অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৫৮

প্রকাশক
বাণীশিল্প ও শ্যামলীর পক্ষে
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
অরিজিৎ কুমার
লেসার ইম্প্রেশনস্
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

সহ সম্পাদক
অজয় সরকার

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

একশো ত্রিশ টাকা

লেখকের ভূমিকা

'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসটির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে তিনটি ভাগ একসঙ্গে কিনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এর প্রতিকার তিনটি ভাগ একত্র প্রকাশ করা। এতদিন পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। 'বাণীশিল্প'এর কল্যাণে সেই অসম্ভব সম্ভব হতে যাচ্ছে। এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। বোধহয় পাঠকরাও, যদি এ গ্রন্থ তাঁদের আনন্দ দেয়।

'রত্ন ও শ্রীমতী' লেখার বাসনা আমার মনে জাগে ১৯৩৫ সালে, কিন্তু তখন আমার হাতে সরকারি কাজ তো ছিলই, তার উপর ছিল 'সত্যাসত্য' সমাপনের দায়। তা ছাড়া আমার অভিলাষ ছিল এর পরে আরো দুটি উপন্যাস লেখার। তাদের নাম 'রত্ন ও শাশ্বতী' আর 'রত্ন ও স্বাতী'। তিন প্রস্ত উপন্যাস একটানা লিখে যাবার মতো অবকাশ পেতে হলে চাকরি থেকে বিদায় নিতে হতো। তার জন্যে দরকার হতো পেনসন। তখনকার দিনে পঁচিশ বছর চাকরীর আগে পেনসন মিলত না। অপেক্ষা করতে হতো ১৯৫৪ সাল অবধি। ততদিন আমি অপেক্ষা করতে চাইনি। স্বাধীনতার পর আনুপাতিক পেনসন নিয়ে আরো আগে সরে পড়তে যাচ্ছিলুম। কিন্তু রেহাই যখন পেলুম তখন ১৯৪৯ সালে দেখা গেল ইংরেজদের রেখে যাওয়া নিয়ম অনুসারে আমি একুশ বছর একটিভ সার্ভিসের ফলে পুরো পেনসন পাবার অধিকারী।

বাঁচা গেল । কিন্তু ইতিমধ্যে রায় লিখতে লিখতে ও রিপোর্ট লিখতে লিখতে আমার সাহিত্যের হাতটি ও সাহিত্যিকের মেজাজটি নষ্ট। হাত ও মেজাজ ফিরে পেতে লেগে গেল আরো কয়েক বছর। 'রত্ন ও শ্রীমতী' শুরু হলো ১৯৫৪ সালে, যখন বয়স আমার পঞ্চাশ।

বিশ বছর বয়সে ফিরে যাওয়া ছিল আরো কঠিন কাজ। প্রেমের ভাষায় লেখা তার চেয়েও কঠিন। রক্তের অক্ষরে লেখা কঠিনতম। দুটি ভাগ শেষ করে যখন তৃতীয় ভাগে মন দেব তখন দেখি বিবেকের আপত্তি দুটি বাক্যে। লিখব কি লিখব না এই নিয়ে অন্তহীন ভাবনা চিন্তা দ্বিধা দ্বন্দ্ব। প্রায় দশ বছর কেটে গেল বিবেকের সঙ্গে আপস করতে।

ইতিমধ্যে 'রত্ন ও শাশ্বতী' লিখতে হলো 'বিশল্যকরণী' নামান্তরে আর 'রত্ন ও স্বাতী' প্রথম ভাগ 'তৃষ্ণার জল' আখ্যা দিয়ে। সে পর্যায় সমাপ্ত হয়নি, হবেও না। তার পরিবর্তে লেখা হলো 'ক্রান্তদর্শী'। এসব গ্রন্থ যথাকালে প্রকাশিত হয়।

এসব বই যে আদৌ লেখা হলো এই যথেষ্ট। যেমনটি হতে পারত তেমনটি হলো না। লেখকের ক্ষমতার অভাবে নয়, তার অন্তরাত্মার অনিচ্ছায়। মহাকাল বিচার করবেন যা হয়েছে তা কালোত্তীর্ণ হবার যোগ্য কিনা। তাকে রূপোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ করতে চেষ্টা করেই আমি মুক্ত।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

প্রাসঙ্গিক

'সত্যাসত্য' উপন্যাসমালা শেষ হয়েছিল বাদলের মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে, বাবার চোখের সামনে ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যুতে। 'সত্যাসত্য'-এর শেষ পর্ব যখন লেখা, তারই কাছাকাছি সময়ে লেখক নিজেও পুত্রশোক পান। তা তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যদর্শনকে পাল্টে দেয়, তিনি মার্গান্তরের জন্যে ব্যাকুল হন।

'আনা কারেনিনা' টলস্টয়ের মার্গান্তরের আগে লেখা, 'রেজারেকশন' মার্গান্তরের পরে লেখা। লেখক অন্নদাশঙ্করের একটা লক্ষ্য ছিল টলস্টয়ের মতো লেখা, যে টলস্টয় 'আনা কারেনিনা' লিখেছিলেন, কী করে আর একখানা 'আনা কারেনিনা' লেখা যায় সেই তাঁর জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে। 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র দাবীই এই উপন্যাসমালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মার্গান্তরিত না হওয়ার একটা কারণ।

অন্নদাশঙ্কর টলস্টয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সত্যের প্রতি অনুরাগ, এপিকের প্রতি আকর্ষণ; রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ, বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণ; রলাঁ-র কাছ থেকে তাঁর নৈতিক গুণগুলি; গ্যেটের কাছ থেকে স্থিতপ্রজ্ঞা; আর গান্ধীর প্রভাবে পড়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হওয়ার বাসনা—তবু 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র দাবী যখন তাঁকে একাধিক বোঝা নামাতে বাধ্য করে তখন তিনি জনগণের বোঝাটিই নামান সর্বপ্রথম।

'রত্ন ও শ্রীমতী' লেখার আগে তাঁকে 'না' ও 'কন্যা' লিখতে হয়েছিল, এ-দুটি উপন্যাস না লিখলে চলতো না; যেমন 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র পরবর্তী পর্যায়ের দুটি উপন্যাস হলো 'বিশল্যকরণী' ও 'তৃষ্ণার জল'—বিবর্তন একটানা নয়, ছাড়াছাড়া; যেমন 'দুকান কাটা' বা 'হাসনসখী'-র মতো গল্প মার্গান্তরের পরে লেখার কথা কিন্তু লেখা হয়েছে আগে।

একদিক থেকে বলা যায়, অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' হচ্ছে তাঁর 'সমর ও শান্তি', আর 'রত্ন ও শ্রীমতী' হচ্ছে তাঁর 'আনা কারেনিনা', আর 'ক্রান্তদর্শী' হচ্ছে তাঁর 'পুনরুজ্জীবন'—জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তিনি টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

কী নিয়ে 'রত্ন ও শ্রীমতী' লেখা? কী তার কাহিনী, কেমন চরিত্রগুলি, বিষয়বস্তু কী? রত্ন নামে একটি ছেলে শ্রীমতী নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল, তাদের প্রেমোপাখ্যান নিয়ে এই উপন্যাস রচিত। এটা বহিরঙ্গের দিক। লেখকের অভিলাষ ছিল, এর চরিত্রগুলি হবে এককালের হয়েও চিরকালের মানুষ, একদেশের হয়েও গোটা বিশ্বের মানুষ। আর তার কথাবস্তু হবে মানবনিয়তি ও মানবপ্রকৃতি। 'সত্যাসত্য'-এ বাদল সুধীকে প্রশ্ন করেছিল, 'সুধীদা, ফ্রী উইল না ডিটারমিনিস্‌ম্?' লেখকের স্বাধীনতা আছে

এটা সত্য, কিন্তু এই লেখকের মতে লেখা একবার শুরু হয়ে গেলে ফ্রী উইল মায়া। তখন ডিটারমিনিস্‌ম্‌ কাজ করে যায়। যা হয়ে দাঁড়ায় তা নিয়তি। এই মানবনিয়তিই 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে লেখকের বিবেচ্য।

অন্তরঙ্গের দিক থেকে এই বই দুরূহ বই। সহজ করে লিখলেও উচ্চতর ভাবের কথা। এ বই সঠিক বুঝবে তারাই যারা জীবনে কিছু পেয়েছে। তা সে সুখ দুঃখ যাই হোক। একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর আমাকে বলেছিলেন, 'অল্প বয়স থেকে দুটো জিনিশকে বড় বলে জেনেছি, একটা হচ্ছে নরনারীর প্রেম, আর একটা আমার নিজের প্রেম। নরনারীর যে প্রেম, তা সারাজীবন ধরে সাধনা করলেও শেষ হয় না। নর আর নারী—তারা হচ্ছে মানব-মানবী, তারা দুটি আত্মা। আমি ও আমার প্রিয়া আমরা যেমন দুজন, তেমনি আমরা একই সত্তার দুটি দিক, আমাদের মধ্যে একটা একাত্মতা রয়েছে। সেই একাত্মতা দেহে-দেহে, মনে-মনে, আত্মায়-আত্মায়। দেহের মিলনই সব নয়, তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, আরও একটু গভীরে যেতে হবে, আরও একটু গভীরে যেতে হবে, আরও একটু ওপরে উঠতে হবে, আরও একটু ওপরে উঠতে হবে, সেইটেই লক্ষ্য। সেইটেই প্রেমের আদর্শ। তা কার জীবনে কতটুকু সম্ভব বলা যায় না, তবে চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি নিজে সম্পূর্ণ হই আর না হই, আমার প্রিয়া সম্পূর্ণ হন কি না হন, আমি বিশ্বাস করি, ইটার্নাল বলে একটা কিছু আছে। তা কী সেটাই আমার প্রশ্ন, সেটাই আমার ধ্যান। গল্পে উপন্যাসে তাকেই আমি ধরতে চেয়েছি। এই শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণে আমি নিয়োজিত আছি, এই-ই আমার অন্বেষা।' 'রত্ন ও শ্রীমতী' সেই শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণের কাহিনী।

এই নরনারীপ্রেম প্রসঙ্গে লেখকের নিজের প্রেমের কথাও তুললাম এই কারণে যে, সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে এই উপন্যাসমালার রচনানীতির সঙ্গে। উপন্যাস শুরু করার সময় লেখকের পণ ছিল যে, তিনি নীতিবাদী হবেন না, রেস্পেক্‌টেবল হবেন না, লোকের মন রাখা কথা বলবেন না; থামিয়ে দেবেন না, বদলে দেবেন না, শুধরে দেবেন না, বাদসাদ দেবেন না, মোড় ঘুরিয়ে দেবেন না, পল্লবিত করবেন না, অলঙ্কৃত করবেন না, জনপ্রিয় করবেন না; কিন্তু তাই বলে অকারণে গায়ে পড়ে আঘাতও করবেন না, ব্যথা দেবেন না, অসভ্য হবেন না। যাঁর ভালো না লাগবে তিনি পড়া বন্ধ করে দেবেন, বেশির ভাগ পাঠক যদি বিরূপ হন তাহলে প্রকাশক ছাপা বন্ধ করে দেবেন, লেখক কিন্তু লেখা বন্ধ করবেন না, লিখে যাবেন, কেননা তিনি লিখছেন অন্তিম পাঠকের জন্যে।

কিন্তু উপন্যাস শেষ করার সময়ে তিনি দেখেন যে, তখন তিনি রেস্পেক্‌টেবল গৃহস্থ ও প্রবীণ সাহিত্যিক, নিজেকে তিনি যতটা স্বাধীন ভেবেছিলেন তখন আর ততটা স্বাধীন নন, আগের মতো আর প্রাণ খুলে লিখতে পারেন না, তিনি সাবধানী হয়েছেন। ফলে তৃতীয় ভাগ কিছু বাদসাদ দিয়ে লিখতে হয়, তাতে শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণের বৃত্তান্ত পাল্টায় না হয়তো কিন্তু কিছু স্বাদ বাদ যায়।

টলস্টয় তাঁর পরিকল্পিত নায়িকা আনাকে গিল্‌টি বলে বিশেষিত করতে চাননি,

করতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র প্যাথেটিক। কিন্তু ঘটনাচক্রে আনা শুধুমাত্র প্যাথেটিক নয়, মূলত গিল্‌টিই। আর অন্নদাশঙ্করের নায়িকা শ্রীমতী তথা গোরী যতটা না প্যাথেটিক তার চাইতে বেশি সিম্প্যাথেটিক, অভিমানিনী; যতটা না প্যাশনে তার চেয়ে বেশি কম্প্যাশনে গড়া; আনার মতো দৃঢ়চেতা ও একরোখা নয়, বরং স্ববিরোধী ও মরমী; প্রেমের জন্যে তার ত্যাগ, প্রেমিকের জন্যে সে যোগিনী। আর রত্নও নয় ভ্রন্‌স্কি, যেমন জ্যোতি নয় লেভিন।

'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণ এই প্রকারের : 'দুঃখমোচন ছিল ব্রত একদা/এখন দিয়েছি তারে গঙ্গাজলে।/আর কোন্ ব্রত আছে প্রেমব্যতীত/এবার বাঁচব আর কিসের ছলে?/...টান যদি থাকে কোনো সে নয় প্রাণের/ধনের মানের নয়, নয়কো যশের/স্নেহের প্রেমের টানে হৃদয় বাঁধা/অণুতে অণুতে টান মধুর রসের।/ মনে হয় আরো যেন কয়েকটি ধাপ/প্রেমের দেউল দ্বারে উঠতে হবে/নয়তো আমার এই জীবন-লীলার/সাধনা অপরিণত ক্ষান্ত রবে।'

'রত্ন ও শ্রীমতী' শেষ করার কাছাকাছি সময়ে লেখকের উপলব্ধি এই যে : 'রাধার প্রেমের ঋণ এসেছি শুধিতে/এখনো হয়নি শেষ রয়েছে এ বোধ/এই আয়ুষ্কালে যদি না-ই হয় শোধ/কে জানে কোথায় কবে হবে জন্ম নিতে।/গোরী সে হয়েছে গৌরী, রাধা সে মাদোনা/বসন্তের পরিণতি হেমন্তের সোনা।'

শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণে কখনো কখনো প্রেমের সঙ্গে সুন্দরের মিলন ঘটে, যা প্রেমময় তা সুন্দর ও যা সুন্দর তা প্রেমময় হয়ে ওঠে, সে এক সুগভীর অভিজ্ঞতা, তার আস্বাদ পেলে মুক্তির আস্বাদ। 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে এর সামান্য আভাস আছে। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে লেখক আমাকে বলেছিলেন, 'সৌন্দর্যের অন্বেষণ—এটা উপেক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ যে সৌন্দর্যচিন্তা তা মনের মতো হচ্ছে না। ফলে সৌন্দর্যের অন্বেষণ নিয়ে লেখার দরকার হতে পারে—বুক অব বিউটি।'

এই প্রসঙ্গে 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র সঙ্গে 'কন্যা'-র ভাবগত তারতম্যের কথা উঠবে। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এ-সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তার কিছু উদ্ধৃত করছি—

There is a basic difference between the ruling idea of 'Kanya' and that of 'Ratna O Srimati'. The latter is a love story concerning a Free Man and a Free Woman. The former is a quest for the Eternal Feminine. Imagine her as four women or aspects — She who has great physical beauty and charm but cannot be possessed for long; She who has spiritual and intellectual beauty shining through her face but is beyond our hero's reach; She who is capable of rare feats of heroism or is beautiful in action but becomes commonplace if possessed and She who is everywhere and nowhere — the Woman among Women — the womanly spirit or feminine principle — who is not to be possessed but felt...

এক ব্যক্তিগত পত্রে লেখক বলছেন, 'আমি কাউকে পরামর্শ দেব না এই চারটি

পথের পথিক হতে। বরং সতর্ক করব। ধরে নাও যে ও বইটাই (কন্যা) একটা warning বা চেতাবনী।' কিন্তু 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র যা ভাববস্তু, মুক্ত ও শাশ্বত প্রেমের সে অভিজ্ঞতা ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব এবং সম্ভব হলে তা উত্তরণের একটা উপায়ও বটে। আর এ-জিনিশ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ঘটেওছে। তাঁর প্রেমিকা স্বকীয়া, তাঁর বিবাহ প্রণয়মূলক। তাই বেদ উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারতের মতো তাঁর ক্ষেত্রেও, তাঁর জীবনেও, স্বকীয়ার শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন। তাঁরা সুখী ও তৃপ্ত।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে মহৎ উপন্যাস লেখা যায় না। তাই মূল উপন্যাসে পাত্রপাত্রী পাল্টেছে, ঘটনাধারা পাল্টেছে। প্রেমিকা সেখানে পরকীয়া। কাহিনীও শেষ-পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়।

একদিক থেকে দেখলে 'রত্ন ও শ্রীমতী' বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের যে লীলাব্যঞ্জনা তার প্রতীকে রচিত। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায়, 'সূত্রপাতে আকর্ষণ, প্রণয়-জিজ্ঞাসা এবং প্রণয়-পরীক্ষা। পরবর্তীতে প্রণয়কে কামনার অগ্নিদাহনে বিশুদ্ধ করে জানবার চেষ্টা। অবশেষে সকল সম্পর্কের বাইরে গিয়ে চিত্তের গভীরে প্রণয়কে আবিষ্কার করা। প্রেমের এই অভিব্যঞ্জনাকে তিনি আধুনিক জীবনের মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এই গ্রন্থের শ্রীমতী হচ্ছে রাধা রত্ন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি আধুনিক জীবনের মধ্যে বৈষ্ণব রসের আস্বাদনকে কি করে সার্থক করবেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, বৈষ্ণব রসের আনন্দকে প্রকাশ করতে হলে দ্বিতীয়বার সেই অনুভূতির রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। আমি বহুজনের জীবনে বহুকাল ধরে জীবনলাভ করতে চাই। সীমার ভিতর (অসীমকে) পুরতে জানাই আর্টের বিষয়।'

এই প্রয়াস অপ্রত্যাশিত কিছু নয় কেননা তাঁর নিজের ধারণায় তিনি চণ্ডীদাসের উত্তরসাধক। তাঁর বিদগ্ধ নাগরিকতার পাশাপাশি তাই তাঁর সহজাত চণ্ডীদাসী সাধনাও সক্রিয়। 'সত্যাসত্য'-এর তৃতীয় খণ্ডে লেখকের পারিবারিক বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের প্রক্ষেপ ঘটেছিল আর এখানে 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে লেখকের বৈষ্ণব ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে মনে করি।

'অসমাপিকা' লেখার বছর পাঁচেক পরে লেখক অনুভব করেছিলেন যে ওই উপন্যাসের বিষয়বস্তু একটি বৃহৎ উপন্যাসের উপযুক্ত। পরে এই বিষয়বস্তুই বৃহদাকার উপন্যাস 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র রূপ পায়। 'অসমাপিকা'-য় প্রেমের অন্বেষণের প্রাথমিক প্রয়াস। তা একটি সমস্যামূলক প্রেমের কাহিনী। কিন্তু 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে আদর্শ প্রেমের সমুন্নত প্রকাশ। তা শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণের দার্শনিক ভাষ্য। এই ভাষ্যে লেখক নরনারীর প্রেমকে বিশুদ্ধ নিরামিষ বা নিছক সামাজিক করে রাখেন নি। তা যতটা দৃপ্ত তার চেয়ে বেশি ভাবালু বলে হয়তো আধুনিক সমালোচকের বক্রোক্তির লক্ষ্য। কিন্তু তা বাঙালি ঐতিহ্যেরই অপরিহার্য অঙ্গ, যেখানে মননপ্রাধান্যও ভাবুকতায় পরিণতি চায়।

শ্রীমতী হচ্ছে রাধা আর রত্ন হচ্ছে কৃষ্ণ—এই ধারণার উল্টোপিঠ হলো লেখকের সেই উপলব্ধি যা 'রত্ন ও শ্রীমতী' শেষ করার কাছাকাছি সময়ের ও যার কথা আগেই বলেছি এবং এই দুটিকেই যে-প্রতীতির আধারে ধরে রাখা যায় তা হলো লেখকের

রাধাতত্ত্ব, অন্নদাশঙ্করের রচনায় ও বিশেষত কাব্যে যার অজস্র প্রকাশ ঘটেছে-

১. সৃষ্টির সার ধরণী গো আর ধরণীর সার নারী
নারীর মাধুরী দশ ইন্দ্রিয়ে আহরিতে যদি পারি!
ধরণীর সার রমণী গো আর রমণীর সেরা সে
জনমে জনমে আমার লাগিয়া জনম মাগিল যে।
ওগো একাকিনী, ওগো একাকিনী রাধা,
কেহ নাহি জানে তুমি আর আমি কোন অবাঁধনে বাঁধা।

২. পুন কোন বনে পড়িব বাঁধা
নূতনা রাধা!
পুন কোন বনে বাঁশরি সাধা
আবার কাঁদা!
ঘরের বাঁধনে নাইকি বাঁধা
নাই কি কাঁদা!
সমাপিবে চির বাঁশরি সাধা
সুচিরা রাধা!

৩. রাধার প্রেমের ঋণ হয়নি সে শোধ
বিশ্বের সৌন্দর্য ঋণ শোধ নাই তারও
যত দিই মনে হয় দিই আরও আরও ...

৪. সাধনার ধন বটে রমণীর প্রেম
প্রেম যেথা সত্য সেথা নিকষিত হেম।
ধরায় রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি
তাই তো এখনো আমি ছাড়িনি ধরণী।

৫. রাধা আসে রূপে রূপে শক্তি সঞ্চারিতে
পঙ্গু সেও লঙ্ঘে গিরি রাধাপ্রেম বুকে
মূকও বাচাল হয় রাধানাম মুখে
শক্তও সহজ হয় রাধার ইঙ্গিতে।
যা করেছি, যা হয়েছি, রাধারই প্রসাদে।
রাধে জয়! রাধে জয়! জয়, জয় রাধে!

৬. সৃষ্টির হ্লাদিনী শক্তি তারই নাম রাধা
অমূর্ত রহস্যময়ী নারীরূপ ধরে
কান্তা হয় সেই নারী কান্তের অন্তরে
মুক্ত বিহঙ্গীর মতো পড়ে না সে বাঁধা।
কান্ত যদি হয়ে থাকে রসিক সুজন
কান্তারূপে পায় তারে না করে বন্ধন।

এই সেরা রমণী, চিরন্তন তবু চিরনতুন রাধা, সৃষ্টির হ্লাদিনী শক্তি, প্রেমের সাধ্য শিরোমণি 'দেবী নয়, নারী, তবু উর্ধ্বে নিয়ে চলে/উর্ধ্ব হতে আরো উর্ধ্বে, বৈকুণ্ঠ যেথায়/কবিপ্রিয়া বিয়াত্রিস সরণি দেখায়/ কবি তার সঙ্গ রাখে একা নভস্তলে।'

লেখকের ব্যক্তিসত্তা সেই নারীর উদ্দেশে বলে ওঠে—'যে নারী পূরায় বাঞ্ছা অন্তরযামিনী/তাহারে প্রণাম।/সে নয় বিভবলুব্ধা সামান্যা কামিনী/তাহারে প্রণাম।/প্রণাম হাসিয়া লয় যে উর্ধ্বগামিনী/ তাহারে প্রণাম।'

আর লেখকের কবিসত্তা সেই নারীর উদ্দেশে বলে—'ক্রান্তদর্শী সমাপিত অশীতির পারে/মরণে পড়েনি ছেদ, এ যে আশাতীত/ বার্দ্ধক্যে নেবেনি বহ্নি, যদিও স্তিমিত/ যৌবন প্রচ্ছন্ন ছিল বয়সের ভারে।/তৃপ্ত, তবু মুক্ত নই, আছে এই বোধ/রাধার প্রেমের ঋণ হয়নি তো শোধ।'

এইসব অনুভূতি মিস্টিক অনুভূতি এবং সেই প্রসঙ্গে লেখকের এই উক্তি স্মরণীয়—'সর্বোচ্চ সত্যকে জানতে গেলে মিস্টিক অনুভূতি চাই। শুধু ইনটেলেক্ট দিয়ে হয় না। আবার গুরুর কাছে গিয়ে, শাস্ত্র পড়ে, তীর্থ পর্যটন করেও সত্যকে জানা যায় না। এটা জানা যায় দৈবক্রমে। আমি ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস করি। হায়ার পাওয়ার বলে কিছু একটা আছে।'

বস্তুবাদী কেউ আপত্তি করলে তিনি বলবেন—'সাধনার প্রথম ধাপে পৌঁছবার আগে শেষ ধাপের মর্ম তুমি কী বুঝবে?'

ধীমান দাশগুপ্ত

রত্ন ও শ্রীমতী

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

বছর ষোলো যখন আমার বয়স তখন আমার হাতে এলো টলস্টয়ের ছোটগল্পের বই। যার ইংরেজী নাম 'টোয়েনটি থ্রী টেল্‌স।' বইখানি আমি পুরস্কার পেয়েছিলুম, সেইজন্যে আমার চোখে তার এত দাম। তার একটি গল্পের বাংলা অনুবাদ করে সেই বয়সেই 'প্রবাসী'-তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টকার্ড আসে। মঞ্জুর! তার পরের সংখ্যাতেই ছাপা হয়। তাজ্জব!

বাংলা মাসিকপত্রে সেই আমার প্রথম প্রবেশ। যাঁর কল্যাণে একটি ষোলো বছরের ছেলে 'প্রবাসী'-র আসরে আসন পেলো সেই টলস্টয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক। টলস্টয় আমি মন দিয়ে পড়ি। বছর দু' তিন পরে লাইব্রেরীতে গিয়ে 'আনা কারেনিনা' পাঠ করি। তার দু'এক বছর পরে 'হোয়াট ইজ আর্ট।'

টলস্টয়ের জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যখন তাঁর অন্তঃপরিবর্তন হয়নি, যখন থেকে তাঁর অন্তঃপরিবর্তন হয়। যেমন আমাদের চণ্ডাশোক ও ধর্মাশোক তেমনি চণ্ড-টলস্টয় ও ধর্ম-টলস্টয়। আমার প্রথম পরিচয় ধর্ম-টলস্টয় বা ঋষি টলস্টয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় পরিচয় চণ্ড-টলস্টয় বা ভোগী টলস্টয়ের সঙ্গে। তৃতীয় পরিচয় আবার সেই ধর্ম-টলস্টয় বা ঋষি টলস্টয়ের সঙ্গে। এ রকম উল্টো পাল্টা পরিচয়ের ফল দাঁড়ালো এই যে আমি তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট'-এর থিয়োরির সঙ্গে তাঁর দুই বয়সের দু'খানি বই মিলিয়ে দেখে 'আনা কারেনিনা'-কেই বেশী পছন্দ করলুম। থিয়োরি থেকে যা এলো তাকে নয়, থিয়োরির আগে যা এসেছিল তাকেই। তার মানে চণ্ড-টলস্টয় বা ভোগী টলস্টয়ের প্রতি আমার পক্ষপাত দেখা গেল। এটা টলস্টয় নিজে চাননি। তিনি তাঁর 'আনা কারেনিনা'-কে আর্ট হিসাবে ব্যর্থ মনে করতেন। কারণ ও-বই লেখার সময় তিনি ছিলেন পাপীতাপী মানুষ। টাকার জন্যে ও-বই লিখেছিলেন। ওতে কেবল বড়লোকদের কথা। যেসব বড়লোকও খারাপ লোক।

টলস্টয় জীবিত থাকলে আমার এই বিপরীত মনোভাব দেখে পীড়া বোধ করতেন। আমি তখন 'ফলেন পরিচীয়তে' এই আর্ষবাক্যকে টলস্টয়ের ঋষিবাক্যের চেয়ে মান্য করতুম। 'হোয়াট ইজ আর্ট'-এর ফল এমন কী হলো! ঋষি এমন কী সৃষ্টি করলেন! তিনি যা পারলেন না অন্যে তা পারবে কেন? আমি পারব কেন? আমি ও-থিয়োরি সরাসরি খারিজ করলুম। কী করে আর একখানা 'আনা কারেনিনা' লেখা যায় সেই আমার জিজ্ঞাসা। কোন্ থিয়োরি থেকে এলো 'আনা কারেনিনা?' না, তার পিছনে কোনো থিয়োরি নেই? যদি কোনো থিয়োরি না থাকলেও তেমন একখানি ক্লাসিক লেখা সম্ভব হয় তবে থিয়োরির আবশ্যক কী? কেন থিয়োরি মুখস্থ করব?

ওদিকে ঋষি ওয়ার্ড্সওয়ার্থের একটি থিয়োরি ছিল, কতকটা ঋষি টলস্টয়ের মতো। তার থেকে কিছু ভালো কবিতা এসেছিল, যেমন 'টোয়েনটি থ্রী টেল্‌স্' এসেছিল টলস্টয়ের থিয়োরি থেকে। আমি কিন্তু শেলী কীটসের অধিকতর অনুরাগী ছিলুম। যা আমাকে শেলী বা কীটসের মতো কবি না করবে তা নিয়ে আমি কী করব! কী করব তেমন থিয়োরি নিয়ে? কিন্তু টলস্টয় এবং ওয়ার্ড্সওয়ার্থ দু'জনের দুটি থিয়োরি আমার মন না পেলেও মনের কোণে ঘরকন্না পেতে বসল। সেখান থেকে তাদের হটানো গেল না।

এমনি সময় ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। তিনিও তো একজন ঋষি। শোনা যাক তিনি কী বলেন এ সম্পর্কে। তিনি বললেন, উচ্চতর গণিত ক'জন বুঝতে পারে? তা বলে তাতে জল মিশিয়ে সাধারণের বোধগম্য করা যায় কি? — এই ধরনের কথা। আর্টের সঙ্গে উচ্চতর গণিতের তুলনা তখনকার দিনে আমার অন্তরের সায় পায়নি। তবু এইটেই আমি মেনে নিয়েছি। আমার ভিতরে একজন উঁচকপালে হাইব্রাউ ইনটেলেকচুয়াল ছিল, সে তার মনের মতো সাফাই পেয়ে বর্তে গেল। আরে, আমি কি সাধারণের জন্যে লিখতে পারি! আমি লিখব বিদগ্ধদের জন্যে। ফরাসীতে যাঁদের বলা হয় এলিৎ।

তখনকার মতো একটা সমাধান তো পাওয়া গেল। তাই নিয়ে হলো আমার যাত্রা শুরু। সাহিত্যে আমি 'পথে প্রবাসে' লিখে উপনীত হলুম। সেই আমার উপনয়ন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখলেন ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তুমি এর ইংরেজী অনুবাদ করে ছাপাও না কেন? অতটা সাফল্য আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি ভালো করেই জানতুম যে আমার শিক্ষানবিশি যথেষ্ট কাঁচা। কত কাল যে এক মনে সাধনা করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। কেননা আমার লক্ষ্য ছিল টলস্টয়ের মতো লেখা। যে টলস্টয় 'আনা কারেনিনা' লিখেছিলেন। শেলীর মতো লেখা। কীটসের মতো লেখা। রবীন্দ্রনাথের মতো লেখা।

কোনো রকম থিয়োরিতে আস্থা না থাকায় আমাকে অপরের দৃষ্টান্ত দেখে পথ চলতে হচ্ছিল। এঁর মতো তাঁর মতো। কয়েক জনের নাম করেছি। আরো কয়েকজনের করি। রম্যা রলাঁর তখন আমার উপর অপ্রতিহত প্রভাব। এখনো রোজ রাত্রে তাঁকে আমি স্মরণ করি। এটা অনেক দিনের অভ্যাস। আর তাঁর লেখা পড়িনে। কিন্তু তাঁর নৈতিক গুণগুলি পেতে চাই। রলাঁ ছিলেন স্বাধীন ও মুক্ত, স্পষ্টবাদী, আপোসহীন। অথচ রসিক ও বিদগ্ধ। রলাঁর পর গ্যেটের প্রভাব হলো তেমনি অপ্রতিহত। যেমন তার 'ফাউস্ট' তেমনি তাঁর 'ভিল্‌হেল্‌ম মাইস্টার' আমাকে দিল একাধারে দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টি। আমার জীবন-দর্শনটাই বদলে গেল। লিখতে যদি হয় তো এমনি সব বই। যাতে আর কারো জীবনদর্শন বদলে যাবে। হতে যদি হয় তো গ্যেটের মতো সবকিছুর উর্ধ্বে: সব দ্বন্দ্বের, সব সঙ্কটের। গ্যেটের মতো স্থিতপ্রজ্ঞ।

এর পরে এলো গান্ধীর প্রভাব। আরো অপ্রতিহত। গান্ধীকে আমি আগে একবার গুরু করেছিলুম, পরে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আবার ফিরে গেলুম গান্ধী-মার্গে। সে

মার্গ সাহিত্যে টলস্টয় মার্গ। আবার পড়লুম 'হোয়াট ইজ আর্ট।' এতদিন যা আমার মনের তলে ফল্গুর মতো ছিল তা উপরে এলো গঙ্গার মতো।

থিয়োরিকে অবহেলা করেছিলুম, উপেক্ষা করেছিলুম। এবার সে তার শোধ তুলল। আমি হয়ে উঠলুম গান্ধীমার্গী, টলস্টয়মার্গী। ততদিনে আমার বৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য' সারা হয়েছিল বারো বছরের তপস্যায়। থিয়োরি নিয়ে মাথা ঘামাইনি তার রচনাকালে। ভালোই করেছি। মাথা এমনিতেই ঘামছিল সরকারী কাজে, শাসক শাসিতের সংঘর্ষের যুগে। আরো ঘামলে লেখা বন্ধ হয়ে যেত। পুঁথি অসম্পূর্ণ থাকত

'সত্যাসত্য' লিখতে লিখতে 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র পরিকল্পনা আমার মানসে উদয় হয়। সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। ইচ্ছা ছিল একটা বই শেষ হলে পরে আরেকটা ধরব, কিন্তু তত দিনে সাত বছর কেটে গেছে। লিখে লিখে আমি শ্রান্ত, নিঃশেষিত। ছোট একখানা উপন্যাস হলে হাত দিয়ে দেখা যেত। কিন্তু এও তো বেশ দীর্ঘ হবে। লম্বা পাড়ির পর আবার লম্বা পাড়ি কে দেয়! জিরোতে হয়। আমার দরকার ছিল কয়েক বছর বিশ্রাম। কিন্তু শুধু তাই নয়। আরো কথা ছিল। জীবনটাকে আমি মার্গান্তরিত করতে চেয়েছিলুম। চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে যাব, সেখানে গতর খাটাব, চাষী হব। এমনি অনেক কথা। তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এই যে সাহিত্য হবে মাটির গন্ধে মাটির স্বাদে ভরপুর। কাগজের ফুল নয়, গাছের ফুল। ফ্যানাটিক হলে যা হয়। এক এক করে আমি আমার সব ক'টি দেবমূর্তি ভেঙেছিলুম। গ্যেটে, রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ।

এখানে বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই আমার জীবনের প্রথম না হলেও প্রধান প্রভাব। তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকে ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি আমার জীবনদর্শনের দার্শনিক ও দিশারী ছিলেন। তবে সাহিত্যক্ষেত্রে এত দীর্ঘকাল নয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই যে আমার জীবনদর্শনে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রভাব বড় একটা ছিল না, যেটুকু ছিল সেটুকু সাহিত্যক্ষেত্রে নিবদ্ধ, তাও ভাষার বেলা। তবে তাঁর বৈদগ্ধ্যের আমি পরম পক্ষপাতী ছিলুম। তাঁর মতো সংস্কৃত মন আমি এ দেশে খুব কম দেখেছি। তাঁর ভাষা তাঁর মনের ভাষা, মনের ভাষা বলেই মুখের ভাষা। তাঁর মন মুখ এক ছিল।

প্রথম প্রভাব আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি বৈষ্ণব পদাবলীকারদের। বিশেষ করে চণ্ডিদাসের। বৈষ্ণব কবিতাই আমার প্রথম প্রেম। রবীন্দ্রকাব্য আমার দ্বিতীয় প্রণয়। বাংলাদেশে এর চেয়ে ভালো আর কিছু লেখা হয়নি এখনো।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পুত্রশোক পেয়ে এই চিন্তাই আমার মনে প্রবল হলো যে জীবন ঠিক না হলে সাহিত্য ঠিক হবে না। অতএব ধর্মাশোক হতে হবে। মার্গান্তরের জন্যে আমি ক্রমে ক্রমে ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। এই ব্যাকুলতা চারিয়ে গেল আমার সাহিত্যকর্মে, ছাড়িয়ে উঠল নতুন উপন্যাস রচনার উদ্যমকে। 'রত্ন ও শ্রীমতী, লেখা হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আগের কাজ আগে। জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে। চল্লিশ বছর বয়সে একজন মানুষের কাছে কেন যে এটা এত জরুরি হলো তা আমারই ভালো মনে পড়ে না। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও আমি একদিনের জন্যে ভুলিনি

যে আমাকে 'রত্ন ও শ্রীমতী' লিখতে হবে। লিখতে হবে পঞ্চাশের পূর্বেই। নইলে লেখার জোর পাব না। শরীর বিমুখ হবে। দুনিয়ায় যেসব জোরালো বই লেখা হয়েছে সেসব বই লেখকদের বল বয়স থাকতে। বাণপ্রস্থে গেলে 'আনা কারেনিনা' লেখা হতো না। হয় অলিখিত রয়ে যেত, নয় ধর্মগ্রন্থ হয়ে দাঁড়াত। পঞ্চাশ পেরোবার আগে 'রত্ন ও শ্রীমতী' শেষ হওয়া চাই, পরোয়ানা পেয়েছিলুম ভিতর থেকে। শুধু 'রত্ন ও শ্রীমতী' নয়, সেই পর্যায়ের আরো দু'সেট বই।

কী করে তা সম্ভব ? তখন কিন্তু মনে হতো যে মার্গান্তরের পরেই 'রত্ন ও শ্রীমতী' লিখতে বসা সম্ভব, পঞ্চাশের পূর্বে তিন সেট বই শেষ করাও সম্ভব। অথচ মার্গান্তর মানে বসে বসে বই লেখা নয়। কায়িক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবনযাত্রা নির্বাহ। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাত আট খণ্ড উপন্যাস বিরচন। এখন বুঝতে পারছি পাগলামি। এসব বই এত শ্রমসাধ্য যে কায়িক পরিশ্রমের পর মানসিক শ্রম ও লেখনী চালনার শ্রম উটের পিঠে শেষ কুটো হতো। উট মুখ থুবড়ে পড়ত। মরত। লেখকের জীবনে কায়িক পরিশ্রম গৌণ হতে পারে। কিন্তু মুখ্য হলে সে 'আনা কারেনিনা' লিখতে পারে না, পারে বড় জোর 'মাস্টার য়্যাণ্ড ম্যান' বা 'ডেথ অফ আইভান ইলিচ।' অর্থাৎ ছোট গল্প বা মেজ গল্প। উপন্যাস নয়। উপন্যাস নিজেই একপ্রকার কায়িক পরিশ্রম।

এত দিনে হোঁশ হয়েছে। কিন্তু দশ বারো বছর আগে আমি ছিলুম সম্পূর্ণ অবুঝ ও অন্ধ। অসম্ভবের আশায় দিনপাত করেছি। অসময়ে লিখেছি 'দু'কানকাটা' ও 'হাসন সখী' প্রভৃতি কয়েকটি ছোটগল্প। যা মার্গান্তরের পরে লেখার কথা। আগে নয়। ব্যাকুল হয়েছি মার্গান্তরের জন্যে। পেছিয়ে দিয়েছি উপন্যাসের দাবী। থিয়োরির ছক কেটেছি। থিয়োরি যে পুরোপুরি টলস্টয়ের সঙ্গে মেলে তা নয়। গোড়াতেই অমিল। তিনি চেয়েছিলেন সাহিত্যের মূল সুর হবে মানবপ্রীতি, ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসা। নরনারীপ্রেম নয়। সে ভালোবাসাকে তিনি তাঁর ভালোবাসার সংজ্ঞার বহির্ভূত মনে করতেন। নইলে তিনি ধর্ম-টলস্টয় হবেন কেমন করে ? আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে দান্তে, গ্যেটে, চণ্ডিদাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ধর্মসাধনার মধ্যে কেবল এক জাতের ভালোবাসার স্থান আছে তা নয়, সব জাতের ভালোবাসার ঠাঁই আছে। তাই যদি হলো তবে সাহিত্যসাধনার মধ্যে কেবল একটি রসের নয়, সব রসের জায়গা আছে। সাহিত্যের প্রেরণা কেবল মানবমৈত্রী নয়, নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক, সত্যের অন্বেষণ, রূপাভিসার, সামাজিক ন্যায়, বীরত্ব। সকলের সব সাহিত্যসৃষ্টি এক ছাঁচে ঢালাই হবে, সে ছাঁচ মানবমৈত্রীর, নইলে তার নাম সাহিত্য হবে না, এ গোঁড়ামি আমি কোনো দিন মেনে নিতে পারিনি। কিংবা নরনারীর প্রেমকেও বিশুদ্ধ নিরামিষ বা সামাজিক করে তুলিনি।

তা হলে মিল কোথায় ! মিল এইখানে যে লেখা হবে জনগণের জন্যে। তারাই সাহিত্যের ভোক্তা। এ ভোজ তারা না এলে ব্যর্থ। লিখতে হবে কোটি কোটি মানুষের রসপিপাসা মেটাতে, রূপতৃষ্ণা তৃপ্ত করতে।

লিখতে হবে সরল মানুষের জন্যে সরল করে, এত সরল যে ওর চেয়ে সরল কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সরল করতে গিয়ে তরল করা চলবে না। বিকৃত করা

চলবে না । পূর্ণ সত্যটাই পাতে তুলে দিতে হবে । বাদসাদ দিয়ে নয় ।

ভাষা হবে সরল, সহজ, স্বাভাবিক, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আসা । চাতুরীবর্জিত । অলঙ্কারবিহীন । যে ভাষায় মানুষ ভগবানের সঙ্গে কথা বলে । জনগণও তো ভগবান । বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু সকলেই যাঁর যাঁর দেশের প্রাকৃত ভাষায় জনগণের সঙ্গে কথা বলেছেন । ইংরেজীর খুব ভালো নমুনা হচ্ছে বাইবেলের ভাষা, নিউ টেস্টামেন্টের ভাষা । এ ভাষা সুন্দর । এ ভাষায় মধু আছে । এ ভাষা মধুময় ।

লেখা হবে মস্তিষ্কজাত নয়, হৃদয়জ । উচ্চতর চিন্তাকেও হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আসতে হবে, হৃদয়ের রসে সরস হয়ে । রস এখানে সুভাষিত নয়, উইট নয় । করুণ রস, কান্ত রস, রুদ্র রস । মানুষ যতই অশিক্ষিত যতই নির্বোধ হোক না কেন, হৃদয় তো তার আছে, সেই হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবে, সাড়া তুলবে । শুধু মস্তিষ্কের দ্বারে গিয়ে ফিরে আসবে না ।

চরিত্রচিত্রণ হবে প্রাথমিক বর্ণে, প্রাইমারি কালার দিয়ে । মোটা তুলিতে । তা হলে সেসব চরিত্র সকলের ঘরের লোকের মতো আপন হয়ে যাবে । সকলে তাদের চিনবে । যেমন সেকালে চিনত । মহাভারত বা রামায়ণের চরিত্রগুলি লাল নীল হলদে রঙে আঁকা । কোনো কোনোটি শাদাতে কালোতে আঁকা । বর্ণাঢ্যতা যেই এলো অমনি এলো ক্ষয়িষ্ণুতা বা ডেকাডেন্স । সাহিত্য যেখানে বর্ধিষ্ণু সেখানে রঙের আড়ম্বর নেই ।

এমনি আরো অনেকগুলি সূত্র আমি স্বীকার করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, বানানো গল্প নয় সত্যি গল্প । তা বলে যেমনটি ঘটেছিল তেমনিটি নয় । রূপান্তরিত ।

থিয়োরির উপর একদা আমার অবিশ্বাস ছিল । মানুষ তার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টা হাতে কলমে বাঁচে । থিয়োরি অনুসারে নয় । আমরাও লিখব হাতে কলমে । কিন্তু ক্রমেই আমার মনে এ ধারণা দৃঢ় হলো যে জীবনশিল্পীরা কেউ প্রাকৃতজনের মতো দিন থেকে দিন বাঁচেন না । তাঁদের বাঁচার একটা পরিকল্পনা আছে, সেটার পিছনে আছে তাঁদের মূলনীতি, তাঁদের জীবনদর্শন । তেমনি যেসব গ্রন্থ সকলের মধ্যে বাঁচবে তাদের বেলা থাকবে বহুকালের প্রস্তুতি । সে প্রস্তুতির নাম হাতে কলমে শেখা নয় । কী ও কেন ও কেমন করে ও কতটা এসব নিয়ে প্রচুর ভাবতে হবে, তোলা-পাড়া করতে হবে । লিখতে বসলুম আর লেখা আপনার বেগে আপনি চলল এমন করে কোনো মহৎ সৃষ্টি হয়নি ।

'রত্ন ও শ্রীমতী'র প্রস্তুতি একটানা নয়, খাপছাড়া । মাঝখানে এলো সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ ও স্বাধীনতার সুযোগ । এর অমৃত গরল আমিও আকণ্ঠ পান করেছি । এর প্রতি চোখ বুজে থেকে এক মনে সাহিত্য নিয়ে ভাবা আর যার দ্বারা হোক আমার দ্বারা হলো না । আমার চোখ কান সব সময় খোলা । তাছাড়া আমিও তো আর দশজনের মতো ভুক্তভোগী । আগুনের আঁচ আমারও গায়ে লেগেছে । জীবনের পাঁচটি বছর সাহিত্য ছেড়ে জীবনেরই কথা ভেবেছি ও লিখেছি । সে সব লেখা সাহিত্য হয়েছে বলে আশা করব না । তবে তার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য সৃষ্টিও করেছি । একেবারে বন্ধ্যা হইনি ।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে আমি চাকরি থেকে অকালে অপসরণ করি। এ না হলে বৃহৎ উপন্যাসের জন্যে অবিভক্ত মনোযোগ পাওয়া যেত না। তার সঙ্গে ছিল সেই মার্গান্তরের প্রশ্ন। মার্গান্তর ওর চেয়ে বিলম্বিত হলে আমার জীবনের পরিকল্পনা ভেঙে পড়ত। ওই যথেষ্ট বিলম্ব। মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি এসে ব্যাঘাত না ঘটালে আমি বছর তিন চার আগেই বিদায় নিতুম। কিন্তু তার জন্যে আমি পরিতাপ করিনে। কারণ চাকরি থেকে বিদায় নিলেও দেশেই তো থাকতুম। দেশ যখন অপ্রকৃতিস্থ আমিও তখন অন্যমনস্ক হতে বাধ্য। মনোযোগ কোনো মতেই একাগ্র হতো না, মন লাগত না অন্য মার্গে, মন যেত না বিশুদ্ধ সাহিত্য অভিমুখে। প্রস্তুতি আমার খাপছাড়া হতোই।

এর পরে ধীরে ধীরে জীবনটাকে নতুন করে নেওয়া গেল। কিন্তু গ্রামে বাস, কায়িক পরিশ্রম ইত্যাদি গান্ধী টলস্টয় নির্দিষ্ট কার্যক্রম আমাকে দিয়ে হলো না। সাহিত্যের প্রস্তুতির সঙ্গে জীবনের প্রস্তুতির অসামঞ্জস্য ঘটল। সাহিত্যের কাজ বকেয়া পড়ে আছে, চুকিয়ে না দিয়ে আমার অব্যাহতি নেই। যেমন তেমন করে চুকিয়ে দেওয়া নয়। সাহিত্যে যেমন তেমনের মার্জনা নেই। সুতরাং দিনরাত কেমন করে'র কথা ভাবতে হয়। দেখলুম আগে ফিরে পেতে হবে লেখার হাত। পাঁচ বছর সে হাত দিয়ে রসের লেখা হয়নি। হয়েছে কাজের লেখা। কদাচ কখনো রসের লেখা। হাত ফিরে পাওয়া যত সোজা ভেবেছিলুম তত সোজা নয়। এ তো চাষীর হাত নয়, মজুরের হাত নয়। এ শিল্পীর হাত। যারা ছবি আঁকে বা সেতার বাজায় তারা পাঁচ বছর ক্ষান্তি দিক দেখি! সে হাত আর ফিরবে না। আমারও ফিরত না, যদি না ইতিমধ্যে আমি মনে মনে লিখতুম। হাতে কলমে নয়, ধ্যানে ও চিন্তনে। কোনো দিন এর বিরতি বা ছেদ ঘটেনি।

'রত্ন ও শ্রীমতী' লেখার আগে অনিবার্য কারণে আমাকে 'না' লিখতে হলো, 'কন্যা' লিখতে হলো। এ দুটি পদক্ষেপ না নিলে চলত না। তার পর নিজের থিয়োরিটা একবার ঝালিয়ে নিলুম 'সাহিত্যে সঙ্কট' উপলক্ষে। এ থিয়োরি টলস্টয়ের সঙ্গে কতক মেলে কতক মেলে না। লিখতে লিখতে ভাবতে ভাবতে আমি আমার নিজের পথ পেয়ে গেছি। এখনো এর সবটা আমার জানা নেই। মোটের উপর এটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। তা হলেও আমি প্রস্তুত। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিল জনগণের জন্যে লেখার বাধ্যবাধকতা। জোর করে এ দায় আমি কাটালুম। আমি লিখব জনগণের জন্যে নয়, বিদগ্ধ মণ্ডলীর জন্যে নয়, ultimate reader বা অন্তিম পাঠকের জন্যে। যে পাঠক আমার চোখের সামনে নেই, কোথায় আছে আমি জানিনে। হয়তো আমারি অন্তরে। সে আমাকে অনেক বেশী স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি এখন অনেক বেশী স্বাধীন। জনগণের বোঝা পিঠে নিয়ে হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠতে যাওয়া মূঢ়তা। এভারেস্ট যদি জয় করতে হয় তবে বোঝা সব চেয়ে হালকা হলেই রক্ষা। 'রত্ন ও শ্রীমতী' শেষ পর্যন্ত কেমন ওতরাবে জানিনে। হয়তো আদৌ ওতরাবে না। হয়তো দু'হাজার ফুট উঠেই আমার দম ফুরিয়ে যাবে, পথের প্রারম্ভেই বসে পড়ব। হয়তো দশ হাজার ফুট পর্যন্ত আমার মুরোদ, তার বেশী আমার ক্ষমতাই নেই। পঞ্চাশ পেরিয়েছি একান্ন পেরিয়েছি। এটা তো উঠতির বয়স

নয়, উঠব কী করে। কিন্তু বোঝা আমি এক এক করে নামিয়ে দেবই। জনগণের বোঝাটি সব প্রথম নামালুম।

তার পর 'রত্ন ও শ্রীমতী' দুরূহ বই। হাজার সরল ভাষায় লিখলেও উচ্চতর গণিত বোধগম্য হয় না সকলের। এ বই বুঝবে তারাই যারা জীবনে কিছু পেয়েছে। তা সে সুখ দুঃখ যাই হোক। তা বলে আমি ইচ্ছা করে দুর্বোধ্য ভাষায় লিখব না। বরং যত দূর পারি সরল সহজ সরস করে লিখব। ভাষা যেন বোঝবার পক্ষে বাধা হয়ে না ওঠে। পল্লবিত অলঙ্কৃত বাক্য একটা বাধা। বাগ্‌বিভূতির মোহ আমার নেই। ঐশ্বর্যকে আমি একটা প্রলোভন বলে মনে করি। শব্দের ঐশ্বর্যের কথা বলছি। কিন্তু সৌন্দর্যের কথা আলাদা। সৌন্দর্য যদি প্রতি ছত্রে না ফুটল তবে লিখে আমার আশ মিটল না।

সৌন্দর্য বলতে এত দিন আমি জানতুম সুন্দর রূপ। অর্থাৎ বহিঃসৌন্দর্য। সম্প্রতি দু'বছর হলো আমার জ্ঞান হয়েছে যে তাই সব নয়, যদিও অনেকখানি। অন্তঃসৌন্দর্য বা সুন্দর সত্তা না হলে আর্ট শ্রীহীন হয়। সুন্দর রূপ সত্ত্বেও। ফর্মাল বিউটি তো থাকবেই। তার চেয়েও বড় কথা এসেনশিয়াল বিউটি। কোথায় পাই, কার কাছে যাই এর জন্যে? বই পেছিয়ে গেল এর জন্যেও কিছু দিন। বছর খানেক।

সত্যের উপর জোর বরাবর দিয়েছি, আরো জোর দিতে হবে এবার। কিন্তু আমি স্টোরি লিখতে বসেছি। হিস্টরি লিখতে বসিনি। জীবনী বা ইতিহাস লিখলেই তা উপন্যাস হয় না। জীবনের সত্যকে আর্টের সত্য করতে হবে। অনেক বাদ যাবে, অনেক জোড়া হবে, অনেক বদলাবে। রূপান্তরিত না হলে জীবন কখনো আর্ট হবে না। তার পর তথ্যের সবটাই তো সত্য নয়। যা ঘটে তাই দেখলে কেউ সত্যের স্বরূপ দেখতে পায় না। আরো গভীরে যেতে হয়। তার জন্যে চাই আরেক রকম দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি। রিয়ালিটির উপর মুঠো শক্ত হবে কী করে, যদি অন্তর্দৃষ্টি মর্মভেদী না হয়?

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হবে আরেকটি মুঠি। সেটি ডিলাইট প্রিন্সিপ্লের উপর। রসের উপর। আনন্দ দেওয়াই নৃত্য গীত চিত্র ভাস্কর্যের কাজ। সাহিত্যেরও। এ ছাড়া আর যদি কোনো কাজ থাকে সেটা অধিকন্তু। কিন্তু যে উপন্যাস রস দিতে না পারে সে তার আসল কাজই জানে না। তা বলে ক্লান্ত মানুষের অবসর বিনোদনকে আমি রসদান বলব না। এন্টারটেনমেন্ট আমার অভীষ্ট নয়। রস দেওয়া যেন গাছের গোড়ায় জল দেওয়া। মানুষ বাঁচে রস পেয়ে, এটা তৃষ্ণার জল। আর অবসর বিনোদন হলো চা কিংবা সরবৎ কিংবা মদ। সভ্যতার ব্যাধি দূর হলে এত গাধা খাটুনিও থাকবে না, এত ক্লান্তিও থাকবে না, এমন অবসর বিনোদনেরও আবশ্যক হবে না। কিন্তু তৃষ্ণা থাকবে, তাই তৃষ্ণার জলেরও প্রয়োজন হবে। আর্ট চিরকালের। কারণ তৃষ্ণা চিরকালের। কিসের তৃষ্ণা? রসের। ও রূপের। যে রূপ রসের সঙ্গে অভিন্ন। সাহিত্যের আনন্দ একাধারে রসের ও রূপের।

চরিত্রচিত্রণের বেলা কেবলমাত্র লাল নীল হলদে বা শাদা কালো ব্যবহার করব না। 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র চরিত্রচিত্রণে আরো বেশী রং লাগবে। এখনো তো আমি মার্গান্তরিত হইনি। না হওয়ার একটা কারণই তো 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র দাবী। এই পর্যায়ের আরো

দু'সেট গ্রন্থের দাবী । আপাতত সাধ মিটিয়ে রঙের খেলা খেলব । কিন্তু আমার ধরনধারণটা মনস্তাত্ত্বিকের নয় । বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণশীল । আমি বিজ্ঞান লিখতে বসিনি । চরিত্রকে চিরে চিরে দেখানো আমার দ্বারা হবে না । চরিত্র আস্তই থাকবে । বিচিত্র হবে । কোনো কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার জন্যে আসরে নামবে না । নামবে কাহিনীর প্রয়োজনে ।

কাহিনী না হলে উপন্যাস হয় না । কাহিনীই উপন্যাসের প্রাণ । উপন্যাস মানেই কাহিনী । টলস্টয়ের এই উপদেশটি আমি বহুদিন থেকে মেনে আসছি, এখনো মানি, যে, কাহিনী আমি উদ্ভাবন করব না । জীবনের কাছ থেকে নেব । কিন্তু কী ভাবে নেব, কতখানি নেব, কোন উদ্দেশ্যে নেব, এসব আমিই স্থির করব । জীবন এখানে নিয়ামক নয় । এটা আর্টেরই এলাকা । আর্ট মানেই রূপান্তর । রূপান্তর ঘটলে এক জিনিস অন্য জিনিস হয়ে যায় । নইলে রূপান্তর কিসের ? জীবনের কাছ থেকে যেমন নেব তেমনি রূপান্তর ঘটিয়ে জীবনের হাতে ফিরিয়ে দেব । জীবনের ধন জীবনই পাবে, কিন্তু আদিম রূপে নয়, আমার দেওয়া রূপে । রূপ দেওয়ার স্বাধীনতা আমার আছে ।

কিন্তু এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয় । কাহিনীর একবার পত্তন হলে সে আমার হাত থেকে কলম কেড়ে নেবে । তার পর নিজেই নিজেকে লিখবে । আমি যেন সাক্ষীগোপাল । এমন কত বার হয়েছে । এবারও হবে । গল্প তার নিজের নিয়মে চলে । তার চলার নিয়ম আমাকেই শিখতে হবে, আমার নিয়ম তার উপর খাটবে না । চরিত্রগুলিও সুবোধ বালক বা লক্ষ্মী মেয়ে নয় । তাদের পরিণতি তাদের অন্তর্নিহিত নিয়মে হবে । আমার মাস্টারি বা মুরুব্বিয়ানা চলবে না । পাঠক যখন অনুযোগ করেন অমুককে অমন কেন করলেন, আমি ফাঁপরে পড়ি । অমন কি আমি করেছি, না ও নিজে হয়েছে ?

লেখকের স্বাধীনতা আছে, এটা সত্য । কিন্তু লেখা একবার শুরু হলে ফ্রী উইল মায়া । তখন ডিটারমিনিজম কাজ করে যায় । যা হয়ে দাঁড়ায় তা নিয়তি । নিয়তির সঙ্গে পদে পদে বোঝাপড়া করতে হয় । আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করতে পারিনে । কিন্তু আমি যেন ইংলণ্ডের রাজা বা ভারতের রাষ্ট্রপতি । আমারও নিয়ামক আছে । সে নিয়তি । জীবনকে নিয়ামক হতে দিলুম না, নিয়তিকে দিলুম, এই প্রভেদ লক্ষণীয় ।

এখন আর একটি কথা বলতে চাই । শিল্পীদের সব সময়ে ধ্যান সত্য ও সৌন্দর্য । এর থেকে মনে হতে পারে শিবের জন্যে তাঁদের মাথাব্যথা নেই । তা নয় । জগতে প্রচুর পরিমাণ ভালোর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ মন্দ মিশিয়ে রয়েছে । এমন ভাবে মিশিয়ে রয়েছে যে আলাদা করার উপায় নেই । সাহিত্যে কিন্তু লোকে আশা করে যে ভালো থাকবে, মন্দ থাকবে না, আলাদা করার উপায় আছে । এটা দুরাশা । এ শর্ত মেনে নিলে সাহিত্যের পূর্বে একটা বিশেষণ বসিয়ে দিতে হয় । সৎ সাহিত্য । তার মানে অসাহিত্য । এ শর্তে কোনো সত্যিকার সাহিত্যিক রাজী হতে পারেন না । অনেকে বিদ্রোহ করতে গিয়ে প্রতীপগামী হন । ভালো দেখতে পারেন না, মন্দটাই দেখেন ও দেখান । সেইভাবে ভালোর থেকে মন্দকে আলাদা করেন । তা হলে আর বিদ্রোহ কী নিয়ে !

কারো কারো বিদ্রোহ অন্য রূপ নেয় । ভালোমন্দের সীমানার বাইরে অভালো অমন্দ বলে কি তৃতীয় কিছু নেই ? এই হলো তাঁদের জিজ্ঞাসা । তাঁরাই উত্তর দেন, আছে ।

যা আছে তার নাম amoral। কিন্তু কী amoral তা জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে কী moral ও কী immoral। তেমনি কী ভালো ও কী মন্দ । এই প্রাথমিক জ্ঞান যেখানে নেই সেখানে কেউ নিশ্চিত রূপে বলতে পারে না যে এটা amoral বা ওটা অভালো অমন্দ । ভালোমন্দের উপর মুঠি শক্ত না হলে অভালো অমন্দ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় । তা বলে পরের কথায় ভালোর থেকে মন্দ আলাদা করতে যাওয়াও সমীচীন নয় । শিল্পীরা ঋষি নন । ভালো মন্দের উপর তাঁদের মুঠি শক্ত নয় । শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়তে ওঁদের ভয় করে । তবে যদি কারো শিবদর্শন ঘটে থাকে তিনি সত্যকে খর্ব না করে সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ না করে শিবমন্দির গড়তে পারেন । থিয়োরির দিক থেকে এটা সম্ভব । কার্যত সহজ নয় ।

শিল্পীর কর্তব্য থিয়োরির খোঁজ খবর রাখা, কিন্তু প্র্যাকটিসের উপর জোর দেওয়া । রান্না যদি মুখে দেবার মতো না হয় তা হলে পাকপ্রণালীসম্মত হলে কী হবে ? পায়েসের প্রমাণ আস্বাদে । পাকপ্রণালী না পড়েও অমৃত রাঁধা যায় । রান্নার মতো লেখাও একটা প্র্যাকটিকাল ব্যাপার । একান্তভাবে প্র্যাকটিকাল । উভয়ের একই লক্ষ্য । অমৃত কিসে হয় । লক্ষ্যভেদ করতে পারলে ধন্যতা । নয়তো ব্যর্থতা । তখন কোনো থিয়োরি দিয়ে এর কোনো সার্থকতা নেই ।

অনেক বার ভেবে দেখেছি, এ উপাখ্যান কি না বললে নয় ? কেন বলতে চাওয়া ? ভিতর থেকে উত্তর পেয়েছি, এটা একটা বলবার মতো উপাখ্যান । আমি যদি না বলি তবে আর কেউ কোনো দিন বলবে না । চিরকালের মতো না বলা রয়ে যাবে । অতএব বলতে হবে । বলতে হবে এর পরবর্তী উপাখ্যানও । বলতে হবে আমাকেই । বিষয়টাকে আমি বরণ করে নিয়েছি । বিষয়টাও আমাকে বরণ করে নিয়েছে । এই যে পারস্পরিক বরণ এমনটি বহু ভাগ্যে ঘটে । না বলে আমার নিস্তার নেই । না বলিয়ে কাহিনীরও নিস্তার নেই ।

বলতে বসে আমি পণ করেছি যে আমি ঋষিকল্প হব না, রেস্পেকটেবল হব না, লোকের মন রাখা কথা বলব না । থামিয়ে দেব না, বদলে দেব না, শুধরে দেব না, বাদসাদ দেব না, মোড় ঘুরিয়ে দেব না, পল্লবিত করব না, অলঙ্কৃত করব না, জনপ্রিয় করব না । তা বলে অকারণে গায়ে পড়ে আঘাত করব না, ব্যথা দেব না, অসভ্য হব না । যাঁর ভালো না লাগবে তিনি পড়া বন্ধ করে দেবেন । বেশীর ভাগ পাঠক যদি বিরূপ হন তা হলে প্রকাশক ছাপা বন্ধ করে দেবেন । লেখক কিন্তু লেখা বন্ধ করবে না । লিখে যাবে ।

১লা অক্টোবর ১৯৫৫
শান্তিনিকেতন

পাদটীকা :
এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি কাল্পনিক । কারো সঙ্গে কোনো রকম সাদৃশ্য দেখলেই তাঁকে সেই ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না ।

।। ২ ।।

উপন্যাসকার একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন । সে জগৎ এ জগৎ নয় । এ জগতের সঙ্গে তার মিল থাকতে পারে, কিন্তু থাকতে বাধ্য নয় । মিল না থাকলে সে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না । উপন্যাসের জগতে যদি কেউ এ জগতের প্রতিরূপ খুঁজতে যান তা হলে তাঁর ব্যর্থতার ফলে উপন্যাস ব্যর্থ হবে না । উপন্যাসের সার্থকতা এ জগতের ছবি বা ছায়া হয়ে নয়, তার নিজস্ব জগতের সত্যতায় ও সৌন্দর্যে । যেখানে একটি নিজস্ব জগতের রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে সে তার নিজের জোরেই অস্তিত্ববান । এ জগতের সঙ্গে তার মিল নেই বলে তার নাস্তিত্ব ঘটবে না । তাকে অস্বীকার করে পাঠকের রসবোধ চরিতার্থ হবে না । ববং মনে হবে পাঠকের রসবোধ নেই । পাঠককে উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করতে হবে বিশেষ একখানি প্রবেশপত্র নিয়ে । দোকানদারকে রজতমুদ্রা দিয়ে মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করা এক । লেখককে স্বীকৃতিমূল্য দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা আরেক।

ভালো উপন্যাস বলতে আমি বুঝি যে উপন্যাস একবার পড়লে ফুরিয়ে যায় না । যে উপন্যাস বার বার পড়তে পারা যায় । যতবার পড়ি ততবার নতুন নতুন স্বাদ পাই, নতুন কিছু আবিষ্কার করি, নতুন করে ভাবতে পারি । রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' আমি অনেকবার পড়েছি। এখনো পড়তে ইচ্ছা করে । টলস্টয়ের উপন্যাসেব মধ্যে এমন বস্তু আছে যা পড়ে নিঃশেষ করা যায় না । যেমন তাজমহল দেখে কোনো বারই মনে হয় না যে এই শেষ বার, আর দেখে কী হবে । উৎকলকবি রাধানাথ রায় লিখেছেন—

'সুন্দরে তৃপ্তির অবসাদ নাহি
যেতে দেখিলেহেঁ নূআ দিশু থাই ।'

প্রথম লাইনের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক । দ্বিতীয় লাইনের অর্থ, যত দেখলেও নতুন দেখাতে থাকে । অর্থাৎ যতই দেখি ততই নতুন দেখায় । ভালো উপন্যাস চির নূতন । নয়তো সে ভালো উপন্যাস নয় । সামাজিক বিচারে ভালো হতে গিয়েই সে মরেছে ।

ভালো উপন্যাসের চরিত্রগুলি হবে চিরকালের মানুষ, বিশ্বের মানুষ । আর তার কথাবস্তু হবে মানবনিয়তি ও মানবপ্রকৃতি । মর্মভেদী দৃষ্টি না হলে এসব সৃষ্টি করা যায় না ।

১৮ই মার্চ ১৯৫৬
শান্তিনিকেতন

।। ৩ ।।

'রত্ন ও শ্রীমতী' বিশ কিংবা বাইশ বছর পূর্বে কল্পিত । তখন আমার ধারণা ছিল এই বই তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে । বছর দুই আগে যখন ছকতে বসি তখন বুঝতে পারি

আরো এক খণ্ড লিখতে হবে । সেই মর্মে ঘোষণাও করা হয় । লিখতে বসে দেখা গেল প্রথম খণ্ড যেখানে শেষ করা হলো সেখানে না করলে তেমন ভালো বিরতি পাওয়া যায় না । কাব্যের নিয়মে সেইখানেই সর্গের যতি ।

অতএব এ বই পাঁচ খণ্ডে সারা হবে । কিন্তু মোটের উপর এর আয়তন চার খণ্ডেরই সমান থাকবে । 'খণ্ড' না বলে আমি 'ভাগ' বলতে চাই । প্রথম ভাগের চেয়ে দ্বিতীয় ভাগ শক্ত । দ্বিতীয় ভাগের চেয়ে তৃতীয় ভাগ । তৃতীয় ভাগের চেয়ে চতুর্থ ভাগ । চতুর্থ ভাগের চেয়ে পঞ্চম ভাগ । লিখতেও শক্ত । পড়তেও শক্ত । শেষপর্যন্ত ক'জন পাঠক আমার সঙ্গে থাকবেন জানিনে । প্রকাশককে আমি চেতাবনী দিয়ে রেখেছি ।

প্রথম ভাগ আনন্দবাজার পত্রিকার গত শারদীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল । তার পরে আমি ওটি আরেক বার লিখি । পুনর্লিখন সব সময় ভালো নয় । বাদসাদ দিতে দিতে স্বাদ বাদ যায় । কিন্তু সীমার মধ্যে আনতে হলে বাদসাদ না দিয়ে উপায় নেই । বিশেষত যদি কোনো অংশ আরেকটু বাড়াতে হয় ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শান্তিনিকেতন
২১শে জুন ১৯৫৬

এক

মনের কথা বলবে যে, বলতে চাইলেই কি বলতে পারা যায় ! যাকে বলবে তার মন থাকলে তো ! দিনক্ষণ অনুকূল হলে তো ! প্রভাত কবে থেকে বলবে বলবে করছে। রত্নকে—তার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে । বলা ক্রমশ জরুরি হয়ে উঠছিল । কিন্তু ওকে ধরতে পারছিল না । যদিও একই কলেজের বিদ্যার্থী, একই মেসের আবাসিক ।

ও ছেলেটি যেখানেই যায় সেখানেই ওকে ঘিরে একটি বন্ধুমণ্ডল গড়ে ওঠে । পশ্চিমের সেই বড় শহরটাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি । ওরা দু'জনে একসঙ্গে বি-এ পড়বে বলে প্রবাসী হয়েছিল সেখানে । কিন্তু দেখতে দেখতে দু'জনের মাঝখানে তৃতীয় জনের জনতা হয় । সেখানকার ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দিয়ে প্রভাতও তো একটি ছোটখাটো জঙ্গীলাট বনেছিল । তার চার দিকেও ঘুর ঘুর করত এক দল ভক্ত ।

দু'জনের উপর দু'জনের অভিমান জমছিল । শুধু এই নিয়ে নয়, আরো কারণ ছিল । আই-এ পড়তে পড়তে বাংলাদেশের কোনো মফঃস্বল শহরে যখন তাদের প্রথম আলাপ তখন তারা ও তাদেরি মতো জনকয়েক উৎসাহী সতীর্থ মিলে একটি মণ্ডলী রচনা করে । নাম রাখে 'The Iconoclasts.' সদস্যসংখ্যা সাতজনের অধিক হলো না, তাই ডাকনাম দাঁড়িয়ে গেল সাত ভাই চম্পা । টুলী স্ট্রীটের তিন দর্জি নাকি বলেছিল, 'আমরা ইংলণ্ডের জনগণ ।' তেমনি ঘোড়ামারার সাত ছাত্র বলত, 'আমরা ভারতবর্ষের উত্তরপুরুষ ।' তাদের স্বাক্ষরিত ইশতেহারে লেখা ছিল কাঠপাথরের প্রতিমা তো তারা ভাঙবেই আর ভাঙবে যত রাজ্যের মিথ্যা সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সনাতন সেজে নূতনের পথ রোধ করেছে । বাগ্মিতায় অগ্রগণ্য বলে প্রভাতকেই দলপতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল । কেবল কথায় নয় কাজেও সে সকলের অগ্রণী । বন্ধুরা ডাকত কালাপাহাড় বলে । দেখতেও সে লম্বা চওড়া ভারিক্কি ও শামলা । বক্তৃতার সময় কখনো হাসাত কখনো কাঁদাত কখনো জলদগম্ভীর স্বরে রুদ্র রূপে ডমরু বাজাত । অভিনয়ে তার কুশলতা ছিল । মঞ্চের বাইরেও সে নিজের অজ্ঞাতসারে অভিনয় করে যেত । বোঝা শক্ত ছিল কোনটা অভিনয় কোনটা নয় । ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দেবার পর দেখা গেল সে অন্যপ্রকার প্রতিমাপূজক হয়ে উঠেছে । সেলাম করছে নির্বিকারে । হুকুম মানছে নির্বিচারে । যখনি তার ঘরে যাও দেখবে ইউনিফর্ম পাট করছে বুট পালিশ করছে ভক্তি ভরে । একটু হাত দিয়েছ কি তোমার দিকে এমন চোখে তাকাবে যেন তুমি চণ্ডাল হয়ে বিগ্রহের অঙ্গস্পর্শ করেছ ।

রত্ন ছিল সব রকম প্রতিমাপূজার বিরোধী । কেবল শাস্ত্রবাদীদের প্রতিমার নয়, শস্ত্রবাদীদের প্রতিমারও । তার কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে জোর যেখানে মান পায় প্রেম

সেখানে হৃতমান, স্বাধীনতা সেখানে হীনমান। নতুন সভ্যতা চলবে প্রেম ও স্বাধীনতা এই দুটি চাকায়। পশ্চিমে আসার পর একদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। ঘটে রত্নর অন্তর্জীবনে। প্রভাতের অগোচরে। রত্নর অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। দীপ জ্বলে ওঠে তার অন্তরে। সে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। এ বিশ্বসংসার এমন অবর্ণনীয় রূপে প্রকাশিত হয় যে ক্ষণকালের জন্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, সব বুঝতে পারা যায়, দুঃখ দৈন্য দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব কেমন করে সঙ্গতি ও সুষমা পায় একখানি পরম সৌন্দর্যময় চিত্রে। এই মরমী দৃষ্টির পর রত্নর পূর্ব অবস্থা ফিরে এলো। আবার সেই নিত্য অপূর্ণতার সঙ্গে ঘর করা। কিন্তু চেতনার অতলে প্রত্যয় রয়ে গেল যে পরিপূর্ণতা কবে একদিন হবে তা নয়, পরিপূর্ণতাও নিত্য।

এর পরে দেখা গেল রত্নর চার দিকে একটি নতুন দল গজিয়ে উঠছে। সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়। প্রভাত ভুল বুঝল, ক্ষুণ্ণ হলো। এরা রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলছে যখন, তখন এরা অনিবার্যভাবে গুরুবাদী। গান্ধীকে মহাত্মা বলছে যখন, তখন বস্তুগত্যা অবতারবাদী। এর পর এরা কালীঘাটে মাথা নোয়াবে, কাশী বিশ্বনাথে মাথা মুড়োবে। জাত মানবে। পৈতে নেবে। বিধবাকে স্বামী গ্রহণ করতে দেবে না, সহমরণে পাঠাবে। আর বাকী রইল কী! বর্ণাশ্রম ধর্ম অক্ষয় হলো। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করল। প্রভাত জানল না যে রত্নর ভিতরে আগুন তখনো জ্বলছে। সে অগ্নি অনির্বাণ। আত্মসমর্পণ আর যেই করুক রত্ন করবে না কোনো দিন। ভাঙার কাজ তাকে চালিয়ে যেতে হবেই। তফাৎ শুধু এই যে, সেইসঙ্গে গড়ার কাজও করতে হবে তাকে। এক হাতে ভাঙন, আরেক হাতে গড়ন। সে যেন অর্ধনারীশ্বর। বিদ্রোহী ও মরমী। কালাপাহাড় ও সৌন্দর্যবাদী। তার বুকে আগুন চোখে স্বপ্ন। সেসব স্বপ্ন অভিনব সৃষ্টির। অভিনব প্রতিমার। কাঠপাথরের নয়। ভাবের। রসের।

প্রভাত জানত পূর্ণিমা রাত্রে রত্ন কারো সঙ্গে মেশে না। তাকে একা পাওয়া যায় সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে। বাঁধের ঢালু দিকটাতে গা মেলে দিয়ে কুল-ছাপানো জলে পা ভিজতে দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে আসমানের দিকে। এ সুধা অপচয় করতে নেই, একে আকণ্ঠ পান করতে হয়। এমনি করে মানুষ অমৃত হয়। তাই রাত দশটা অবধি সে পড়ে থাকে ইষ্টক শয্যায়। আহার নেই, নিদ্রা নেই, আহারনিদ্রার স্পৃহা নেই।

এক পূর্ণিমার রাত্রে প্রভাত গিয়ে রত্নর পাশে চাদর পাতল। আটটা বাজে। নদীর ধার শূন্য। রত্ন তখন মগ্ন ছিল সৌন্দর্য অবগাহনে। বন্ধুকে কাছে পেয়ে প্রীত হলো। তন্ময় ভাবে বলল, 'ভাই প্রভাত, এ কোন্ রূপকথার রাজ্যে এলুম আমরা। জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটেছে। সমুখে দুধের সায়র। এটা কোন্ যুগ। আমরা কি খ্রীস্টোত্তর বিংশ শতাব্দীতে? না খ্রীস্টপূর্ব? আমি যেন কবেকার সেই রাজপুত্র আর তুমি যেন মন্ত্রীপুত্র। পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আমরা যেন কোন্ আদি কালে যাত্রা শুরু করেছি। পেরিয়ে এসেছি দেশ আর কাল। ছাড়িয়ে এসেছি বাস্তব।'

মন্ত্রীপুত্র হতে প্রভাতের একটুও সম্মতি ছিল না। তবু সে মৌন হয়ে শুনতে লাগল।

'ভাই প্রভাত, পূর্ণিমার রাত্রে আমার মনে পড়ে যায় পূর্ণতার কথা । যে পূর্ণতা এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত অপূর্ণতাকে আচ্ছন্ন করে প্রচ্ছন্ন রয়েছে । অন্যান্য দিন অপূর্ণতার সঙ্গে ঘর করি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হই । এই একটি দিন পূর্ণতার অভিসারে গৃহত্যাগ করি। তখন মনে হয় আমি পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় চলেছি । আমি আর বিদ্রোহী নই, আমি বিমুগ্ধ । চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে থাকি, থাকতে থাকতে সহসা এক সময় অবগুণ্ঠন খুলে যায় । শুভদৃষ্টি হয় সুন্দরীর সঙ্গে। যে সুন্দরী এ বিশ্বের মর্মমূলে অধিষ্ঠিতা । তখন অনুভব করি আমি একা নই, আর একজন আছে, যাকে নিয়ে আমি পূর্ণ । তার সঙ্গে সহবাস করে আমিও সুন্দর হয়ে উঠি ।'

রত্নর মুখে এসব কথা নতুন । প্রভাত কান পেতে রইল !

'এবার শুধু পূর্ণিমা নয় । তার সঙ্গে মিলেছে বসন্তের সেনা । কোকিলের কুহু, দখিনের বাতাস । ভাই প্রভাত,আমিও বসন্তের মতো এসেছি, বসন্তের মতো যাব । যেখানে যাব সেখানেও বসন্ত । আমাকে নিয়ে বসন্ত । আমি বন্ধনহীন আত্মা । আমি ফ্রী স্পিরিট । উনিশ বিশ বছর মানবের দেশে বাস করতে করতে মানব হয়ে গেছি । কিন্তু স্বাধীনতা দিইনি । আমি স্বাধীন মানব । ফ্রী ম্যান ।'

প্রভাত আড় চোখে রত্নর দিকে তাকায় । তার মুখে পূর্ণিমার আলো পড়ে তাকে আরো কমনীয় করেছে । ক্ষীণকায় । অনতিদীর্ঘ । অনতিগৌর । উনিশ বিশ বছর বয়স যদিও, তাকে দেখলে যুবক মনে হয় না । মনে হয় চিরকিশোর ।

'আমি স্বাধীন সত্তা । বন্ধন আমার জন্যে নয় । সেই আমি মানবের দেশে এসে কেবলি ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি । বেঁধেছি, বাঁধা পড়েছি । এ বাঁধন খুলতে গেলে লাগে । নিজে খুলতে পারিনে । মৃত্যু যদি খুলে দেয় কেঁদে আকুল হই । ভাই, একে মর্ত্যভূমি বললে মৃত্যুকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । এ ধরণী প্রেমভূমি । এখানে আমরা আসি ভালোবাসা দিতে ও নিতে । বৈষ্ণবরা বলে স্বয়ং ভগবান মানবরূপে এসেছিলেন প্রেম আস্বাদন করতে । এমন প্রেম আর কোথায় আছে ! স্বর্গেও না । বৈকুণ্ঠেও না । সেইজন্যেই বুঝি এখান থেকে স্বেচ্ছায় কেউ চলে যেতে চায় না । যত দিন পারে মরণকে এড়ায় । প্রেম যদি না থাকত না বাঁধত মানুষ কি বাঁচতে রাজী হতো ! আমার অন্তরতম অভিলাষ কি, শুনবে ? আমি হতে চাই সব স্বাধীন মানুষের মধ্যে স্বাধীনতম, সব প্রেমিক পুরুষের মধ্যে প্রেমিকসত্তম ।'

প্রভাত যেন এতক্ষণ এই সুযোগটির জন্যেই ওৎ পেতেছিল ! কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ভাই রতন, আমি বার বার ভালোবাসিনি, এক বারই বেসেছি । বার বার ভালোবাসা পাইনি, এক বারই পেয়েছি । আমার অভিজ্ঞতা শুনতে চাও তো বলি । যে প্রেমিক সে স্বাধীন নয় । তার মতো পরাধীন আর নেই । আর প্রেমের জ্বালা মরণজ্বালার চেয়ে কম কিসে ! একটার তবু নির্বাণ আছে । অপরটা অনির্বাণ ।'

প্রভাতের কণ্ঠস্বরে এমন একটা রোদন ছিল যে রত্ন তার বন্ধুর উক্তির প্রত্যুক্তি করতে কুণ্ঠিত হলো । শুধু বলল, 'আমার প্রেমের অনুভূতি জ্বালাময় নয় ।'

বন্ধু যেন এর জন্যেও তৈরি ছিল । দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আর আমাকে দগ্ধ

করছে আশাহীন এক প্যাশন ।'

দগ্ধতার অভিব্যক্তি ছিল তার কণ্ঠে, তার বক্ষে । তার বক্ষ শ্বসিত হচ্ছিল প্রচণ্ড আবেগে । না, অভিনয় নয় ।

'প্যাশন !' চমকে উঠে সামলে নিল রত্ন । 'তাই বল ।'

'কেন ? প্যাশন কি প্রেম নয় !'

'তা কী করে হবে ?'

'হাওয়া যে করে ঝড় হয় । জল যে করে মেঘ হয় । আলো যে করে আগুন হয় । প্রেম যখন গাঢ় হয় তখন তাকে বলি প্যাশন । গোড়াতে এমন ছিল না । হালে এমন হয়েছে । তোমাকে খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই । শুনবে ?'

রত্ন সায় দিল । 'শুনি।'

তখন প্রভাত শোনাল তার অকথিত কাহিনী ।

রানু তার বাল্যসখী । পাশাপাশি বাড়ী । বয়সের ব্যবধান বছর দুই । কত বার তারা বর বৌ খেলেছে । মনে মনে ঠিক করে রেখেছে এ খেলা বড় হয়েও খেলবে । গুরুজন জানতেন । ভাবতেন এটা ছেলেমানুষী । এমন তো কত হয় । তাঁরা দেখেও দেখতেন না । মায়েরা পরস্পরকে বেহান বলে ডাকতেন । বড় হয়ে প্রভাত জেনেছে ওটা একপ্রকার শিষ্টাচার । তখন কিন্তু তার ধারণা ছিল কেউ কাউকে বেহান বলে ডাকলে ওরা সত্যি সত্যি বেহান হয়ে গেল । কেবল শুভকর্মটা বাকী । নাতজামাই নাতবৌ এসব যে রসের কথা এটাও তার মাথায় ঢুকত না । তার হোঁশ হলো যখন তেরো বছরের রানুকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দেওয়া হলো । কেন ? না রানুর কাপড়ে রক্তের ছোপ দেখা দিয়েছে । প্রভাত ধরে নিয়েছিল কোথাও কিছু কেটে গেছে । যা দুরন্ত মেয়ে । কিন্তু বৌদিদিরা তার প্রাথমিক সাহায্যের বাকস দেখে হেসে খুন । দূর বোকা, রানু যে এখন যুগ্যিমন্ত হয়েছে !

কাকে বলে যুগ্যিমন্ত, কী তার লক্ষণ, এসব ক্রমে ক্রমে তার বোধগম্য হলো । বেশ একটু ভয় পেয়েছিল সে । ষোলো বছর বয়সে ছেলের বাপ হলে তো তার বিয়েটা একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে । না । সে চায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে । দশজনের একজন হতে । ব্রাহ্মদের কাছে লেখাপড়া শিখে সে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিল । নিজে বাল্যবিবাহ করলে কি তার মুখ থাকবে ! রানু কেন ব্রাহ্ম কুমারীদের মতো অপেক্ষা করবে না ? কিন্তু রানুর গুরুজন তা কল্পনা করতে পারেন না । মেয়ে দিন দিন অরক্ষণীয়া হয়ে উঠছে। সময়ে বিয়ে না দিলে পরে হয়তো ওর বিয়েই হবে না । প্রভাত যদি বিয়ে না করে ? তার গুরুজন যদি টাকার লোভে তার অন্যত্র বিয়ে দেন ? প্রভাতের আশায় বসে থাকলে একটির পর একটি সৎপাত্র হাতছাড়া হবে। রানুর ছোট বোন টুনুও ভত দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে থাকবে । সমাজ ক্ষমা করবে না । এ কি তোমার ব্রাহ্ম সমাজ !

রানু যখন যুগ্যিমন্ত হয় প্রভাত তখনো যোগ্য হয়নি, সুতরাং যা হবার তাই হলো ।

কী করুণ মুখখানি রানুর ! কী কাতর কান্না ! যেন বিবাহে নয়, সহমরণে যাচ্ছে। জোর করে নিয়ে যাচ্ছে সমাজ । নইলে কী জানি কী অমঙ্গল হবে ! প্রভাত অসহায় চক্ষে দেখতে লাগল এ দৃশ্য । সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরটা কঠিন হয়ে যেতে থাকল । সে চোখের জল ফেলবে না । তাতে শক্তিক্ষয় । সে সমাজসংস্কারক হবে । যাতে আর কোনো মেয়ের অকালে বিয়ে না হয় । ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া না হয় । ব্রাহ্মরাই আদর্শ ।

কিন্তু রানু যখন শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এলো তখন তার চেহারা দেখে প্রভাতের চোখের জল বাগ মানল না । ধ্বস্ত বিধ্বস্ত ভিতরে ও বাইরে । সমাজসংস্কার দিয়ে তার ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগবে না, পোড়া জীবন বাঁচবে না । রানু কি বাঁচবে ? কী করলে বাঁচবে ? প্রভাতকে পাগল করে তুলল এ চিন্তা । ততদিনে সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে । হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায় । সে-সময় কলকাতা কংগ্রেসে সবে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে । লোকে ঠাওরাল মহাত্মা গান্ধীর ডাক শুনে সে গোলামখানা থেকে বেরিয়েছে। তার গুরুজন এই রটনার প্রতিবাদ করলেন না । প্রকৃত ঘটনা চেপে গেলেন । একটি বছর সে নানান জায়গায় ঘুরল । কোথাও ব্রাহ্ম সমাজের কাজে, কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে । কিছু দিন কংগ্রেসের কাজে জেলখানায় কাটাল । অবশেষে মনটাকে বাঁধল । কলেজে ফিরল ।

এবার রত্নর সঙ্গে আলাপ । কাননের সঙ্গে । নবনীর সঙ্গে । কালাপাহাড়ী দলের পত্তন হলো । কত রকম কার্যকলাপ নিয়ে ব্যাপৃত রইল ওরা । কালাপাহাড় তো নামে । আসলে ডন কুইকসোট । রানুর সঙ্গে দেখা হয় না । তার স্বামীর বদলির চাকরি । প্রভাতের মনে হলো তার নিজের দিক থেকে প্রেম নেই । নিবে গেছে । রানুর দিক থেকে যদি থাকে তবে প্রশ্রয়যোগ্য নয় । বছর তিনেক অদর্শনের পর সখীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার বাপের বাড়ীতে । অবাক হয়ে লক্ষ করল প্রভাত, রানুর রূপ খুলে গেছে । কোনো দিন সে এমন সুশ্রী ছিল না । আরো অবাক হলো যখন নিরীক্ষণ করল—সখীর নয়নকোণে প্যাশন । সে প্যাশন তারই অভিমুখে উদ্দিষ্ট ।

প্রভাত বরাবর প্র্যাকটিকাল মানুষ । তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গুটোতে বসল । আর একটা দিনও নয় । কিন্তু খবরটা কেমন করে রানুর কানে পৌঁছল । সেও তৎক্ষণাৎ অসুখে পড়ল । মেয়েদের এ বিষয়ে অশিক্ষিত পটুতা আছে । এ বিদ্যা শেখে না কোনো নারী । শুনতে পেলো প্রভাত, ও বাড়ীর রানুর ভয়ানক জ্বর । একবার দেখতে চায় তাকে । তা শুনে গেল দেখা দিতে । সখী তার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে । সে চোখে অন্তহীন নিরাশা । সেই সঙ্গে অনির্বাণ জ্বালা । প্রভাত কী যেন বলতে চায় । তার মুখ ফোটে না । চোখে চোখ রেখে রানুর কাছটিতে বসে থাকে সে । কত কাছে ! তবু কত দূরে ! যেন জন্মান্তরের ব্যবধান । তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে টেলিগ্রাফ চলে । বিনা বাক্যে । সখী বলে, দেখছ তো আমাকে । তোমার কি কিছুই করবার নেই ? প্রভাত বলে, এখন আমি কী করতে পারি ? হয় খুব দেরি হয়ে গেছে, নয় এখনো সময় হয়নি । সখী বলে, তুমি তা হলে আশা দিচ্ছ ? প্রভাত বলে, আশা দিতে পারি, কিন্তু সে অর্থে নয় । সখী বলে, তাই যদি না হলো তবে কেন বাঁচব ? প্রভাত বলে,

জীবনে আরো অনেক কাম্য আছে । এই কি সব ! সখী বলে, তৃষ্ণার্তের কাছে পানীয়ই সব ।

আশা নেই অথচ আকাঙ্ক্ষা আছে, এইখানেই তো জ্বালা । এ জ্বালা জ্বর হয়ে রানুকে দহন করছিল । ওষুধে কী করবে ! তা বলে প্রভাত আশা দিতে পারে না সে অর্থে । দিন কয়েক বাদে রত্নর সঙ্গে দেখা করে বলল, তোমার না পশ্চিমে যাবার বড় শখ ? চল, পশ্চিমেই যাই । না, ইউরোপে না । তার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন করতে হবে । আপাতত বেহার । রত্ন রাজী হয়ে গেল । কানন, হৈম, গিরীন এরা পিছনে পড়ে রইল বাংলাদেশের সেই মফঃস্বল শহরে । ললিত আর নবনী কলকাতা চলল । ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই । সাত ভাই চম্পায় ভাঙন ধরল ।

পশ্চিমে এসে প্রভাত মনে করেছিল রানুর ছোঁয়াচ এড়াতে পারবে । কিন্তু ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল সেও ভুগছে ঐ জ্বরে । যদিও থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না দেহতাপ । প্রভাত বলিষ্ঠ পুরুষ । তার আদর্শ ফ্রী ম্যান নয়, স্ট্রং ম্যান । কিন্তু গত আট দশ মাস যাবৎ তার যাতনার বিরাম নেই । সেটাও সহ্য হতো । কিন্তু ওদিকে রানুর অসুখ বেড়ে চলেছে । তার স্বামী পর্যন্ত অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন প্রভাতকে একবার যেতে ।

যেতে কি তার পা ওঠে ! পরের বাড়ী যে । রানু এখন পরকীয়া । যে হতো তার নিজের বৌ তার সঙ্গে কথা বলতে হলে পরের কাছে প্রার্থী হতে হবে । দুটো গোপন কথা বলার জো নেই । কে কী ভাববে ! চায় না প্রভাত জেলকয়েদীর মতো অনুগ্রহ । কিন্তু যদি না যায়, যদি শেষ দেখা না হয় তা হলে রানু হয়তো এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে চির আফসোস নিয়ে । অপূর্ণ তৃষ্ণার সঙ্গে চির আফসোস ! কী মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী ! বিস্বাদ হয়ে যাবে না প্রভাতের অবশিষ্ট জীবন ! কোনো দিন কি সে সুখী হতে পারবে ! কিন্তু যদি যায়, যদি রানু প্রাণ পায়, যদি বার বার যেতে বলে তখন কি এই যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে না ! একে পুষে রেখে কার কী সুখ ! প্রভাত তার সখীর মরণকামনা করে না, কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে চায় । এই বয়সে তার যদি দুরারোগ্য ব্যাধি হয় তা হলে জীবনে কী ফল ! সে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছে । যদিও বাইরের ঠাট বজায় রেখেছে । সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে । শক্ত মানুষ হচ্ছে ।

রত্ন কী বলে ? প্রভাত যাবে কি যাবে না ?

রত্ন অভিভূত হয়েছিল । কী বলবে ? সে তো বিশ্বাস করে না যে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে । মেয়েদের সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চ । প্যাশন সম্বন্ধে তার প্রাণে ভয় । প্রেম বলতে সে বোঝে রস । সে রস হৃদয়জ ।

'প্রভাত,' রত্ন একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তুমি যাও । তোমার না যাওয়াটা অমানবিক হবে । গেলে দেখবে তুমি যা ভেবেছ তা নয় । প্যাশন নয় । বিরহ । মানুষ মানুষের জন্যে বিরহ বোধ করবে, এইটেই স্বাভাবিক । সামাজিক সম্পর্ক যাই হোক না কেন । আমিও তো বিরহ বোধ করি একজনের জন্যে যিনি আমার কেউ নন সমাজের চোখে। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না । বিবাহ যদি বা হয় মিলন হবে না ।

এও তো আশাহীন। তা বলে প্যাশন নয়। প্যাশনকে বিরহে পরিণত কর। দেখবে আশাহীনতা সত্ত্বেও শান্তি পাবে। তবে একটা 'কিন্তু' আছে। আর কাউকে বিয়ে করতে পাবে না, যতদিন রানুর জন্যে বিরহবোধ থাকে।'

'হায়!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল প্রভাত। 'যদি অন্তর থেকে বলতে পারতুম ও কথা! রানু তো তবু কিছু পেয়েছে। আমি যে কিছুই পাইনি। কোনো আস্বাদ।'

'তা যদি বল,' রত্ন শরমে রঙিন হলো, 'মালাদি হয়তো কিছু পেয়ে থাকবেন। তিনি একদা বিবাহিতা ছিলেন। আমি পাইনি। পাবও না। তাবলে কি আমি সেইজন্যেই আর কাউকে বিয়ে করব? আর কারো সঙ্গে মিলিত হব? না, ভাই। নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকে শেষ অবধি মিস্টিক। আর যা তা অধিকন্তু। সে যদি বরদা হয় তবে ওটা তার করুণা। ভগবানের করুণা। সব প্রেমই তো ভগবানের কাছ থেকে প্রবাহিত। তিনিই দাতা, গ্রহীতাও তিনিই। বৈষ্ণবরা বলে পরমাত্মা কৃষ্ণ, জীবাত্মা রাধা। আমি বলি পরমাত্মা পুরুষরূপে কৃষ্ণ, নারীরূপে রাধা। জীবাত্মাও তাই।'

প্রভাত বলল, 'আমি তোমার মতো মিস্টিক নই। ভগবানকে এর মধ্যে টেনে আনার মর্ম বুঝিনে। বৈষ্ণবও নই যে পরকীয়াতত্ত্বের মহিমা অবগত হব। তোমার কথা শুনলে আমার গা জ্বলে। বিয়ে হবে না, বিয়ে যদি বা হয় ইয়ে হবে না। কেন এমন অরুচি! আমার অনুমান তোমার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স কাজ করছে। যাঁর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক—ওটা কি পাতানো না সহজাত?'

'পাতানো।' রত্ন উত্তর দিল প্রশ্ন শেষ না হতেই।

'যাঁর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক পাতিয়েছ তাঁর সঙ্গে জায়া সম্পর্ক পাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু অমন তো কত হয়। মেয়েরা যাদের দাদা বলে ডাকে তাদের সঙ্গে বিয়ে হলে পরে ছোট বোনের অভিনয় করে কি? তোমার মালাদিও তোমার 'ওগো' হবেন। তখন দেখবে নারীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রাকৃতিক হবে।'

রত্ন এ কথা শুনে ক্ষুব্ধ হলো। তখন তাকে বর্ণনা করতে হলো মালাদির আখ্যান। এত দিন গোপন রেখেছিল সাত রাজার ধন মানিকের মতো। বন্ধুকে খুলে দেখাল এই প্রথম।

ছেলেবেলায় একবারমাত্র তাঁকে দেখেছিল রথযাত্রার মেলায়। একদিনেই খুব ভাব হয়ে যায়। দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়ায়, দোকানে দোকানে ঘোরে, এটা সেটা কিনে ভাগাভাগি করে খায়। তার পর গোরুর গাড়ী করে মালাদিরা রওনা হন এক দিকে, রত্নরা আরেক দিকে। ঐ ভিন্ গাঁয়ের দিদির সঙ্গে আর কোনো দিন সাক্ষাৎ হয়নি, হবার কথাও নয়, কারণ বিয়ের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে বর্মা চলে যান। অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল সমুদ্রের ধারে। তখন তার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। হাসিখুশির সেই ফেনিল ঝরণা তখন করুণ রসের বিশীর্ণ মরুস্রোত। দুঃখিনী মেয়েকে নিয়ে মা বাপ তীর্থবাস করতে এসেছেন। চেনা লোক আর কেউ নেই। রত্নই অনাহূতভাবে সাহায্য করে। লাইব্রেরী থেকে বই এনে দেয়। নিজের মাসিকপত্র পড়তে দেয়।

বিষাদের প্রতিমা। মূর্তিমতী নিরাশা। রত্ন সমবেদনায় গলে যায়। কিন্তু মালাদির নিজের চোখে জল নেই। ফুরিয়ে গেছে ঝরতে ঝরতে। তিনি কাঁদেন না, কাঁদান। রত্নর সমবেদনা যে কবে কেমন করে প্রেমে রূপান্তরিত হলো রত্ন হিসাব রাখেনি। প্রেম কি না তাই বা কেমন করে জানত, যদি না লক্ষ করত যে মালাদির উপর টান তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না, দিনে দশ বার নানা ছলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে। রাত্রেও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে যাওয়া চাই, যদিও সে প্রতিমাপূজক নয়, প্রতিমাভঙ্গকারী। মালাদি কিন্তু ঘূণাক্ষরেও জানতেন না, এখনো জানেন না যে রত্ন তাঁর প্রেমে পড়েছে। জানলে হয়তো লজ্জায় মরে যেতেন। তিনি সংস্কারবদ্ধ হিন্দু বিধবা। দ্বিতীয় বার বিবাহ তাঁর চক্ষে অসতীর লক্ষণ। রত্ন যদি তাকে বই কাগজ পড়িয়ে গল্প করে ও ভজিয়ে সংস্কারমুক্ত করতে পারে তা হলে তিনি হয়তো একদিন বিয়ে করতে রাজী হবেন, কিন্তু রত্নকেই বিয়ে করবেন এটা তার দুরাশা। সমবেদনা যেমন প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে স্নেহ কি তেমনি রূপান্তরিত হবে, না হতে পারে ? প্রত্যয় হয় না।

তার পর রত্নও তো বিবাহের জন্যে ব্যাকুল নয়। সে স্বাধীন থাকতে চায়। স্বাধীন অথচ সপ্রেম। বিবাহ যদি কোনো দিন করে তবে প্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যে, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। স্বাধীনতাকে খর্ব করে নয়। উভয় পক্ষেই থাকবে অসীম প্রেম আর অপরিসীম স্বাধীনতা। তার মধ্যে বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও পড়ে। যার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে এ কথা বোঝায় কে ? বিশেষ করে মালাদিকে। এক বার যে মেয়ে বিধবা হয়েছে পরের বার সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, এ কি মুখ ফুটে বলবার মতো কথা ? অথচ না বললেও নয়। বলতে হবেই এক দিন না এক দিন। না বললে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। যাঁকে ভালোবাসে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা রত্নর পক্ষে অসম্ভব। যতদিন ভালোবাসতে মন যায় ভালোবাসবে, যতটুকু নিতে ইচ্ছুক থাকেন দেবে, যতটুকু দিতে ইচ্ছা করেন নেবে। সে স্বাধীন নায়ক, তিনি স্বাধীনা নায়িকা। ফ্রী ম্যান। ফ্রী উম্যান। এই ভিত্তির উপর প্রেম যতদিন পারে দাঁড়াবে। আপাতত এক পায়ে দাঁড়িয়ে।

ক্রমেই তার প্রতীতি হচ্ছে, সে যেমনটি চায় তেমনটি এ দেশে সম্ভবপর নয়। হলে এ শ্রেণীতে নয়। তেমনটির জন্যে তাকে পশ্চিমেই যেতে হবে, তার মানে ইউরোপে আমেরিকায়। নয়তো গ্রামে গিয়ে চাষী কিংবা কারিগর শ্রেণীর লোক হতে হবে। এর কোনোটাই তার পক্ষে সুখকর নয়। কত কাল প্রবাসে কাটাবে ? শ্রেণীচ্যুত হলে তো আত্মীয়দের লজ্জার কারণ হবে। সে যে আরো দুঃসহ। সেইজন্যে বিবাহের চিন্তা সে একেবার মুছে ফেলেছে মন থেকে।

প্রভাত অন্য কথা ভাবছিল। নিজের ভাবনার রেখা টেনে বলল, 'মালাদি যদি তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতি বহন করে সারা জীবন অতিপাত করেন তবে তোমার দোষ নেই, কিন্তু যদি তোমার প্রেমের প্রতিদান দেন, যদি তোমাকে বিয়ে করেন, তাহলে বাকিটুকু —শুনছ, রত্ন—তাঁর করুণা নয়, তোমার পৌরুষ।'

রত্ন আরক্ত হয়ে জিব কাটল। 'তার মানে কী ? বলপ্রয়োগ ?'

প্রভাত ব্যঙ্গ করল । 'ওঃ ! আমার মনে ছিল না তুমি অহিংসাবাদী ।'

রত্ন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এ তোমার যুদ্ধক্ষেত্র নয় । এ হলো প্রেমের রাজ্য ।'

প্রভাত রঙ্গ করে বলল, 'যুদ্ধে আর প্রেমে সব কিছুই ন্যায্য ।'

রত্ন কোণঠাশা হয়ে কী আর বলবে ? ফস্ করে বলে বসল, 'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে । ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম ।'

প্রভাত দপ করে জ্বলে উঠল । 'বল কী ! মেয়েদের মধ্যে প্যাশন নেই ! ওটা আমার দৃষ্টিভ্রম ! রতন, তুমি কি জন্মান্ধ, না চোখ তুলে কখনো মেয়েদের দিকে তাকাওনি ? সবাই কি তোমার মালাদি ? আচ্ছা, শোন তা হলে তোমাকে একটা কাহিনী বলি । কাহিনীটা সত্য । এই তো সেদিনকার ঘটনা । এখনো চার মাস হয়নি । পূজার বন্ধে দেখে এলুম স্বচক্ষে । তবু তুমি বলবে দৃষ্টিভ্রম ।'

এই বলে সে শুরু করে দিল আরেক বয়ান ।

পূজার অবকাশে সে বিশ্রাম পায়নি । তাকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে নবগঠিত স্বরাজ্য পার্টির অনেকগুলো নির্বাচনী সভায় । এই পার্টির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাকে স্নেহ করেন । তাঁকে জিতিয়ে দেওয়া চাই । তাই তাঁর ডাক শুনে ছুটে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলায় । তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে জুটে গেছে ।

বেগমপুরের মিটিং জমিদারবাবুদের নবাবী আমলের চকমিলান বাড়ীতে । তার ঠাকুরদালানের সামনের দরদালানে নেতৃস্থানীয়রা । বাঁধানো উঠোনে গাঁয়ের লোক । উপরের তলার তিন পাশের বারান্দায় চিক । চিকের আড়ালে মহিলারা ।

নেতাদের পিছনের সারিতে প্রভাত ছিল । তার হঠাৎ মনে হলো বাঁ ধারের চিকের একটি কোণ যেন একটু খানি সরে গেছে । নজরে এলো, উঁকি মারছে একটি চোখ । সে চোখ এত সুন্দর যে কবিত্ব করে বলতে ইচ্ছা হয়, উদয় হয়েছে একটিমাত্র তারা । তখন গোধূলি লগ্ন । দীপ জ্বলেনি । অত বড় ভবনে ওই একটিমাত্র সন্ধ্যাদীপ ।

কিছুক্ষণ পরে আবার মনোযোগ ভঙ্গ হলো প্রভাতের। এবার একটি নয়, একজোড়া চোখ । আরো খানিক পরে আস্ত একখানি মুখ । চাঁদের উপমা দিলে মামুলি শোনাবে । কিন্তু উদয় হয়েছে যেটি হোক একটি জ্যোতিষ্ক । আলো হয়ে গেছে দশদিক । তার পর প্রভাত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করল চিকটা কেমন করে পিছনে চলে গেছে । চিকের সামনে বসে আছে উদিতা ।

বয়স কত হবে ? এই উনিশ বিশ । তন্বী । গৌরী । পরিধানে শাদা রেশমের শাড়ী । তার উপর শাদা রেশমের ফুল তোলা । ঘোমটা খসে গেছে । ঘন কালো কেশ অবিন্যস্ত ভাবে কপোলে পড়েছে । হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা । কোথাও আর কোনো অলঙ্কার নেই । এক হাতে ধরে আছে একটি রক্ত গোলাপ । টকটকে লাল ।

প্রভাত ভালো করে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না । পাছে কেউ কিছু মনে করে । তবু একবার চুরি করে চেয়ে দেখল । অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী । কিন্তু বহ্নিশিখার মতো

লেলিহান। কে জানে কোন যজ্ঞবেদীতে এর জন্ম ! এই যাজ্ঞসেনীর ! আধুনিক যুগের মহাভারতে প্রাচীন যুগের মহাভারতের এ নারী কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবে কে জানে ! কাকে প্রেরণা জোগাবে ? কোন ভীমার্জুনকে ?

প্রভাতের বক্তৃতার সময় হলো। সে যে বোকার মতো কী বলতে কী বলে গেল নিজেই জানে না। 'না জাগিলে যত ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না' এও নাকি সেদিন সে বলেছে। বলতে বলতে একবার তার দৃষ্টি পড়ে তরুণীর দৃষ্টিপথে। সে চোখে কী প্যাশন ! এমন প্যাশন সে আর কারো চোখে দেখেনি। রানুর চোখেও না। রানু এর কাছে কী ! দাবানলের কাছে তুষানল !

বলতে বলতে তার মাথা ঘুলিয়ে গেল, কথা জড়িয়ে গেল। বাক্যের মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেল সে। অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়ল। ক্ষণকাল পরে চেয়ে দেখল মেয়েটি চিকের আড়ালে লুকিয়েছে। যেমন মেঘের আড়ালে এই পূর্ণিমার চাঁদ। বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে তার আভাস। সভাশেষে কে একজন এনে দিয়ে গেল সেই রক্তগোলাপটি। প্রভাতকে নয়। সুভাষদাকে। প্রভাত শুনতে পেলো, এই সেই শ্রীমতী যে মহাত্মা গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল।—এই সেই শ্রীমতী ! সেই বিখ্যাত শ্রীমতী !

রত্ন নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল। কাহিনীর যে এইখানেই ইতি তা সে অনুমান করতে পারেনি। ভেবেছিল প্রভাত একটু দম নিয়ে আবার বলবে, কিন্তু দীর্ঘ বিরতির পর যখন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো তখন রত্নর কানে এলো, 'রানুকে নিয়ে কী যে করি কিছুই বুঝতে পারছিনে, ভাই ! আমি নিজে ক'দিন বাঁচব !'

রত্ন তখনো শ্রীমতীর ধ্যান করছিল। বলল, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে ওটা পলিটিকাল প্যাশন। গরম গরম বক্তৃতা শুনলে কে না গরম হয়ে ওঠে !'

প্রভাত বলল, 'কতক মেয়ে আছে যারা এমনিতেই গরম।'

দুই

মাস ছ'সাত পরে।

রত্ন সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল। ক্ষান্তবর্ষণ বিদ্যুৎ চমকানো মেঘলা দিন। বেলা ন'টা বেজে গেছে খেয়াল নেই। খেয়াল হলো যখন হস্‌টেলের চাকর ল্যাংড়া লালজী এসে ঘরে ঘরে ডাক বিলি করে গেল। তত দিনে সে ও প্রভাত মেস থেকে হস্‌টেলে উঠে এসেছে। দু'জনেই দু'খানা এক-আসনিক ঘর পেয়েছে।

রত্ন ডাক নিয়ে দেখল তার নামে একখানা 'ভারতী' ও একখানা খাম। তার স্বভাব সে মাসিকপত্র পেলে সেখানাই আগে খোলে ও একবার চোখ বুলিয়ে যায়। তার পর চিঠিপত্র। কিন্তু এই খামখানা ছিল নীল রঙের ও সুবাসিত। আর এর ঠিকানাটা মেয়েলি হাতের। মাসিকপত্র ফেলে খামখানা খুলে দেখে—এ কী ! এ কে !

বেগুনি রঙের কালি দিয়ে নীল রঙের কাগজের এক পিঠে রুল টানা লাইন ধরে

লেখা । পাতার পর পাতা মেয়েলি হাতের অক্ষর । রত্ন বার বার উলটে পালটে দেখল । না মালাদির চিঠি নয় । মালাদি সুগন্ধি ব্যবহার করেন না ।

প্রিয় ভাই,

একটি অচেনা অজানা বোনের চিঠি হঠাৎ পেয়ে চমকে উঠবেন হয়তো । কিন্তু যার জন্যে এ চিঠি সে আপনার অচেনা নয় । যার কথায় লিখছি সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনার মণ্ডলীর সদস্য । সম্প্রতি আমার মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছে। আন্দাজ করুন দেখি প্রথম জনটি কে ? আর দ্বিতীয় জনটি ?

পারলেন না তো ? আচ্ছা, আমিই তবে বলি । দ্বিতীয়টি ললিত । সে আমার ননদের দেওর । তার সঙ্গে আলাপ বেশী দিনের নয় । গোড়া থেকেই সে আপনার নাম করছে । আপনার আর প্রভাতদার । কিন্তু সুনাম নয় । আপনারা নাকি স্বার্থপরের মতো পশ্চিমে চলে গেছেন সরস্বতীপূজা করে লক্ষ্মীলাভ করতে । আপনাদের সব আদর্শবাদ নাকি বাক্যে । বুঝতে পারছি তার অভিমান হয়েছে। ছেলেটি আপনাদের দু'জনের পরম ভক্ত । এখনো তার বিশ্বাস সোনালীর জন্যে যদি কেউ কিছু করে তো সে রত্ন, সে প্রভাত ।

এই দেখুন প্রথম নামটিও বলে ফেললুম । সোনালীকে কি মনে আছে আপনার ? তিন বছর আগে যে হতভাগিনীকে উদ্ধার করতে আপনারা অগ্রসর হয়েছিলেন সাত ভাই চম্পার সেই পারুল বোনটি আজ কোথায় ? একটি বার কি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে না আপনার ? বা আপনার বন্ধুবরের? হায় ! সে বেচারির দুঃখে পাষাণও গলে যায় । পূর্ব জন্মে কী মহাপাপ করেছিল ! জ্যোতিদা আবার বলে, পূর্ব জন্ম নেই । সব বানানো । তা হলে পর জন্মও নেই । আপনার কী মনে হয় ?

যা বলছিলুম। সোনালীকে সেই রাবণরা তাদের অশোকবনে লুকিয়ে রেখেছিল, তা তো জানেন । শত চেষ্টাতেও সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারা যায়নি । আপনাদের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল । বছর আড়াই পরে ওরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হতভাগিনীকে মুক্তি দেয় । তখন মালুম হলো বন্ধনের চেয়ে বন্ধনমোচনেই বেশী দুঃখ । বাগানবাড়ী থেকে ছাড়া পেয়ে সে যাবে কোন চুলোয়! বাপ মা দূর দূর করে দরজা বন্ধ করে দিল । একটু আশ্রয়ের জন্যে সে দ্বারে দ্বারে ঘুরল । কেউ দয়া করল না । যেসব লোক দয়ার ভান করল তাদের অস্ফুট শর্ত অবিকল রাবণদের মতো । লঙ্কায় কি সকলেই রাবণ ? সোনালী তা হলে শস্তায় আপনাকে বিকিয়ে দেয় কেন ? বুঝতে পারলেন, না আরো খোলসা করতে হবে ? সে সোজা বাড়ীউলির কাছে গিয়ে ঘর ভাড়া করল, পুলিশের কাছে গিয়ে নাম লেখাল ।

রত্নভাই, কী লজ্জা ! কী লজ্জা ! আমি নারী হয়ে জন্মেছি বলে লজ্জিত। আপনি পুরুষ হয়ে জন্মেছেন বলে লজ্জিত নন ? কিন্তু এই লজ্জা যদি ক্রোধে

পরিণত না হলো তবে সোনালীর মতো সোনার মেয়েদের কোনো প্রতিকার আছে কি ? আমি তো অনেক আগে থেকেই অলঙ্কার ত্যাগ করেছি । ভাবছি এবার নতুন কী ত্যাগ করব । মাংস খাইনে, মাছ খাই । মাছ ছেড়ে দিলে কেমন হয় ? অন্যায় চির কাল জিতবে ? কেউ পারবে না রুখতে ?

ললিত বলছে আপনারা যদি চেষ্টা করেন সোনালীকে অস্থান থেকে উদ্ধার করে পাত্রস্থ করা এখনো সম্ভব । ও আশ্রমে যাবে না । হয় বিয়ে করবে, নয় যা করছে তাই করবে । ওরও তো আত্মসম্মান আছে । আমি এটা সমর্থন করি। নারীর বেলা অন্য ব্যবস্থা কেন ? পুরুষের বেলা তো বিয়ে আটকায় না । ঐ যে বড় রাক্ষসটা ওটারও তো সেদিন মহা ধূমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল । সবাই জানে ওর কাণ্ড । অথচ একজনও অসহযোগ করবে না । সবংশে খাবে ও-বাড়ীর ভোজ। রায় বাহাদুর নেমন্তন্ন করেছেন বলে কী রকম কৃতার্থ গদগদ ভাব ! সমাজপতি যে ! ওটিও তো একটি পয়লা নম্বর পারাবত । কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে । কার ছেলে সেটা মনে রাখতে হবে । বড় রাক্ষস এখন পতিদেবতা হয়েছে। এর পরে একদিন সমাজপতি হবে । ছোট চলল কলকাতা । সেখানে ব্যবসা করবে। কে জানে কিসের ব্যবসা ! নারীমাংসের নয় তো !

ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি ? রত্নভাই, আমার তো মনে হয় আপনিই ওই পরমা সুন্দরী কন্যার উপযুক্ত বর । আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি যে । তাই তো অমন কথা লিখতে সাহস হলো । বেয়াদবি মাফ করবেন । প্রভাতদার উপরেও আমার সমান নির্ভরতা । তাঁর বীরত্বের তুলনা নেই । সোনালীর জন্যে তিনি যা করেছেন তা নিয়ে নতুন একখানা রামায়ণ লেখা যায় । শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ে মাথা নুয়ে আসে । তাঁকে আর আলাদা করে লিখলুম না । এ চিঠি যদি দয়া করে তাঁকে দেখতে দেন কৃতজ্ঞ হব । তিনিও তো এখনো কুমার । তাঁর মতো নায়ক কে না কামনা করে ! ধন্য হবে সোনালী ।

এবার আমার আত্মপরিচয় দিলুম না । যদি আপনার সাড়া পাই পরে ওসব হবে । সাড়া পাব তো ? না পেলে কিছু মনে করব না । বুঝব আপনি ও আপনার বন্ধু অক্ষম । আজ তা হলে আসি । সোনালী দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে । একটি একটি করে দিন যায়, আর একটু একটু করে তলিয়ে যায় । যা করবেন জলদি করবেন । নয়তো বড় বেশী দেরি হয়ে যাবে । উত্তরের জন্যে ডাকঘরে রোজ বিশ্বাসী লোক পাঠাব ।

নমস্কার, রত্নভাই । ইতি আপনার শরণার্থিনী

শ্রীমতী দেবী

রত্ন এ চিঠি পড়ে প্রথমে কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল । চমক বলে চমক ! পাতায় পাতায় চমক । পদে পদে চমক । তার পরে রোমাঞ্চ বোধ করল । কানে এলো কাঁকনের কন কন । আঁচলের খস খস । ঘ্রাণে এলো এসেন্সের সুরভি । প্রাণে এলো প্রথম

পরিচয়ের চাঞ্চল্য । অচেনা অজানা বোন । অচেনা অজানা নারী ।

তার পর বেদনায় ঢলে পড়ল । তিন বছর আগে যা ঘটেছিল তার স্মৃতিও বেদনাবহ । তার উপর যবনিকা টেনে দিয়ে বেশ তো নিশ্চিন্তে ছিল এত দিন । সোনালী বোনের প্রতি যেন আর কোনো কর্তব্য নেই । যা কিছু করণীয় তা করা হয়ে গেছে । কোথাকার কে এক শ্রীমতী দেবী আজ আদিখ্যেতা করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সে-সব ঘটনা । সোনালী চলেছে পতনের পথে । গড়াতে গড়াতে নিচে থেকে আরো নিচে । সিঁড়ির ধাপ থেকে পা ফস্‌কালে যেমন হয় । এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নয়, আকস্মিকভাবে, অপরের ধর্ষণে। তার জের এখনো মিটল না । মোমেন্টাম এখনো থামল না । বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ।

গঙ্গাস্নান করে ঘরে ফিরছিল পাশের ঘরের ব্রিজনন্দন । রত্নকে তড়িতাহতের মতো পড়ে থাকতে দেখে তার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল হিন্দীতে, 'ব্যাপার কী ! খুব কি খারাপ খবর !' রত্ন কথা কইতে গিয়ে দেখল কথা আসছে না । মুখ না মন কোনটা অসাড় কে জানে ! কিন্তু চিঠিখানা সে ক্ষিপ্র হাতে খামে পুরে দূরে সরিয়ে রাখল । আর কেউ পড়ে এটা তার ইচ্ছা নয় । ব্রিজনন্দন অবশ্য বাংলা পড়তে জানে না । অপ্রতিভ হলো উভয়েই ।

না, আর কেউ পড়ে এটা তার ইচ্ছা নয় । প্রভাতও না । এ চিঠি রত্নকে লেখা, রত্নর একার । কিন্তু কী করবে, প্রভাতকে না দেখিয়ে উপায় নেই । লেখিকার নির্দেশ । তখন কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছিল । কোনো মতে কয়েকটা ঘণ্টা কাবার করে বিকেলের দিকে প্রভাতের সঙ্গে দেখা । ততক্ষণে রত্ন সামলে নিয়েছে । ভিতরে ভিতরে লজ্জায় জড়সড় । বাইরে দিব্য সপ্রতিভ ভাব । দুই বন্ধুর কথাবার্তা এই রূপ নিল :

'শুনেছ, ললিত আমাদের না বলে অন্য একটা মণ্ডলীতে ভিড়েছে ?'

'তাই নাকি ? কার কাছে শুনলে ?'

'আজ একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছি । মেয়েলি হাতের ।'

'বেনামী চিঠি ! মেয়েলি হাতের ! কী করে বুঝলে ?'

'মেয়েলি হাতের তা তো দেখলেই বোঝা যায় । বেনামী এটা আমার অনুমান । ভদ্রমহিলার নাম হয়তো শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী কি শ্রীমতী নিভাননী দেবী । মাঝখানটা চেপে গিয়ে লিখেছেন শ্রীমতী দেবী ।'

প্রভাত কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কই দেখি ?' সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলল, 'দেখতে পারি ?'

'নিশ্চয় । তোমাকে দেখতে দিতে বলেছেন ।'

চিঠি পড়ে প্রভাত রত্নর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল । 'অভিনন্দন । স্বয়ং শ্রীমতী তোমাকে চিঠি লিখেছে । দেশের লোক কেই বা তোমাকে চেনে ! সে তোমার চেয়ে বহুগুণ বিখ্যাত । অথচ তুমি তার নামটাই জান না । জানবে কী করে ? রাজনীতিক মহলে তো মেশ না । কেন, তোমাকে বলিনি তার নাম একদিন গঙ্গার ধারে ? মাস কয়েক আগে একদিন পূর্ণিমার রাত্রে ? সেই যে গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল।'

রত্ন ভুলে গেছল । মনে পড়ল শুধু একটি চিত্রকণা । শরমে লোহিত হয়ে বলল, 'সেই যাঁর চোখে প্যাশন ?'

'সে-ই ।' প্রভাত বলল রহস্যময় ভঙ্গীতে । যেন জুজুর ভয় দেখাচ্ছে ।

'তিনিই !' রত্ন নেতিয়ে পড়ল শঙ্কায়, নিরাশায় ।

প্রভাত চাপা গলায় বলল, 'শুধু তাই নয় । ইতিমধ্যে কানে এসেছে আরো জবর খবর । কশ্চিৎ সন্ত্রাসবাদী উপদল শ্রীমতীকে হস্তিনীর মতো সামনে রেখে হস্তী সংগ্রহ করছে । দেখছি ললিতকে দলে টেনেছে, এর পর তোমাকেও টানবে । কোনখানে কার দুর্বলতা সেটা ওদের অজানা নয়, সেইখানেই ওদের আবেদন । তোমার দুর্বলতা তুমি নারীর অপমান শুনলেই লাফিয়ে ওঠ । ডন কুইক্সোটের মতো ছোটো আর ছোটাও । তারপর তুমি খেলোয়াড়ের মতো বসে থাক আর আমি লাট্টুর মতো বন বন করে ঘুরি ।'

এই বলে সে ছড়া কাটল, 'প্রভাত শর্মা করিৎ কর্মা । রত্ন বর্মা স্রেফ অকর্মা ।'

ওই 'স্রেফ' কথাটির আমদানি হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে । প্রভাতের প্রিয়তম কবি । ইতিমধ্যে সে গিয়ে আলাপ করে এসেছে তাঁর সঙ্গে ।

রত্ন মাথায় হাত দিয়ে বসল । এর মধ্যে এত রহস্য আছে ! তার চেহারা দেখে প্রভাতের মায়া হলো । 'থাক, তোমাকে ও চিঠির জবাব দিতে হবে না । আমিই দু'জনের হয়ে জবাব দেব । কি লিখব, শুনবে ?'

রত্ন চোখ তুলে তাকাল । প্রভাত লিখবে শুনে আশ্বস্ত । কী লিখবে শুনতে উৎসুক ।

'লিখব, ভদ্রে, আমরা তিন বছর আগে পরাজিত হয়েছি । আর নতুন করে লড়তে ইচ্ছা নেই । আপনি অপর সৈনিকের সন্ধান করুন ।'

রত্ন মর্মাহত হলো । প্রভাতটা কী রূঢ় । ভদ্রমহিলাকে অমন করে লিখতে আছে ! আর পরাজিত কিসের ? মানবাত্মা অপরাজেয় । তবে, হাঁ, লড়তে ইচ্ছা নেই সে কথা ঠিক । গত কয়েক মাস ধরে রত্নর ভিতরেও একটা পরিবর্তন চলেছে । তার জীবনদর্শন বদলে গেছে। জগতে এত রকম এত বেশী মন্দ আছে যে তার সঙ্গে যুঝতে থাকলে আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া চলে না । ফলে সৃষ্টি করা হয় না । যৌবন চলে গেলে নারী যেমন হাজার মাথা খুঁড়লেও মা হতে পারে না তেমনি শত তপস্যা করলেও পুরুষ হতে পারে না শিল্পী বা কবি, স্বাপ্নিক বা ধ্যানী । পূর্ণিমা ফিরে ফিরে আসে, বসন্ত ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু যৌবন একবার গেলে আর আসে না । দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে সৃষ্টির বাসনা যার আছে তাকে যৌবনের দিনে রণছোড় হতে হবে । তার পক্ষে এটা গৌরবের নয় । তার বিবেক সব সময় বিক্ষুব্ধ । মন্দ কি তা হলে কায়েম হলো ? হলো হয়তো, কিন্তু জগতে নবজাত সৌন্দর্য এলো । তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী । যেমন অন্ধকার রাতে দীপের আলো । দীপ জ্বলে ওঠা মাত্র একটুখানি তফাৎ হলো বইকি । কালিমার মহিমা খর্ব হলো ।

প্রভাত লক্ষ করল রত্নর মুখ থেকে আভা মিলিয়ে গেছে । গাঢ় স্বরে বলল, 'ভাই

রত্ন, এই তিন বছরে আমি অনেক দেখেছি অনেক শিখেছি । তুমি কি জান না যে আমি নিজে পুরোহিত হয়ে বিধবার বিয়ে দিয়েছি, অসবর্ণ বিবাহের সাক্ষী হয়েছি, পতিপরিত্যক্তাকে মুসলমান করে মুসলমান বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়েছি ? কিন্তু এই সোনালী মেয়েটির বেলা আমি পরাজিত । এ যদি মুসলমান হতে রাজী হয় আমি এর বিয়ের ভার নিতে পারি, কিন্তু আমি নিজে মুসলমান হতে নারাজ, আর হিন্দু হয়ে আমি পতিতা পরিগ্রহ করতে অক্ষম ।'

'পতিতা কেন বলছ ? পাতিতা।' রত্ন সংশোধন করল ।

'আচ্ছা, তাই হোক । পাতিতা । কিন্তু আমার সাধ্য নয় । এই ইসুতে আমি হিন্দু সমাজের সঙ্গে লড়তে যাব না । গেলে আমার নির্ঘাত হার হবে ।'

রত্ন রাগ করে বলল, 'তা হলে সাত ভাই চম্পা ভেঙে দাও । পারুল বোন যখন ভেসে গেল । তলিয়ে গেল ।'

প্রভাত করুণ হেসে বলল, 'তুমি থাকতে ?'

'সোনালী যদি আমাকে ভালোবাসত আর আমি ভালোবাসতুম ওকে,' রত্ন ঢোক গিলে বলল, 'তা হলে আমাদের বিয়ের কথা উঠত ।'

'তা যখন নয় তখন কী করার কথা ওঠে ? ও যেখানে আছে সেখান থেকে ওকে সরিয়ে কোথায় রাখবে তুমি ? বোনের মতো নিজের বাড়ীতে ?'

'বাড়ী তো আমার নয়, আমার বাবার । তিনি রাজী হলে তো ? না, ভাই । সে আশা নেই ।' রত্ন আক্ষেপ করল ।

'তা হলে নিজের বাড়ী যত দিন না হয়েছে তত দিন সবুর করতে হয় । তত দিন সোনালীকে ভরসা দিতে চাও, দিতে পার । কিন্তু তুমি কি জান ঠিক কত দিন পরে তোমার নিজের বাড়ী হবে ? আর সে বাড়ীতে কার অধিকার বেশী ? বৌয়ের না বোনের ? বৌ এলে বোনকে বিদায় করে দেবে না ?'

রত্ন সম্পূর্ণ অপদস্থ হলো । 'সোনালী কি তা হলে ওইখানেই চিরকাল থাকবে ?'

'অগত্যা । হিন্দু সমাজে ওই তার ঋষিনির্দিষ্ট স্থান । কিন্তু সমাজ বলছি যে, সমাজে কি ওর কেউ আছে ! ও তো সমাজের বাইরে । তা হলে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হলে ক্ষতি কী ? তবে বিয়েটা একটা সমাধান নয় । দেখছি তো রানুকে ।'

রত্ন বহু কাল রানুর কথা জিজ্ঞাসা করেনি । জানতে চাইল, 'রানু কেমন আছে প্রভাত ?'

'বেঁচে আছে । থাকবে যত দিন না আমার বিয়ে হয়েছে ।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্রভাত । 'মানুষ বাঁচে আশায় । ওর এই একটিমাত্র আশা যে আমি আইবুড়ো থাকব আজীবন । তা কি আমি পারি ?'

'ও বাঁচবে না জেনেও কি তুমি বিয়ে করবে ?'

'আমার তো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয় । আমি চাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ।'

'তা বলে একটি নারীর জীবনের বিনিময়ে !' রত্ন অনুযোগ করল ।

প্রভাত বলল ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে, 'সেইজন্যেই তো বলি আমরা পরাজিত ।'

'না । আমরা পরাজয় স্বীকার করব না ।' রত্ন ঘোষণা করল দৃপ্ত স্বরে ।

'তা হলে তুমিই বল রানুকে নিয়ে আমি করি কী ।'

'রানু তোমাকে ভালোবাসে । তুমি রানুকে ভালোবাস । ভালোবাসার আইন আর বিয়ের আইন এ দুটোয় সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অনুসারেই মানুষ চলবে । সমাজ যদি মানুষের সমাজ হয়ে থাকে তবে সমাজও চলবে । ভালোবাসার আইন কী করতে বলে ? বলে, রানুকে বাঁচাও । যা করলে ও বাঁচে তাই কর । ওর স্বামীকে বল ওকে ছাড়পত্র দিতে । তার পর ওকে নিয়ে সংসার পাত ।'

'বিয়ে না করেও ?'

'সম্ভব হলে বিয়ে করে । না হলে না করেও ।'

প্রভাত স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'রত্ন, ছি !'

রত্ন নিরস্ত হলো না । বলে চলল, 'পরাজয় বরণের চেয়ে লোকনিন্দা বরণ শ্রেয় । প্রভাত, ভাই, তুমি যদি জীবনের প্রথম দিনের রণেই পরাজয় মেনে নাও তা হলে তোমার ভাঙা মাজা জোড়া লাগবে না আর । পার্থিব সাফল্য নিয়ে তুমি করবে কী ? তার চেয়ে স্পৃহনীয় মহৎ কর্মে বিফলতা । তেমন বিফলতা পরাজয় নয় ।'

প্রভাতের স্বর কাঁপছিল আবেগে । 'ভাই, তোমার যুক্তির জোর আমি মানি । কিন্তু আমার শক্তির দৌড় আমি জানি । আর রানুকে তো আমি চিনি । সে তার স্বামীটিকে ছাড়বে না । স্বামী ছাড়পত্র দিলে সেই দণ্ডেই মারা যাবে ।'

রত্ন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না । হঠাৎ ঘা খেয়ে 'য়্যা' করে উঠল ।

তার বন্ধু তাকে প্রবোধ দিল । 'রত্ন, তুমি সরল মানুষ । জটিলকে সরল করে এনে সমাধান করতে চাও । যেমন করে অঙ্ক কষতে । জীবনে তা হয় না । জটিলকে জটিল রেখেই সমাধান খুঁজতে হবে । রানু যে আমাকে না পেলে বাঁচবে না এটা সত্য । তেমনি ওটাও সত্য যে, সে যাঁর সঙ্গে মন্ত্র পড়েছে, অগ্নি সাক্ষী করে যাঁর হাত ধরেছে, যাঁর ঘরে ঘরনী হয়েছে, যাঁর স্বজনদের বৌমা বৌদি কাকিমা মাসিমা হয়েছে, যাঁর সন্তানের মা হবে কে জানে কোন দিন,' বলতে বলতে প্রভাতের গলা ধরে এলো, 'তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না । ভালোবাসার আইন অনুসারে চলবে যে, ভালোবাসা কি তাঁদের দিক থেকে নেই, তাঁদের উপর নেই ? আর সমাজভয় তো মেয়েদেরই বেশী । পুরুষ দু'দিন বাদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায় । নারী কি ঘরের বৌ ঘরে ফিরতে পারে !'

রত্ন কোথায় একটুখানি সহানুভূতি দেখাবে, না রেগে আকুল হলো । 'ও সব সংসারী লোকের যুক্তি । প্রেমিক পুরুষের নয় । প্রেম অসাধ্যসাধনের সংকল্প নেয় । চরম বিপদের সম্মুখীন হয় । জীবন যদি আমাকে দিত তেমন একটা সুযোগ যেমন দিয়েছে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতুম প্রেম কত বড় শক্তিমান।'

প্রভাত রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'একে তুমি সুযোগ বল, রত্ন ! আমার মতো অভাগাকে ঈর্ষা কর তুমি ! এমন দুর্ভাগ্য যেন শত্রুরও না হয় ।'

'ভাই প্রভাত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি নারীর প্রেম পেয়েছ । আমি পাইনি । তুমি ধন্য । আমি নই । তোমার কপালে রাজটীকা । আমার কপালে ভাই-ফোঁটা । মালাদি আমাকে তার বেশী দেননি, দেবেন না । রানু তোমাকে তার বেশী দিয়েছে, আরো দেবে যদি তুমি তার প্রেমের মর্যাদা রাখ ।'

প্রভাত কী মনে করে জিজ্ঞাসা করল, 'রত্ন, জীবনে নারীর প্রেমই কি সব চেয়ে মূল্যবান ? তার উপর আর কিছু নেই !'

রত্ন সকালবেলার উদ্দীপনায় তখনো উদ্দীপ্ত ছিল । বলল, 'রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি । তার উপরে যদি কিছু থাকে তবে সে-ই দেখতে পায় যে তত দূর উঠেছে ।'

এ কথা শুনে প্রভাত সহসা গম্ভীর হলো । শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'রত্ন, ভাই, কখনো কোনো বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পোড়ো না ।'

রত্ন আশ্চর্য হলো । বলল, 'সে ভয় নেই । আমার মালা আছে । আমি মালা জপ করি । তা কি তুমি জান না ?'

সেদিন বিদায় নেবার সময় রত্নর মনে পড়ল যে শ্রীমতী দেবীর চিঠির উত্তর দিতে হবে । প্রভাতকে বলল, 'বেশ, তুমিই এ চিঠির উত্তর দিয়ো । তবে আমারও এক লাইন লেখা উচিত । না লিখলে অসৌজন্য হবে ।'

'কী লিখতে চাও তুমি ?'

'লিখব, দিদি, আপনার পত্রের উত্তর প্রভাত দিচ্ছে । ওটা আমারও উত্তর ।'

প্রভাত তার রোমশ ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, 'দিদি ! দিদি কেন ?'

'রত্নভাই বলে যখন ডেকেছেন তখন বয়সে বড় নিশ্চয় ।'

'দেখে তো মনে হয়নি তখন । খ্যাতিটা বয়সের অনুপাতে বেশী ।'

রত্ন মনে মনে এই সংবাদটি জানতে চেয়েছিল । আর একটি সমাচার জানতে বাকী ছিল তার । তা না না না করে প্রশ্নটা তুলল । তুলতে গিয়ে রেঙে উঠল ।

তার উত্তরে প্রভাত দুষ্টু হাসি হাসল । 'হাঁ বিবাহিতা । লক্ষ করনি, 'ললিত আমার ননদের দেওর ?' বিয়ে না করলে ননদ হয় কখনো ?'

রত্নর অত খেয়াল ছিল না । অপ্রস্তুত হলো । ঘরে ফিরে এসে রত্ন শ্রীমতীর চিঠিখানা আরো একবার পড়ল । ইতিমধ্যে পড়া হয়ে গেছে দু'তিন বার । চিঠির উত্তর না দিলে বা এক লাইন উত্তর দিলে কী মনে করবেন শ্রীমতী বোন !

বোন ? হাঁ, বোনই তো । ভাই বলে ডেকেছেন যখন তখন বোন নয় তো কী ? এই অচেনা অজানা বোনটির প্রতি রত্নর ভ্রাতৃস্নেহ সঞ্চারিত হয়েছিল । আমার বোন ! আমার নতুন বোন ! আমার শ্রীমতী বোন ! আমার বোনকে আমি চিঠি লিখব না ? লিখবে আরেকজন ? দেখ দেখি কত বড় একখানা চিঠি ! এ চিঠির উত্তর যদি এত বড় না হয় তা হলে স্নেহের পরিচয় দেওয়া হবে কী করে ?

স্নেহ ? হাঁ, স্নেহই তো । যাকে চোখে দেখিনি তার প্রতি স্নেহ অনুভব করা এমন কী নতুন কথা হলো ! মাসীর মেয়ে মিনুকেও তো দেখিনি । সে এখন তার স্বামীর

সঙ্গে নাগপুরে না কোথায় । এক কালে খুব চিঠিপত্র লিখত আমাকে । উত্তরও পেত । বিয়ের পর থেকে চুপচাপ । স্নেহ অনুভব করা চোখের দেখার অপেক্ষা রাখে না । সম্বন্ধটা স্নেহের সম্বন্ধ হলেই হলো ।

রত্ন স্থির করে ফেলল চিঠির জবাব সে নিজেই দেবে । এক লাইনে নয়, সবিস্তারে । কেন সোনালীর জন্যে কিছু করা সম্ভব নয় তা বুঝিয়ে বলবে, গুছিয়ে বলবে । প্রভাতের বিয়ে না করার কারণ এক । রত্নর বিয়ে না করার কারণ অন্য । প্রভাত কেন পারবে রত্নর মনের কথা রত্নর মনের মতো করে লিখতে ? তা ছাড়া গত কয়েক মাস ধরে রত্নর অন্তর্জীবনে একটা সঙ্কট চলছিল । এই সম্প্রতি তার সঙ্কট মোচন হয়েছে । ভাঙার কাজ সে অপরের উপর ছেড়ে দিতে চায় । গড়ার কাজ নিয়ে থাকতে চায় নিজে । সোনালীর ভার নিয়ে সংগ্রাম করাও তো ভাঙার কাজ ।

কিন্তু কেউ যদি কিছু না করে তা হলে কী করে রক্ষা পাবে সোনালী ? সে কি তবে অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যাবে মিলিয়ে যাবে ? সেও তো একটি বোন । তার জন্যে রত্নর মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল । যেমন ভারাক্রান্ত সেই ভাদ্রের আকাশ ।

তিন

পরের দিন রবিবার ছিল । সারা দিন ধরে বার বার মুসাবিদা করার ফলে রত্নর উত্তরটা অবশেষে এই রূপ নিল :

অচেনা অজানা বোন,

বছর তিনেক আগে যে যন্ত্রণা আমাকে অধীর করে তুলেছিল আজ এত কাল পরে তার পুনরাবৃত্তি আমাকে দ্বিতীয় বার অস্থির করলেই কি আমি এক হাতে কিছু করতে পারব ? সোনালীর কথা বলছি ।

আপনি যা লিখেছেন তা আপনার যোগ্য হয়েছে । এই তো চাই । আমাদের মেয়েরা তাদেরই মতো আর কয়েকটি মেয়েকে বিপন্ন দেখে মুখ ফিরিয়ে না নিলে ঘৃণা না করলে সোনালীরা এমন ভাবে নির্যাতিত হতো না । তাদের বিয়ে হতো, ঘরসংসার হতো, লোকে ভুলে যেত সাময়িক একটা দুর্ঘটনা । যেমন ভুলে যাবে বড় রাক্ষস ও ছোট রাক্ষসের বেলা । যদিও এদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল । এমনি আমাদের সমাজ যে উদোর শাস্তি পড়ল বুধোর ঘাড়ে । ভুগতে হলো সোনালীকেই । রামায়ণের যুগেও তো যত দুর্ভোগ সীতারই । রাবণের আর কী এমন দুর্গতি হলো ! সে তো রামের হাতে মরে বৈকুণ্ঠে গেল । শত্রুরূপে সাধনা করলে নাকি ভগবানকে তিন জন্মে পাওয়া যায় । ভক্তরূপে সাত জন্মে । পুরুষ যাই করুক না কেন তার সাত খুন মাফ । যত নির্দোষ হোক না কেন সাজা কেবল

নারীর বেলা। আমি কিন্তু অবাক হই ভেবে যে, মেয়েরা কেন এটা মেনে নেয়, কেন নারীর পক্ষ নেয় না, কেন সীতার পক্ষ নিল না সেকালে, সোনালীর পক্ষ একালে ? তার চেয়ে আরো অবাক হচ্ছি দেখে যে, এ পোড়া দেশে এত যুগ পরে এমন একজন মহিলার অভ্যুদয় হয়েছে যিনি সোনালীর পক্ষে। এ বিস্ময় আনন্দের।

অচেনা অজানা বোন, কেন আপনি এলেন না তিন বছর আগে যখন কেউ ছিল না আমাদের প্রেরণা দিতে ? এলেন যদি, তবে এত দেরিতে কেন ? আমাদের মণ্ডলী ভেঙে যাবার সামিল। আমরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছি। মতভেদ ও পথভেদ দেখা দিয়েছে। একজোট হয়ে আর আমরা কাজ করিনে। করতে পারিনে। প্রভাতকে আপনার চিঠি দেখাতে সে বলল, আমরা পরাজিত। আমরা নতুন করে লড়তে অনিচ্ছুক। আমি অবশ্য স্বীকার করব না যে, আমরা পরাজিত। কিন্তু আমার নিজের একটা সাধনা আছে। আমি যাকে ভালোবাসব তার ভালোবাসা পেলে তাকেই বিয়ে করব, যদি বিয়ের উপায় থাকে। কিংবা যে আমাকে ভালোবাসবে সে আমার ভালোবাসা পেলে সেই হবে আমার বধূ, যদি বিশেষ কোনো বাধা না থাকে। ভালোবাসার আইন ও বিয়ের আইন এ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অনুসরণ করব। একসঙ্গে থাকব। ভালোবাসা যত দিন একসঙ্গে থাকা তত দিন। হয়তো আজীবন।

সত্যি বলতে কি, বিবাহ নামক প্রথাটা আমার চোখে সুন্দর নয়, তবে প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন হতো না যদি পুরুষ নারীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ না করত, নারী না করত পুরুষের সঙ্গে। কিন্তু অবিশ্বাস দিয়ে যার শুরু কী করে তা সুখের হবে ! বিশ্বাসের অভাব বা অল্পতা যার মধ্যে দেখব কেমন করে তাকে চিরদিন ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দেব ! যে নারী আমাকে এত বেশী বিশ্বাস করবে যে বিয়ের কথা মুখে আনবে না অথচ ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দেবে তাকেই বিয়ে করব আমি, তার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব। আর যে বলবে আগে বিয়ে তার পরে বিশ্বাস, তার সঙ্গে আমার বিবাহ কোনো দিন হবে না।

তার পর বিবাহ একবার হলে আমরণ স্থায়ী হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা দিতে আমি নারাজ, কারণ মানুষের হৃদয়ের উপর তার নিজেরই হাত নেই, সে জোর করে ভালোবাসতে পারে না সবদিন। ভালোবাসার ভান কি ভালো ? আমি বলি, না। ভালো নয়। তার চেয়ে ছাড়াছাড়ি ভালো। ছাড়াছাড়ির পর আবার বিয়ে। যদি নতুন করে প্রেম আসে জীবনে। এ স্বাধীনতা পুরুষেরও থাকবে, নারীরও থাকবে। নারী যদি পাঁচ বার বিয়ে করে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। বরং সেইটেই হবে মহাভারতসম্মত। একসঙ্গে পাঁচজনকে নয় কিন্তু। তাতে আমি অসম্মত। এই যার মতবাদ তারই সঙ্গে সোনালীর বিয়ে দিতে চান আপনি ? কিন্তু সোনালী কেন রাজী হবে ?

সোনালীকে আমি চোখেও দেখিনি। ভালোবাসা তো দূরের কথা। সে হয়তো

আমার নামটাও শোনেনি । ভালোবাসা তো আরো সুদূর । এমন অবস্থায় বিয়ে করতে আমার সাধনায় বাধে । বিয়ে করলে পরে হয়তো একপ্রকার ভালোবাসা জন্মায়, কিন্তু সে ভালোবাসা প্রেমিককে নয়, স্বামীকে । প্রেমিকাকে নয়, স্ত্রীকে। সে না হয়ে আর কেউ যদি স্বামী হতো বা স্ত্রী হতো তবে তাকেও ঠিক তেমনি নির্ধারিত মাপে ভালোবাসা মেপে দেওয়া যেত । এক ছটাক এদিক ওদিক হতো না । অর্থাৎ এ হলো কর্তব্য হিসাবে ভালোবাসা । সংসারে এই রকম ভালোবাসাই বেশী চলতি । আমি সংসারী মানুষ নই, আমি এ রকম ভালোবাসা চাইনে । আমাকে স্বাধীন থাকতে হবে সত্যিকারের ভালোবাসার খাতিরে । বিপন্না কুমারীকে শত ভাবে সাহায্য করতে পারা যায় । কিন্তু জোর করে ভালোবাসা যায় না । জোর করে ভালোবাসা, জোর করে বিয়ে করা, জোর করে হরণ করা এসব একই মানসিকতার রকমফের । জোরকে যারা নারীর ইচ্ছার উপর জিতিয়ে দিতে চায় আমি তাদের কেউ নই । আমি বলি, জোর কিছুতেই জিতবে না। জোরকে কিছুতেই জিততে দেওয়া হবে না । সেই আমি কখনো জোর করে ভালোবাসতে পারি ! জোর করে ভালোবাসা আদায় করতে পারি ! না, বোন, তাতে বিপন্নাকে আরো বিপন্ন করা হয় । অন্য সমাধান খুঁজতে হবে । তিন বছর আগে আমরা অন্য সমাধান খুঁজেছিলুম ।

একদিন দুপুর বেলা কানন এসে খবর দেয় তার প্রতিবেশী ভদ্রলোকের বিবাহযোগ্যা রূপসী কন্যা সোনালীকে পাওয়া যাচ্ছে না । তাদের বাড়ীতে হাহাকার পড়ে গেছে । আগের রাত্রে কীর্তন মহোৎসব ছিল পাড়ার বড় বাড়ীতে। যেমন প্রতি মাসে হয়ে থাকে । কীর্তন শুনতে সোনালীরা তিন বোন পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যায় । কীর্তনের শেষে সবাই ফিরল, ফিরল না শুধু একজন । হরির লুটের গোলমালে পাঁচশো লোকের ভিড়ে সোনালী লুট হয়ে গেল । কেউ টের পেলো না । তার পর খোঁজ খোঁজ । সারা রাত খুঁজে হারানিধি পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি বড় বাড়ীর বাবুরাই সেই ভাবে নারী সংগ্রহ করে কোথায় লুকিয়ে রাখেন।

কাননের মুখে বৃত্তান্ত শুনে আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠল । গেলুম আমরা সোনালীর বাপের কাছে। লোকটি পাঠশালার পণ্ডিতমশাই । গরিব লোক । এমন ভীতু যে পুলিশেও খবর দেবে না, আদালতেও যাবে না, পঞ্চায়েৎও ডাকবে না। পাছে জানাজানি হয়ে যায় । ও মেয়ের তো বিয়ে হবেই না, পাছে ওর ছোট বোনদেরও বিয়ে না হয় । আর সমাজটিও এমন যে পরিবারশুদ্ধ সবাইকে পতিত করবে । আর রায় বাহাদুর যদি শুনতে পান যে তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হলে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করতে কতক্ষণ ! মহাজনও তিনি, জমিদারও তিনি, উকীল মোক্তারের পৃষ্ঠপোষকও তিনি, উচ্চতর কর্মচারীদের চাঁদার ভাণ্ডারীও তিনি, নিম্নতর কর্মচারীদের বকশিষের কাণ্ডারীও তিনি । জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ !

প্রভাত একজন ঝানু ডিটেকটিভের মতো শহরের অন্ধিসন্ধি ঘুরে রাত্রে এক

গাড়োয়ানের কাছে সন্ধান পেলো যে বাবুদের বাগানবাড়ীতে উক্ত রাত্রে একটি অল্পবয়সী মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । মেয়েটি খুব কাঁদছিল । প্রভাত ওই লোকটিকে গাড়ীতে করে শহরের দু'মাইল দূরে সেই বাগানবাড়ীতে যায় ও মালীদের সঙ্গে ভাব করে । ধর্মাধর্মজ্ঞান তাদেরও ছিল । অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে মালীদের একজনের সঙ্গে প্রভাত বাগানবাড়ীর বারান্দায় ওঠে । কাঁচের জানালা দিয়ে সোনালীকে দেখতে পায় । সে কাঁদছে, কেঁদে মিনতি করছে, 'আমাকে ছেড়ে দিন, বড় দাদাবাবু । আপনার পায়ে পড়ি, মেজ দাদাবাবু ।' তা নিয়ে হাসাহাসি পড়েছে ইয়ারবকশী মহলে । আরো কয়েকটি স্ত্রীলোক রয়েছে সেখানে । তারাও হাসছে ।

থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে দেখা করল প্রভাত । দারোগা বলল, 'বাপ কাকা যদি না আসে, নিকট আত্মীয় যদি না আসে, তা হলে কার কথায় আমরা কেস রুজু করব ? বাইরের লোকের কথায় ? তোমার মতলব কী হে ছোকরা ? কবে থেকে এমন সাধুপুরুষ বনলে ? ওরা ভোগ করছে, তোমায় ভাগ দিচ্ছে না, এই তো তোমার প্রাণের কথা!' তখন প্রভাত চলল উকীলের কাছে । ইনি একজন ত্যাগী ব্যক্তি । টাকার খাঁই নেই । বললেন, 'যাদের সঙ্গে ঝগড়া তারা লাখ টাকা খরচ করবে, বার-এর সেরা মাথাগুলো কিনে নেবে, সাক্ষী ভাঙিয়ে নেবে, ঘুষ দিয়ে লাল করে দেবে পুলিশকে । প্রথম তাস আমার হাতে, কিন্তু হাতের পাঁচ ওদের হাতে। সোনালীকে দিয়েই ওরা বলিয়ে নেবে যে, সে কাউকেই সনাক্ত করতে পারবে না, কেউ তার আগে থেকে চেনা নয় ।'

তখন প্রভাত চলল নেতাদের সকাশে । সঙ্গে আমরাও ছিলুম । তাঁরা কী বললেন শুনবেন ? 'শয়তানী সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করার পর তার থানায় বা আদালতে যাওয়া দেশদ্রোহ । পঞ্চায়েৎ ডাকলে অপর পক্ষ আসবে না, সোনালীকে হাজির করবে না । দাঁড়াও, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হতে যাচ্ছে। ভারত উদ্ধার হলে তখন কি আর সোনালী উদ্ধার হবে না ! গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে শুভদিনটিকে এগিয়ে দাও তোমরা । সোনালী অপেক্ষা করতে পারে, স্ববাজ পারে না ।' আমরা হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু প্রভাত ছাড়বে না। সে চলল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলায় । সঙ্গে হৈম । ওর ইংরেজীর উচ্চারণ সাহেবদের মতো । সাহেব বললেন, 'আমি আপনাদের উক্তির উপর নির্ভর করে সার্চ ওয়ারেণ্ট ইসু করছি । আপনারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন । অসহযোগ করেই তো দেশটা গেল। আশা করি আপনাদের বোনটিকে আপনারা আজকেই ফিরে পাবেন ।'

সাহেবের হুকুম । পুলিশের লোক তৎক্ষণাৎ রওনা হলো । কিন্তু সোজা রাস্তায় গেল না । বাবুদের প্রকারান্তরে জানিয়ে রাখল যে তাদের পৌঁছতে যেটুকু দেরি হবে সেইটুকুই সোনালীকে সরাবার পক্ষে যথেষ্ট সময় । হলোও তাই । রিপোর্ট গেল যে বাগানবাড়ী যাকে বলা হয়েছে সেটা তপোবন । সেখানে একটিও স্ত্রীলোক

নেই। সোনালী নামে কোনো মেয়েকে দেখিয়ে দিতে পারেনি প্রভাত বা হৈম। ওদিকে রায় বাহাদুর সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে মোলাকাৎ করে বললেন, 'আমি সদাচারী হিন্দু। আমার ওটা ভজন কুটির। ওখানে স্ত্রীলোক আসবে কোন সূত্রে? পুলিশ ওখানে হানা দেওয়ায় আমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক লেগেছে। ওটা কংগ্রেসের কারসাজি। প্রভাত হৈম কংগ্রেসের এজেন্ট। প্রভাত তো জেলও খেটেছে। এ প্রাণ আমি রাখব না, সার। একে তো আমি রায় বাহাদুর বলে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে। ওই সার্চ ওয়ারেন্ট ওরা কোন দিন পত্রিকায় ছাপাবে। তখন কি আমি—' এই বলে রায় বাহাদুর ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

সার্চ ওয়ারেন্ট রদ হলো। সাহেব প্রভাতকে হৈমকে দর্শন দিলেন না। তাঁর কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। কোনো দিকে কোনো প্রতিকার না পেয়ে, প্রতিকারের আশা না দেখে আমরা নিবৃত্ত হলুম। প্রভাত বলে, ওটা পরাজয়। আমি বলি, বিফলতা। সোনালীর জন্যে হাতে কলমে কিছু করতে পারা গেল না বলে তখন থেকেই আমার মনে একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। এটা সব সময় খচখচ করে না। কিন্তু যখন করে তখন বড় ব্যথা দেয়। তখন বার বার জপ করি, Force shall not win. কেবল সোনালীর বেলা নয়, যে-কোনো মেয়ের বেলা। আমি হচ্ছি স্বভাবত knight। আমার ব্রত হলো lady বিপদে পড়লে তাঁকে বিপন্মুক্ত করা। কিন্তু সাধ্যে যদি না কুলোয়, সাধনায় যদি বাধে তা হলে আমি করি কী! ইতি।

আপনার রত্নভাই

চিঠিখানা ডাকে দেবার আগে প্রভাতকে একবার দেখতে দিল রত্ন। প্রভাত বলল, 'লিখেছ ভালোই, কিন্তু 'আমি অক্ষম' বা 'আমি পরাজিত' এই কথা ক'টি এড়াতে গিয়ে এ যা করেছ এ তো একপ্রকার ইঙ্গিত যে সোনালী যদি তোমাকে ভালোবাসে তা হলে তাকে তুমি বিয়ে করতে রাজী। অবশ্য আরো একটা যদি আছে। যদি তুমিও তাকে ভালোবাস। কিন্তু কার্যকালে দেখবে একটি প্রেমে-পড়া অবলাকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ নয়। তার প্রেম যদি সত্য হয় তোমাকে চুম্বকের মতো টানবে। তুমি ভালো না বাসলেও সে তোমাকে ভালোবাসবে। ভালোবাসিয়ে ছাড়বে। তখন বুঝবে বিয়ে না করাটাই কাপুরুষতা। তখনি শুরু হবে তোমার অনুশোচনা। বিয়ে করলেও পশতাবে। না করলেও পশতাবে। আর যদি বিয়ে করে বিয়ে ভেঙে দাও সেটা হবে কাপুরুষতার চূড়ান্ত। অমানুষতা।'

রত্ন ভেবে বলল, 'তা নয়। প্রশ্নটা এই রকম। একটি অনিচ্ছুক নারীর উপর জোর খাটানো হয়েছে। যারা খাটিয়েছে তারাই জিতবে? সে হারবে? এ কখনো হতে পারে? হওয়া উচিত কখনো? আমরা যারা একালের নাইট তারা আছি কী করতে? না। হারতে দেওয়া হবে না সোনালীকে। তার মনোবল যাতে অটুট থাকে সে জন্যে বিয়ের পথ খোলা আছে বলতে হবে। খোলা রাখতে হবে। কোনো দিন কোনো অবস্থায়

তাকে আমি বিয়ে করব না, কেন একথা বলতে যাব ? যা অভাবিত তাও সময় সময় ঘটে । আমি শুধু লক্ষ রাখব যে আমার প্রেমের মান উচ্চ আছে । সোনালীর খাতিরে না, মালাদির খাতিরে না, দুনিয়ায় কারো খাতিরে আমি আমার প্রেমের মান খাটো করব না । তেমনি আমার স্বাধীনতার মান । স্বাধীন ও সপ্রেম থেকে যদি নাইট হতে পারি তবে অনুশোচনার কী আছে !'

প্রভাত বলল, 'বুঝেছি । কিন্তু জোর কি ওই একটি মেয়ের উপরেই খাটানো হয়েছে ? জোর কি রানুর উপরে খাটানো হয়নি ? অং বং দুটো সংস্কৃত মন্ত্র আওড়ালেই কি সেটা ধর্মাচরণে পরিণত হয় ? কিন্তু তার তুমি কী করছ, বল ? কী করতে পারো ? নাইট যদি হয়ে থাকি আমরা তো কই আমাদের ঢাল তলোয়ার ? ওহে নিধিরাম, তিন বছর আগে সাত ঘাটের জল খেয়েও কি তোমার শিক্ষা হয়নি ? কবে হবে ? আমার কথা যদি বল, আমি আর ওই ইসুতে লড়তে যাচ্ছিনে । সোনালীর যা হয় হবে। রানুর যা হয় হবে । আমি কাউকে আশাও দেব না, কারো আশাভঙ্গও ঘটাব না । তোমাকেও বলে রাখছি, এখন থেকে তোমার যুদ্ধ তোমার । তুমি লড়বে, আমি পড়ব ।'

আক্ষরিক অর্থে না হলেও প্রভাত সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল । বাইরে দাঁড়িয়ে দুটি অভাগিনী নারী । একটি সমাজবিরুদ্ধ ভাবে ধর্ষিতা । একটি সমাজসম্মত ভাবে ।

'আচ্ছা ।' বলে রত্ন প্রভাতের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । চিঠিখানা দিয়ে এলো ডাকে । কাটকুট করল না । স্বীকার করল না যে সে পরাজিত বা অক্ষম । তার দরজা খোলা রইল সব অপমানিতা নারীর জন্যে । কেউ বা সোনালীর মতো । কেউ বা রানুর মতো । সে নাইট । তা বলে সে তার প্রেমের মান বা তার স্বাধীনতার মান খর্ব করবে না ।

শ্রীমতীর চিঠি পাওয়ার পর থেকে শ্রীমতীকে চিঠি লিখে ডাকে দেওয়া পর্যন্ত এই ক'দিন রত্ন অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পায়নি । উত্তেজনা প্রশমিত হলে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল যে আকস্মিক ব্যাঘাতে কী যেন একটা সুর হারিয়ে গেছে । কথা হারিয়ে গেলে কথা মনে পড়ে । সুর হারিয়ে গেলে সুর ফিরে পাওয়া কঠিন । তাকে বিমূঢ় করল এ ক্ষতি ।

প্রভাত যেমন তার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি তেমনি নতুন বন্ধুদের মধ্যে । ঢেউ খেলানো বড় বড় চুল, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গোলগাল মানুষটি দিনরাত কাব্যচর্চায় বিভোর । তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যেত অল্পবয়সী আরেক জনকে । তার নাম অঞ্জন । স্বপ্নবিলাসী কবিপ্রকৃতির । এরা আর এদের মণ্ডলী রত্নকেই মধ্যমণি রূপে বরণ করেছিল । যাকে বলে বন্ধু দার্শনিক ও দিশারী । এদের আলাপ আলোচনা পার্থিব লাভালাভের নয়, সমাজ ভাঙাগড়ার নয়, দুর্বলকে রক্ষা করার নয় । এরা অমৃত আস্বাদন করে পরস্পরকে ভাগ দেয় । কে কী নতুন বই পড়েছে, নতুন ভাব আবিষ্কার করেছে, নতুন রস আহরণ করেছে, নতুন প্রেরণা পেয়েছে জানায় ও জানে । রত্ন এদের নিয়ে গঙ্গার ধারে আড্ডা দেয় । বৃষ্টি পড়লে বিদ্যাপতির ঘরে । প্রভাত যোগ দেয় না । উপহাস করে ।

এটা জীবন থেকে পলায়ন নয় । এটাও জীবন । একে উপেক্ষা করে কেবল আঘাত সংঘাত নিয়ে মত্ত থাকলে সেই মত্ততার ফাঁক দিয়ে এমন কিছু হারিয়ে যায় যার জন্যে পরে আফসোস করতে হয় । জগতে মন্দ থাকবে, তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকবে, এই যদি হয় শেষ কথা তা হলে সৌন্দর্য হবে প্রথম ক্যাজুয়ালটি । সত্যও কি ক্যাজুয়ালটি হবে না ? দ্বন্দ্বসর্বস্ব মন সত্য আর সৌন্দর্য উভয়কেই অবহেলা করবে, উপবাসে রাখবে ।

শ্রীমতীর উপর রত্ন মনে মনে বিরক্ত হয়ে রয়েছিল । বেশ তো ছিল সে তার নতুন বন্ধুদের নিয়ে । কেন তাকে পুরোনো মণ্ডলীর কার্যকলাপ আবার উজ্জীবিত করতে বলা ! সোনালীর প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেওয়া কেন ! 'অক্ষম' কি না প্রমাণ করতে চ্যালেঞ্জ করা কেন !

হারানো সুর খুঁজে পাওয়া যায় না । মন বিরস হয়ে যায় । অপরিচিতার চিঠি পেয়ে দোলা যেটুকু লেগেছিল সেটুকু থেমে যায় ।

'রত্ন, তোমার কী হয়েছে ? অমন মন-মরা কেন ?' বিদ্যাপতি সুধায় ।

'কী যেন একটা সুর ছিল, হারিয়ে গেছে, মিলছে না ।'

'কী সুর ?'

'গানের সুর নয় । কবিতার সুর নয় । জীবনের সুর ।' রত্ন বোঝাতে পারে না ।

'কী করে হারাল ?'

'একখানা চিঠি পেয়ে ও তার জবাব দিতে গিয়ে ।'

'ও ! সেই খারাপ খবর ! শুনেছি ব্রিজনন্দনের কাছে ।' বিদ্যাপতি শোক ভেবে সমবেদনা জানাল । রত্ন তার ভ্রান্তিমোচন করল না । বিদ্যাপতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ প্রভাতের মতো নয় ।

সুরটা কেটে যাওয়ার অস্বস্তি কাউকে বোঝানো যায় না । রত্ন একাই ভোগে । সোনালীর জন্যে সত্যি কিছু করবার নেই, তবু মনে হয় কী যেন একটা করবার ছিল । শ্রীমতী হয়তো তাকে কাপুরুষ ভাববে, অচেনা অজানা বোনটির চোখে সে নেমে যাবে । তা বলে কি সে মার্গচ্যুত হবে ? চলতে পারবে না তার নিজের মার্গে ? তার জীবনের উপর তার নিজের ইচ্ছা খাটবে না ? খাটবে সোনালীর ইচ্ছা, শ্রীমতীর ইচ্ছা ?

সামান্য একখানা চিঠি । অমন তো কত আসে । কিন্তু সেই চিঠিখানা আসার আগে রত্নর জীবন যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল আসার পরে সে ধারায় নয় । ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে। রত্ন মানতে চায় না যে সামান্য একখানা চিঠির অত প্রভাব । কারো প্রভাব স্বীকার করা তার স্বভাব নয় । কোনো জিনিসের প্রভাব ।

সে আশা করতে থাকল যে শ্রীমতী আর চিঠি লিখবে না । কেন লিখবে ? কী দরকার ? তবে তার আশঙ্কা ছিল যে সোনালীর জন্যে দরজা খোলা আছে জানলে ও মেয়ে হয়তো তাকে রেহাই দেবে না । রেহাই পাবে প্রভাত । প্রভাতের দরজা বন্ধ ।

সিন্ধুপ্রদেশ থেকে একজন বিখ্যাত সুধী এসেছিলেন । বোধ হয় সুফী ভাবাপন্ন । বিদ্যাপতি, অঞ্জন, রত্ন এঁর রচনা অনেক দিন থেকে পড়ে আসছিল । অন্তরে সৌন্দর্য না থাকলে যা হয় তা নিছক বাক্যযোজনা । কিন্তু এঁর প্রত্যেকটি বাক্য সুন্দর । মানুষটি

সুন্দর কি না দেখতে তিনজনেরই কৌতূহল ছিল । চলল দেখতে ।

তাদেরই মতো বিশ পঁচিশজন শ্রোতা ও দর্শনার্থী তাঁর সামনে বসেছিল মাটিতে । তিনিও মাটিতে । সকলের অনুরোধে তিনি মৌনভঙ্গ করলেন । নীর ও ক্ষীর এক সঙ্গে মিশে রয়েছে । হংস জানে কোনটা ক্ষীর । শুধু সেইটুকু বেছে নেয় । এই যে নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে জানা এরই নাম জ্ঞান । এটি যাঁর আছে তিনিই জ্ঞানী । জ্ঞানীদের অপর নাম হংস । নীর হলো তথ্য । ক্ষীর হলো সত্য । এক রাশ তথ্য নিয়ে আমরা কী করব, যদি অন্তর্নিহিত সত্যটুকু চিনতে না পারি, বেছে নিতে না পারি ? ডিগ্রী পাব, ডিগ্রী ভাঙিয়ে চাকরি পাব, চাকরি ভাঙিয়ে নিরাপদ জীবনযাত্রা পাব এই যাদের ভাবনা সিদ্ধিও তাদের তাদৃশ । কিন্তু সত্য অত সহজে ধরা দেয় না । জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মনে হয় জীবনটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে । কী নিয়ে প্রয়াণ করবে !

ফেরবার পথে রত্ন বলল, 'কই দেখতে তো তেমন সুন্দর নন !'

বিদ্যাপতি বলল, 'রীতিমতো কদাকার ।'

অঞ্জন বলল, 'তোমরা নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে জান না । তোমরা হংস নও । নইলে লক্ষ করতে তাঁর চোখ দুটি মাঝে মাঝে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে । তখন চোখের ঝরোকা দিয়ে সৌন্দর্য আভাসিত হয় ।'

এ কথা শুনে বিদ্যাপতি বলল, 'তা বটে ।' কিন্তু রত্ন সহসা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল । তার স্মরণ হলো শ্রীমতীর চোখে প্রভাত কী লক্ষ করেছিল । প্রভাতের সাক্ষ্য যদি সত্য হয় তবে শ্রীমতীর চোখের ঝরোকা দিয়ে কিসের আভাস পাওয়া যায় ?

'কি হে, রত্নহংস ! কী ভাবছ ?' জানতে চাইল বিদ্যাপতি ।

'কিচ্ছু না ।'

'বুঝতে পারছি তুমি নিরাশ হয়েছ ।' অঞ্জন বলল, 'তা কী করবে, বল ! 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো।' রবীন্দ্রনাথ তো তোমার জন্যেই লিখেছেন।'

'তা নয় । আমি ভাবছিলুম অন্য কথা ।' কিন্তু কী কথা সে খুলে বলল না । তার বদলে বলল, 'জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমারও কি মনে হবে যে জীবনটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে?'

'তাই তো । তুমি তা হলে কী নিয়ে প্রয়াণ করবে !' পরিহাস করল অঞ্জন । বয়সে নাবালক, বালকের মতো চেহারা, কিন্তু বাক্যবাণে দুর্জয় ।

বিদ্যাপতিও হাস্য পরিহাসে যোগ দিল । কিন্তু রত্ন সত্যি সত্যি ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে না জানলে জীবনটাই অনাস্বাদিত থেকে যাবে । অবশ্য এটা তার কাছে নতুন কথা নয় । জীবনের পক্ষে কী essential, কী নয়, এ নিয়ে তার নিভৃত চিন্তা বহুকালের । কিন্তু তার চিন্তাপদ্ধতি জ্ঞানীর মতো নয় । শিল্পীর মতো । রসিকের মতো ।

স্বাধীনতা এসেনসিয়াল । এ না হলে বাঁচতে ইচ্ছা করে না । বাঁচলে এর জন্যেই বাঁচা । কিন্তু এই সব নয় । প্রেম চাই । ভালোবাসব । ভালোবাসা পাব । সব মানুষকে ভালোবাসব । সব মানুষের ভালোবাসা পাব । সব প্রাণীকে ভালোবাসব । সব প্রাণীর

ভালোবাসা পাব। সব সংহত হবে একটিতে। সে আমার প্রিয় নারী। সবাই থাকবে তার মধ্যে। তাকে ভালোবাসলেই সবাইকে ভালোবাসা যায়। তার ভালোবাসা পেলেই সকলের ভালোবাসা মেলে। স্বয়ং ভগবান প্রিয়ারূপে আসেন। প্রিয়ারে দেবতা করি, দেবতারে প্রিয়া।

তার পর সৃষ্টি করাও এসেনসিয়াল। এবং প্রয়োজন হলে বিনাশ।

চার

রত্ন সেদিন হস্টেলে ফিরে গিয়ে দেখল তার নামে চিঠি এসেছে বিকালের ডাকে। আবার সেই মেয়েলি হাতের। এবার তার অচেনা নয়। সে তেমন প্রসন্ন হলো না। ঠেলে সরিয়ে রাখল চিঠিখানা। চা তৈরি করতে স্টোভ ধরাল।

কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি তাকে সমস্তক্ষণ টানছিল। টানছিল সুগন্ধ দিয়ে, সুরূপ দিয়ে। টানছিল চুম্বকের মতো। না খুলে তার গতি ছিল না ওই খাম। পড়ল—

প্রিয় রত্নভাই

আপনার করুণা অপার। আমার চিঠির উত্তরে যা লিখেছেন তা আমার পক্ষে পরম গৌরবের। কিন্তু আমি তো আমার জন্যে কিছু চাইনি, চেয়েছি সোনালীর জন্যে। অভাগীকে আপনি কী দিলেন? একটি ভালো মেয়ে, ভালো ঘরের মেয়ে বিনা দোষে পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন গভীর থেকে গভীরতরে। আপনি তো উপদেশ দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন। পাঁকে নামবে কে? এ কি আমার কাজ? আমি যদি পুরুষ হয়ে জন্মে থাকতুম তা হলে কি আর কাউকে সাধতে যেতুম? কত লোককে সেধেছি, কেউ যদি পাঁকে নামতে রাজী হতো!

ভীষণ রাগ হলো আপনার উপর। প্রভাতদার উপর। পরে ভেবে দেখলুম আপনাদের অপরাধ কী? আপনারা তবু চেষ্টা করেছেন। আপনাদের উপর যদি ভীষণ রাগ করি তবে যারা নিশ্চেষ্ট তাদের উপর কী করব? ভীষণতর রাগ? আর যারা শয়তান? তাদের উপরে? মহিষমর্দনের সময় চণ্ডী যা করেছিলেন? জিঘাংসা? কিন্তু তাদের গায়ে আঁচড়টি দেয় কার সাধ্যি! একখানা চিঠি লিখেও যে ক্রোধ জানাতে পারি সে সাহস আমার নেই।

আমি অসহায়। সম্পূর্ণ অসহায়। আমাকেই কে বাঁচায় তার ঠিক নেই। আমি কাকে বাঁচাব! কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিন। তার আগে আপনাকে বলব রুপালীর গল্প। সেও আজ নয়! আজ আমার মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। কিন্তু শুনে আপনি হয়তো আবার পাশ কাটিয়ে যাবেন। আপনার দার্শনিকতায় আমি আবার অভিভূত হব। তার পর দেখব সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। জলে নামবে না কেউ। নিমজ্জমানকে কূলে বসে উপদেশ দেবে। তা সত্ত্বেও

শোনাব একদিন আপনাকে । আর কিছু না হোক চমৎকার একখানা চিঠি পাব আপনার। আমার পত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত হবে একটি রত্ন ।

আমার ক্রমে প্রত্যয় হচ্ছে প্রেমই এর একমাত্র সমাধান । একজন প্রবল পুরুষের প্রবল প্রেম ভিন্ন সোনালীকে পাঁক থেকে তোলার আর কোনো কার্যকর উপায় নেই । সাধারণ পুরুষের সাধারণ করুণা দিয়ে এসব সমস্যার সমাধান হবে না । কিন্তু কোথায় সেই প্রবল পুরুষ ! কোথায়ই বা তার প্রবল প্রেম ! এই নিরস্তপাদপ দেশে যাদের দেখি তারা কাপুরুষ কিংবা শিখণ্ডী । আর তাদের প্রেম ? ঘেন্না ধরে গেছে তার উপর । প্রেম না শেম !

ললিতের মুখে যা শুনেছিলুম তার কতক সত্য । আপনি অনন্য । আপনার সঙ্গে চেনা হলো । আপনাকে ভালো লাগল এইটুকুই যা লাভ । কিন্তু মাছ আমাকে ছাড়তেই হলো । পরশু আপনার উত্তর পেয়ে আমার মৎস্যবাসনা লোপ পেয়েছে। আর খাইনি । সোনালীর জন্যে যদি কোনো দিন কিছু করে উঠতে পারি তা হলে আবার খাব । আমার শ্রদ্ধা জানবেন । ইতি ।

আপনার শ্রীমতীবোন

শ্রীমতীর দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে রত্ন আগের মতো বিমূঢ় হলো না, কিন্তু বেদনা বোধ করল তেমনি বা তার চেয়েও বেশী । এই মেয়েটি কে তা সে জানে না । কার কন্যা কার স্ত্রী কাদের আত্মীয়া প্রভাত তাকে বলেনি । যেই হোক, আর-একটি মেয়ের জন্যে কেউ কিছু করছে না দেখে মনের দুঃখে অশন ত্যাগ করেছে । আংশিক ভাবে অবশ্য ।

শুধু বেদনা নয়, অপমানও বোধ করল রত্ন । সে প্রবল পুরুষ নয়, সাধারণ পুরুষ । এই নিরস্তপাদপ দেশে সেও একটি কাপুরুষ কিংবা শিখণ্ডী । তবে সে অনন্য । এইটুকুই যা লাভ । কাটা ঘায়ে এইটুকুই মলম । অনন্য হয়ে কোন সুখ, যদি কাপুরুষ বা শিখণ্ডী বা সাধারণ পুরুষ হলো ! তার ভালোবাসার সম্ভাবনা হলো সাধারণ করুণা ! প্রেম না শেম !

স্বীকার না করলে কী হবে, তার মনের অগোচরে সেও দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল । পরাজিত বা অক্ষম বলে নয়, হৃদয়হীন বলে তো নয়ই, জড়িয়ে পড়তে চায় না বলেই : আর মাস ছয়েক পরে তার বি-এ ফাইনাল । পরীক্ষার পরের দিনই সে বেরিয়ে পড়তে চায় বিশাল জগতে, যে জগত বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগরের দ্বারা পরিমিত নয় । নারী যদি বোঝা না হতো একসঙ্গে চলা আনন্দেব হতো । সোনালীকে কাঁধে করে বয়ে বেড়ানোর নাম কি পথে বেরিয়ে পড়া !

তার পথে বেরিয়ে পড়া নিছক পথের প্রেমে নয় । একটা সুরের অন্বেষণে । যেমন রাধা বাহির হয়েছিলেন বাঁশির সুর শুনে । রত্নর জীবনে এ সুর এখনো স্পষ্ট হয়নি । এ যে কিসের সুর, কোন্‌খান থেকে আসছে, তাও অস্পষ্ট । তবু কিছুদিন থেকে সে বুঝতে পারছে এ সুর তাকে ঘরে থাকতে দেবে না । তাকে দেশের বা সমাজের কাজ করতে দেবে না । তাকে ডাক দেবে বাইরে ও অকাজে । এমন মানুষকে যদি কেউ

প্রবল পুরুষ না বলে সাধারণ পুরুষ বলে তবে চুপ করে সয়ে যাওয়াই ভালো ।

সেদিন খেতে বসে সে বাবাজীকে বলল তার পাতে মাছ না দিতে। এখন থেকে সে মছলি খাবে না । বাবাজী তো মহা খুশি । রতনবাবু হিন্দুস্থানী বন জায়েঙ্গে ।

কথাটা প্রভাতের কানে গেল । সে বিকেলের দিকে রত্নর ঘরে গিয়ে জানতে চাইল ব্যাপার কী ! হঠাৎ মাছে অরুচি কেন ! রত্ন তখন শ্রীমতীর চিঠিখানা বন্ধুর হাতে দিল । উচ্চবাচ্য করল না ।

হা হা হো হো । প্রভাত অট্টহাসি হাসল । 'বেড়াল বলছে, মাছ ছেড়ে দিয়েছি । কে বিশ্বাস করবে এ কথা ! বরং বেড়াল ছাড়লেও ছাড়তে পারে মাছ, কিন্তু হিন্দুর ঘরের সধবা মাছ ছাড়বে আর আমি এ কথা বিশ্বাস করব এত বড় আহাম্মক আমি নই । সেদিন এক বুড়ী এক পয়সার শাকের দাম দু'পয়সা শুনে হাটের মাঝখানে বলেছিল, ক্যা বংগালী সমঝা ! তেমনি আমিও বলতে চাই শ্রীমতীকে, আমাগো কি বাঙ্গাল সমঝেসেন !'

রত্ন হাসছে না, রাগছে, দেখে প্রভাতের আক্কেল হলো যে সে প্রকারান্তরে উক্ত মহিলাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'আহা ! আমি কি জানিনে যে ও সত্যনিষ্ঠ ! ওর মতো ত্যাগ ক'জন করেছে ! আমার বক্তব্য শুধু এই যে, হিন্দুর ঘরের বিধবা যা পারে সধবা তা পারে না । মাছ খাওয়া হলো এয়োতির লক্ষণ । মৎস্যবর্জন কি মুখের কথা ! আমার মতে অসম্ভব ।'

'কিসে অতটা নিশ্চিত হলে ?' রত্ন বলল কঠোর স্বরে । 'হিন্দুর ঘরের সধবা কি সব অলঙ্কার খুলে দেয় ? সোনাবাঁধানো শাঁখা ভিন্ন আর কিছু পরে না !'

'ছিল । নোয়া ছিল ।' প্রভাত স্মরণ করে বলল, 'তবে তাই যথেষ্ট নয় । বেগমপুরের ছোট তরফের আয় যদিও শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে তবু মরা হাতী লাখ টাকা । বাড়িতে ভাঙন ধরেছে। শরিকরা প্রায় সবাই চলে গেছে সদরে বা কলকাতায় । পাঁচিল ধ্বসে পড়েছে, কাঠের ভিনিসিয়ান খসে পড়েছে, ইটের পাঁজর গোণা যায়, অশত্থ গাছ উঠেছে পাঁজর ভেদ করে । তবু ছোট তরফ ওখান থেকে নড়বেন না । যখের ধন আগলাবেন । শোনা যায় সিন্দুকভরা মোহর । সব বাদশাহী আমলের । ওরা খানদানী রাজপুত বংশ । বাংলাদেশে এসেছিল শাহ্ সুজার সঙ্গে । তার পর থেকে বেমালুম বাঙালী বনে গেছে । মাছে ভাতে বাঙালী ।'

হস্টেলে উঠে আসার আগে রত্ন ও প্রভাত যে মেসে থাকত সেখানে রমেনদা বলে একজন আইনের ছাত্রও থাকতেন । মিষ্টভাষী স্নেহশীল প্রকৃতির যুবক । কনিষ্ঠদের সমীহ করেন সমবয়সীদের মতোই । চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আইন পড়ছেন, কিন্তু উকীল হিসাবে সফল হবেন বলে মনে হয় না । দয়ার শরীর । কোনো রকম প্রতিযোগিতার ভাব নেই স্বভাবে । সবাই তাঁকে ঠেলে এগিয়ে যায় । তিনি পড়ে থাকেন পিছনে । খেতে বসেন সকলের শেষে । যে দিন যা বেঁচে থাকে ।

প্রভাত বলল, 'চল, রমেনদার পরামর্শ নেওয়া যাক । সোনালীর জন্যে কী আমরা করতে পারি যার ফলে শ্রীমতীর মুখে মাছ রুচবে । রত্নর মুখেও ।'

কতকাল পরে দেখা। রমেনদার চোখ সজল হয়ে উঠল। তিনি তাদের দু'জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে আপনার দু'পাশে বসালেন। কাঁধে হাত রাখলেন। কুশলপ্রশ্নের পর পড়াশুনার খোঁজখবর। তার মাঝখানে প্রভাত গলা খাটো করে বলল, 'রমেনদা, আপনার সঙ্গে একটা গোপনীয় পরামর্শ ছিল।'

সোনালীর উপাখ্যান গোড়া থেকে শুনে রমেনদা বললেন, 'না। সোজা রাস্তা নেই। তবে রাস্তা যে একেবারেই নেই তা নয়। সোনালী যদি বোষ্টমী হয়ে কোনো বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করত তা হলে আর কোথাও না হোক বৃন্দাবনে ওদের ঠাঁই হতো। হিন্দু সমাজের সদর দরজায় কড়া পাহারা, কিন্তু খিড়কি দিয়ে হাতী ঘোড়া পার হয়। কাশী বৃন্দাবন আমরা সৃষ্টি করেছি কেন? সোনালীদের জন্যেই। সেখানে ওরা হাফ গেরস্ত। ওদের ছেলেমেয়েরা এক পুরুষ বাদে ফুল গেরস্ত। হিন্দু সমাজের সমস্তটাই মনুশাসিত নয় হে। কতক অংশ মনুষ্যশাসিত। নইলে ও সমাজ অত দিন টিকত না।'

প্রভাত হাঁফ ছেড়ে বলল, 'বাঁচা গেল। এখন প্রথম কাজ একটি বোষ্টম জোটানো। দ্বিতীয় কাজ কণ্ঠীবদল ঘটানো। রমেনদা, আপনার সন্ধানে কোনো বৈরাগী আছে।'

রত্ন অনুযোগ করল, 'কিন্তু যার উপর অন্যায় করা হয়েছে সে কেন চোরের মতো খিড়কি দিয়ে ঢুকবে? সমাজকেই সদর দরজা খুলে দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ করতে হবে। কণ্ঠীবদল নয়, রীতিমতো বিবাহ। ঐ হাফ গেরস্ত কথাটা ভালো নয়।'

'কেন? কণ্ঠীবদলটা এমন কী মন্দ? তুমিই তো বলে থাক বিয়ে সম্ভব না হলে একসঙ্গে থাকাও ভালো। সেও তো হাফ গেরস্তালি।' প্রভাত রত্নকে কাহিল করল।

রমেনদা বললেন, 'বৈরাগী জুটে যাবে। তবে সোনালী হয়তো ওর সঙ্গে বিয়ে বসবে না। সম্পদের স্বাদ পেয়েছে। সুন্দরী যখন, তখন ও বিনা মূল্যে বিকোবে না। পতিতা যতদিন হয়নি ততদিন ভয়ডর ছিল। একবার পড়লে পরে তখন ভয়ডর ভেঙে যায়। সোনালী কি আর সেই সোনালী আছে!'

ঘুরে ফিরে আবার সেই একই প্রাচীরে পৌঁছনো গেল। কিছুই করবার নেই।

হস্টেলে ফিরে প্রভাত বলল করুণ স্বরে, 'রতন, শ্রীমতীবোনকে লিখো আজকের কথাবার্তার বিবরণ। ও কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে? তুমি মাছ ছাড়লে কি আমি মাছ খাব ভেবেছ? খাদ্য ত্যাগ করা প্রকৃতির অনুমোদিত নয়। এর সাজা আছে।'

রত্ন আবেগভরে বলল, 'আমি পরাজয় মানব না। শ্রীমতীবোনকেও পরাজয় মানতে দেব না। ত্যাগ বলতে এই বোঝায় যে আমরা অপরাজিত। কিন্তু তুমি কেন ত্যাগ করবে? তুমি তো পরাজয় মেনে নিয়েছ।'

শ্রীমতীকে চিঠি লিখতে খুব যে উৎসাহ ছিল তা নয়। একে তো নতুন কোনো সমাধানের ইশারা দিতে পারছে না। তার উপর শ্রীমতীকে ভিতরে ভিতরে তার ভয়। ভয় দুই কারণে। শ্রীমতীর চোখে প্যাশন। শ্রীমতী শাস্ত্রকারদের হস্তিনী।

অপর পক্ষে হস্টেলের ঐ নারীবর্জিত জীবনে দূর থেকে যেটুকু রমণীয় পরশ

আপনা হতে মিলে যায় তার জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হয় । তাকে অবহেলা করতে নেই । মালাদি তো চিঠি লেখেন না । আর কেই বা লিখছে পারিবারিক মণ্ডলের বাইরে ! তা ছাড়া রত্নর কপালে এ রকম কত বার ঘটেছে যে, সে অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছে । তাকে বিশ্বাস করে তারা এমন সব কথা বলেছে যা মেয়েরা মেয়েদেরই বলে, পুরুষদের বলে না । এই যে শ্রীমতী রূপালীর কাহিনী বলতে চেয়েছে এটা হয়তো সে আর কোনো পুরুষকে বলেনি । এসব মেয়েলি গল্প শুনতে তার নিজেরও ভালো লাগে । মেয়েদের প্রতি তার যেন একটা নাড়ীর টান আছে । সেও কতকটা মেয়েলি । তার নাম রত্ন, তা সত্ত্বেও অনেকে তাকে রত্না বলে ডাকে ।

লিখবে কি লিখবে না করতে করতে দিন কয়েক কাটল । যুক্তি দু'দিকেই সমান । লিখলে সুর কেটে যায় । না লিখলেও তাই । শেষে স্থির করে ফেলল লিখবে । সোনালীকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখা যাক সে বোষ্টম পেলে বোষ্টমী হয়ে মালাচন্দন করতে রাজী কি না । কে জানে হয়তো সে হাতে স্বর্গ পাবে । তার পর বৃন্দাবন, নতুন জীবন । দূর থেকে সাহায্য করবে শ্রীমতী, শ্রীমতীর মণ্ডলী, রত্ন, রত্নর মণ্ডলী । যার যেটুকু সাধ্য ।

রত্ন শ্রীমতীকে এবার যে চিঠি লিখল তার গোড়ার দিকে ছিল রমেনদার পরামর্শ । শেষের দিকে তার নিজের মতবাদ ।

স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনা নারীর স্বাধীন ভাবে হয়েছে যে প্রেম তারই উপসংহার বিবাহ, যদি সম্ভব হয় । উপসংহারকে আমি উপক্রমণিকা করার পক্ষে নই । তাতে প্রেম এবং স্বাধীনতা উভয়েরই অমর্যাদা হয় । কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি আমার মতবাদ জাহির করব না, রমেনদার খাতিরে সরে দাঁড়াব । সোনালীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে । সে যদি রমেনদার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করে তা হলে আমিও সুখী হব । কেননা এই সমস্যার সমাধান না হলে আপনি হিন্দুর ঘরের সধবা হয়েও মৎস্যগ্রহণ করবেন না এটা আমার পক্ষেও সুখের কথা নয় । নয় বলেই আমিও মৎস্য-অনশন আরম্ভ করেছি ।

দেখতে দেখতে শ্রীমতীর চিঠি এলো ফিরতি ডাকে । তেমনি নীল রঙের খাম । তেমনি সুবাসিত । তেমনি মেয়েলি হাতের ঠিকানা । চিনতে দেরি হয় না । খুলতেও না ।

আমার প্রিয় রত্নভাই,

আপনার প্রীতির তুলনা কোথায় ! আর কে আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আহার ত্যাগ করেছে ! কিন্তু আপনাকে আমার মাথার দিব্যি, ওসব করতে যাবেন না । এ কী ছেলেমানুষী বলুন দেখি ! আমি যা করেছি তা ঝোঁকের মাথায় করিনি, অনেক দিন থেকে ভাবা ছিল যে এই কাজটি আমি করব, যদি ওই কাজটি আর কেউ না করে । শুধু সোনালীর সুরাহা হলে চলবে না । রূপালী বলে আর-একটি মেয়ে আছে তারও সুরাহা হওয়া চাই । কিন্তু আজ ও কথা নয় । আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ডাক ধরতে হবে, যাতে আপনি তাড়াতাড়ি এ চিঠি পান ও পত্রপাঠ

মৎস্য-অনশন ভঙ্গ করেন । এখানে টেলিগ্রাফ নেই, নয়তো জরুরি তার পাঠাতুম। উত্তর পাব তো ? সত্বর ।

রমেনদার পরামর্শ মন্দের ভালো । আমরা ভেবে দেখব । কিন্তু আপনার নিজের মতবাদ নিছক মন্দ । জ্যোতিদার মতবাদও অনেকটা ওই রকম । ওসব পাশ্চাত্য প্রতিধ্বনি এ দেশের উপযোগী নয় । আমাদের ঐতিহ্য অন্যরূপ । ভারত পরাধীন না হলে তার সমাজের এ দশা হতো না । এ দশা চির দিন থাকবে না। পরিবর্তন ঘটবেই । কিন্তু তার জন্যে চাই দেশের স্বাধীনতা । দেশকে স্বাধীন করবে কে ? গান্ধী ফেল । সি আর দাশ কাউনসিলে গিয়ে শেষ । বৃদ্ধদের দ্বারা কী আর হবে ! তরুণরাই ভরসা । রত্নভাই, আপনি কি ললিতের মতো যোগ দিতে পারেন না আমার মণ্ডলীতে ? প্রভাতদাও ? শুনেছি তিনি বেগমপুরে এসেছিলেন, আমাদের দালানেই বক্তৃতা করে গেছেন । আমার কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না কোন্ জন।

আজ তাহলে আসি । মনে থাকবে তো যা বলেছি ? ইতি ।

আপনারই শ্রীমতীবোন

এমন যে হবে তা তো প্রভাতের কাছে আগেই শোনা ছিল । আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না, তবু আশ্চর্য হলো রত্ন । শ্রীমতী কি এইজন্যেই তার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে ? সোনালীর ব্যাপারটা কি আলাপের ছল ? চিঠিখানা প্রভাতকে দেখাতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না । শ্রীমতী যেভাবে তাকে সম্বোধন করেছে, যেভাবে ইতি করেছে, প্রভাত দেখলে হো হো করে হাসবে । হয়তো ক্ষ্যাপাতে শুরু করবে ।

সে রাত্রে ভোজ ছিল । পূজার ছুটি আসন্ন । যে যার দেশে যাবে । তার আগে একটু আমোদ আহ্লাদ করতে চায় । খেতে খেতে প্রভাত বলল বাবাজীকে হিন্দীতে, 'রতনবাবুর পাতে মাছ দিচ্ছেন কেন ? ও মাছ আমার পাতে দিন । আমি দু'জনের মাছ খাব । ওকে দিন আমার আলুর দম ।'

বাবাজী মুচকি হাসল । রত্ন বলল, 'আমিই দিতে বলেছি ।'

প্রভাত বিদ্রূপ করল । 'লোভ সংবরণ করতে পারলে না বুঝি ?'

রত্ন সে বিদ্রূপ পরিপাক করল । কিন্তু ফাঁস করল না যে ওটা শ্রীমতীর মাথার দিব্যি । ভোজের পর কথা প্রসঙ্গে বলল, 'ভাই প্রভাত, শ্রীমতীর প্রস্তাব ওর মণ্ডলীতে আমরাও যোগ দিই ললিতের মতো । বৃদ্ধদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না । তরুণরাই ভরসা ।'

'আমি জানতুম ।' প্রভাত বলল এক গাল হেসে । 'ঝুলি থেকে বেড়াল এক দিন বেরোবেই । কিন্তু শ্রীমতী দেখছি আস্তে আস্তে খেলিয়ে খেলিয়ে ইঁদুর ধরতে জানে না । ওর দাদারা বোধ হয় ওকে ঠিকমতো তালিম দেননি । হয়তো দাদারাই ওকে তাড়া দিচ্ছেন ।'

'কিন্তু আমরা যে ওঁদের কথামতো কাজ করব এ নিশ্চয়তা ওঁরা কার কাছে পেলেন ?'

'তার জন্যে', প্রভাত বলল দোষীর মতো মুখ করে, 'আমিই বোধ হয় দায়ী । স্বরাজ পার্টির কর্মীদের সঙ্গে অত বেশী মাখামাখি না করলেও চলত । তখন কি ছাই জানতুম যে ওঁরা বর্ণচোরা আম ! তলে তলে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী । ওঁদের কাছে আইনসভা একটা আচ্ছাদন । আমার কাছে রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের একটা ধাপ ।'

এর পরে রত্ন শ্রীমতীকে লিখল যে সে আবার মাছ খেতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তার তাতে একটুও রুচি নেই । মাছ দেখলেই তার মনে পড়ে যে তার শ্রীমতীবোন আংশিক অনশনে । অমনি বিস্বাদ লাগে অশন । তার পর লিখল—

বিশুদ্ধ রাজনীতি আমার ভালো লাগে না । যাই হোক না কেন তার লক্ষ্য। স্বরাজ বা স্বাধীনতা বা খেলাফৎ বা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিকার । একদা আমাকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা রাজনীতির অন্তরালে নৈরাজ্যবাদ। যে মতবাদ রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে রাজশক্তিকে বাদ দিয়ে ভাবে । গান্ধীর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলুম আমার কল্পনার নৈরাজ্যবাদীকে। যাঁর সংগ্রাম কেবল পরদেশী রাজশক্তিকে হটাবার জন্যে নয়, তার সিংহাসনে সেই সব ক্ষমতার অধিকারী প্রজাশক্তিকে বসাবার জন্যে নয়। তিনি চান ভয়ের শাসনের পরিবর্তে প্রেমের শাসন । যে শাসনব্যবস্থায় সৈন্য লাগবে না, পুলিশ লাগবে না, আদালত লাগবে না, কারাগার লাগবে না । লাগবে না আইনসভা বা পার্লামেন্ট, উকীল বা কৌঁসুলি । তাঁর অসহযোগের প্রোগ্রাম এমন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে বিদেশী সরকার গেলে স্বদেশী সরকারকেও এর সম্মুখীন হতে হবে । তখন তার সরকারত্ব চলে যাবে, ফুটে বেরোবে মনুষ্যত্ব ।

তার পর সরকার বললে দৃশ্যত মনে হয় সরকারী আমলা ও ফৌজ । আড়াল থেকে যাদের অদৃশ্য হস্ত রশি টানে ও পুতুল নাচায় কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। তারা হলো বিদেশী ও স্বদেশী স্বার্থ । ধনিক, বণিক, ভূম্যধিকারী, মালিক । তাদের স্বার্থই যদি আড়ালে রয়ে গেল তা হলে আবার এলো সেই ভয়ের শাসন। সেইজন্যে প্রেমের শাসনের প্রতীক চরকা । সকলেই হাত লাগাবে, গতর খাটাবে, কেউ পরাসক্ত হবে না । এর থেকে আসবে শোষণবিরতি । শোষণহীন সমাজ ।

এত বড় একটা আদর্শ যাঁর তাঁর উপায়ও তো হবে আদর্শের সুরে বাঁধা । অহিংসা ভিন্ন আর কোন উপায়ে এসব হবে ? কিন্তু অহিংসা কি দেশের লোক মেনে নিয়েছে ? তা হলে কেন বলব গান্ধী ফেল ? বরং বলব দেশের লোক প্রস্তুত নয় । যখন প্রস্তুত হবে তখন দেখব গান্ধী পাশ ।

পূজার ছুটি এসে পড়ল । সবাই গোছগাছ করছে, রত্নও । বিকালে কলকাতার ট্রেন । সকালের ডাকে এলো শ্রীমতীর চিঠি । রত্নর হাতে সময় ছিল না । খামখানা পকেটে পুরল । তার পর দুপুরে খেতে বসে পকেট থেকে বার করে পরিবেশনের দেরি দেখে পড়তে শুরু করল । গান্ধীর বিরুদ্ধে লম্বা নালিশ । আসলে ওটা তাঁর সহকর্মীদের

বিরুদ্ধে। তাঁদের আদর্শবাদ নাকি একটা মুখোশ। কেউ কাউন্সিল কেউ জেলাবোর্ড কেউ মিউনিসিপালিটি যিনি যেখানে যা পাচ্ছেন হাত করছেন। বলছেন দেশের স্বার্থে, আসলে আপন স্বার্থে বা উপদলের স্বার্থে। জ্যোতিদার মতো নির্বোধ বেশী নেই। বোকারাই শুধু চরকা নিয়ে পড়ে আছে।

তার পর ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করেছে, 'আপনি যদি এমন অসাধারণ গান্ধীভক্ত তো তাঁর অনুগামী হন না কেন ? কলেজে পড়েন কী করতে ? জানেন না ওটা গোলামখানা ? দাস বানাবার কারখানা ওটা। সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি।'

চাবুকের মতো বাজল রত্নর পিঠে। এমন করে কেউ তাকে শাসন করেনি। গায়ের জ্বালায় জ্বলতে থাকল কিছুক্ষণ। খাওয়া সেরে বিদায় নিল বিদ্যাপতি, অঞ্জন প্রভৃতি বন্ধুদের কাছ থেকে। প্রভাত তার সহযাত্রী হবে কিউল তক। তার সঙ্গে এক্কায় উঠে বসল।

'কি হে ! কী অত পড়ছিলে ?' সুধাল প্রভাত। চোখে দুষ্টু হাসি।

'কিছু না। একখানা বাজে চিঠি।' রত্ন এড়িয়ে গেল।

ট্রেনে উঠে রত্ন সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক রইল। কী উত্তর দেবে এই প্রশ্নের ? যে মেয়ে গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়ে নিরাভরণ হলো তার মোহভঙ্গ হয়েছে। সে জানতে চায় রত্ন কেন কিছু ত্যাগ করেনি, কেন মোহ পোষণ করছে। কলকাতায় পৌঁছে দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে রত্ন এর একটা জবাব লিখল। জবাবদিহি।

কেন গান্ধীজীর অনুগামী হইনি ! কলেজে কেন পড়ি ? শ্রীমতীবোন, আপনার মতো আমিও নিজেকে প্রশ্ন করেছি। করেছি অনেক বার। এক এক বার এক এক উত্তর পেয়েছি। কাল থেকে আবার আত্মপরীক্ষা করছি। এবার যা মনে আসছে তাতে সব একাকার হয়ে গেছে।

গান্ধী যেখানে নৈরাজ্যবাদী আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে। চার বছরে এ মিল অমিলে পরিণত হয়নি। সেইজন্যে আমি এখনো খদ্দর পরি। এটা একটা প্রতীক। কিন্তু এই ক'বছরে তাঁর সঙ্গে আমার অমিল দিন দিন পরিষ্কার হচ্ছে। যেমন রাজনীতিকদের সঙ্গে। তার ফলে রাজনীতি থেকেই আমার মন উঠে গেছে। আমি খবরের কাগজ পড়িনে। শুনেছি তাতে আপনার নাম বেরোয়।

রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির বলপরীক্ষা অন্যান্য দেশেও ঘটে গেছে। এ দেশে এত কাল ঘটেনি। এই প্রথম ঘটছে। এই যে বলপরীক্ষা এটা গান্ধীনেতৃত্বে অহিংস রূপ নিয়েছে। এ শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, জগতের ইতিহাসে অপূর্ব। কিন্তু কী শুনছি ? শুনছি এটা নাকি ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের সংগ্রাম। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। তার মানে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিরোধ। তলিয়ে দেখলে এক প্রজাশক্তির সঙ্গে আরেক প্রজাশক্তির বিবাদ।

তার পর আরো এক পা এগিয়ে তাঁরা বলছেন এটা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব। পূর্ব হচ্ছে পূর্ব, পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম, কোনো দিন ওরা মিলবে না। কারণ এক পক্ষ নাকি অধ্যাত্মবাদী, অপর পক্ষ জড়বাদী। এক পক্ষ দৈবী, অপর পক্ষ

আসুরী । এক পক্ষ শ্রেষ্ঠ, অপর পক্ষ নিকৃষ্ট। কিপলিংকে ওলটালে যা হয় ।

আরো শোনা যাচ্ছে আধুনিক সভ্যতা নাকি একটা ব্যাধি । ইংরেজ স্বয়ং ও রোগে ভুগছে । ছোঁয়াচ লাগিয়ে ভারতকেও ভোগাচ্ছে । সুতরাং এটা আধুনিকতার বিরুদ্ধে অভিযান । ফিরে চল প্রাচীন সভ্যতায় । সেইটেই প্রকৃত সভ্যতা । অপরটা ছদ্মবেশী অসভ্যতা । ইতিহাস উজান বইবে আমাদের হুকুমে ।

তা হলে দেখছেন তো, বলপরীক্ষা কেবল রাজশক্তির সঙ্গে নয়, ইংরেজের সঙ্গে, ইংলণ্ডের সঙ্গে, পশ্চিমের সঙ্গে, আধুনিকের সঙ্গে, ভূগোলের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে । অহিংস মনোভাব কোথায় ! হাওয়ায় মিশিয়ে আছে জাতিতে জাতিতে বৈর, দেশে দেশে শত্রুতা, কাল সম্বন্ধে অজ্ঞতা, যুগ সম্বন্ধে অন্ধতা । আমি স্বীকার করিনে যে পুবের সঙ্গে পশ্চিমের গভীর কোনো অমিল আছে বা মিলন কোনো দিন হবে না । আমি বিশ্বাস করি যে আধুনিকের সহস্র দোষ থাকলেও সে আমার আপন যুগ, যেমন ভারত আমার আপন দেশ । রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির বিরোধকে আমি ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের বা ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের বিরোধ করে তুলব না, যদি করি সেটা হবে মূঢ়তা । রাজশক্তির পিছনে যারা আছে তারাই সমগ্র ইংলণ্ড বা সমস্ত ইংরেজ নয় । বরং তাদের একাংশ ভারত বা ভারতীয় ।

কলেজে কেন এলুম ? কারণ কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে আমার চিত্তের মিল আছে, যেমন হাওয়ার সঙ্গে জানালার । কলেজে এসে আমি দাস হইনি, মনে প্রাণে স্বাধীন হয়েছি । ইউরোপীয় সাহিত্যে ও দর্শনে মানব মানসের যে মুক্তি, ইউরোপের ইতিহাসে মানবাত্মার যে জয়যাত্রা, আমরা যদি তার অংশ না নিই তবে আমরাই বঞ্চিত হব আমাদের উত্তরাধিকার থেকে । যে উত্তরাধিকার প্রত্যেক মানবসন্তানের ।

তা বলে ভারতীয় উত্তরাধিকারকেও উপেক্ষা করব না । এ উত্তরাধিকারও সর্ব মানবের । তা যদি না হতো রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় সম্ভব হতো কী করে ? কলেজে এসেছি বলে আমি ভারতীয় সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হইনি । তার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত রয়েছি । রস আকর্ষণ করছি মূল দিয়ে সেই মৃত্তিকা থেকে । পশ্চিমের সঙ্গে যোগ পূবের সঙ্গে বিয়োগ নয় । তেমনি আধুনিকের সঙ্গে অভেদ প্রাচীনের সঙ্গে ছেদ নয় ।

রত্ন তার কলকাতার চিঠিতে কুষ্টিয়ার ঠিকানা দিতে ভুলে গেছল । শ্রীমতীর চিঠি এলো কলকাতা ঘুরে । পড়ল পিতার হাতে । নীল খাম, সুবাসিত, মেয়েলি হাতের লেখা। এসব দেখে মল্লিক মহাশয় জানতে চাইলেন কে লিখেছে ।

রত্ন ফাঁপরে পড়ল । ভাগ্যিস চিঠিখানার উপর ঠিকানা কাটাকুটি ছিল, তাই বলতে পারল, 'সম্পাদকের দপ্তর থেকে ঘুরে ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে । বোধ হয় কোনো পাঠক কি পাঠিকা ।'

মা নেই । বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই । ছোট বোন । সংসার দেখাশুনা

করেন বিধবা জ্যাঠাইমা । ছাদের উপর একখানি করোগেট-ছাওয়া ঘর । সেখানে রত্ন যত দিন থাকে তত দিন তার আস্তানা । সমবয়সী বন্ধুজন এলে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায় । নইলে আর কেউ বিরক্ত করে না । রত্ন যখন খুশি পড়ে, যখন খুশি লেখে, যখন খুশি শুয়ে শুয়ে ভাবে । পায়চারি করে ।

শ্রীমতীর চিঠিখানা ভারী ঠেকছিল । খুলে দেখল ছোটখাটো একখানা মহাভারত । এ মহাভারতের পাণ্ডব কারা বোঝা যায় না, কিন্তু কৌরব হচ্ছে ইংরেজ । ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের লাট লিটন পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি । সকলের সব দুষ্কৃতির জন্যে দায়ী রত্ন । যা হোক মহাভারত থেকে এটুকু উদ্ধার করা গেল যে শ্রীমতীর পিতৃকুলের এক পূর্বপুরুষ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পক্ষে প্রাণ দিয়েছিলেন । তার পর তার মাতুলানীর প্রপিতামহ সিপাহী যুদ্ধে—সিপাহীবিদ্রোহ বললে মানহানি হয়—ঝাঁপ দিয়েছিলেন । তাঁর ফাঁসি হয় । ইংরেজের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ক্রোধ বংশানুক্রমিক ।

তার চিঠিগুলোর সম্বোধনগুলো দিনকের দিন আবেগময় হয়ে উঠছে । 'আমার প্রিয়তম ভাই' বলে সূচনা। 'আপনারই স্নেহের বোন শ্রীমতী' বলে ইতি। লিখেছে—

> একটা দেশ আরেকটা দেশকে গায়ের জোরে দখল করে তার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। একটা জাতি আরেকটা জাতিকে ঘরে কয়েদ করে দোর জানালা বন্ধ করে দিয়েছে । এর জন্যে আমি নিত্য জ্বলছি, রত্নভাই। আপনি কেন জ্বলেন না ? আপনার শরীরে কি রক্ত নেই ? আপনি কি মানুষ নন, প্রাণী নন, গাছ কি পাথর ? না আপনি দেবতা ?
>
> আপনার কথা শুনে মনে হয় না যে পরাধীনতা বলে একটা জ্বালা আছে । যে জ্বালা মানুষকে অনবরত অস্থির করে তোলে, যে জ্বালার নিবৃত্তি না হলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, নয়তো পাষাণ হয়ে যায় । পাষাণকে যদি অহিংস বলেন আমার আপত্তি নেই । অহিংসাবাদীরা পাষাণই বটে । যেমন জ্যোতিদা । কিন্তু তার চেয়ে আমার মতে পাগল হওয়া হিংস্র হওয়া শ্রেয় । আগুন জ্বলছে যার বুকে তাকে নিবৃত্ত হতে বলা বৃথা । নিবৃত্তি চাই তার নয়, তার জ্বালার, তার পরাধীনতার । এ পরাধীনতা কি অক্ষয় বটের মতো অনন্তকাল থাকবে ! অসহ্য ! অসহ্য !

পাঁচ

ক্ষণকালের জন্যে ঝলকে গেল রত্নর মনে এই চিন্তা, এ কোন্ পরাধীনতার কথা বলছে শ্রীমতী ? যে পরাধীনতা ত্রিশ কোটি মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা, দেড়শো বছরব্যাপী, সে কি এমন তীব্র ভাবে বাজে ? না এ তার ব্যক্তিগত পরাধীনতা, স্বল্পকালব্যাপী, সেইজন্যে এত তীক্ষ্ণ ?

কিন্তু কাজ কী অনুসন্ধিৎসু হয়ে ! শ্রীমতী জ্বলছে, এই যথেষ্ট । কেন জ্বলছে, তা অবান্তর । রত্ন তার জন্যে সমবেদনা বোধ করল । এবার যে চিঠি গেল তার সম্বোধন

'আমার স্নেহের শ্রীমতীবোন ।' তাতে থাকল—

আপনার জ্বালা আমাকে দগ্ধ করছে । বছর পাঁচেক আগে আমিও জ্বলেছি । সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাকেও জ্বালিয়েছিল । কিন্তু ওই তো আমার জীবনের একমাত্র জ্বালা নয় । মা যখন ছিলেন মায়ের দুঃখ দেখে জ্বলেছি । সে দুঃখ বাবার দেওয়া । পরে দিদির বিয়ের সময় বাবার দুঃখ দেখে জ্বলেছি । এ দুঃখ বরপক্ষের দেওয়া । তুচ্ছ কারণে ওরা বরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল । কী ভাগ্যি কনেকে ফেলে রেখে যায়নি । নইলে বাবাকে হয়তো অপমানে আত্মঘাতী হতে হতো । বিয়েতে পণ দেবেন না বলে বাবার এ দুর্গতি । পণ নেবেন না, দেবেন না, এই ছিল তাঁর পণ । কিন্তু বিয়ের সময় তিনি যা দিলেন না পরে ওরা তা মোচড় দিয়ে আদায় করে নিল দিদিকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে । পরিবারের ভিতরে ও বাইরে এ রকম কত অপমান ও অত্যাচার সইতে হয়েছে আমাকে। একটা তো আপনারও জানা । সোনালীর ব্যাপার । প্রত্যেকবার জ্বলেছি। জ্বলতে জ্বলতে যা হয়েছি তা একপ্রকার ডাইনামাইট । সব দিন ফাটে না । ফাটে এক দিন । যেদিন ফাটে সেদিন পাহাড় ফাটিয়ে দেয় । অঙ্গারের মতো আমি ছাই হয়ে যাইনি । আমি অপরাজিত ।

জ্বলতে জ্বলতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে হাজার হাজার বছর এদেশে সামাজিক পরিবর্তন হয়নি, বিরাট বিরাট পরিবর্তন বকেয়া রয়েছে । যারা এক বার চাকার উপরে উঠে বসেছে তারা চাকাটাকে ঘুরতে দেয়নি, শাস্ত্র বানিয়ে সবাইকে বুঝ দিয়েছে যে তাদের ভাগ্য বদলাবার নয় । জন্মান্তরে ব্যক্তির ভাগ্য বদলাতে পারে, তার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা চলতে পারে, কিন্তু সমষ্টির ভাগ্য কোনো কালেই বদলাবে না, সমষ্টিগত চেষ্টা বৃথা । যারা এক বার চাকার নিচে পড়েছে তারা চিরকাল চাকার নিচেই পড়ে থাকবে, কারণ পা হলো নিচে, মাথা হলো উপরে । জনসাধারণ তো সমষ্টিগত ভাবে আশা ছেড়ে দিয়ে উদ্যম ছেড়ে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছিল । এমন সময় বাইরে থেকে এক দল লোক এলো। তারা পতিতকে আশা দিল, ভীতকে অভয় দিল । লক্ষ লক্ষ লোক মুশলমান হয়ে গেল । কিন্তু অধিকাংশ লোক এক শাস্ত্রের বদলে আরেক শাস্ত্র মানতে রাজী হলো না, তার চেয়ে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় । ইংরেজ এসে আরেক দফা আশা দেয়। ধর্ম বদলাতে বলে না, শহরে টেনে নিয়ে যায়, পূর্বপুরুষের পেশা ছাড়ায়, সংস্কার ছাড়ায় । লক্ষ লক্ষ লোক অভূতপূর্ব সুযোগ পায়,স্বাধীনতা পায় । সমষ্টিগত ভাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে । কিন্তু অধিকাংশ লোক গ্রামেই রয়ে যায়, বৃত্তি ছাড়ে না, বরং না খেতে পেয়ে মরে । এবার আশা দিতে হবে এই মানুষগুলিকে ।

ইহজন্মে ইহলোকে সমষ্টিগত চেষ্টায় অধিকাংশের ভাগ্যপরিবর্তনের আশা দিতে হবে । ধর্ম না বদলিয়ে । গ্রাম না ছেড়ে । ধর্ম থাকবে, অথচ তার মধ্যে থাকবে ধর্মান্তরের মুক্তি । গ্রাম থাকবে, অথচ তাতে থাকবে না জাতপাত অস্পৃশ্যতা টিকি পৈতে মনসা শীতলা গুরু পুরোহিত সাধুবাবা । ইসলামের অন্তঃসার,

ইউরোপের মর্মবাণী অবিকৃত ভাবে আত্মসাৎ করতে হবে। সাধারণত যা দেখি তা বিকৃতি বা অস্বীকৃতি। অসাধারণদের মধ্যেও এই দুর্বলতা লক্ষ করেছি। এটা কাটিয়ে ওঠা চাই। জাতীয় স্বাধীনতা হবে বিপুলসংখ্যকের বিপুলতর মুক্তি। যে মুক্তি বুদ্ধ অশোকের পর দেখা যায়নি এদেশে। যার জন্যে বাইরের লোকের আসার দরকার ছিল। যার জন্যে জন্মানোর দরকার ছিল আপনার, আমার ও আমাদের বয়সের তরুণ তরুণীর। আমরাও বাইরে থেকে এসেছি। এসেছি কোন্ সুদূর লোকান্তর থেকে কোন্ নতুন সমাধান নিয়ে যা এখনো আমাদের কাছেই অস্পষ্ট। চিন্তা করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, নিরীক্ষা করতে হবে। শুধু জ্বলে পুড়ে মরলে তো হবে না। তবে, হাঁ, জ্বলাটাও আমাদের স্বধর্ম। আমরা নক্ষত্র ও নীহারিকা। আমরা এই পৃথিবীর মতো শীতল নই। আমরা জ্বলব, জ্বালাব, ভাঙব, চুরব, নতুন করে বানাব। কিন্তু নতুন নিগড় নয়, শাস্ত্র নয়। এক দাসত্বের পরিবর্তে আরেক দাসত্ব প্রবর্তন করা আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা স্বাধীন পুরুষ, স্বাধীনা নারী। ফ্রী মেন, ফ্রী উইমেন।

আরো দু'চার কথার পর ইতি দিয়ে লিখল—আপনারই স্নেহের রত্নভাই। এ চিঠি ডাকে দিয়ে সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। সব কথার উত্তর দিতে গেলে মহাভারতের বিনিময়ে মহাভারত পাঠাতে হয়। রক্ষে কর। আকাশের দিকে তাকাবে কখন! ভরা নদীর রূপ নিরীক্ষণ করবে কখন! বাউল বোষ্টম ফকির দরবেশের সঙ্গে মিশবে কখন! পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে মিলবে কখন!

রত্ন ও প্রভাত পশ্চিমগামী হবার পর থেকে সাত ভাই চম্পার সম্মিলন ঘটে বছরে তিন বার কি চার বার। পূজার বা বড়দিনের বা গরমের বন্ধে। তেমনি একটা বৈঠক আসন্ন হয়েছিল কাননের বাড়ী, ঘোড়ামারায়। সেখানে এসে জুটবে প্রসাদপুর নওগাঁ থেকে গিরীন, ইংরেজ বাজার থেকে প্রভাত, লালগোলা থেকে ললিত, নাটোর থেকে হৈম, ঈশ্বরদি থেকে নবনী। আর কুষ্টিয়া থেকে রত্ন। মণ্ডলীর কার্যকলাপে পরিচালনার অভাব ছিল। এক এক জনের অভিরুচি এক এক দিকে। এমন কেউ ছিল না যে তাদের সংহত করে নির্দিষ্ট কর্মপন্থায় চালিত করবে। সর্বক্ষণ মেলামেশা করলে আপনা হতে একটা ঐক্য আসে। কোনো একজনের নায়কত্ব না হলেও চলে। কিন্তু বছরে কয়েকবার মাত্র মিলিত হলে শিথিলতা অনিবার্য।

কাননকে বিহ্বল করেছে পশুপক্ষীর ব্যথা। যেমন করেছিল বাল্মীকিকে। এই অহিংসার দেশে পশুহত্যার পদ্ধতিটা অনাবশ্যক নিষ্ঠুর। চামড়াটা আস্ত পাবে ও বেশী দামে বেচবে বলে প্রাণ নেবার আগেই ছাল ছাড়িয়ে নেয়। মাংস বেশী পাবে বলে মাথার যত কাছাকাছি পারে তত কাছাকাছি কাটে, একটু একটু করে কাটে, এক কোপে কাটলে পাছে মাথার সঙ্গে মাংস বেশী চলে যায়। পাখীদের যেভাবে ধরে, যেমন করে একসঙ্গে বেঁধে বা খাঁচায় পুরে চালান দেয়, জলটুকু খেতে না দিয়ে শুকিয়ে মারে তা দেখলে বাল্মীকি হয়তো গোটা দেশটাকে অভিশাপ দিয়ে আর একটা শ্লোক রচনা করতেন।

গিরীনকে বিধুর করেছে বসন্তরোগী কলেরারোগীর পরিত্যক্ত অবস্থা ও নিঃসঙ্গ যাতনা। সে পড়াশুনা করবে কখন ! যখনি সংবাদ পায় ছুটে যায় রোগীর পাশে, সেবার ভার নেয়, সঙ্গ দেয়। আই-এসসি পাশ তার এখনো হলো না, পাশ করলে ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু দিন দিন তার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার সহপাঠীরা মেডিকাল কলেজের এম-বি হতে চলল। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভাবছে একটা ওষুধের দোকান খুলবে, নইলে সংসার অচল হবে। সে বিয়ে করবে না। তা হলেও তার আশ্রিত অনেকগুলি।

হৈম উকীল হয়ে গরিবদের জিতিয়ে দেবে। যারা জিতবে তাদের কাছ থেকে ফী নেবে। যারা হারবে তারা ফ্রী। বিয়ে ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। সেটা গুরুজনের ইচ্ছায়। কিন্তু সে বহু সন্তানের জনক হবে না। সেখানে তো গুরুজনের ইচ্ছা খাটে না। সে তার সহধর্মিণীকে শিক্ষিতা করবে। দেশে মহিলা কর্মীর বড় অভাব।

ললিত তলে তলে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকছে বলে গুজব। তবে তলিয়ে যেতে নারাজ। সে খেলোয়াড় মানুষ, খুব একটা উচ্চাঙ্গের খেলা খেলতে চায়। যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। সরকারী মহলে পারিবারিক প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকবে, আবার দেশানুরাগী মহলে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার হানি হবে না।

নবনীর নিজের ইচ্ছা কবি ও মনীষী হতে, মাসিকপত্র সম্পাদনা করতে। কিন্তু তার গুরুজনের ইচ্ছা তা নয়। ইতিমধ্যেই এক বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে এই প্রত্যাশায় যে তার শ্বশুর তাকে সওদাগরি আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন। সেও একদিন বড়বাবু হবে। তা সত্ত্বেও সে সাম্যবাদের পক্ষপাতী হয়েছে। কাননের যেমন পশু ও পাখী নবনীর তেমনি চাষী ও মজুর। মেশে না যদিও তাদের সঙ্গে, তবু লেখে তাদের দুর্দশার কথা। যে-ভাষায় লেখে সে-ভাষাও তাদের মুখের ভাষা নয়।

বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন পরে একজোট হওয়ার উত্তেজনা। তার উপর যাতায়াতের উত্তেজনা। রত্ন এই নিয়ে অন্যমনস্ক ছিল, এমন সময় এলো শ্রীমতীর চিঠি। তার চিঠিতে ফী বারেই একটা না একটা চমক থাকে। এবারকার চমক 'আপনির'র জায়গায় 'তুমি।' সে যে কেবল 'তুমি' বলেছে তাই নয়, 'তুমি' না বললে রাগ করবে বলে শাসিয়েছে।

> সত্যি, ভাই, তোমার উপর রাগ না করে পারিনে। যত বার তোমার চিঠি পেয়েছি তত বার রাগ করেছি। তোমার উত্তর যেমনটি হলে খুশি হতুম তেমনটি হয়নি। হয়েছে তার উলটোটি। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অপূর্ব। আমার চেনাশোনার মধ্যে তুমিই একমাত্র জন যাকে চিঠি লিখলে চিঠির উত্তর খুলতে হাত কাঁপে। আবার চিঠি না পেলে, পেতে দেরি হলে, প্রাণ কাঁপে।
>
> রত্ন, তোমার চিঠি আমার চাইই চাই। আমি পড়ে আছি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অখ্যাত এক দ্বীপে। এখানে সভ্যতার আলো পৌঁছয় না। তোমার চিঠি যখন পাই তখন মনে হয় সভ্যতার আলো পেলুম কত দিন বাদে। জ্যোতিদাও মাঝে মাঝে আসে। সেও বয়ে আনে আলো। নতুন বই দিয়ে যায় পড়তে। আর যারা আসে তাদের মধ্যে আগুন আছে, আলো নেই। আমি আগুন পছন্দ

করি, কিন্তু আলো না হলে বাঁচিনে । তোমার মধ্যে, জ্যোতিদার মধ্যে, আগুনও আছে, আলোও আছে। সেইজন্যে তোমাদের এত ঈর্ষা করি ।

এবার তুমি যা লিখেছ তা আমাকে দোলা দিয়েছে । অত্যন্ত উন্মনা বোধ করছি । সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় ভেঙে পড়ছি। কেন, সে কথা বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হয় । বলব এক দিন । তার আগে শোনাতে চাই রুপালী বলে একটি মেয়ের গল্প । আমার বান্ধবী । ও আমাকে বিশ্বাস করে যা বলেছে তা আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি । দেখো, ভাই, কাউকে এসব বোলো না । ললিত জানে । সে জেনেছে আমার ননদের কাছ থেকে ।

তোমাকে লিখছি এই ভরসায় যে তুমি যেমন সোনালীর জন্যে চেষ্টা করেছিলে তেমনি রুপালীর জন্যেও করবে । গান্ধীর উপর আমি বীতরাগ কেন, জান ? তাঁকেও আমি জানিয়েছিলুম । তিনি কিছু করলেন না । এমন উপদেশ দিলেন যা কোনো কাজের নয় । নেতাদের কেউ কেউ জানেন । তাঁদেরও সেই ধরনের উপদেশ । সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা তাঁদের কাছে এত বেশী মূল্যবান যে একটি বালিকার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে ও হচ্ছে তার কোনো সুস্থ শোভন প্রতিকার তাঁদের মাথায় আসে না । উটপাখীর মতো বালুতে মাথা গুঁজলে কী হবে ? বিরক্তি লাগে ।

রুপালীর কথা লিখব যে, কেমন করে আরম্ভ করব ভেবে পাইনে । এলোমেলো হবে। অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে যাবে। সে-সব তুমি কল্পনা দিয়ে ভরে নিয়ো । ইচ্ছা করে অনেক কথা বাদ দিচ্ছি । সে-সব পুরুষমানুষের কাছে বলা যায় না ।

রুপালী না বলে রূপসী বলতে পারতুম । ও মেয়ে দেখতে এত সুন্দর যে মেয়েরা পর্যন্ত ওর প্রেমে পড়ে যায় । পুরুষরা তো পতঙ্গের মতো পড়ে । ও কিন্তু সহজে কারো প্রেমে পড়বে না । ও চায় বীরপুরুষ । ও হবে বীরভোগ্যা । যার তার কণ্ঠে মালা দেবে না ও । দেবে স্বয়ংবর সভায় বীরত্বের পরিচয় দেখে। এমনি একটা আদর্শ বা স্বপ্ন নিয়ে ওর ছেলেবেলা কেটেছিল । ওর বয়স যখন তেরো কি চোদ্দ তখন ওর দাদার এক বন্ধু এসেছিলেন ওদের বাড়ী বেড়াতে । বীরের মতো চেহারা নয়, তবে সুমার্জিত মুখমণ্ডলে ভাবময় চাউনি । স্বরোদ বাজান। সে কী স্বরোদ ! যেন শ্যামের বাঁশি । কোনো প্রেম চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে । কোনো প্রেম কানের ভিতর দিয়ে । এই স্বরোদিয়া ওর হৃদয় হরে নিল কয়েকটি দিনে । প্রথম প্রেম এলো হৃদয়ে ।

মেয়ের ভাবান্তর মায়ের নজর এড়ায় না । তিনি জানতে চান, সে জানায় । মা রাজী ছিলেন, বাপ নারাজ । ও জমিদারের ছেলে নয়, পড়াশুনাও তেমন করেনি যে বড় চাকরি পাবে বা বড় উকীল হবে । তা ছাড়া ভিন্ন জাত । সেইটেই সব চেয়ে বড় বাধা । রুপালী কিন্তু মানা মানবার মেয়ে নয় । চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকল জিতেশকে। লিখতে থাকল, আমাকে নিয়ে যাও, হরণ করে নিয়ে যাও

অর্জুনের মতো। একখানা চিঠি কেমন করে দাদার হাতে পড়ে, দাদার হাত থেকে বাবার হাতে। তিনি তো অগ্নিশর্মা। যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। এখুনি যা। সে যে কী দুঃসহ অপমান তা বোঝাবার নয়। রুপালী এক মাস উপবাস করে। তার সাধ্য থাকলে সে সত্যি বেরিয়ে যেত।

পাহারা বসল। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ চলতে থাকল। ওর দারুণ আপত্তি। কিন্তু কে শুনছে ওর কথা! ওর চেয়ে বয়সে দু'গুণ বড় এক দোজবরের সঙ্গে ওর ধরা বিয়ে। স্বয়ংবর নয়। বনেদী জমিদার বংশের বেঁটে মোটা আহ্লাদী দুলাল। বীরপুরুষ নয়। মাছ ধরা, শিকার, গান বাজনা, খেলাধূলা সব একটু একটু জানে। লেখাপড়ায় দুটো পাশ। কিন্তু বিদ্বান বা গুণী নয়। দেখতেও যদি ফরসা হতো! চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিয়ের আগে দেখাসাক্ষাৎ বারণ। শুভদৃষ্টির সময় বরকে চাক্ষুষ করে রুপালীর তো চক্ষুস্থির! এ কোন্ ছদ্মবেশী ব্যাঙ্ রাজকুমার! রূপকথায় যেমন খোলস ছেড়ে সহসা সুপুরুষ হলো বাস্তবেও হবে না কি? হে মা কালী, তাই যেন হয়। তাই যেন হয়।

ফুলশয্যার রাত্রে রুপালী আশা করেছিল এই রূপান্তর। কত কাব্য, কত রোমান্স, কত সৌন্দর্য দিয়ে সূচিত হবে তার নবজীবন! রজনীদীর্ঘ হবে তার পূর্বরাগ। মন পাবার তপস্যা চলবে দেহ পাবার পূর্বে। কিন্তু যা হলো তা অকথনীয়। সেও একপ্রকার নারীধর্ষণ। পশু না হলে তেমন অভদ্র ইতর আচরণ কেউ করে না। বর্বর না হলে তেমন করে লজ্জা শরম বিসর্জন দেয় না। প্রথম আস্বাদন কোথায় সুধার মতো স্বাদু হবে, তা নয়, বিষের মতো বিস্বাদ। সেই কুৎসিত বীভৎস সঙ্গ থেকে সে দূরে সরে গিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর নয়, আর নয়।

দ্বিতীয় বারের বার সে বাধা দিয়ে অনর্থ বাধায়, তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে আসে। অষ্টমঙ্গলার সময় যখন বাপের বাড়ী ফিরে যায় তখন তার মা বাবা বুঝতে পারেন না কী হয়েছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন বিয়ে কোনো রকমে একবার হয়ে গেলে বাকীটুকু প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাবেই, অন্যথা হবে না, এই হলো তাঁদের ধারণা। কিন্তু রুপালীর ধারণা তার বিয়ে একটা মায়া, ফুলশয্যা একটা দুঃস্বপ্ন, সে বাপের বাড়ীতেই ছিল, রয়েছে ও থাকবে। তার মা কাকিমারা তাকে যতই বোঝান যে মেয়েদের আসল বাড়ী হচ্ছে শ্বশুরবাড়ী, স্বামী ভিন্ন ইহলোকে পরলোকে অন্য গতি নেই, মা না হলে জীবন বৃথা, মা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, সে ততই অবুঝ হয়। সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না, নোয়া খুলে ফেলে, কুমারীজীবনে ফিরে যায়। সে বিবাহিতা নয়, সে কুমারী। কৌমার্য তার অক্ষত রয়েছে। যদিও ঠিক তা নয়।

বৎসরান্তে তাকে জোর করে রানীনগরে দিয়ে আসা হয়। যারা দিয়ে আসে তারা এক গাছা দড়ি ও একটা কলসী দিয়ে আসতে ভুলে যায়। সে ভুল শোধরানোর উপায় ছিল না। দরকারও ছিল না। সে আবিষ্কার করল যে বাংলার সিংহাসন শূন্য থাকেনি। রানীনগরের রানী হয়েছেন প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বিধবা দিদি। সম্বন্ধটা

স্ত্রী বিয়োগের পূর্ব হতেই । স্ত্রীর মৃত্যুর কারণও নাকি তাই । একই কারণে দ্বিতীয় বিবাহে অপ্রবৃত্তি । তাতে কিছু অসুবিধা হয় নি । এ বাড়ীর ঐটেই নিয়ম । প্রায় প্রত্যেকের একটি করে উপপত্নী আছে। সেটাও বনেদিয়ানার অঙ্গ । না থাকলে পৌরুষে বাধে। তবে বিয়েটাও করে রাখা দরকার । নইলে সম্পত্তির অধিকারী কে হবে ? বৈধ পুত্র চাই । বৈধ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা । সেইজন্যে অবশেষে রুপালীর পাণিগ্রহণ । তার কর্তব্য হচ্ছে একটি পুত্রসন্তান উপহার দেওয়া । আর অপরার কর্তব্য শয্যাসঙ্গিনী হওয়া । দু'জনের দুই স্বতন্ত্র মহল । দু'সেট বাঁদি । ধর্মপত্নী বলে রুপালীরই সম্মান বেশী । কিন্তু নর্মপত্নী বলে শেফালীর আদর বেশী। মাঝখানে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পাছে রুপালী মূর্চ্ছা যায় । পরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে । রুপালী মূর্চ্ছা যায় যাবে ।

এর পরে বেচারির খুব শক্ত অসুখ করে। তার মামা এসে তাকে ভাগলপুরে নিয়ে যান । যেখানে তার জন্ম । সেখানে বছর খানেক থেকে তার শরীর সারল । কিন্তু যার চিকিৎসায় সারল সে পড়ল সেই ডাক্তারের প্রেমে । এই প্রেমটাই সত্যিকার প্রথম প্রেম । পূর্বের সেটা ছেলেমানুষী । এবার তার মধ্যে নারী জাগল । জাগল ঘুমভাঙা রাজকন্যার মতো । জেগেছে দেহে মনে আত্মায় । জেগেছে প্রতি রোমকূপে । প্রতি অঙ্গে । সে তার প্রিয়তমের কাছে প্রেম নিবেদন করল বিরলে। তিনি তার উত্তরে যা করলেন তা বিস্ময়কর । হঠাৎ একটি সুপাত্রী দেখে রাতারাতি বিয়ে করে ফেললেন । বেচারি রুপালী ! তার সব আশা নির্মূল হলো । এবার সে হয়তো গঙ্গার জলে ডুবে মরত, যদি না আকাশগঙ্গার মতো নেমে আসত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন । সেই আকাশগঙ্গার স্রোতে অনেকে ভেসে যায় । তার স্বামীও । জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্দুক বাজেয়াপ্তির হুমকি দেখান । তখন শ্বশুর মহাশয় পুত্রকে পাঠিয়ে দেন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে । আর পুত্রবধূকে নিয়ে যান রানীনগর ।

সেও স্রোতের টান এড়াতে পারল না, অলঙ্কার খুলে দিল গান্ধীকে যখন তিনি আবেদন করেন । ম্যাজিস্ট্রেট রাগ করে শ্বশুরের নাম কেটে দেন খাস মুলাকাতি লিস্ট থেকে। কত বড় অসম্মান ! কিন্তু সেইটেই তাঁর জয়ের হেতু হয় লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে । যার জন্যে এ জয় তাকে তিনি বহু পরিমাণে স্বাধীনতা দেন কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে মিশতে । রুপালী যেন অন্য মানুষ হয়ে যায় । এখন থেকে তার ধ্যান হলো ভারতের স্বরাজের মতো তার স্বকীয় স্বরাজ । পরাধীনতার উপর তার ঘেন্না ধরে গেছে ।

স্বামী ফিরলেন আড়াই বছর বাদে, ব্যারিস্টার না হয়ে । শেখবার মধ্যে শিখেছেন বেহালা বাজাতে । কিনে এনেছেন একখানা বারো হাজার টাকা দামের বেহালা । ও দেশে থেকে এইটুকু উন্নতি হয়েছে যে স্ত্রীর উপর জোরজুলুম করেন না । আরাধনা করেন । রুপালীর এখন অপ্রতিহত প্রতিপত্তি । ইচ্ছা করলে সে এই মুহূর্তে শেফালীকে দূর করে দিতে পারে । কিন্তু তা যদি সে করতে যায় তবে

তাকেই নিতে হবে শেফালীর স্থান । যা সে হতে চায় না তাই হতে হবে। সন্তানবতী। তা হলে তার স্বাধীনতার কী হবে ? ওদের দু'জনের যে সম্পর্ক তা দূরে গেলেও ঘুচে যাবে না । একজন দূরে গেলে আরেকজন যাবেন তার বিরহ জুড়াতে । মাঝখান থেকে রুপালীর নরকবাস আরো অসহ্য হবে। যেখানে প্রেম নেই ও হবার আশা নেই সেখানে অপ্রেমের সন্তান তার বাঞ্ছিত নয় । একটি দেবশিশুকে স্বর্গ থেকে নরকে আনা কি তার কর্তব্য ? তুমিই বল, ভাই, এটা কি তার ধর্ম ?

সংক্ষেপে এই হলো সোনালীর বোন রুপালীর কাহিনী । সোনালীর বোন শুনে মনে কোরো না সত্যিকারের বোন । না, পাতানো বোনও নয় । কেউ নয় । একটি অপমানিতা নারী, যার সঙ্গে একটি ক্ষেত্রে একটি গভীর মিল আছে । উভয়েই ধর্ষিতা । তবে সোনালীর বেলা সেটা মন্ত্রপূত নয়, ঢাক ঢোল বাজিয়ে লোকজন খাইয়ে আগুনে ঘি ঢেলে সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে শালগ্রাম সাক্ষী করে অন্যায় করা হয়নি, করা হয়েছে একান্ত আদিম ভাবে। আর রুপালীর বেলা এটা মন্ত্রশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত ধর্মনির্দিষ্ট অন্যায় । এর কাছে আত্মসমর্পণই পুণ্য, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই পাপ । যে যত বেশী আত্মসমর্পণ করবে সে তত বড় সতী । আত্মসমর্পণের দ্বারা যে যত বার মা হবে সে তত বড় দেবী । নারীত্বের পরাকাষ্ঠা অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ও অন্যায়কারীর সন্তানের মাতৃত্ব । যেহেতু মন্ত্র পড়া হয়েছে । নয়তো একই ব্যাপার অন্য নাম নিত । যেমন সোনালীর বেলা।

অন্যায়ের জয় হবে ভাবতেই পারে না রুপালী। সেই যে সে অলঙ্কার ত্যাগ করেছে তার পরে আর ধারণ করেনি। কেবল দু'হাতে দু'গাছি শাঁখা, এক গাছা নোয়া । এই পর্যন্ত আপোস । লোকে ঠাওরায় এটা দেশের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন । তা নয় । এটা ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহের অস্বীকৃতি । সে কারো অধিকৃতা নয় । সে অনধিকৃতা । এই তো সেদিন মাছ ছেড়ে দিল । বিধবার মতন । এটাও তার বিবাহের অস্বীকৃতি । এবার যা ঘটেছে তা বলপ্রয়োগ নয়, মানসিক নিষ্ঠুরতা । প্রতিবাদ তাকে করতেই হবে, যে-ভাবেই হোক । তা যদি না করে আপনার উপর শ্রদ্ধা হারাবে । খাড়া থাকতে পারবে না, ভেঙে পড়বে । তার জীবনের গতি একটা চরম অবস্থার দিকে যাচ্ছে । রুপালী তাই ঘোরতর চিন্তিত । কী আছে তার বরাতে কে বলতে পারে ! সে কি বাঁচবে ! সে কি মরবে ! সে কি জীবন্মৃতের মতো বেঁচে বর্তে থাকবে । দেখছে তো আরো নয়শো নিরানব্বুই জন মেয়েকে । কী তাদের বাঁচার ছিরি ! প্রত্যেকেই মনে মনে জানে যে তার হাত পা বাঁধা । তার মুক্তির উপায় নেই । থাকলে পালাত, ধরা দিত না, মা হতো না । তবু প্রত্যেকেই বলে এটা তার ধর্ম, পতি ভিন্ন সতীর আর কে আছে, অবাঞ্ছিত হলেও তারই সন্তান ধারণ করতে হবে, মনোনয়নের অবকাশ নেই । উনি যাই করে থাকুন না কেন, আরেকজনকে বিয়ে তো করেননি । যাই করতে থাকুন না কেন, আরেকটা বিয়ে তো করছেন না । কী রকম মহানুভব, দেখছ । প্রায় মহামানব বললেও

চলে ।

ভাই রত্ন, এ গল্প শুনে তোমার কেমন লাগল লিখো । ভরসা করি তুমিও বিধান দেবে না যে যা হয়ে গেছে তাকে মেনে নেওয়াই শ্রেয় । আমি তো বলি, যা হয়ে গেছে তাকে না-হওয়ানোই শ্রেয় । অঙ্ক ভুল হয়ে থাকলে সেলেট মুছে ফেলতে হয় । তেমনি বিয়ে ভুল হয়ে থাকলে কী ? সীমন্ত । রুপালীকে আমি দেখেছি । ও মেয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী নয় যে বিদ্রোহ করার পর পায়ে লুটিয়ে পড়বে সতীন থাকতে প্রসাদ পাবার জন্যে, মা হবার জন্যে । না, ভাই, ঋষি রবীন্দ্রনাথের বাক্যও তার শিরোধার্য নয় । কোথায় যেন তিনি লিখেছেন নারী তো তার স্বামীকে বেছে নেয় না, মেনে নেয় । তা হলে তার সন্তানকে বেছে নেবে কেন ? মেনে নেবে । মরি, মরি ! কিবা যুক্তি ! মেয়েরা যেদিন হয়কে নয় করতে শিখবে সেদিন এই ঋষি মশাইদের চোখ ফুটবে। এঁরা দেখবেন পুরুষ যাই করে তাই চূড়ান্ত নয়, নারী ইচ্ছা করলে তাকে উলটে দিতে পারে । বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে ? যে জন্যে হয়েছে সেটি হচ্ছে না । দেশের সব মেয়ে যেদিন এই তান ধরবে সেদিন দু'তিনটে বিয়ে করেও কি ফল হবে কোনো !

ফল শব্দটার নিচে একটা রেখা টেনে দিয়েছিল শ্রীমতী । রত্ন তা দেখে সিঁদুর হয়ে উঠল । বাপ রে ! কী ডানপিটে মেয়ে ! রত্নর বুঝতে বাকী ছিল না যে রুপালী আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীমতী ।

ছয়

রত্ন সেদিন তার ঘরে কাউকে আসতে দিল না । দরজা বন্ধ করে কোলের কাছে হাত জোড় করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল । এ কী চমক ! চমক বলে চমক ! চমক যেন থামতে চায় না ।

শ্রীমতীকে সে এত দিন ভুল বুঝেছে বলে লজ্জিত ও দুঃখিত । ও মেয়ে ওর নিজের মুক্তির জন্যে জীবনমরণ রণ করে চলেছে । ও কেন পরের হাতের পুতুল হবে ! ও যদি সন্ত্রাসের পথ ধরে থাকে তবে ওর বিশ্বাস ওই পথেই ওর নিজের মুক্তি । বলা যায় না, হয়তো ওই পথেই ওর মুক্তি হবে । রত্ন যদি ওর মতো অবস্থায় পড়ত রত্নও কি সন্ত্রাসবাদী হতো না ? রত্ন যে রত্না হয়ে জন্মায়নি তাইতেই সে বেঁচে গেছে । নইলে তারও তো এত দিনে বিয়ে হয়ে থাকত, সেই রকম একটা ধরা বিয়ে । তার উপরেও জোর খাটাত এক ব্যক্তি, যার হৃদয়ে তার জন্যে প্রেম নেই, যার জন্যে তার হৃদয়ে নেই প্রেম । ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে আসে, মনে হয় ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে ।

এই উৎপাতের সঙ্গে সংগ্রামই করতে হয় । এর সঙ্গে সন্ধি করা চলে না । জগতে এ যদি থাকে তবে এ যত দিন থাকে তত দিন সৃষ্টির কাজ স্থগিত । রত্নর জীবনদর্শনে

যে স্থিতির ভাব এসেছিল সেটার গায়ে ধাক্কা লাগল। প্রচণ্ড ধাক্কা। এমনি এক ধাক্কা লেগেছিল সোনালীর বৃত্তান্ত প্রথম যেদিন শোনে কাননের মুখে। তিন বছর লাগল সামলে নিতে সেবার। এবার কে জানে ক'বছর লাগবে। তা হলে কি তাকে দিয়ে সৃষ্টিলীলা হবে না? সে কি এসেছে ডাইনামাইট হাতে করে? তার রক্ত স্বভাবত গরম নয়। কিন্তু গরম হয়ে ওঠে দুর্বলের উপর প্রবলের বলপ্রয়োগ ঘটলে বা ঘটবার উপক্রম হলে।

রত্ন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল যে, শ্রীমতীর এই রণ তারও রণ। সে রণছোড় হতে পারে না। হলে শ্রীমতীর পরাজয় হবে। সেটা তারও পরাজয়। যে পরাজিত হয়েছে বা পরাজয় মেনে নিয়েছে তাকে দিয়ে কোন্ মহৎ কর্ম সম্পন্ন হতে পারে? সে হয়তো ধনী হবে গুণী হবে গণ্যমান্য হবে সম্ভ্রান্ত হবে, কিন্তু মানবাত্মার যা নিয়ে গৌরব তা হলো দুর্বলকে অভয় দেওয়া, প্রবলকে অভয়ঙ্কর করা। একজনকে বলা, 'আমি থাকতে তোমার ভয় নেই।' আরেকজনকে বলা, 'আমি থাকতে তোমার জোর নেই।'

কিন্তু এই মুহূর্তে জোরই বা কোথায়! শ্রীমতীর স্বামী তো আর জোর খাটাতে ব্যগ্র নন। তিনি তাঁর বল প্রত্যাহার করে ছল ব্যবহার করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কী করতে হয় রত্ন বলতে পারে না। তার কোনো ধারণাই নেই। তার পরামর্শ চাইলে সে বলত, 'ও-বাড়ী ছেড়ে যেখানে পার চলে যাও। বাপের বাড়ী, কাকার বাড়ী, মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী।' কিন্তু শ্রীমতী তার পরমর্শ চায়নি। যত দূর বোঝা যায় সে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাতে চায় না, অথচ স্বাধীন হতে চায়। এই স্ববিরোধ তার অন্তরে, কিন্তু সে ভাবছে তার বাইরে। রত্ন এর কী করতে পারে! শ্রীমতীর চেয়ে শতগুণ বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরাও তো ভাবছেন ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাবেন না, অথচ স্বাধীন হবেন।

রত্ন যাই বলুক না কেন, তলে তলে পিউরিটান ছিল। নরনারীর দাম্পত্য জীবনের রহস্য যদিও অতি সামান্যই উম্মোচিত হয়েছিল তবু সেটুকুও তার দৃষ্টিকটু। জানতে যে তার কৌতূহল ছিল না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিতৃষ্ণাও ছিল। আর ছিল শঙ্কা। 'চুপ, চুপ' নীতিতে তারও আস্থা ছিল। ওসব কথা অত খোলাখুলি ভাবে লেখা কি ভালো! শ্রীমতীটার কবে বুদ্ধিসুদ্ধি হবে! রত্ন হাজার হোক পুরুষ মানুষ। না শ্রীমতীর মতে সে মেয়েলি?

যাক, রত্ন শ্রীমতীকে বুঝতে দিল না যে ও বুঝতে পেরেছে রুপালী কে। না বোঝার ভান করে গেল উত্তর দেবার সময়। দাম্পত্য ব্যাপারগুলোর বেলা নীরব রইল। এবার তাকে অনেক রেখে ঢেকে চিঠি লিখতে হলো। কে জানে যদি অন্য কারো হাতে পড়ে! একটু গম্ভীর রাশভারি বঙ্কিম-বঙ্কিম ভাব আনতে চেষ্টা করল তার লেখায়। একটু সংযত রবীন্দ্র-রবীন্দ্র ভাব। ভারতের অধ্যাত্ম সত্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, দিব্য জীবন, মাতৃত্বের মহিমা ইত্যাদি সব ক'টা বুকনি ছিল তাতে। তার বক্তব্যের সার কথা : বর্ণমালায় তিনটে স আছে। স'। স'। স'। অর্থাৎ সব কিছু সহ্য কর।

কিন্তু চিঠিখানা ডাকে দিতে গিয়ে তার মনে হলো ভারতের মাটিতে এই একটি মেয়ে জন্মেছে যে অন্য রকম। এর মনোবল ধ্বংস করে একেও স্টীম রোলার দিয়ে

সমভূম করে দেওয়া আর যার দ্বারা হয় হোক, তার দ্বারা হবে না। চিঠিখানা কার হাতে পড়বে সে কথা ভেবে চিঠি লেখা ভণ্ডামি। পড়ে পড়বে তার স্বামী কিংবা শ্বশুরের হাতে। শাশুড়ী কিংবা ননদের হাতে। তা বলে সমাজরক্ষী সেজে সাজানো কথা লিখবে না রত্ন।

চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখল :

শ্রীমতী, বোন আমার,

রুপালী কে আমি জানি। সে অনন্যা। ভারতবর্ষে তাকে দেখব আশা করিনি। তার সংগ্রামের তুলনায় ভারতের সংগ্রাম কঠিন নয়। সে যদি জয়ী হয় ভারতও জয়ী হবে। শ্রীমতী, তুমিই আমার ভারত। যে ভারত স্বাধীন হবেই, শস্ত্রের কাছে বা শাস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। যে ভারত বহু শতকের নির্মোক ত্যাগ করে নতুন হয়ে উঠেছে, মনে প্রাণে নতুন। যে ভারত পুরাণে ইতিহাসে ছিল না, এই প্রথম উদিত হলো। শ্রীমতী, তুমিই সেই ভারত। তোমাকে আমি বন্দনা করি। কিন্তু আমার বন্দনার ভাষা বন্দে মাতরম নয়।

যে পুরুষ নারীর মনোনয়ন পায়নি তার মতো হতভাগ্য কে আছে! পতি মনোনয়নের মধ্যেই সন্তান মনোনয়ন নিহিত। মনোনয়নের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। জন্মস্বত্ব। নারী কেন এর থেকে বঞ্চিত হবে? যারা তাকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের অধিকার মানে না। মানুষের চেয়ে বড় করে সমাজকে, শাস্ত্রকে। ফরমায়েসী সতীত্বকে, ফরমায়েসী মাতৃত্বকে। এসব যেন অর্ডারি মাল। যেন অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। অর্ডার অনুসারে না মিললে জোরজুলুম খাটায়, শাস্ত্র থেকে পৌঁছয় শস্ত্রে। প্রেমের পথ এ নয়। প্রেম কখনো দাবী করে না। তাই প্রেমের মধ্যে দু'পক্ষের স্বাধীনতা নিহিত। স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম।

আজ আমার মন ভরা আছে। বিষাদে অথচ গৌরবে। আজ এই পর্যন্ত। কাল রাজশাহী যাচ্ছি। সাত ভাই চম্পার বৈঠকে। ইতি।

স্নেহের ভাই রত্ন

অনেক কথা বলার ছিল, বলতে পারত। কিন্তু সমস্যা তো কথা দিয়ে মিটবে না। চাই কাজ। যে মেয়েটি একা সংগ্রাম করছে শত্রুপুরীতে মিত্রহীন হয়ে তার মনের জোর যাতে বজায় থাকে সেই জন্যে কথা যেটুকু বলতে হয় সেইটুকু বলবে। কিন্তু তার জয়ের পক্ষে সেই যথেষ্ট নয়। চাই কাজ। রত্ন এর কী করতে পারে!

ভারতের জন্যেই বা কী করতে পারছে! বাইরে যাবার কথাই তো ভাবছে। সে কি শুধু ভারতবর্ষেরই সন্তান? সারা পৃথিবীর নয়? জন্মকালে কি সে গোটা পৃথিবীতেই ভূমিষ্ঠ হয় নি? কেবল ভারতের কোলে হয়েছে? মৃত্যু হলে কি সে সমস্ত পৃথিবী থেকেই বিদায় নেবে না? কেবল মাত্র ভারত থেকে নেবে? তা হলে কেন আয়ু থাকতে দেশবিদেশ ঘুরে দেখবে না? কে জানে ক'দিনের পরমায়ু! জীবনের বিশ বছর কাটল

একটি মাত্র ভূখণ্ডে । আর কত কাল কাটবে !

তার বাল্য সখা হীরু তাকে বড় ভালোবাসে । এমন দিন যায় না যেদিন দু'জনের দেখা না হয় । হীরুর সর্বক্ষণ ভয় যে রত্নর ছুটি ফুরিয়ে আসছে, সে আবার অদর্শন হবে। তাকে চোখে চোখে রাখে, রাত দশটা না বাজা তক চোখের আড়াল করে না । সেই হীরু যখন শোনে যে রত্ন সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়াবে তখন তার মনের অবস্থা শ্রাবণের মেঘের মতো বর্ষণ উন্মুখ হয় । সে কথা বলতে পারে না, তার হয়ে কথা বলে তার বিবর্ণ মুখমণ্ডল, তার কাতর চাউনি । যখন বাণী ফিরে পায় তখন প্রশ্ন করে, 'হাঁ রে, রতন, তোর মা নেই বলে কি কেউ নেই যে তুই উদাস হয়ে ঘুরে বেড়াবি বাউল দরবেশের মতো ?' পাতলা ছিপছিপে ফরসা । লাজুক চেহারা । একটুতেই ভয় পায় ।

রত্ন তার ভীরু বন্ধুটিকে ভয় দেখিয়ে বলে, 'কেন ? বাউল দরবেশ কি মন্দ ? আমি এসেছি শুনলে ওরা রৌজ আমাদের বাড়ী আসে, গান গায়, আনন্দলহরী বাজায়, আনন্দ করে । আর আমিও তো যাই ওদের আড্ডায় । দেখি ওদের জীবন । সম্বল বলতে কয়েক রকম কয়েকটা ঝোলা আর ভিক্ষাপাত্র আর ওই আনন্দলহরী বা একতারা । যখন এক আখড়া বাসি হয়ে গেল তখন আরেক আখড়ায় চলল । সঙ্গে হয়তো সঙ্গিনী । নয়তো সঙ্গিনীকে মুক্ত করে দিয়ে যায়, যাতে সে অপর সঙ্গী গ্রহণ করতে পারে । নিজেও মুক্ত হয় ।'

হীরুর চোখ কপালে ওঠে । সে বকুনি দেয় । বলে, 'ভদ্রলোকের ছেলে না তুই ! তোর এসব ভালো লাগে ! একটা মেয়ে, তার দশ বার দশ জনের সঙ্গে মালাচন্দন হয়েছে, এও তো আমার জানা । তেমন একটি সঙ্গিনী যদি তোর কাঁধে চাপে তা হলে সে আর নামছে না, বাছাধন । তার হয়তো আগের পক্ষের সন্তানও আছে । পিতৃপরিত্যক্ত । সেটিও তোর পিঠের বোঝা হবে । তার পর তোরও কি নিজের একটি হবে না ? সেটিকে কার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে যাবি ? তোর বাপ তো দশরথের মতো মারা যাবেন পুত্রবিরহে ।'

রত্ন শিউরে ওঠে । মারা যাবেন বাবা ! পুত্রবিরহে ! সে কি তবে নিজের জীবনটা নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে না ! এ কী অত্যাচার !

'হীরু, তুই তো জানিস, আমি বাপের সম্পত্তি চাইনে । রামের মতো সিংহাসন ছেড়ে দিতে চাই ছোট ভাইকে ।'

'সে তো আরো বড় আঘাত । বাপের প্রাণ কি তা সইতে পারে !'

রত্ন বিমর্ষ হয় । বন্ধন যে কত প্রকার আছে তার ইয়ত্তা নেই । স্নেহও এক প্রকার বন্ধন । তার বাবা তাকে সেই অদৃশ্য রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন । তার ভাইবোনরাও । কোথায় মুক্তি! বাউল দরবেশের মতো মনের জোর থাকলে তো !

শ্রীমতীর কথা মনে পড়ল । শ্বশুরবাড়ীতে সে নিশ্চয় কিছু স্নেহ পেয়েছে কারো না কারো কাছে। হয়তো শ্বশুরশাশুড়ী তাকে ভালোবাসেন । সে যদি চলে যায় তাঁরা কি তার জন্যে কাঁদবেন না ? মায়া পড়ে গেছে যে ! মায়ার হাত থেকে মুক্তি কোথায় !

শ্রীমতী কি সত্যি স্বাধীন হতে পারবে ! খাঁচা খুলে দিলেও কি পারবে উড়তে !

রাজশাহী যাত্রার দিন এলো । রত্ন খবর দিয়ে রেখেছিল, তার ট্রেন যখন ঈশ্বরদি হয়ে যায় তখন নবনী ওঠে । নাটোরে অপেক্ষা করছিল হৈম । কোলাকুলির পর তিন জনে রাজশাহীর বাস ধরল । কতকাল পরে আবার এই পথ দিয়ে যাওয়া । সব নতুন লাগছিল। দু'ধারে তাকাতে তাকাতে গল্পগুজব করতে করতে চলল ।

হৈম ছেলেটি মাথায় খাটো । মোমের পুতুলের মতো ফরসা ও নরম । রোজ সাবান মাখে একটি ঘণ্টা ধরে, যদিও এমনিতেই ধবধবে । পোশাক পরিচ্ছদ ফিটফাট ছিমছাম । কথাবার্তা চোস্ত । সব সময় তার মুখে খৈ ফুটছে । কিন্তু কখনো কারো মনে ব্যথা দেয় না । সৌজন্য আর স্নেহ দিয়ে গড়া ।

নবনীও গৌরবর্ণ । দোহারা গড়ন । দীঘল । তার মুখমণ্ডল সুশ্রী ও মার্জিত । কিন্তু প্রসাধনের প্রসাদে নয় । এমনি । তার আচরণে ধীরতা ও স্বভাবে সংযম । তার আয়ত নেত্রে বিষাদমলিন গভীরতা । সৌম্য শান্ত প্রীতিকর তার ব্যক্তিত্ব । কিন্তু সে কাজের লোক নয় । একসঙ্গে বেড়াতে বেরোলে সে-ই সকলের পিছনে পড়ে থাকে ।

বাস স্ট্যাণ্ডে কানন উপস্থিত ছিল । তার গোল মুখ হাসিতে খুশিতে আরো গোলগাল দেখাচ্ছিল । এই এক বছরে সে তালগাছের মতো বেড়েছে, চওড়াও হয়েছে কতকটা । পশুদের দুঃখে কাতর বলে তার চেহারায় কিন্তু করুণ ক্লিষ্ট ভাব নেই । যেমন গিরীনের চেহারায় । মঙ্গোলিয়ান ছাঁদের চোখ নাক । হরদম সিগারেট ফুঁকছে । প্রাণোচ্ছল ।

ওরা কাননের সঙ্গে তার কাকার বাসায় গিয়ে দেখে গিরীন কখন থেকে বসে আছে । লম্বা রোগা রোদে ঝলসানো । মুখে বসন্তের দাগ । ড্যাবড্যাবে চোখ । গায়ে একটা খদ্দরের আলখাল্লার মতো বেঢপ পাঞ্জাবী । হাঁটু পর্যন্ত ঝুল । পায়ে ক্যানভাশের জুতো, রং চটা, তালি দেওয়া । কতকটা সাধুসন্তের মতো দেখতে । প্রায় মৌনী ।

কোলাকুলি ও কুশলবিনিময়ের পর ওরা চা খাচ্ছে এমন সময় প্রভাত ও ললিত এসে জুটল । ললিত নামেই ললিত । মালকোঁচা মারা জবর জোয়ান । সব রকম খেলায় ওস্তাদ । লোহার মতো শক্ত ওর মাংসপেশী । লোহার মতোই কালো । চোখে চশমা । সেটার ভগ্ন দশা । বোধ হয় বল লেগে । বনেদী ঘরের ছেলে । ভদ্র । মজলিসী ।

সাত ভাই চম্পার সকলে সমবেত। এমন অর্ধোদয় যোগ অনেক দিন ঘটেনি । সাত জনের বিছানা একসঙ্গে পাতা হলো । একখানা ফরাস, পাশাপাশি সাতটা বালিশ । খাওয়াদাওয়ার পর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে কথা যেন ফুরোতে চায় না । রাত এগারোটার পর নবনী, হৈম ও গিরীন ঘুমিয়ে পড়ে । রাত বারোটার পর কানন ও প্রভাত । জেগে থাকে ললিত ও রত্ন । দেয়ালের দিকে, এক টেরে ।

রত্ন যেন এই সুযোগটির প্রতীক্ষায় ছিল । বলল, 'ভাই ললিত, তুমি তো জান শ্রীমতী আমাকে চিঠি লেখে । কিন্তু এত বার চিঠি লেখালেখি হলো, এখনো পরিচয় হলো না । সে কে ? কার কী হয় ? বেগমপুর কোথায় ?'

'ও ঃ !' ললিত বিস্মিত হলো । 'তোমাকে এসব কথা জানায়নি এখনো ? কী তা হলে এত লেখে ?'

'সোনালী বলে সেই ধর্ষিতা মেয়েটির কাহিনী। ক্লাইভ থেকে লর্ড লিটন প্রমুখ ইংরেজের দুষ্কৃতি। বিপ্লবের আবশ্যকতা। গান্ধীজীর ব্যর্থতা। ভালো কথা, ললিত, তুমি কি ওর বিপ্লববাদী মণ্ডলীর সদস্য হয়েছ ?'

ললিত যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'বিপ্লববাদী ! মণ্ডলী ! কারা এসব রটায় ! ওর মণ্ডলী বলতে কী বোঝায়, জান ? জনকয়েক দরদী বন্ধু ও আত্মীয়। দেশের মুক্তির নাম করলে ওর সঙ্গে মেলামেশা সহজ হয়। নইলে যা কড়া পর্দা। ওরা নবাবী আমলের রইস। ইংরেজ শাসনের উপর বরাবর অপ্রসন্ন। ইংরেজী শিক্ষার উপর মুসলমানদের মতোই বিরূপ ছিল। এখনো দুটো একটা পাশ করলেই ঢের হয়েছে মনে করে। চাকরি তো করতে হবে না।'

রত্ন থামিয়ে দিয়ে সুধাল, 'শ্রীমতীর মুক্তি কার হাত থেকে ? কেন ?'

'ও ঃ! শ্রীমতীর মুক্তি ! সেইটেই আসল। যাকে পায় তাকে ধরে, মুক্তির উপায় বল। আরে, নারীর মুক্তি কি দেশের মুক্তির মতো অত সহজ ? এক বছরে স্বরাজ হতে পারে, কিন্তু এক বছরে নারীর মুক্তি হয় কখনো ? দশ বছরেও কি হবার ? আস্তে আস্তে পর্দা প্রথা উঠে যাবে, মেয়েরা একটু একটু রাজনীতি করতে বেরোবে, ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো প্রেমেও পড়বে অল্পস্বল্প। তবে, হাঁ, ঘরগেরস্তালি স্বামীসেবা কাচ্চাবাচ্চা বাঁচিয়ে। শ্রীমতীর কিন্তু তর সয় না। সে দেশের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপ দেবে। যার আশায় ঝাঁপ দেবে তেমন পুরুষোত্তমই বা কোথায় !'

'কিন্তু কেন মুক্তি চায় তা তো বললে না ?'

'তা হলে গোড়া থেকে বলতে হয়। রাত হয়েছে। শোবে না ?'

'রাত হয়েছে বলেই তো সুবিধা। কেউ শুনতে পাবে না। বল।'

তখন ললিত বলে গেল শ্রীমতীর ইতিবৃত্ত।

ওদের বাড়ী গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। আগে পলাশীর কাছে ছিল। ওর বাবা জমিদারি থেকে যা পান তাতে কুলোয় না। জজ কোর্টে ওকালতী করেন। মেয়েকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন, তার পর বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়াতেন। কলকাতায় পড়ত বড় ছেলে শ্রীশেষপ্রতাপ। সে এক দিন তার বন্ধু অনুপকে নিয়ে এলো অতিথি রূপে। অনুপ এখন একজন বিখ্যাত স্বরোদী। তখনি তার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু টাকার জন্যে তো বাজাত না। ঘরে টাকাও ছিল না। তা ছাড়া ওরা দত্ত। এরা সিংহ রায়। তাই শ্রীমতী যখন ওকে বিয়ে করবে বলে চিঠি লিখল তখন ওর বাবা অশেষপ্রতাপ ক্ষেপে গিয়ে ওর অন্যত্র বিয়ে দিলেন। যাঁর সঙ্গে বিয়ে তিনি বেগমপুরের রাধামাধব ফৌজদারের পুত্র যশোমাধব। যাঁর ছোট এক বোন সুশীলা ললিতের বৌদি। বেগমপুর কোথায় ? লালবাগের কাছে।

বিয়ের কিছু দিন পরে কী যে ঘটল স্বামীস্ত্রীতে, শ্রীমতী বাপের বাড়ী থেকে ফিরতে চাইল না, সোজা বলে বসল স্বামীর ঘর করবে না, ও নাকি স্বামীই নয়। বাপ মা কেন শুনবে ? বিয়ের পর বাপমা'র কী অধিকার ? স্বামীই সর্বাধিকারী। যার সম্পত্তি তাকে

ফেরৎ পাঠাল। শ্রীমতী এসে দেখে যশোবাবু তাঁর প্রথম পক্ষের মৃত পত্নীর বিধবা দিদি সুধাকে আনিয়েছেন তাঁর রুগ্‌ণা জননীর সেবিকা রূপে। শ্রীমতীর জন্যে অন্য ঘর বরাদ্দ হয়েছে। তখন ও মেয়ের যা রাগ! থাকতেও পারছে না, ফিরতেও পারছে না। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, গঙ্গাস্নান বারণ হলো। এর পরে ওর খুব অসুখ করে। সারে না। তখন ওর ইচ্ছায় ওকে পাঠাতে হলো ওর মামার বাড়ী ভাগলপুর। মামার নাম ময়ূরবাহন সিং। রইস ও অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট। শ্রীমতীর জন্ম তাঁর বাড়ীতেই। ছেলেবেলাটা ভাগলপুরেই কেটেছে। ওখানে গিয়ে অসুখ সারতে দেরী হলো না, জন্মস্থানের জলহাওয়া মানুষকে খুব সাহায্য করে। শ্রীমতী ওখানে রয়েই গেল শরীর ফেরাবার নাম করে। এক বছর যায়, এমন সময়ে সে ওখানেও বাধিয়ে বসে এক কাণ্ড। বাড়ীর ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম। জানাজানি হতে যাচ্ছে, হলে প্র্যাকটিসটি মাটি। তাই ডাক্তার চোখ বুজে বিয়ে করে ফেললেন আরেক জনকে।

তখন শ্রীমতীর দশা রাই উন্মাদিনীর মতো। তার মামা তাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়তেন, যদি না রাধামাধববাবু অগ্রসর হয়ে তাকে বেগমপুর নিয়ে যেতেন। যশোবাবু হঠাৎ বিলেত চলে যান পুলিশের নজর এড়াতে। ভদ্রলোক অসহযোগ আন্দোলনে বিলিতী কাপড় পুড়িয়েছিলেন, বিলিতী মদের বোতল ভেঙেছিলেন। যদিও কাপড়গুলো তাঁরই, বোতলগুলোও তাঁর নিজেরই। সুধা শ্রীমতীর পা ধরে মাফ চায়, শ্রীমতীর মহল শ্রীমতীকে ছেড়ে দেয়, নিজে ঠাকুরঘরে আশ্রয় নিয়ে রাতদিন প্রার্থনা করে যশোবাবুর মঙ্গলের জন্যে। এ হলো সত্যিকারের প্রেম। যে যাই বলুক এ প্রেম নিছক কায়িক সুখ নয়। শ্রীমতী তার স্বামীকে কায়িক সুখ দিলে সুধাকে ও সুখ দিতে হতো না। সুধা ও রকম মেয়েই নয়। দু'জনের ভিতরে একটা প্রীতির সম্বন্ধ বরাবরই ছিল, সেইজন্যে যশোবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাননি। সেটাকে রতির সম্বন্ধ হতে দিল কে? শ্রীমতী স্বয়ং।

যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। ভুলে গেলেই হয়। শ্রীমতী কিন্তু কিছুতেই ভুলবে না। আড়াই বছর যশোবাবু বিলেতে ছিলেন, সেই সুযোগে শ্রীমতী রাজনীতিক্ষেত্রে স্থান করে নেয়। অলঙ্কার খুলে দেয় গান্ধী মহারাজকে। তার পর শ্বশুরকে জিতিয়ে দেয় লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে। এক চালে বাজী মাৎ। শ্বশুর তার কাছে কৃতজ্ঞ। বাড়ীর পর্দা বজায় রেখে তিনি তাকে মেলামেশার স্বাধীনতা দিলেন কয়েকটি বাছাবাছা কর্মীর সঙ্গে। এরা আসে প্রকাশ্যে ভারত উদ্ধারের জন্যে। গোপনে শ্রীমতী উদ্ধারের জন্যে। কিছুতেই ও মেয়ে স্বামীর ঘর করবে না। ললিতও এ দলে ভিড়েছিল। শ্রীমতীর প্রতি তার সহানুভূতির কারণ ছিল এই যে, বিলেত থেকে ফিরে ওর স্বামী সুধাকে নিয়ে থাকেন, সুধাকে দিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে শ্রীমতীর জন্যে সেইটুকুই মজুত। উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে কোন্ স্ত্রী রাজী হয়! বিশেষত শ্রীমতীর মতো তেজী মেয়ে!

এক দিন ললিত ওকে সোনালীর জন্যে কিছু করতে বলেছিল। সেইসূত্রে সোনালীর কাহিনী শোনাতে হয়। তার থেকে এলো সাত ভাই চম্পার কথা। রত্নর নাম। প্রভাতের নাম। শ্রীমতীর 'মণ্ডলী'তে যারা ছিল তারা রাজনীতির দীক্ষা নিয়েছে। সমাজ অপেক্ষা করতে পারে, রাজনীতি করবে না। তা হলে সোনালীর জন্যে কিছু করতে হলে সাত

ভাই চম্পাকেই বলতে হয় । নবনী-হৈমর বিয়ে হয়ে গেছে, গিরীন তো কলির ভীষ্মদেব । ললিত রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে । কানন এখন পশুদরদী, নারীর জন্যে তার দরদ নেই । অন্তত তাই তো সে বলে । বাকী রইল প্রভাত ও রত্ন । এদের দু'জনের মধ্যে রত্নই বেশী নরম । এ কথা শুনে রত্নকে চিঠি লেখে শ্রীমতী ।

ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আসছিল, কিন্তু ঘুমের ঘোরকে অতিক্রম করেছিল গল্পের নেশা । আবার কবে কোথায় দেখা হবে, এমন সুযোগ মিলবে !

রত্ন জিজ্ঞাসা করল, 'শ্রীমতী কেন বাপের বাড়ী ফিরে গিয়ে লেখাপড়া শেষ করে না ? তার পরে কোনো রকমে স্বাবলম্বী হয় না ?'

'ওঁরা সাফ বলে দিয়েছেন যে সন্তানসম্ভাবনা ভিন্ন অন্য কোনো উপলক্ষে ওঁদের ওখানে যাওয়া চলবে না। গেলে মুখদর্শন করবেন না। ফেরৎ পাঠাবেন তৎক্ষণাৎ।'

'তা হলে মামার বাড়ী ? ভাগলপুর ?'

'সেখানে গেলে ডাক্তারটির মুখদর্শন করতে হবে । শ্রীমতীর সেটা অসহ্য ।'

'তা হলে আর কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ী ? মাসী পিসী খুড়ীর ?'

'কেউ সাহস পায় না ওকে ডাকতে বা রাখতে । ও যেখানে যাবে রোমান্স ওর সঙ্গে সঙ্গে যাবে। ওর দোষ কী। ওর সৌন্দর্যের দোষ। যেই দেখে সেই মুগ্ধ হয়।'

রত্ন ক্লান্ত হয়ে বলল, 'তা হলে উপায় ? তোমরা ওর মণ্ডলীর সভ্যরা কী বল ?'

'ও যদি মনঃস্থির করতে পারত আমরা যা হয় একটা উপায় খুঁজে বার করতুম । কিন্তু ওর নিজের মতি স্থির নেই । মুক্ত হতে ও বদ্ধপরিকর, কিন্তু মুক্তির জন্যে কী মূল্য দেবে, না আদৌ দেবে না, এই নিয়ে ওর অন্তহীন ভাবনা ও আমাদের অন্তহীন মাথাব্যথা । ওর আবার সবাইকে সন্দেহ । আমাকেও । যেন আমি ওর গায়ে হাত দিতে উদ্যত ।'

সাত

ভোর বেলা যাদের ঘুম ভাঙল তাদের হৈ চৈ শুনে আর সকলের ঘুম ছুটে গেল । রত্ন আর একটু স্বপ্ন দেখত, কিন্তু নবনী সুর করে আবৃত্তি শুরু করে দিল—

'হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার ।'

চলল সাত জনে চা খেয়ে পদ্মা দর্শনে । শরতের নদীতে বন্যাবেগ নেই । তবু তার প্রসার বহু দূর । চেনা চর অদৃশ্য । অচেনা চর মাথা তুলছে । নৌকো চলেছে কত রঙে পাল উড়িয়ে । স্টীমারের ধোঁয়া দিগন্তে ।

বাঁধের এক জায়গায় ওরা আসন নিল । অতীতে সেইখানে ছিল ওদের সান্ধ্য পরিক্রমণের সময় বিশ্রামঘাট । সেইখানে বসে সাত ভাই চম্পার তর্ক বিতর্ক জল্পনা

কল্পনা গল্প সল্প চলত । এখন আর কেউ সেখানে যায় না ।

রত্নর মনে পড়ছিল তখনকার দিনের পারুল বোনটিকে । সকলের সব কথা বার্তার আড়ালে সোনালী প্রচ্ছন্ন ছিল । কেউ মুখে আনত না তার নাম । কিন্তু মনে মনে সকলেই জানত যে সোনালী যত দিন বন্দিনী ততদিন তারা স্বাধীন নয়, তাদের উপর উদ্ধারের দায় । পারুল না থাকলে সাত ভাই চম্পা থাকে না । সে-ই যেন সাত জনকে এক ডোরে বেঁধেছে । বাঁধন ছিঁড়লে তারা সাতটি একক, কিন্তু সাত জন মিলে সপ্তক নয় ।

সোনালী এই শহরেই আছে । তার রাত কাটছে কী বীভৎস শয্যায় ! দিন কাটছে গভীর লজ্জায় ! কোনো দিন কি তার ভাগ্য পরিবর্তন হবে ! পারুলের যখন এই দশা তখন সাত ভাই চম্পার ভবিষ্যৎ ভেবে কী ফল ? নিয়তিই যদি সব তবে পরিকল্পনার ভান কেন ? কী করে জানলে যে তোমাকেও ঘটনাচক্রে সোনালীর মতো অবস্থায় পড়তে হবে না ? একই অবস্থায় নয় অবশ্য । কিন্তু পুরুষও তো সমাজে পতিত হয় । রাজদ্বারে দাগী হয় । কত রকম অত্যাচারে তার আত্মা ভেঙে যায় ।

সোনালীর প্রসঙ্গ উঠতেই হৈম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'কবে সোনালীর জন্যে কীই বা করেছিলুম, এখনো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বুড়ো জমাদার পথেঘাটে সেলাম করে । ওরা জানে কাজটা আমরা নিঃস্বার্থভাবে করেছিলুম। হেরে গিয়েও আমরা জিতে গেছি ।'

কিন্তু আর কারো উৎসাহ লক্ষিত হলো না । কথাটা ঐখানেই সাঙ্গ হলো । বাসায় ফিরে গিয়ে তারা বৈঠক করল । বৈঠকের বিষয় : কে কোন্‌খানে ছিল, কোন্‌খানে এসে পৌঁছেছে, মানসিক পরিস্থিতিটা কী । রত্ন যা বলল তার সার মর্ম—

সে ছিল বিদ্রোহী, এখনো তাই আছে, অধিকন্তু হয়েছে মরমী । বিদ্রোহী চায় ওমর খৈয়ামের মতো এই বিশ্রী খাপছাড়া বাস্তবটাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের মধ্যে এনে নির্মমভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে । অথচ মরমীর চোখে মায়া অঞ্জন আঁকা । ওই চোখ দিয়ে সে যাই দেখে তাই সুন্দর । কেন তা হলে ভাঙবে ! কাকেই বা ভাঙবে !

এই সব নয় । এক হিসাবে যেমন সে বিদ্রোহী তথা মিস্টিক আরেক হিসাবে তেমনি লীলাবাদী তথা নাইট । তার জীবনটা হবে তার লীলা । বাঁচবে সে লীলাকুশলের মতো । মরবে যখন তখন যেন প্রত্যয় হয় যে লীলা করে গেল । যা কিছু করবে তা যেন সলীল হয়, স্বতঃস্ফূর্ত হয় । কিন্তু কঠিন কিছু করতে না পারলে সে বাঁচতে চায় না । বীরত্ব বিনা জীবন অসার । সকলের কাছে সে বীরত্ব প্রত্যাশা করে, নিজের কাছে সব চাইতে বেশী ।

এও সব নয় । সে ইতিহাসের একজন তথা চিরকালের একজন । বিবর্তনের শোভাযাত্রায় আর সকলের সঙ্গে সেও আছে, সেও পৃথিবীকে প্রত্যহ বদলে দিচ্ছে । অথচ সে স্বকালের উর্ধ্বে । যুগযুগান্তর তার কাছে কিছু নয়, লক্ষ লক্ষ বর্ষ যেন কয়েকটি নিমেষ । কেন তা হলে এত ত্বরা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের জন্যে ? এক দিন যা হলো না অন্য দিন তা হবে ।

এই কি সব ? না, আরো আছে। সে কেন্দ্রাভিমুখ তথা কেন্দ্রাতিগ । সে সব দেশ

দেখবে, সব মানুষের পরিচয় নেবে, সব বিদ্যা অধিগত করবে। দেশে দেশে তার ঘর আছে, ঘরে ঘরে তার ঠাঁই আছে, কোথাও সে পর নয়, পরদেশী নয়। তা হলেও সে কোথাও একঠাঁই ঘর বাঁধবে, বনস্পতির মতো শিকড় গাড়বে। অরণ্যে অথবা গ্রামে, যেখানে সভ্যতার কলরোল পৌঁছয় না। কোনো এক নারীর সঙ্গে, যে আলো হাওয়া আগুনের মতো এলিমেণ্টাল। প্রকৃতির কন্যা। প্রকৃতির হাতে গড়া। অকৃত্রিম।

পরিশেষে রত্ন হচ্ছে স্বাধীন মানব তথা প্রেমিক পুরুষ। স্বাধীন যে সে তার স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কিছু কামনা করে না। স্বাধীনতার জন্যে আর সব বিসর্জন দেয়। প্রেমিক যে সে প্রেমিকার জন্যে আপনাকে উৎসর্গ করতে পারলে বাঁচে। বিনিময়ে তার কোনো দাবী নেই। যদি কিছু পায় কৃতার্থ হয়। না পেলে নীরব থাকে।

এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এর থেকে তার পরিত্রাণ নেই। পরিত্রাণের পন্থা খুঁজছে। সে তো রণছোড় হতেই চায়, কিন্তু রণ যে তাকে ছাড়তে চায় না। কমলী নেহি ছোড়তী।

বৈঠকের পর এক সময় প্রভাত বলল, 'আমি তোমার এত কাছে থাকি। কই, এসব তো এত দিন শুনিনি? হাঁ, মিস্টিকের মতো কথা শুনেছি মনে পড়ছে।'

তখন রত্নর মনে পড়ল রানুকে। একান্তে সুধাল, 'প্রভাত, রানু কেমন আছে?'

'ভালো। রানু কি আর সে রানু আছে! মা হতে চলল।' স্নিগ্ধ হাসল প্রভাত।

শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক, হকচকিয়ে গেল রত্ন। তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বলল, 'দেখা হয়েছে?'

'হাঁ, এই তো সেদিন। খালাস হবার জন্যে বাপের বাড়ী এসেছে। মুখে স্বর্গীয় আভা। চিরন্তন মাতৃত্বের আলেখ্য। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। এই তো আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের কল্যাণী নারী।' প্রভাত যখন ভাবপ্রবণ হয় তখন হাস্যকর হয়।

রত্নর ভিতরকার মিস্টিক কোথায় তলিয়ে গেল, বিদ্রোহী ফণা তুলল। উষ্ণ হয়ে বলল, 'যে কোনো ষাঁড়ের সঙ্গে যে কোনো বকনাকে জুটিয়ে দাও। দেখবে সনাতন মাতৃত্বের চিত্র। আমাদের পরম পূজনীয়া গোমাতা। কিন্তু নারীকে এর মধ্যে পাবে না। প্রভুকে 'না' বলতে পারে না যে সে নারী নয়। রানুর নারীত্ব বলতে কতটুকু অবশিষ্ট রইল তাই বল।'

প্রভাতও ব্যথা বোধ করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ফূর্তি। রানুর জন্যে তার কেরিয়ার মাটি হতে যাচ্ছিল। কেরিয়ার গেলে পুরুষমানুষের আর কী থাকে! কেরিয়ার হচ্ছে পুরুষার্থ। পৌরুষ। প্রভাত খুব বেঁচে গেছে। আর রানুও তো একটা অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেলো। মৃত্যু ঘটত। তার বদলে মাতৃত্ব ঘটছে।

প্রভাত গদগদ স্বরে বলল, 'ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। কে জানে রানুর গর্ভে কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন! যাঁর জন্যে তারকবাবুর পিতৃত্বের প্রয়োজন ছিল।'

রত্ন প্রায় ক্ষেপে গেল। শ্লেষের সঙ্গে বলল, 'যাঁর জন্যে প্রভাতবাবুর পিতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না। তুমি দেখছি দৈবজ্ঞ। কার অংশে কে জন্মাবে তাও তোমার নখদর্পণে।'

প্রভাত তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।'ভাই রতন, তুমি যাই বল না কেন, মেয়েরা আদিকাল থেকে এই ভাবেই মা হয়ে এসেছে, এইভাবেই হতে থাকবে। পঙ্ক থেকেই পঙ্কজ হয়। পদ্ধতিটাই পঙ্কিল। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে মিলন হয়তো সুখের হতো। কিন্তু সুন্দর হতো কী করে বলব ? মাতৃত্বটুকুনই সুন্দর। তার আগে যেটা যায় সেটা বিশ্রী। প্রেম দিয়ে তার শোধন হয় না।'

রত্ন কখনো একসঙ্গে এতগুলো অসার উক্তি শোনেনি। তাও প্রভাতের মতো মানুষের মুখে। ক্ষণকাল হতবাক হয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার কথা যদি যথার্থ হয় তা হলে সোনালীর জন্যে আমরা বৃথা মন খারাপ করেছি। তার বিয়ে দিলেও তার স্বামীর সঙ্গে সে পাঁক ঘাঁটত। যে তাকে ভালোবাসে এমন কারো সঙ্গে বিয়ে হলেও তার বরাতে ছিল পঙ্কিলতা। পার্থক্য শুধু এই যে সে একদিন মা হতে পারত। একবার মা হতে পারলে তার পর সব কুশ্রীতার অবসান। কিন্তু, প্রভাত, তোমার কথা যদি মেনে নিই তা হলে স্বীকার করতে হয় যে, End justifies Means.'

এই নিয়ে দুই বন্ধুতে কথা কাটাকাটি হলো। রত্নর কথা হচ্ছে, পদ্ধতিটা প্রেমিকের হাতে লীলা। তার আদি অন্ত সুন্দর। ফল যেমন সুন্দর ফুলও তেমনি। বরং ফুলের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ফলের চেয়েও বেশী। ফলের মধ্যে একটা ইউটিলিটির ভাব আছে, একটা প্রয়োজনীয়তার। ফুলের মধ্যে বিশুদ্ধ বিউটি, অহেতুক সৌন্দর্য। নরনারীর মিলন নিয়ে কত কাব্য কত রোমান্স হয়েছে। মিলনের ফল নিয়ে তার শতাংশও নয়।

আর প্রভাতের কথা হচ্ছে, সোনার সঙ্গে যেমন খাদ মেশানো থাকে তেমনি প্রেমের সঙ্গে কাম। এই মিশালটুকু আবশ্যক। এ না হলে সৃষ্টিপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়, প্রা·। নির্বংশ হয়। একে যারা অনাবশ্যক বলে তারা সমষ্টিগত নির্বাণবাদী। অপর পক্ষে একে আবশ্যক বলে মাথা পেতে নিলেও মাথা হেঁট হয়ে যায় এর কুরূপ দেখে। কুরূপকে সুরূপ বলা মনকে চোখ ঠারা। এর থেকে সৌন্দর্য আসে তখনি যখন সৃষ্টিপ্রবাহ মুক্ত হয়, প্রাণ অনির্বাণ হয়। আঁধার থেকে আলো আসে বলে আঁধার সুন্দর নয়। আলোই সুন্দর। পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব থেকে বিযুক্ত হলে এর মধ্যে কেবল গ্লানি, কেবল ক্লেদ। তা সে বিবাহিত জীবনেই হোক আর বিবাহের বাইরেই হোক। প্রেম এর জন্যে লজ্জিত। অপ্রেম তো নির্লজ্জ দু'কানকাটা। প্রেম যদি শুদ্ধ হতে পারত তা হলে কত ভালো হতো ! কিন্তু দেহধারণ করে দেহী হয়ে শুদ্ধ প্রেম কল্পনা করা যায় না। কল্পনার মধ্যেও মিশাল থাকে। বরং মা হয়ে বাপ হয়ে এর ভিতরকার অশুদ্ধি ক্ষয় করে ফেলাই ভালো। রানুর জীবনে সেটা সম্ভব হলো। প্রভাতের জীবনেও কি হবে না ? পরস্পরের সাহায্যে নয়। এই যা দুঃখ।

রত্ন বলে, 'আমার যদি সন্তান হয় সে হবে প্রেমের সন্তান। তার জন্মরহস্য পঙ্কিল নয়, পরতে পরতে সুন্দর। এখানে উদ্দেশ্য ও উপায় এক ও অভিন্ন। এমনভাবে অবিচ্ছিন্ন যে কেউ বলতে পারে না কোন্‌টা উদ্দেশ্য ও কোন্‌টা উপায়। সেইজন্যে বলতে হয় প্রেমই প্রেমের উদ্দেশ্য। একটা সম্পূর্ণ পদক্ষেপ। তার মধ্যে অপত্যকামনা নেই, যদি থাকে তো এমন গভীর ভাবে নিহিত যে মনেরও অগোচর। সকলের কি

সন্তান হয় ? যাদের হয় না তারা কি তা বলে অন্ধকার থেকে আলোকে আসে না ? অশুদ্ধি ক্ষয় করে শুদ্ধি লাভ করে না ? অন্ধকার যাকে ভাবছ তাও উজ্জ্বল । অশুদ্ধ যাকে বলছ তাও শুদ্ধ । এর মধ্যে লজ্জার যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে জোর খাটানো । আমি তো কোনো মেয়ের উপর জোর খাটাতে যাব না । বিয়ের মন্ত্র পড়লেও না । কেন তবে আমি লজ্জিত হব ?'

প্রভাত দুষ্টু হাসে । কেন হাসছে বলে না । পীড়াপীড়ি করলে বলে, 'তুমি তো কোনো মেয়ের উপর জোর খাটাতে যাবে না । কেননা জোরে তার সঙ্গে পারবে না । কিন্তু সে যদি তোমার উপর জোর খাটাতে যায় ? তখন ?'

রত্ন যেন আকাশ থেকে পড়ে । এও কি কখনো সম্ভব !

'তোমার চেয়ে আমি বয়সে দু'বছরের বড় । সে দু'বছর আমি নষ্ট করিনি । সংস্কৃত পড়ে ব্যাকরণতীর্থ হয়েছি । কাব্যতীর্থ হবার যোগ্যতা রাখি । ওদের চিনতেন আমাদের আর্য ঋষিরা । তাঁরা ছিলেন বহুদর্শী পুরুষ । বহুবিবাহ থেকে বহুদর্শিতা জন্মায়, তা তুমি মানবে না যদিও । বহুদর্শীরা কী লিখে গেছেন, জান ?'

রত্ন অস্ফুট স্বরে বলে, 'কী ?'

প্রভাত তেমনি অস্ফুট স্বরে বলে, 'অষ্টগুণ ।'

কিসের অষ্টগুণ, কার অষ্টগুণ সে ভেঙে বলে না । হাসে । সে যত হাসে রত্ন তত রাগে ও রেঙে ওঠে ।

'সংস্কৃত ভাষায়', প্রভাত হেসে বলে, 'অবলা বলে কোনো শব্দ নেই । ওটা দেশজ। অবোলা থেকে অবলা । ওরা কথা বলে না, সেটা ঠিক । কিন্তু ওদের বল নেই, এটা ভুল । মহাশক্তিস্বরূপিণী ওরা । মহাভারতে একটিও দুর্বল স্ত্রীচরিত্র নেই ।'

রাত্রে শায়িত অবস্থায় আবার যখন বৈঠক বসল প্রভাত একটা প্রোগ্রাম দিল ।

ধর্মের মুখোশ এঁটে বহু লোক স্বার্থসিদ্ধি করছে । এদের মুখোশ খুলে ফেলতে হবে । সুস্থ মানুষ কি 'স্বাস্থ্য' 'স্বাস্থ্য' করে চেঁচায় ? তা হলে এরা অত 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে ছাদ ফাটায় কেন ? তার পর শাস্ত্র বলতে কেবল ধর্মশাস্ত্র বোঝাত না । অর্থশাস্ত্রও বোঝাত, কামশাস্ত্রও বোঝাত । এরা সে তথ্য বেমালুম চেপে যায় । কথায় কথায় শাস্ত্রে দোহাই দিতে যদি হয় তবে শুধু ধর্মশাস্ত্রের দোহাই কেন ? অর্থশাস্ত্রের কেন নয় ? কামশাস্ত্রের নয় কেন ? অবশ্য নির্বিচারে দোহাই দেওয়া বা দোহাই মানাও ঠিক নয় । বিচারের অধিকার সব মানুষের জন্মগত অধিকার । এ অধিকার দাবী করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে । জনগণকে অধিকার-সচেতন করতে হবে । দীর্ঘকাল তাদের অচেতন করে রাখা হয়েছে । সেইজন্যে তারা অত সহজে পরাধীন হতে পেরেছে । পরাধীনতার প্রতিকার সচেতনতা । চরকায়াং নৈব নৈব চ । চরকা কেটে দেশ স্বাধীন হবে না ।

এমনি করে রাজনীতি এসে পড়ল । কেউ প্রতিবাদ জানাল, কেউ সাধুবাদ । ললিত নিয়ে এলো বিপ্লববাদ । আর কাননের যা স্বভাব । সে রিভলভার পর্যন্ত এগোল । তখন ফরফর করে বলে গেল হৈম, 'চার দিকে ধরপাকড় চলছে । সুভাষ বোস গ্রেপ্তার । একটু বুঝে সুঝে কথা বলতে হয় ।'

নবনী ফিস ফিস করে বলল, 'কী হে, কানন, তুমি কি আমাদের ধরিয়ে দেবে বলে এখানে ডেকে এনেছ ?'

সবাই একদম চুপ । ছুঁচ পড়লেও শোনা যেত । দেয়ালেরও কান আছে । তার পর কখন এক সময় কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল হালকা বিষয়ে । বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়নি, তাদের নাম কাগজে লিখে ভাঁজ করে লটারি করা হলো । যার নাম আগে উঠবে সে-ই বিয়ে করবে আগে । নাম উঠল ললিতের ।

ললিত কবুল করল যে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে । কোন্‌খানে ? না বেগম পুরে । কার সঙ্গে ? না যশোবাবুর সব চেয়ে ছোট বোনের সঙ্গে । মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ । কিন্তু বড্ড কচি । ললিতের নিজের মত নেই ।

এর থেকে এলো বেগমপুরের গল্প । কিন্তু সে কেবল রত্নর সঙ্গে ললিতের । আর যারা ছিল তাদের আগ্রহ ছিল না, তাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ অন্য বিষয়ে আর কারো সঙ্গে কথা বলল । প্রভাত ছিল রত্নর অপর পাশে । শেষপর্যন্ত দেখা গেল তারাই দুই বন্ধু জেগে । আর সকলে ঘুমিয়ে । রত্ন জানত না যে আগের রাত্রেও প্রভাত জেগে রয়েছিল ও সমস্ত শুনেছিল । রত্নর কানে কানে প্রভাত বলল, 'রতন ।'

অন্যমনস্ক ভাবে রত্ন বলল, 'কী ?'

'জান তো, ও মেয়ে অগ্নিসম্ভবা । আগুন নিয়ে খেলতে যেয়ো না । হাত পুড়বে । মুখ পুড়বে । আমার ভয় হয় ললিতের গায়ে ওর আঁচ লেগেছে ।'

'ও আমার আত্মার বোন । ওর সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক । সোনালী ছিল আমাদের সাতজনের বোন । শ্রীমতী শুধু আমার একার । ওকে বাঁচাতে হবে ।'

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস ফেলল । 'একবার পরাজিত হয়ে তোমার শিক্ষা হলো না, রতন ! আবার পরাজয় বরণ ! সোনালীর বেলা তবু আশার আলো ছিল । সে কারো সম্পত্তি নয় । সে কুমারী। শ্রীমতীর বেলা নিরাশার আঁধার । সে তার স্বামীর সম্পত্তি । গোটা সমাজটাই তার স্বামীর পক্ষে । যে যার সম্পত্তির কথা ভেবে স্বামীকেই সমর্থন করে, তাকে নয় । যে দু'চার জন দরদ দেখায় তারা কপট মিত্র । তাদের রাজনৈতিক দাবাখেলায় সেও একটি ঘুঁটি । আর সেও এমন মেয়ে যে চার দিকে এক পাল বেটাছেলে না ঘুরলে জীবনে স্বাদ পায় না । তুমি কি তার সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ হবে ?'

ভাববার কথা । রত্ন বলল, 'আমি আমার আপনার কক্ষচ্যুত হয়ে আর কারো কক্ষসাৎ হব না । নিজের কক্ষে স্থির থেকে যেটুকু উপকার করতে পারি, করব । তুমি তো জান, আমি তাকে চিনতুম না । তুমিই চিনিয়ে দিলে । আর সেও আমাকে চিনত না । ললিত চিনিয়ে দিল । তোমরা দু'জনে চিনিয়ে না দিলে আমাদের দু'জনের চেনাশোনাই হতো না ।'

প্রভাত বলল, 'তা বলে তুমি মালাদিকে ভুলে যাওনি তো ?'

তখন রত্নর খেয়াল হলো যে সে পূর্ব রাত্রে মালাদির ধ্যান করেনি, যেমন করে থাকে প্রতি রাত্রে । প্রভাত স্মরণ করিয়ে না দিলে ধ্যান করত না সে-রাত্রেও । তার ধ্যান জুড়েছিল শ্রীমতী । তার আত্মার বোন । তার একার বোন ।

'না। ভুলে যাব কেন ? মালা আমার জপমালা।' এই বলে রত্ন মালা জপ করতে লাগল।

ঘুম আসছিল না দু'জনের একজনেরও। রত্ন বলল, 'তুমি তা হলে সুখী হয়েছ রানুর মাতৃপ্রতিমা দেখে ? হবে না কেন ? তুমি যে তলে তলে প্রতিমাপূজক।'

প্রভাত বাণবিদ্ধের মতো আর্ত কণ্ঠে বলল, 'সুখী হব। আমি কি পুরুষ নই। পুরুষ মানুষের পক্ষে এত বড় অপমান আর আছে।'

রত্ন এর অর্থ অনুধাবন করতে পারল না। নীরব রইল। প্রভাত তখন ঝড়ের মতো শ্বসিত হয়ে হু হু করে বলে গেল, 'নারী যদি পুরুষের জন্যে মরতে না পারল তবে তার প্রেমের মূল্য কী! প্রেম কি শুধু প্যাশন! আমার প্রেমে রানু যদি একদিন মরে যেত আমি তাকে সারা জীবন সতীর মতো কাঁধে করে বেড়াতুম। মা হতে যাচ্ছে, বেশ। সেও বাঁচুক, আমিও বাঁচি। এবার আমিও প্রেমে পড়ি, বিয়ে করি। আমারও ছেলেমেয়ে হোক।'

রানুর পক্ষ নিয়ে রত্ন দু'এক কথা বলতে প্রভাত ফোঁস করে উঠল। 'যারা হাসতে হাসতে জহরব্রত করত ও তাদেরি দেশের মেয়ে। ওর কাছে আমার প্রত্যাশা তেমনি কঠোর। আমি যদি ওর স্বয়ংবৃত পতি হয়ে থাকি তবে আমার জন্যে জহরব্রতই ওর ধর্ম। এত দিন আমি চোখ বুজে থেকেছি, এখন তো কোনো উপায় রইল না আত্মপ্রতারণার। তুমি তো জান আমি চব্বিশ ঘণ্টা কেমন ব্যাপৃত রাখি আপনাকে। বয়স্যদের সঙ্গে রসের কথা বলি মনের ভার হালকা করতে। তা ছাড়া আমার ব্যসন বলতে কিছু নেই। কাজ। কাজ। কাজ। আমার এই রুদ্র তপস্যার শেষ ফল কী দাঁড়াল! দুর্বলা নারী যথারীতি পতিব্রতা হলো। আমার মতে পত্যন্তরগ্রহণ করল। 'My friend, I have been rejected.'

বলিষ্ঠ পুরুষ ভিতরে ভিতরে ভাঙছিল। রত্নর হৃদয় মথিত হতে থাকল।

পরের দিন সত্যি সত্যি বাঘ এসে পড়ল। খোঁজ করল সাত সাতটি তরুণ কী করতে জমায়েৎ হয়েছে কলেজের ছুটির সময়। পুলিশের লোক পিঠ ফেরাতে না ফেরাতে ললিত হাওয়া হয়ে গেল।

প্রভাত মন্তব্য করল, 'ললিতটা উপরচালাক। যে কোনো দিন ধরা পড়বে।'

রত্ন বিমর্ষভাবে বলল, 'ওর মৌচাকের মক্ষিরানী কি বাদ যাবেন ?'

কানন প্রশ্ন করল, মক্ষিরানীটি কে ? খুলে বলতে হলো তাঁর নাম। দেখা গেল সবাই তাঁর নাম জানে। যদিও জানে না কবে তিনি বিপ্লববাদিনী হলেন।

বৈঠক এর পর জমল না। গিরীন বেরিয়ে গেল রোগী দেখতে। প্রভাতের পূর্ণিয়ায় কাজ ছিল। নবনী ও হৈম উতলা বোধ করছিল তাদের বাড়ীর লোক তাদের ধরপাকড়ের ভয়ে উৎকণ্ঠিত ভেবে। রত্নর মাথায় ঘুরছিল তার অনুপস্থিতিতে শ্রীমতীর চিঠি কার হাতে পড়বে। কানন কী আর করে! আবার বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এলো। রুমাল ওড়াল। কথা রইল আবার বড় দিনের সময় মেলা যাবে। এবার শান্তিনিকেতনে।

সেই দিনই রতন বাড়ী পৌঁছে দেখল চিঠি এসেছে ঠিক, কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি নয়। দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখেছে বিদ্যাপতি। তার সঙ্গে গোঁজা কয়েকখানি ফোটো। অঞ্জনের তোলা। সিঞ্চলে সূর্যোদয়। টাইগার হিল থেকে মাউন্ট এভারেস্ট। কাঞ্চনজঙ্ঘা।

জগতে এমন অপূর্ব সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু ক'জনের ভাগ্যে ঘটবে এর সঙ্গে শুভদৃষ্টি ? জানতে চেয়েছে বিদ্যাপতি। তা হলে অধিকাংশ মানুষের জন্যে সৌন্দর্য পরিবেশনের কী ব্যবস্থা ? তারা কি অল্পে সন্তুষ্ট হবে ? তারা কি নিম্ন অধিকারী ? মনটা বিরস হয়ে যায় যখন ভাবে হিমালয়ও থাকবে, হিমালয়ে সূর্যোদয়ও থাকবে, কিন্তু দেখতে আসবে অতি নগণ্যসংখ্যক লোক। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের বাসনা নেই, যাদের বাসনা আছে তাদের সামর্থ্য নেই। অধিকাংশ মানুষের কোনোটাই নেই, তারা জানেই না তারা কী হারাচ্ছে। সৌন্দর্য অপচিত হচ্ছে এক দিকে। অন্য দিকে অপচিত হচ্ছে জীবন। এই দ্বিবিধ অপচয়ের কী প্রতিকার ? রত্ন কী বলে ? তার কী পরিকল্পনা জনগণের জন্যে ?

রত্ন কী বলবে ? তার মন চলে যায় সুদূর হিমালয় অঞ্চলে। যেখানে চিরন্তন তুষার চিরনীল আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি শিবির রচনা করেছে। নীলিমার বিরুদ্ধে শুন্যতা। কেউ কাউকে হটাতে পারছে না। দ্বন্দ্বের দ্বারা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। এরই মাঝখানে হঠাৎ কোন্‌খান থেকে এসে উদয় হয় সূর্য। বর্ণ-ঝর্ণার দিগন্তব্যাপী প্লাবন বয়ে যায়। যেমন তার সহস্র সহস্র যোজন-জোড়া বিস্তার তেমনি তার তিরিশ হাজার ফুট উচ্চতা। এ মহিমা অতুল, অসীম। রত্ন লেখে, অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ জীবন কাটবে এসব দুর্লভ সৌন্দর্যের থেকে দূরে কোনো নিভৃত পল্লীতে যেখানে ছুটি পাওয়া দুরূহ, ছুটি পেলেও পাথেয় জোটানো শক্ত। তবু যেখানেই তারা থাকুক সৌন্দর্যের কোলেই তাদের অস্তিত্ব। চোখ মেলে যেদিকেই তারা তাকাবে সৌন্দর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। সে সৌন্দর্য সুলভ বলে কম দুর্লভ নয়। এ জগতের প্রত্যেকটি ধূলিকণা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি পাওয়া দুর্লভ। যা পাইনি তার জন্যে উদ্বাহু হয়ে যা পাচ্ছি তার যেন অনাদর না করি। অতি পরিচয় থেকে একপ্রকার অবজ্ঞা আসে। তার ফলে আমরা বিস্মৃত হই যে অতি পরিচিতও অপরিচিত। কত যে সৌন্দর্য রয়েছে তার মধ্যে এখনো তা অজানা। ইচ্ছা করলে ছোট একটা গ্রামে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েও মানুষ নিত্য নতুন সৌন্দর্যের দ্বারা আয়ুষ্কাল ভরিয়ে নিতে পারে।

বিদ্যাপতিকে চিঠি লিখতে লিখতে রত্ন ভুলে গেল যে ছোট একটা গ্রামে জীবন কাটছে না বলেই শ্রীমতী ত্রাহি ত্রাহি করছে। তখনকার মতো সে সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য পাবে সেটুকু আহরণ করবে। হংস যেমন নীর থেকে ক্ষীরটুকু নেয়। সাত ভাই চম্পার বৈঠকের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে এলো গত রাত্রের স্বপ্নের মতো। ওটা যেন আর একটা জগৎ।

আট

অবশেষে এলো তার চিঠি । নাড়াচাড়া করে রত্ন বুঝতে পারল পুলিশের নেকনজর পড়েছে । রত্ন সন্দেহভাজন বলে নয়, শ্রীমতী পলিটিকাল সাসপেক্ট বলে । সেটা অযথা নয় । প্রায় প্রতি চিঠিতেই দু'চার লাইন রাজনীতি থাকবেই । এবারেও ছিল । এই যে চার দিকে ধরপাকড় চলেছে সে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল । তার পর লিখেছিল—

কাল রাত্রে যখন বিছানায় যাই তখন আমার বয়স ছিল উনিশ । আজ সকালে জেগে দেখি বয়স এক বছর বেড়ে গেছে । মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল । লোকে বলে কুড়িতে বুড়ী । আমি এখন তাই । জন্মদিন বলে আনন্দ করব কী ! করবার কী আছে ! তাও যদি সার্থক জীবন হতো । সব সম্ভাবনা হাতছানি দিয়ে সরে গেছে । পড়ে আছে শুধু শূন্য জীবন । ফুল ফুটছে না, কুঁড়িতে শুকিয়ে যেতে বসেছে । জানি আমার বিলেতফের্তা প্রোপ্রাইটর—মালিকের ইংরেজী—এক রাশ উপহার দেবেন । সেটা তাঁর পাঁচ বছরের স্বত্ব স্বামিত্ব মৌরসী মোকররি করতে। উপহার দেবেন তাঁর পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, ভগিনীগণ, আত্মীয়স্বজন । ভেট আসবে প্রজাদের ঘর থেকে । ফুলের তোড়া দিয়ে যাবে দেশকর্মীরা । জ্যোতিদা পাঠাবে সদ্যপ্রকাশিত কোনো বই । আমি জানি ওরা সবাই আমার দীর্ঘজীবন চায়। তবু ওই দীর্ঘজীবন নিয়ে সুখী হবার কী আছে !

দুপুরে এলো একজনের চিঠি । আমার জন্মদিনের সেরা উপহার । ও যদি আর কিছু না লিখে শুধু আমার নাম ধরে ডাকত, যদি শুধু বলত 'তোমার বন্ধু রত্ন' তা হলেও আমার জন্মদিন সার্থক হতো । কিন্তু ও বলছে আমি অনন্যা। ও বলছে ও আমাকে ভারতবর্ষে দেখবে আশা করেনি । আমিই ওর ভারত, এমন কথাও লিখেছে । এ কথা শুনলে কার না সাধ যায় বাঁচতে । বাঁচতে বাঁচতে আদ্যিকালের বদ্দি বুড়ী হতে । এক বছর পরে এমনি একখানি চিঠি লিখো, রত্ন। তা হলে আমার বিশ্বাস হবে যে আমার জীবন ব্যর্থ নয়, আমি মনের সুখে দীর্ঘজীবী হতে পারি । সেইসঙ্গে তোমারও বেঁচে থাকা চাই । আমি যখন একশো বছরের থুড়থুড়ে বুড়ী হব তখন আমার বয়সের গাছপাথরও থাকবে না, থাকবে একমাত্র একজন । সে কে ? যার চোখে আমি অনন্যা ।

রত্ন, তুমি আমাকে যা দিলে তার বদলে আমি তোমাকে কীই বা দিতে পারি, ভাই ! যা কিছু দেখছি সব পরের, মায় আমিও । নিজেই তো আমি পরকীয়। হঠাৎ মনে হলো তোমার হাতে আমি রাখী বাঁধলে কেমন হয় । স্বদেশী যুগের রাখীবন্ধন দিবস গেল, রাখী বাঁধলুম ভাইদের হাতে, একটাই তুলে রেখেছিলুম ; যেটি আমার সব চেয়ে প্রিয় সেইটি । তখন পাঠাতে সাহস হয়নি । তুমি রাজনীতি ভালোবাস না । আজ তো রাজনৈতিক দিবস নয়, আজ আমার জন্মদিন । মনে মনে পরিয়ে দিলুম তোমার হাতে । জান তো হুমায়ুন বাদশাকে এক রাজপুত রানী

এমনি এক রাখী পাঠিয়েছিলেন । সেই সূত্রে হুমায়ুন হলেন তাঁর রাখীবন্ধ ভাই। যদিও কেউ কাউকে কোনো দিন চোখে দেখেননি, দেখলেন না জীবনে । রত্ন, তুমি আমার রাখীবন্ধ ভাই, আমি তোমার রাখীবন্ধ বহিন । কোনো দিন আমাদের চার চোখ এক হয়নি, হবেও না বোধ হয় । তুমি অদর্শন, আমি অদর্শনা, তবু তোমার আমার এ বন্ধন চিরকালের । আর কারো সঙ্গে এ সম্পর্ক পাতাইনি । এ শুধু তোমাতে আমাতে ।

কিন্তু এর একটি তাৎপর্য আছে । বোন যদি কখনো বিপদে পড়ে ভাই তাকে সর্বস্ব পণ করে উদ্ধার করবে । এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তুমি আমার রাখী নিয়ো না, আমাকে ফেরৎ দিয়ো । আমি কিছু মনে করব না । কেনই বা তুমি আমার বিপদের দিনে নিজেকে বিপন্ন করবে ! না, ভাই । তেমন কোনো অনুরোধ করব না । আমি তো কই তোমার বিপদের ক্ষণে আপনাকে বিপন্ন করার অঙ্গীকার দিচ্ছিনে । রাখীবন্ধ বোনেরা দিতনা । সেই রাজপুত রানীও দেননি । তবে আমি তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষিণী হব । তার বেশী আর কী করতে পারি! মেয়েরা তার বেশী পারে না । তাদের হাত পা বাঁধা । কিন্তু মুক্তি যদি কোনো দিন পাই, অবিকল পুরুষের মতো স্বাধীন হই, তখন তোমার বিপদের মুহূর্তে আমিও বিপদ বরণ করব । এ হলো আশা । অঙ্গীকার নয় । দিন দিন আমার আত্মবিশ্বাস কমে আসছে । বিশ্বাস কমে আসছে । আমার মুক্তি সম্বন্ধে । সাত পাকের পাকে চক্রে জড়িয়ে পড়েছি । এ যে কী যন্ত্রণা তুমি কী বুঝবে ! তুমি তো সহজেই মুক্ত ।

তার পর, রত্ন, এ কী করেছ, বল দেখি ! রুপালীকে ভেবেছ আমি ! লজ্জায় মরি ! রুপালী তোমার কাছে সমাধান প্রত্যাশা করছে । তাকে এখন কী বোঝাই ? তোমার মতে তার কী করা উচিত ? তুমি তাকে কী করতে পরামর্শ দাও ? যা শুনেছ তার চেয়ে বেশী শুনতে চাও তো তাও শোনাব । কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ো ।

তোমার সঙ্গে কথা কি ফুরোবার ! তার আগে হয়তো রাত ফুরোবে । আজ এই পর্যন্ত । তোমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলুম । চোখে দেখতে পায় না বলেই অন্ধ কানে শুনতে চায় অত বেশী । তোমার চিঠি পাওয়া যেন তোমার কথা কানে শোনা । চিঠি নয় তো, বাঁশি । কথা নয় তো, সুর । মত মেলে না, রাগ করি, তবু বুঝতে পারি যে তুমি আমাকে কখনো ঠকাবে না, কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না । কী যে নিরাপদ বোধ করি তোমার কাছে! জ্যোতিদার কাছেও । আর যারা আসে তারা রক্ষকবেশী ভক্ষক । ইতি । তোমার স্নেহাধীনা ।

গৌরী

পদ্মার বুকের উপর দিয়ে যেন একখানা স্টীমার চলে গেল । ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে ফুলতে ফুলতে ফেটে পড়ছে । আছড়ে পড়ছে তটের গায়ে । লুটিয়ে যাচ্ছে ।

মিলিয়ে যাচ্ছে। ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে নদীর পাড়। তেমনি এই চিঠি। রত্ন তার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বালিশে বুক চেপে। দু'হাত জোড় করে মাথাটাকে বেড়ীর মতো বেষ্টন করল। কত রকম ভাব উঠছে, ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ভাঙন লাগছে, মাতন তবু থামছে না!

অনেকক্ষণ পরে রত্ন মুখ তুলে চেয়ে দেখল—রাখী। চিঠির সঙ্গেই ছিল, নজরেও পড়েছিল, কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। সুন্দর রাঙা রাখী। লাল সুতোর সঙ্গে হলুদ সুতো। রুপালী জরির কাজ। রেশমের ফুল। কেউ কখনো তাকে এমন শৌখিন রাখী পরায়নি। মেয়েদের হাত থেকে রাখী নেওয়া এই প্রথম।

রত্ন কি এ রাখী নেবে, না ফেরৎ দেবে?

রাজপুত রানীরা যখন রাখী পাঠায় তখন সে রাখী প্রত্যাখ্যান করলেও সঙ্কট, না করলেও সঙ্কট। প্রত্যাখ্যান করতে শিভালরি-তে বাধে। বীরধর্মে কলঙ্ক লাগে। রানীর অমর্যাদা। নারীর অসম্মান। আবার গ্রহণ করাও তো কম দুঃসাহস নয়। কবে কেমন করে তার বিপদ ঘটবে, যার হাত থেকে বিপদ সে কত বড় প্রবল শত্রু কে জানে! অনির্দেশ্য অপরিমেয় বিপদের জন্যে আগে থাকতে আত্মনিবেদন করা কি মুখের কথা! নিজের স্বার্থ অবহেলা করে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের স্বার্থ পাহারা দেওয়া, পরের প্রাণ ও মান রক্ষা করা কি সহজ কাজ! বিশেষত যখন কেউ কাউকে চোখেও দেখেনি, দেখবেও না।

আর মনে পড়ল যে গৌড়দেশের শাসকের বিদ্রোহ দমন করতে এসে হুমায়ুন বাদশা পেয়েছিলেন এমনি একটি রাখী রাজপুতানার কোনো এক রানীর কাছ থেকে। অচেনা অদেখা বোন তাঁকে রাখীবন্ধ ভাই বলে ডেকেছেন। সাড়া না দিয়ে যারা পারে তারা পারে, কিন্তু হুমায়ুন বাদশা অন্য ধাতুতে গড়া। রাখী তো তিনি রাখলেনই, কিছু দিন পরে নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে রানীর রাজ্য রক্ষার জন্যে লড়তে গেলেন। যার সঙ্গে লড়লেন সে তাঁর শত্রু নয়। তার সঙ্গে লড়াই রাজনীতি নয়। তবু তাঁকে করতে হলো রণ। কারণ তিনি যে রাখীবন্ধ ভাই। পরেও কি রানীর সঙ্গে দেখা হলো! না, জীবনে কোনো দিন নয়।

রত্নর অভ্যন্তরে একজন মধ্যযুগের নাইট ছিল, একজন হুমায়ুন বাদশা, নির্বোধের একশেষ, যে নিজের সাম্রাজ্য রাখতে পারল না, দেশ থেকে বিতাড়িত হলো। ওই রাখী রাখতে গিয়ে হয়তো তার সর্বস্ব যাবে, অথচ ও রাখী ফেরৎ দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রাখী যদি আদৌ তার কাছে না আসত তাহলেই সে নিষ্কৃতি পেতো। কিন্তু একবার যখন এসেছে তার কাছে তখন কি তার নিস্তার আছে? তাকেও রাখী রাখতেই হবে, আর পরে যদি কোনো বিপদের সঙ্কেত আসে হুমায়ুনের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হবে।

রাখীটিকে রত্ন যত্ন করে ডান হাতে বাঁধল। মনে করল যেন সে নয়, শ্রীমতী বাঁধছে। শ্রীমতী? না, শ্রীমতী নয়, গোরী। কী মিষ্টি নাম। গোরী! রত্ন মনে মনে ডাকল, গোরী! গোরী! গোরী! বার বার ডেকেও সাধ মিটল না। 'না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, অধর ছাড়িতে নাহি পারে।' তেমনি গোরী নামে।

ঘরের দরজা খোলা ছিল । হীরু ঢুকে বলল, 'কি রে, কী হচ্ছে ? তোর হাতে ওটা কী ? রাখীর মতো মনে হচ্ছে না ? এই কার্তিক মাসে রাখী কে পাঠাল ? আরে, এ যে চমৎকার কাজ করা !'

রত্নুর মুখ শুকিয়ে গেল লজ্জায় । হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজে পেলো না । শ্রীমতীর কথা বাল্যবন্ধুকে বলেনি । বললে সে যদি বকে । যদি বলে পরের ঘরের বৌঝির সঙ্গে অত ফষ্টিনষ্টি কেন ?

কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ আলাপের পর এক সময় রত্নু বলে ফেলল, 'আর হয়েছে আমার বিদেশে যাওয়া ! ইটালী সুইটজারলণ্ড যেখানেই থাকি না কেন, কখন কার কী বিপদ ঘটবে, অমনি ছুটে আসতে হবে কাজ ফেলে । তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো । তোর তো মনোবাঞ্ছা এই যে আমি দেশ ছেড়ে কোথাও না যাই ।'

দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়া দূরের কথা, হীরু তো কুষ্টিয়া ছেড়ে কলকাতা পর্যন্ত যায়নি । যেতে চায় না । কলকাতা গেলে যদি গুণ্ডার হাতে পড়ে । গুণ্ডা নাকি ওখানকার অলিতে গলিতে । লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক । বাপ রে বাপ রে বাপ ! ওসব জায়গায় গেলে কি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে ! কলেজে পড়তে হলে রাজশাহী বা কৃষ্ণনগর যেতে হয় । সেও কি কম দূর ! বাড়ীর মতো আরাম আর কোথাও নেই । সেই জন্যে পড়াশুনাই দিল ছেড়ে । চাকরি করছে । সামান্য রোজগার । উন্নতির আশা নেই । অল্পে সুখী । শখ বলতে একটু গানবাজনা শেখা, সাধ বলতে নিজস্ব একখানা সেতার কি এসরাজ কেনা । আর স্বপ্ন বলতে একটি বিয়ে । তাও ডানাকাটা পরী বা রাজকন্যা নয় । কল্যাণী বধূ । যে গুরুজনের সেবা করবে, তুলসীতলায় সাঁজ জ্বালবে, লক্ষ্মীবারে আলপনা দেবে ।

হীরু বিমূঢ় হলো । হঠাৎ একথা কেন ? কার বিপদ ? কী বিপদ ?

তখন রত্নু একটু একটু করে ভেঙে বলল, 'এই যে রাখী দেখছিস এ রাখী যে আমাকে পরিয়েছে তার যদি কোনো দিন কোনো রকম বিপদ আপদ ঘটে তা হলে আমাকে আমার সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হবে তাকে রক্ষা করতে । পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন । রাখীটা না রাখলেই হতো । রেখে হয়তো ভুল করলুম । কিন্তু রেখেছি যে তুই তার সাক্ষী । তুই না এলে হয়তো কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে রাখীটা খুলে ফেলে বলতুম, আমি তো পরিনি এ রাখী । পিছু হটতুম । তুই এসে আমাকে বাঁচালি । এবার আর আমি পেছোতে পারিনে । পরেছি । সত্য করেছি ।'

হীরু চকিতের মতো বলল, 'সত্য করেছিস ?'

'তুই তার সাক্ষী ।'

'আমি—আমি তার সাক্ষী ?' সে তখনো সম্মোহিত ।

'কিন্তু বলিসনে কাউকে । দশরথ শুনলে মূর্চ্ছা যেতে পারেন ।'

হীরু কথা দিল । কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে অভিনয়ের মতো অলীক লাগছিল । জানতে চাইল মানুষটি কে । ছেলে না মেয়ে । কী হয়েছে ওর ।

রত্ন বলল, 'সেসব বলা বারণ । তাতে ওর বিপদ বাড়বে । ফলে আমারও তো বিপদ ।' কোনো মতে তার বাল্যবন্ধুকে নিরস্ত করল ।

রাত্রে শুতে যাবার সময় রাখীটি আবার হাতে বাঁধল রত্ন । এবার কী জানি কেন তার মনে হতে থাকল রাখী তো সে নিজে বাঁধেনি, বেঁধেছে গোরী, বেঁধেছে অদৃশ্য হাত দিয়ে । পরবে কি পরবে না, এ প্রশ্ন ওঠে না । খুলবে কি খুলবে না, এইটেই প্রশ্ন । ইচ্ছা করলে রত্ন খুলে রাখতে পারত, কিন্তু বলতে পারত না যে গোরী তাকে রাখী পরিয়ে দেয়নি ।

মাঝ রাতে বার বার ঘুম ভেঙে গেল । তাই তো । রাখী এলো কার হাত থেকে তার হাতে ? কে পরালো ? আজ তো রাখীপূর্ণিমা নয় । পূর্ণিমাই নয় । তা হলেও পূর্ণতার ভাব মনে আসে । যে পূর্ণতা সব অপূর্ণতার অন্তরে রয়েছে । বাইরে রয়েছে । ছাড়িয়ে রয়েছে । ছাপিয়ে রয়েছে । রত্ন ঘুমিয়ে পড়ে সেই পূর্ণতার কোলে । শিশুর মতো পরম আশ্বাসভরে ।

রাত থাকতে উঠে চিঠি লিখতে বসল শ্রীমতীকে । লিখল—

গোরী,

তোমাকে এই নতুন নামে ডাকতে কী যে ভালো লাগছে । গোরী ! রাখী-বন্ধ বহিন ! তোমার জন্মদিন গেল । জানলে কিছু একটা পাঠাতুম । অন্তত আমার শুভ কামনা । আজ শুধু সেইটুকু পাঠাচ্ছি । এ কামনা বিলম্বিত হলেও আন্তরিক । গোরী ! রাখীবন্ধ বহিন ! তোমার জন্মদিন অনেক বার ঘুরে ঘুরে আসুক ।

দীর্ঘ জীবনকে তোমার এত ভয় কিসের ? আমার কথা যদি বল, আমার ভয়ও নেই লোভও নেই । আমি বিশ্বাস করিনে যে এই একমাত্র জীবন বা এর পরে শূন্য । আমি পূর্ণতাবাদী । পূর্ণ থেকে এসেছি, পূর্ণতে আছি, যাব যখন পূর্ণতে যাব । জীবনের অন্তে জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে । সুতরাং এ জীবন দীর্ঘ হলেও ভালো, হ্রস্ব হলেও ভালো । আজকেই যদি শেষ হয় তা হলেও আমার খেদ নেই, কারণ আজকেই আবার আরম্ভ ।

দশ বছর যখন আমার বয়স তখনো আমার মনে হয়েছে, যা পেয়েছি অনেক পেয়েছি, আমি ধন্য, আমি পূর্ণ । এত ভালোবাসা আমার ভাগ্যে মিলেছে, এত আনন্দ, এত সৌন্দর্য যে মরে গেলেও আমার কেনো আফসোস থাকবে না । পনেরো বছর বয়সেও আমার এই একই অনুভূতি ছিল । বিশ বছরেও এই একই । গোরী, তোমার এই জন্মদিনটি আমার জীবনে এসেছে মাস ছয়েক আগে । সেদিন আমি এই কথাই ভেবেছি যে আমার ভাগ্যে যা মিলেছে তা প্রভূত । যা মেলেনি তার জন্যে আফসোস করব না । ইতিমধ্যে তুমি এলে । যা মেলালে তা অপূর্ব ।

তার পর, গোরী, এ কী করলে । বিধাতার কাছে আমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিনি । আমার প্রার্থনা ছিল, আমাকে কোরো স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে স্বাধীনতম । তার উত্তর কি এই রাখী । এই বন্ধন কি আমাকে দেশদেশান্তর থেকে টেনে আনবে

না, যদি কখনো তোমার কোনো বিপদ ঘটে ? ভগবান না করুন । আজ থেকে আমার অন্যতম প্রার্থনা গৌরী যেন কোনো দিন বিপদে না পড়ে । একমাত্র এই ভাবেই আমি স্বাধীন থাকতে পারি । অবশ্য ইচ্ছা করলে রাখীটি আমি খুলে ফেলতে পারতুম, কিন্তু তা যদি করি তা হলে আমি হুমায়ুন বাদশার চেয়ে, মধ্যযুগের নাইটদের চেয়ে, খাটো হয়ে যাই । জানি আমার সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, ধনবল নেই, বাহুবল নেই । আমার পক্ষে ওঁদের সমান হতে যাওয়া মূঢ়তা । তবু একালের এক রাজপুত রানী যে আমাকে হুমায়ুনের মতো ভাবতে পেরেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট ।'

গৌরী, কী দেখে তুমি আমাকে এ গুরু দায়িত্বে বরণ করলে ? আমি যে খুঁজে পাইনে আমার মধ্যে এমন কোনো মহত্ত্ব । একদিন তুমি আবিষ্কার করবে যে ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম । যেদিন আমাকে চাক্ষুষ করবে সেদিন তোমার ভ্রম ঘুচবে । গায়ে জোর নেই । অস্ত্র ধরতে জানিনে । অত্যন্ত সাধারণ চেহারা । বীর পুরুষ বলতে যা বোঝায় আমি কি তাই ? তোমাকে প্রতারণা করে তোমার রাখী ধারণ করা কি উচিত ? সজ্ঞানে তোমাকে আমি প্রতারণা করিনি । অজ্ঞানে করে থাকলে ক্ষমা চেয়ে রাখছি । যখনি তোমার মনে হবে রাখীটি অপাত্রে দেওয়া হয়েছে তখনি আমাকে লিখো, আমি ফিরিয়ে দেব । যা আমার নয় তা নিতে আমার স্বভাবের বাধা । এ কি সত্যি আমার ? জানিনে । শুধু জানি এ অমূল্য । এ আমার রক্ষাকবচ ।

রুপালীর সমস্যার সমাধান ? আমি কি সবজান্তা ? আমি যা বলব তা কি অভ্রান্ত ? তা কি তোমার পছন্দ হবে ? তবে শোন । রুপালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে । উদ্ধার করতে হবে তার হৃত স্বাধীনতা, তার মানবিক জন্মস্বত্ব । এক দিক থেকে দেখলে দুর্ভাগ্য সোনালীর বেশী, রুপালীর কম । অপর দিক থেকে দেখলে রুপালীর বেশী, সোনালীর কম । সোনালী স্বাধীন, সে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বিয়ে করতেও পারে, না করতেও পারে, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিতেও পারে, না দিতেও পারে । রুপালী স্বাধীন নয়, সে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তার হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে জীবনান্তকাল অবধি ।

এই যে একজনের হয়ে আরেক জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিয়ে সেটাকে একজনের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না । এ স্বাধীনতা ঈশ্বরদত্ত । রুপালীর স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি বিদ্রোহীর স্বাধীনতা । রাজামাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা প্রজামাত্রেরই আছে। আর প্রভুমাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার স্বাধীনতা দাসমাত্রেরই আছে । এ হলো স্বাধীনতা ফিরে পাবার স্বাধীনতা । রুপালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে ।

কিন্তু হতে চাইবে কি সে ? হতে চাইলেও দাম দিতে চাইবে কি ? কেমন করে জানব ? আমি তো অন্তর্যামী নই । ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, বংশগৌরব,

নিরাপত্তা, এর কোনটি বা তুচ্ছ । কোনটি বা ত্যাগ করা সহজ । কিন্তু ত্যাগ না করলে মুক্তি কোথায় ! রুপালীকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে । চাই বললেই পাওয়া যায় না । দাম দিতে হয় । স্বাধীনতার দাম সোনারুপার চেয়ে, সামাজিক মর্যাদার চেয়ে, বংশগৌরবের চেয়ে, নিরাপত্তার চেয়ে বেশী । এসব কথা রুপালীকে বোঝায় কে ? আমি তো পারব না । তোমারি এ কাজ ।

সোনালীর সমস্যা এক হিসাবে অত কঠিন নয় । ভাগ্যে থাকলে সে তার মনের মানুষ পাবে । সে মানুষ যদি মানুষের মতো মানুষ হয়ে থাকে তবে সোনালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব । যদিও সম্ভাবনা স্বল্প । কিন্তু রুপালীর ভাগ্যে তেমন মানুষ মিললেও সোনার শিকলের বাধা দুস্তর । আইনের বাধা তো আছেই । সমাজসম্মত স্বামীর গ্রাস থেকে তাকে উদ্ধার করা নরক থেকে ত্রাণ করার চেয়েও দুরূহ । সে আপনি বিদ্রোহী না হলে আর কেউ কিছু করতে পারবে না ।

যাক, এসব ভাবনা ভেবে মাথা ঘামানোর অবসর আমার কই ? আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে । এবার ফিরে গিয়ে পড়াশুনায় মন বসাতে হবে । আর তিন মাস বাদে পরীক্ষা । আমার জীবনের শেষ পরীক্ষা । পরীক্ষার পর আর পড়ছিনে । পড়তে পড়তে যদি জীবন ভোর হয়ে যায় তবে বাঁচব কখন ? দেখব কখন ?

চিঠি লিখতে গিয়ে রাত ভোর হয়ে এলো । বাইরে বৈষ্ণবীর প্রভাতী গান শুনতে পাচ্ছি । ও থেমে থেমে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে । রোজ এই করে । একমাস ধরে করবে । ওই আমার কল্পনার স্বাধীনা নারী । ওর কোনো বাঁধন নেই । সাথী আছে, সাথী কিন্তু প্রভু নয় । স্বয়ং ভগবানকেও সে প্রভু ভাবে না । তিনিও কি প্রভু হতে চান ? তিনি কান্ত ।

গোরী , এখন তা হলে আসি । চতুরীকে দেখতে ইচ্ছা করছে । স্বাধীনাকে দেখলে আমি অপূর্ব প্রেরণা পাই । জানতে চাই কী আছে ওর মধ্যে । রূপ তো নেই । তবে কী ? রস । শিখতে হবে রস কাকে বলে ।

অজস্র শুভকামনা জেনো । ইতি।

তোমার রাখীবন্ধ ভাই

চিঠি লিখে রত্নর মনটা হালকা হয়ে গেল । বিপদকে দূর থেকে যত ভয়ঙ্কর মনে হয় বিপদ আসলে তত ভয়ঙ্কর নয় । তা যদি হতো মানুষ এত রকম দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে এসে সভ্যতার মুখ দেখত না, মাঝ রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ত । দুর্যোগকে সুযোগে পরিণত করতে জানলে মানুষের হার নেই । মানবাত্মা অদম্য ।

তার উল্লাস, তার গর্ব এই যে জন্মদিনে গোরী আর কাউকে রাখী পাঠায়নি, পাঠিয়েছে একমাত্র তাকেই । ডাক পড়ে অনেকের, বেছে নেওয়া হয় অল্প কয়েকজনকে। এক্ষেত্রে মাত্র একজনকে বেছে নিয়েছে নিয়তি । কী জানি কোন্ দুর্লভ সুকৃতির দরুন । মনোনয়ন পেয়েছে রত্ন । একমাত্র রত্ন । গৌরবে তার মাথা উঁচু হয়ে গেছে । সে রাখীবন্ধ ভাই । একালের হুমায়ুন । সকলের কাছ থেকে সে এটা গোপন রাখতে চায় । অনাবশ্যক

নম্রতার সঙ্গে কথা বলে । জানে তার উচ্চতা বেড়ে গেছে। তবু এমন ভাব দেখায় যেন সে লজ্জায় নতশির । শুধু উচ্চতা নয়, দায়িত্ব বেড়ে গেছে । কী এক দুর্জ্ঞেয় গুরুভার তার উপর ন্যস্ত !

নয়

চিঠিখানা ডাকে দিতে না দিতেই আরেকখানা হাজির । সাধারণ খাম, যা ডাকঘরে কিনতে পাওয়া যায় । তার ভিতরে এক্সারসাইজ বুক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া পাতা । দ্রুত হস্তাক্ষরে কী লিখেছে শ্রীমতী ? এ কী !

এ চিঠি পড়া হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলবে । ললিত গ্রেপ্তার । খুব সম্ভব মাগুালের পথে । ছোট ননদের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল । ললিতের ইচ্ছা নয়, সেইজন্যে কি সে স্বেচ্ছায় ধরা পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল ? ও ছেলের মনের তল পাওয়া ভার । ও বোধ হয় আরেকজনকে ভালোবাসে । কাকে, বলব ? না, থাক । এইসব হতাশপ্রেমিকদের জন্যে দুঃখ হয় । কিন্তু এদিকে যে আমি মুশকিলে পড়লুম । ছোট ননদের বিয়ে না হলে এরা আমাকেই দোষী করবে । সাবু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে আর আমার উপর ঠোঁট ফোলাচ্ছে । যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর । সত্যি, কৃতজ্ঞতা বলে দুনিয়ায় কিছু নেই । বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল কে ? সে আমিই । নইলে ও বাড়ীতে এক মেয়ে দেবার করুণ অভিজ্ঞতার পর আরেক মেয়ে দিতে কেউ এত দিন গা করেনি । এখন আমার প্রোপ্রাইটর পর্যন্ত আফসোস করছেন আর আমার দিকে সজল চোখে তাকাচ্ছেন । বড় মাছটা চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ।

আচ্ছা, আমি এখন কী করতে পারি ! ললিত যদি পুলিশকে দেখিয়ে দেখিয়ে সাঙ্কেতিক লিপি পাচার করে ও ধরা পড়ে আমার কী করবার আছে ! আমি অত কাঁচা মেয়ে নই । আমি বলছি আমি এর মধ্যে নেই । প্রোপ্রাইটর তবু সজল চোখে তাকাবেন । তাঁর বিশ্বাস আমি এর মধ্যে আছি । শুনছি পুলিশ সাহেবকে বিরাট ডালি পাঠানো হয়ে গেছে। তাঁর অধীনস্থদের যাঁর যেমন মর্যাদা তাঁকে তেমন নজরানা দিতে সদরে ম্যানেজারবাবু গেছেন । যাতে এ বাড়ীতে খানাতল্লাসী না হয় । বা আমাকেও গ্রেপ্তার না করে । আমি তো তৈরি । কিন্তু আমাকে ধরছে কে ? আমি যমেরও অরুচি ।

রত্ন, তোমার কাছ থেকে আগাম বিদায় নিয়ে রাখছি । লিখতে যদি দেয় জেল থেকে চিঠি লিখব । এটাও তো একটা জেল । দুঃখ করার কী আছে ? অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন । বরং ওরই মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে । একটু হাওয়াবদল । ভালো কথা, আমার রাখীশুদ্ধ চিঠি কি তোমার হাতে পড়েনি ? পুলিশে আটক করেছে নিশ্চয় । কত কথা লিখেছিলুম তাতে । আর কি সময়

আছে দ্বিতীয় বার লেখার ? এ চিঠি যার মারফৎ যাচ্ছে সে এই মুহূর্তে রওনা হচ্ছে । সেখান থেকে ডাকে ছাড়বে । ডাকঘরের খামে । ভালোবাসা চিরকালের জন্যে ।

একেই বলে বিপদ । রত্ন শিউরে উঠল । ললিত—যাকে সেদিন রাজশাহীতে দেখে এলো সে—এখন হাজতে কি কোথায় ভগবান জানেন । গোরী—যার চিঠি এইমাত্র পেলো সে—এতক্ষণে জেনানা ফাটকে কি কোথায় দেবতারাও জানেন না ।

রত্নর মুখ শুকিয়ে গেল ভাবনায় । টেলিগ্রাম করলে হয় । কিন্তু কাকে করবে ? গোরীকে না তার প্রোপ্রাইটরকে ? কোন্ অধিকারে করবে ? টেলিগ্রাম যদি পুলিশের খর্পরে পড়ে তা হলে সেও তো সন্দেহভাজন হয় । একই দলের বলে তাকেও তো ধরতে পারে । তা বলে সেই ভয়ে পেছিয়ে যাওয়াও তো রাখীবন্ধ ভাইয়ের সাজে না । কী গেরো !

তার মনে পড়ল যে খবরের কাগজে যাদের নাম বেরিয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীমতীর নাম নেই । গ্রেপ্তার হলে তার মতো বিখ্যাত মহিলার নাম নিশ্চয় কাগজে উঠত । ছবিও ছাপা হতো । এত বড় একটা খবর চেপে যাওয়া সম্ভব নয় । ললিত না হয় নগণ্য ছাত্র, শ্রীমতী যে বেগমপুরের ছোট তরফের জমিদারবধূ ।

রত্ন আরো কয়েকখানা খবরের কাগজ খুঁজে পেতে পড়ল । একখানার এক কোণে গ্রপ্তারীদের তালিকায় ললিতানন্দ বর্মণের নাম ছিল । রত্ন লক্ষ করে বিমর্ষ হলো । বেচারা ললিত । সেদিন হাওয়া হয়ে গিয়েও নিস্তার পেলো না । অমন একখানি বপু যার সে গা ঢাকা দেবে কোথায় ! ফাঁদ পাতা ছিল, আটকে গেল ।

এর পর প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া রত্নর কাজ হলো । যদি শ্রীমতীর নাম থাকে । ছবি বেরোয় । দেখতেও সাধ যায় ওকে । পশ্চিমে ফিরে যাওয়ার দিন এসে পড়ল । রত্ন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় এলো চিঠি । আবার সেই নীল খাম । ভিতরে সেই নীল রঙের কাগজ । রত্ন আশ্বস্ত হলো । যাক, বিপদ কেটে গেছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল ।

চিঠিখানা খুলতে না খুলতে ঝুপ করে একখানা ফোটো খসে পড়ল । ছোট একটা স্ন্যাপশট । দেখি, দেখি । রত্ন তুলে নিয়ে দেখল । না, স্ন্যাপশট নয় । বড় সাইজের ফোটো থেকে কেটে নেওয়া একটি বাস্ট । সম্ভবত গ্রুপ ফোটো থেকে । আরো যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে মালুম হয় বিয়ের সময়কার ফোটো থেকে ।

এই গোরী ! রত্ন অশেষ কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করল । কই, প্রভাতের বর্ণনার সঙ্গে তো মেলে না । মিলবে কী করে ! ও যে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের নবোঢ়া । ব্রীড়ায় নতমুখী । নিষ্পাপ নিরীহ । বিষম একটা আঘাত পেয়ে বিষাদময়ী । সচকিত সশঙ্ক । তবু কী সুন্দর ! কলিকা বয়সে এই ! ফুটলে কি রূপের অবধি থাকবে ! রত্নকে আরো আনন্দ দিল তার আবিষ্কার যে কোথাও প্যাশনের পূর্ব লক্ষণ নেই । প্রভাত বলেছিল কতক মেয়ে থাকে যারা এমনিতেই গরম । কই, তা তো মনে হয় না ।

শ্রীমতী লিখেছিল—

সুখবর দিচ্ছি । ললিত ছাড়া পেয়েছে । তবে একটা শর্ত আছে । অবিলম্বে বিয়ে করতে হবে । এটা আমার প্রোপ্রাইটরের কারসাজি । পুলিশের তরফ থেকে প্রস্তাব । কলকাটি নাড়ছেন ম্যানেজার । ললিতের বাবা এখন এমন কৃতজ্ঞ যে কাল দিন ফেললে কালকেই ছেলের বিয়ে দেন । তা যাক, বিয়ের দেরি আছে । তোমাদের সবাইকে আসতে হবে বরযাত্রী হয়ে । সাত ভাই চম্পার সাত জনকেই একসঙ্গে দেখতে চাই । বিশেষ করে একজনকে । রত্ন, তোমার ওজর আপত্তি শুনব না । জান তো, আমার বন্দী জীবন । তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে করতে পাব না । কিন্তু বিয়েবাড়ীর হৈ চৈয়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাবেই । বর যখন আসবে তখন তার এক পাশে তুমি থাকবে । বর যেখানে বসবে তার এক পাশে তুমি বসবে । তোমাকে আমি চিনে নেবই । নারীর সহজাত দৃষ্টি দিয়ে ।

কিন্তু তুমি কি আমাকে চিনতে পারবে ? সন্দেহ । পুরুষের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ । ভাবলুম তোমাকে আমার একখানা ফোটো পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় । তা দেখে চিনবে । কিন্তু ফোটো খুঁজতে গিয়ে দেখি কোনোখানাই আমার পছন্দ হয় না । বুড়ো বয়সের ফোটো দেখে তোমারই বা কোন্ সুখ ! দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি । গড়ন যখন আমার রজনীগন্ধার মতো ছিল, বরণও ছিল তেমনি, তখনকার একটা ফোটোর একাংশ পাঠাচ্ছি । কাউকে দিয়ো না । কাছে রেখো । ও বয়স আর ফিরবে না । বিয়েতে এসো কিন্তু । না এলে নিরাশ হব ।

তুমি বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছলে যে আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে । এখন তুমি শুনে নিশ্চিন্ত হতে পার আমাকে ধরবে না । আমি কিন্তু একটুও খুশি নই । কেন আমাকে ধরবে না ? আমি এমন কী অপদার্থ ? আমি কি দেশের জন্যে কম করেছি ? প্রকৃত ব্যাপার কি, জান ? চুপি চুপি বলছি । ওরা সব খবর রাখে। আমাকে পাকড়াবে বলে সব ঠিক করে রেখেছিল । মাণ্ডালে চালান দিত । কিন্তু কোন্ দেবতাকে কী দিয়ে তুষ্ট করতে হয়, কাকে বেলপাতা, কাকে তুলসী, এ বিদ্যা আমাদের ম্যানেজার মশায়ের চোখের তারায় । যার দিকে একবার তাকাবেন তার কিসের উপর লোভ তা নির্ঘাত জানতে পারবেন । লোকটা তান্ত্রিক সাধক। সত্তর বছর বয়স হলো । যুবার মতো উজ্জ্বল তাঁর চোখ । ম্যানেজার জানতেন ম্যাজিস্ট্রেট ডালি নেবেন না, রাগ করে গালি দেবেন । তাঁকে দিতে হয় নবাবী আমলের ছবি । বিনা মূল্যে নয় । নামমাত্র মূল্যে । সাহেবের ছবির সঞ্চয় চমৎকার। সব বাড়ী থেকে একখানা দু'খানা গেছে । এত দিন এ বাড়ী থেকে যায়নি । আমরা যেতে দিইনি । এবার একসঙ্গে খান দুই গেল । আলিবর্দি খাঁর রাজসভার ছবি। আমার শ্বশুর মশায় তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন । আজকের বাজারে চল্লিশ হাজার টাকার কম নয় । যদিও মূল চিত্র কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না ।

অতএব আমি গ্রেপ্তারের অযোগ্য । ম্যাজিস্ট্রেট নাকি আমাদের বাড়ী চা খেতে আসবেন । আমি তাঁর মেয়ের বয়সী । আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করবেন ।

তিনি আমার বাপের মতো। তবু এ বাড়ীর সম্মান রাখতে তাঁর ও আমার মাঝখানে একটা মোটা চাদরের পর্দা খাটানো হবে। তিনি কথা কইবেন, আমি শুনব। তার পর আমি কথা কইব, তিনি শুনবেন। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাব না। কী অত্যাচার, বল দেখি! এসব কেতা যদি এখনো মানতে হয় তবে স্বাধীনতা কিসের জন্যে ও কার জন্যে? ইংরেজই বা এসবের প্রশ্রয় দেয় কেন? ও বোধ হয় ভাবছে মাঝখানে যদি পর্দা না থাকে আমি হয়তো ওকে গুলী করে বসব। আমার নামে অনেক বাজে কথা শুনেছে নিশ্চয়।

দূর হোক, মন ভালো নেই। বন্দিনী যদি হতে হয় রাজবন্দিনী হতুম। দেশশুদ্ধ লোক সুখ্যাতি করত। দেশটাও মুক্তি পেত। আমিও। গৌরবে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হতো। না হয় কারাগারেই প্রাণ যেত। সেও কত বড় একটা ভাগ্য! তা তো হবার নয়। পচতে হবে এই অন্তঃপুরের অন্ধকূপে। কূপমণ্ডুক হয়ে। মণ্ডুক রাজকুমারের সঙ্গে। সাধ আহ্লাদ বলতে আমার ওই মণ্ডলী। কিন্তু ধরপাকড়ের ফলে মণ্ডলী এখন বিপর্যস্ত। ললিতের নাম করলুম। অন্যান্যদের নাম করা বারণ। ওরা কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। বাইরে আছে একমাত্র জ্যোতিদা। সে হলো গান্ধীপন্থী। যদিও সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত উদারপ্রকৃতির যুবক। সে-ই আমার অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ।

তার পর, রত্ন, তুমি তা হলে আমার 'রাখীবন্ধ' স্বীকার করলে! আমার বড় ভয় ছিল তুমি হয়তো আমার শর্তে রাজী হবে না, রাখী ফিরিয়ে দেবে। দিলে আমি কী করতে পারতুম, বল! অবলা নারী আমি। সংসারে আমার আপনার বলতে কে আছে! মা বাবা তো সাফ বলে দিয়েছেন যে মা না হলে তাঁদের বাড়ী যাওয়া নিষেধ। দাদা তো সেই ব্যাপারটার পর থেকে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। দিদিরা হিংসুটে। তাদের ধারণা আমি তাদের বরদের জাদু করব বলে মোহিনী রূপ ধরে এসেছি। ছোট বোনটা আমার অনুগত ছিল। কিন্তু তার বর তাকে চোখে চোখে রেখেছে, পাছে আমার মতো বকে যায়। আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সকলের মনোভাব মোটের উপর একই রকম। পাঁচ বছর হলো বিয়ে হয়েছে, কেন এতদিন মা হইনি? মা না হলে নারী নিরাপদ নয়। তাকে দিয়ে অন্যের অনিষ্ট হতে পারে। অন্যের দ্বারা তার সর্বনাশ হতে পারে। তার স্বামী আবার বিয়ে করতে পারে। তার পর মা হতে পারলে কত বড় একটা নিশ্চিতি। স্বামী তাড়িয়ে দিলে ছেলে পুষবে, স্বামী মারা গেলে ছেলে সহায় হবে, ছেলেই নারীর জীবনবীমা। সকাল সকাল মা হয়ে রাখাটা শেষ বয়সের অন্নসংস্থান। আমার মতো নির্বোধ আর কে আছে!

সন্তু আমার ছোট ভাই আমাকে ভক্তি করে। তার মতে আমিই ঠিক। সে বেঁচে থাকুক। আপদে বিপদে সে-ই একমাত্র ভরসা। মাঝে মাঝে দেখা করে যায়। বলে, 'সেজদি, আমি বড় হলেই তোকে এখান থেকে নিয়ে যাব। ক'টা দিন সবুর কর।' ছেলেমানুষ, ও কী বুঝবে, কেন আমি সবুর করতে নারাজ। তুমি ওর চেয়ে বড়। তুমিও কি বোঝ! শুনে অভিমান করলে তো?

রূপালীর কথা যা বলেছ তা মানি। তাকে স্বাধীনা হতে হবে সব আগে। কিন্তু মরে যাই তোমার রুচি দেখে! স্বাধীনা নারীর আদর্শ হলো কোথাকার এক বোষ্টমী! তোমার চিঠি পাবার পর মুহূর্ত থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছি এই নিয়ে। এখন বুঝলে তো কেন আমার মন ভালো নেই। ওসব মেয়ের সংসর্গ ছাড়ো। ওরা ডাকিনী। তোমার সর্বনাশ করবে একদিন। আমি তোমার রাখীবন্ধ বহিন। তোমাকে রক্ষা করা আমারই তো কর্তব্য। কী করে রক্ষা করব এত দূর থেকে? যদি তুমি আমার কথা না শোন। রত্ন, তোমার যদি আমার উপর কিছুমাত্র মমতা থাকে তুমি চতুরীর দিকে আর তাকাবে না, ওর চাতুরীতে ভুলবে না। আমার মাথার দিব্যি রইল। তোমার জন্যেই আজ আমার এ মাথাব্যথা। ইতি।

তোমার রাখীবন্ধ বহিন

গৌরী যে গ্রেপ্তার হয়নি, ললিত যে ছাড়া পেয়েছে, এ দুটি খবর রত্নকে তৃপ্তি দিল। তবে ললিতের বিয়ের কথায় সে একটুও খুশি হতে পারল না। যাকে ভালোবাসে না তাকে বিয়ে করবে, নিজে জ্বলবে, আরেকজনকে জ্বালাবে— কে জানে, হয়তো আরো একজনকে। কী দরকার ছিল এর! জেল থেকে বেরিয়ে আসা কি এতই জরুরি! এলেই দেশ স্বাধীন হবে।

রত্ন লক্ষ করেছিল শ্রীমতী এবার গৌরী বলে স্বাক্ষর করে নি, ভালোবাসা জানায়নি। রত্ন যে ওসব চায় বা আশা করে তা নয়। বরং ওসব দেখে বিব্রত বোধ করে। ওর চেয়ে এই ভালো। তবু তার মনের কোণে কাঁটা খচখচ করে। গৌরী অনুমোদন করে না চতুরীর প্রতি তার সরস মনোভাব। তার সপ্রশংস দৃষ্টি। গৌরী সন্দেহ করে চতুরীকে।

বৈষ্ণবী যে স্বাধীনা এই সরল সত্যের দিকে চোখ বুঝে থাকতে হবে, এ কী বাদশাহী ফরমান! রাখীবন্ধ ভাই কি আঁখিবন্ধ ভাই! চতুরীকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। বয়সে অনেক বড়। কাছেই কোনোখানে ওর আখড়া। কিন্তু এক আখড়ায় বেশী দিন ও থাকবে না। মাঝে মাঝে অদর্শন হয়ে যাবে। এক বছর কি দু'বছর বাদে ফিরবে। ইদানীং রত্ন নিজে প্রবাসে থাকে, চতুরীর খোঁজখবর রাখে না, দৈবাৎ দেখা হয়। ও যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। ওর বয়স বাড়েনি বোধ হয় দশ বছর ধরে। এদিকে রত্ন আর ছোট ছেলেটি নয়। কত বড় হয়েছে। এককালে যা শুনে হাঁ করে থাকত এখন তা শুনলে নাক কান সিঁদুর হয়ে ওঠে, লুকোতে পথ পায় না। 'কই, আমার মনোচোরা কই গো? আমার নাগর কোথায়?' রত্ন এসেছে জানলে বৈষ্ণবীও আসে।

রূপসী নয়। রসবতী। হাবে ভাবে চলনে বলনে কটাক্ষে রসের ঝরনা ঝরছে। কেমন চূড়া করে কেশ বাঁধে। মোহন চূড়া। শম্ভু চূড়া। অর্ধেক আকর্ষণ ঐ কেশে। বাকীটা সুমধুর স্বরে। রসালাপে। ক'টি বাউল বোষ্টম পার করেছে সেই জানে। জ্যাঠাইমা এই নিয়ে পরিহাস করলে সে অপ্রতিভ হয় না। বলে, 'মধু থাকলে ভ্রমর আসে। ফুলের অপরাধ কী?' গুনগুনিয়ে ওঠে, 'ও সে রসিক ভ্রমর জানে ফুলের মর্ম অরসিক তা জানে না।'

কই, কখনো তো মনে হয়নি যে সে ডাকিনী। তার একখানা ভালো কাপড় কি গয়না নেই, বাক্স কি তৈজস নেই, জমি নেই, বাড়ী নেই, সেসব দিকে নজর নেই। ডাকিনী হলে কি সে গুছিয়ে নিত না ? এমন কারো নাম শোনা যায় না যার কাছ থেকে সে কখনো টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়েছে বা আর কোনো উপহার। যেদিন যেটুকু দরকার —চাল কি ডাল কি তেল কি নুন—সেইটুকু তার ভিক্ষা। তার বদলে সে যা দিয়ে থাকে তা বহুগুণ মূল্যবান। তার গান শুনতে পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে। কান ভরে ভিক্ষা নিয়ে যায় তার কাছ থেকে। তার পর প্রাণভরে নিন্দা করে। তারা যে স্বাধীনা নয়। সে যে স্বাধীনা।

গৌরীর দু'খানা চিঠির জবাব বাকী। কিন্তু রত্নর হাতে সময় ছিল না। সে তার আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। হীরু চলল তার সঙ্গে স্টেশন অবধি। প্রতি বারের মতো। পথের জন্যে কিছু সন্দেশ রেখে গেল।

কলকাতায় মাসিকপত্র মহলে ঘোরাঘুরি করে দিন দুই কাটল। নবনী ইতিমধ্যে পৌঁছেছিল। সেই হলো তার পাণ্ডা। রত্নর নাম কেউ কেউ শুনেছিলেন, কিন্তু নবনীর মুখ চিনতেন অনেকেই। সে মুখ একটি প্রিয়দর্শন সৌম্য সুজনের।

নবনী ললিতের বিয়েতে বরযাত্রী হবে। সে চায় রত্নও যেন হয়। এ রকম একটা বিয়েতে যোগ দিতে অরুচি নেই নবনীর। সে নিজেও তো এই রকম একটা বিয়েতে বর সেজেছে। কিন্তু রত্ন বিশ্বাস করে না প্রেমবিরহিত বিবাহে।

নবনীর গায়ে লাগে। সে অভিমান করে বলে, 'আমাদের দেশের মেয়েদের তুমি চেন না। বিয়ে না করলে বা বিয়ের আশা না জাগালে কোনো মেয়ে তোমাকে এমনি ভালোবাসবে না। এমনি ভালোবাসার জন্যে কি তুমি যৌবন ভোর করে দেবে নাকি ? একদিন না একদিন তোমার হোঁশ হবে। হায়, দিন যে গেল! তখন লালাবাবুর মতো তুমি সংসারত্যাগ করবে না, বিয়ে থা করে সংসারী হবে। আমি না হয় দু'দিন আগে থাকতে করে রেখেছি। আর ভালোবাসার কথা যদি বল, বিয়ের আগে যা মেলে না বিয়ের পরে তা মেলে। কোনো মেয়েই তোমাকে বঞ্চিত করবে না। তোমার জন্যে সর্বস্ব দেবে, রতন।'

রত্ন খুঁৎ ধরে। 'আমাকে নয়। তার স্বামীকে।'

'তুমিই তো তার স্বামী।'

'উঁহু। আমি আমি। স্বামী স্বামী। একই ডালে দুই পাখী বসলে দুই এক হয়ে যায় না। যে মেয়ে স্বামী বলে আমাকে ভালোবাসবে সে স্বামীকেই ভালোবাসবে। আমাকে নয়। যে মেয়ে আমি বলে আমাকে ভালোবাসবে, সে আমাকেই ভালোবাসবে। স্বামীকে নয়। স্বামীর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করলে আমার তাতে কী ? আমার জন্যে যদি অতি সামান্য কিছু ত্যাগ করে সেই আমার কাছে সর্বস্বের অধিক। কারণ তার সবটাই আমার সর্বস্ব। তেমন মেয়ে কি ভূভারতে নেই ? সত্যি জান, নবনী ?'

নবনী এক কথায় উড়িয়ে দেয়। 'নেই।'

'তা হলে আমার জুড়ি নেই এ দেশে। আমাকে দেশান্তরী হতে হবে।'

তা শুনে নবনী আরো ক্ষুণ্ণ হয় । তর্কটা মোড় ঘোরে । কখন এক সময় ওরা প্রেমবিরহিত বিবাহ থেকে বিবাহবিরহিত প্রেমে পৌছয় ।

নবনী চমকে উঠে বলে, 'তার মানে কী হলো ? চণ্ডিদাস ও রামী ?'

'আমি হলে বলতুম, রাধা ও কৃষ্ণ ।'

নবনী আঁতকে ওঠে । 'না, না । আমি ভাবতেই পারিনি । তেমন প্রেম যদি অশরীরী হয় তবে অতৃপ্তি রেখে যায় । আর যদি শরীরী হয় তবে গন্ধ করে । কামগন্ধ ।'

রত্ন হেসে বলে, 'মন্ত্র পড়লে আর গন্ধ থাকে না ? আহা ! মন্ত্রশক্তি !'

নবনী অপ্রস্তুত হয়, কিন্তু নিরস্ত হয় না । তখন রত্ন এই বলে শেষ করে দেয় যে, 'কেউ কারো উপরে জোরজার না করলেই হলো । সেইটেই মন্দ । আর কিছুই মন্দ নয় । আমি কখনো কারো উপরে জোর খাটাতে যাব না । কিন্তু কেউ যদি খুশি হয় ও খুশি করে তা হলে রসের ভিতর দিয়ে যাব । মন্ত্র পড়তে আমার আপত্তি থাকবে না, তবে সমাজের আপত্তি থাকতে পারে ।'

দশ

পশ্চিমে ফিরে গিয়ে রত্ন দেখল প্রভাত আরো আগে ফিরেছে ও পড়াশুনায় ডুব দিয়েছে। ললিতের বিয়েতে যাবে কি না প্রশ্ন করায় এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে লিখল, 'না ।' লিখে রত্নর দিকে বাড়িয়ে দিল । বিচিত্র ব্যাপার ! রত্ন অবাক হলো । তখন প্রভাত আবার লিখল, 'খুশবন্ত সিং দারুণ পড়ছে ।' অর্থাৎ তার প্রতিযোগী তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ।

রত্নর সঙ্গে যার প্রতিযোগিতা সে বিদ্যাপতি । সে যদি দারুণ পড়ত বাধ্য হয়ে রত্নকে মৌনীবাবা সাজতে হতো । সৌভাগ্যের বিষয় সে রত্নর প্রাধান্য মেনে নিয়েছে । চ্যালেঞ্জ করেনি । তাতে দু'পক্ষের সুবিধা । কাউকে দারুণ খাটতে হয় না । তা হলেও প্রথম শ্রেণীটা তো পেতে হবে । সেটা অনায়াসলভ্য নয় ।

প্রথম শ্রেণীর মান রাখতে হলে রীতিমতো কসরৎ করতে হয় । কায়িক নয়, মানসিক । কসরৎ করতে করতে যা হওয়া যায় তার নাম ইনটেলেকচুয়াল । এটা অনেকের পক্ষে—অনেকের কেন, সকলের পক্ষে—শ্লাঘার বিষয় । কিন্তু রত্ন এর জন্যে কুণ্ঠিত । কুস্তিগির হওয়ার চেয়ে সুপুরুষ হওয়া তার কাছে কাম্য । কারণ ওতেই সৌন্দর্য । মনোরাজ্যে সুপুরুষ হওয়া বলতে বোঝায় সুরসিক হওয়া । সুষম হওয়া । এর প্রস্তুতি অন্য প্রকার ।

তা ছাড়া ইনটেলেকচুয়াল হয়ে মানুষ সত্যকে জানতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যবোধ বিকশিত না হলে সুন্দরকে জানতে পারে না । সত্যকে জানবে অথচ সুন্দরকে জানবে না, এর কোথাও একটা ফাঁকি আছে । সেই ফাঁক দিয়ে সত্যও বেরিয়ে যাবে । বিশ্লেষণ শক্তির সঙ্গে সংশ্লেষণ প্রতিভা যুক্ত না হলে সমগ্র দর্শন হয় না । যা হয় তা খণ্ড দর্শন ।

অন্ধের হাতী দেখা । রত্নর এতে বিশ্বাস ছিল না ।

তার পর মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়েরও অনুশীলন চাই । মহৎ অন্তঃকরণ না হলে বৃহৎ মনীষা নিয়ে মানুষ করবে কী ! যা করবে তা অনাসৃষ্টি । মন্ত্রতন্ত্রের মতো যন্ত্রতন্ত্র । মানুষ নিজেই একটা যন্ত্র হয়ে যাবে, কিংবা একটা ময়দানব । রত্ন সেইজন্যে বিশুদ্ধ ইনটেলেকচুয়াল হতে অনিচ্ছুক । পরীক্ষায় বিফল হতে অবশ্য চায় না । কিন্তু সফল হলেও সে অবিমিশ্র সুখী হতে পারে না । শঙ্কা জাগে পাছে তার ভিতরকার রস শুকিয়ে যায় । রসিক অদৃশ্য হয় । প্রথম শ্রেণীতে পাশ না করলে তার আত্মবিশ্বাস কমে যাবে, কিন্তু তা করতে গিয়ে সে হৃদয়বৃত্তির অবহেলা করতে রাজী নয় ।

অঞ্জন একরাশ ফোটো তুলে এনেছিল । হিমালয়ের বিবিধ দৃশ্য । বিদ্যাপতি সেই সব আলোকচিত্রের বর্ণচ্ছটাময় বর্ণনা দিয়ে বন্ধুদের বিমুগ্ধ রাখল । রত্নর মনে হতে থাকল সেও তাদের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গেলে ভালো করত । না গিয়ে ভুল করেছে।

একটু স্থির হয়ে বসার পর রত্ন শ্রীমতীকে চিঠি লিখল । এত দিন কেন লেখেনি তার কৈফিয়ৎ দিয়ে ললিতের বিয়েতে কেন যাবে না তার জন্যে জবাবদিহি করল । আশ্বস্তি প্রকাশ করল গোরী রাজবন্দিনী হয়নি বলে । এক বন্ধন কাটাতে পারছে না বলে আরেক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাওয়া মূঢ়তা । তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিতে যাওয়া যেমন । তার পর লিখল—

গোরী, তোমার কিশোর বয়সের ওই ফোটোখানি পাওয়া আমার জীবনের একটি অনুপম অভিজ্ঞতা । রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি আমার কানে গুনগুনিয়ে উঠছে । সেটিও শরৎকালের অনুভূতি । 'আমার নয়নভুলানো এলে । আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে ।' এদিকে যে শরৎ শেষ হয়ে এলো সে খেয়াল নেই । বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরের জগতের সামঞ্জস্য হচ্ছে না । অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে, 'আমার নয়নভুলানো এলে ।'

মানুষের যতগুলো বয়স আছে তার মধ্যে কৈশোর শ্রেষ্ঠ । 'বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ ।' মনে পড়ে যায় আমার হারানো কৈশোর । ফিরে যেতে ইচ্ছা করে সে বয়সে । হায়, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যেতে পারি, কিন্তু সাতটি বছর পেরিয়ে যেতে পারিনে ! মুখে চোখে আনতে পারিনে সে লাবণ্য, সে লালিত্য । সেদিনের সেই আধো আলো আধো ছায়া অস্পষ্ট অস্ফুট মন আজ কোথায় ! পিছন ফিরে তাকাতে স্পৃহা নেই । জানি সেসব আজ রূপকথা । 'এক যে ছিল রাজা' যেমন, তেমনি 'এক যে ছিল কিশোর ।'

আমার কৈশোরকে আমি তোমার কৈশোরের প্রতিরূপে পুনরাবিষ্কার করলুম । রূপ তোমাকে ভগবান দিয়েছেন । আমাকে দেননি । ওই স্নিগ্ধ কমনীয় রূপ কি এখনো তেমনি আছে ? ওই জ্যোৎস্নার মতো রূপ ? গোরী, তোমাকে দেখতে কি আমার অনিচ্ছা ! কিন্তু সম্ভব নয় । আমি ব্যস্ত । আর আপনাকে দেখাতে আমার

কুণ্ঠা । আমি চির দিনই লাজুক । লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই । ছেলেদের সামনেই বেরোতে লজ্জা । মেয়েদের সামনে তো আরো । আমাকে আমার নিভৃত পরিবেশে না দেখলে চেনা যায় না । হাটের মাঝখানে যাকে তুমি চিনবে সে আমি নয়, আমার স্বনামা কোনো ব্যক্তি । গৌরী, জান তো, সেই রাজপুত রানীর সঙ্গে হুমায়ুন বাদশার কোনো দিন চোখের দেখা ঘটেনি । তবে আমাদের বেলাই বা কেন ঘটবে ?

যার দিকে তাকাতে বারণ করেছ তার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি । নিকট ভবিষ্যতে হবেও না । পরীক্ষার পর যদি আমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ি তা হলে কি আর কোনো দিন দেখা হবে জীবনে ! কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুযোগ আছে, গৌরী । রাখীবন্ধ ভাই কি আঁখিবন্ধ ভাই ? আমার যদি কাউকে ভালো লাগে তার দিকে আমি তাকাতে পারব না ? তা হলে সুরদাসের মতো দু'চোখ বিঁধে অন্ধ করে দিলে হয় । না চোখে ঠুলি পরব কলুর বলদের মতো ? প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যের মতো নারীর বিচিত্র রূপ মানুষমাত্রেরই দর্শনীয় । আমি কি মানুষ নই ? রূপ দিয়ে কি আমি আমার দু'চোখ ভরে নিতে পারব না ? রস দিয়ে আমার অন্তর ? তবে কেনই বা জন্ম নিলুম এ লোকে ? কেনই বা বাঁচব ?

ধনসম্পদ আমি চাইনে । সম্পত্তিতে আমার কাজ নেই । আমার ঐশ্বর্য আমার ভিতরে । কিন্তু এই ভিতরটাকে ক্রমাগত ভরিয়ে নিতে হয় । চোখ দিয়ে কান দিয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে ধ্যান দিয়ে ভরিয়ে নিলেই আমি ঐশ্বর্যবান । নইলে আমি নিঃস্ব । নিঃস্বের কাছে তুমিই বা কী পাবে, গৌরী ? সেইজন্যে বলি, আমাকে চোখ বুজে থাকতে মাথার দিব্যি দিয়ো না । চোখ কান খোলা না রাখলে আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাবে, যেমন শুকিয়ে যায় পুষ্করিণী উৎসমুখ রুদ্ধ হলে ।

চিঠিতে চতুরী সম্বন্ধে আর যা লিখবে ভেবেছিল তা লিখল না রত্ন । চিঠিখানা শেষ করে দিল সহানুভূতির সুরে । সহানুভূতি গৌরীর নির্বান্ধব দশার জন্যে । বাপ মা ভাই বোন কেউ তার সহায় নয় । সকলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয়তা । কে একজন জ্যোতিদা তার একমাত্র নির্ভর । তাঁকে ধন্যবাদ । রাজনীতি প্রসঙ্গে রত্ন একটি কথাও লিখল না । তার মন তখন রাজনীতিবিমুখ । তা বলে স্বাধীনতাবিমুখ নয় । দেশের লোকের স্বাধীনতা সে নিজের স্বাধীনতার মতোই কামনা করে ।

প্রিন্সিপাল একদিন কমিশনারকে হস্‌টেল দেখাতে নিয়ে এলেন । ইনি একটি প্রবন্ধ লিখতে দিলেন আবাসিকদের । আধ ঘণ্টার মধ্যে লিখতে হবে হস্‌টেল ওয়ার্ডেনের সাক্ষাতে। যে প্রথম হবে সে পুরস্কার পাবে । রত্ন প্রথম হলো । প্রিন্সিপাল তাকে ডেকে পাঠালেন । জানতে চাইলেন সে কী পেলে খুশি হবে । টাকা না বই ? রত্ন বলল, বই । কী বই ? রত্ন নাম দিল এমন সব বইয়ের যা শ্রীমতীকে উপহার দেওয়া চলে । সব ইংরেজী যদিও । বই যেদিন হাতে এলো সেদিন কী ফুর্তি ! বিদ্যাপতিরা কেড়ে নিতে চায় । সে ছুঁতে দেবে না । তারা বুঝতে পারে না কেন । নতুন বই দেখলে

সে নিজেই তো কেড়ে নিয়ে পড়ে তাদের হাত থেকে । কী করে তাদের বোঝায় এসব বই তার নয়, আরেক জনের ।

বইগুলো গোরীকে পাঠিয়ে চমকে দেবার মতলব ছিল রত্নর । ডাকঘরে গিয়ে পার্সেল করে এলো । পার্সেলের ভিতরে ছোট একখানা চিঠি গুঁজে দিল । তাতে লেখা ছিল মা সরস্বতীর কাছে সে মানৎ করেছিল পুরস্কার পেলে পুরস্কারের বই রাখীবন্ধ বহিনকে রাখীর পরিবর্তে পাঠাবে । বইগুলো যে ভাষায় রচিত সে ভাষা মা সরস্বতীর অজানা । তা হলেও তার আশা আছে গোরী এসব বই পড়ে বুঝবে, না বুঝলে জ্যোতিদার কাছ থেকে বুঝে নেবে ।

ইতিমধ্যে গোরীর চিঠি এলো । বই পাবার আগে লেখা । সাবুর বিয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত । এক দণ্ড ফুরসৎ পাচ্ছে না । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছে । কলমের কালি ফুরিয়ে যাওয়ায় পেনসিল দিয়ে । বঁটি দিয়ে কাটা পেনসিল । জন্মদিনে তোলা ফোটো এনলার্জ হয়ে এসেছে । একখানা প্রিন্ট আলাদা করে পাঠাচ্ছে । ভালো ওঠেনি । চেহারাও তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে । যাবে না ? খাঁচার পাখীর কি রঙের বাহার থাকে ?

রত্ন, আমার রূপের দেদার সুখ্যাতি শুনেছি । কিন্তু তোমার মুখে যা শুনলুম তা একজন জহুরীর অভিমত । আমার আক্ষেপ শুধু এই যে সুখ্যাতিটা আমার এখনকার পাওনা নয় । যখনকার পাওনা তখন যদি তুমি থাকতে ! তোমাকে আমার এখনকার ফোটো পাঠাতে আমার সাহস হয়নি । হতো না । কিন্তু ওই যে তুমি জানতে চেয়েছ আমার রূপ কি এখনো জ্যোৎস্নার মতো আছে, ওই জিজ্ঞাসার উত্তর আর কী ভাবে দিতে পারি ? না, নেই, বললে কি তুমি বিশ্বাস করতে ? এখন দেখ । বিশ্বাস কর ।

তুমি আসছ না জেনে রাগ করেছি । খবরটা আমি প্রথমে পাই ললিতের কাছে কলকাতায় । সে পেয়েছিল নবনীর কাছে । তুমি নাকি এ কথা বলেছ যে তুমি এ বিবাহ সমর্থন কর না ? কেন, মশায় ? ললিত সাবুকে ভালোবাসে না বলে ? কিন্তু সাবু তো ললিতকে ভালোবাসে । সে-ই বা কী করে আর কাউকে বিয়ে করবে ? না সারা জীবন আইবুড় থাকবে ? মেয়েদের দিকটা তোমরা দেখবে না, বুঝবে না, ভাববে না । আমি যা করেছি তা সাবুর মঙ্গলের জন্যে করেছি। ললিতেরও মঙ্গলের জন্যে । সাবুর মতো বৌ পেলে ও বর্তে যাবে । ভালোওবাসবে। তুমি দেখবে আমার কথা ফলে কি না ফলে ।

হাঁ, কলকাতা যেতে হয়েছিল সাবুর জন্যে গয়না পছন্দ করতে । মাসীর বাড়ী উঠেছিলুম । তুমি যদি আর কয়েকটা দিন দেরি করতে তা হলে কলকাতায় দেখা হতে পারত । তা আমিও তো আগে জানতুম না যে কলকাতা যাবার অনুমতি মিলবে । জানলে কি তোমাকে জানাতুম না ?

রত্নর নামে ফোটো এলো আলাদা ডাকে । সে তখন কলেজে । পিয়নের হাত

থেকে নিয়ে চাদরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল । ছেলেরা দেখলে ছিনিয়ে নিয়ে খুলে দেখত । চারটের পর ঘরে গিয়েও কি নিরিবিলি পাবার জো আছে ! একজন না একজন আসবেই । আড্ডা দিতে কিংবা পড়া বুঝে নিতে। সন্ধ্যাবেলা বইপত্র সামনে রেখে বসতে হয় । প্রিফেক্ট্ ঘুরে বেড়ান । সুপারিনটেনডেন্ট টহল দেন।

রাত্রে শুতে যাবার সময় রত্ন দরজায় খিল দিয়ে ফোটোখানা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তুলে ধরল । পোস্টকার্ড সাইজ । একাকিনী শ্রীমতী । একটি বৃহৎ ফুলের তোড়া বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছে । দেশী ও বিলিতী নানা জাতের নানা রঙের ফুল । ও ফুলের আড়ালে ঢাকা পড়েছে আরো দুটি ফুল । যৌবনের ফুল । ঘন কালো চুল কিন্তু শাদা ঢাকাই শাড়ী দিয়ে ঢাকা থাকছে না, ফুটে বেরোচ্ছে । ছুটে আসছে সামনের দিকে সমুদ্রের লহরীর মতো । মাথার কাপড় খসা । ঘোমটার ভান নেই । মুখে ব্রীড়াজড়ানো হাসি । সে হাসি চাউনিতেও । চাউনিতে আরো কিছু আছে । মাদকতা, মদিরতা, বিলোলতা, বিদ্যুৎ, বহ্নি । প্রভাত হলে বলত, প্যাশন । রত্ন বলবে, জাদু ।

অলঙ্কার বলতে দু'হাতে দু'গাছি সোনাবাঁধানো শাঁখা । বাঁ হাতে নোয়া ও শৌখীন হাতঘড়ি । নিরাভরণ হয়ে তার রূপ আরো খুলেছে । কৈশোরে যা ছিল স্নিগ্ধ কমনীয় যৌবনাগমে তা তীব্র রমণীয় । যে ছিল রজনীগন্ধা সে হয়েছে কেতকী । তখনকার বয়সের লালিত্য নেই, লাবণ্য নেই, তার জায়গায় এসেছে প্রাণোচ্ছলতা, প্রখরতা । ভরা নদীর খর ধারা । নিরীহতা নেই, তার জায়গা নিয়েছে তপ্ততা । কিন্তু প্রসাধন বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষিত হয় । যেন কোন্ উদাসিনী রাজকন্যা ।

আট ন'মাস আগে রত্ন কি জানত যে এ জগতে শ্রীমতী বলে কেউ আছে, যাকে দেখতে এ রকম ? প্রভাতের জবানীতে তার নাম ও বর্ণনা শুনে চমক লেগেছিল । সেই সঙ্গে ভয় । তাজ্জব ব্যাপার ! শ্রীমতীকে রত্ন চোখেও দেখেনি, দেখবে বলে মনেও হয় না । তার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই, এমন কোনো সূত্র নেই যে সূত্র ধরে আলাপ পরিচয় হয় । কোথায় শ্রীমতী আর কোথায় রত্ন ! মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান । তবু ভয় একজনকে আরেক জনের । সেই আট ন'মাস আগে গঙ্গার ধারে প্রথম শ্রবণে ।

কেন ভয় ? রত্ন আত্মবিশ্লেষণ করেছিল । ভয় প্রভাতবর্ণিত প্যাশনকে ও রত্নকল্পিত বয়সকে । কিন্তু বয়সে তো মালাদিও বড় । তাঁর বেলা ভয় নেই কেন ? দুর্বোধ্য প্রহেলিকা । প্রহেলিকার উত্তর কি এই যে মালাদির সঙ্গে রত্নর সম্পর্ক নিরাপদ ? তা যদি হয় তবে শ্রীমতীর সঙ্গে তো কোনো সম্পর্কই নেই তার, সেটা আরো নিরাপদ । রত্ন তখন কল্পনাই করেনি যে শ্রীমতী তাকে একদিন চিঠি লিখবে, তার চিঠি পেয়ে ক্ষান্ত হবে না, আবার চিঠি লিখবে । আবার চিঠি পাবে । এমনি করে দু'জনের যোগাযোগ ঘটবে ।

ইতিমধ্যে বয়সের ভয়টা ভেঙেছে । শ্রীমতীই ছোট । কিন্তু প্যাশনের ভয় ? প্রথম ফোটোতে প্যাশনের বিন্দুবিসর্গ ছিল না । দ্বিতীয় ফোটোতে যা আছে তা প্যাশনের নয়, জাদুর সম্মোহন । ওই তো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেয়ারের কাঁধে ডান হাতটি রেখে । বাঁ হাত বুকে চেপে । ফুল দিয়ে ফুল ঢেকে । একটি শ্বেতপদ্ম আর সব দৃশ্যমান পুষ্পকে

নিষ্প্রভ করেছে। ওটি যেন গৌরীর অন্তরের শুভ্রতা। তার জীবনের কুৎসিত অভিজ্ঞতা যেন ওই পদ্মপত্রের জল।

একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ রত্নর চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। আছে, প্যাশন আছে। কিন্তু নয়নে নয়, অধরে। আর ওষ্ঠে। রত্ন অবাক হলো, শঙ্কিত হলো, তাড়াতাড়ি ফোটোখানা বাক্সবন্দী করে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রাণপণে জপ করতে থাকল, মালাদি, মালাদি। এই তার মালাজপ। ধীরে ধীরে তার মনশ্চক্ষে ফুটে উঠল মালাদির মুখ। সে মুখে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, আছে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যভাব। তিনি যেন কোন স্বর্গদূত বা এঞ্জেল। যাঁর দেহ বলতে কিছু নেই। দ্যুতি যেন মূর্তি ধরে নেমে এসেছে ভক্ত উপাসকের ভয় ভঞ্জনের জন্যে। রত্ন নিশ্চিন্ত হলো।

মালাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল শেষ বার গত বড়দিনের সময় কাশীধামে। রত্ন যাচ্ছিল একটা দলের সঙ্গে আগ্রা দিল্লী লখনউ বেড়াতে। পথে কাশীধামে একটা দিন থামতে হয়েছিল। শুনেছিল মালাদির মা তাঁকে নিয়ে কাশীবাস করছেন। তাঁর বাবা কলকাতায় অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে থাকেন। দলের কাছ থেকে এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে সে মালাদিকে দেখতে যায়। দেখে মালাদি শয্যাশায়ী। তাকে পাশে বসিয়ে গল্প করলেন। সহজে উঠতে দিলেন না। না খাইয়ে ছুটি দিলেন না।

প্রাইভেট ম্যাট্রিক পাশ করে মালাদির মন গেল কলেজে পড়তে। কিন্তু কলকাতা তাঁর সহ্য হলো না। তীর্থস্থানে থাকলে অন্তরে শান্তি পান। কাশীতে কলেজও আছে, শান্তিও আছে। তাই কাশীতে অবস্থান। কিন্তু নিয়মিত কলেজে হাজিরা দিতে পারেন না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থাকলে পিঠ ব্যথা করে। ননকলেজিয়েট পরীক্ষা দিতে চান, ভালো একজন প্রাইভেট টিউটর চাই। কিন্তু তেমন লোক বহু দিন সন্ধান করেও মেলেনি। যেই আসে সেই ধরে নেয় যে মালাদির বুদ্ধি কম, তাঁকে বকাঝকা করে। তা তো নয়। অকালবৈধব্যের দুঃসহ আঘাতে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, অতি কষ্টে স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরছে। মেধা এখনো দুর্বল।

ভালো টিউটর হবেন সহানুভূতিশীল, ধৈর্যবান, ধীর। টাকা খরচ করলেই তেমন লোক পাওয়া যায় না। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়। মালাদির মনে হচ্ছে তেমন মানুষ একজন আছেন, তিনি পেশাদার টিউটর নন। তাঁর খুশি হলে তিনি পড়িয়ে যান। ইতিমধ্যে দুটি একটি ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়েছেন, বেতন নেননি। বাঙালী। বাংলাদেশে এম এ পাশ করার পর অন্তরীন হন বা অন্তরীন হবার পর এম এ পাশ করেন। তার পর দিল্লীতে গিয়ে হোমিওপ্যাথী করেন। সেখান থেকে বম্বে গিয়ে জ্যোতিষী হন। এইসব করতে করতে তাঁর বয়স হয় পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। তখন কাশীতে এসে থিওসফি চর্চা করেন। অকৃতদার। স্বল্পাহারী। কোনো রকমে চলে যায়।

মালাদিকে সেদিন মিসেস ব্রাউনিং-এর মতো দেখাচ্ছিল। তেমনি রুগ্‌ণ দুর্বল ক্ষীণকায় অথচ স্বর্গীয় আভায় ভাস্বর। মানুষ তো নয়, দীপশিখা। মোমের মতো শরীর যেন মোমবাতির মতো পুড়ছে। কিন্তু আত্মায় এতটুকুও দীনতা নেই, গ্লানি নেই। তাঁর

সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে আপনাকে পবিত্র মনে হয় । পাগলের মতো একটা খেয়াল মাথায় চাপে । ইচ্ছা করে ব্রাউনিং-এর মতো এই এলিজাবেথ ব্যারেটকে লুট করে নিয়ে পালিয়ে যেতে । ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে । তা হলে দু'জনেরই পূর্ণ বিকাশ হতো । মালাদিও বাঁচতেন, রত্নও সৃষ্টিতৎপর হতো ।

এলিজাবেথ রাজী ছিলেন, মালাদি নারাজ । রত্নও উৎসুক নয় । সত্যি বলতে কি তার জীবনের পরিকল্পনায় মালাদির স্থান পূর্ববৎ ছিল না । তাঁর সঙ্গ তার ভালো লাগে, তাকে প্রেরণা দেয় । কিন্তু তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের দায় নিতে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিরুচি নেই । সে স্বাধীন বিহঙ্গের মতো দেশে দেশে উড়ে বেড়াবে সামনের দশ বছর । পরে হয়তো কোনো এক দুর্গম অরণ্যে বা গ্রামে গিয়ে বসতি করবে । সেখানে তার সাথী হবে কোনো এক মাটির মেয়ে । চাষানী কি মেঝেন । নিটোল স্বাস্থ্যবতী, কর্মক্ষম, সন্তানবহনপটু । মালাদি না-মঞ্জুর । কিন্তু এ হলো অনেক দূরের কথা । এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক কাটানোর ভাবনা ভাবতে পারা যায় না । এখনো তিনি তার হৃদয় জুড়ে রয়েছেন । তাঁকে তার দরকার আছে ।

একলব্যের মতো সে একজনকে সম্মুখে রেখে পূজা করতে করতেই প্রেমশিক্ষা করবে । প্রেমিক হবে । শুধু স্বাধীন হয়েই তার তৃপ্তি নেই । সে যুগপৎ স্বাধীন তথা প্রেমিক হবে । মালাদি তার প্রেমগুরু । যারা পূজা করে তারা নিষ্কাম নয়, তারা ফলাকাঙ্ক্ষী। রত্ন কিন্তু তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না । দিন দিন তার প্রেম শুদ্ধ হচ্ছে । বাসনা কামনা থেকে শুদ্ধ । সে দিতে চায়, নিতে চায় না । সে শিক্ষানবীশ । যারা শিক্ষানবীশ তারা গুরুদক্ষিণা দেয় । পরিবর্তে তাদের কোনো রূপ দক্ষিণা পাবার কথা নয় । তারা যদি কিছু পায় তবে তার নাম দাক্ষিণ্য । মালাদি যদি খুশি হয়ে সঙ্গ দেন তবে রত্ন খুশি হয়ে সঙ্গ পাবে । কিন্তু স্থূল অর্থে নয় । এখনো কেউ কারো গায়ে হাত দেয়নি । সেবাচ্ছলেও না ।

শেষবার দেখার পর প্রায় এক বছর হতে চলল । এই এক বছরে রত্নর প্রণয়চেতনা আরো স্পষ্ট, আরো সাকার হয়েছে । মালাদির জীবনে যদি অত বড় একটা ট্র্যাজেডী না ঘটত তা হলে কি রত্ন তাঁর প্রতি অতটা আকৃষ্ট হতো ? শোকের আগুন তাঁকে দগ্ধ করেছে, তাঁকে শুদ্ধ করেছে । অগ্নিশুদ্ধ কাঞ্চনের মতো তিনি সুবর্ণ । নইলে এমন কী আছে তাঁর মধ্যে যা কাছে টানতে পারে রত্নকে ! তাঁর পরম সম্বল তাঁর ঐ শোক । শোক যদি তাঁর জীবনে না আসত তবে তিনি এমন মহিমময়ী হতেন না । তাঁর আধ্যাত্মিকতা শোকনির্ভর, শোকজ । এর মূল ভিতরে নয়, বাইরে । তবে এ মূল এত দিনে ভিতরে চলে গেছে । এই ক'বছরে ।

সহজাত আধ্যাত্মিকতা নয়, শোকলব্ধ আধ্যাত্মিকতা । প্রভেদটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছিল । তাই প্রেমও ধীরে ধীরে কুণ্ঠিত হচ্ছিল । যতখানি দেওয়া যেত ততখানি দিতে কুণ্ঠিত । প্রেমের সাধনায় দানকুণ্ঠতা এলে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না । রত্ন উপলব্ধি করল সে মালাদির বেলা দানকুণ্ঠ হতে চলেছে । আগে নিতে চাইত না, কিন্তু দিতে চাইত । এখন নিতেও চায় না, দিতেও চায় না । দেওয়া নেওয়া বাদ দিলে যদি

প্রেম থাকে তবে প্রেম আছে। কিন্তু কত কাল থাকবে ? এ কি প্রেম ? না এ ভক্তি ?

প্রেম হোক ভক্তি হোক যেটাই হোক যত স্বল্পকালীন হোক এখনো এর প্রভাব নিবিড়। দুঃখশোক যার জীবনে আসে তাকে একপ্রকার আকর্ষণশক্তি দেয়। সে শক্তি অপরকে চুম্বকের মতো টানে। মালাদি রূপবতী নন। কেউ তাঁকে সুন্দরী বলে ভ্রম করবে না। তবে ফরসাকেও তো লোকে সুন্দর বলে। মালাদি ফরসা ও ফ্যাকাশে। তাঁর মুখের গড়নটি হাতীর দাঁতের কাজের মতো খোদাই করা। রত্নকে মুগ্ধ করে তাঁর পক্ষ্ম। তাঁর ভ্রূলতা। তাঁর ঘন কৃষ্ণ চক্ষুতারকার অপার্থিব দ্যুতি। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর শোকস্তব্ধ মহিমা। তাঁর দুঃখদগ্ধ বরণ। রামায়ণের সেই ক্রৌঞ্চবধূ যেন মানবদেহ নিয়ে এসেছে। দেহ নিয়ে এসেছে, অথচ বিদেহী। মালাদির সঙ্গে থাকলে দেহচেতনা থাকে না।

মোটের উপর এটা একটা মিস্টিক সম্বন্ধ। দু'জনের মধ্যে মনের মিল বা মতের মিল নেই। কায়িক আকর্ষণ নেই। জীবনের পথও এক নয়। তা সত্ত্বেও রত্নর হৃদয়ে মালাদির আসন এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত। রাত্রে শুতে যাবার সময় মালাদিকে মনে পড়বেই। যদিও ক্ষণকালের জন্যে। যেখানেই হোক মালাদি আছেন। তাঁর অস্তিত্ব অদৃশ্য থেকে রশ্মি বিকীরণ করছে। আলো আসছে কালো ভেদ করে। সে আলো আর কারো জন্যে নয়, যে ভালোবাসে তার জন্যে। রত্ন এখনো তাঁকে ভালোবাসে। পূজা করে। কিন্তু ব্রাউনিং-জায়ার মতো নয়। এই রোগিণীর সেবা করার মতো ধৈর্য ও দরদ তার নেই। এই শোকাকুলা নারীর ক্রৌঞ্চশোক তাকে বিধুর করে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। দুঃখিনীর দুঃখ দূর করা তার অসাধ্য। আর কেউ যদি তাঁর ভার নেন সে মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। মিস্টিক সম্বন্ধ থেকে নয়, সাংসারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি। এক কথায় তার প্রেম মানবীর জন্যে নয়, মানসীর জন্যে।

এগারো

দ্বিতীয় ফোটো পেয়ে গোরীকে কী লেখা যায় ভাবছিল রত্ন। মিথ্যা বলবে না, ঠকাবে না, বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করবে না। তা হলে সব কথা খুলে বলতে হয়। যা থাকে কপালে। কিন্তু তার আগে সাহস সঞ্চয় করতে হয়। রত্নর অত সাহস ছিল না যে কোদালকে সোজাসুজি কোদাল বলবে।

এদিক থেকে চিঠি গেল না। ওদিক থেকেই এলো আবার। গোরী তার বইগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার করেছে। ছোট্ট একরত্তি কাগজে পেনসিলের আঁচড়। বিয়েবাড়ীর গোলমালের মধ্যে লেখা। হলুদ লেগে আছে চিরকুটখানায়।

প্রিয়তম ভাই,

মনে বড় অভিমান ছিল তুমি এলে না। তার বদলে এলো তোমার রাশি

রাশি আদর। এসব বই পড়ে বুঝতে পারি এত বিদ্যে কি আমার আছে! বুঝে নিতে হলে তোমার কাছেই বুঝে নেব। আর কারো কাছে নয়। আর কে আছে আমার! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন। একটা কথা আমি খুব মানি। যে যার সে তার। নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার। আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো। ইতি।

তোমার আদরিণী গোরী

খামের ভিতরে একমুঠো গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিল। রত্ন সযত্নে তুলে রাখল একটি কাঁচের পাত্রে। তাতে জল ভরে দিল। জলের উপর ভাসতে লাগল পাপড়িগুলি। একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধে ভরতে লাগল ঘর। বই হাতে করে উপভোগ করতে লাগল রত্ন। মোগল উদ্যানে অধ্যয়ননিরত হুমায়ুন বাদশার মতো।

চিঠিখানিও সুগন্ধি হয়েছিল। অন্তরে বাইরে সুগন্ধি। এতটুকু চিঠি, তবু এত সুগন্ধি! এত সুগন্ধ নিয়ে কী করবে রত্ন! কোথায় রাখবে! একে তো পাত্রে ভরে রাখা যায় না। এ যে ঘর ভরবে। বাক্সয় বন্ধ করে রাখলেও কি এ বন্দী থাকবে! রত্ন নিরুপায় হয়ে বুকে চেপে ধরল ও চিঠি। কেউ দেখে ফেললে কী মনে করত!

এ কী লিখেছে গোরী! এ যে ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা তো রাজপুত রানী লেখেননি মোগল বাদশাকে। রাখীবন্ধ বহিন হলে লিখত না রাখীবন্ধ ভাইকে। 'যে যার সে তার।' এর মানে কী! 'নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার।'

রত্নর বুক দুলছিল ঝোড়ো হাওয়ায় খেয়া নৌকার মতো। মন মাঝি বলছিল, সামাল সামাল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছিল। শোঁ শোঁ করছিল বাতাস। চিঠিখানি বুকে চেপে ধরার পরিণাম এই। বুক থেকে কলিজার মতো ছিঁড়ে বাক্সয় বন্ধ করলেও কি পরিত্রাণ আছে! বুক তেমনি তোলপাড় করতে থাকল।

মৃগনাভি বুকে নিয়ে মৃগ যেমন অন্ধ হয়ে গন্ধ খুঁজে বেড়ায় রত্নও তেমনি দিশাহারা হয়ে দিন কাটায়। গোরী যা লিখেছে তার অর্থ কী? সহজ বুদ্ধিতে তো বোঝা যায় গোরী রত্নর, রত্ন গোরীর, নইলে রত্নর পাশে দাঁড়ানোর অধিকার থাকে না গোরীর। কিন্তু সহজ বুদ্ধি এখানে পরাস্ত। অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। গোরী জানে। রত্ন জানে না।

তা হলে কি সে চিঠি লিখে জানতে চাইবে কী ব্যাখ্যা? না, না। তার লজ্জা করে। সব চেয়ে ভালো ও কথা ভুলে যাওয়া। ও কথা কেউ লেখেনি, ওটা না লেখারই সামিল। যদি লিখেও থাকে তবু বিশেষ কিছু মনে করে লেখেনি। লিখতে লিখতে মানুষ কত কী লেখে। বলতে বলতে কত কী বলে। সব কথা ধরতে নেই।

রত্ন ক্রমে শান্ত হলো। গোরী একটি খেয়ালী মেয়ে। যখন যা খেয়াল হয় তখন তা বলে বসে। না ভেবে না চিন্তে। বিয়েবাড়ীর হট্টগোলে ওর মাথার ঠিক নেই। হঠাৎ এক রাশ বই পেয়ে যা মাথায় এসেছে তাই লিখে বসেছে, হাতের কাছে যা জুটেছে তাই দিয়ে। বইয়ের বিনিময়ে দিয়েছে গোলাপের পাপড়ি। বইয়ের চেয়েও মূল্যবান।

রত্ন সেই মূল্যবান উপঢৌকন আবার খামে ভরে বাক্সয় তুলে রাখল ।

কিন্তু চিঠির একটি কথা বার বার হানা দিতে থাকল সারা দিন সারা সাঁঝ । অনেক রাত অবধি । 'আর কে আছে আমার ! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন ।'—এ কি কখনো হতে পারে ? আর কেউ নেই তোমার ? আমিই তোমার শেষ অবলম্বন ? গৌরী ! গৌরী ! কেন ও কথা বললে ?

রাখীর বিনিময়ে গেল বই । বইয়ের বিনিময়ে এলো গোলাপ ফুলের পাপড়ি । পাপড়ির বিনিময়ে কী যাবে ? করবী ফুল । রত্ন দুটি করবী ফুল তুলে খামে ভরে গৌরীর নাম লিখে রাখল চিঠি লেখার আগে । একটি রক্ত করবী । একটি শ্বেত করবী । তার পর লিখল এই চিঠি ।

আমার আত্মার বোন গৌরী,

তোমার দ্বিতীয় ফোটো পেয়েছিলুম, গোলাপ ফুলের পাপড়ি পেলুম । ফুলের উত্তরে গেল ফুল । ফোটোর উত্তরে কিছু না । আমার ফোটো নেই । থাকলেও পাঠাবার মতো হতো না । কিন্তু আমার কিছু বলবার ছিল । বলি বলি করে এত দিন বলতে পারিনি । আজো সাহস পাচ্ছিনে বলতে । যখন বলব তখন নির্জলা সত্যই বলব । তুমি রাগ করবে, জানি । সেই জন্যেই ইতস্তত করছি । তা ছাড়া তুমি তো মন্তব্য চাওনি ।

তোমাকে আরো কত কথা বলতে মন যায় । কিন্তু তুমি শুনবে কখন ? ললিতের বিয়ে নিয়ে মহাব্যস্ত । তোমার বিশ্বাস তুমি যা করছ তাই ঠিক । আমার বিশ্বাস তা নয় । যেখানে এমন গভীর ব্যবধান সেখানে কেমন করে এই স্নেহের সম্পর্ক সম্ভব হলো ? কেমন করে সহজ হলো ? তুমি আমার মায়ের পেটের বোনের মতো প্রিয় । তোমার মা আমারও মা । আমার মা তোমারও মা । আমরা পিঠোপিঠি ভাইবোন । এখন মনে হচ্ছে তুমি ভিন্ন আমার আর কোনো বোন নেই। আমি ভিন্ন তোমার আর কোনো ভাই । সেইজন্যে তুমি লিখেছ, 'আর কে আছে আমার ! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন ।' কথাটা আমাকে পেয়ে বসেছে । যতই আবৃত্তি করি ততই অনুভব করি ওর অন্তর্নিহিত সত্য ।

যেখানে মিল এত গভীর সেখানে কেমন করে ঐ ব্যবধান সম্ভব হলো ? কেমন করে গভীর হলো ? এইটেই বরং বিস্ময়কর । গৌরী, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ক'টাই বা দিনের ! তবু কত কালের ! আমি তো এরই মধ্যে দিনগণনা হারিয়ে ফেলেছি । তোমাকে লিখেছি কি না স্মরণ নেই, তোমার চিঠি যেদিন পাই তার মাস ছয়েক আগে তোমার নাম আমার কানে আসে । তোমার ছবি আমার চোখে আঁকা হয়ে যায় । সে ছবি এবার তোমার দ্বিতীয় ফোটোখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম । খুব অপরিচিতের মতো লাগেনি তোমার ফোটো । পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি, তোমার প্রথম চিঠিও খুব অপরিচিতের মতো লাগেনি ।

তোমার নাম যেদিন প্রথম কানে এলো, তোমার ছবি যেদিন চোখে আঁকা

হলো, সেদিন আমি ভাবতেই পারিনি যে তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবে, তবু সেই প্রথম জ্ঞান থেকেই আমার প্রাণ তোমাকে চিনেছে । চিনেছে সাতঙ্কে । বোধ হয় সানন্দে । আনন্দ অনেক সময় আতঙ্কের রূপ নেয় । কিন্তু সে কথা আজ নয় । যা বলেছি এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বলেছি । এর থেকে আশা করি এইটুকু প্রমাণ হবে যে আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হবার আগেই আত্মার ভাইবোন হয়েছি। কী বল ? প্রমাণটা কি নেহাৎ কাঁচা হলো ? আমার মনে হয় এই রকম একটা কিছু মনে করেই তুমি লিখেছ, 'যে যার সে তার ।'

আমার বন্ধুরা কে কে ওখানে গেছে, কার কার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, কাকে কেমন লেগেছে, এসব শুনব বলে কান পেতে রইলুম । না জানালেও তুমি জানবে আমি তোমাকে ভালোবাসি । ইতি ।

তোমার আত্মার ভাই রত্ন

রত্ন ভেবেছিল বিয়ের পাট চুকলে গোরী আবার চিঠি লিখবে, কিন্তু ললিতের বিয়ের বর্ণনা দিয়ে প্রথম চিঠি যার কাছ থেকে এলো সে গোরী নয়, কানন । তাতে বধূ সাবিত্রীর একটি লিপিচিত্র ছিল । সেইসঙ্গে তার দাদা যশোমাধববাবুরও । সত্যিকার অভিজাত ভদ্রলোক । বিলেতফেরৎ ও প্রগতিশীল । মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে প্যাঁসনে চশমা । নাকটা একটু থ্যাবড়া দেখায় । নিচের ঠোঁটটা বেরিয়ে থাকে । সেটাকে ভিতরে টেনে নিতে গেলে গাল দুটো ফুলে ওঠে । সৌজন্যের অবতার । কাননদের সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে গোলাপ কুঁড়ির বোকে স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন বোতামের গর্তে । গোলাপ জল ছিটিয়ে দিলেন জামায় চাদরে । সিগার অফার করলেন । ড্রিঙ্ক অফার করলেন । রাজা রাজড়ার সঙ্গে সমান ব্যবহার । কাননরা যে বরের বন্ধু ।

যশোবাবুর পিতা ফৌজদার মশায় কন্যা সম্প্রদানে নিযুক্ত থাকায় জ্যোতিবাবুর পিতা মুস্তফী মশায় সব দেখাশুনা করছিলেন । ইনি বেগমপুরের ম্যানেজার । সত্তর বছর বয়স, কিন্তু একটিও চুল পাকেনি । একটিও দাঁত পড়েনি । কেবল গোঁফ জোড়াটি পাকা । শোনা যায় ইনি বীরাচারী তান্ত্রিক । যশোবাবু পর্যন্ত এঁকে ডরান । হাঁকডাক নেই । নীরবপ্রকৃতির লোক । কিন্তু যাঁর দিকে তাকান সে-ই তটস্থ হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায় ।

জ্যোতিবাবুর সঙ্গেও আলাপ হলো । মোটা খদ্দরের কটিবাস পরা, খালি গায়ে শুধু একখানা খদ্দরের উড়ানি জড়ানো গান্ধীযুগের উগ্র ক্ষত্রিয় । রোদে পুড়ে বিষ্টিতে ভিজে শীতে ফেটে সীজন হয়েছে শরীর । চর্বি বিহীন পেশীপ্রধান অঙ্গ । বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল স্থির সংকল্পে কঠোর । অযত্নে গজানো এক মুখ দাড়ি গোঁফ । যশোবাবুর পাশে দাঁড়ালে সভ্যতার পাশে বর্বরতার মতো দেখায় । কিন্তু আলাপ হলে বোঝা যায় লোকটি রসিক । কৌতুক দিয়ে বিদ্যা ঢাকতে চান । সকলে সমীহ করে এঁকে ।

জ্যোতিবাবুর পাশে বসে আহার করছিল ললিতের বন্ধুরা । যশোবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দেবী বসেছিলেন পর্দার আড়ালে । মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছিলেন কে কী খাচ্ছে না, ফেলে রাখছে । কে কী খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে, সঙ্কোচে আরেকটুখানি চেয়ে

নিতে পারছে না। জ্যোতিবাবুকে ডেকে বলছিলেন তদ্বির তদারখ করতে। ওটা যে জ্যোতিবাবুর দায়িত্ব। পরিবেশককে নির্দেশ করছিলেন কার পাতে কী দিতে হবে। 'না' 'না' শুনলে চলবে না। সকলের হাত ধোয়া মোছা হয়ে গেলে পরে সোনার তবক মোড়া পান দিতে ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী স্বয়ং। সে-সময় প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো তাঁর। কাননকে নবনীকে হৈমকে অনুরোধ করলেন আবার আসতে বড়দিনের ছুটিতে। জিজ্ঞাসা করলেন রত্নর কথা, প্রভাতের কথা। জানতে চাইলেন গিরীন কেন এলো না।

কাননের চিঠিতে শ্রীমতীর রূপবর্ণনা ছিল। জন্মদিনের ফোটোর সঙ্গে মিলে যায়। নতুনের মধ্যে এই যে সে মাথায় খাটো। তার উপর ভরন্ত গড়ন বলে তাকে অযথা মোটা দেখায়। আর একটু লম্বা হলে ও রকম মনে হতো না। মিহি ঢাকাই শাড়ী পরে সে তম্বী সাজতে চায়, কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণ হয় কি না সন্দেহ। গায়ে একখানা শাল কিংবা স্কার্ফ থাকলে শোভন হতো। পর্দার ভিতরে যা মানায় পর্দার বাইরে তা বেমানান।

কানন ছেলেটি বরাবর সেন্টিমেন্টাল। গদগদ হয়ে লিখেছে, 'এত দিন আমাদের সাত ভাই চম্পার পারুল বোন ছিল না। এত দিন পরে পারুল বোন এলো। সেইদিনই তাঁকে আমি পারুলদি বলে ডেকেছি। তিনি সাড়া দিয়েছেন। তুমিও ডেকো।'

কাননকে রত্ন জানতে দিল না শ্রীমতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় এসে ঠেকেছে। সে ওকে কী বলে ডাকে। ও কেন সাত ভাই চম্পার সাত জনের বোন হতে যাবে! ও তার একার বোন। যে যার সে তার। মাঝখান থেকে তোমরা কে হে, বাপু!

দিন কয়েক পরে গৌরীর চিঠি এলো। সেও ললিতের বিয়ের বর্ণনা দিয়েছিল। দিয়ে আক্ষেপ করেছিল যে কিছুই তার মনের মতো হলো না। তার মন ভয়ানক খারাপ। শরীরও শ্রান্ত। আর বইতে পারছে না। এখন বোধ হচ্ছে এ বিয়ে না দিলেই ছিল ভালো। কেন সে কথা আর কাউকে বলেনি, বলবার নয়। রত্নকেই বলছে বিশ্বাস করে।

সাবু শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরেছে। আমার ভাবনা ও ভয় ছিল ওর ফুলশয্যার অভিজ্ঞতাও হয়তো আমারই মতো গ্লানিকর ও বেদনাবহ হবে। নর মাত্রেই নরপশু। ব্যতিক্রম যদিও সম্ভব। ললিত যদি ব্যতিক্রম না হয় সাবু কি আমাকে ক্ষমা করবে? আমি কি আমার মাকে ক্ষমা করেছি? বলতে গেলে আমিই তো ও বেচারিকে বাঘের গুহায় ঠেলে দিলুম।

এখন আমি হেসে গড়িয়ে পড়ছি। হাসতে হাসতে মারা যাব। বাঘ বলে যাকে মনে হয়েছিল সেটা ভেড়া। রাতের পর রাত কাটল, সাহস তার কোনো দিন হলো না। সাবু অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিয়ের জল পড়েনি। এ নিয়ে বেচারি শরমে সঙ্কোচে অর্ধমৃত। মেয়ে মহলে কিছুই চাপা থাকে না। হাসি ঠাট্টা তবু সহ্য হয়, কিন্তু মেয়েমানুষের মুখে মৌমাছির মতো হুল আছে যে।

ললিত নাকি বলেছে অত কম বয়সে মা হতে যাওয়া অহিতকর। আরো তিন বছর সবুর করতে হবে। এই তিন বছর অসিধার ব্রত। তা মন্দ বলেনি ললিত। এক দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে চিন্তিত। ললিত যদি এ বৌ নিয়ে ঘর না করে লোকে আমাকেই দুষবে। বিয়েটা তো আমারই দেওয়া। কেন দিতে গেলুম ?

ললিতের বিয়েতে তার বন্ধুরাও আসবে ও তাদের মধ্যে তুমিও থাকবে, এটা আমি সরল বিশ্বাসে ধরে নিয়েছিলুম। আমি ভাবতেই পারিনি যে এ বিয়ে তুমি সমর্থন করবে না, সেটা তোমার না আসার হেতু হবে। বরযাত্রীরা যখন এলো তখন আমার মন বলছিল তুমি এসেছ, শেষ মুহূর্তে মত বদলেছ। কোন্ জন তুমি তাও আন্দাজে চিনেছিলুম। রেগে উঠেছিলুম একটু বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হলো বলে। জ্যোতিদাকে সাধলুম, যাও না, দেখে এসো রত্ন এসেছে কি না। এসে থাকলে ওকে বোলো আমার দূত গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসবে।

কী দুঃখ ! কী লজ্জা ! ও রত্ন নয়। নবনী। রত্ন আসেনি। উৎসবের সব আলো আমার চোখে নিবে গেল। অর্থহীন উৎসব। সাবুর বর এলো, আমার বর এলো না। আমি কেন আনন্দ করব !

নেহাৎ ওরা তোমার বন্ধু, ওদের আপ্যায়নে ত্রুটি থাকলে তুমি ব্যথা পাবে, এ কথা ভেবে তোমার বন্ধুদের ডাকিয়ে আলাদা একখানা ঘরে বসিয়ে খাওয়ালুম, জ্যোতিদাকে দিলুম দেখাশুনার ভার। পরে এক সময় ওদের সঙ্গে আলাপ হলো অল্পক্ষণের জন্যে। গিরীন ছিল না। খাসা লাগল নবনীকে কাননকে হৈমকে। কানন তো আমার সঙ্গে পারুলদি পাতিয়েছে। ওদের বলেছি বড়দিনের বন্ধে বেগমপুর আসতে। শান্তিনিকেতনে কে আছে যে যাবে ! কবি তো দক্ষিণ আমেরিকায়।

এবার তোমার কোনো অজুহাত খাটবে না, প্রিয়। শান্তিনিকেতনে গেলে পরীক্ষার ক্ষতি হবে না, বেগমপুর এলে হবে, এ যুক্তি অচল। ইচ্ছা করলেই তুমি আসতে পারতে, তবু এলে না। এ দুঃখ আমি ভুলব না। তুমি যে আমার কী তা আমি দিন দিন হৃদয়ঙ্গম করছি। মুক্তি যদি এ জন্মে পাই তবে তা তোমারই কল্যাণে। বলেছি তো, তুমি আমার শেষ অবলম্বন। সূর্যমুখীর মতো তোমারই দিকে আমি তাকিয়ে আছি। আমি তোমারই। আমার এখন মনে হয় পূর্ব জন্মে আমরা পরস্পরের ছিলুম। নইলে আমার নাম আর বর্ণনা শুনে তুমি কেন অমন ত্রস্ত হতে ? আর আমিই বা কেন তোমার নাম আর বৃত্তান্ত শুনে উন্মনা হয়ে চিঠি লিখতুম ?

বিশ বছর কেটে গেল। আর ক'টা দিনের জীবন ! যখনি মনে হয় যে দেখা হয়তো এ জীবনে হবে না, চার চোখ এক হবে না, তখনি অসহায়ের মতো মুষড়ে পড়ি। মনে হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। আমাদের মিলন এ লোকে নয়। প্রিয়তম, তুমি কী বলতে চাও নির্ভয়ে বল। আমার রূপ আর জ্যোৎস্নার মতো নয়, এই কথা বলবে তো ? আমি আর সুন্দরী নই, এ কথা বলতে এমন কী সাহস লাগে। আমি জানি সৌন্দর্যলক্ষ্মী চঞ্চলা।

আরো কতক দূর গিয়ে গোরী ইতি দিয়েছে । ইতির পরে লিখেছে, 'তোমার পূর্বজন্মের সঙ্গিনী গোরী ।'

রত্ন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল । তার হৃৎস্পন্দন থেমে এলো । এ কি সত্য ! এ কি কখনো হতে পারে যে গোরী তাকে মনে মনে বর বলে বরণ করেছে । প্রিয়তম বলে ডেকেছে ! সে ওই চিঠিখানা কাঁপতে কাঁপতে আরেক বার পড়ল । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো এক বার । গোরী যদি মিথ্যা না বলে থাকে তবে সত্যই তাকে ভালোবেসেছে । তার প্রেমে পড়েছে ।

রত্নর জীবনে স্নেহপ্রীতির অপ্রাচুর্য ছিল না । তেমন ভালোবাসা সে অঝোর ধারায় পেয়েছে আত্মীয়া অনাত্মীয়া চেনা অচেনা অনেক মেয়ের কাছে । পেয়ে ধন্য হয়েছে । কিন্তু এমন ভালোবাসা এই প্রথম । এত দিন তার সমবয়সিনীরা তাকে তাদেরই একজন বলে গণ্য করেছে । তাতেই সে কৃতার্থ । এই প্রথম সে পুরুষ বলে স্বীকৃতি পেলো ।

উল্লাসে তার নাচতে ইচ্ছা করা উচিত । কিন্তু কী জানি কেন তার কাঁদতে ইচ্ছা করল । অব্যক্ত সুখ নিল দুঃখের আবরণ । তার মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেল । কেউ যদি তখন সেখানে এসে পড়ত তা হলে ভাবত সে সহসা গভীর শোক পেয়েছে । অথচ ছলনা নয় । আছে হয়তো কোনো প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের । জগতের দুই পরাক্রান্ত শক্তির । যখন আকাশ থেকে নামে তখন বাজপাখীর মতো ছিনিয়ে নিয়ে যায়, উড়িয়ে নিয়ে যায় ।

গোরীকে তার মনে মনে ভয় ছিল । সেই প্রভাতের বর্ণনা শোনার পর থেকে । তাছাড়া সে কি ওর যোগ্য ! অমন একটি বিখ্যাত মহিলার ! পরকীয়া, সেটাও একটা কথা, যদিও তার মতে প্রেম যাকে স্বকীয়া করে সেই স্বকীয়া । বিবাহ যাকে স্বকীয়া করে সে পরকীয়া ।

তার পর এটাও তার বিশ্বাস যে একজনকে হৃদয়ে স্থান দিতে হলে আরেকজনকে স্থানচ্যুত করতে হয় । মালাদিকে না সরিয়ে গোরীকে বসানো যায় না । মালাদিকে সরাতে মায়া হয় । মনে হয় বিনা দোষে বেচারিকে ত্যাগ করা হলো । রত্ন কিছুতেই তাঁকে ত্যাগ করবে না । তা হলে কী করে গোরীর প্রেমের প্রতিদান দেবে ? না দিলে গোরী কী মনে করবে ? ওর কি অভিমান নেই, অপমানবোধ নেই ?

হায় হায় করতে লাগল রত্নর অন্তর । হায়, গোরী, কেন ভালোবাসলে ! কেন প্রেমে পড়লে ! এ কী সঙ্কটে ফেললে ! ভাইবোনের সম্পর্ক কেমন নির্বিবাদ ছিল । আর এই নতুন সম্পর্কের যে গোড়া থেকেই বিবাদ । যে ভালোবাসে সে ভালোবাসা পায় না । যে ভালোবাসা পায় সে ভালোবাসতে ভয় পায়, কুণ্ঠিত হয় । এমন ভালোবাসা কে চেয়েছিল ? তেমন ভালোবাসাই ছিল ভালো ।

সত্যি ? তেমনি ভালোবাসাই ছিল ভালো ? রত্ন আপনাকে জেরা করে জবাব পায়—না, তাতে বৈচিত্র্য নেই । তা পুরুষকে পুরুষ করে না । তার চেয়ে এই ভালো । এত দিন মনে খেদ ছিল যে নারীর প্রেম আসেনি জীবনে । পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় পূর্ণতাবোধ নিয়ে যাবে কী করে ? এখন তো আর কোনো খেদ রইল না । নারীর

প্রেম এলো জীবনে অবশেষে । বিশ বছর বয়সে । যে বয়সে প্রত্যাশা করেছিল সে বয়সে নয় । যার কাছে প্রত্যাশা করেছিল তার কাছ থেকে নয় । অপ্রত্যাশিতার কাছ থেকে । অপ্রত্যাশিত সময়ে ।

এ কী পরম সৌভাগ্য ! মানুষকে অমর করে দেবার মতো । কিন্তু এমনি তার কপাল । প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারছে না । পাড়ার লোককে ডেকে বলতে পারছে না, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ । অত কথায় কাজ কী, তার প্রিয় বন্ধু প্রভাতকেই জানাতে পারছে না ।

আহা, কেন এমন হলো ? কেন গোরী বোন হয়ে নিরস্ত হলো না ? বড় আদরের বড় আপনার বোন । এখন যে সে ওকে আর বোন বলে চিহ্নিত করতে পারবে না । করলে সেটা হবে ছলনা । বোন যদি না হয় তবে কী হবে ওর পরিচয় ? প্রিয়া ? না, না, অমন কথা ভাবা যায় না । তার চেয়ে বরং ফিরে যাক সে পূর্ব পরিচয়ে । বোন হোক । আত্মার বোন । আরো অন্তরঙ্গ । আরো আত্মীয় । বেশ একটা মিষ্টি সম্বন্ধ । মিস্টিক সম্বন্ধ ।

কেন, এটাও কি একটা মিস্টিক সম্বন্ধ নয় ? রত্ন লজ্জায় রক্তিম হলো । কিন্তু পরে ভেবে দেখল মালাদির সঙ্গে সম্বন্ধ যদি মিস্টিক হয়ে থাকে গোরীর সঙ্গে সম্বন্ধও তাই । প্রভেদ শুধু এই যে মালাদির বেলা সে সাড়া পায়নি, গোরীর বেলা সে অসাড়। গোরীর জন্যে তার মন কেমন করতে লাগল । চির দুঃখিনী আবার দুঃখ পাবে, যখন শুনবে যে রত্নর হৃদয় অন্যত্র ন্যস্ত । মিলনের আশা কোথায় যে আশায় আশায় থাকবে ! দেখা সাক্ষাতে কী ফল ! সেটা পরিহার করাই শ্রেয় । তা হলেই হয়তো গোরীর এ মোহ কেটে যাবে । এই ক্ষণিক মোহ । হাঁ, এটা একটি তরুণীর ক্ষণিক মোহ । রোমান্টিক দিবাস্বপ্ন ।

প্রভাতের পর তার সব চেয়ে নিকটবন্ধু ছিল বিদ্যাপতি । পরীক্ষার মরসুমে রাত থাকতে উঠে একজন অপর জনের ঘুম ভাঙিয়ে দিত । তার পর স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি করতে বসত রত্ন । জমাট দুধ মিশিয়ে । বিদ্যাপতি হাজির হতো এক টিন বিস্কুট হাতে করে । চা খেতে খেতে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে তারা অনুমিত প্রশ্নপত্রের উত্তর রচনা করত । তারই ফাঁকে ফাঁকে বা সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিষয়ে কথাবার্তা চলত ।

পরের দিন বলি বলি করে কিছুতেই বলতে পারল না রত্ন যে, এ জগতে এমন নির্বোধ মেয়েও আছে যে তার মতো অপাত্রের প্রেমে পড়ে বসে আছে । এটা অদর্শন থেকে । অদর্শনেরও একটা সম্মোহন আছে । চোখে দেখলে এমন অঘটন ঘটত না । তা হলে আনন্দের কী আছে !

বারো

এর পর থেকে দেখা গেল রত্ন কারো সঙ্গে মিশতে চায় না । একা থাকতে, একা একা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে । হাতে একখানা বই । সেটা কিন্তু পড়বার জন্যে নয় । পড়তে

মন যায় না। ভালো লাগে ভাবতে, কল্পনা করতে। দু'হাতে বুক চেপে ধরতে, মাথা চেপে ধরতে। অন্তরের কলরোল থামাতে। কিংবা চুপ করে শুনতে।

এক দিন যা লেখে আরেক দিন ডাকে দেবার সময় তা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলে। এ বেলা যা লেখে ও বেলা তা শোধরাতে গিয়ে কেটেকুটে একাকার করে। এমনি করে চিঠি লেখা হয় গোরীকে। অন্যান্য কথার পর ধীরে ধীরে আসে আসল কথায়।

যে পুরুষ বিশ বছর হলো পৃথিবীতে এসেছে, কখনো কোনো পৃথিবীর মেয়ের মুখে 'প্রিয়' সম্বোধন শোনেনি, যে কেবল ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পায়নি, তাকে তুমি কোন্‌খান থেকে এসে 'প্রিয়তম' বলে ডাকলে ? বাউলের করোয়াতে চাল বা পয়সা না দিয়ে মোহর ফেলে দিলে ? মোহর না মাণিক ?

গোরী, আমি ধন্য। আমার মতো ধনী কে ? তুমি যদি তুমি না হয়ে যে-কোনো একটি মেয়ে হতে তা হলেও আমি ধন্য হতুম। ধনী হতুম। কিন্তু তুমি যে-কোনো নও। তুমি অন[illegible]। তুমি নারীকুলের রানী। তোমার তুলনা নেই। তুমি নারীদের মধ্যে [illegible]। রাধার পর তোমার মতো নারী ভারতের মাটিতে জন্মায়নি। অন্তত আমার তো জানা নেই। দেবী দেখতে দেখতে আমার চোখে অরুচি ধরেছে। এই প্রথম একটি মেয়ে দেখছি যে দেবী নয়, যে সামান্য মানবী নয়। [illegible]য অনন্যা।

এর পর যা বলব তা কি তুমি সইতে পারবে ? যদি না বলি তোমার সঙ্গে মিথ্যাচারণ হবে। তুমি আমার মুঠোয় মোহর ভরে দিলে। মোহর না মাণিক ? তোমার মতো দাতার সঙ্গে যদি আমি ছলনা করি তবে আমার মতো অকৃতজ্ঞ কে ? গোরী, আমি যদি প্রতিদান দিতে না পারি তার কারণ আমি স্বাধীন নই। 'স্বাধীন নই' একথা কবুল করতে আমার মুখে বাধছে, কেননা আমার তো ধারণা ছিল আমি স্বাধীন পুরুষ। আমার সাধনাও ছিল তাই। প্রভাত আমাকে বলেছিল, 'যে প্রেমিক সে স্বাধীন নয়, তার মতো পরাধীন আর নেই।' তখন আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন দেখছি কথাটা অযথা নয়।

অনুমান করতে পেরেছ বোধ হয় যে আমার হৃদয় দেওয়া হয়ে গেছে। যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি কিন্তু জানেন না। জানলেও ফেরৎ দিতে পারতেন না। তিনি তাঁর মৃত পতির অনুচিন্তায় বিভোর। আমি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে অনিচ্ছুক। কীই বা আছে আমার যা দিয়ে আমি তাঁর স্বামীর অভাব পূরণ করতে পারি ! তার পর আমি তো চলার পথে। আমার পথের সাথী হতে আমি তাঁকে ডাকব না। এ পথ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। তাঁর কষ্ট হবে। তা ছাড়া তিনি সাধারণত অসুস্থ। আমি যদি সেবায় রত থাকি আমার পথ চলা হয় না।

তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে দেবতার মতো পূজা করি। তিনি যদি কোনো দিন সাড়া দেন আমার সব পরিকল্পনা বদলে যাবে। আশা আমার দিন দিন কমে আসছে। নেই বললেও চলে। তবু আমাকে আরো কিছু কাল অপেক্ষা করতে

হবে । এ আমার অন্তরের নির্দেশ । কী করি বল ! আমি যে পরাধীন । আমার প্রেম আমাকে যেমন পরাধীন করেছে তোমার বিয়েও তোমাকে তেমন পরাধীন করেনি । বিয়ে তো জোর করে দেওয়া হয়েছে । মন তা মেনে নেয়নি । তুমি আমার চেয়েও স্বাধীন । প্রেমে পড়ার মৌলিক স্বাধীনতা মন্ত্র পড়ে কেড়ে নেওয়া যায় না । কিন্তু একবার প্রেমে পড়লে দ্বিতীয় বার প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা থাকে না, যত দিন না প্রথম প্রেম ক্ষীণ হয়ে আসে ।

সেদিন যে কবে তার কোনো ধারণা নেই আমার । তোমাকে তত দিন বসিয়ে রাখব না । অনির্দিষ্ট কাল অনিশ্চিতের আশায় কেনই বা তুমি বসে থাকবে পথিক মানুষের দ্বারে, ফকির মানুষের দ্বারে ? তোমার মতো রানীর কি তা শোভা পায় ? তোমার দাক্ষিণ্য পেলে কত পুরুষ প্রেমে পড়বে, কত পতঙ্গ আগুনে পুড়বে । তোমার কি ভক্তের অকুলান ! গোরী, তুমি আমার মতো অক্ষমের প্রেমে না পড়ে কাননের মতো একজন সুপুরুষের প্রেমে পড় । তা হলেই আমি সুখী হব । আমি তোমার রাখীবন্ধ ভাই, তুমি আমার রাখীবন্ধ বহিন । এই সম্পর্ক বহাল থাক । আর কোনো সম্পর্কে কাজ কী ?

সম্পর্ক যদি বদলাতে হয় তবে এসো আমরা দু'জনে দু'জনের মিতা হই, বন্ধু হই । এই সম্পর্কেই সব চেয়ে কম দাবীদাওয়া, কম বাধ্যবাধকতা । অথচ সব চেয়ে বেশী ভাব । এত দিন এটা মেয়েতে মেয়েতে পুরুষে পুরুষে হয়েছে । এখন থেকে মেয়েতে পুরুষে হোক । ভাইবোনের সম্পর্কের মতোই এটা নিরীহ নির্দোষ । অথচ প্রিয় সম্পর্কের মতো সরস সুমধুর । মনে মনে আমি এমনি একজনকে খুঁজছিলুম । মিতা । বান্ধবী । প্রিয়া নয় । বধূ নয় । নয়, নয় বোন ।

কেমন ? রাজী ? এ সম্পর্ক পাতালেও দেখবে তুমি আমার বড় আদরের, বড় আপনার । গোরী, আমিও তোমার ।

এর পর গোরীর নতুন ফোটোর প্রসঙ্গ ও রূপের প্রশংসা । রূপ কখনো একই রকম থাকে না । দিনে দিনে বদলায় । কৈশোরের গোরী আর যৌবনের গোরী একই মানুষ হলেও রূপ তাদের একই রূপ নয় । জ্যোৎস্নার কমনীয়তা থেকে সূর্যোদয়ের রমণীয়তা পরিবর্তনসূত্রে এসেছে। সেও যেমন সুন্দর ছিল এও তেমনি সুন্দর । সৌন্দর্যের কমতি কোথায় যে ফোটো পাঠাতে এর সাহসের অভাব হবে ? বরং যাকে পাঠানো হয়েছে তারই সাহসের অভাব । সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, দু'হাতে চোখ ঢাকে । এমনিতেই সে মেয়েদের দেখলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় । নারীভয় যার সত্তায় সে কি ফোটোকেও নিরাপদ জ্ঞান করে ! বিশেষ করে গোরীর বেলা । তার বেলা সে চিত্রার্পিতকেও প্রত্যক্ষের মতো ডরায় ।—

জানি তুমি দুঃখ পাবে । তবু তোমাকে সব কথা খুলে বলাই ভালো । এর ফলে তোমার আমার সম্পর্ক পায়ের তলার মাটির মতো স্থির হবে । প্রেমের চেয়ে

স্নেহ প্রীতি বন্ধুতা কোনোটাই খাটো নয় । সত্যিকারের ভাইও সত্যিকারের প্রেমিকের মতো মহৎ । সত্যিকারের বন্ধুর মতো মহৎ কোন্ মিথ্যা স্বামী ? গোরী, ভুলে যেয়ো না যে তোমার পক্ষে স্বাধীনতাই সর্বপ্রথম প্রশ্ন । প্রেম তার পরের কথা । এত দিন আমি তাই জানতুম । এখন লক্ষ্য করছি তুমি পরের কথাটাকে আগে টেনে আনছ । তাতে তোমার দুঃখ কেবল বাড়বে ।

রত্ন তার জীবনে এত বড় গুরুত্বসম্পন্ন লিপি লেখেনি । চিঠিখানা বার বার পড়ে নিশ্চিন্ত হলো যে লিখে ঠিকই করেছে, না লিখলে ভুল করত । গোরী যদি দুঃখ পায় তবে অধিকতর দুঃখের হাত থেকে বাঁচবে । বিবাহিতা নারীর প্রেমে পড়তে তার বন্ধু প্রভাত তাকে নিষেধ করেছিল । প্রভাতই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে শ্রীমতীর মধ্যে প্যাশন আছে । এসব উপেক্ষা করতে হয়তো সে রাজী হতো, যদি মালাদির প্রতি তার আনুগত্য না থাকত । তিনি দ্রোণ, সে একলব্য । এখনো তার সাধনার প্রয়োজনে তাঁর মূর্তি পূজা করতে হয় । পরে হয়তো প্রয়োজন থাকবে না । তখন তার হৃদয় খালি হবে ।

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে রত্ন গঙ্গার ধারে গিয়ে গা মেলে দিল । এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে তার মনে হচ্ছিল তার জীবনের সব সঙ্কট কেটে গেছে, তার অন্তরে পরম শান্তি । সে ভালোবেসেই তৃপ্ত, ভালোবাসার প্রতিদান প্রার্থনা করে না । নারীকে সে দূর থেকে ধ্যান করবে, পুষ্পাঞ্জলি দেবে । সঙ্গসুখ নাই বা জুটল । মালাদি আর কারো সঙ্গে সুখী হোন । সে স্বাধীন থেকে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াক । মাস কয়েক যেতে না যেতে এ কী হলো ! প্রেম এলো তার দ্বারে অনাহূতের মতো । যার প্রেম সে সামান্য মানবী নয় । নারী উত্তমা । কিন্তু তার প্রেম স্বীকার করলে নতুন এক সঙ্কট । যার পার দেখা যায় না ।

বড়দিনের বেশী দেরি ছিল না । শান্তিনিকেতনে যাওয়াই স্থির হলো । নেতা পাওয়া গেল সলিল ব্রহ্মকে । তার বাবা ওখানকার অধ্যাপক । সলিল অভয় দিল জায়গার জন্যে ভাবতে হবে না । বিদ্যাপতি অঞ্জন এরা সলিলের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিল । রত্ন বলল, বেশ ।

ওদিকে কানন নবনী ওরা বেগমপুর যাবে বলে কথা দিয়েছিল । রত্নকে লেখায় সে অসামর্থ্য জানিয়েছিল । প্রভাত তো মৌন । সে উত্তর দিল কি না সে-ই জানে ।

দেখতে দেখতে গোরীর চিঠি এসে পড়ল । খুলতে ভরসা হচ্ছিল না রত্নর । মেয়ে নিশ্চয় রাগ করেছে । রাগ করাই স্বাভাবিক । চিঠি খুলতেই ছিটকে পড়ল আবার একখানি ফোটো । ছোট একটি স্ন্যাপশট । গোরী দু'হাতে মুখ রেখে ভাবছে । মাথায় কাপড় নেই । অবিন্যস্ত কেশ কালো স্রোতের মতো দু'কূল ভাসিয়ে নিচ্ছে ।

এবার সে প্রিয়তম বলে সম্বোধন করেছিল সরাসরি । লিখেছিল—

তুমি যদি ভেবে থাক যে সহজে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে তবে সেটা

তোমার ভুল । তুমি যা লিখেছ তা আমার অপ্রত্যাশিত নয় । বিশ বছর বয়সের একজন যুবাপুরুষ আর কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েনি এ কথা হলপ করে বললেও আমি বিশ্বাস করতুম না । আমার কাছে যারা সাধু সাজে তাদেরকেই আমার বেশী সন্দেহ । সন্দেহ অকারণে নয় ।

আমি যেসব কাণ্ড করেছি তার তুলনায় তুমি কীই বা করেছ ! আমার তো মনে হয় কিছুই করনি । তোমার চিঠি পড়ে আমি মনে মনে হেসেছি । দেবী বলে যাঁর পূজা করছ তাঁরও তো ভোগ চাই । এমন কোন্ দেবতা আছেন যাঁকে ভোগ দিতে হয় না ? তোমার মালাদির জন্যে আমার দুঃখ হয় । বেচারিকে সারা জীবন দেবী সেজে অসাড় হয়ে থাকতে হবে । সাড়া দিলেই যে তুমি আঁতকে উঠবে । তাই তো ! এ কেমন দেবী ! তা হলে কি দেবী নয় ! দুঃখ হয় তোমার জন্যেও । একটা অহেতুক আশায় তুমি মরীচিকার পিছনে ছুটেছ । মরীচিকা ধরে তোমার কী হবে ! সে তো জল নয় যে অঙ্গ জুড়োবে । মরীচিকা ধরা দেয় না। দিতে পারে না । তোমার দৌড়নোই সার ।

তুমি তোমার প্রাণের কথা রেখে ঢেকে বলনি । স্পষ্ট করে বলেছ । এবার আমার পালা । আমিও খুলে বলছি । রাগ কোরো না । তুমি আমার রাখীবন্ধ ভাই হতে রাজী হয়েছিলে । আমিও খুশি হয়েছিলুম তোমার রাখীবন্ধ বহিন হয়ে । পরে বুঝতে পারলুম ওর মধ্যে সত্য নেই । সত্যের খাতিরে ও-সম্বন্ধ বাতিল করতে হলো । আমাদের সম্বন্ধ ভাইবোনের নয়, বন্ধু-বন্ধুনীর নয় । স্নেহপ্রীতি বন্ধুতার নয় । তবে কার কার ও কিসের ? একটু একটু করে আমার প্রত্যয় হলো যে, তুমি আমার কানু, আমি তোমার রাই । তা না হলে এমন কেন হবে যে দেখা নেই, চেনা নেই, চিঠিতে চিঠিতে ভাব । সে ভাব কত নিবিড় । তুমি যে আমার এই তার প্রমাণ । আমি যে তোমার এ তুমি আজ না মানলেও কাল জানবে । আমরা একসঙ্গেই ধরণীতে এসেছি, একই বছর । মাসটা বা দিনটা যদিও এক নয় । হঠাৎ মনে হতে পারে আমরা যমজ । তা নয় । আমরা যুগল । রাধা আর কৃষ্ণ ওরাও তো একবয়সী ছিল । মাত্র পনেরো দিনের ছোট বড় ।

প্রিয় আমার, তোমার চিঠি যেদিন আসে সেদিন আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিই । বলি আমার মাথা ধরেছে । শুয়ে শুয়ে তোমার চিঠি পড়ি । একটু একটু করে পড়ি । ফুরিয়ে যাবে বলে আধখানা হাতে রাখি, রাত্রে বার করি। আমার তো আর কোনো শয্যাসাথী নেই । তোমার চিঠিই আমার শয্যাসাথী । বুকে রাখি, মুখে রাখি, মাথায় রাখি । কোথায় না রাখি ? তুমি কি জান যে তোমার চিঠি দিনের বেলাও আমার সঙ্গী হয়, ব্লাউসের ভিতরে ? স্নানের ঘরেও তোমার চিঠি খুলে পড়ি । রত্ন, তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই । প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয় । আগে হাত পুড়েছে বলে জানি এর নাম আগুন। এ আমার জ্বলন্ত সত্য ।

প্রিয়তম, তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করনি । আমিও তোমার সঙ্গে

মিথ্যাচরণ করব না। প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয়, এই দ্বিতীয় নয়, এই তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ। আমার নিজের দিক থেকে। অন্য দিক থেকে যদি বলি তুমি বিশ্বাস করবে না। ভাববে গৌরী বাড়িয়ে বলছে। কত লোক যে এ অভাগিনীর প্রেমে পড়েছে তার হিসাব রাখিনি। তাদের একজনকে তুমি চেন। সে তোমার প্রিয় বন্ধু ললিত। ছেলেটি ভালো। তাকে আমার ভালোও লাগে। কিন্তু ভালোবাসা অন্য কথা। তাকে আমি ভালোবাসতে পারব না। তার মনে দুঃখ হবে, তাই সাবুর সঙ্গে তার বিয়ে দিলুম, সাবুর ভালোবাসা পাবে। আমিও মুক্তি পাব অবাঞ্ছিত ভালোবাসা থেকে।

এই যেমন ললিতের কথা বললুম তেমনি আরেক জনের কথা বলি। সে জ্যোতিদা। তোমার যেমন মালাদির প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা ও ভক্তি জ্যোতিদার তেমনি আমার প্রতি অনুরক্তি। কী চোখে যে দেখেছে আমাকে, শত প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও আমার দিকেই ঝুঁকবে, আর কারো দিকে না। কত বার কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি, বিয়ের সম্বন্ধ করেছি ; কিন্তু ভবী ভুলবে না। আমার মঙ্গলের জন্যে তার মতো কেউ চিন্তিত নয়। স্বার্থ কাকে বলে জানে না। দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছে। বড়লোকের ছেলে, থাকে গরিবদের পাড়ায়, গরিবদের সঙ্গে। নিজের পরিশ্রমে যতটুকু হয় ততটুকুতেই চালায়। তবে আমরা বন্ধুবান্ধবরা খেতে বলি, উপহার দিই। পরের পরিশ্রম নেবে না, পরশ্রমজীবী হবে না। দেবতা যদি কেউ থাকে তবে জ্যোতিদা। তার প্রেম দেবতার প্রেম। আমার মতো অযোগ্য পাত্রে তার প্রেমের অপচয় হচ্ছে দেখে বিষম দুঃখ হয়। কী করি ! আমি যে তাকে ভালোবাসতে পারিনে। সে আমার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমিও তার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মিতা বলে যে নতুন সম্পর্কের প্রস্তাব করেছ সেটা আমার জীবনে নতুন নয়। সেই সম্পর্ক জ্যোতিদার সঙ্গে আমার। কিন্তু প্রেমিকের মাল্য তাকে আমি দেব না। সে মাল্য তার জন্যে নয়।

দুটি উদাহরণ দিলুম। আরো দিতে পারতুম। বেশীর ভাগই রূপমুগ্ধ তরুণ। শুধু তরুণ নয়, প্রৌঢ়ও আছে। এমন কি, বৃদ্ধও আছে। বিশ্রী লাগে তাদের আর্তি দেখে। পর্দার বাইরে কতটুকুই বা বেরোই ! বেরোতে হয় দেশের কাজে। তার পরিণাম এই ! সৌন্দর্য একটা অভিশাপ। যার আছে তাকে গিলে খাবার জন্যে রাহুরা হাঁ করে রয়েছে। তবু তো আমি গয়না গায়ে দিইনে। ফ্যাশনের ধার ধারিনে। অশোকবনে সীতার মতো থাকি। নিই যেটুকু না নিলে নয়। দিই যেটুকু না দিলে নয়। কোনো মতে বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু করতে হয় করি। শুধু বেঁচে থাকা। তার বেশী নয়।

আচ্ছা, ভাই, তুমি কি বলতে পার ? আমি তো কাউকে ডরাইনে। লোকে আমাকে ডরায় কেন ? কী আছে আমার মধ্যে যা দেখে তুমিও ভয় পেয়ে গেছ ? ভয় পেয়ে বেসুরো গাইতে শুরু করেছ। 'আমি পরাধীন, আমি অক্ষম,' তোমার মুখে এ কী বিপরীত উক্তি ! নিজেই যদি পরাধীন হলে স্বাধীন করবে কাকে ?

আমি যে কত আশা করেছিলুম তুমি আমাকে মুক্ত করবে। তোমার চিঠিপত্রে যে অদম্য মুক্তির সুর ছিল তা কি একখানা ফোটো দেখেই নেতিয়ে পড়ল ? তা হলে আর একখানা ফোটো পাঠাই। এটা দেখে যদি তোমার ভয় ভাঙে। সত্যি, তোমার ভয় ভাঙানো দরকার। তোমার চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় তুমি যে কেবল দেবীপূজক তাই নয় তুমি নারীপূজক। নারীকে পূজা কর বলেই কি এত ভয় কর ? তা হলে কাজ নেই তাকে পূজা করে।

তোমার বন্ধুরা আবার আসছে। তাদের পারুল বোন হতে আমি রাজী। কিন্তু তোমার পারুল বোন হতে নয়। তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক। এখন তাদের কাছে প্রকাশ করব না। পরে তারাও জানবে। প্রেম কখনো ছাপা থাকে না। জানবে সকলেই। আমার প্রোপ্রাইটরও জানবেন। কপালে দুঃখ আছে। তার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি। এই যে আমি গয়না পরিনে, মাছ খাইনে, নাচার না হলে কিছু নিইনে বা দিইনে, এ আমার দুঃখবরণের প্রস্তুতি। ভয় আমার নেই। কিন্তু ভাবনা আছে। আমি যে বড় নিঃসঙ্গ। আমার যে সঙ্গী নেই। চারদিকে লোকজন থাকার নাম সঙ্গী থাকা নয়। আমি একটি পক্ষিণী। আমার পক্ষীটি কই ? ওগো বনের পাখী, তুমি কি এই খাঁচার পাখীর সঙ্গী হবে না ?

ওগো বনের পাখী, মনের পাখী, পরীক্ষার পর তুমি যদি কোথাও চলে যাও আমি কি সইতে পারব ? আমি কি প্রাণে বাঁচব ? স্বাধীনতা নিয়ে আমি করব কী ? হৃদয় যদি শুকিয়ে যায়, অঙ্গ যদি না জুড়োয়, মন যদি না ভরে, আত্মা যদি আত্মীয় না পায় তবে কিসের জন্যে স্বাধীনতা ?

এর পর সে লিখেছিল জ্যোতিদা বেলগাঁও কংগ্রেসে যাচ্ছে। ফিরে এলে জানা যাবে নতুন কোনো সত্যাগ্রহ আন্দোলন হবে কি না। হলে গোরী তাতে ঝাঁপ দিয়ে স্বাধীন হবে। রত্নর সাহায্য নিতে হবে না। রত্নকে তার প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে। ইতির পর যোগ করেছিল, 'তোমার অনুরাগিণী গোরী।'

রত্নর চোখ দুটি আবেগে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই দুঃখিনী মেয়েটির জন্যে কীই বা করতে পারে একা একটি তরুণ ! এক হাতে ক'দিন লড়তে পারে সমাজের সঙ্গে, বড়লোকের সঙ্গে ! বোধ হয় আইনের সঙ্গেও। রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপ দিয়ে গোরী যদি মুক্তি পায় তবে সেই সব চেয়ে ভালো।

চিঠির যেখানে নারীপূজার উল্লেখ ছিল রত্নকে তা স্মরণ করিয়ে দিল বহুকাল পূর্বের কথা। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কে সে ঋষির মতো ভক্তি করত। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেত। তন্ময় হয়ে তাঁর উপদেশ শুনত। তিনিই একদিন বলেছিলেন, 'আমি ঈশ্বর বুঝিনে, পরকাল বুঝিনে। দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে। কিন্তু আমারও তিনটি উপাস্য দেবতা আছেন, তাঁরাই আমার ট্রিনিটি বা ত্রয়ী। আমার বাবা, আমার মা, আর আমার স্ত্রী।' রত্ন তা শুনে চমৎকৃত হয়েছিল। প্রথম দ্বিতীয়ের জন্যে নয়, তৃতীয়ের জন্যে। 'আমার স্ত্রী।'

কথাটা রত্নর মনে গাঁথা রইল। সে তো ধর্মবিশ্বাসে ট্রিনিটি বা ত্রিসত্ত্ব মানত না।

সে ইউনিটারিয়ান। অধ্যাপক মহাশয়ের আর্যবচন থেকে সে প্রথম দ্বিতীয়কে বাদ দিল। রাখল শুধু তৃতীয়কে। 'আমার স্ত্রী।' তার আবার 'স্ত্রী' শব্দটা পছন্দ নয়। সেটাতে শ্রদ্ধার ভাব যথেষ্ট নেই। তাই সে ওখানে বসিয়ে দিল 'নারী।' এই তার নারীপূজার ইতিহাস। তখন থেকে সে তার অধ্যাপকের মতো বলে আসছে, 'আমি দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে। কিন্তু আমারও একটি উপাস্য দেবতা আছেন। তিনি আমার নারী।' বলে আসছে মনে মনে। কদাচ কখনো মুখ ফুটে।

ইতিহাসের আরেক অধ্যায় তার মনে পড়ছিল। মাঘোৎসবের দিন সান্ধ্য উপাসনার পর রত্ন ও প্রভাত দুই বন্ধু ব্রাহ্মসমাজ থেকে ফিরছিল। অভিভূত ভাব তখনো কাটেনি। প্রভাত বলল, 'ভাই রতন, ছেলেবেলা থেকে আমি ব্রাহ্মদের হাতে গড়া। মনে প্রাণে আমিও তাদের একজন। তা হলে দীক্ষা নিইনে কেন? গুরুজন রাগ করবেন এই যা অন্তরায়। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমিও যদি দীক্ষা নাও দু'জনের গুরুজনের রাগ অর্ধেক হয়ে যায়।'

অঙ্কশাস্ত্রে এ রকম বলে নাকি? রত্ন তর্ক করতে পারত। তা না করে বলল, 'প্রভাত, ভাই, ছেলেবেলা থেকে না হলেও বড় হয়ে অবধি আমিও তাদের একজন। কিন্তু কেমন করে বলব যে কেবল তাদেরি একজন? গির্জায় যখন যাই তখন বলতে সাধ যায়, আমিও তোমাদের একজন। মসজিদের আজান যখন শুনি তখন বলতে ইচ্ছা করে, আমিও তোমাদের একজন। আর বাড়ীর পূজাপার্বণ যখন দেখি তখন মনে মনে বলি, দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে, তবু আমিও তোমাদের একজন। আমার মতো লোকের কি কোনো একটি ধর্মে দীক্ষা নেওয়া উচিত? যে মানুষ সকলের সে কেন এক সম্প্রদায়ের হবে?'

প্রভাত পরিষ্কার করে বলল, 'ব্রাহ্মদের একজন হতে চাই বলে দীক্ষা নিতে চাই তা নয়। ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাস করি, এটা প্রকাশ্যে স্বীকার করার মধ্যে সৎসাহস আছে।'

এবার রত্ন তর্ক করল। 'বিশ্বাস করা এক। দীক্ষা নেওয়া আরেক। দীক্ষা যদি নিতে হয় তবে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে আমরা কি শুধুমাত্র নিরাকারবাদী, না ঈশ্বরকে পিতা বলে উপাসনা করার পক্ষপাতী? আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি সাকারবাদে আস্থা হারিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারিনে ঈশ্বরকে পিতা কেন বলব, মাতা বলব না কেন।'

'ব্রাহ্মরাও মাতা বলে উপাসনা করেন।'

'প্রেমিক বলে?'

'রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়নি?'

'প্রেমিকা বলে?'

প্রভাত চমকে উঠল। 'কী বলে? কী বলে?'

রত্ন পুনরুক্তি করল। 'ঈশ্বরকে প্রেমিকা বলে উপাসনা করা যায় না?'

প্রভাত চলতে চলতে থেমে গিয়ে বন্ধুর দিকে কঠোরভাবে তাকাল। বলল, 'এটা

কি তর্কের খাতিরে তর্ক ? না ঈশ্বরকে নিয়ে কৌতুক ?'

রত্ন তেমনি নিরীহভাবে বলল, 'না, ভাই । এটা আমার উপলব্ধি । ছেলেবেলা থেকে বৈষ্ণব পরিবেশে মানুষ হয়েছি । ওদের পরমাত্মা কৃষ্ণ, জীবাত্মা রাধা । আমি তো স্বভাববিদ্রোহী । আমি বলি উলটোটা কেন হবে না ? জীবাত্মা কৃষ্ণ, পরমাত্মা রাধা ।'

'শুনেছি সুফীরা ও-রকম ভাবে। ওটা ভালো নয়। ছি! ভগবানকে নারী ভাবা !' প্রভাত বলল চলতে চলতে ।

'কেন ? ভগবানকে নারী ভাবা কি নতুন কথা হলো ? রামকৃষ্ণ কি তাঁকে জননীরূপে আরাধনা করেননি ?'

'তা বলে প্রেমিকারূপে ! ওতে তাঁকে নিচু করা হয় যে !'

রত্ন তর্ক করল, 'আর প্রেমিকরূপে ? তাতে নিচু করা হয় না ?'

প্রভাত গলা খাটো করে বলল, 'স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের যে সম্বন্ধ তাতে স্ত্রী নিচু নয় তো কী ! মনে নেই পণ্ডিত মশাই কী বলেছিলেন ! নরনারীর সমান অধিকার নিয়ে তুমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গেলে । ক্লাসের মাঝখানে মোক্ষম কথাটা উচ্চারণ করেন কী করে ! পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, প্রভাতমোহন, তোমার বন্ধু রত্নকান্তকে বলবে এটা প্রকৃতির বিধান যে পুরুষ উপরে, স্ত্রী নিচে । কেবল মানুষের বেলা নয়, সব প্রাণীর বেলা । তুমি তো শুনে লাফাতে লাগলে । বায়োলজির কেতাব ঘাঁটলে লাইব্রেরীতে বসে। পেলে না মুখের মতো জবাব ।'

রত্ন শোচনার সুরে বলল, 'হায়, হায় ! তখন যদি আমার জয়দেব পড়া থাকত ! পণ্ডিত মশাইকে পরাস্ত করতুম তাঁর নিজের অস্ত্রে ।'

'কিন্তু তাতে করে কী প্রমাণ হতো ? মেয়েরা উপরে । সমান তো নয় ।' এই বলে প্রভাত রত্নর মুখ বন্ধ করে দিল ।

পণ্ডিত মশাই ধরে নিয়েছিলেন যে নরনারীর সম্বন্ধটা প্রাণিতত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । প্রভাতেরও ধারণা তাই । সেইজন্যে সমান অধিকারের প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল । ইতিমধ্যে রত্নর সুবুদ্ধি হয়েছে । সে আর বিজ্ঞানের ধার দিয়ে যায় না । ও প্রসঙ্গ উঠলে সোজা শুনিয়ে দেয়, 'নরনারীতত্ত্ব নৃতত্ত্ব নয় । এখানে প্রকৃতির বিধান অবান্তর । নর ও নারী যাদের বলা হয় তারা কি আত্মায় তাই ? আত্মা নিরুপাধি । তবে, হাঁ, জগতে দুটো মূলতত্ত্ব রয়েছে । পুরুষ ও প্রকৃতি । ম্যাসকুলিন ও ফেমিনিন । দুই না হলে জগৎ চলে না । দুটোই সমান । দু'পক্ষই সমান । সমানে সমানে আত্মিক সম্বন্ধ । মিস্টিক সম্বন্ধ ।'

তার নিজের স্বভাবেই অসঙ্গতি ছিল । ফেমিনিস্ট হিসাবে সে বিশ্বাস করত যে নরনারীর সমান অধিকার । ওরা সমান । কিন্তু নাইট হিসাবে নারীকে দিত উচ্চাধিকার বা অগ্রাধিকার । তার একবার মনে হতো স্বাধীন পুরুষ বা স্বাধীনা নারী কেউ কারো পূজা করবে কেন ? ওরা যে সমকক্ষ । আরেক বার মনে হতো পরমাত্মা যদি নারী রূপ ধরে আসেন তা হলে তো তাঁকে সেই রূপে পূজা করতে হয় । সেইটেই পুরুষের

ধর্ম । তাঁর সঙ্গে সমান হতে চাওয়া পূজারীর মনস্কামনা নয় ।

এখনো সেই অসঙ্গতির অবসান হয়নি । এখনো সে নারীসাম্যবাদী ফেমিনিস্ট । অথচ মনে প্রাণে মধ্যযুগের নাইট কিংবা ত্রুবাদুর । ধ্যান করে প্রজ্ঞাপারমিতা বিয়াট্রিসের । কল্পচক্ষে অবলোকন করে বিয়াট্রিস আগে আগে চলেছেন, দান্তে তাঁর পিছনে পিছনে । এক তারালোক হতে আরেক তারালোকে । উর্ধ্বে, উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে । নারী এখানে নারীসত্ত্ব বা চিরন্তন নারীত্ব । গ্যেটে যার বন্দনা করেছেন ফাউস্ট নাটকের যবনিকাপতনের পূর্বক্ষণে । "The Eternal-Womanly draws us above."

ভাবতে ভালো লাগে যে মালাদি তার বিয়াট্রিস । মালাদির সে দান্তে । বেশ তো ছিল সে তার ভাবনা নিয়ে । কোন্‌খান থেকে এলো শ্রীমতী ! রত্নর জগতে এখন শুধু দান্তে ও বিয়াট্রিস নেই আছে রাধা ও কৃষ্ণ । দুই ধরনের দুই যুগল । কিন্তু দুই অসম । উভয় ক্ষেত্রেই নারী বড়, পুরুষ ছোট । নারী গুরু, পুরুষ শিষ্য । নারী উচ্চে, পুরুষ নিচে । রূপক আকারে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন জয়দেব ।

গৌরী বলছে সে-ই রাধা । কিন্তু রত্ন এখনো স্বীকার করতে পারছে না । স্বীকার করলে বিষম জটিলতা । মালাদির প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করা যায় না, সে যে দারুণ ব্যথা । শুধু কি মালাদির প্রতি ? বিয়াট্রিসের প্রতি, বিয়াট্রিসরূপিণী নারীর প্রতি, নারীসত্ত্বের প্রতি । না, সে তার নারীত্বের আদর্শ ছাড়তে পারবে না ।

অথচ গৌরীও তার বড় আদরের, বড় আপনার । এই ক'মাসে সে ও গৌরী যমজ হয়ে গেছে । যমজ, যুগল নয় । সে চায় তাদের দু'জনের সম্বন্ধটাকে সেই স্তরে রাখতে । কিন্তু গৌরী তাতে রাজী নয় । যমজকে যুগল না করে ওর তৃপ্তি নেই । আবার বলছে কিনা, কাজ নেই নারীকে পূজা করে। তা হলে সম্বন্ধটা কী দাঁড়াল ?

রত্নর বুকের কাঁপন থামলে হয় । তার আশঙ্কা হয় সে মরে যাবে । এত আনন্দ তার সইবে না । একে সোজাসুজি অস্বীকার করলেই বাঁচন, নয়তো মরণ । তার ভয় করে রাধাকে, রাধারূপিণী নারীকে । নারীত্বের যে আদর্শ গৌরীকে অনুপ্রাণিত করেছে । এ যেন অন্য সাধনা । অতি ভয়ানক, অতি বিপজ্জনক । কেননা এর মধ্যে দেহের ভূমিকা আছে । মালাদির মতো গৌরী বিদেহী নয় । ওই তো তার এবারকার ফোটো । কেবল মাত্র বাস্ট । গৌরী দু'হাতে মুখ রেখে ভাবছে । ভাবাকুলা নারী । বিষাদমধুর মুখ । কী যে আছে ও-দুটি পল্লবঘন নেত্রে ! তড়িৎ না চুম্বক ! চেয়ে থাকলে কাছে টেনে নেয় ।

তেরো

রত্ন নিজে সৌন্দর্যবাদীদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন চলল, কিন্তু সাত ভাই চম্পাকে নির্দেশ দিল বেগমপুর যেতে । নবনী কানন হৈম গিরীন ললিতকে লিখল ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা স্থানকেন্দ্রিক না হয়ে নীতিকেন্দ্রিক হতে । কয়েকটি মূলনীতি না মানলে সাত ভাই চম্পার

অস্তিত্ব নিরর্থক । সেগুলি কী কী তা নতুন করে স্থির করা হোক একসঙ্গে বসে বেগমপুরে । রতুর নিজের সিদ্ধান্ত এই যে, অতীতের সম্মোহন সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ নেই । স্থবিরের আবার ভবিষ্যৎ কী ? ভবিষ্যৎ হচ্ছে তরুণের । অথবা শিশুর । যেসব সভ্যতা জীর্ণ হয়েছে তাদের সসম্মানে যাদুঘরে স্থান দিতে হবে । জীর্ণ-সংস্কার পণ্ডশ্রম । যাবার আগে গোরীকে চিঠি লিখল রাত জেগে । লিখল—

এসব কথা এত নিগূঢ় যে বন্ধুদের কাউকে বলা যায় না, বোঝানো যায় না । নির্বাক হয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই । দু'হাতে বুক চেপে ধরি, ঘাড় চেপে ধরি । লোকে হয়তো ভাবে পাগল না ক্ষ্যাপা । এই ক'দিন আমি ক্ষ্যাপার মতো অস্থির হয়ে কাটিয়েছি । শেষপর্যন্ত স্থির জেনেছি—কী জেনেছি, শুনবে ?

গোরী, তুমি হচ্ছ আর-একটি আমি । আমি যদি নারী হয়ে জন্ম নিতুম আমার নাম হতো গোরী । আমার রূপ হতো গোরীর । তুমি আমার প্রতিবিম্ব । কিংবা আমিই তোমার । আমরা যমজ নই । কারণ যমজের মধ্যে আছে পার্থক্যের ভাব। আমরা যুগল নই । কারণ যুগলের মধ্যে বৈপরীত্যের ভাব । তা হলে আমরা কী? আমরা একে অপরের প্রতিচ্ছায়া । আমরা একই ব্যক্তির নামান্তর ও রূপান্তর । জন্মান্তরে নয় । একই সময়ে ।

আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ো না । এর পিছনে আছে অনেক নিদহারা রাত । ক্ষীণাহারী দিন । এ আমার অনেক দুঃখের উপলব্ধি । গোরী, তুমি এসে আমার অন্তর্জীবনের ঘরকন্না ওলটপালট করে দিয়েছ । অগোছালো সংসার নিয়ে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি । একে গোছাতে হলে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা চিরকালের মতো নির্ণয় করতে হবে । আজ ভাইবোন, কাল বন্ধু বন্ধুনী, পরশু মিতা মিতালী পাতিয়ে চিরকালের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না । বাকী থাকে প্রেমিকপ্রেমিকা । তার বাধা কোন্‌খানে তা কি তুমি জান না ? আমার হৃদয় পড়ে আছে আর-একজনের কাছে । সেইজন্যে আমার সমাধান এই যে, তুমি আর-একটি আমি । আমি আর-একটি তুমি । প্রেম তো আপনার সঙ্গে আপনার হয় না ।

তা ছাড়া প্রেমের উপর নির্ভর করে চিরকালের সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না । প্রেম যেন বহতা নদী । কোথাও একঠাই আবদ্ধ থাকে না । তাকে বন্ধন দিয়ে স্থিতিবান করতে গেলে বন্ধনই সার হয় । গোরী, আমার সঙ্গে চিরকালের সম্বন্ধ যদি চাও তবে প্রেম বাদ দাও । তা বলে তোমার জীবন থেকে প্রেম বাদ দিতে বলব না । তুমি আর কাউকে ভালোবাসবে । আর কারো ভালোবাসা পাবে । তোমার হৃদয় যদি শূন্য থাকে আমার একটি নিবেদন আছে । তুমি আমার বন্ধু কাননকে ভালোবেসো । সর্ব জীবে ওর করুণা । পশুপক্ষীর এমন দরদী আর নেই । দুঃখী মানুষেরও । সোনালীর দুঃখে ওই তো প্রথম সাড়া দেয় । ওর হৃদয়টিও সোনালী। কিনা সোনার । ওর কাছে তুমি একটুতেই সাড়া পাবে । ওর নিজের জীবনেও একটি সুন্দর যোজনা হবে । বেচারা কানন । কোনো মেয়ে ওকে ভালোবাসে না।

ও অন্তরে অন্তরে নিঃসঙ্গ ।

আমার কথা যদি জানতে চাও তো জানাতে পারি, কিন্তু রাগ করবে না তো ? আমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি যে নারী পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়। আমি ফেমিনিস্ট । নারীসাম্যবাদী । কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে নারীকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে । তাই poetic justice হিসাবে কবিরা সাধকরা নারীকেই গুরু বলে বরণ করেছেন । আর সকলের চোখে সে ছোট । কবিদের সাধকদের চোখে সে বড় । এমনি দুটি নারী-আদর্শ আমার মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে । রাধা ও বিয়াট্রিস। মধ্য যুগের কবি ও সাধকদের প্রেমগুরু । নারীর এই ভাবরূপ আমিও ধ্যান করেছি। কিন্তু ধ্যান করে ক্ষান্ত থাকিনি । বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছি । আমার মনে হয়েছিল মালাদির মুখে বিয়াট্রিসকে দেখেছি । ক্রমে সে ধারণা ফিকে হয়ে আসছে । এখন মনে হচ্ছে বিয়াট্রিসকে যদি মূর্তিমতী দেখতে চাই তো এ দেশে পাব না, ও দেশে যেতে হবে । ইউরোপে ।

আর রাধাকে ? রাধাকে যদি নারীতনুতে দেখতে চাই তো ও দেশ থেকে এ দেশে ফিরে আসতে হবে । তার পর নিজের শ্রেণী থেকে নিচের শ্রেণীতে নেমে যেতে হবে । কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষত্রিয় কুলে পাননি । পেয়েছিলেন গোপকুলে । আমি হয়তো পাব চাষীকুলে কি মাঝিকুলে । গৌরী, তুমি আমার আর-একটি আমি। তোমার কাছে খুলে বলতে সঙ্কোচ নেই । আমার প্রত্যয় হয় না যে তুমি রাধা। দেখেছি তো তোমার ফোটো । আমার কল্পলোকের রাধার সঙ্গে মেলে না । মিললেও আমি রাধার জন্যে প্রস্তুত নই । মালাদির প্রতি আমার আনুগত্য । বিয়াট্রিস-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ।

ওদিকে বড়দিনের বন্ধে আসবে বলে শ্রীমতীকে যারা কথা দিয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র কানন তার প্রতিশ্রুতি রাখল । একটিমাত্র কোকিলকে দিয়ে বসন্তকাল হয় না । মূলনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে কে ? বৈঠকখানায় যশোবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ও তাঁর সেই বিখ্যাত বিলিতী বেহালা শুনে কাননের দিন কাটে । অন্দর থেকে ডাক এলে শ্রীমতীর সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করতে হয় । তার পরিপাটি আহারের সময় গৌরী নিজে বসে পাখা করে । যদিও ওটা শীতকাল । মাধবের মতো কাননও আর কিছু দিন বাদে ও-বাড়ীর গৃহদেবতা বনে যেত, কিন্তু একদিন তার আসন টলল । বেলগাঁও থেকে খবর এলো গান্ধীজীর ইচ্ছা নয় অদূর ভবিষ্যতে কোনোরূপ গণ আন্দোলন করা । তাঁর কাছে যারা ফাইটিং প্রোগ্রাম দাবী করেছিল তাদের মাথায় তিনি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছেন । ফাইটিং প্রোগ্রাম চাও তো আগে বিদেশী বস্ত্র বর্জন কর । মিলের কাপড় নয়, মিলের সূতো দিয়ে তৈরি তাঁতের কাপড় নয়, হাতে কাটা সূতোর তাঁতে বোনা খদ্দর পর । চার আনা দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য না হয়ে সূতো কেটে সদস্য হও ।

আহ্লাদে অধীর হয়ে কানন বলে ফেলল, 'সাবাস, গান্ধীজী এই তো চাই ।' ভেবেছিল শ্রীমতীও সায় দেবে । কিন্তু ওর ভাবভঙ্গী দেখে ভয় হলো ও মাথায় বাড়ি খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়েছে । বেল পাকলে কাকের কী ? বেলগাঁও কংগ্রেস রণছোড়

হলে বেগমপুরের শ্রীমতীর কী ? কানন গালে হাত দিয়ে ভেবে আকুল । অনেকক্ষণ পরে শ্রীমতী যা বলল তার মর্ম এই । দুষ্টু বুড়ো বেনিয়া ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওর অলঙ্কারগুলি নিয়েছে । গণসত্যাগ্রহ করবার নাম নেই । বারদোলি সত্যাগ্রহ চৌরীচৌরার অজুহাতে স্থগিত রাখায় ও স্তম্ভিত হয়েছিল । তবু ওর বিশ্বাস ছিল যে গণ আন্দোলন চালাবার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে । এখন সে বিশ্বাস চূর্ণ হলো । না, সে ক্ষমতা গান্ধী বুড়োর নেই । ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে তিনি বেকায়দায় পড়েছেন । ভানুমতীর খেল জমছে না । ডুগডুগি বাজালে কী হবে ?

কানন একটু প্রতিবাদের মতো করেছিল । শ্রীমতী দপ করে জ্বলে উঠেছিল । 'তুমি কী বুঝবে আমার ব্যথা ! তোমার তো সর্বস্ব যায়নি ।' তার পর ধীরে ধীরে কানন শুনতে পেলো শ্রীমতীর মর্মবেদনার হেতু । মুক্তি না পেলে সে বাঁচবে না । কেমন করে পাবে, যদি না গণ আন্দোলনে ঝাঁপ দেয় ? কিন্তু গণ আন্দোলন হলে তো ঝাঁপ দেবে ! সন্ত্রাসবাদেও সে আর মুক্তির হাতছানি দেখছে না । বিদেশী বসন বয়কট করে খাদি পরে সুতো কেটে কি সে আপনাকে মুক্ত করতে পারবে ? বৃথা স্বপ্ন !

কানন তাকে নতুন কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেনি । যশোবাবুর মতো নিখুঁৎ ভদ্রলোকের সঙ্গে কেন যে তার বনছে না কাননের কাছে এটা এক দুর্ভেদ্য রহস্য । সুযোগ পেলে সে দু'জনের মাঝখানে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছে। নয়তো অত বড় একটা খানদানী বংশে কলঙ্ক লাগবে । শ্রীমতী কিন্তু মধ্যস্থতার প্রস্তাবে সম্মত নয় । সে বলে, 'কানন ভাই, চাঁদের উলটো পিঠ কেউ দেখতে পায় না । তুমিও দেখনি । ও শুধু চাঁদের বৌ দেখেছে ।' এর মানে কী ? কানন তো হতবুদ্ধি ।

বেগমপুর থেকে ঘুরে এসে কানন চিঠি লিখেছিল রত্নকে । মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে । তারই শেষের দিকে ছিল, 'মানুষের জন্যেই মূলনীতি । মানুষ যদি দুঃখ পায় তা হলে তার দুঃখ কিসে দূর হয় সে কথা না ভেবে কতকগুলো শুষ্ক অনুশাসন দিয়ে কী হবে ? ভাই রতন, পারুলবোন যাতে সুখী হয় তার উপায় অন্বেষণ কর । দেখেশুনে মনে হলো ও তোমার দিকেই চেয়ে আছে সূর্যমুখীর মতো । সাত দিন ছিলুম, এমন দিন যায়নি যেদিন কথায় কথায় তোমার নাম ওঠেনি । আর কারো নাম দিনান্তেও একবার নয় । তোমার সম্বন্ধে ওর গভীর জিজ্ঞাসা । আমরা সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করি জেনে ও পরম তৃপ্তি পেলো । আমাকে বিশেষ করে বলেছে, তোমাকে যেন আমি বেগমপুর বা কলকাতা নিয়ে গিয়ে দেখাই । ও দেখতে চায় । কবে তোমার সময় হবে ? পরীক্ষার পরে বোধ হয় । আমি তৈরি যে কোনো সময় ।'

গৌরীর বর্ণনাও ছিল কাননের চিঠিতে । পড়ে মনে হলো গৌরী সমস্ত ক্ষণ জ্বলছে । তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে তার দেহমন । আগুনের হলকা ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে । হাওয়া গরম হয়ে উঠছে । শীতকালে পাখার দরকার হবে না ? পাখাটা দিয়ে এমন মার মারল একটা বেড়ালকে যে কাননের পশুদরদী মন গুমরে উঠল । সে আর খাবে না বলে হাত গুটিয়ে বসল । গৌরীর চোখেও জল লক্ষ করল । এই হাসি এই কান্না এই রাগ এই আদর । সব মিলিয়ে এই শ্রীমতী ।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে কাননের চিঠির সঙ্গে একই ডাকে গৌরীর চিঠি পেয়েছিল রত্ন । তাতেও কতকটা এই ধরনের কথা ছিল । কাননটা ছিঁচকাঁদুনে বুড়ো খোকা । ওর দিকে তাকালে বাৎসল্যের ভাব আসে । ওর প্রেমে পড়বে কোন মেয়ে ! খোকাবাবুকে ভালোবাসবার জন্যে একটি খুকুমণি খুঁজতে হবে । একটি পাঁচ বছরের খুকু । গান্ধীজীর অকর্মণ্যতায় গৌরীর বুক ভেঙে গেছে । সে আর রাজনীতি করবে না । রাজনীতির ভাবনা মনেও আনবে না । গত লোকাল বোর্ড নির্বাচনে শ্বশুর মহাশয় দাঁড়িয়েছিলেন, সে তাঁর জন্যে ভোট ভিক্ষায় নেমেছিল । ফলে শ্বশুর মহাশয় তাকে কতকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন । কিন্তু শ্বশুরপুত্রের পায়ে আত্মসমর্পণের শঙ্কা তো অতীত হয়নি । সেইটেই স্বাধীনতার কষ্টিপাথর । গৌরী রত্নর উপর নির্ভর করেছিল । কিন্তু সেও তো ধরাছোঁয়া দিতে রাজী নয় । তার মালাদি আছেন যে ! গৌরী অভিমান করে লিখেছে—

তোমার চিঠিখানি মিছরির ছুরি । মিষ্টি মিষ্টি কথা, কিন্তু সব কথার সার কথা তুমি আমাকে ভালোবাস না । ভালোবাসতে পারবে না । এই যখন তোমার শেষ কথা তখন আমার আর কী বলবার আছে ? কী বলব ?

আগডুম বাগডুম এত বকবক না করে তুমি যদি শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করতে ! যদি বলতে, আমি তোমাকে ভালোবাসি ! তা হলে কি আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে না জানি কোন মহৎ কাজ করতে যেতুম না ! কত মহৎ সম্ভাবনা ছিল আমার জীবনে । কিন্তু সোনার কাঠি ছোঁয়াবে কে ! কোন রাজপুত্র ! প্রিয়তম, তুমি আমাকে নিরাশ করলে ।

তোমার এ প্রত্যাখ্যান আমি ভুলতে পারছিনে । তাই তোমার মিঠে কথায় ভুলছিনে । মিঠে কথা প্রায় মিছে কথা হয় । তুমি আর-একটি আমি । আমি আর-একটি তুমি । তা হলে তোমার আমার ভিন্ন নিয়তি কেন ? আমি কেন বন্দিনী ? তুমি কেন মুক্ত ? আমি কেন কলেজে তোমার সহপাঠিনী হতে পাইনে ? অন্তত অন্য কলেজে ? আমি কেন তোমার মতো স্বপ্ন দেখব না ? পুরুষ-আদর্শের ? তোমার যেমন বিয়াট্রিস ও রাধা আমার তেমনি অর্জুন ও কৃষ্ণ ।

তোমার মতো আমার কেন ভ্রমণের স্বাধীনতা নেই ? আমি কেন যেখানে মন চায় যেতে পারিনে ? ইউরোপ তো অনেক দূরের কথা । কলকাতা এত কাছে, তবু সেখানে যেতে দেবে না । দিলে এক দল লোকলস্কর সঙ্গে দেবে । নইলে এদের মানসম্মান থাকবে না । আমার প্রাণান্ত । কোথায় এদের লোকজনকে রাখি ? জানি তারা এক একটি গুপ্তচর । আমি তাদের নজরবন্দী । তবু তাদের তোয়াজ করতে হবে । সেদিন কলকাতা গিয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়েছে । তা হলেও যাব আবার, যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় ।

কাননকে সেধেছি যেমন করে হোক যেখানেই হোক তোমার আমার সাক্ষাৎ ঘটাতে । বেগমপুরে হলেই ভালো, নয়তো কলকাতায় । কবে তোমার সুবিধে হবে ওকে লিখো, আমাকেও জানিয়ো । সত্যি আমি সঙ্কটাপন্ন । কিন্তু লেখনীমুখে

বোঝাতে পারব না । লোকমুখেও না ।

আমি যে সব আশা সব ভরসা হারিয়ে ফেলেছি । আমি কি তবে হেরে যাব ? হার মানব ? প্রথম বয়সে আত্মঘাতী হতে চেষ্টা করেছিলুম । তাতে আন্তরিকতা ছিল না । যে জগতে এসেছি তার পরিচয় না নিয়ে তার কাছে নিজের পরিচয় না দিয়ে অকালে বিদায় নিতে পা সরে না । আমি বাঁচতেই চাই । আমার যে সব দেখা সব শেখা সব পাওয়া সব করাই বাকী । আমার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অশান্ত অতৃপ্ত কামনা । এ নিয়ে আমি যাব কোন স্বর্গে ? আমাকে বাঁচতেই হবে । তা বলে কি আমি অনন্তকাল জ্বলব ? জ্বলতে পারে কেউ ? দগ্ধ হতে হতে আমার যৌবন গেল । জীবনও যাবে ? হৃদয়ভরা দাহ নিয়ে আমার রূপ কত কাল থাকবে ? তবে কি আমি পরাজিত হব ? পরাজয় মানব ?

ভাবতে পারিনে, প্রিয় । আমাব মনে হচ্ছে আমি আবার অসুখে পড়ব । একটা কোনো শক্ত অসুখে । সুখ না থাকলে অসুখ তো করবেই । যেমন তোমার মালাদির করেছে । কে জানে হয়তো আমার অসুখ করলে তুমি আমাকে দেখতে আসবে । হয়তো অস্তমুখী শশিকলার মতো মিলিয়ে যাচ্ছি দেখলে ভালোবাসবে ।

রত্ন, পরিত্রাণের পন্থা জান তো বল । জানা জরুরি । সবুর সইবে না । এমন কিছু ঘটে যাবে যার জন্যে সারা জীবন পশতাতে হবে । তোমার তপোভঙ্গ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত । ওদিকে তোমার পরীক্ষা । এদিকে আমারও তো পরীক্ষা । তুমি পাশ করবে, আমি ফেল করব এই কি আমাদের নিয়তি ? তোমার আর-একটি তুমি ফেল করলে সেটা কি তোমারই ফেল করা নয় ?

এমনি বিষণ্ন সুরে আরো অনেক কথা লিখে গোরী ইতি দিয়েছিল । ইতির পরে লিখেছিল, 'তোমার অভাগিনী গোরী ।'

শান্তিনিকেতনের ভাবলোকে বিহার করতে করতে রত্ন বাস্তব সংসার থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল । সেখান থেকে ফিরে এসেও তার সংসারচেতনা হয়নি । সৌন্দর্যের ঘোর ভাঙতে চায় না । কিন্তু কাননের ও গোরীর চিঠি দু'খানি তাকে ধূলির ধরণীতে নামিয়ে আনল । বিষাদে ভরে উঠল মন ।

শান্তিনিকেতনে যে কয় দিন ছিল বস্তুলোকের ঊর্ধ্বে রূপলোকে ছিল । সেখানে যেন সুন্দরের রাজত্ব । 'যে যায় সে গান গেয়ে যায় সব পেয়েছির দেশে ।' দিনে রাতে সকালে সাঁঝে যখন খুশি যার খুশি গান গেয়ে উঠছে । কত রকম গান । সব রবীন্দ্রনাথের রচনা । কী অপূর্ব তার সুর, তার ব্যঞ্জনা, তার অনুরণন ! সাওতাল মেয়েরা সার বেঁধে গান গেয়ে চলেছে তাদের নিজেদের মতো করে । এক ঝাঁক বুনো পাখী আর কী ! সাঁওতাল ছেলেরা বাঁশি বাজাচ্ছে আপন মনে । ছবি আঁকছে পটুয়ারা পথের ধারে বা মাঠের মাঝখানে । খোলা আকাশের তলে । বাইরে থেকে আকাশকে লুট করে নেবে, লুটে নেবে প্রকৃতিকে ।

মেলা দেখতে মেলা লোক এসেছিল । কিন্তু রত্ন অঞ্জন বিদ্যাপতি তো মেলা দেখতে

যায়নি । ওদের লক্ষ্য মেলামেশা । তার অফুরন্ত সুযোগ জুটল । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, তিনি তখন দক্ষিণ আমেরিকায় । য়্যাণ্ডরুজ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি আরো অনেকে ছিলেন । আলাপ করে ও ফোটো তুলে, গান শুনে ও গল্প করে, মানুষ চিনে ও দৃশ্য দেখে ওদের মনে হলো ওরা কত কাল শান্তিনিকেতনে আছে । ওরাও আশ্রমিক । দেশী বিদেশী তরুণ তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হলো । তেমন পরিচয় দুর্লভ । বিদ্যাপতি বলে, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং না গচ্ছামি । সলিল তাকে ক্ষ্যাপায় । তার বোনরা শুনে হাসে । শিশুমহলেও সে সমান জনপ্রিয় । নামের গুণে কি রূপের গুণে বলা যায় না । পরীক্ষার ভয় না থাকলে সে বোধহয় ফিরতে চাইত না । রত্নও কি ফিরতে চাইত ?

আহা ! সেই বৈকুণ্ঠবাসের পর কোথায় তার স্মৃতির সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, তা নয় । মুক্তির উপায় অন্বেষণ কর । সবুর সইছে না । জরুরি । নইলে অসুখ করবে। শক্ত অসুখ । মালাদির মতো শুকিয়ে যাবে গোরী । মালাখানির মতো ।

কেন এমন হয় যে রত্ন যত বার সৌন্দর্য দিয়ে তার চেতনা ভরতে যায় অসুন্দর তত বার এসে তাব ধ্যান ভেঙে দেয় ! চেতনা জুড়ে বসে ! নিষ্ঠুর বাস্তব তাকে স্বাধীন হতে দেয় না । আর সকলের মতো সেও বস্তুলোকের নিয়মাধীন । মানতে চায় না শাসন, মানতে হয় । অন্যথা প্রাণধারণ অসম্ভব ।

রত্ন যখন উদভ্রান্ত বোধ করে তখন হস্টেলের বেড়ার বাইরে করবীর ঝাড়ের নিচে অর্ধশয়ান হয় । কবিত্ব করে বলে, 'করবীকুঞ্জ ।' যেমন শান্তিনিকেতনের 'মঞ্জুমালতী কুঞ্জ ।' সেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসে না । এক বিদ্যাপতি আন্দাজ করে যে কিছু একটা হয়েছে, কাছে এসে সহানুভূতি জানায় ।

সেদিন বিদ্যাপতি বলল, 'কি হে, অমন মনমরা হয়ে ভাবছ কী ? যাদের ফেলে এসেছ তাদের কথা ? 'কোনো নামটি মন্দালিকা, কোনো নামটি চিত্রলিখা ।'আবার কবে শান্তিনিকেতন যাওয়া হচ্ছে আমাদের ? বসন্ত উৎসবের সময় গেলে কেমন হয় ?'

তিন বন্ধু এরই মধ্যে দর্জির কাছে ঢোলা পায়জামার ফরমাস দিয়ে এসেছিল । বাবরী রাখবে বলে নাপিতকে জানিয়ে দিয়েছিল । বাকী থাকে তিনজনের তিনটি দাড়ি । কিন্তু একালের মেয়েরা কেউ দাড়ি বরদাস্ত করবে না, যদিও দাড়ি বাদ দিলে গুরুদেবের গুরুত্ব বারো আনা কমে যায় ।

'ওঃ ! তুমি দেখছি শান্তিনিকেতনে হৃদয় হারিয়েছ ! হারামণি খুঁজতে যেতে চাও ! নিজের ভাবনা আমার উপর আরোপ করছ ।' রত্ন পরিহাস করতে গেল । কিন্তু পরিহাসের সুর বাজল না। ধরা গলায় বলল, 'ভাই বিদ্যাপতি, একসঙ্গে যে ক'টা দিন আছি একত্রবাসের মাধুরী দিয়ে পেয়ালা ভরে নিই এস । এর পরে তুমি কোথায় আর আমি কোথায় ! আমার জীবনের একটা অধ্যায় তো সারা হয়ে এলো । সমাপ্তির হাওয়া গায়ে লাগছে ।'

'কেন ? তুমি এম-এ পড়বে না ?'

'না । তোমাকে প্রথম হবার সুযোগ দেবার জন্য আমি অপসরণ করব ।'

বিদ্যাপতি খুশি না হয়ে ক্ষুণ্ণ হলো। 'কোথায় যাবে ? শান্তিনিকেতন ?'

রত্ন বলল, 'না, ওখানে আমার হারামণি নেই। আমি লিখতে লিখতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাব। লেখার উপার্জনে একজনের সংসার চলে যাবে।'

'আরেক জন এলে ?' বিদ্যাপতি কৌতূহলী হলো।

'আমার জীবনের প্যাটার্ন স্থির হয়ে গেছে। আমি যত দূর পারি একাকী উড়ব। সঙ্গিনী যদি কেউ হয় সেও পাশাপাশি উড়বে। নীড় বাঁধার কথা ওঠে না। অমি একসঙ্গে বাস করা পছন্দ করিনে। অতি পরিচয় থেকে অবজ্ঞা জন্মায়। কাছাকাছি বাস করলেই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে দেখা হবে। দেখা না হলেই বা কী!'

বিদ্যাপতি লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, 'না হলেই বা কী! মিলন হবে না, বলতে চাও ? কোনো দিন হবে না ?'

রত্ন শরমে অরুণ হয়ে বলল, 'হবে হয়তো।'

বিদ্যাপতি সলজ্জ ভাবে সুধালো, 'সন্তান হলে ?'

রত্ন রঙিন হয়ে বলল, 'হবে না।'

বিদ্যাপতি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল। 'তার মানে ? ব্রহ্মচর্য ?'

রত্ন রেঙে উঠে বলল, 'অন্য উপায় আছে।'

বিদ্যাপতি ঘেমে উঠে বলল, 'ওসব চলবে না এ দেশে। অমন মেয়েই বা কোথায়! তা ছাড়া ওটা নারীত্বের আদর্শ নয়। নারীত্বের পরিণতি মাতৃত্ব।'

রত্ন এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠল। তর্ক করতে পেলে সে আর কিছু চায় না। বলল, 'ওসব চলে এসেছে সব দিন সব দেশে। এ দেশেও। তুমি খোঁজ রাখ না। অমন মেয়েও আছে বই-কি। আমি যখন আছি তখন সেও আছে কোথাও। নইলে জোড় মিলবে কী করে ? ভগবান আমাদের জোড়ে জোড়ে পাঠান। আর ওই যে নারীত্বের আদর্শের কথা বললে ওটা পুরুষের দাড়িত্বের মতোই সেকেলে রেওয়াজ। চিরন্তন নয়। একালের ছেলেরা একালের মেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে ঠিক করবে নারীত্বের আদর্শ কী হবে আর পৌরুষের আদর্শ কী হলে ভালো হয়।'

চোদ্দ

কাননকে গৌরীর মনে ধরেনি বলে রত্ন দুঃখিত হয়েছিল। কাননের জন্যেও বটে, গৌরীর জন্যেও বটে। তার নিজের জন্যেও। কারণ এখন তো ভালোবাসার দায় তারই উপর বর্তায়। 'ভালোবাসব' বলা সহজ নয়, 'ভালোবাসব না' বলাও কঠিন। গৌরীর মতো না হলেও রত্নও সঙ্কটারূঢ়। তার এটা উভয়সঙ্কট। সব চেয়ে ভালো হতো গৌরী যদি কাননকে ভালোবাসত, কানন গৌরীকে। তা তো হবার নয়।

রত্ন আত্মপরীক্ষা করে দেখল গৌরীকে সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। রাখীবন্ধ বহিনকে পরিত্যাগ করা যায় না। বীরধর্মে বাধে। সম্পর্ক ইতিমধ্যে বদলে গেছে, কিন্তু

রাখী তো বাঁধা রয়েছে । সে বাঁধন খোলেনি । আলগা হয়নি । রকমারি সম্পর্কের কথা ভাবা গেছে । কোনোটা খাপ খাচ্ছে না । 'তুমি আমার আর-একটি আমি' 'আমি তোমার আর-একটি তুমি' এর মধ্যে চিরন্তনতা আছে, কিন্তু এ সম্পর্ক গোরী স্বীকার করবে না । একতরফা কেমন করে চলবে ?

সম্পর্ক যাই হোক না কেন, রত্ন বুকে হাত রেখে জানল যে গোরীকে সঙ্কটমুক্ত না করে তার সঙ্কটমুক্তি নেই । পথি নারী বিবর্জিতা আর যার দ্বারা হোক তার দ্বারা হবে না । তবে সে একা পারবে না অত বড় দায় বইতে । সাত ভাই চম্পাকেও বইতে হবে। কিন্তু আপাতত আর কাউকে বলতে ভরসা হয় না । গোরী কী মনে করবে ! সে তো আর কাউকে তেমন করে চেনেই না । চেনে সাত ভাইয়ের মধ্যে কাননকে। আর যাকে চেনে সে রত্ন স্বয়ং ।

রত্ন লিখল কাননকে, 'একটা গান আছে বাউলদের । শুনেছ ? 'কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার ।' আমিও ভাবছি বাউল হয়ে গান বাঁধব, 'বেলগাঁওয়ে কী হয়েছে বেগমপুরে অসুখ কার ।' গান্ধীজী গণ আন্দোলন করবেন না, তাই শ্রীমতী দেবীর বুকে ব্যথা । তুমি, ভাই, তোমার পারুলবোনকে হাতে নাও । তুমি তো কাছাকাছি থাক, তোমার পাশ কোর্সের পরীক্ষায় অত চাপও নেই । আমাকে আপাতত মাফ করতে হবে । তবে যদি সত্যি কোনো রকম বিপদ আপদ ঘটে আমি সব সময় তৈরি ।'

সব সময় তৈরি, এ কথা লিখবামাত্র তার মনের ভাব হালকা হয়ে গেল । হাঁ, নাইট সব সময় তৈরি । রত্ন এ জীবনে কত কী হতে চেয়েছে । সাধক, শিল্পী, প্রতিমাভঙ্গকারী, ক্রবাদুর, নাইট । কিন্তু ঘটনাচক্র তাকে আর সব কিছু থেকে নিবৃত্ত করে নাইট করবে বলে বদ্ধপরিকর । বেশ, তাই হোক । এটাও তার প্রার্থনার উত্তর । বর লাভ । সে এবার যখন গোরীকে চিঠি লিখতে বসল তখন লিখল—

> সময় থাকলে তোমাকে শান্তিনিকেতন যাত্রার গল্প লিখতুম । সারা পথ সলিল ব্রহ্ম যা মজা করল তা শুনলে হেসে খুন হবে । বোলপুর স্টেশনে নেমে দেখি আশ্রমের মোটরবাস আসেনি । সেই সনাতন গোরুর গাড়ীতে আমাদের সাত আটজনের মালপত্র চাপিয়ে আমরা পায়ের গাড়ী চালিয়ে দিলুম । মাত্র দু'মাইল । বাংলাদেশের এই অঞ্চলটা সাঁওতাল পরগণার মতো অসমতল ও শুষ্ক । চার দিকে একপ্রকার রুক্ষ শোভা । বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থলে স্থলে তরুরাজি । পথের দুই পাশে কাশের সারি । আশ্রমের চার দিকে প্রশস্ত প্রান্তর আর ছোট ছোট ঝোপ ছাড়া আর কিছু নেই । মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতো লতাগুল্মপত্রপুষ্পের অন্তরালে অবস্থিত কয়েকটি নানা আকারের নানা রীতিতে নির্মিত কুটির । বেশীর ভাগই খড়ের । কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব আছে ।
>
> আমার দৃষ্টি প্রকৃতির উপর ততটা নয় যতটা মানুষের নির্মিতির উপরে । যা মানুষের হাতে গড়ে উঠছে তা আকারে উল্লেখযোগ্য নয় । তোমাদের ওখানে তার চেয়ে বৃহৎ আয়তন পাবে । তোমার চিঠিতে তুমি 'মহৎ' শব্দটি ব্যবহার করেছ। আমিও সেই শব্দটির শরণ নিচ্ছি । শান্তিনিকেতনে যা গড়ে উঠছে তা

মহৎ । কেবল আশ্রম নয়, সপ্তপর্ণী কুঞ্জ নয়, কলাভবন নয়, বিশ্বভারতী নয়, আন্তর্জাতিক শ্রীক্ষেত্র নয় । নতুন যুগের বালক বালিকা তরুণ তরুণী । আমাদের সঙ্গে এদের মিলবে কেন ? আমরা মানুষ হচ্ছি এক রাশ নেগেটিভ নিয়ে । আর এরা মানুষ হচ্ছে একটুখানি পজিটিভ হাতে করে ।

বুঝিয়ে বলি । আমরা যেসব স্কুল কলেজে পড়ি সেসব আমাদের কয়েদখানা । কর্তারা আমাদের বিশ্বাস করেন না, আমরাও তাঁদের বিশ্বাস করিনে । এই দেখ না, এই হসটেলের চার দিকে লোহার রেলিং । ঢুকতে হয় লোহার দরজা দিয়ে । সে দরজা বন্ধ হয়ে যায় রাত দশটায় । দশটা থেকে ছ'টা আমরা তালাবন্ধ । সকালে ও সন্ধ্যায় প্রিফেকট ঘুরে বেড়ান, দেখে যান যে যার কুঠরিতে পড়াশুনা করছে কি না । সুপারিনটেন্ডেন্ট পরিদর্শন করতে আসেন । কাউকে অনুপস্থিত পেলে রক্ষা নেই । এর সঙ্গে তুলনা কর শান্তিনিকেতনের । ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা বলে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে ।' ধন্য রবীন্দ্রনাথ ! ধন্য তোমার রাজত্ব !

তুমি আমার সহপাঠিনী হলে সুখী হতে ? কিন্তু আমাদের কলেজ নারীবর্জিত । এ শুধু সম্ভব শান্তিনিকেতনে । সেইজন্যে আমার বন্ধু বিদ্যাপতির সে কী আফসোস শান্তিনিকেতন ছাড়তে ! এখনো তার মাথায় শান্তিনিকেতন ঘুরছে । কিন্তু যা বলছিলুম । আমরা মানুষ হচ্ছি একরাশ নেগেটিভ নিয়ে । যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কয়েদ করেছে তাকে চাইনে । এ ব্যবস্থা যারা কায়েম করেছে তাদের রাজত্ব চাইনে। তাদের রাজত্ব যার উপর দাঁড়িয়েছে সেই শাসন পদ্ধতি চাইনে, সেইসব আইনকানুন চাইনে । তার গোড়ায় যা আছে সেই সভ্যতা চাইনে, সেই সংস্কৃতি চাইনে । আর শান্তিনিকেতনের ওরা মানুষ হচ্ছে একটুখানি পজিটিভ হাতে করে । ওরা গড়ে নিতে চায় । যা ওদের মানসে আছে তা গড়ে নিতে চায় । যা ওদের অন্তরে আছে তাকে বাইরে আনতে চায় । বাইরে দেখতে চায় ।

গোরী, তুমিও কি ওদের মতো একটুখানি পজিটিভ নিয়ে শুরু করতে পার না ? এমন কিছু যা অপরের প্রতিবাদ নয়, পালটা নয়, বিরুদ্ধ নয়, বিপরীত নয়। যা অন্যনিরপেক্ষ, আপনাতে আপনি স্থিত । যা নেতি নেতি নয়, ইতি ইতি । এমন কিছু কি নেই তোমার সন্ধানে ? তোমার ধ্যানে ? তুমি তোমার আপন কাজ খুঁজে পেলে তোমার এ অসুখ অমনি সেরে যাবে । গোরী, তুমি অপরাজিতা । কে তোমাকে পরাজিত করবে ? পরাভব আসে বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে । মানুষ হারে তার নিজের দুর্বলতায় । পরের প্রবলতায় নয় । তুমি হারবে না, গোরী, হারতে পার না । তুমি মহাশক্তিস্বরূপিণী । তুমি প্রকৃতি । শান্তিনিকেতনে কত মেয়ে দেখলুম, কিন্তু তোমার মতো কেউ নয় । তোমার কথাই কেবল মনে পড়ছিল। ভাবছিলুম গোরী যদি এখানে পড়ার সুযোগ পেত এদের সবাইকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিত ।

কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে জানিনে । আমার তো মনে হয় দেখা

না হওয়াই ভালো। এখনো আমাদের সম্পর্ক স্থির হলো না। তুমি আমার কে, আমি তোমার কে, এতদিনেও পরিষ্কার হলো না। সন্দেহ নেই যে আমরা নিকট সম্পর্কীয়। সেইসূত্রে আমরা নিকটবর্তী হতে পারি। কিন্তু নিকটে গেলে তো ঠোকাঠুকিও বাধে। একজন যা আশা করে আরেকজন যদি তা দিতে না পারে তা হলে আশাভঙ্গ অনিবার্য। তুমি কাঁদবে, আমি সইতে পারব না। এমনিতেই আমি কান্না সইতে পারিনে। কারো কান্না।

তবে, ভগবান না করুন, তোমার যদি কোনো আকস্মিক বিপদ ঘটে তা হলে আমি দেশে থাকলে তোমার কাছে ছুটে যাব, জেনো। কোন সুবাদে যাব, ভেবে দেখব না, ভেবে দেখবার সময় পাব না। তুমি আমার কে, আমি তোমার কে, এ গণনা তখন নয়। তখন আমি নাইট। নারী বিপন্ন। আমি তার পাশে। যেমন রোগী মূর্ছিত। ডাক্তার তার পাশে।

আর কলেজে হাজিরা দেবার বালাই ছিল না। টেস্ট চুকে গেছে। শীতের নরম রৌদ্রে পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর দপ্তর পেতে বসে রত্ন। সেইখানে তার কাছে পড়া বুঝে নিতে আসে তার সতীর্থরা। তারা কেউ তার প্রতিযোগী নয়। হলে তো সে বর্তে যায়। তা হলে আরো জোরসে পড়ে। আরো এগিয়ে যায়। তার ঢিলেঢালা ভাবের জন্যে দায়ী তাদের ঢিলেঢালা ভাব।

ওদিকে মৌনীবাবা ঘরে খিল দিয়ে কঠোর তপস্যায় রত। প্রভাতকে বিরক্ত করে এমন সাহস একজনেরও ছিল না। রত্নরও না। দুই বন্ধুর মাঝখানে বহু যোজন ব্যবধান। কত কাল যে ভাববিনিময় হয়নি। আর কবে হবে! পরীক্ষার পর কে কোথায় চলে যাবে। রত্নর দুঃখ হয় ভাবতে যে পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসছে বিদায়ের দিন ততই ঘনিয়ে আসছে। মন কেমন করা এখন থেকেই অনুভব করা যায়।

গৌরীর চিঠি এলো চার দিন যেতে না যেতে। সে লিখেছিল—

আমার কী যে বিপদ তোমাকে তা জানাতে পারব না। প্রকাশ করা অসম্ভব। কেন তা হলে তোমাকে দেখা করতে বলে তোমার পরীক্ষার ক্ষতি করি? দেখা হলে সুখী হব, স্বর্গ হাতে পাব। আমার মনের জোর বেড়ে যাবে। কিন্তু বলতে পারব না তোমাকে কোন্‌খানে কাঁটা খচখচ করছে। তুমি যে অনুমান করে নেবে সে বুদ্ধি তোমার নেই। ক'জন বেটা ছেলের আছে! এসব মেয়েলি ব্যাপার। মেয়েদের খুলে বলতে হয় না। তারা আপনি বোঝে।

একটু সামলে নিয়েছি। দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আমার স্বাধীনতার কী সম্পর্ক! অথচ তিন বছর কাল এই রাস্তায় ভেবেছি। এখন আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনে। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলে আর কিছুর সঙ্গে যোগ স্থাপন করা দরকার বোধ করি। নইলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। বিচ্ছিন্ন বলে দুর্বল।

সেই আর কিছুর নাম প্রেম । প্রেম আমার পক্ষে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো প্রয়োজনীয় । এ না হলে আমি বাঁচব না । বাঁচলে তবে তো স্বাধীন হব ? প্রিয়তম, আমাকে ভালোবাসতে দাও । ভালোবাসা পাই বা না পাই ভালোবাসছি, এটুকু হলেও আমি বাঁচব । এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি এটুকুও আমার জীয়নকাঠি । এর থেকে বঞ্চিত হলে আমার মরণ ।

এর পর থেকে এক দিন অন্তর একদিন গোরীর চিঠি আসতে থাকল । রত্নর উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করে না । তার কোনো দাবীদাওয়া নেই । রত্নকে সে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছে মুক্তির উপায়চিন্তা থেকে। রত্নরও ক্রমে প্রত্যয় হলো যে গোরী তাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করতে চায় না । এ রকম একটা সংশয় তার মনের কোণে ছিল । আর ছিল আত্মাভিমান । সে কেন অপর একজনের স্বাধীনতার বাহন হবে ? সে স্বাধীন সত্তা । ধীরে ধীরে তার সংশয় দূর হলো । আত্মাভিমান গেল। তখন সে গোরীর প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করল । রস আস্বাদন করল । গোরীর প্রেম রাধার প্রেমের মতো শুদ্ধ প্রেম । নিকষিত হেম ।

সেও রোজ কয়েক লাইন লিখে রাখে । ডায়েরির মতো । দু'এক দিন অন্তর খামে ভরে ডাকে দেয় । তার জীবনদর্শন এই সময় একটা নতুন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল । এত দিন সে এক চোখে সুন্দর এক চোখে অসুন্দর দেখে এসেছে। এক চোখে ভালো এক চোখে মন্দ । এক চোখে সত্য এক চোখে অসত্য । এই যে দ্বৈত দৃষ্টি এর বদলে আসছিল অদ্বৈত দৃষ্টি । যাই দেখে তাই সত্য, তাই শিব, তাই সুন্দর । সমস্তটাই সত্য শিব সুন্দর । তার নবলব্ধ অদ্বৈত বা অখণ্ড দৃষ্টির কথা সে লিপিবদ্ধ করে গোরীকে পাঠিয়ে দেয় ।

গোরীর চিঠিতে রসের কথাই বেশী থাকে । সে তার হৃদয় উজাড় করে প্রণয় বর্ষণ করে । সাড়া না দিলেও ক্ষান্ত হয় না । রত্নর কাছে এ অভিজ্ঞতা অপ্রত্যাশিত অপূর্ব । সে মনে মনে অভিভূত হয় । কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিদান দেয় না । দিতে পারে না । মালাদির প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন আছে । কিন্তু সেই প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্ন দিন দিন জড়িয়ে যাচ্ছিল যে গোরী কি কেবল দিয়েই যেতে থাকবে, পাবে না এক ফোঁটা ? পেলে দোষ কী ? ক্ষতি কার ? কে তার হাতে ধরে বলছে, গোরীকে দিয়ো না, দিয়ো না ! গোরীকে দিলে আমি যে পাইনে ! আমার ভাগে কম পড়ে !

বেলগাঁও থেকে ফিরে জ্যোতিদা গোরীর স্বাধীনতার ভার নিয়েছিল । তার সমাধান রীতিমতো বৈপ্লবিক । সে বলে গোরী যদি সত্যিকারের স্বাধীনতা চায় তবে তাকে শ্রেণীচ্যুত হতে হবে । শ্রমিক শ্রেণীর একজন হতে হবে । শ্রমিক মেয়েরা খেটে খায়, স্বামীর উপর নির্ভর করে না । স্বামীস্ত্রীতে যত দিন বনিবনা তত দিন একসঙ্গে থাকা । বনিবনার অভাব হলে স্ত্রী স্বামীর ভাত খায় না । ভাত না খেলে বাঁধন আপনি খুলে যায় । তার পর নতুন লোকের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক পাতায় । এইটেই যথার্থ সুনীতি । বসে বসে স্বামীর অন্ন ধ্বংস করা ও স্বামীর অনাচার সহ্য করা সুনীতি নয় । তথাকথিত

উচ্চ শ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্যের মান যতই উন্নত হোক না কেন, প্রকৃত নীতিবোধ তাদের নেই। মূলনীতির বেলা আপোস করতে করতে তাদের চরিত্রবল ক্ষয়ে গেছে।

অলক্ষিতে কখন এক সময় জ্যোতিদার প্রতি রত্নু ভক্তিমান হয়েছিল। যদিও কোনো দিন তাঁকে দেখেনি, তাঁর এই পন্থা সে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল। গৌরী কিন্তু নারাজ। সে অনেক রকম ত্যাগ করেছে ও করবে। ত্যাগে তার কুণ্ঠা নেই। কিন্তু শ্রমে তার অরুচি। হাতে কড়া পড়বে, পায়ের পাতা ফাটবে, গায়ের চামড়ায় খড়ি উড়বে। রং কালো হয়ে যাবে। কেই বা তখন তাকে ভালোবাসবে! যে স্বাধীনতার শেষে ভালোবাসা নেই সে স্বাধীনতা তার কোন কাজে লাগবে! সে তার প্রিয় পুরুষের ঘরণী হতেই চেয়েছিল, স্বাধীনা হতে চায়নি। ঘরণীই হবে, যদি তার প্রিয়তম পুরুষকে পায়। তা বলে সংসারের খাটুনি তাকে দিয়ে হবে না। ঝি রাখতে হবে, চাকর রাখতে হবে। রাঁধুনি রাখতে হবে। নইলে সে দু'দিনেই কালো কুৎসিত বুড়ী হয়ে যাবে। আর শ্রেণীচ্যুত হয়ে ছোটলোকদের একজন হওয়া! কিছুতেই নয়। মরে গেলেও নয়।

জ্যোতিদা প্রথম-প্রথম শ্রদ্ধা করত না রত্নুকে। বলত, 'ইনটেলেকচুয়াল তো বড় কম দেখলুম না। ইনিও তাঁদের একজন। পোশাক ছাড়লেই নিজ রূপ বেরিয়ে পড়ে। হাড়ে-হাড়ে পারিবারিক স্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ।' পরে তার মন একটু ভিজল। তখন বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে নিঃস্বার্থ। শ্রেণীগতভাবে স্বার্থবান।' ইদানীং তার মন আরো নরম হয়েছে। বলে, 'রত্নুকে আমি ইনটেলেকচুয়ালের কোটায় ফেলে ভুল করেছিলুম। কোনো লেবেল ওর গায়ে আঁটা যায় না। ও যেন পদ্মপাতার জল। শ্রেণীর পদ্মপাতায় কেউ ওকে ধরে রাখতে পারবে না।' রত্নু তার সমাধান সমর্থন করেছে শুনে জ্যোতিদা পরম সুখী।

রত্নুর কথামতো কানন আবার বেগমপুর যায়। এবার জ্যোতিদার সঙ্গে তার দেখা হয়। জ্যোতিদা বেলগাঁও থেকে ফিরেছিল। ওর মনটাও মেঘলা। তবে মুখে হাসি মশকরা লেগে আছে। কানন জ্যোতিদার নিজের হাতে তৈরি কুটিরে রাত্রিবাস করে, বেলগাঁও কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত শোনে। গৌরীর মুক্তির উপায় পর্যালোচনা করে। কেউ কারো সঙ্গে একমত হতে পারে না। কিন্তু দু'জনায় খুব ভাব হয়ে যায়। কাননের কাছে জ্যোতিদা রত্নুর খোঁজখবর নিয়েছিল। কানন বলেছিল, 'রতন আমার বাল্যবন্ধু। অসহযোগের আগে থেকেই ওদের বাড়ীতে বিলিতী কাপড় বন্ধ। এমন কি দিশী মিলের কাপড়ও। ওরা তাঁতের কাপড় পরত। মহাত্মাজীর শিক্ষায় খদ্দর ধরল। ওর বাবা সরকারী চাকরি করলে কী হয়, গোঁড়া স্বদেশী। চরকাও কিছু দিন চালিয়েছিলেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। রতনও এক কালে সুতো কাটত। আজকাল কাটে না।'

জ্যোতিদা লোকটি সুপুরুষ। চওড়া বুক, ক্ষীণমধ্য, বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কোথাও মাংসের আধিক্য নেই। চর্বি আছে কি না সন্দেহ। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাতাসে শুকিয়ে শীতে ফেটে তার দেহ যেন ঋতু-জারিত সেগুন কাঠ। কম খায়, কিন্তু যা খায় তা খাদ্যবিজ্ঞানসিদ্ধ, অতএব অসিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ। কটি বস্ত্র পরিহিত কট্টর স্বদেশী, কিন্তু চীনা বাদাম আর বিলিতী বেগুনের যম। সোয়া বীনের চাষ করছে, লেটাস

লাগিয়েছে, মুরগীও পুষছে। ইংরেজী বই কলকাতা থেকে আনিয়ে পড়ে । আধুনিক দর্শন ও সাহিত্য তার প্রিয় পাঠ্য । রাজনীতি প্রসঙ্গে কথা বলতে চায় না । তবে গান্ধীনীতি বুঝিয়ে দেয় ।

কানন রত্নকে চিঠি লিখে বলেছিল রত্ন যখন কলকাতা যাবে তখন কাননকে জানালে সেও যাবে, জ্যোতিদাকেও নিয়ে যাবে । তিন জনে মিলে মাথা খাটাবে । পারুলবোন থাকলে আরো ভালো হতো, চার জনে মিলে মাথা ঘামাত । কিন্তু সেটা কলকাতা বা বেগমপুর কোনো খানেই সম্ভব নয় । সর্বত্র পাহারা । দেয়ালেরও কান আছে ।

ললিতকে গোরী ডেকে পাঠিয়েছিল । সে নতুন জামাই হয়ে নিজেকে খেলো করতে রাজী নয় । একবার শুধু এক বেলার জন্যে এসেছিল । বলে গেল, 'আমাকে বিয়ে করতে হুকুম করা হয়েছিল, আমি বিয়ে করেছি । ব্যস্ । ঐখানেই ফুলস্টপ । ভালোবাসতে হবে এমন তো কোনো কথা ছিল না । তবে বংশরক্ষা বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু সাবুর চেয়ে আমার চেয়ে বয়সে যারা দেড় গুণ বড় তারা আগে দৃষ্টান্ত দেখাক ।' ললিত এখন য্যায়সা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে যে গোরীর মুক্তির প্রয়োজন স্বীকার করে না । তার মনে কেমন একটা খটকা বেধেছে । গোরী তো যশোবাবুকে একটুও ভালোবাসে না, ছাড়তে পারলেই বাঁচে । কেন তবে যশোবাবুর বোনের জন্যে এত দরদ । এর পিছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। গোরী গোপন করছে ।

বিদ্যাপতির সঙ্গে রত্নর মতান্তর হয়ে যায় । বিদ্যাপতি বলে, 'নারীত্বের পরাকষ্ঠা মাতৃত্ব । যে নারী মা হলো না সে পরিপূর্ণ নারী হলো না । তার সৌন্দর্য পূর্ণিমার সৌন্দর্য নয় । একালের মেয়েরা কি দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে ছেলেদের মন পাবে ?'

রত্ন বলে, 'সেকালের লক্ষ্মী সরস্বতী মা হয়েছিলেন বলে শোনা যায় না । তাঁরা কি তবে পরিপূর্ণা ছিলেন না ? আর রাধা ? রাধার সুষমা কি কোনো অংশে অপূর্ণ ছিল ? ভাই বিদ্যাপতি, কোনো মেয়ে যদি অকালে বিধবা হয় সে কি কারো চেয়ে কম সম্পূর্ণ ?'

তার পর একটু ইতস্তত করে যোগ করে, 'আর মীরার মতো যদি কেউ অসুখী হয়, যোগিনী হয়, ঘরসংসার ছেড়ে দেশে দেশে যায় তা বলে কি সে কারো চেয়ে কম সুন্দর ?'

বিদ্যাপতির মন মানে না । তার বক্তব্য এই যে মাতৃত্বের অনুভূতি না হলে চরম অনুভূতি বাকী রয়ে গেল। সেই সঙ্গে পরম সৌন্দর্য । তার কি কোনো প্রতিপূরণ আছে ?

রত্ন জবাব দেয়, 'তা হলে বলতে হয় পিতৃত্বের অনুভূতিও সমান চরম । পিতা হলেই পরম সৌন্দর্য । আমিও মানছি যে রসের সাধনায় ওটিও একটি ধাপ, অকারণে উপেক্ষণীয় নয় । কিন্তু সন্তান কি চাইলেই হয় ? হলো না বলে কি আমরা অপরিপূর্ণ থাকব ? কখনো নয় ।'

পনেরো

অবশেষে এলো সেই মাঘী পূর্ণিমার রাত, যে রাতে রত্ন পেয়েছিল শ্রীমতীর প্রথম পরিচয় প্রভাতের মুখে। এক বছর আগে।

সেই পূর্ণিমা, সেই পূর্ণতা, সেই সৌন্দর্য, সেই বসন্তের পূর্বাভাষ। উন্মনা হয়ে ঘুরে বেড়ায় রত্ন, যেদিকে দু'চোখ যায়। শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তরে, মাঠের বুকের উপর দিয়ে, পায়ে চলার পথ ধরে। আম গাছে বোল্ ধরেছে, শিমুল গাছে আলতা রঙের কুঁড়ি। কোকিলের কুহু এখনো খোলেনি। হাজার পাখীর কলরব।

দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় রত্ন। ক'টা বাজল হোঁশ নেই। কোন্ যুগ, কোন্ শতাব্দী খেয়াল নেই। রূপকথার জগতে এসে পড়েছে। সে জগৎ এ জগৎ নয়। পদে পদে রোমাঞ্চ লাগে। এই পথ দিয়ে ওরাও গেছে। ওইসব রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্রের দল। দলের পর দল। দল পরম্পরা। দল থেকে ছিটকে পড়েছে শুধু একজন। সে আজ একা। তাই তার গা ছমছম করে।

একা ? না, আরো একজন আছে। অলক্ষ্যে। সে তাকে একখানি অপরূপ চিঠি লিখেছে। চিঠির প্রত্যেকটি কথা তার মনে গাঁথা। লিখেছে—

> কান্ত, আমার তো প্রত্যয় হয় না যে তোমাকে আমি কোনো দিন চোখে দেখতে পাব। তুমি আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেলে এ জন্মের মতো। এ যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা কেমন করে তোমাকে বোঝাব ! তুমি আছ, আমি আছি। কীই বা এমন দূরত্ব ! ইচ্ছা থাকলে যে কোনো দিন দেখা হতে পারত। তবু হয় না। হবেও না। যদি না আমি সব দড়াদড়ি কাটিয়ে তোমার কাছে ছুটে যাই একদিন না বলে কয়ে খবর না দিয়ে।
>
> তুমি একদিন অবাক হয়ে চেয়ে দেখবে আমি । ভাববে কে এ ! চিনিনে তো একে। ছেলেদের হস্টেলে মেয়ে এলো কোন ফাঁক দিয়ে ! তোমার বিশ্বাস হবে না যে আমি গোরী খাঁচার পাখী বনের পাখীকে দেখতে এসেছি। খাঁচায় ফেরার পথ খোলা রাখিনি। ফিরলে কেউ আমাকে নেবে না। ওদের ছেলের আবার বিয়ে দেবে। যেখানে যত আত্মীয় আছে সকলের মাথা হেঁট হবে, সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তুমিই আমার একমাত্র গতি। আমাকে ঘরে নিতে হবে তোমাকেই। তোমার সেই হস্টেলে। তা কী করে হবে ? ওরা হতে দেবে কেন ? তুমি ফাঁপরে পড়বে। কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আমি যে অসহায় নারী। শরণাগতা। তুমি যে নাইট। শরণদাতা।
>
> আমার হাত ধরে তুমি বেরিয়ে পড়বে হস্টেল ছেড়ে কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে সংসার ছেড়ে সমাজ ছেড়ে। বেরিয়ে পড়বে, পিছন ফিরে তাকাবে না। হাত ধরে চলবে, হাত ছেড়ে দেবে না। সব ছাড়বে, হাত ছাড়বে না। আমার হাত তোমার হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। মাঝখানে পাহাড় এলেও না, পাথার এলেও না। মানুষ এলে তো নয়ই। মরণ হলেও না। তুমি আমার হাত ছেড়ে দেবে

না, আমি তোমার হাত ছেড়ে দেব না। আমাদের দু'জনের হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। যদি মরি তা হলেও না। যদি বাঁচি তা হলেও না। তুমি আমার প্রাণ, আমি তোমার দেহ। প্রাণ বিনা কি দেহ থাকে ? দেহ বিনা কি প্রাণ থাকে ? তোমার সঙ্গে আমার দেহপ্রাণ সম্পর্ক। তুমি থাকবে, আমি থাকব, দেহ থাকবে, প্রাণ থাকবে। কী সম্পর্ক হবে, কী সম্পর্ক হবে, খুঁজে পাচ্ছিলে না। এই নাও। এই সম্পর্কে হবে। তোমাতে আমাতে দেহপ্রাণ সম্পর্ক। এও একপ্রকার বিবাহ। বন্ধন, কিন্তু কদর্য নয়। রাজী ?

ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে রত্ন যখন হস্‌টেলের পথ ধরল তখন বাইরে ডাকছিল 'চোখ গেল।' তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভিতরে ডাকছিল 'শান্তি গেল।' বার বার 'চোখ গেল,' 'শান্তি গেল।' 'চোখ গেল,' 'শান্তি গেল।' পাখীর ডাকেরও বিরাম নেই, অন্তরের ধ্বনিরও বিরতি নেই।

আর একটু দেরি হলেই হস্‌টেলের লৌহকপাট বন্ধ হয়ে যেত। ঘরের তালা খুলে আলো জ্বালিয়ে রত্ন লক্ষ্য করল মেজের উপর এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল—'তোমার ঘরে তালা দেখে তোমার খাবার আমার ঘরে দিয়ে গেছে। খেতে এসো। প্রভাত।'

খেতে ইচ্ছা ছিল না, তবু প্রভাত তাকে প্রত্যাশা করছে বলে রত্ন চলল প্রভাতের ঘরে কাপড়চোপড় না ছেড়েই, হাতমুখ না ধুয়েই। বলল, 'ভাই প্রভাত, আজ আমার মন ভরে রয়েছে। পেট না ভরলেও চলে। আমি খাব না।'

সে চলে আসছিল, প্রভাত মৌনভঙ্গ করে তাকে বসতে বলল। সারা রাত না খেয়ে থাকবে ? তা কি কখনো হয় ? একটু কিছু মুখে দিক। অনেক দিন বাদে রত্ন প্রভাতের কণ্ঠস্বর শুনল। অগত্যা বসতে হলো। কিন্তু মাঘের শীতে আধ ঘণ্টা বাইরে পড়ে থেকে খাবার জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে। চাপাটি যেন চামড়া। সরিয়ে রেখে রত্ন বলল, 'প্রভাত. ভাই, এক পেয়ালা কোকো কি কফি খাওয়াতে পার ?'

প্রভাতকে রাত জাগতে হয় পরীক্ষার জন্যে পড়তে। কফি তার রাত জাগানিয়া। হাতের কাছে একটা থার্মোফ্লাস্কে ভরা থাকে। তার থেকে পেয়ালায় ঢেলে রত্নকে দিল, নিজে নিল। খান দুই বিস্কুট সহযোগে।

কফিতে চুমুক দিয়ে প্রভাত বলল, 'রতন, তোমার চেহারা থেকে তো মালুম হয় না যে মন ভরে রয়েছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ঝোড়ো কাকের মতো উস্কোখুস্কো। ঢলঢলে খদ্দরের পায়জামা খোঁচ লেগে ছেঁড়া খোঁড়া। জরির নাগরা ধুলোকাদামাখা। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ? গঙ্গার ধারে ?'

এর উত্তরে রত্ন বলল, 'বাতিটা চোখে লাগছে। বল তো নিবিয়ে দিই। ঘরে চাঁদের আলো আসুক। ধন্যবাদ। ভাই প্রভাত, এটা কোন্ রাত তোমার মনে আছে ?'

'ত্রয়োদশী বোধ হয়।'

'দূর। পূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমা। এক বছর আগে এই রাতে যার পরিচয় দিয়েছিলে

সে একদিন আমার জীবনে এলো । অভাবনীয় । তার পর থেকে অভাবনীয়ের যেন অন্ত নেই । পদে পদে চমক । ক্ষণে ক্ষণে চমক । ভাই, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, আমা-হেন মানুষকেও একজন ভালোবেসেছে । আমি তো বিশ্বাস করতেই চাইনি, আমল দিইনি, উড়িয়ে দিয়েছি । কাননকে সামনে ঠেলে দিয়েছি যাতে ভালোবাসার পাত্রান্তর হয় । ধরা দিইনি, এড়িয়ে গেছি, পালিয়ে বেড়িয়েছি । নিজের প্রতিভার উপর আমার আস্থা ছিল, কিন্তু পৌরুষের উপর ভরসা ছিল না । লোকে বলত আমি নাকি মেয়েলি । এখন মনে হচ্ছে আমি পুরুষ । নইলে শ্রীমতীর মতো মেয়ে আমার প্রেমে পড়ত না । তার প্রেম আমার পৌরুষের প্রথম অভিজ্ঞান ।'

প্রভাত স্তব্ধ হয়ে শুনছিল । সুধাল, 'তুমিও কি ওর প্রেমে পড়েছ ?'

রত্ন পদ্মরাগের মতো রক্তিম হলো, কিন্তু তার মুখে ছায়া পড়েছিল । তাই দেখা গেল না । সামলে নিয়ে বলল, 'আজ এত দিন পরে মনে হচ্ছে আমিও প্রেমে পড়েছি ওর ।'

এর পরে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল তার নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিবরণ ।

'তুমি তো জান আমি মালাদির উপাসনা করতুম । তিনিই আমার ভগবান । ভগবান আমার কাছে তাঁরই রূপ ধরে এসেছিলেন । মালাদির প্রতি অনুগত থেকে শ্রীমতীকে কী করে ভালোবাসতে পারি ! সেইজন্যে আমি প্রাণপণে মালাজপ করেছি। শ্রীমতীর ফোটোগুলো একবারের বেশী দেখিনি । প্রতি রাত্রে মালাদির ধ্যান করেছি। কাল রাত্রেও । আজ মনে হচ্ছে এত দিন যা আমি করেছি তা মালাদির পূজা নয়, আমার মানসী নারীর প্রতিমা গড়ে সেই মন-গড়া প্রতিমার পূজা । প্রতিমাভঙ্গকারী আমি প্রতিমাপূজক হয়েছি । ভগবান তাই আমার কাছে গৌরী রূপ ধরে এসেছেন । প্রতিমা ভেঙে গেছে ।'

প্রভাত বলল, 'গৌরী বুঝি ওর ডাক নাম ?'

'হাঁ । বেহারে ওর জন্ম । মাতুলালয়ে ।'

প্রভাত আর একটু কফি ঢেলে রত্নকে দিল । নিজে নিল । তার পর ?

'তার পর তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে প্যাশনের । বলেছিলে, শ্রীমতীর চোখে কী প্যাশন ! আমি তো ভয়ে ওর দিকে তাকাতেই চাইনি । ফোটোকেও ভয় । আমার যা শরীর আর আমার যে স্বভাব আমার পক্ষে ঠাণ্ডা ধাতের মেয়েই ভালো । গরম ধাতের মেয়েকে আমি সুখী করতে পারব না । ও আমাকে ছাড়বে কিংবা মারবে । দুই ভয়াবহ । কিন্তু শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিতে হলো যে আমি পুরুষ, আমি সম্মুখীন হব । জ্বলতে হয় জ্বলব । ভুগতে হয় ভুগব । আমার ভয় ভেঙে গেছে । যেমন ভেঙে গেছে প্রতিমা ।'

প্রভাত হতভম্ব হয়ে বলল, 'তার পর ?'

'তার পর যে মেয়ে বয়সে বড় তাকে আমি দিদির মতো সমীহ করি, শ্রদ্ধা করি । তার সঙ্গে মোটেই সহজ ও স্বাধীন বোধ করিনে । তার কাছে তটস্থ হয়ে থাকি । তার গায়ে হাত দিতে সাহস পাব না, গায়ে হাত দিলে মনে হবে পবিত্রকে অপবিত্র করলুম ।

পূজা কি তা হলে চিরকাল দূর থেকে হবে ? দূরত্ব থাকলে সাযুজ্য হয় কখনো ? আমার যা ধর্মমত তাতে পূজা বলতে সব কিছুই বোঝায় । তার আদিতে বিরহতাপ, অন্তে পূর্ণমিলন । এর মধ্যে অপবিত্রতা নেই । কিন্তু এমনি আমার সংস্কার যে বয়সে বড় হলে গৌরীকেও আমি মালাদির মতো বরাবর পরিহার করতুম । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে আমার ছ'মাসের ছোট ।'

প্রভাত হঠাৎ রসভঙ্গ করে বলল, 'তা হলেও তুমি বয়সে বড় নও । তোমার বয়স বাড়ছে না । বরং দিন দিন কমছে । তুমি যেমন আনপ্র্যাকটিক্যাল ছিলে তার চেয়েও বেশী হয়েছ । তুমি ধরে নিচ্ছ যে শ্রীমতী তার স্বামীর কাছ থেকে ছাড়পত্র পাবে, তোমার মতো গরিবকে বিয়ে করবে, তোমার সুখদুঃখের সঙ্গিনী হবে । অসম্ভব ! অবাস্তব! অকল্পনীয়! অঘটনীয়! যাও, শুয়ে পড় গে । কাল রাত্রে ভুলে যাবে আজ রাত্রের পাগলামি। আমিও আজ আর দেরি করব না। তুমি আমার মাথা ধরিয়ে দিলে ।'

রত্ন উঠছিল । কী মনে করে প্রভাত তাকে আবার বসতে বলল। আরো কফি দিল । সে বুঝতে পারল প্রভাত কিছু বলতে চায় । কত কাল বলার সুযোগ হয়নি ।

'রতন, আমি কেন মৌন হয়েছি, জান ?'

'জানি বই-কি । পরীক্ষার পড়ায় মন দিতে ।'

'মন দিতে পারছি কোথায় ? জোর করে মন দিলে কি পড়া ভালো হয় ? তবু তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাই ।'

'ভ-য় পাও !' রত্ন অবিশ্বাস করল । 'তোমার মতো ছেলে ভয় পায় ।'

প্রভাত কী যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু চেপে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে বলল, 'তা নয় । তুমি তো জান আমি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছি । এর উপর যদি পরীক্ষায় ব্যর্থ হই তা হলে কি আমি জীবনসংগ্রামেও ব্যর্থ হব না ! রাত্রে আমার ঘুম হয় না, ঘেমে উঠি, ভয় হয় যে আমি হয়তো সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হতে যাচ্ছি। আমার জীবন বৃথা ।'

রত্ন বলল, 'আমার কিন্তু পরীক্ষার ভয় নেই । আর জীবনসংগ্রামের ভাবনা যদি বল, জীবনকে আমি সংগ্রাম বলে ভাবিনে, সুতরাং সে ভাবনাও আমার নেই ।'

'কেন, বল তো ? তুমি এমন কী সচ্ছল ?'

'সচ্ছল ! তুমি কি জান না আমাদের অবস্থা ? কিন্তু আমার জীবনদর্শন হলো এই যে, মানুষ কী খাবে কী পরবে কোথায় থাকবে এসব চিন্তায় সময়ক্ষেপ করবে না । সময়ক্ষেপ মানেই জীবনক্ষেপ । জীবনের অপচয় । তার বদলে ধ্যান করবে পরম সৌন্দর্যের । অনুষ্ঠান করবে পরম কল্যাণের । অন্বেষণ করবে পরম সত্যের । সাধনা করবে পরম প্রেমের । এমনি করে সে অমৃতের পুত্র অমৃত হবে । আমার ভাবনা যদি থাকে তবে তা মৈত্রেয়ীর মতো । যা দিয়ে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব !'

'তার জন্যে,' প্রভাত ব্যঙ্গ করল, 'একটি মঠবাড়ী দরকার । ভক্তরা সব কিছু জোগাবে। তুমি মালা জপবে আর চোখ বুজে খাবে । কিন্তু তুমি তো বলছ, মালাজপ ছেড়ে দিয়েছ । এখন থেকে গৌরীনাম সংকীর্তন । আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে উক্ত

মহিলার ভোগবিলাস অত অল্পে মিটবে না ।'

রত্ন প্রতিবাদ করে বলল, 'গৌরী ভোগবিলাসের ধার ধারে না । ওর মতো ত্যাগী মেয়ে ভূভারতে নেই ।'

'বটে !' প্রভাত বলল শ্লেষের সঙ্গে, 'তুমি যেন কত কাল থেকে ওকে চেন। দেখতে দেখতে চুল পেকে গেল ! না, রতন ?'

রত্ন অভিমানে কথা বলল না, শুধু উঠবে বলে উসখুস করতে লাগল ।

'রাগ কোরো না, লক্ষ্মিটি । আমার বক্তব্য আর কিছু নয়, এই । যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তার সম্বন্ধে অলীক ধারণার উপর ভিত্তি করে কোনো রকম সিদ্ধান্ত নিতে যেয়ো না । আমি যত দূর জানি ওটি একটি শ্বেতহস্তিনী । হাতীপোষার ক্ষমতা তোমার নেই ও হবে না । তবে, হাঁ, তোমার বাস্তববোধ জাগবে ।'

রত্ন প্রতিবাদ করল । তার পর কাতরভাবে বলল, 'আমার শান্তি গেছে ।'

'শুনে দুঃখিত হলুম । আমার শান্তি ফিরে এসেছে। আর তোমার গেছে !' প্রভাত বলল গম্ভীর হয়ে, 'তোমাকে আমি প্রথম থেকেই সতর্ক করে দিয়েছি । কিন্তু তুমি, ভাই, এমন ছেলে যে, যেটি করতে বারণ করব সেই জিনিসটি করবেই করবে । আগুনে হাত দিয়ো না বললে আগুনেই হাত দেবে তুমি । যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি তারই খপ্পরে পড়া চাই । তুমি কিনা স্বভাববিদ্রোহী । শান্তি গেছে। যাবেই তো । কার দোষ !'

রত্ন অম্লানবদনে বলল, 'তুমিই তো ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটালে । দোষ তোমারই । কেন তুমি আমাকে ওর বর্ণনা দিতে গেলে ?'

'তা বলে কি আমি তোমাকে ওর প্রেমে পড়তে বলেছিলুম ?'

'প্রেমে পড়তে কি আমিই চেয়েছিলুম ! একটি বছরকাল প্রতিরোধ করে আজ দেখছি প্রেম অপ্রতিরোধ্য । ভাই প্রভাত, ঐরাবতের মতো আমি ভেসে যাচ্ছি ।'

প্রভাত স্নেহভরে তার বন্ধুর হাতে হাত রাখল । গাঢ়স্বরে বলল, 'আমি লক্ষ করেছি । কী করব, তুমি তো আমার কথা শুনবে না । ভাই রতন, প্রেম অবশ্য বড় জিনিস, কিন্তু পুরুষের জীবনের পুরুষার্থ নয় । প্রেমের জন্যে অনেক কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু সব কিছু দেওয়া উচিত নয় । ওসব মেয়েরা পারে। ওদের তো পাবলিক লাইফ নেই । আমাদের পাবলিক লাইফ আছে । আমরা একদিন বিখ্যাত হব, যশস্বী হব । দেশবান্ধব প্রভাতমোহন মৈত্র, দেশরত্ন রত্নকান্ত মল্লিক । প্রেমের জন্যে আমরা কি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে পারি ! গান্ধী রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ চিত্তরঞ্জন এঁরা কি কেউ পেরেছেন ! তুমিই বল, এ কি পারা যায় !'

রত্ন বলল তেমনি গাঢ়স্বরে, 'ভাই প্রভাত, আমার সে রকম কোনো উচ্চাভিলাষ নেই । ধন মান জনপ্রিয়তা যশ ইত্যাদির জন্যে আমি লেশমাত্র চেষ্টা করব না । যদি আপনা হতে আসে আমি আসতে দেব, যদি আপনা হতে যায় আমি যেতে দেব । কিন্তু যা যা নিয়ে আমি থাকতে চাই, যা যা এলে আমি ধন্য হই, যা যা গেলে আমি নিঃস্ব হই সেসব হলো প্রেম, স্বাধীনতা, সৃষ্টিপ্রেরণা, সত্যনিষ্ঠা, সৌন্দর্যতৃষা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণবোধ। ভাই প্রভাত, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ । তুমি আমাকে আমার গৌরীর

সঙ্গে মেলালে ।'

প্রভাত কী যেন বলতে চাইল আবার । পারল না । দমন করল । রত্ন লক্ষ করল না । সে তার ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়ল, হাত মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল । তার পর গোরীর ফোটোগুলি বাক্স থেকে বার করে টেবিলে সাজিয়ে রেখে গোলাপের পাপড়িগুলি বিছানায় ছড়িয়ে দিল । তার পর গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে অত রাত্রে চিঠি লিখতে বসল । গোরীকে । তার কান্তাকে ।

অনেক কথাই লেখবার ছিল সেই স্মরণীয় তিথিটিতে । কিন্তু প্রেম অনেক কথা বলে না, যদি বলে তবে সে প্রেম নয় । প্রেম শুধু একটুখানি সুর ধরিয়ে দেয় । রত্ন লিখল—

> এক বছর পরে সেই রাতটি আবার এলো যে রাতে তুমি প্রথম এলে আমার চেতনায় । গোরী, সেই দিনটি থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে এসেছি । তোমাকে কি লিখেছি কোনো দিন প্রভাত আমার চোখে তোমার কী মূর্তি এঁকেছিল ? আজ আবিষ্কার করলুম এত দিনে, ভয় বলে যাকে জেনেছি তার আসল নাম ভালোবাসা । ভয় তার ছদ্মনাম । তোমাকে ভয় করেছি সেই ছলে ভালোও বেসেছি । নিজের ভালোবাসা নিজের কাছেই গোপন ছিল । আজকেই আমি হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি সেই চোরকে যে এক বছর ধরে সিঁদ কাটতে কাটতে আমার যথাসর্বস্ব চুরি করেছে । মালাদির প্রতি আনুগত্যও তার মধ্যে পড়ে ।
>
> প্রেম, তোমার মতো প্রিয় আমার কেউ নেই । তুমি আমার স্বকীয়া । আমি তোমার স্বকীয় । যে যার সে তার । কবে আমাদের দেখা হবে, আদৌ হবে কি না, এ নিয়ে আমি ভাবিনে । হলে অভাবিত রূপে হবে । যেমন করে হলো আমাদের চেনা, আমাদের ভাব, আমাদের ভালোবাসা । প্রেম, তোমাকে আমি স্বীকার করে নিলুম । আমার এই স্বীকৃতি আমাকে মুক্তি দিল । সেইসঙ্গে নিবিড় করে বাঁধল। তাই আমার এক চোখে হাসি, এক চোখে জল । আজ আমার সিদ্ধান্তের দিন । তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল । তুমি আমার কান্তা ।
>
> আমি তোমার
>
> কান্ত

চিঠি লেখা শেষ হতে না হতেই বাতি নিবে গেল । হস্‌টেলের নিয়ম । অমনি এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকল । জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটল । রত্ন জানালার ধারে গিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল চন্দ্রাহতের মতো । মনে হলো গোরী চেয়ে আছে তার দিকে । শোবার সময় সে আর মালবিকার ধ্যান করল না । ধ্যান করল শ্রীমতীর ।

প্রভাতের কাছে একটু আগে যা চাপা ছিল এখন আর তা চাপা রইল না । উল্লাস । সব শঙ্কা, সব জ্বালা, সব আফসোস ছাপিয়ে উঠে বাজতে থাকল উল্লাসের রাগিণী । উল্লাসের তালে তালে প্রতি অঙ্গের প্রতি পরমাণুর নাচন শুরু হলো । মাতন লাগল শোণিতে শিরায় স্নায়ুতে । কোথায় ঘুম ! খালি পেটে কফি পড়লে যা হয় । রত্ন একবার

শোয়, একবার পায়চারি করে। হঠাৎ কী মনে করে মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে। বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণতি পাঠায় কে জানে কোন্ দেবতাকে! কস্মৈ দেবায়!

বলে, 'মধুর, তুমি অনেক দিয়েছ। অশেষ দিয়েছ। নাও, নাও, কী নেবে নাও। নারী রূপে। গৌরী রূপে।'

(১৯৫৫)

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

রত্ন ও শ্রীমতী

দ্বিতীয় ভাগ

এক

রত্ন বলে একটি ছেলে কোনো দিন কল্পনাও করেনি যে শ্রীমতী বলে একটি মেয়ে এ জগতে আছে, যে মেয়ে তাকে চোখে না দেখতেই তার প্রেমে পড়বে। এমন অঘটন যেদিন ঘটল রত্ন সেদিন প্রাণভরে উৎফুল্ল হতে পারেনি, তার হৃদয় তখন জোড়া। এর পরে এলো আর একটি দিন, যেদিন সেও প্রেমে পড়ল শ্রীমতীর, ওকে চোখে না দেখেই। সেদিন তার উল্লাস অবিমিশ্র উল্লাস।

সেই দিনটি থেকে রত্ন হলো শ্রীমতীরত্ন। আর শ্রীমতী তো হয়ে রয়েছিল রত্নশ্রীমতী। রত্নগোরী। গোরী আর রত্ন মিলে যুগল। যমজের মতো তাদের দু'জনের যোড় একান্ত অলক্ষ্য ও নিগূঢ়। তাই তাদের একজন গোরীরত্ন। অপর জন রত্নগোরী। রত্নকে রত্ন বলে যারা জানল তারা তার কতটুকুই বা জানল! তেমনি গোরীকে গোরী বলে যারা জানল!

রত্ন যেখানেই যায় গোরী যেন তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। তার হাতে হাত রাখে। মুখোমুখি দাঁড়ায়। গোরী, তুমি! রত্ন, তুমি! কী করে যে চিনলে! ওমা, তোমাকে চিনব না তো কাকে চিনব। আমাকে ভালোবাস? তোমাকেই ভালোবাসি। তুমি! ওগো তুমি! আমি! ওগো আমি!

গোলাপ! গোলাপ! সারা পথ গোলাপ! অভ্র! আবীর! আকাশ থেকে অভ্র! আসমান থেকে আবীর! স্বর্গ থেকে পারিজাত! হে প্রভু, এত করুণা! হে প্রিয়, এত আনন্দ! প্রিয়ে, ধন্য আমি। পূর্ণ আমি।

কাকে যে বলা হলো ও কথা—দেবতাকে না মানুষকে—রত্ন প্রকাশ করতে অক্ষম। তার কাছে দুই এক হয়ে গেছে। দেবতাই এসেছেন নারীদেহ ধরে। নারীই নিয়ে যাবে দেবতার সকাশে। প্রেম দিয়ে উভয়ের পূজা করতে হয়।

এরূপ অনুভূতি যে পূর্বে কখনো হয়নি তা নয়। কিন্তু সে ছিল ভালোবাসা। এ হলো ভালোবাসাবাসি। সে ছিল একা একা খেলা। এ হলো দু'জনায় লীলা। তখন মনে হতো আমি নিঃসঙ্গ। এখন মনে হয় আমরা দূরে দূরে থাকলেও একজোড়া কোকিল।

মালাদিকে কখনো এত কাছে মনে হয়নি। যখন তিনি কাছে তখনো তিনি দূরে। সব সময়েই তিনি সুদূর। গোরী কিন্তু তা নয়। প্রথম থেকেই সে নিকট। এখন সে নিকটতর। কে জানে কবে নিকটতম হবে! কোকিল কোকিলা কত কাল ধরে কুহু কুহু ডাকে। সাড়া দেয়। ডাকতে ডাকতে সাড়া দিতে দিতে কাছাকাছি হয়। এত কাছাকাছি যে নির্বাক।

এর নাম ভালোবাসাবাসি। তরুণতরুণীর ভালোবাসাবাসির মতো সুন্দর কী আছে।

মধুর কী আছে ! দেহধারণ তো এর জন্যেই । দু'জনে দু'জনের মাধুর্য আস্বাদন করবে, মধুর রসের স্বাদ পাবে । দু'জনে দু'জনের সৌন্দর্যে তন্ময় হবে । লীন হবে । একজনের পেয়ালা খালি দেখলে অপর জন সে পেয়ালা ভরে দেবে । রত্ন যদি সুরূপ না হয়ে থাকে গৌরী তাকে রূপবান করবে আপনার রূপ দিয়ে । গৌরী যদি শীতল না হয়ে থাকে রত্ন তাকে স্নিগ্ধ করবে নিজের সুধা দিয়ে ।

স্বর্গসুধা এর কাছে কী ! সে সুধা হয়তো অজর করে, অমর করে, কিন্তু প্রেমের জন্যে দেবতারাও ব্যাকুল । মানুষ তাদের চেয়ে ভাগ্যবান । মানুষের অন্তর যে প্রেমের ভাণ্ডার । প্রেম দিয়ে মানুষ মৃত্যুকে পরিহার করতে পারে না । সে হিসাবে মৃত্যুই অধিকতর শক্তিমান । কিন্তু মৃত্যুর পরেও প্রেম থাকে, প্রেমের ক্রিয়া চলতে থাকে । সেদিক থেকে প্রেমই অধিকতর শক্তিধর। ভালোবাসাবাসির কোথাও কোনো ছেদ নেই । মরণেও না, জীবনেও না । একমাত্র ছেদ প্রেম যদি আপনা থেকে ক্ষীণ হয়, দুর্বল হয়, নিঃশেষিত হয় । যেমন হলো মালাদির বেলা । সে ছিল ভালোবাসা । ভালোবাসাবাসি নয় । এবং তার প্রায় সবটাই ভক্তি ।

নারীর প্রতি রত্নর অহেতুক শ্রদ্ধা ছিল । নারী কখনো দোষ করতে পারে না । তার কখনো স্খলন পতন হতে পারে না । এই শ্রদ্ধা থেকে এলো বিশেষ একটি নারীর প্রতি ভক্তি । মালাদি যে দেবী ! গৌরীও কি দেবী ? না, গৌরী দেবী নয় । গৌরী হচ্ছে দেবতা । দেবতা তার কাছে প্রিয়া রূপে এসেছেন । প্রিয়াই দেবতা । এসেছেন তাকে প্রেম শেখাতে। প্রেমের আস্বাদন দিতে। এই মর্ত্যভূমি হচ্ছে প্রেমভূমি । প্রেমের শিক্ষা পাব বলেই আস্বাদন পাব বলেই এখানে আসা ও থাকা । সেইজন্যেই জন্মমরণের দ্বার দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান : যে ভালোবাসল না, ভালোবাসা পেলো না, অমনি এলো আর গেল তার মতো দীনহীন আর কে ! হলোই বা সে ধনকুবের । হলোই বা রাজচক্রবর্তী । কোনো মতে যার দিন চলে সেও তার চেয়ে ভাগ্যবান হতে পারে । হয়ও । ভগবান তাকে ভালোবাসেন । তাকে ভালোবাসান । তার ভালোবাসা নেন ।

ভালো কেমন করে বাসতে হয় রত্নর তা অজানা ছিল না । কিন্তু ভালোবাসা কেমন করে নিতে হয় তা কি সে জানত ! নারীর প্রেমের কথা হচ্ছে । সে প্রেম তার জীবনে এই প্রথম এলো । এর উত্তরে সে এই প্রথম সাড়া দিল । সাড়া দিলে ও পেলে কোকিল কোকিলার কুহুরব অবিরাম ধ্বনিত হয় । পঞ্চমে ওঠে । সারাক্ষণ প্রলাপ চলে ।

রত্নর প্রেমস্বীকৃতি পেয়ে গৌরী যে চিঠি লিখল তা বিশুদ্ধ প্রলাপ । এমন উত্তেজিত যে একটা বাক্য সারা না হতেই আর একটা শুরু করেছে । যেন এক রাশ কথা ঠেলাঠেলি করছে কোনটা আগে যাবে তার জন্যে । এমন উল্লসিত যে কয়েক লাইন কেবল প্রিয়সম্বোধনই করেছে । ডেকেছে রকমারি নামে । রত্ন, রতন, রতু, রতি, মণি, মাণিক, ধন, সোনা, মধু, মধুর, মিষ্টি, মিঠু, নিঠুর, কপট । এমনি কত কী ! না আছে তার মাথা, না আছে মুণ্ডু । ফেনা বাদ দিলে রস যা থাকে তা এইরূপ :

ওগো আমার প্রাণ, তুমি যদি না থাক আমি কি বাঁচব ! প্রাণ বিনা কেউ কখনো

বাঁচতে পারে !

প্রিয়তম, তুমি কি জাদু জানো ? জাদু দিয়ে আমাকে হরণ করেছ ? আমি কি এখানে রয়েছি ? না আমি ওখানে তোমার কোলে ?

কান্ত, তোমার ওইটুকু লিপির জন্যে আমি যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করেছি । বিশ বছর কেটে গেল ওরই প্রতীক্ষায় । আহা ! কী অমৃত আছে তোমার ওই ক'টি কথায় । আমার দাহ জুড়িয়ে গেল ।

ওগো, দিনরাত আমি এই প্রশ্ন করেছি আমার অদৃষ্টকে । কে আমাকে একটু ভালোবাসবে ! এক ফোঁটা ভালোবাসা দেবে । আমি যে দগ্ধ সাহারা মরু । এক বিন্দু বর্ষণের জন্যে কাঙাল । কেউ কেন আমাকে ভালোবাসে না ? শুধু অভিনয় করে । অথবা দেয় ভালোবাসার নামে কী জানি কী বিষ ! ওগো, আমি যে জ্বলে যাচ্ছিলুম গো । এত দিনে আমি পেলুম আমার তৃষ্ণার জল । তুমি আমাকে বাঁচালে গো বাঁচালে ।

মোহন, বার বার আমার চোখে জলের মোহ জাগায় অসার মরীচিকা । মোহভঙ্গ হয় । সে যে কী কষ্ট । প্রেম এত দিন আমাকে প্রতারণা করেছে । এবারেও কি তাই হবে ? না, না, তুমি তেমন নও ! তোমার প্রেম আস্বাদন করে জেনেছি এ সুধা খাঁটি । এই তো আমি চেয়েছি গো মাধবের কাছে । তুমি যে কে তা আমি জানতুম না । কবে আসবে তাও কি জানতুম ! তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি, মানৎ করেছি । বলেছি, হে ঠাকুর, ও যেন আসে, এ জীবনে আসে, জীবন থাকতে আসে । যে আমার, আমি যার, তাকে যেন এই জন্মে পাই । তার জন্যে আবার যেন জন্মাতে না হয় । প্রিয়তম, আমার জন্ম সার্থক হয়েছে ।

কিন্তু, প্রেমদাতা, তোমাকে দিতে পারি এমন কী আছে আমার ! আমার কি হৃদয় আছে ! হৃদয় যে পুড়তে পুড়তে পোড়াকাঠ হয়ে গেছে । ভিতরে শুধু ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে । ওগো রতনমণি, সোনামণি, কেন তুমি ভালোবাসবে এই দুঃখিনীকে ! পারবে কি এর বুকের আগুনের আঁচ সইতে !

মণি, এত কাল আমার জীবনে একটিমাত্র প্রধান অনুভূতি ছিল জ্বলন । আমি জানতুম আমি জ্বলছি । অবিরাম জ্বলছি । জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি । জীবনে আমার দ্বিতীয় প্রধান অনুভূতি এলো এই প্রথম । জুড়ন । তুমি যেন শীতল সরোবর আর আমি যেন জ্বররোগী । তোমার কোলে ঝাঁপ দিয়ে আমার অঙ্গ জুড়ালো । কিন্তু তাপ যে আমার ভিতরে । তার থেকে মুক্ত হই কী করে ! প্রেম, তুমি কি আমার মুক্তি রূপে আসবে না ?

পড়তে পড়তে রত্নর বুক ব্যথা করে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে । মনটা উদাস হয়ে যায় । সত্যি এ মেয়েটি দুঃখিনী । যদিও এর অনেক খ্যাতি, অনেক রূপ। অনেক বান্ধব ও ভক্ত । অনেক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ।

গৌরীর জীবনে প্রেম এই প্রথম নয় । প্রেমিক আরো এসেছে । রত্নর কাছে সে তা গোপন করেনি । কিন্তু তাদের কাছে সে যা পেয়েছে তা উচ্চস্তরের ভালোবাসা নয়।

তার প্রাণ জুড়ায়নি। সেইজন্য রত্নর দিকে সে চেয়ে আছে তাতল সৈকতের মতো। বারিবিন্দুর আশায়। সাধারণ ভালোবাসায় সে তৃপ্তি পাবে না। সে চায় অসাধারণ প্রেম। রত্নকে উঠতে হবে অনেক উঁচুতে। ও কি পারবে অত দূর উঠতে!

এক এক সময় ওর মনে হয় বেশ তো ছিল ওরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হয়ে। যমজ ভাইবোন। যমজের চেয়ে যুগল ভালো কিসে! ভাইবোনের ভালোবাসার কি তুলনা আছে! আমার রত্ন ভাই! আমার শ্রীমতী বোন! আমার গৌরী বোন! এ কি কম মিষ্টি! চমৎকার! চমৎকার সম্বন্ধ! আমরা দুটি যমজ। আমরা একসঙ্গে পৃথিবীতে এসেছি। একসঙ্গে বড় হয়েছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার হয়নি। নইলে একসঙ্গেই থাকা যেত। তুমি যদি বাঁধন কাটাতে পার একসঙ্গে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু ভাইবোনের মতো।

গৌরী সে সম্বন্ধ রদবদল করেছে। রত্ন রদবদল মেনে নিয়েছে। পিছন ফিরে তাকানো বৃথা। আর সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। এখন তারা যুগল। কান্ত আর কান্তা। তারাই জগতের প্রেমকেন্দ্র। সেই কেন্দ্র একও হতে পারে, একাধিকও হতে পারে। যেখানে যত যুগল আছে সকলেই রত্ন ও শ্রীমতী। কান্তা ও কান্ত। এই বিশ্বরাসলীলামঞ্চে একটিমাত্র যুগল আছে, আর আছে সংখ্যাতীত দর্পণ। এরাই বিম্বিত হয় সংখ্যাতীত রূপে, সংখ্যাতীত নামে। এরা নৃত্যপর হলে ওরাও নৃত্যপর। এদের ভালোবাসাবাসি ওদেরও ভালোবাসাবাসি।

কিন্তু এতেই কি দুঃখিনী সুখী হবে! যেখানে আছে সেখানে থেকেও! যার কাছে আসতে চায় তার কাছে আসতে না পেলেও। রাখীবন্ধ বহিনের মতো দূরত্ব রক্ষা করেও। না বোধ হয়। কান্তবিরহ কারই বা কাম্য হতে পারে। মিলনবাসনা দুর্বার হবেই। প্রেম সেই ভাবেই পূর্ণতা খোঁজে।

রত্নর মনে হয় তার হৃদয়ে সুপ্ত ছিল ভালোবাসবার ও ভালোবাসাবার অফুরন্ত শক্তি। সেই কুলকুণ্ডলিনীকে গৌরী এসে জাগাল। সে যদি সারা জীবন গৌরীকে ভালোবাসে ও গৌরীর ভালোবাসা পায় তা হলেও তার তৃপ্তি হবে না কোনো দিন। কান্তকান্তার প্রেমে তৃপ্তি কোথায়! তৃপ্তি হলে তো পরিসমাপ্তি। পরিসমাপ্তির পরে কী? বৈষ্ণব কবিরা বলতে পারতেন বিচ্ছেদ। বলতে চাননি। যুগল যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে তবে ভাবসম্মিলনেই প্রেমের পরম পরিণতি। সেটা পরিসমাপ্তি নয়। তাই তার পরতর নেই। রত্ন আর গৌরী চিরদিন ভাবসম্মিলনে সম্মিলিত থাকবে। পরস্পরের মধুপানে বিভোর।

ভাবসম্মিলন। রূপসম্মিলন নয়। কেউ কারো কাছে থাকবে না। কাছে আসবে না। চোখের দেখা যদি দেয় তবে ক্ষণিকের জন্যে। অমনি করে একটা রহস্যবোধ জাগিয়ে রাখতে হবে। নইলে অতিপরিচয় থেকে অবজ্ঞা জন্মাবে। প্রেম পারবে না অবজ্ঞা অতিক্রম করতে। না, রূপসম্মিলন নয়। ভাবসম্মিলন। যদিও সে ভাব কান্তকান্তা ভাব। সবই তার মধ্যে পড়ে। দেহ মন হৃদয় আত্মা। কোনোখানেই তার ছেদ নেই। নয়তো পূর্ণতা কিসের! সবই তার অন্তর্গত। যদিও কার্যত নয়।

সার কথা হলো মাধুর্য আস্বাদন। তার কমতি কোথায়। রত্ন কোনো একজনকে ধন্যতা জানাতে চায়। কাকে? গৌরীকে? গৌরী জানাবে কাকে? রত্ন তাই ধন্যতা জানায় জীবনদেবতাকে। তিনি পরম দাতা। তাঁর দানের সীমা পরিসীমা নেই। কোন দানটির চেয়ে কোনটি বা কম! সব ক'টিই মাথায় তুলে রাখবার মতো। সব স্নেহ, সব বন্ধুতা, সব দয়া, সব মায়া, সব মমতা। কিন্তু তাঁর সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান এই প্রেম। তরুণতরুণীর এই মাধুর্য আস্বাদন। এরই জন্যে নরজন্ম ও নারীজন্ম। নরনারীর অন্তরে যে প্রেমের গঙ্গোত্রী। তনুতেও রসের যমুনোত্রী। কিন্তু সে অনেক দূরের কথা।

তার পর রত্নর জিজ্ঞাসা হলো এই। জীবনদেবতার কাছে।

গৌরী যে জগতে আছে, প্রেম যে জগতে আছে, সে জগতে মন্দ কেমন করে থাকবে! ভালোমন্দের দ্বৈত, সুন্দর অসুন্দরের দ্বৈত চিরকাল রত্নকে কাঁদিয়েছে রাগিয়েছে বিদ্রোহী করেছে সংঘাতের মুখে ঠেলেছে। কিন্তু ইদানীং তার মনে হচ্ছে জগৎ জুড়ে শুধু ভালোই আছে। শুধু সুন্দরই। নয়তো গৌরীর থাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে কেন? আলো থাকলে কি অন্ধকার থাকে? পূর্ণিমা থাকলে কি অমাবস্যা?

তবে কি মন্দ বলে কিছু নেই? অসুন্দর বলে কিছু নেই? আছে। আছে। প্রত্যহ চোখে খোঁচা দিচ্ছে। কোনো মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না তাদের অস্তিত্ব। তাদের কৃত অনর্থ। তা হলেও মানতে হবে যে তাদের অভ্যন্তরে সত্য নেই। তারা অসত্য দিয়ে ফাঁপা। ভিতরে ভিতরে ফাঁকা। তলে তলে নাস্তিত্ব।

তাই যদি হলো তবে কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? সংগ্রাম কার সঙ্গে? তল-পর্যন্ত গেলে অসুন্দরও অসুন্দর নয়। মন্দও মন্দ নয়। রত্ন আর পূর্বের মতো প্রেরণা পায় না বিদ্রোহের বা সংঘাতের। আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তার পা সরে গেছে বা পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এখন যেখানে তার পদযুগ প্রোথিত সেখানে মন্দ নেই, সুতরাং মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নেই। অসুন্দর নেই, সুতরাং অসুন্দরের সঙ্গে বিরোধ নেই।

একেবারেই নেই তাই বা কেমন করে বলবে? নারী যেখানে লাঞ্ছিতা সেখানে কুরুক্ষেত্রের হেতু বিদ্যমান। পাঞ্চালীর লজ্জা তো পাণ্ডবদেরও লজ্জা। তার যত দিন মুক্ত কেশ তাদেরও তত দিন মুক্ত অসি। তা বলে এই নিয়ে জীবন ভোর করে দেওয়াও কিছু নয়। আরো গভীরে নামতে হবে। যেখানে মাধুর্যের শতদল ফুটে আছে। যেখান থেকে আসছে এই সূর্যের আলো, বসন্তের পরশ, মুকুলের বাস, কোকিলের কুহু, পলাশের রং। যে উৎস হতে প্রকৃতির রমণীয়তা, রমণীর প্রেম, প্রেমের উল্লাস। গৌরী এসে খুলে দিল সেই রূপলোকের দ্বার। আর উপরে উপরে ভেসে থাকা নয়। এবার ডুব দেওয়া। তলিয়ে যাওয়া। দেখতে হবে এই অতলের তল কোথায়। মূল কত দূর। রত্নর দিন কেটে যায় আবিষ্ট ভাবে।

সে যেন কোন আরব্য উপন্যাসের রাজ্যে উপনীত হয়েছে। তার সম্মুখে বহু যুগের

নিষিদ্ধ দ্বার । রুদ্ধ দ্বার । হঠাৎ সে দ্বার খুলে গেছে । মরি মরি কী অপূর্ব সৌন্দর্য ! সৌন্দর্যের একখানি চিত্র । দ্বার খুলে গেছে, না দৃষ্টি খুলে গেছে ? সৌন্দর্যবাদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যা হলো না গৌরীর সঙ্গে ভাবসম্মিলনে যুক্ত হয়ে তাই হলো । রত্ন যেদিকেই তাকায় সেদিকেই সৌন্দর্যের সায়র । অথই । অপার। সায়রের ঢেউ গুনে শেষ করা যায় না । প্রত্যেকটি বিশিষ্ট । কিন্তু বিশ্লিষ্ট নয় । ব্যষ্টি ও সমষ্টি অভেদ অবিচ্ছিন্ন । কার নাম পাখী কার নাম পশু কার নাম গাছ কার নাম পাথর অত বেছে কী হবে! সুন্দর ! সুন্দর ! সব সুন্দর ! সবাই সুন্দর ! ল্যাংড়া লালজী, মহাদেও বাবাজী, ইয়াসিন পোস্টম্যান এরাও সৌন্দর্যের শরিক ।

আলো ! আলো ! কোন রঙীন নক্ষত্রের আলো এসে রাঙিয়ে দিয়েছে ধরণীর জলস্থল অন্তরীক্ষ ! সে যে কী রং তা নাম দিয়ে বোঝানো যায় না । সে রং ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে । তাকে নামের বন্ধনে বাঁধা যায় না । তাকে চিনতে গেলে সে চির অচেনা। আলোকনির্ঝর থেকে ঝরঝরিয়ে পড়ছে আলো, আরো আলো । প্রাণ পুলকিত হচ্ছে । পল্লবিত হচ্ছে । পুষ্পিত হচ্ছে । আমরা কি মাটির ছেলে, না আলোর দুলাল ! দুই । আমাদের জন্ম মাটির কোলে, আলোর অংশে । আমরা মর ও অমর।

রত্ন যখন বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ভিতর পানে তাকায় তখন আরো বিস্ময় লাগে তার । এত সৌন্দর্য ছিল তার নিজের অন্তঃপুরে! জানত না, দেখত না। এ যে একটা সৌরজগৎ । তারালোক । এর গায়ে রত্ন বলে কোনো নাম লেখা নেই । এ যেন সকলের অন্তর্বিশ্ব । যার দৃষ্টি খুলে গেছে সে-ই আবিষ্কার করে । অপরের কাছে অনাবিষ্কৃত অজ্ঞাত থেকে যায় । প্রেম এসে খুলে দিল দ্বার ।

দৃষ্টি খুলে গেল শুধু সৌন্দর্যের অভিমুখে নয় । নারীত্বের অভিমুখেও । তার সম্মুখে প্রসারিত নারীত্বের একখানি চিত্র । গৌরী তার কেন্দ্র অধিকার করেছে। বস্তু-গৌরী নয়, ভাব-গৌরী । শ্রীরাধার মতো মহাভাবস্বরূপিণী । কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত তার আভামণ্ডল । সব নারীই গৌরী । তাই গৌরীই সব নারী । তার গায়ে গৌরী বলে কোনো নাম লেখা নেই । সে নারীসত্ত্ব । নারীসত্ত্বের মূলতত্ত্ব । আদি বহ্নি । আদি বিদ্যুৎ । আদি জ্যোতি । আদি বাক । তার কালগণনা হারিয়ে গেছে । সে এই পৃথিবীর চেয়েও প্রাচীন । এই আকাশের সমবয়সী । তার সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ । যেমন নীলিমার সঙ্গে নভস্তলের । সুবিধার জন্যে সম্বন্ধ পাতিয়ে তার উপর ধর্মের মুখোশ আঁটা বা-নীতির পলস্তরা চড়ানো নারী বা পুরুষ কারো পক্ষে গৌরবের নয় ।

নারীত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে রত্ন । দেখতে পায় বিদ্যুৎকে ধরে এনে মানুষ তাকে দিয়ে দীপ জ্বালাচ্ছে, পাখা চালাচ্ছে । সেই বন্দী বিদ্যুৎকে মানুষ চেনে । সে যে কাজে লাগে। কিন্তু যে বিদ্যুৎ বন্দী নয়, কাজে লাগে না, সে-ই তো চোখ ধাঁধায়, তমসার যবনিকা সরায়, দিগ দিগন্ত উদঘাটন করে । যে নারী গৃহদীপখানি জ্বালে, রান্নাঘরে পরমান্ন রাঁধে, আঁতুড়ঘরে উত্তরাধিকারীকে জন্ম দেয় তাকে নিয়ে কবিত্ব করতে হয় আর কেউ করবেন, কিন্তু রত্ন সে নারীর বন্দনা গান করবে না । সে যে বন্দিনী । সে যে কাজের জন্যেই মূল্যবান । রত্নর হৃদয়ের আরাধনা পাবে সেই নারী যে মুক্ত বিজলী । যাকে ব্যবহার

করা যায় না, ব্যবহার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা, ব্যবহার করতে চাইলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। যার জন্যে প্রার্থনা করতে হয়, তপস্যা করতে হয়, বিপদে পড়তে হয়, সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। বীরত্বের পরীক্ষা দিতে হয়।

রত্ন চিঠি লেখে রাত জেগে। এবার লিখল—

ওগো বিদ্যুদবর্ণা, বিজলী কন্যা, তোমাকে বন্দী করে রাখবে কে! তুমি মুক্ত, সহজমুক্ত। তোমার মুক্তির জন্যে আমার দরকার করে না। তবু যদি তোমার এই ইচ্ছা যে আমি তোমার মুক্তির কাজে লাগি তা হলে এসো আবার আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হই। তা হলেই আমি জোর পাব। কেননা তা হলে আমার কাজ হবে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ। লোকে হয়তো ঠাওরাবে আমার মতলব ভালো নয়, আমার নিশ্চয় কোনো মন্দ অভিপ্রায় আছে। কিন্তু আমি তো জানব আমার জন্যে আমি কিছু চাইনে। চাই শুধু বিজলীর মুক্তি, যে বিজলী কারো সেবাদাসী নয়, যে স্বতঃস্বাধীনা। তুমিও জানবে আমার নিজের বলতে কোনো সাধ নেই।

এই যে আমাদের কান্তকান্তা সম্বন্ধ এর জন্যে আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কেমন করে অপরকে আমি বোঝাব যে তোমার মুক্তি আমার নিজের জন্যে নয়, এতটুকুও নয়, শুধু তোমার জন্যেই, সম্পূর্ণ তোমার জন্যে! তুমিও কি পারবে বোঝাতে। আপনি বুঝলে তো বোঝাবে! গোরী, তুমিই হয়তো একদিন ভুল বুঝবে। বলবে, যে আমাকে মুক্ত করেছে সে তার নিজের জন্যেই করেছে। এ কথা ভাবতেই আমার মনটা দমে যায়। আমি তোমার মুক্তির জন্যে জোর পাইনে। যদিও পাওয়া আমার উচিত। ওগো বিদ্যুৎ কন্যা, তুমি বন্দী থাকলে জগতের নারীত্ব বন্দী থাকবে। তুমিই সর্ব নারী। তোমাকেই সর্বত্র আমি দেখি। আমার চোখে তুমিই একমাত্র নারী। যদিও চোখে তোমাকে দেখিনি।

নারীর কাছে আমার অনন্ত প্রত্যাশা। নারী যেদিন মুক্ত হয়ে দেশের ও বিশ্বের ভার নেবে সেদিন নতুন যুগ আসবে। নারী আনবে মানুষে মানুষে শান্তি। যুদ্ধবিগ্রহ অতীতের বস্তু হবে। নারী তুলে দেবে প্রাণদণ্ড। নারী উঠিয়ে দেবে কারাগার। কেউ বন্দী হবে না। অপরাধ করলেও না। শাস্তি বলে যদি কিছু থাকে তবে তা হবে মা যেমন করে ছেলেকে সাজা দেয়। ভালোবাসার সাজা। নারীশাসিত সমাজ হবে প্রেমশাসিত সমাজ। ভয়শাসিত সমাজ নয়। বৈকুণ্ঠ নেমে আসবে মর্ত্যে। নারী হবে সেই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ঠাকুরানী। ওগো নারী, তুমি সেই লক্ষ্মী ঠাকুরানী। মানুষকে তুমি মানুষের ভয় থেকে ত্রাণ করবে। পুরুষকে বাঁচাবে পুরুষের হাত থেকে।

গোরী, আমি স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্ন দেখি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। নিজের নয়, সর্বজনের। জীবনকে কত রকম ভাবে বাঁচা যায়। কত উন্নত ভাবে, শ্রীমন্ত ভাবে। কোটি মহান সম্ভাবনায় পূর্ণ এই জীবন। সম্ভাবনা কি সম্ভাবনাই থেকে যাবে যুগের

পর যুগ ! আমাদের যুগটা কি গতানুগতিক ভাবে কেটে যাবে ! আমার মন তাতে সায় দেয় না । আমি বিশ্বাস করি যে আমার কতক স্বপ্ন সফল হবেই । হবে এই যুগে । তাকে সফল করবে তোমরা এ যুগের নারী । তোমার মুক্তির প্রশ্ন তোমার একার নয় । যা প্রত্যক্ষরূপে একজনের তা পরোক্ষে সব জনের । মুক্তা, তুমি মুক্ত হও তোমার শুক্তি থেকে। আমার জন্যে নয় । আমি অনাসক্ত ।

দুই

ওদিকে গোরীর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চায় না । সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে রত্ন তাকে ভালোবেসেছে । তার ভালোবাসার মর্যাদা রেখেছে । চিঠি লিখে চিঠির জবাবের জন্যে সে সবুর করবে না । চিঠির পর চিঠি লিখবে । তার উচ্ছ্বসিত পল্লবিত রচনাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করলে এইরকম দাঁড়ায় :

ওগো বিস্ময় ! ওগো পুনঃপুনঃ বিস্ময় ! ওগো রাজপুত্র ! ওগো কুমার ! ওগো নবযৌবন ! ওগো সুন্দর । ওগো ওগো ! তুমি আমায় ভালোবাস ! এ কি সত্য ! তুমি আমার ! এ কি সত্য ! আমি তোমার ! এ কি সত্য !

প্রতিদিন ভোরে আমার ঘুম ভেঙে যায় । রাত্রেও কত বার ভাঙে। মনে হয় একটু আগেই তুমি ছিলে । হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলে । মিলিয়ে গেলে, না লুকিয়ে রইলে । চোখ দিয়ে তোমাকে সব ঠাঁই খুঁজি । উঠে বসি । পাগলের মতো পালঙ্কের তলায় চেয়ে দেখি । না, কোথাও সিঁদ কাটার চিহ্ন নেই । সুন্দর, তুমি বিদ্যাসুন্দরের সুন্দর নও । সিঁদ কাটতে জানে না ।

দিনমান কান্না পায় ! কেন তুমি ধরাছোঁয়া দিলে না ! কেন হারিয়ে গেলে ! কোথায় তোমাকে এখন খুঁজে বেড়াই ! একমাত্র সান্ত্বনা তোমার চিঠি । কী যে ভালো লাগে তোমার দুটি কথা ! অমৃত । অমৃত । আমি প্রাণ পাই । আমার বাঁচতে ইচ্ছা যায় । প্রিয়, বেঁচে থেকে কোন সুখ যদি প্রিয়সঙ্গ না মেলে ! যদি প্রিয়পরশ না ঘটে! তোমার চিঠির মধ্যে গোঁজা করবী ফুল আমার খোঁপার মধ্যে গুঁজি! ওই তিলপরিমাণ প্রিয়সংস্পর্শ আমাকে তালপরিমাণ অপ্রিয়সংসর্গ সইতে শেখায়। ওই যেন আমার রক্ষাকবচ। আমার কবচ কুণ্ডল। যেমন কর্ণের।

সইতে শেখায়। আবার অসহিষ্ণু করেও। আগের চেয়ে আমি ঢের বেশী অসহিষ্ণু হয়েছি। এত দিন যা বরদাস্ত করে এসেছি এখন আর তা বরদাস্ত হয় না। আমার মধ্যে একটা নতুন অবাধ্যতার উদয় হয়েছে। এরাও সেটা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কেন তা জানে না। আমার ভয় কিসের? আমার ভয় কাকে?

তুমি আমার জীবনে এসেছ । দুঃখিনীকে দয়া করে ভালোবেসেছ । ওগো আমার সাত রাজার ধন মাণিক । এখন হতে তুমিই থাকবে আমার হৃদয় জুড়ে । আমার হৃদয় সে তো তোমারই হৃদয় । তোমারই জন্যে পাতা শয্যা । সেখানে

আর কেউ শোবে না। আর কারো উত্তাপ কামনা করব না। পেলেও নেব না। তুমি আর আমি মিলে যুগল। তুমি গৌরীরত্ন। আমি রত্নগৌরী। ওগো মধুরতম, যে স্বাদ তুমি আমাকে দিয়েছ তার পর আর সব বিস্বাদ। আকাশে যখন সূর্য ওঠে তখন তারা সব মিলিয়ে যায়। চাঁদ আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু তারও বরণ মলিন হয়ে যায়। সেই জ্যোতির্ময়েরও জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়। তোমাকে যে আসনে বসিয়েছি সে আসনে কেবল তুমি আর আমি। ধন, তুমি আর আমি। ধন, আমিও যে তুমি।

রত্ন স্তব্ধ হয়ে দু'হাত যোড় করে। কপালে ঠেকায়। সে কি এ প্রেমের যোগ্য! তার চোখে জল ভরে আসে। এমন ভালোবাসা কেউ তাকে বাসেনি। এমন ভালোবাসার উত্তর এমনি ভালোবাসা। সেও কি না ভালোবেসে পারে! গৌরীর প্রতি স্বতঃ অনুরাগের সঞ্চার হয়। অনুরাগ আপনি উৎসারিত হয়ে ছোটে।

এ তার বিনা প্রয়োজনের ভালোবাসা। একে লিখে জানানো যায় না। বলে বোঝানো যায় না। প্রকাশ করতে হয় বিনাবাক্যে। একটু চাউনি দিয়ে। একটুখানি কাছে এসে। কিন্তু তার কি বিশেষ কোনো আশা আছে! কোথায় রত্ন আর কোথায় শ্রীমতী! মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। আকাশের চাঁদের সঙ্গেও তত নয়। চাঁদকে তো চোখে দেখা যায়। তার আলো তো জানালার ভিতর দিয়ে বিছানায় এসে পড়ে। রাত কাটে তার সঙ্গে।

গৌরী তার প্রত্যেকটি চিঠিতে ফুলের পাপড়ি গুঁজে দেয়। রত্ন তা নিয়ে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখে। রাত্রে শুতে গেলে বুকে তুলে নেয়। মুখে ছোঁয়ায়, নাকের সামনে ধরে। সে অত রকম ফুলের নামও জানে না। বন্ধুদের দেখিয়ে নাম জেনে নিতেও সাহস হয় না। যদি ওরা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় পেলে! একমাত্র প্রভাত তার রহস্য জানে। সেও তার পরীক্ষার পড়া নিয়ে তন্ময়। দুই বন্ধুতে দেখাশোনা বন্ধ।

গৌরীর চিঠিতে আদরের ছড়াছড়ি থাকে। যেন সে কোনো দিন কাউকে আদর করেনি, এই প্রথম সুযোগ পাচ্ছে। পরিবর্তে সেও চায় আদর। যেটুকু পায় সেটুকুর জন্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত হয়ে থাকে। বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তার আদরের আতিশয্য দেখে অবাক হয় রত্ন। আতিশয্য! উঁহু। উচ্ছলতা, উদ্বেলতা। পূর্ণিমার রাত্রে সমুদ্র তো দেখেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে ফুলছে ফাঁপছে দুলছে কাঁপছে ফেনিয়ে শ্বসিয়ে ছুটে এসে ভেঙে পড়ছে লুটিয়ে পড়ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে গড়িয়ে যাচ্ছে। চাঁদ থাকে কোন আকাশে। বাহু তুলে তার নাগাল পাওয়া যায় না। তাই মুখমদের ছিটা ছুঁড়ে মারে। চোখের জলের জোয়ারে ভাসায়।

কাছাকাছি থাকলে কি এমনটি হতো! বলা শক্ত। রত্নর ধারণা সে সুদূর বলেই তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সে অদর্শন বলেই সে সুদর্শন। কাছে গিয়ে দেখা দিলেই মোহভঙ্গ নিশ্চিত। কাজ কী দেখা দিয়ে। থাক না, সম্বন্ধটা আরো পাকা হোক। গভীরতর চেনাশোনা তো চিঠিপত্রেই হয়। মন জানাজানি কি সাক্ষাতে হবার! তখন যে রসনা মৌন হতে চায়। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কথা বলতে যায় তো ভুল বকা

হয় । পেটের কথা পেটেই থেকে যায় ।

দেখা কি তবে দেবে না ? দেখা না দিলে দেখা পাবে কী করে ? দেখা চাই সঙ্গসুখের জন্যে । আর লেখা চাই মন ছোঁয়াছুঁয়ির জন্যে । মন দেওয়ানেওয়ার জন্যে । আগে মনের সঙ্গে মনের শুভদৃষ্টি হোক । তার পরে হবে নয়নের সঙ্গে নয়নের শুভদৃষ্টি । কবে ? কে জানে কবে ! রত্ন জানে না, জানতে চায় না । কিন্তু বিশ্বাস করে যে হবে একদিন । হবেই । এমন অপূর্ব প্রেম মাঝ পথে থেমে যাবে না ।

রত্নর সেই চিঠি পেয়ে গোরী লিখল—

রাখীবন্ধ ? হাঁ, রাখীবন্ধ । ভাইবোন ? না, ভাইবোন না । যমজ ভাইবোন ভাবতে আমাব কত ভালো লাগে । কিন্তু তাও আমার পছন্দ নয় । পছন্দ, কিন্তু তোমার সঙ্গে সেটা নয় । সেটা আমি জ্যোতির জন্যে তুলে রেখেছি । সে বেচারা মর্মাহত হয়েছে তোমার দ্বারা নিষ্প্রভ হয়ে । কিছু দিন তো দেওয়ানার মতো ঘুরে বেড়ালো । এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছে । ওর তো বিয়ে দিতে পারিনে ললিতের যেমন দিলুম । ও কোনো দিন বিয়ে করবে না । ললিতকে পরখ করে দেখা গেল তার মধ্যে তেমন দৃঢ়তা নেই । আমার ধারণা ছিল সে কিছুতেই রাজী হবে না । কিন্তু সে রীতিমতো পিতৃভক্ত । জ্যোতি ? না, জোতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া । ঠিক যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি ।

তোমার হাতে যেদিন রাখী বেঁধেছিলুম, ওগো, সেদিন ভাই মনে করে বাঁধিনি । যা মনে করে বেঁধেছিলুম তাই অবশেষে সত্য হলো । মাধবের ইচ্ছা । মাধবের কাছে বরভিক্ষা করেছিলুম, তিনি বর দিয়েছেন তোমাকে । তোমার সাধ্য কী যে তুমি এড়িয়ে যাবে ! আমি জানি তুমি ঠাকুরদেবতা মানো না । মাধবকেও তুমি পুতুল বলে উড়িয়ে দেবে । কিন্তু যিনি নিরাকার তিনিই সাকার, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার । যার যেমন সাধনা তার কাছে তেমন । শিখরা বলে অলখ নিরঞ্জন। ওরা কি ভুল বলে ? না, ঠিকই বলে । তা বলে কাশীর বিশ্বেশ্বর, বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, পুরীর জগন্নাথ, কালীঘাটের কালী ভুল হয়ে যান না । এ বাড়ীর রাধামাধব জাগ্রত দেবতা । মাধবকে আমি ছাড়ব না ।

কিন্তু এদের সংসার আমি ছাড়বই । বশ্যতা স্বীকার করব না । সমাজ আমাকে এক কণ্ঠে বলছে, মেনে নাও । মেনে নাও । মেনে নিলেই মঙ্গল । না মানলে অমঙ্গল । কিন্তু হৃদয় বলছে অস্ফুট স্বরে, কখনো নয় । কিছুতেই নয় । সংগ্রাম করে চলেছি আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত । মাসের পর মাস, বছরের পর বছর । কবে যে এর অবসান হবে কে আমাকে বলবে ! মাধব তো নিরুত্তর । তাঁর উত্তর বোধ হয় সাকার হয়েছে তোমাতে । তুমিই তাঁর জীবন্ত উত্তর । তুমি যখন এসেছ তখন আমার ভাবনা কিসের ? মুক্তি আমি পাবই । ওগো, তুমি যেদিন প্রস্তুত হবে আমিও সেদিন প্রস্তুত । ওগো, তোমার হাতেই ছেড়ে দিলুম দিন ক্ষণ সন তারিখ । তুমিই আমার মুক্তিদাতা, প্রেমদাতা, দুই ।

আর আমি ? আমি তোমার কী তা তুমিই সত্যি করে বল । আমাকে কি বোনের মতো লাগে ? আমি যদি তোমার বোন হই তা হলে তুমি সত্যি সুখী হও ? যদি বল তাতেই তোমার সুখ তা হলে আমার আর উপায় কী ! তোমাকে সেই ভাবেই সুখী করতে শিখব । কিন্তু আমার হৃদয়ে তোমার স্থান কে নেবে ? কোথায় পাব তাকে যে দেবে আমাকে অমৃত ! প্রিয়তম, তুমি আমাকে বোন ভাবতে পার, তা বলে আমি কি তোমাকে ভাই ভাবতে পারি ! ও যে ঘোর অসত্য হবে । আমাকে তুমি আমার মতো করে ভাবতে দাও । এই তো সেদিন লিখেছিলে আমরা যুগল । সেই সম্পর্কে স্থির থাকতে পার না কেন ? আমি তোমার রত্নগোরী । তুমি আমার গোরীরত্ন । এই সম্পর্কই ঠিক । এর পর আর যত রকম সম্পর্ক সব বেসুরো বাজবে । না গো, আমি তোমার বোন হতে পারব না । তোমার মালাদিকেই তোমার বোন কর । যমজ বোন । আর আমাকে দাও সেই মালা যা তুমি তাঁর জন্যে গেঁথেছিলে ।

একটু আগে বলেছি, মাধবকে আমি ছাড়ব না । এখন বলছি, তোমাকেও আমি ছাড়ব না । তোমরা দু'জনেই আমার সমান আপন । মাধব আর তুমি । মাধবকে যখন সাজাই— ওটা আমার প্রতিদিনের কাজ— তখন মনে মনে তোমাকেও সাজাই । কখনো রাজবেশে, কখনো রাখালবেশে । তাঁকে যখন আরতির সময় চামর করি তখন তোমাকেও । তাঁর জন্যে মালা গাঁথা তোমার জন্যেও গাঁথা । তাঁর সঙ্গে তুমি আমার কাছে অভিন্ন হয়ে গেছ । তবে কেন দু'জনে বলি ? একজন । তবে ঠাকুরকে তো কামনা করা যায় না । পাপ হবে যে ! কামনা করতে হয় মানুষকে । তেমনি সুজনকে । স্বজনকে । তুমি আমার তেমনি সুজন ও স্বজন। পাপ ? না, তোমার বেলা আমার পাপবোধ নেই ।

এ রকম একখানা চিঠি পেলে কার না মাথা ঘুরে যায় ! চিঠিখানা মুখে ছুঁইয়ে বুকে চেপে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে রত্ন । কথা বলতে পারে না । আবেগে কণ্ঠরোধ হয় ! কেউ এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে বোবার মতো অসহায় বোধ করে। মাথা নেড়ে বা হাত নেড়ে জবাব দেয় । ভাগ্যিস পরীক্ষা আসন্ন । তাই ওরা ধরে নেয় সে স্বেচ্ছায় মৌন অবলম্বন করেছে। বিদ্যাপতি অঞ্জনরা তো অত সহজে ভুলবে না । তাকে কথা বলাবেই । কিন্তু কথা বলতে গেলে হয় স্বরভঙ্গ ।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে রত্নর মনে পড়ে যায় সাত আট মাস আগে শ্রীমতীর প্রথম কি দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে প্রভাতের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে যা বলেছিল !

বলেছিল, 'প্রেম অসাধ্যসাধনের সংকল্প নেয় । চরম বিপদের সম্মুখীন হয় । জীবন যদি আমাকে দিত তেমন একটা সুযোগ যেমন দিয়েছে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতুম প্রেম কত বড় শক্তিমান ।'

জীবন তাকে সত্যি সত্যি দিল তেমন একটা সুযোগ । এবার তাকে প্রমাণ দিতে হবে তার উক্তির । এখন যদি সে পিছিয়ে যায় তবে জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ হবে ।

যে মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারে না তাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেয় কি কেউ ? না, এ সুযোগ হেলায় হারালে দ্বিতীয় সুযোগ মিলবে না । জীবনেরও কতকগুলো অলিখিত নিয়ম রয়েছে ।

'একে তুমি সুযোগ বল, রতন ।' বিস্মিত হয়েছিল প্রভাত । বিলাপ করেছিল, 'আমার মতো অভাগাকে ঈর্ষা কর তুমি ! এমন দুর্ভাগ্য যেন শত্রুরও না হয় ।'

'ভাই প্রভাত,' রত্ন বলেছিল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি নারীর প্রেম পেয়েছ । আমি পাইনি । তুমি ধন্য । আমি নই । তোমার কপালে রাজটীকা । আমার কপালে ভাইফোঁটা । মালাদি আমাকে তার বেশী দেননি, দেবেন না ।'

এখন তো রত্নর কপালেও রাজটীকা পড়ল । ক'টা মাস যেতে না যেতেই । এখন তো তার ধন্য হওয়া উচিত । সে কি ধন্য হয়েছে, না হয়নি ? রত্ন একবার তার বন্ধু প্রভাতকে আড়ালে পেতে চায় । কিন্তু ভরসা হয় না তার কাছে সব ভাঙতে ।

প্রভাত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জীবনে নারীর প্রেমই কি সব চেয়ে মূল্যবান ? তার উপরে আর কিছু নেই ?'

রত্ন উত্তর দিয়েছিল উদ্দীপ্ত হয়ে, 'রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি । তার উপরে যদি কিছু থাকে তবে সে-ই দেখতে পায় যে তত দূর উঠেছে ।'

প্রভাত তা বিশ্বাস করেনি । তাকে অনুনয় করেছিল, 'রত্ন, ভাই, কখনো কোনো বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পোড়ো না ।'

সুতরাং প্রভাতের কাছে যাওয়া নিরর্থক । সেদিন রাত্রেও তো সে ওই ধরনের কথা শুনিয়ে দিয়েছে । রত্ন তার সঙ্গে একমত হতে পারেনি । প্রেম যদি এমনিতেই ভালো জিনিস হয়ে থাকে তবে বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে হলেই খারাপ জিনিস হয়ে যেতে পারে না । তা ছাড়া গোরী কিসের বিবাহিতা ! বিবাহ তাকে জোর করে দেওয়া হয়েছে। তার আপত্তি তখনো ছিল, এখনো রয়েছে । একদিনের জন্যেও সে সায় দেয়নি । ঐ ভদ্রলোককে স্বামী বলে স্বীকার করেনি । ভালোবাসেনি । ভালোবাসা পায়নি । ভালোবাসার পাত্রী আরেকজন । তখনো ছিল । এখনো রয়েছে । বলতে গেলে ওরাই বিবাহিত । গোরী নয় ।

দিন কয়েক বাদে প্রভাত নিজেই হাজির হলো তার ঘরে । রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে । বলল, 'এ কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছিনে। বুঝিয়ে দিতে পার ?'

রত্ন বই খোলা রেখে চিঠি লিখছিল । চিঠিখানা কোথায় যে রপ্তানি করে দিল প্রভাত তা দেখে স্তম্ভিত । ম্যাজিক না ভোজবাজি !

'হুঁ । খুব লেখাপড়া হচ্ছে । ব্যাঘাত করলুম বলে দুঃখিত ।' প্রভাত জমিয়ে বসল । তার চোখে হাসি । মুখে কপট গাম্ভীর্য ।

'কী হয়েছে ? হঠাৎ কী মনে করে ?' রত্ন ভয়ে ভয়ে সুধাল ।

'হবে আর কী ! তোমার তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। চম্পা ভাই বলে সম্বোধন । নিচে স্বাক্ষর পারুল বোন । তিন পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠি । জীবনে কখনো এত বড় চিঠি পাইনি । এসব পড়ে যদি সময় নষ্ট করি তো ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস কষব কখন ? প্রথম

পৃষ্ঠায় দেখি রাজনীতি । দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সমাজনীতি । শেষের দিকে কাজের কথা । ও কী বলতে চায় শুনবে ?'

রত্ন শুষ্ক মুখে বলল, 'শুনি ?'

'আমরা নাকি মহাভারতের যুগে বাস করছি । কুরুক্ষেত্র বাধবেই । একালের কুরু পাণ্ডব হচ্ছে ইংরেজ ভারতীয় । তা মহাভারতের যুগে বাস করছি যখন, তখন মহাভারতের সমাজ ফিরিয়ে আনব না কেন ? সে সমাজে নারীর ছিল স্বয়ংবরের অধিকার। নারীকে তার সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে । নারী স্বয়ংবরা হবে । যাদের বিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে তাদের বিবাহ অসিদ্ধ । তারা ইচ্ছা করলে সে বিবাহ অস্বীকার করবে ও তার পরে স্বয়ংবৃতা হবে । তেমন ইচ্ছা পারুলেরও আছে । সোনালীর জন্যে আমি এত কিছু করেছি, পারুলের জন্যে কেন করব না ? সে কি আমার বোন নয়? আমি নাকি সর্বশক্তিমান । আমি সচেষ্ট হলেই সে মুক্ত বিহঙ্গীর মতো সাথী মনোনয়ন করতে পারে । সাথী নাকি আমার সুপরিচিত । তাই তার নাম করেনি ।'

রত্ন তৎক্ষণে পদ্মরাগমণির মতো রক্তিম । ভাবের আবেগে ভাষাহীন ।

প্রভাত বলল, 'দেখলে তো আমি কেমন ঝানু ডিটেকটিভ । ঠিক ধরে ফেলেছি বিহঙ্গটি কে । কিন্তু আমার কথা শোন । ওর স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়, হিন্দুরা সেদিকে হুঁশিয়ার । মহাভারতের যুগ ফিরে আসুক এটা ওদের মনোবাঞ্ছা । কিন্তু স্বামীত্যাগ করে স্বয়ংবর,? অসম্ভব ! অবাস্তব !'

'তা হলে বলি সব কথা ।' রত্ন প্রাণ খুলে বলতে চেয়েছিল, সুযোগ পায়নি, আজ পেলো । 'সোনালীই এর মূলে । তার জন্যে বরাবর আমার মনে একটা ব্যথা ছিল । নিজের অক্ষমতায় আমি একান্ত লজ্জিত ছিলুম । শ্রীমতী যখন আমাকে সোনালীর সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করল তখন আর একবার আমি হাত লাগিয়ে দেখলুম । এবার এই শিখলুম যে পাঁক থেকে টেনে তুলতে বল লাগে । সে বল কেবল প্রেমের আছে । প্রবল প্রেম ব্যতীত আর কেউ পারবে না ওকে উদ্ধার করতে । গোরীর সমস্যা অবশ্য একজাতের নয় । তা হলেও বেশ কিছু মিল আছে । ওখানে নগ্ন বাহুবল । এখানে মন্ত্রপূত বাহুবল । নারীর অন্তরাত্মা যাকে চায় তাকে সে পাবে না । যাকে চায় না তাকেই মেনে নিতে হবে । মেনে না নিলে তার দেহমনের উপর অত্যাচার করা হবে । যত দিন না মেনে নিচ্ছে তত দিন অত্যাচার লেগে থাকবে । দিনে দিনে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষয়ে আসবে । এমনি করে একদিন তার স্পিরিট ভেঙে যাবে । কায়িক আত্মসমর্পণ এখানে স্পিরিচুয়াল ডিফিট । তা হলে সোনালীর সঙ্গে শ্রীমতীর সত্যিকার তফাৎটা কোথায় ? সমাজ অন্ধ, তা বলে তুমিও কি তাই ?'

প্রভাত হয়তো প্রতিবাদ করত, কিন্তু রত্ন তাকে মুখ খুলতে দিল না বলে চলল, 'ভাই প্রভাত, চক্ষুষ্মান হলে তুমিও দেখতে পেতে সেই একই সমাধান এখানেও । প্রবল প্রেম ভিন্ন আর কারো সাধ্য নেই যে ওকে উদ্ধার করে । ও যে আপনাকে আপনি উদ্ধার করবে তার জন্যেও চাই প্রবল প্রেম । প্রতি রাত্রেই ওকে প্রতিরোধের জন্যে সশস্ত্র হতে হয় । শস্ত্রটা সম্পূর্ণ নৈতিক । কিন্তু আত্মা বিমুখ হলেও দেহ উন্মুখ হতে

পারে । প্রবৃত্তি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে । সেইজন্যে ওকে বিশ্বাস করতে হয় যে, ও প্রেমসূত্রে অপরের নারী । অপরের সঙ্গেই ওর সর্বপ্রকার সম্পর্ক । ওর যত কিছু চাহিদা সব মেটাতে পারে ওর সেই অ-পর পুরুষ । ওর স্বকীয় পুরুষ । প্রেমসূত্রে আপন ! বরণসূত্রে বর । তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে । ইতিমধ্যে প্রতিরোধ করতে হবে পরিপূর্ণ প্রেমের নামে । নয়তো জাগবে না পরিপূর্ণ প্রতিরোধশক্তি। সে শক্তি অসীম, কেননা সে শক্তি অসীম প্রেমের । আমার দিকে তাকালেই ও আশ্বাস পায় যে অসীম প্রেম ওর নাগালের মধ্যে । আমি ওর ভাই হতে চেয়েছিলুম । রাখীবন্ধ ভাই । কিন্তু ও বলে ও আমাকে রাখী পরিয়েছে কান্ত ভেবে । এখন তো মালাদির প্রতি আমার আনুগত্য নেই । আমি তবে কার মুখ চেয়ে প্রত্যাখ্যান করব গোরীকে ? প্রেমকে ? রাখীকে ?'

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক যে জিনিসটি করতে বারণ করেছিলুম সেই জিনিসটি তুমি করলে। একেই বলে নিয়তি । শ্রীমতীর কি বন্ধুর অভাব, না প্রেমিকের ! এক পাল পুরুষকে ও ভেড়া বানিয়ে রেখেছে । কিন্তু তোমার মতো মেড়া কেউ নয় । চোখে না দেখেই জান কবুল করা ! যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে । ও আমাকে ভাই বলে ডেকেছে, আমার শরণ নিয়েছে । বোন যদি শরণাগত হয় ভাই কি তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারে ! তার জন্যে কী করা যায় তাই ভাবছি । হিন্দুর ঘরের বৌ তো আদালতে গিয়ে ছাড়পত্র দাবী করলে পাবে না । তা হলে তার মুক্তি বলতে কী বোঝাবে ? বিবাহ থেকে মুক্তি নয়, অন্তঃপুর থেকে মুক্তি । অবরোধ থেকে মুক্তি । পৃথক বসবাস । স্বতন্ত্র জীবিকা । স্বাধীন মেলামেশা । কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার গোরী তোমার কাছে পরকীয়াই রয়ে যাবে । বিবাহিতা নারী, অবিবাহিত পুরুষ । বড় কষ্ট, রতন ! বড় দুঃখ ! চিরটা কাল টেনসন । সে টেনসন তুমি পারবে না সইতে । সেও কি পারবে !'

ও যেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলা । অশ্রু ধোওয়া । বুকভাঙা । রত্ন কতটুকু ভুগেছে কতটুকু জেনেছে যে বন্ধুর উক্তির প্রতিবাদ করবে, বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করবে ! তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস জোরে জোরে পড়ছিল । বুক উঠছিল নামছিল। বেশ মালুম হচ্ছিল সে ঘোরতর অশান্ত ।

'গোড়াতেই তোমার ভুল হচ্ছে, ভাই ।' সে উত্তেজনা দমন করে বলল, 'গোরী পরকীয়া নয় । কোনো কালেই ছিল না । ও স্বীকারই করে না যে ওর বিয়ে হয়েছে । বিয়ে তো একটা অনুষ্ঠানমাত্র নয় । আর বিয়ে যদি হয় বলপূর্বক তবে তা বিয়েই নয় । তা আইনে টিকতে পারে, ন্যায়ে টিকবে না । ন্যায়ত গোরী অবিবাহিতা । কৌমার্য যাওয়া ও কুমারীত্ব যাওয়া একই কথা নয় । সে কুমারী । আমি কুমার । সে আর স্বকীয়া । আমি আমার স্বকীয় । প্রেমের নিয়মে আমরা পরস্পরের স্বকীয় স্বকীয়া । প্রেমের নিয়মের সঙ্গে বিবাহের নিয়ম যদি না মেলে তবে বিবাহের নিয়ম বদলাতে হবে। সে নিয়ম শাশ্বত নয় ।'

প্রভাত আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল । বলল, 'বুঝি সব । কিন্তু তার অনেক দেরি।

সমাজ চলে শত লক্ষ পায়ে। ব্যক্তি চলে দুটি মাত্র পায়ে। সমাজ কি ব্যক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারে! দশ বিশ বছর সবুর করলে হয়তো সমাজ তোমাদের সঙ্গে পা মেলাবে। কিন্তু প্রেম কি তত দিন পায়চারি করবে! প্রেমেরও একটা ঋতু আছে। এই বসন্ত ঋতু যেমন। তার পর দেখবে প্রেমের বদলে আছে গভীরতম স্নেহ, অকপট প্রীতি। প্রেম নয়। প্রেম চলে গেছে। প্রেম পাত্রান্তরিত হয়েছে। বিবাহের নিয়ম শাশ্বত নয়। কিন্তু প্রেমের অধিষ্ঠান কি শাশ্বত! তাই যদি হতো তবে আবার আমি প্রেমে পড়তুম কেন?'

প্রভাত যেন এই খবরটুকু জানাতে এসেছিল। দমকা হাওয়ার মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। রত্নর মনে পড়ল যে সেদিন রাত্রে ও যেন এই কথাটি বলতে চেয়েছিল। বলেনি।

তিন

এর মধ্যে একদিন একটা স্বপ্ন দেখে মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল রত্নর। সরে যাওয়া লেপটাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে সে ভেবেছিল আয়েস করে শুয়ে থাকলে ভাঙা ঘুম আবার জোড়া লাগবে। হারানো স্বপ্ন ফিরে আসবে। দ্বিতীয় বার দেখা দেবে সেই স্বপ্নের মেয়েটি যে এক অখ্যাত পুরুষের আখ্যান শোনাতে গিয়ে বলেছিল, 'সত্যিকার ভালোবাসা যদি জীবনে আসে সব কিছু রূপান্তরিত হয়।'

রত্ন অনেকক্ষণ বানানো স্বপ্ন দিয়ে মিলিয়ে যাওয়া স্বপ্নের জের টানল। কিন্তু তার স্বপনচারিণীর মুখ স্মরণে আনতে পারল না। পাছে কথাগুলিও ভুলে যায় সেই ভয়ে সে শীতের রাতে শয্যা ছেড়ে উঠল। ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় গয়ে পেনসিল দিয়ে টুকল, 'সত্যিকার ভালোবাসা যদি জীবনে আসে সব কিছু রূপান্তরিত হয়।'

ওটা যেন ব্যক্তিগত একটা বাণী। রত্নর প্রতি কোনো অপরিচিতার। না, সে গৌরী নয়। গৌরীর মুখ তো ফোটো থেকে চেনা। অপর কোনো শুভাধ্যায়িনী তার প্রয়োজনের সময় তাকে এই বাণী দিয়ে গেল স্বপ্নযোগে। আরো কয়েক জনের সাক্ষাতে। তাদের উপস্থিতি ভেদ করে। গল্পচ্ছলে। তারা পেলো গল্প। সে পেলো মর্ম।

অত রাত্রেও কোকিল ডাকছিল। কোকিলা সাড়া দিচ্ছিল। ডাকাডাকি করতে করতে ওরা একটু একটু করে কাছাকাছি হচ্ছিল। কেউ কাউকে চোখে দেখেনি। দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু না দেখলেও চিনতে পারছিল। ওরাই যেন রত্ন ও শ্রীমতী। পাখী হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। যে যার বন্ধন ছেদ করেছে। দু'জনেই মুক্ত।

শুয়ে শুয়ে গৌরীর রূপ ধ্যান করতে করতে কখন এক সময় রত্ন আবার ঘুমিয়ে পড়ল। জাগল যখন, তখন শীতকালের রোদ উঠেছে। তার বন্ধু বিদ্যাপতি তার ঘরে ঢুকতে না পেরে ডাকাডাকি করছে। ওটা ঠিক কোকিলের ডাক নয়।

সতীর্থের সঙ্গে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বসে রত্নর চোখে পড়ল, 'সত্যিকার ভালোবাসা যদি জীবনে আসে সব কিছু রূপান্তরিত হয়।' কখন একথা লিখল? রাত্রে

বিছানা থেকে উঠে ? এ কি তার লেখা ? না এ তাকে দিয়ে লেখানো ? তার নয়, আর কারো উক্তি । কে সে ? ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে স্বপ্নের সেই দৃশ্য । স্বপ্নের মেয়েটিও আবছায়া মতন । যেমন প্রাচীন গুহাচিত্রের অবশেষ । তার উপর রং চড়িয়ে তাকে তার স্বরূপ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না ।

'আচ্ছা, ভাই,' রত্ন সুধাল তার বন্ধুকে, 'আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয় ? আমি কি তেমনি আছি ? না আমার কোথাও কোনো রূপান্তর ঘটেছে ?'

অদ্ভুত প্রশ্ন । বিদ্যাপতি এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না । ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল । রত্ন সেই শীতের প্রত্যূষেও ঘেমে উঠল, কিন্তু ভেঙে বলল না কী বৃত্তান্ত।

তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বিদ্যাপতি কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করল । বলল, 'হাঁ, তোমার ললাটে সূর্যোদয়ের আভা । বাইরের সূর্যোদয়ের নয় । ভিতরের । তুমি কি তাকে ধ্যানে অবলোকন করেছ ? সেই পরম সৌন্দর্যকে ? যার জন্যে হিমালয় যেতে হয় না । টাইগার হিলেও উঠতে হয় না । সেই একান্ত সূর্যোদয়কে ?'

তখন খুলে বলতে হলো গত রাত্রের স্বপ্নপ্রসঙ্গ । তা শুনে বিদ্যাপতির দুই চোখ তার কচ্ছপের খোলার চশমার দুই কাঁচের সঙ্গে সমান হলো ।

'আমিও মাঝে মাঝে ওকে স্বপ্ন দেখি । ওর নাম স্বপ্নাবতী । ও আমাদের শুভকারিণী শক্তি। জীবনের এক একটি সন্ধিক্ষণে ওর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । ভাই রত্না, তোমার জীবনের এটি একটি সন্ধিক্ষণ। তোমার জীবনে ভালোবাসা এসেছে, কিন্তু এ ভালোবাসা সত্যিকার কি না তুমি কেমন করে জানবে, যদি না সত্যিকার ভালোবাসার লক্ষণ কী তা জেনে রাখ ? স্বপ্নাবতী তোমাকে তা জানিয়ে রাখল ।'

রত্ন অবশ্য বিশ্বাস করল না যে স্বপ্নাবতী বলে কেউ আছে । বিদ্যাপতির মতো সে অকাল্ট ব্যাপারের ধার ধারে না । মিস্টিক আর অকাল্ট দুই এক নয় । কিন্তু স্বপ্নাবতী বলে কেউ না থাকলেও স্বপ্নলব্ধ বাণীটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । হয়তো সে বাণী জাগ্রত অবস্থায় আর কারো কাছে পাওয়া । কবে তা স্মরণ নেই ।

'ভাই বিদ্যা, সব ভালোবাসাই সত্য । তা যদি হয় তবে সত্যিকার ভালোবাসা বলে ইতরবিশেষ করবে কী করে ?' জানতে চাইল রত্ন ।

'সব ভালোবাসাই সত্য । কিন্তু সত্যিকার ভালোবাসা সত্যি দুর্লভ । সবাইকে সে সৌভাগ্য দেওয়া হয় না । দেওয়া হয় হাজারে একজনকে । না, হাজারে একজনকেও না । লাখে একজনকে । না, লাখেও না । আমার সমনামা কবি বলে গেছেন, লাখে না মিলল এক । ভাই রত্না, সত্যিকার ভালোবাসা আমি একটিই দেখেছি, যদিও ভালোবাসা দেখেছি অনেক । সত্যিকার ভালোবাসার দাবী এমন সর্বগ্রাসী যে তাকে আমি দূর থেকে প্রণাম করি । আমার ওই সাধারণ ভালোবাসাই নিরাপদ ।'

'তা হলে সৌভাগ্য কেন বললে ? দুর্ভাগ্য বল ।' রত্ন ভুল ধরল ।

'যা বলেছ । কিন্তু সে দুর্ভাগ্য সবাইকে দেওয়া হয় না । যাদের দেওয়া হয় তারা যদি শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকে তবে তারাই সংসারের সার ।'

রত্নর মুখে ছায়া নেমে এলো । এত যে আনন্দ এ কি নিরানন্দের পূর্বাভাষ ।

বিদ্যাপতি আনমনে কী ভাবছিল । করুণ কণ্ঠে বলল, 'থাক । আজ না । আরেক দিন তোমাকে আমার মেসোমশায় আর মাসিমার কাহিনী শোনাব ।'

'তোমার আপন মাসিমা ?'

'না । আমাদের প্রতিবেশিনী ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী । আমার পড়ার খরচ তো আগে তিনিই দিতেন । বৃত্তি পেতে আরম্ভ করি ম্যাট্রিকের পর থেকে । তার পর একদিন তাঁর সঙ্গে আমার মনান্তর হয়ে যায় । বলব, কেন । আজো বোঝাপড়া হয়নি ।'

রত্না কৌতূহলী হয়েছিল । দুঃখিত হলো । যেখানে সত্যিকার প্রেম সেখানেও মনান্তর ! পরে এক সময় বিদ্যাপতি ওকে তার মাসিমার কাহিনী শোনাল ।

ধনী ও মানী পিতার একমাত্র দুহিতা অলকানন্দা দেশনায়ক বিধুশেখরের প্রেমে পতিগৃহ ত্যাগ করেন । পতি যদিও কৃতী, পুত্র যদিও শিশু । আর বিধুশেখর ? তিনি বিসর্জন দেন তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ । কালি মাখিয়ে দেন তার উচ্চ কুলে । ঘরে ছিলেন তাঁর পতিব্রতা পত্নী, তাঁর সাধের দুলালী । ঘরেই রইলেন তাঁরা । তিনি চললেন বাইরে । বিদেশে । অপরার সঙ্গে । যে দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই দেশ রইল পিছনে পড়ে । বিজেতার বুটের তলায় অসহায় অসাড় । তখনো গান্ধী আসেননি ।

অর্থের অসদ্ভাব ছিল না । ইচ্ছা করলে আজীবন বিদেশেই বসবাস করতে পারতেন । হয়তো ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহিতও হতে পারতেন । কিন্তু তেমন ইচ্ছা শেখরবাবু বা অলকাদেবী দু'জনের কারো ছিল না । বছর কয়েক বাদে দেশে ফিরে এসে তাঁরা প্রথমে ঘর বাঁধলেন হিমালয়ের কুলু উপত্যকায় । তার পর এক পা এক পা করে পিছু হটতে হটতে পৌঁছে গেলেন শেখরবাবুর নিজের শহরে । কিন্তু নিজের মঞ্জিলে নয় । সেটা দুয়োরানীর দখলে। সুয়োরানীর জন্যে তখন অন্য ভবন গড়া হলো । সেখানে শেখরবাবুরও অবস্থান । দুয়োরানীর সঙ্গে তাঁর সংস্রব রইল না ।

শেখরবাবু মনে করেছিলেন তাঁর জন্যে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা করছে । বিদেশে তিনি এক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি । ভারতের জন্যে আন্দোলন চালিয়েছেন । পার্লামেন্টে বার বার ভারতপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়েছেন । স্বাধীনতা অর্জনের আইরিশ পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন । নতুন একটা প্রোগ্রাম নিয়ে তিনি নামতে চাইলেন রাজনীতিতে, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীরা কেউ দেখা দিলেন না । দেখা করতে চাইলে ধরাছোঁয়া দিলেন না । তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে পাবলিক লাইফ থেকে তাঁর নাম মুছে গেছে । তার পর সামাজিক জীবনে যোগ দিতে গিয়ে তাঁর শিক্ষা হলো যে বহুগামী দুশ্চরিত্রদেরও সেখানে মান আছে, অথচ স্থান নেই শুধু তাঁর । তাঁর অপরাধ তিনি সমাজের মর্মস্থলে আঘাত হেনেছেন । বেশ্যা হলে কথা ছিল না । সে তো কারো সম্পত্তি নয় । নিম্ন শ্রেণীর রক্ষিতা হলেও কথা উঠত না । নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টি তো উচ্চ শ্রেণীর সেবার জন্যে । কিন্তু এ যে অভিজাত বংশের কুলবধূ ! স্বামীর সম্পত্তি । সমাজ ক্ষমা করতে পারে না । ক্ষমা করলে কারো সম্পত্তি নিরাপদ নয় । তাঁর কাছে তবু দু'চার জন পুরাতন

বন্ধু কালেভদ্রে আসেন। মাসিমার কাছে কেউ কোনো দিন আসে না। তিনি যে কলঙ্কিনী কুলটা! মহিলারা তাঁর কাছে এলে মহিলামহলে মুখ দেখাবেন কী করে।

পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে তাঁদের তো কেউ ভুলেও ডাকে না। অথচ টাকার জন্যে পায়ে ধরতেও বাধে না। প্রাপ্যের অধিক পায়। তবু ক্ষমা নেই। কী করলে যে আপনার লোকের মন পাওয়া যাবে এ হলো তাঁদের দৈনন্দিন ভাবনা। বারো বছরেও তাঁরা তপস্যার ফল পেলেন না। অযোধ্যার লোকের মতো এদেরও সেই একই দাবী। অলকাদেবীকে ত্যাগ করতে হবে। শেখরবাবুই অজস্র ব্যয় করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। যদিও পছন্দটা তাঁর নয়, মেয়ের মায়ের। তবু কারো মন ভিজল না। মেয়ে আপনার হলো না। আরো পর হলো। মেয়ের মা তো পরের চেয়েও পর। যদিও পরকীয়া নন। ওদিকে অলকাদেবীর স্বামী আবার বিয়ে করেছিলেন। ছেলে নতুন মাকে পেয়ে পুরোনো মাকে ভুলেছিল। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে তার মা নেই, মারা যান তার শিশুবয়সে। একটু একটু করে শেখরবাবু ও অলকাদেবীর মনে দাগ কাটল যে এ সংসারে তাঁরা ভিন্ন তাঁদের আর কেউ নেই। আর যারা আছে তারা টাকা আছে বলেই আছে। টাকা যদি পরে না থাকে তারাও কেউ থাকবে না। থাকবে হয়তো গুটি কয়েক বাল্যবন্ধু। আর কর্তার আমলের ভৃত্য।

অনায়াসেই কলকাতায় বাস তুলে নেওয়া যায়। সেখানেও তাঁদের বাড়ী আছে। কিন্তু সেটা হতো পরাজয়। তেমনি অতি সহজেই মুসলমান হয়ে তালাক নিয়ে নিকা করা যায়। কিন্তু সেটা হতো আরো বড় পরাজয়। প্রেমের নিয়ম মেনে তাঁরা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন তবে সেটা সত্যাগ্রহীদের মতো আইন লঙ্ঘন। তার জন্যে দণ্ডবিধি যদি সাজা দেয় তবে সাজা ভোগ করাই কর্তব্য। দীর্ঘকাল পরে সমাজ একদিন উপলব্ধি করবে যে সত্যাগ্রহীর কাছে যেমন বিবেকের দাবী প্রেমিকপ্রেমিকার কাছে তেমনি প্রেমের দাবী। সে দাবী এমন দাবী যে তাকে উপেক্ষা করে রাজার দাবী বা সমাজের দাবী মেনে নেওয়া ভালো নয়। প্রেমে না পড়লে তাঁরাও আর দশ জনের মতো সমাজের অনুগত প্রজা হতেন। প্রেম যখন এসেছে তখন প্রেমের জন্যে সমাজের হাতে মার খেতে হবে। লাগবেই তো। না লাগলে প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হয় না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তাঁদের কিছু অর্থসামর্থ্য আছে। নইলে মারটা আরো বেশী লাগত। কিন্তু এই বা ক'দিন! লক্ষ্মী চিরদিন চঞ্চলা।

এ অবস্থায় আর কেউ হলে প্রাণপণে ধনসঞ্চয় করত। তাঁদের কিন্তু উলটো বিচার। গরিবের ছেলে গরিবের মেয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করছে দেখলেই তাঁরা জলপানি দেন। বহু ছাত্রছাত্রী তাঁদের সাহায্যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। তার পরে যারা কলেজে পড়তে চেয়েছে তাদের বেলা কিন্তু একটা অলিখিত শর্ত। মুখ ফুটে কাউকে কোনো দিন বলেন না, কিন্তু কথায় বার্তায় কৌশলে জেনে নেন কার চোখে প্রেমের দাবী বড়, কার চোখে সমাজের দাবী। ষোলো বছর বয়সেও যাদের চোখ ফুটল না তাদের উচ্চাভিলাষ থাকে তো তারা নিজেরাই খেটেখুটে খরচার টাকা তুলবে। আর যাদের জ্ঞানোদয় হয়েছে তাদের কলেজে পড়ার ভার তাঁরা বইবেন। তাঁদের মানসপুত্র মানসীকন্যা তারা কয়েক জন।

হলোই বা তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় । ছেলেমেয়ে কি মানুষের রাশি রাশি হয় !

বিদ্যাপতি তাঁদের ঘরের ছেলের মতো । ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের সঙ্গে ভাব । তার গুরুজন তাকে বারণ করেছিলেন ও বাড়ীতে যেতে । গেলে লোকে কী মনে করবে ! কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তরে লোকনিন্দার কারণটা বলেননি । সেইজন্যে সে মানা মানেনি । বড় হয়ে সে নিজেই আবিষ্কার করল । মাসিমা আরেক জনের স্ত্রী । মেসোমশায় আরেক জনের স্বামী । তখন সে লজ্জায় মরে যায় । তাঁদের বাড়ী আর পা দেয় না । তার পর সে এই বলে আপনাকে বুঝ দেয় যে তাঁরা যখন স্বামীস্ত্রী নন তখন স্বামীস্ত্রীর মতো বাস করেন না নিশ্চয় । তার ধারণা তাঁরা অসিধার ব্রত পালন করেন । লক্ষ্মণ ও উর্মিলা যেমন । আরো বড় হয়ে সে তার সহপাঠীদের হাসি মশকরা সইতে পারল না । বাজি রাখল । মাসিমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে ও কথা জানাল । তিনি ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন । অনেকক্ষণ নিরুত্তর থেকে তারপর বললেন, 'বাচ্চু, তুমি হেরে গেলে ।' এই বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন । বিদ্যাপতিও কেঁদে আকুল । তার বুক ভেঙে গেল।

মাসিমা সেদিন তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন । বললেন, 'চুম্বক আর লোহা । দুই পরিবারের লোক কত চেষ্টা করল ছাড়াতে । আমরাও কিছু কম চেষ্টা করিনি । কেন দুঃখ দেওয়া নিরীহ শিশুকে, নিরপরাধ স্বামীকে ! পতিব্রতা সহধর্মিণীকে, পিতৃমুখী কন্যাকে! অগণিত আত্মীয় স্বজনকে ! গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে ! কিন্তু কী করব, যে শক্তি আমাদের টানছিল সে যে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বলবান । তাদের চেয়েও । সে যে আমাদের আলাদা হয়ে থাকতে দেবে না । বাঁচতে দেবে না । যখন নিশ্চিত জানলুম যে বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত একসঙ্গে থাকা তখন বিপরীত চেষ্টা ছেড়ে দিলুম । এ কি কখনো হতে পারে যে তিনি থাকবেন অথচ আমি তাঁর কাছে থাকব না ? বা আমি থাকব, অথচ তিনি আমার কাছে থাকবেন না ? এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর । এক অক্ষরে । 'না ।' আপনাকে সঁপে দিলুম তাঁরই হাতে যিনি আমার সব চেয়ে আপন । তিনিও তাই করলেন । জ্ঞানত আমি কাউকে পরিত্যাগ করিনি, তিনিও করেননি পরিত্যাগ । একজনকে বরণ করলে যে আর সবাইকে বর্জন করতে হয় এটা আমাদের কথা নয় । এটা তাঁদেরই কথা । সংসারের রীতি এই, তা কি তখন অত স্পষ্ট করে জানতুম । এত দিনে জেনেছি । কিন্তু মানিনে ।'

তার পর তিনি আরো বললেন, 'বিদেশে গিয়েও বিবাহের কোনো ভদ্র উপায় পাইনি । কুলু উপত্যকায় সংসার পেতেও প্রাক্তনের মায়া কাটাতে পারিনি । প্রিয়জনের আকর্ষণে ধীরে ধীরে ফিরে এসেছি । এখানে । ধীরে ধীরে সমাজের সহানুভূতি অর্জন করতে চেয়েছি। আমরা জানতুম না যে আমাদের কপালে রয়েছে ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যান । তা বলে এত দূর ! আর এত কাল ধরে ! এর যেন অন্ত নেই এ জীবনে । ওঁরই দুঃখ বেশী । নিজ বাসভূমে পরবাসী উনি । কত লোকের পূজা পেয়েছিলেন । পূজার পরেই বিসর্জন আর নদীর জলে নিমজ্জন ! কীই বা ওঁর অপরাধ ! ভালোবাসা কি পাপ !'

বিদ্যাপতি নিবেদন করল, 'না, ভালোবাসা পাপ নয় । কিন্তু অসিধার লঙ্ঘন করা তো ভালোবাসার পর্যায়ে পড়ে না । মহাত্মাজী কি কস্তুরবাকে কম ভালোবাসেন ? ববং

আরো বেশী ভালোবাসতে পারছেন সেই ব্রত নেবার পর থেকে ।'

তিনি কিছু ক্ষণ মৌন থাকলেন । তার পর নত মুখে বললেন, 'অসিধার ব্রত নিলে তার অর্থ এই হতো যে ওঁকে আমি পতির অধিকার দিতে কুণ্ঠিত । আত্মসমর্পণে সঙ্কুচিত আর উনি আমাকে অপরের প্রতি একনিষ্ঠ ভাবতেন । পরকীয়া ভাবতেন । প্রেমের যেটা চরম পরীক্ষা সেটাতে আমি অনুত্তীর্ণ হতুম । প্রেম যখন দেয় তখন সর্বস্ব দেয় হাতে রেখে দেয় না । কার জন্যে হাতে রাখবে ? দ্বিতীয় কেউ থাকলে তো? আমার যদি দ্বিতীয় কেউ থাকে তবে ওঁরও যে দ্বিতীয় কেউ থাকবে । সেটা তো আমার ইচ্ছা নয় ! সেটা প্রেমের নিয়মও নয় । এ খেলায় শুধু একজন একজনের পার্টনার। অসিধার অসাধ্য বলে নয়, অসিধার অসঙ্গত বলে ভঙ্গ করেছি । তা বলে আমরা উচ্ছৃঙ্খল নই, বাচ্চু । প্রেমের ডিসিপ্লিন বিবাহের ডিসিপ্লিনের চেয়েও কড়া । বিবাহে অসংযত হলে বিবাহ ভেঙে যায় না, কিন্তু প্রেমে অসংযত হলে প্রেম চলে যায় । সেইজন্যে বেশী ধরা দিতে নেই । এর পরেও কি তুমি মনে করবে যে আমরা পাপী আর পাপীয়সী? আমার তো বিশ্বাস উনিও একজন মহাত্মা । যদিও লোকের বিশ্বাস অন্যরূপ । লোকমতের রায় কি কোনো দিন বদলাবে না ? আমরা অপেক্ষা করব ।'

বিদ্যাপতির মন মানল না । তিন বছর কেটে গেছে । এখনো সে বিকার বোধ করে এই জন্যে যে, যারা বিবাহিত নয় তারা ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী নয় । যারা ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী নয় তারা জনকজননী নয় । কিন্তু যতবার তাঁদের ওখানে যায় ততবার লক্ষ করে অবাক হয় যে তাঁরা যেন নতুন করে প্রেমে পড়েছেন । যেন নববিবাহিত দম্পতি । গান্ধী-গান্ধীজায়ার সমবয়সী, অথচ তাঁদের তুলনায় যুবক যুবতী । যৌবন যেন তাঁদের ছাড়তে চায় না । দূর থেকে এত যে বিকার ও বিরাগ কাছে গেলে তা এক মুহূর্তে জল হয়ে যায় । দণ্ড দিতে আসে, কিন্তু হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে । ভেবে পায় না কোথায় তাঁদের দোষ । কত মহৎ তাঁরা ! কত নম্র ! কেমন ভাস্বর ! কেমন চরিত্রপূর্ণ ! ব্যক্তিত্বময় ! মর্যাদাবান ! তাঁদের নিন্দুকদের চেয়ে তারা কত উচ্চ ! কত উন্নত ! বিদ্যাপতি তাঁদের চেয়ে ভালো কাকেই বা দেখেছে তার শহরে ! তাঁদের চেয়ে ভালোবাসতে কাকেই বা দেখেছে স্বচক্ষে ! মামুলী ভালো আর মামুলী ভালোবাসা দেখে কি তৃপ্তি হয় ! তাই তো সে তাঁদের ওখানে যায় । কিন্তু সমর্থন করতে অক্ষম বোধ করে । লোকে যখন তাকে চেপে ধরে সে তাঁদের পক্ষ নেয়, কিন্তু তর্কে হেরে যায়।

এই তিন বছরে সে বিভিন্ন দিক থেকে ভেবেছে, কিন্তু তথ্যের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে তথ্য মেলাতে পারেনি । একবার ভাবে মাসিমা হচ্ছেন মোহিনী নারী, জননী নারী নন । তার পর লক্ষ করে পরের সন্তানের প্রতি কী অপরিমেয় স্নেহ ! ছোট ছেলের অসুখ হয়েছে শুনলে তিনি নিজের ডাক্তার পাঠিয়ে দেন, ফল কিনে দেন, পথ্য কিনে দেন, ওষুধ কিনে দেন । যেখানে তাঁর যেতে বাধা নেই সেখানে নিজে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেন । বিনা বেতনের নার্স হয়ে তাঁর কী তৎপরতা ! দুঃখ হয় এরকম এফিসিয়েন্ট মহিলা সমাজের কোনো কাজে লাগলেন না । বিদ্যাপতির দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একাই একটা হাসপাতাল চালাতে পারতেন । তাঁর বাড়ীতেও রুগণ শিশুরা গিয়ে জোটে।

কাছে রেখে চিকিৎসা করান। মেসোমশায় বিরক্ত না হলে বাড়ীতেই হাসপাতাল বসত। তিনি বলেন, 'তোমার ওটা একটা দুর্বলতা, অলকা। কেউ একবার 'মা' বলে ডাকলে তুমি অমনি গলে জল হয়ে যাও। যতই কর, যতই দাও, ভবী ভুলবে না। সামনে বলবে, 'মা—।' পিছনে বলবে, 'মাগী।' তার চেয়ে চল, কলকাতা যাই। সেখানকার লোক এদের মতো অযোধ্যার লোক নয়।' তার উত্তরে মাসিমা বলেন, 'এরা যে আমার শ্বশুরবাড়ীর লোক। এদের কি আমি ছেড়ে যেতে পারি!'

রত্না এ কাহিনী শুনে বিচলিত হয়েছিল। এ যেন তারই উপাখ্যান। তার ও গৌরীর। বাদসাদ দিয়ে। জোড়াতালি দিয়ে।

'ভাই বাচ্চু, তোমাকে বাচ্চু বলছি, কিছু মনে কোরো না। কিন্তু তোমার ওই অনমনীয় মনোভাব আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আমাকে বল কোনখানে তোমার বাধছে।'

বিদ্যাপতি চিন্তা করে বলল, 'প্রেমহীন বিবাহ বা বিবাহহীন প্রেম কোনোটাই আদর্শ নয়। একটা যদি হয় তপ্ত কটাহ তো আরেকটা হচ্ছে জ্বলন্ত উনুন। দুটোকেই এড়াতে হবে। ওঁদের উচিত ছিল আজীবন অপেক্ষা করা। ইতিমধ্যে অন্যের সঙ্গে সংসার না করা। এমন করে সমাজকে ফাঁকি দেওয়া প্রকৃতিকে ফাঁকি দেওয়া কি ভালো?'

রত্না ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'জীবনকে ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে ভালো।'

বিদ্যাপতি মাথা নাড়ল। বলল, 'সত্যিকার ভালোবাসাকেও নীতির আমলে আসতে হবে। ওটা নীতির ঊর্ধ্বে নয়। কিংবা নীতির বাইরে নয়।'

'কেন, নীতি লঙ্ঘিত হলো কোনখানে? প্রেমহীন বিবাহ নাকচ হলে পুনর্বিবাহ করে এঁরাই তো হতেন আদর্শ দম্পতী। তখন হয়তো জনকজননীও হতেন। এখন হলে সন্তানকে হেয় হয়ে থাকতে হয়। সে বেচারাকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় হবে। প্রেমহীন বিবাহ যে নাকচ হবার নয় সেটা কি এঁদের দোষ? পুনর্বিবাহের যে কোনো ভদ্র উপায় নেই সে দোষটাও কি এঁদের? প্রেমের অস্তিত্ব যদি মানো, প্রেমের মূল্য যদি স্বীকার করো, তা হলে বাকীটুকু বুঝতে কেন তোমার এত সময় লাগছে? একেবারে ধরা না দিলে কি প্রেম থাকে? তা বলে সন্তান!' রত্না রঙীন হয়ে শিউরে উঠল।

'তা বলে বিবাহিত না হয়েও বিবাহিতের অধিকার ভোগ করা সুনীতি হতে পারে না। আর ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিফল আছে। ক্রিয়া করবে, আর প্রতিফল এড়াবে, এ কেমনতর সুনীতি? ভাই রত্না, বিবাহ যে হয়নি এর জন্যে আমি তাঁদের দোষ ধরিনে। একসঙ্গে থাকেন যে, এটাও আমার সয়ে গেছে। কিন্তু অসিধার লঙ্ঘন আমার বিচারে নীতির সীমা লঙ্ঘন। ক্ষণিক দুর্বলতা উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস ওটা প্রেমের চরম পরীক্ষা। আমি বলি, আরো একটা পরীক্ষা বাকী থেকে যাচ্ছে যে! প্রেমের চিহ্ন বহন করা। তার দায় নেওয়া। হাঁ, সমাজে হেয় হবে সে। দাগী হয়ে থাকবে। সেটা যদি অন্যায় বলে বুঝে থাক তবে প্রেমের চরম পরীক্ষা দিতে যাও কেন? পুরোদস্তুর তপস্যা করে যাও। লক্ষ্মণ আর ঊর্মিলার মতো কাছাকাছি রয়েছ যে, এই পরম ভাগ্য। পাশাপাশি শুয়েছ যে, এই পরম সুখ।' বিদ্যাপতির আপোসের পরিধি এই পর্যন্ত।

রত্নর মুখখানা সিঁদুরে হয়ে উঠলো । যেন ধরা পড়ে গেছে সে নিজে । কোনো মতে আত্মসমর্পণ করে সে যেন আত্মপক্ষ সমর্থন শুরু করে দিল । 'ভাই বাচ্চু, প্রেমিকপ্রেমিকা যদি বিয়ের মন্ত্র পড়ে তা হলে তো কেউ প্রত্যাশা করে না যে তারা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হবে । অথচ যে প্রেমিকপ্রেমিকা বিবাহিতের মতো একনিষ্ঠ থাকলেও বিয়ের মন্ত্র পড়েনি, পড়ার সুযোগ পায়নি, তাদের কাছে সমাজ দাবী করে সন্ন্যাস । ভাই বিদ্যা, অন্নপ্রাশন উপনয়নের মতো আর একটা সংস্কারকে কি তুমি এতখানি গুরুত্ব দেবে যে নীতির আকাশে তুলে দেবে ? সেই সংস্কারটি যাদের হয়নি তারা আকাশ থেকে পাতালে নামবে ? যেহেতু ওটা রীতি সেহেতু ওটা নীতি ?'

রত্ন সেইখানেই থামল না । ব্যাকুলভাবে মিনতি করল, 'প্রেমিকপ্রেমিকা কেমন করে পরস্পরকে পরিপূর্ণ রূপে জানবে, সম্পূর্ণ রূপে চিনবে, যদি মিলন-মুহূর্তে উপলব্ধি করে যে তারা বিদেহী, তারা অঙ্গহীন ? অমন করে হাত পা বেঁধে রাখার মতো নির্মম কী হতে পারে ? ভাই বিদ্যা, নীতি বলতে কী বুঝব ? পূর্ণতা না অপূর্ণতা ?'

বিদ্যাপতি তথাপি অবুঝ । তার রায় হলো, 'তাদের পক্ষে দূরত্বই ভালো । উর্মিলা থাকবে অযোধ্যায় আর লক্ষ্মণ থাকবে লঙ্কায় ।'

রত্ন বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে লক্ষ্মণ থাকবে অযোধ্যায় আর উর্মিলা থাকবে লঙ্কায়। নারীর জীবন রাহুগ্রস্ত করবে রাক্ষসের ক্ষুধা।'

তার পর তার মনে পড়ে গেল বিদ্যাপতির আপত্তির অবশিষ্ট । তার মুখ জবাফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠল । সে বলল, 'মিলন বলতে বুঝি একটা পরিপূর্ণ অখণ্ড অনুভূতি । সাধকরা আকাঙ্ক্ষা করেন পরমাত্মার সঙ্গে যে মিলন সেও তেমনি পরিপূর্ণ অখণ্ড । নরনারীর মিলনের সঙ্গেই তাঁরা তার উপমা দেন । বৈষ্ণব হলে আপনাকে নারী বলে কল্পনা করেন । পরমাত্মাকে পুরুষ বলে । সাযুজ্যের সাধনা হলো নরনারীভাবের সাধনা । এ সাধনা যখন পূর্ণাঙ্গ হয় তখন আর কোনো ধাপ বাকী থাকে না । এর মধ্যে ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত নেই । এ মিলন আপনাতে আপনি অবসিত । এটা মিলিত সৃষ্টির সোপান নয় । এইটেই পরম । এর পরতর নেই । রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলায় সৃষ্টিরক্ষার নীতি অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক । তাতে রসভঙ্গ হয় ।'

বিদ্যাপতি ঘাড় নাড়ে । তার বক্তব্য হলো, 'মাসিমাকে আমি মায়ের মতো ভালোবাসি । মেসোমশায়কে বাপের মতো ভক্তি করি । মা বাপের বিয়ে হয়নি ভাবতেই আমার বুকের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসে । থাক, ওসব কথা মুখে আনতে নেই । আমারি ভুল হয়েছে । চলি ।'

বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বলল বটে রত্ন উলটো কথা, কিন্তু তার সহজ বোধ তাকে মন্ত্রণা দিচ্ছিল যে প্রেম যতদিন অশরীরী থাকবে ততদিন অনাসক্ত থাকবে । কায়িক সম্পর্ক একবার যদি পাতানো হয় তবে সে বন্ধন আত্মিক বন্ধনেরই মতো অচ্ছেদ্য। সেও তেমনি মিস্টিক । কায়িক বলে কম মিস্টিক নয় । তখন যে পুরুষ পলাতক হতে চায় তার অনার নেই। সে ম্যান অফ অনার নয় । যার বিন্দুমাত্র অনার আছে সে মানুষের দৃষ্টিতে বিবাহিত না হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহিত । সামাজিক বিবাহের

কাটান আছে, গান্ধর্ব বিবাহের কাটান নেই। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভিত্তি এই সত্যের উপর। তাই সে অমর।

রত্নর প্রেম তাকে বন্দী করেছে, কিন্তু এখনো সে কায়িক সম্পর্ক পাতায়নি, যে বন্ধন আত্মিক বন্ধনেরই মতো অচ্ছেদ্য। শেখরবাবুর দৃষ্টান্ত তাকে পরিহার করতে হবে। সে প্যাটার্ন তার জন্যে নয়। তার প্যাটার্ন তাকেই নির্মাণ করতে হবে। সে হতে চায় সব স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে স্বাধীনতম, সব প্রেমিক পুরুষদের মধ্যে প্রেমিকসত্তম। এ সামঞ্জস্য কেমন করে সম্ভব ? এ কি সম্ভব ? হে ঈশ্বর ! হে ঈশ্বর !

শ্রীমতীরত্ন স্বাধীনরত্ন থাকতে পারবে তো ? যদি থাকে, পরিপূর্ণ রত্ন হবে তো ? যদি না থাকে তবে কী হবে ? তবে কী হবে, হে ঈশ্বর ! রত্ন তার অন্তর্যামীর কাছে আশ্বাস পেলো যে সে যা চায় তাই হবে। তার ও গোরীর ভালোবাসা যে সত্যিকার ভালোবাসা তার তাতে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাদের জীবনের সব কিছু রূপান্তরিত হবে, রূপান্তরিত হয়ে পরম সুন্দর হবে। কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ন্যূনতা হবে না, খর্বতা হবে না। রত্ন চিরদিন স্বাধীন নায়ক, গোরী চিরকাল স্বাধীনা নায়িকা। যুক্ত অথচ মুক্ত। মুক্ত অথচ যুক্ত। যুক্তমুক্ত।

রত্ন গোরীকে চিঠি লেখার সময় শেখর অলকার উপাখ্যান বর্ণনা করল। লিখল —

> ভেবে দেখেছি ওঁদের জীবনের প্যাটার্ন আমাদের নয়। আমাদের প্যাটার্ন আমাদেরই রচনা করতে হবে। কেমন করে তা আজ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমরা হব ওঁদের সামনে প্রেমিকপ্রেমিকা, কিন্তু ওঁদের চেয়ে স্বাধীনস্বাধীনা। কোথাও যদি বেরোতে না পারি তবে নিরালা বাড়ীতে চুপচাপ বসে থেকে আমি অকর্মণ্য হয়ে যাব। আর তুমি ! তুমি আসবে এক অন্তঃপুর থেকে আরেক অন্তঃপুরে। যে স্বাধীনতার জন্যে তুমি ছটফট করছ সেই স্বাধীনতার জন্যে আবার ছটফট করবে। কিন্তু প্রেমের বাহুপাশ থেকে মুক্তি আরো কঠিন হবে। বন্দী হয়ে বন্দিনীকে নিয়ে কী করব আমি ! তুমিই বা করবে কী আমাকে নিয়ে ! বিধিবদ্ধ দাম্পত্য জীবন আমাদের জন্যে নয়। আমরা স্বাধীনস্বাধীনা।
>
> আমরা ফ্রী ম্যান, ফ্রী উওম্যান। সেইসঙ্গে প্রেমিকপ্রেমিকা। কান্তকান্তা। সামঞ্জস্য এমন ভাবে হওয়া চাই যাতে প্রেমও থাকে, স্বাধীনতাও থাকে। অথচ কোনোটির চেয়ে কোনোটি খাটো না হয়। নিক্তির ওজনে দুই সমান। প্রেমের জন্যে আর সব দেওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতার জন্যে আর সব দেওয়া যায়, কিন্তু প্রেম দেওয়া যায় না। পারবে এই অসাধ্যসাধনের দায় নিতে ? তবে এস আমরা স্বাধীন প্রেমিক স্বাধীনা প্রেমিকা হই। না পারলে আবার সেই রাখীবন্ধ ভাইবোন। সেটা অসাধ্য নয়। তাতে মনের জোর কম লাগে। আর এতে মাধুর্য আছে।
>
> আমি তার জন্যেও প্রস্তুত, এর জন্যেও প্রস্তুত। তোমাকেই বেছে নিতে হবে কোনটা তোমার পছন্দ। আরো একবার সুযোগ দিচ্ছি, গোরী।

চার

ওদিকে রত্ন সম্বন্ধে গৌরীর জল্পনাকল্পনার বিরাম ছিল না। সে যেন ভেবেই পাচ্ছিল না কী যে করবে রত্নকে নিয়ে। পুতুল নিয়ে যেমন ছোট মেয়েরা হয় দিশাহারা। মা যখন ছিলেন তিনিও তো তার ভবিষ্যৎ নিয়ে পুতুল খেলতেন। মেয়েরা কি সবাই ওইরকম! না রত্ন ওদের হাতের পুতুল হবে বলে জন্মেছে!

গৌরী যেন একটা গল্প বলছে এমনি করে লিখেছিল একজনের কথা। তার নাম রত্নসিংহ। সে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের রণনায়ক। সাম্রাজ্যবাদী পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ বর্বর ইঙ্গদ্বীপের পঙ্গপালদের বিরুদ্ধে মুক্তিসৈন্য পরিচালনাই তার জীবনব্রত। সেই জনসেনাপতি গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুদর্শন সুগঠিত ও বলবান যুবাপুরুষ। তার গতিবিধি হাওয়ার মতো অদৃশ্য, হাওয়ার মতো সর্বত্র। তার ছদ্মবেশ অসংখ্য, ছদ্মনাম অগণ্য। ভুটানে সে কাঠুরিয়া, ভোপালে সে ভিস্তি। সিংহলে সে রিক্সা টানে, তিব্বতে সে পুঁথি ঘাঁটে। কোয়েটায় সে বোরখায় মোড়া বেগম, রাওলপিণ্ডিতে পাগড়িপরা উষ্ট্রচালক। সিপাইদের ছাউনিতে সে জ্যোতিষী, পুলিশের ব্যারাকে শিবপূজার পূজারী। ইংরেজ তাকে হাজার ফাঁদ পেতেও ধরতে পারে না। কেউ ধরিয়ে দিলে তো! ধরা পড়লেও সে পিছলে পালিয়ে যায়। তার মাথার দাম পঁচিশ হাজার রূপেয়া। কিন্তু কারো লোভ নেই ও টাকায়।

জনগণ তাকে ভালোবাসে। জনতার চক্ষে সে সুদর্শনচক্রধারী কৃষ্ণ। দেশের মেয়েরাও তাকে ভালোবাসে। মেয়েদের চোখে সে বংশীধারী কৃষ্ণ। কত মেয়ে যে তাকে মনে মনে কামনা করে। সে কিন্তু তাদের কাউকেই কামনা করে না। এ যুগের কৃষ্ণ বহুবল্লভ নয়। তার একমাত্র কামনা কে, জানো? যার নাম জ্যোৎস্না-গৌরী। জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র যার রূপ। পুলকিত যার সঙ্গ। যে তার পথ চেয়ে বাতায়নের ধারে বসে থাকে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। গুপ্ত বার্তাবহ মধ্যে মধ্যে চিরকুট দিয়ে যায়। ঘামে ভেজা। রক্ত মাখা। অদৃশ্য কালি দিয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। প্রিয়ে, ধৈর্য ধর। আমি আসছি। জয় আমাদের অদূরে।

জ্যোৎস্না-গৌরী কতকাল ধৈর্য ধরবে! তারও তো সাধ যায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে আহবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার গৌরব অর্জন করতে। ঝাঁসীর রাণীর মতো নগ্ন কৃপাণ হাতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে লড়তে। লড়তে লড়তে রত্নসিংহের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। দু'জনে দুই ঘোড়ায় চড়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে। কামান ডান দিকে। কামান বাঁ দিকে। কামান সামনের দিকে। বন বন করে ছুটে আসছে গোলা। আওয়াজ করে ফাটছে। রত্ন-গৌরীর ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা সম্মোহিতের মতো টগবগিয়ে চলেছে। কী করে যে বেঁচে আছে! মরে যদি একসঙ্গে মরবে। মুখে মুখ রেখে।

যদি বাঁচে তা হলে তাদের মতো সুখী কে? তারা সারা দেশের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে মালার মতো পরবে। সেই মালা হবে তাদের বরণমালা। সমাজ বলবে, হাঁ, এদের মিলন হওয়া উচিত। এদের মিলনে অযুত সম্ভাবনা। কিন্তু জ্যোৎস্না-গৌরী

যে অন্যপূর্বা । তাই নাকি ? তা হলে তো আইন পালটাতে হয় । নইলে অমন সুন্দর দুটি জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে । সমাজ তখন আপনি উদ্যোগী হয়ে আইন বদলে দেবে । না দেয় তো রত্ন-গোরী সমাজবিপ্লব আনবে ।

রত্নর হাসিও পায়, ব্যথাও লাগে গোরীর কল্পনার দৌড় দেখে । বেচারি গোরী ! যার ঘর থেকে আঙিনা বিদেশ সে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে বেড়াবে । বেচারা রত্ন ! তাকে রত্নসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে । একটু শক্ত বই-কি । আর ওই যে শিবলিঙ্গের পূজারী হওয়া ওটাও তার মতো কালাপাহাড়ের পক্ষে বিসদৃশ । গোরী কি ভুলে গেল যে রত্ন একজন প্রতিমাভঙ্গকারী ? সর্বপ্রকার প্রতিমাভঙ্গই তার জীবনব্রত । কিন্তু কেবল ভাঙার কাজেই তার জীবন নিঃশেষিত হবে না । সে গড়তে চায় বলেই ভাঙতে চায় । গড়বে সৌন্দর্যলোক । প্রতি দিন সে তার ধ্যান করছে। ধ্যান এখনো রূপ নেয়নি । কবে নেবে তাও তার অজানা । অত সহজ নয় গড়া । কেই বা বুঝবে তার বেদনা !

যে যাকে ভালোবাসে সে তার ভালো করতে চায় । যাতে গোরীর ভালো হয় তাই করতে হবে রত্নকে । সে বার বার চিন্তা করে দেখে শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো প্রোপ্রাইটরের চিত্তপরিবর্তন । যাতে তিনি প্রোপ্রাইটরশিপ ত্যাগ করেন । তাঁর চিত্তপরিবর্তন হলে তিনি ওকে স্বেচ্ছায় নিষ্কৃতি দেবেন । ওর স্বাধীনতার অন্তরায় হবেন না । কিন্তু এ পরিবর্তন সাধন করবে কে ? গোরী স্বয়ং, না আর কেউ ? এর জন্যে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে । তার চেয়ে বড় কথা চিত্তশুদ্ধি । অত্যাচারীর প্রতি অবৈর । গোরী যে ঘৃণায় জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছে ।

রত্ন ওকে বোঝাতে যত্নবান হয় মানুষ যদিও শ্বাপদের মতো হিংস্র হতে পারে তবু তার পক্ষে হিংসা বর্জন করাও স্বাভাবিক । সে যেমন নেমে যেতে পারে তেমনি ঊর্ধ্বে উঠতেও পারে । ওঠানামা সমস্তক্ষণ চলছে । মানুষ সম্বন্ধে শেষ কথা কেউ বলতে পারে না । রত্নাকরও বাল্মীকি হয়ে ওঠে । সুতরাং অন্তঃপরিবর্তন এমন কিছু অসাধ্য নয় । আত্মসমর্পণ না করেও অন্তঃপরিবর্তন সাধন করা যায় । রত্ন লেখে—

জ্যোৎস্না-গোরী, তোমার মুক্তির প্রশ্ন রত্নসিংহের কল্পনায় উত্তর খুঁজছে। কিন্তু যাকে তুমি ভালোবেসেছ সে রত্নসিংহ নয় । হবেও না কোনো দিন । তার মধ্যে যদি সত্যিকার বীরত্ব থাকে তবে তা রত্নসিংহের ধারা না ধরে অন্য কোনো ধারায় আত্মপ্রকাশ করবে । বীরত্বের কী একটি মাত্র ধারা ! সে যে শতধারা । মুক্ত স্বাধীন মানবাত্মা কি বীরত্বের উৎসমুখ নয় ? সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কি কেউ চিরদিন মুক্ত স্বাধীন মানবাত্মা হতে পারে?

গোরী, আমিও সংগ্রামশীল । আমি হব সব স্বাধীন মানবের মধ্যে স্বাধীনতম মানব । সেই সঙ্গে সব প্রেমিক মানবের মধ্যে প্রেমিকসত্তম । 'মানব' বলেছি। 'পুরুষ'ও বলব । যে পুরুষ মধুর রসের উপাসক । আমি মধুরের মাধুর্যের আস্বাদন পাব । আপন মাধুর্যের আস্বাদন দেব । মধুর যিনি তিনি নারী রূপে এসেছেন । গোরী রূপে । গোরী, তুমি হবে স্বাধীনা নারী । ইতিহাসে স্বাধীনা নারীর নজীর

বেশী নেই । স্বাধীনা প্রেমিকা তো ইতিহাসে অপূর্ব । এত দিন আমি তার ধ্যান করে এসেছি । ধ্যান আমার মূর্তি নেয়নি । এইবার নেবে । তুমি হবে সেই মূর্তি। প্রেমবতী স্বাধীনা নায়িকা ।

একসঙ্গে আমরা থাকব না । দু'জনের দুই স্বতন্ত্র কক্ষ । যেমন পৃথিবীর আর সূর্যের । মাঝে মাঝে আমরা মিলিত হব । যেমন চুম্বক আর লোহা । পরস্পরকে আকর্ষণ করা সর্বক্ষণ চলবে । কিন্তু মিলনকে সুলভ বা সুদীর্ঘ করা চলবে না । যেই মনে হবে আমরা পুরোনো হয়ে যাচ্ছি অমনি বিরহের ঋতু আসবে। কোনো মতেই আমরা বাসি হতে দেব না আমাদের ভালোবাসার মালাকে । শুকিয়ে যেতে দেব না । সেইজন্যে দূরে দূরে থাকব । সরে সরে যাব । যখন মিলব তখনো প্রাণভরে মিলব না, অতৃপ্তি রেখে দেব পরের বারের জন্যে । অপূর্ণতার জ্বালা নিববে না । নিবলে তো সব ফুরিয়ে গেল ।

দিনে দিনে আমরা বিকশিত হতে থাকব । আমাদের সব কিছু রূপান্তরিত হতে থাকবে । একটা বিকাশের ভাব, রূপান্তরের ভাব, তোমার মধ্যে পাব আমি, আমার মধ্যে পাবে তুমি। একটা অদৃশ্য প্রভাব পড়বে তোমার উপর আমার, আমার উপর তোমার । শেষপর্যন্ত তুমি তুমিই থাকবে, আমি আমিই থাকব, কিন্তু তুমি হয়ে যাবে রত্নশ্রীমতী আর আমি হয়ে যাব শ্রীমতীরত্ন । হয়ে যাব কেন বলছি ? হয়ে রয়েছি । আরো হব । তুমি আমি । আমি তুমি ।

কিন্তু, জ্যোৎস্না-গোরী, আমার মনে ছোট একটি অভিমান আছে। তুমি কি আমাকে ভালোবাস, না তোমার কল্পনার রত্নসিংহকে ? যে আমি নয় তাকে ? শেষকালে এই থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায় । পড়েছ তো, অর্জুন যাকে ভালোবেসেছিল সে প্রকৃত চিত্রাঙ্গদা নয়, সে চিত্রাঙ্গদার চিত্রপ্রতিমা । সে চিত্রাঙ্গদার সাময়িক ছদ্মবেশিনী । তাই বছর ঘুরতে না ঘুরতে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। চিরকালের মতো । প্রকৃতি তোমাকে রূপবতী করেছে । তোমাকে চিত্রাঙ্গদার অনুসরণ করতে হবে না । কিন্তু আমি যদি রত্নসিংহ সাজি তা হলে আমিই হব চিত্রাঙ্গদার অনুসারক। বর্ষসুখের বিনিময়ে চিরকালের মতো প্রিয়সঙ্গ হারাব । না, আমি কখনো চিত্রাঙ্গদার মতো ধার করা রূপ ধারণ করব না ।

যে রূপ আমার আপনার তা হয়তো সুরূপ নয়, তবু তাই নিয়ে আমি তোমার সুমুখে দাঁড়াব । তোমার হয়তো মনে ধরবে না । তুমি ভাববে, এই কি আমার স্বপ্নের রাজপুত্র । নয়, নয় । স্বপ্নের সঙ্গে মিলছে না বলে নিরাশ হবে । যদিও মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে তুমি দুঃখিত । পাছে আমার মনে দুঃখ হয় । যা অনুক্ত থাকবে তাই একদিন অনর্থ ঘটাবে । রত্নসিংহ যার কামনা রত্নকান্ত তার কামনাপূরণ নয় । কোনো দিন কি হবে ।

গোরী এর উত্তরে লিখল, 'এমন পাগল ছেলে আমি দেখিনি । তুমি রত্নসিংহ নও বলে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে এ কথা ভাবতে পারলে তুমি ! ওগো

তুমি কি আমাকে আজো চিনলে না। চিনলে না তোমার প্রেমাধীনা প্রেমভিখারিণীকে! দেখছি তুমি রত্নসিংহকে হিংসা কর। ও যেন তোমার সতীন। ভালো রে ভালো! এখন থেকেই এই অভিমান! তোমাকে যে আমি এক শো নামে ডাকি, এক শো রূপে ধ্যান করি এর মানে কি তোমার এক শো সতীন! ওগো তোমার কানে কানে নিলাজের মতো স্বীকার করছি যে রত্নকান্তই আমার কামনা। আর কেউ আমার কামনাপূরণ নয়। তোমার রূপ নেই, বললেই বিশ্বাস করব! তোমার রূপ আছে গো আছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে। ওখানে ওরা তোমাকে খেতে না দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে বলে তোমার অমন ছিরি হয়েছে। ওটা সাময়িক। ওটাও এক রকম ছদ্মরূপ।'

গৌরীর চিঠিতে আরো অনেক কথা ছিল। রত্ন পড়তে লাগল—

না, অলকা দেবীর মতো আমি এক অন্তঃপুর থেকে আরেক অন্তঃপুরে যাব না। ওঁরা বিগত যুগের নায়কনায়িকা। আমরা আগত যুগের। তোমার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনা বেশ খাপ খায়। আমি একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেলে সহজে বাঁধা পড়ছিনে। তুমি বরাবরই স্বাধীন। তাই বাঁধা পড়তে ভয় পাও। আর আমি বরাবরই বাঁধা। তাই একবার ছাড়া পেলে আর বাঁধা পড়ার কাছ দিয়েও যাচ্ছিনে। তোমার যা ইচ্ছা আমারও সেই ইচ্ছা। আমরা যে যার স্বতন্ত্র পথে চলব। আর মাঝে মাঝে মিলব। হঠাৎ একদিন আমি গিয়ে তোমার ওখানে হাজির হব। রাতটা থাকব। তার পর সাত আট মাস দেখা নেই। তেমনি তুমিও বিনা খবরে আমার আস্তানায় এসে উপস্থিত হবে। দু'তিন দিন থাকবে। তোমাকে আমি পুলিশের নেকনজর থেকে বাঁচাব। কোথাও এক জায়গায় লুকিয়ে রাখব। হয়তো সত্যি মাটির নিচে।

আন্দাজ করতে পেরেছ নিশ্চয় যে আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্যেই আমার নিজের স্বাধীনতা নিয়োগ করব। দেশ স্বাধীন না হলে আমি কেশ বাঁধব না। পাঞ্চালীর মতো আমার মুক্ত বেণী। বেণীসংহার হবে না যতদিন ভারত স্বাধীন না হয়। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম চলবে আর আমি তাতে অংশ নেব না, এ কি কখনো সম্ভব! আমাকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম চলবে আর আমি শুধু সাক্ষীগোপালের মতো দেখব, এ কি কখনো হতে পারে! ইতিহাস রচিত হবে আর আমার নাম থাকবে না, এ কি কখনো সইতে পারি! মনে মনে চেয়েছিলুম যে তুমিও আমার সঙ্গে ঝাঁপ দাও, পাশাপাশি সাঁতার কাট, একসঙ্গে জল থেকে ওঠ, হাতে হাত রাখ, কিন্তু স্বদেশের সংগ্রামে তোমার রুচি নেই দেখে তোমাকে আমি ইতিহাসের ভূমিকা থেকে অব্যাহতি দিলুম। তুমি স্বতন্ত্র সৈনিক। তুমি আমার একার সৈনিক।

আমার জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে তোমার আবির্ভাব। প্রথমটা মনে হয়েছিল আকস্মিক। এত দিনে প্রতীতি হয়েছে, তা নয়। তুমি যদি না আসতে আমি

কোন অতলে তলিয়ে যেতুম । কুমীরে আমার পা ধরে টানতে টানতে আমাকে গহীন জলে নামাত । তুমি আমার হাত ধরে আমাকে ডাঙার উপর টেনে রাখছ । কুমীরের টান প্রতিহত করছে তোমার টান । তাই তো আমি এখনো ডুবিনি। বাবুল, তোমার জন্যেই এখনো আমি মাথা তুলে রয়েছি । আমার মাথার উপরে এখনো ভগবানের আকাশ । আমার হাত ছেড়ে দিয়ো না, বাবুল । চেপে ধর । জোরে চেপে ধর । আরো জোরে চেপে ধর । হাঁ, তোমার গায়ে জোর আছে। সে জোর তোমার প্রেমের জোর । ওগো, তুমি না থাকলে আমার অবতরণ হতো । তুমি আছো বলেই উত্তরণ । তুমি এত ভালো। তুমি কী করে জানবে জগতে কত মন্দ আছে ! আমিও কি জানতুম ! ওঃ ! এই পাঁচ বছরে আমি কী না দেখলুম ! আমি যে দেখতে দেখতে বুড়ী হয়ে গেলুম ! কুড়িতে বুড়ী ! আমার বন্ধুরা আমাকে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয় । তাই তো এখনো বেঁচে আছি । নইলে কবে আত্মঘাতী হয়ে পুড়ে জুড়িয়ে যেতুম । তা হলেই এ জ্বালা জুড়োত ।

কোথায় কোন বেগমপুরে বসে চিঠি লিখছে গোরী । তার জ্বালার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে তিন শো মাইল দূর থেকেও । প্রেমের জল পড়ে আগুনের তেজ না হয় কমেছে, কিন্তু ইন্ধন তো অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে সমানে । আর সেই অঙ্গার থেকে ঝাজ উঠছে । জল তত দূর পৌঁছয় না । আর প্রেম কি কেবলি জল ! প্রেম যে আগুনও । আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায় কি ? গোরীর চিঠিতে তার কোনো লক্ষণ নেই । সে জ্বলছে। সমানে জ্বলছে ।

রত্ন পড়তে লাগল । গোরী আরো লিখেছে—

এটা তো জ্বলন্ত সত্য যে ইংরেজ আমাদের বুকে হাঁটিয়েছে। দেশসুদ্ধ মানুষের মাথা হেঁট করে দিয়েছে । সে মাথা যত বড় মাথা হোক না কেন মানুষের মাথা নয় । পোষা কুকুরের মাথা । পরাধীনতা মানুষকে চরিত্রভ্রষ্ট করে । তাকে দেয় কুকুরের স্বভাব । দেশসুদ্ধ লোক যেমন নীচ স্বার্থপর কুঁদুলে খোসামুদে ভণ্ড হয়ে গেছে ইংরেজের শাসনে, তেমনি অন্তঃপুরের নারীও হয়েছে পুরুষের শাসনে । স্বামী নামক ইংরেজটিকে সুখী করা ভিন্ন নারী জীবনের আর কোনো সার্থকতা নেই । অবিকল পোষা কুকুরের মনোবৃত্তি। একটি পোষা কুকুরের জায়গায় দুটি হলে প্রভুকে কে কত বেশী সুখী করবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা বেধে যায় । সে-ই তত বেশী সফল যে যত বেশী নীচ । সুধা ঠিক পোষা কুকুর নয়, সেইজন্যে আমি তার প্রতিযোগী নই । কিন্তু আর একটি বৌ এলে আমাকেও ধাপে ধাপে নেমে যেতে হবে । যে কোনো দিন এরা এদের ছেলের আবার বিয়ে দেবে । তার আগে আমার যেন মরণ হয় ।

বাবু, তোমার উপরেও আমার একটা অভিমান আছে। বড় একটা অভিমান । রাখীবন্ধ ভাইবোন যখন ছিলুম তখন ছিলুম । এখন তো তা নই । না তোমার মতে এখনো আমরা তাই ? জানিনে তোমার মনে কী আছে । কই, তোমার চিঠিতে

একটি বারও তো আদরের ডাক ডাকনি । শেষে একবার গোরী বলে ডেকেছ । ঠিক যেমন রাখীবন্ধ ভাইয়ের ডাক । কেন ডাকলে না রত্নগোরী বলে ? তোমার নাম কি আমার অঙ্গে অদৃশ্য অক্ষরে ছাপা হয়ে যায় নি ? লোকে কী মনে করবে, সেই ভয়ে উলকি ফোটাইনি । যদি কোনো দিন মুক্তি পাই—বেঁচে থাকতে পাব বলে তো মনে হয় না— আমার প্রথম কাজ হবে তোমার নাম আমার অঙ্গে ফোটানো। তখন আর তুমি আমাকে তোমার কান্তা বলে অস্বীকার করতে পারবে না । মণি, আর আমাকে জ্বালিয়ো না । আমি এমনিতেই জ্বলছি । জ্বলছি তোমার জন্যেও । জ্বলছি যৌবনজ্বালায় । তুমি ছাড়া আমার আপন বলতে আর কে আছে, ধন !

রত্নর মন কেমন করে । এই যে মেয়েটি একে সে চক্ষেও দেখেনি । এও দেখেনি তাকে । কিন্তু অদেখা বলে তো কেউ কারো অনাত্মীয় নয় । সন্তান যখন গর্ভে থাকে তখন সে ও তার জননী পরস্পরের অদেখা । তবু তারা নিকটতম আত্মীয় । চোখের দেখা না দেখায় কিছু আসে যায় না, যদি সম্বন্ধটা পাকা হয় ।

রত্নর মনের কোণে একজোড়া জিজ্ঞাসা ছিল। গোরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা গোরীর নির্বন্ধ অনুসারে কী প্রকার সম্বন্ধ ? গোরীর সঙ্গে তার জীবনের প্যাটার্নটা গোরীর সিদ্ধান্ত অনুসারে কেমনতর প্যাটার্ন ?

এই চিঠিতে সে তার দুই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল । তারা কান্ত কান্তা । তাদের সম্বন্ধ কান্তকান্তা সম্বন্ধ। আর তারা যে যার জীবন নিজের মতো করে বাঁচবে, কেবল মাঝে মাঝে মিলিত হবে । যে মিলন কান্তকান্তা মিলন ।

এটা স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ নয় । এ জীবন দাম্পত্য জীবন নয় । বিবাহ করলেও তারা স্বামীস্ত্রী হবে না । তাদের জীবন দাম্পত্য জীবন হবে না । বিবাহ না করলেও তারা কান্ত কান্তা থাকবে । তাদের জীবন কান্তকান্তার মিলনে বিরহে মধুররসাত্মক হবে । বিরহেও মধু আছে । মিলনে তো আছেই । দীর্ঘ বিরহের পর ক্ষণিক মিলন, তার পর আবার দীর্ঘ বিরহ । প্রিয়া হয়তো জেলে কিংবা আন্দামানে যাবে । কিংবা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আজ এখানে কাল ওখানে লুকিয়ে বেড়াবে ।

গোরীর নাম অঙ্গে ধারণের সাধ রত্নরও হলো । পুরুষমানুষেও উলকি ফোটায়, বিশেষত যারা সৈনিক । কিন্তু সাধ থাকলে হবে কী, সাহস ছিল না । কে কী মনে করবে ! তবে একটি কাজ সে লজ্জার মাথা খেয়ে করল । তার ধুতি চাদর পাঞ্জাবী পায়জামা গেঞ্জি রুমাল প্রভৃতির কোণায় সে গোরীর নাম চেন্না করে রাখল । এমন ভাবে, যাতে কারো নজরে না পড়ে ।

ইতিমধ্যে আর কোনো ফোটো আসেনি । চিঠিও তো এক হিসাবে ফোটো । সে ফোটো সকলের চোখে ফোটে না । যে ভালোবেসেছে তার দৃষ্টি খুলে গেলে সে-ই প্রত্যক্ষ করে । গোরী দিন দিন ক্ষীণ হচ্ছে । বিরহে । আভাময় হচ্ছে । বিরহদহনে । কিন্তু তার জ্বলন তো শুধু বিরহ থেকে নয় । নিত্যবর্তমান অপ্রিয় সংসর্গ থেকেও । রত্নর বাহুতে এত বল নেই যে সে বাহুবলে তার কান্তাকে উদ্ধার করবে ।

রত্নও দিন দিন ক্ষীণ হয় । ক্ষীণ তো সে বরাবর ছিলই । হলো ক্ষীণতর । ক্ষীণতর, কিন্তু উজ্জ্বলতর । দীপ উজ্জ্বলতর হয় তৈলদানে । মুখ উজ্জ্বলতর হয় রসাস্বাদনে । সে ভোলে না, তাকে ভুলতে দেওয়া হয় না যে সে গৌরীরত্ন, গৌরীকান্ত ।

'মিষ্টি,' রত্ন লিখল তার কান্তাকে, 'তুমি আমাকে বাঁচালে । আমার মনে মহা ভাবনা ছিল । প্রেমের জন্যে কি আমাকে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হবে । দিলে যদি তুমি সুখী হও তবে দিতে রাজী আছি এখনো । কিন্তু অন্তর থেকে নয়, আনন্দের সঙ্গে নয় । তুমিও কি চাইবে প্রেমের জন্যে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে ? দিলে কি আমি সুখী হব? না, মিষ্টি, আমি তোমার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে সুখী হব না । আমাদের আদর্শ প্রেমের সঙ্গে স্বাধীনতার সামঞ্জস্য । সব চেয়ে বড় প্রেমের সঙ্গে সব চেয়ে বেশী স্বাধীনতার। সেটা শুধু সম্ভব কান্তকান্তা সম্বন্ধ পাতালে । তুমি এই সম্বন্ধ স্বয়ং বরণ করেছ। এটা তোমার নিজের নির্বন্ধ। এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি ।'

এর পরে সে আরো অন্তরঙ্গ স্বরে লিখল—'আমাদের এই সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য কোনখানে, জান তো ? আমাদের বিয়েতে যদি কোনো বাধা থাকে তবে সেটা নৈতিক বাধা নয়, সামাজিক বাধা । সে বাধা একদিন দূর হতে পারে । তখন আমরা বিয়ে করতে পারি । কিন্তু বিয়ে করলেও আমরা স্বামীস্ত্রী হব না । কান্তকান্তাই থেকে যাব । কারণ এতেই সব চেয়ে বেশী স্বাধীনতা আর সব চেয়ে বড় প্রেম । ওতে নয় । আর যদি বিয়ে না হয় আমাদের তবে শেখরবাবু ও অলকা দেবীর মতো একসঙ্গে থাকব না আমরা। যে যার আপন কর্মক্ষেত্রে থাকব। মাঝে মাঝে মিলিত হব । যেমন চুম্বক আর লোহা । কিন্তু সেই প্রচণ্ড আকর্ষণ দৈনন্দিন হলে তার তীব্রতা হারাবে । তাই বিরহের ব্যবধান সুদীর্ঘ হবে ।'

তার পর আরো ভেবে যোগ করল,—'মিষ্টু, তুমি হয়তো অভিমান করলে। কিন্তু জীবনে যদি কিছু করে যেতে চাও তবে এই হবে জীবনের প্যাটার্ন । তোমার সঙ্গে আমারও । ব্যবধান তো বাইরে। ভিতরে আমরা এক হয়ে রয়েছি, দুই হয়ে যাব না । রত্ন কি রত্ন ! সে গৌরীরত্ন । গৌরী কি গৌরী ! সে রত্নগৌরী । আমি অর্ধনারীশ্বর। তুমিও তাই । আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমার সঙ্গে এক হয়েই থাকব । আর তুমি যেখানেই থাক না কেন আমার সঙ্গে এক হয়েই থাকবে । এক মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছেদ বোধ করব না আমি, করবে না তুমি । আমরা যা করব তা স্বতন্ত্র ভাবে করলেও তার মধ্যে থাকবে এক অদৃশ্য সামঞ্জস্য । সেটা যেন একই মানুষ করছে দুই নামে, দুই রূপে, দুই অবস্থায় । তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দায়িত্ববোধ থাকবে তোমার কাছে আমার, আমার কাছে তোমার । আমরা যেমন পরস্পরের কাছে দায়ী তেমনি পরস্পরের জন্যে দায়ী । ঈশ্বরের কাছে ।'

শেষে লিখল, 'লক্ষ্মীটি, আত্মঘাতী হবার কথা কখনো মনে উদয় হতে দিয়ো না । তুমি তো আর বিচ্ছিন্ন নও । তুমি আপনাকে হত্যা করলে আমাকেও হত্যা করবে। তুমি কি প্রিয়ঘাতিনী হবে ? ধৈর্য ধর । তোমার মুক্তি অনিবার্য । আকাশের বিদ্যুৎকে কি কেউ ঘরে ধরে রাখতে পারে !'

পাঁচ

রত্ন যাই বলুক না কেন এই কয় মাসে তার জীবনে একটা কেন্দ্রান্তর ঘটে গেছে । কেন্দ্র যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে গেছে । স্বাধীনতা ছিল তার জীবনের কেন্দ্র । এখন আর স্বাধীনতা নয়, প্রেমই হয়েছে কেন্দ্র। তা বলে সে স্বাধীনতা সমর্পণ করেনি । সে স্বাধীন পুরুষ । কিন্তু তার চেয়ে আরো সত্য সে প্রেমিক পুরুষ । এ প্রেম তাকে নতুন না করে ছাড়বে না । তাকে তো নতুন করবেই, তার চার দিকের জগৎকেও নতুন করবে । সে একটু ফাঁক পেলেই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে নতুন জগতের। যে জগতে প্রেমের রাজত্ব । মানুষমাত্রেই প্রেমিক । মানবপ্রেমিক । মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ববিরোধ নেই। যা ছিল তা প্রেমের মোহন স্পর্শে সুমীমাংসিত হয়েছে । তাই যুদ্ধ বাধে না। চির শান্তি।

সেই নতুন জগতে মানুষমাত্রেই কাজ করে খেলার মতো আনন্দে । কাজটাই আনন্দময় । খাটুনির অন্ত নেই, তবু কেউ ছুটি চায় না । যেমন কেউ ছুটি চায় না খেলা থেকে। সব কাজই ভালোবাসার কাজ । সে ভালোবাসা কাজের প্রতি । আবার যার জন্যে কাজ তারও প্রতি । প্রিয়জনের প্রতি । প্রিয় দেশের প্রতি । প্রিয় সমাজের প্রতি । প্রিয় জনতার প্রতি । প্রিয় বিশ্বের প্রতি । প্রিয় বিশ্ববিধাতার প্রতি । কাজ করতে ভালো লাগে এমনি । আবার যার জন্যে কাজ তার জন্যে কাজ করতেও ভালো লাগে। কিন্তু তাকে কাজ বলে পরিচিত করা কেন ? তা সৃষ্টি । ঈশ্বরের সৃষ্টির মতো মানুষের সৃষ্টি । সৃষ্টি করার ক্ষমতা ঈশ্বরেরই । মানুষ তা বহু ভাগ্যে পায় । এর জন্যে কেউ তার উপর চাপ দেয় না । তাব সৃষ্টিপ্রেরণা আপনার ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে। উপরওয়ালার হুকুম বলে কিছু নেই । উপরওয়ালাই নেই । আছে ভিতরওয়ালা ।

মানুষের জীবন এত কাল যে ভাবে চলে এসেছে তাতে প্রেমের অংশ অতি সামান্য । মানুষ বেঁচে এসেছে প্রাণের দায়ে । প্রেমের উল্লাসে নয় । ভবিষ্যতের শত সহস্র বর্ষ অতীতের অনুবর্তন হবে না । মানুষ বাঁচবে প্রেমের আনন্দে । তার জীবনযাত্রা রূপান্তরিত হবে প্রেমের জাদুদণ্ডে । দণ্ডভয় উঠে যাবে । কেউ কাউকে দণ্ড দেবে না । রাষ্ট্রও না। সমাজও না। গুরুজনও না । সব অপরাধের সংশোধন হবে স্নেহপ্রীতি দিয়ে । ক্ষমা দিয়ে । শিক্ষা দিয়ে । শাসন ও শোষণ উঠে যাবে । সকলে মিলে হবে একটি সুখী পরিবার । পরস্পরের সুখে সুখী । আত্মসুখে সুখী নয় । যেখানে পর সুখী নয় সেখানে আত্মা সুখী হবে কী করে ?

যৌবন হচ্ছে স্বপ্নদর্শনের ঋতু । মহান কোনো স্বপ্ন । নবীন কোনো স্বপ্ন । রত্নর যৌবনস্বপ্ন নবীন নয় হয়তো । কিন্তু মহান । প্রেম আর স্বাধীনতা দুই তার কাম্য । কেবল তার একার নয়, সর্বমানবের । কেবল গোরীর নয়, সর্বমানবীর । অতীতে যা ছিল অসাধারণদের ভবিষ্যতে তাই হবে সাধারণের । চাই অন্ন, চাই লক্ষ্মী, এ কথা এ যুগে সকলের মুখে । চাই প্রেম, চাই স্বাধীনতা, এ কথাও ফুটবে সকলের মুখে । বিশেষ করে মেয়েদের মুখে । যারা অবোলা যারা চিরবঞ্চিতা ।

আজকের এই গোরী যেন বসন্তের একটিমাত্র কোকিল । একটি কোকিলকে দিয়ে

বসন্ত হয় না । দিকে দিকে দেখা দেবে লক্ষ লক্ষ গোরী । আকাশ ছেয়ে যাবে তাদের নীড়ছাড়া ডানায় । বাতাস মুখর হবে তাদের কুহুরে । তারা হবে স্বাধীনা নায়িকা। তারা হবে পরম প্রেমিকা । তারা যখন সমাজের ভার নেবে তখন সমাজের আবর্তন ঘটবে। সেসব নারীর সঙ্গে নৃত্যের তাল রাখতে পারা কি এসব পুরুষের সাধ্য ! তাই এদের স্থান নেবে লক্ষ লক্ষ রত্ন । যারা স্বাধীন নায়ক তথা পরম প্রেমিক । সেই সব গোরীদের রত্নদের নিয়ে কালকের বসন্ত ।

আজকের বসন্তের দিনমান স্বপ্ন দিয়ে ভরা । দুপুর বেলা গাছতলায় বই সামনে খোলা রেখে গা এলিয়ে দেয় রত্ন । তার অদূরে অঞ্জন । তারও সেই ধারা । কিন্তু প্রেম থেকে নয় । সে যেন কোন সৌন্দর্যের হাতছানি দেখেছে । উড়ে যাওয়া সৌন্দর্যের । নিজে উড়তে পারছে না । চোখ দুটি উড়ে যেতে চায় । নীল পরীর পিছনে ।

রত্ন ওকে ভালোবাসত ছোট ভাইটির মতো। বয়সে যত ছোট তার চেয়েও ছোট দেখায় ওকে। কিন্তু ছোটর মতো ব্যবহার পেতে ওর ঘোর আপত্তি । ও চায় সমান হতে। দাদা বলে ডাকবে না। কথায় কথায় শ্লেষ । শ্লেষ, কিন্তু হুল নেই তাতে ।

একদিন অঞ্জন এসে তার পাশে আসন পেতেছিল । রত্ন লক্ষ করেনি । পরে আবিষ্কার করল। বলল, 'কে ? অঞ্জন ? কখন এলে ?'

'অনেকক্ষণ ।'

'দেখতে পাইনি তো ?'

'দেখবার মতো হলে দেখতে । আজকাল কাকেই বা তুমি দেখ !'

কথাটা সত্যি । গোরী ভিন্ন আর কাকেই বা সে দেখে ! দেখলে ভাসা ভাসা ভাবে দেখে । অঞ্জনের মতো যারা স্পর্শকাতর তারা মনে আঘাত পায় । ভাবে রত্নর ওটা উন্নাসিকতা । কিন্তু বিদায় বেলা যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই আবেগ উথলে উঠছিল । কে জানে কবে আবার দেখা হবে ! যদি আদৌ হয় ।

'পরীক্ষার পর কোথায় যাচ্ছ ?' জানতে চাইল অঞ্জন ।

'সাত ভাই চম্পা যেখানে বৈঠক করবে । এই বোধ হয় শেষ বৈঠক ।'

'ওঃ! তোমার সেই সাত ভাই চম্পা ! আমরা জানি তোমার মনের পক্ষপাতটা ওদেরি উপর । আমাদের উপর নয় । সেইজন্যেই তো এত অভিমান করি ।'

'দূর পাগলা ! আমিও তোমাদেরি মতো সৌন্দর্যবাদী । তবে তোমার মতো গন্ধর্ব নই । এই পৃথিবীর মতো আমিও বাইরে শ্যামল ভিতরে রাঙা । সে আগুন কেউ দেখতে পায় না । আমিও দেখাতে যাইনে । যক্ষের ধনের মতো রক্ষা করি ।'

যে আগুনের কথা বলা হলো সে যে কিসের আগুন রত্ন তা খুলে বলল না । বলতে চাইলেও পারত না । জানা থাকলে তো বলবে । কখনো মনে হয় তা প্রেমের আগুন, কখনো অভিনব সৃষ্টির । কখনো বা ধ্বংসের । বিদ্রোহের । বিপ্লবের ।

নানা কথার পর অঞ্জন সুধাল, 'বৈশাখ মাসে কোথায় থাকবে ?'

'খুব সম্ভব পদ্মার চরে ।'

'পদ্মার চর তো এই গঙ্গার চরেরই মতো হবে । সেখানে জনমানব থাকলে তো ?'

'আমি যে চরের কথা ভাবছি সেখানে হাজার হাজার গোরু চরে । মাসের পর মাস থাকে। তাদের সঙ্গে তাদের রাখাল । ছোট ছোট কুঁড়েঘরে । তারই একখানা কুঁড়ে যদি আমাকে ছেড়ে দেয় আমি আর কিছু চাইনে । ওরা যা খায় আমিও তাই খাব । সকালে পান্তা বিকেলে ভাত । রাত্রে চিড়ে মুড়ি । আর দিনান্তে এক বাটি দুধ ।'

ঐ খাদ্য অঞ্জনের পক্ষে উপাদেয় নয় । সে বড়লোকের ছেলে । অন্য ভাবে মানুষ হয়েছে । মেসে খেতে বসে অর্ধেক ভাত ছিটায়, সিকি ভাগ ফেলে রাখে । তার ঘরে রোজ হালুইকর আসে । মিষ্টান্নর বাকস মাথায় । তার জন্যে খোঁড়া লালজী বাইরে থেকে চপ কাটলেট বয়ে আনে । আর বাবাজীও তার জন্যে বিশেষ পদ রাঁধে ।

'ভাই অঞ্জন,' রত্ন বলল তার ছোট ভাইটিকে, 'মানুষের জীবনে এমন কোনো অন্বিষ্ট থাকবে যার জন্যে সে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাবে । বরং সেইটেই হবে তার ক্ষুধা আর তৃষ্ণা। তারই জন্যে সে ক্ষুধিত ও তৃষিত হয়ে দিন কাটাবে । তা হলে ভেবে দেখা যাক তোমার আমার অন্বিষ্ট কী। কিসের জন্যে আমরা সারাক্ষণ ক্ষুধিত ও তৃষিত ।'

'সৌন্দর্য । যে সৌন্দর্য প্রকৃতির ঘরে ফেলাছড়া যাচ্ছে । মানুষের ঘরে অকুলান । কতক লোককে তাই সৌন্দর্য নিয়ে পড়ে থাকতে হবে । এই পর্যন্ত বেশ বুঝতে পারি । এর পরেই মাথা ধরা । সৌন্দর্য নিয়ে যারা পড়ে থাকবে তাদের পেট ভরবে কী দিয়ে ? কেবল রুটি খেয়ে মানুষ বাঁচে না । কিন্তু রুটিও তো চাই । বাবা চিরদিন থাকবেন না ।'

এ ভাবনা রত্নরও যে না ছিল তা নয় : কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যয় ছিল প্রথমটা আগে ঠিক হয়ে গেলে দ্বিতীয়টা পরে ঠিক হয়ে যাবে । জীবন আগে। জীবিকা পরে । তোমার জীবন নিয়ে তুমি কী করতে চাও তা স্থির কর তো আগে । তখন জীবিকা আপনি আপনার তত্ত্ব নেবে ।

'না। বাবা চিরদিন থাকবেন না । তুমিও চিরদিন থাকবে না । কী চিরদিন থাকবে তা এই বয়সেই জেনে নিতে হবে। উপনিষদের যুগে আমাদের বয়সী ছেলেরাই গুরুগৃহে যেত এই জিজ্ঞাসা নিয়ে । আমরা কি শুধু পড়াশুনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি ? আমরা কি আমাদের জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর পেতে আসিনি ? ভাই অঞ্জন, বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই মনে হানা দিচ্ছে এখান থেকে আমরা কী উত্তর নিয়ে যাচ্ছি ।'

'ওঃ ! তুমি বুঝি আজকাল এইসব ভাব ! তাই তোমাকে এমন ভাবুকের মতো দেখায় !' পরিহাস করল অঞ্জন ।

রত্নর ভাবনার বারো আনা জুড়েছিল গোরী । সে কথা কি ছোট ভাইকে বলা যায় ! কতই বা তার বয়স ! কতটুকু বোধগম্য হবে তার !

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'কী খাব, কী পরব, কোথায় শোব, এসব গণনা আমাদের জন্যে নয় । যেদিন যা জুটবে সেদিন তাই খাব । না জুটলে উপোস দেব । সিদ্ধার্থ কি জানতেন যে সুজাতা বলে একজন কেউ আছে যে দিনে এক বাটি পায়েস এনে দেবে সেই গভীর অরণ্যে বোধিদ্রুম তলে ? তাও একদিন নয়, দু'দিন নয়, পাঁচ বছর

কাল। ওসব গণনা ভাগ্যের উপর বা ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। লেগে থাকতে হয় সত্য বা সৌন্দর্য নিয়ে। যা চিরদিন থাকবে।'

অঞ্জন ফুর্তি করে বলল, 'ঠিক জান চিরদিন থাকবে ? কী করে জানলে ? তুমি তো চিরজীবী নও। আমি নিজে চিরদিন থাকব না, তাই বলতে পারব না কী চিরদিন থাকবে।' বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে বলল, 'সৌন্দর্য চিরদিন থাকে না বলেই তার পিছনে পাগলের মতো ছোটা। চিরদিন থাকবে জানলে কি এই দুপুরে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বসি ?'

তার পর কাতর স্বরে বলল, 'চিরদিন কী থাকবে ? কিছুই থাকবে না। ফুল শুকিয়ে যাবে। মুকুল ঝরে যাবে। মেঘ মিলিয়ে যাবে। মলয় পালিয়ে যাবে। কোকিলের ডাক কর্কশ হয়ে যাবে। আমরাও কি থাকব ? বৃথা চিন্তা।'

রত্ন বলল, 'কবি ইয়েটসের সেই লাইন দুটি মনে আছে তো ?

'In all foolish things that live a day
Eternal beauty wandering on her way.'

এই যে ছায়াছবি এ যেন সুন্দরী নারী পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে অন্য কোনোখানে। এখানে যা ফুরোল অন্য কোনোখানে তা শুরু হলো। সারা বিশ্বের কোথাও না কোথাও আজকের এই দিনটি তার সমস্ত শোভা নিয়ে নিত্য বর্তমান থাকবে। এই যে বসন্ত এ যাবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। সারা বছর ভরে সারা জগৎ ঘুরবে। সুন্দরীর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারলে আমরাও চির সৌন্দর্যের সহচরী।'

আসলে কলেজটা একটা ভাঙা হাটের মতো লাগছিল।

পরীক্ষা সারা হতে না হতে যে যার বাড়ী চলে যাবে, বিদায় নেবার জন্যে একটা দিনও সবুর করবে না। সতীর্থরা এখন থেকেই কোনো মতে সময় করে বিদায় পর্ব সমাপন করে রাখছে। এ জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না। কে কোনখানে ছিটকে পড়বে। বড় দুর্লভ এই ক'টি দিন। যাদের সঙ্গে নামমাত্র আলাপ বা মুখ চেনা তারাও রত্নর ঘরে এসে বিদায় নমস্কার বিনিময় করে যাচ্ছে। তাদেরও নয়নকোণ সজল। এ ধরণী সত্যই প্রেমভূমি। এখান থেকে পা ওঠে না যেতে।

রমেনদার কাছে বিদায় নিতে যেতেই তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবর্ষণ করলেন। ওসব স্তোকবাক্য শুনবেন না তিনি। দেখা এ জীবনে এই শেষ বলে ধরে নিতে হবে।

বর্ষণের ভিতর দিয়ে রোদ ফুটল। অনেক দিন পরে রত্নকে পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। তার জন্যে জিলিপি আনাতে দিলেন। মেসের কাছেই জিলিপির দোকান। মেসে থাকতে সে প্রায়ই জিলিপি আনিয়ে খেত ও খাওয়াত। কত কাল মুখে দেয়নি। তার মজা লাগছিল জিলিপি আসছে শুনে।

'কী সুন্দর হয়ে উঠেছ তুমি এই ক'মাসে। কিন্তু শরীরের প্রতি এত অযত্ন কেন ?' রমেনদা তাকে একসঙ্গে তারিফ ও তিরস্কার জানালেন।

'রমেনদা, এই ক'মাস আমি সুন্দর ছাড়া অসুন্দর কিছু ভাবিনি ।' রত্ন বলল আবেগভরে । তার মন যাচ্ছিল সব কথা খুলে বলতে । কিন্তু সাহস হচ্ছিল না । নিষিদ্ধ প্রেম যে ! দাদার কাছে কি বলতে আছে !

'যার যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি ।' রমেনদা মন্তব্য করলেন ।

এই মিষ্টভাষী মধুরস্বভাব সদাশয় বন্ধুবৎসল যুবক কেবল রত্নর নয় সকলের আত্মীয়তুল্য ছিলেন । কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তাঁর আত্মীয়রাই তাঁকে অনাত্মীয়ের মতো দেখতেন । তার কারণ তিনি তাঁর মোটা মাইনের চাকরিটা অসহযোগের হুজুগে মেতে ছেড়ে দেন । চাকরি যতদিন ছিল ততদিন আত্মীয়দের প্রত্যাশার অবধি ছিল না । চাকরি গেছে, তাই কেউ তাঁকে পোছে না। ওকালতী করে সফল হলে তখন আবার পুছবে ।

'তার পর তোমাদের সেই সোনালী বোনটির খবর কী ?' রমেনদা জানতে চাইলেন কথাপ্রসঙ্গে ।

সোনালীকে রত্ন একেবারে ভুলে গেছল । মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল । এত দিন সে ভেবে এসেছে, যে জগতে গৌরী আছে সে জগতে মন্দ কেমন করে থাকবে, অসুন্দর কেমন করে থাকবে ? এখন মনে হতে থাকল, যে জগতে সোনালী আছে সে জগতে ভালো কেমন করে থাকবে, সুন্দর কেমন করে থাকবে ? দেখতে দেখতে তার মুখ আঁধার হয়ে উঠল ।

তা লক্ষ করে রমেনদারও গলার সুর কাঁপতে লাগল । 'বুঝেছি । খারাপ খবর । বোষ্টম কি অত সহজে বোঝা ঘাড়ে নিতে রাজী হয় ? সোনালী তো বোষ্টমী নয় যে আপনার ভার আপনি বইতে পারবে ।'

'ওঃ ! রমেনদা ! এ জগতে এত অসুন্দরও আছে ! আমি যে মেলাতে পারছিনে । মেলাতে পারছিনে সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরকে । সেইজন্য ভুলে থাকছি ।' রত্ন বলল কাঁদো কাঁদো সুরে । তার জিলিপির সাধ মিটে গেল ।

'কী করবে, বল । অসুন্দরও যে সত্য । সত্যের দিকে চোখ বুজে থাকাও তো ঠিক নয় । মেনে নিতে হবে যে পশুও আছে, পাশবিকতাও আছে, সুন্দরীও আছে, সৌন্দর্যও আছে । এটা মিশ্র জগৎ ।' রমেনদা আশ্বাস দিতে গেলেন ।

'বিউটি য়্যাণ্ড দি বীস্ট !' রত্ন বার বার ঘাড় নেড়ে বলল, 'না । না । না । জগৎ সম্বন্ধে এই দ্বৈত দৃষ্টি আমি মেনে নেব না । আমি নতুন রূপকথা লিখব, রমেনদা । পশু এবং সুন্দরী নয় । সুন্দর এবং সুন্দরী ।'

রমেনদা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ওটা হবে তোমার নিজের গল্প । আগে তো জীবনে লেখা হোক । তার পর কাগজে ।'

রত্ন রাঙা হয়ে উঠল । রমেনদা কি টের পেয়েছেন ? প্রভাত জানায়নি তো ? এর পর সে কী মনে করে শেখরবাবু ও অলকাদের কাহিনী পেড়ে বসল । দেখা যাক রমেনদা অনুমোদন করেন কি না । কিন্তু তাঁদের আসল নাম গোপন রাখল ।

তিনি বললেন, 'ওঁদের দু'জনকেই আমি চিনি । শেখরবাবুর আমি ভক্ত ।

অলকাদেবীকেও শ্রদ্ধা করি । ওঁদের লৌকিক অর্থে বিবাহ্ হয়নি বলে আমি বিকার বোধ করিনে । ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ওটা বিবাহ্ই । আরো কিছু কাল অপেক্ষা করলে ওঁদের জিৎ হবে । হিন্দুসমাজে এ রকম কত হয়েছে হিন্দুরা প্রেমের মহিমা বোঝে। নইলে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করত না । জান তো. বৈষ্ণবরা আহত হন যদি কেউ বলে রাধা পত্নী, কৃষ্ণ পতি [illegible] তাঁরা ভাবতেই পারেন না যে সত্যিকার ভালোবাসা পতিপত্নীর মাঝখানে সম্ভব । প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি বাইরে বিরূপ ভাব দেখাতে হয়, নইলে সমাজ থাকে না । কিন্তু ভিতরে ভিতরে থাকে না পক্ষপাত !'

'তাই নাকি !' রত্ন অবাক হলো । কিন্তু ধরা দিল না ।

'নিশ্চয়। প্রেমিক প্রেমিকাকে সবাই মনে মনে ভালোবাসে । কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় ওরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু শেখরবাবু ও অলকাদেবীর মতো ক'জন খাঁটি সোনা! বেশীর ভাগই ছাড়াছাড়ি হলে মেকী প্রমাণ হয় তুমিও এটা স্বীকার করবে যে একটা অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাওয়া ভালো । সব প্রেম প্রেম নয় । সেইজন্যে সমাজকে খুব বেশী দোষ দিতে পারিনে । প্রেমিক প্রেমিকা যদি ঠিক থাকে তবে সমাজও চোখ বুজতে জানে ।'

রত্নর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কিন্তু আমরা চাই স্বীকৃতি ।'

রমেনদা হেসে বললেন, 'সাহস থাকলে তাও পাবে ।'

রমেনদা কি টের পেয়েছেন ? রত্ন আর একটু হলেই ফাঁস করে দিচ্ছিল আর কী ! কিন্তু দু'চার কথার পর বুঝতে পারল যে 'আমরা' বলতে তিনি সমঝেছেন একালের তরুণতরুণীরা । রত্ন ও শ্রীমতী নয় ।

সে রাত্রে রত্নর কেবলি মনে পড়তে থাকল সোনালীকে । গৌরীর মতো সোনালীকেও সে চোখে দেখেনি । তবু তার জীবনের সঙ্গে সোনালীও জড়িয়ে গেছে । ও মেয়ে হয়তো তার নামটাও কোনোদিন শোনেনি । তার অস্তিত্বের সংবাদ রাখে না । তথাপি তার জীবনে ও মেয়ের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব ।

সোনালী একই ভাবে রয়েছে । রত্ন যত দূর জানে । হয়তো আমরণ সেই ভাবেই থাকবে । বহু শ্বাপদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে বহু দূষিত রোগে সংক্রামিত হয়ে দিকে দিকে পচন ছড়িয়ে ওই নিষ্পাপ মেয়েটি শাপমুক্ত হবে । রত্ন তা হলে কী করবে ? এ জীবনে কোনো দিন হাসবে না ? খেলবে না ? সুখী হবে না ? সুখী করবে না ? যৌবনের স্বাদ নেবে না ? দেবে না? সোনালীকে বাঁচাতে পারছে না বলে নিজে বাঁচবে না ?

তার জীবনদর্শনেও দোলা লাগছিল । যে জগতে গৌরী আছে সে জগতে অসুন্দর কী করে থাকবে ? মন্দ কী করে থাকবে ? আবার যে জগতে সোনালী রয়েছে সে জগতে সুন্দর কী করে থাকবে ? ভালো কী করে থাকবে ? এ জগৎটা তবে কোন জগৎ ? গৌরীময় জগৎ না সোনালীময় জগৎ ? না গৌরীতে সোনালীতে বিভক্ত শাদায় কালোয় ছক কাটা ভালোয় মন্দে ভাগ করা সুন্দরে কুৎসিতে নকসী কাঁথা জগৎ ?

রত্নর মন অবুঝ । সে গৌরীময় জগৎকেই নজরানা দিয়েছে । সোনালীময় জগৎকে

নজরানা দেয়নি । গোরীতে সোনালীতে আলোতে আঁধারে অমৃতে গরলে বিমিশ্র জগৎকেও নজরানা দেবে না । সে দ্বৈতবাদী নয় । যদিও যুগল উপাসক । তার মন বলে, ওগো প্রেম, তুমিই একমাত্র রিয়ালিটি । তুমি যদি সকলের অন্তরে না থাক তবে আমার হৃদয়ে ও গোরীর হৃদয়ে তো রয়েছ । এই থাকাটুকুই যথেষ্ট । এক বিন্দু অমৃত থাকলে সারা সংসারটাই অমৃতময় হয় । এক রশ্মি আলো থাকলে সারা ঘরটাই আলোময় । এখানে পরিমাণের প্রশ্ন ওঠে না । একটুখানিই অপরিমেয় । সেইটুকুই রিয়াল। আর সব আনরিয়াল ।

প্রেম যেখানে আছে সেখানে প্রেমই আছে শুধু । সেখানকার কেন্দ্র দুটি নরনারীর যুগল চিত্ত । পরিধি নিখিল বিশ্ব । রত্ন তা হলে হাসবে খেলবে খুশি হবে খুশি করবে । যৌবনের পেয়ালা তুলে ধরবে । তুলে ধরলে মুখে ছোঁয়াবে । জীবন্মৃতের মতো বাঁচবে না । পূর্ণ প্রাণে বাঁচবে । গোরীকে বাঁচাবে । সবাইকে বাঁচাবে । সোনালীকেও বাঁচাতে চেষ্টা করবে । যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ । এখনো খুব দেরি হয়ে যায়নি । কখনো খুব দেরি হয়ে যাবে না । তবে সোনালীর জন্যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তার নয় । যে ভালোবাসে তারই । কেউ ভালো না বাসলে সোনালীকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরই । তিনি যে ভালোবাসেন এটা ধ্রুব । দুঃখ দিলেও ভালোবাসেন। সুখ দিলেও ভালোবাসেন । ধ্রুব ।

রত্ন সোনালীকে আবার ভুলে গেল । তার মন জুড়ে থাকল কেবল গোরী । যখন জেগে থাকে তখন তার চেতনা ছেয়ে থাকে গোরী । যখন ঘুম পায় তখন ঘুমকে সে ঠেকিয়ে রাখে পেছিয়ে দেয় । পাছে গোরী চলে যায় চেতনার বাইরে । স্বপ্ন দেখতে চায় গোরীকে । কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কদাচ ঘটে ।

শেষে এমন হলো যে রত্ন ভাবতে আরম্ভ করল সে আর রত্ন নয়, গোরীরত্ন নয় । সে গোরী । সাক্ষাৎ গোরী ।

এই অপরূপ অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল । এমন কি কখনো কারো হয়েছে ? রূপান্তরিত হতে হতে রত্ন হয়ে গেল গোরী । বাইরে নয় । ভিতরে ।

গোরীকে এ কথা জানাতেই ও যা লিখল তা আরো অপরূপ । লিখল, 'আমি যখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তুমি এসে আমার সামনে দাঁড়াও । আমি আমার মুখ দেখতে পাইনে । তোমার মুখ দেখি । ওগো এ কী হলো আমার ! আমি কি তুমি হয়ে গেছি ? না এটা আমার বিভ্রম ?'

এর পর যা লিখেছিল তা অতি ভীষণ কথা । আয়নার রত্ন নাকি ওকে চকিতের মতো চুম দিয়েছে । ওর কোনো অপরাধ নেই । অপরাধ রত্নর । এর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পত্রপাঠক রত্নকে।

রত্ন এর উত্তরে লিখল, 'পত্রপাঠক রত্ন তো আর রত্ন নয় । সে গোরী হয়ে গেছে । ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত তা হলে করবে কে ? কার কাছে ? আমার আর্শীখানায় আমি এখনো রত্নকে দেখতে পাই । তাকে যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে বলি সে কী করবে, জান তো ?'

রত্ন তার ফোটো পাঠায়নি, তাই গোরীর অন্য উপায় ছিল না । রত্নর অন্য উপায়

ছিল । সে গোরীর ছবির মুখে মুখ রেখে প্রায়শ্চিত্ত করল। একবার নয় । বার বার । কিন্তু বোঝা গেল না কোন জন গোরী আর কোন জন রত্ন । রত্ন যদি গোরী হয়ে থাকে তবে গোরী হয় রত্ন । পত্রলেখিকা গোরী কিন্তু সেটা কবুল করল না । সে রত্ন নয়, রত্নগোরী ।

ছয়

সলিল ব্রহ্মর সঙ্গে বড়দিনের সময় শান্তিনিকেতন যাবার আগে আরো একবার সেখানে ঘুরে এসেছিল রত্ন একা । সে বার জন গ্রেগরীর সঙ্গে তার দেখা হয় । গেস্ট হাউসে পাশাপাশি দু'জনের দু'খানা লোহার খাট । খাটের উপর তোশক । রাত্রে মশারি খাটিয়ে দিয়ে যায় । গ্রেগরী কিন্তু মেজের উপর কম্বল পেতে শোবেন, মশারি ব্যবহার করবেন না । অস্বস্তি লাগে রত্নর । সে তো তাঁর খাতিরে মশারি বিনা শুতে পারে না ।

সাহেবের পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী । খালি পা । গান্ধীপন্থী বলে ইতিমধ্যেই তাঁর নাম হতে আরম্ভ করেছে। তা বলে একজন মধ্যবয়সী মার্কিন অতিথি যে খাট ছেড়ে মেজেতে শোবেন ও মশারি থাকতে মশার কামড় খাবেন রত্ন এটা কল্পনাও করেনি । পছন্দও করে না । অহিংসার সঙ্গে এর কী সম্বন্ধ ! তিনি কি তবে জৈনদের মতো রক্ত দিয়ে মশা পুষতে চান ? ওটা কি অহিংসা না অহিংসার বিকৃতি ?

এমনি করে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় । ধীরে ধীরে তাঁর জীবনকাহিনী শোনা হয় ।

জন গ্রেগরী আইন ব্যবসায়ে প্রভূত উপার্জন করেছিলেন । কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল যাতে উভয় পক্ষে আপোসে নিষ্পত্তি হয়ে যায় । মানুষে মানুষে বিবাদ বাধবে, আর তার থেকে তিনি ধনবান হবেন, এ রূপ ধনবত্তা তাঁকে বিবেকজর্জর করত । অথচ তাঁর জীবনযাত্রা ছিল এমন ব্যয়বহুল যে রুচি না থাকলেও তাঁকে ধনের অন্বেষণে জীবন ব্যয় করতে হতো । ব্যয়বাহুল্য থেকে পরিত্রাণও ছিল না । সেটা না হলে আইনজীবীদের ঠাট বজায় থাকে না । আর পাঁচজন আইনজীবীর সঙ্গে তাল রেখে চলা যায় না । লোকে বলবে কৃপণ অথবা নীচ ।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্যে অপ্রয়োজনীয় আয় । তার জন্যে অপ্রয়োজনীয় সময়পাত । আবার বিলাসে ব্যসনে ভূরিভোজনে অপ্রয়োজনীয় কালক্ষয় । তাঁর মোমবাতি দুই দিক থেকে পুড়ছিল । তিনি স্থির করলেন যে সভ্যতা থেকে বিদায় নিয়ে বন্যদের সঙ্গে প্রিমিটিভ বনে যাবেন । তাদের জীবনযাত্রা নিষ্প্রয়োজনীয় নয় । তারাই বাঁচতে জানে । আমেরিকা ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে ছিল শিকারের রাইফেল। মৃগয়া করে খাবেন । ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছন । বনে জঙ্গলে ডেরা ফেলেন । একদিন দেখতে পান একটা সারস জাতীয় পাখী—সাংখোল তার নাম—গাছের ডালে বাসা বেঁধেছে । একটু অপেক্ষা করতেই পাখীটা কী মুখে করে বাসায় উড়ে এলো । অমনি জন গ্রেগরী রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন । আর এক সেকেণ্ডের মধ্যে গুলী ছুঁড়তেন ।

কিন্তু সেই খণ্ড-সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর জীবনের ওলটপালট হয়ে গেল । বন্দুক তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল । তিনি বলে উঠলেন, 'এই শেষ । আর নয় ।' তার পর গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অস্ত্রসমর্পণ করলেন ।

আসলে হয়েছিল এই যে মাকে বাসায় ফিরতে দেখে এক ঝাঁক ছানা আনন্দে কলরোল করে ওঠে । সে এক অপূর্ব দৃশ্য । কচি কচি ঠোঁটগুলি ছোট ছোট মাথাগুলি মা'র কাছে আশ্রয় খুঁজছে, আদর খুঁজছে । কে তাদের আশ্রয় দেবে, আদর করবে, মা যদি মারা যায় ! তারাও যে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারা যাবে । একটা গুলীতে এতগুলো প্রাণ নিতে জন গ্রেগরীর অন্তরাত্মা বিমুখ হলো । বিশেষত শিশুর প্রাণ । গুলীতে এরা মরবে না বটে, কিন্তু গুলীর পরিণাম এদের অনাহারে মৃত্যু ।

রত্ন এ কাহিনী শুনে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল । তার মুখে কথা জোগাল না। তার চোখে জল এসেছিল । কত বড় একটা ট্র্যাজেডী কেমন করে মোড় ঘুরে সার্থক এক কমেডী হয়ে উঠল । পাখীটাও বাঁচল, গ্রেগরীও বাঁচলেন । মিথ্যার জীবন খসে পড়ল । সত্যের জীবন অনাবৃত হলো । অহিংসার দীপ হাতে করে নবজীবনের পথে যাত্রা করলেন জন গ্রেগরী । এক চরম পন্থা থেকে তিনি অপর চরম পন্থায় হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন । এক অন্ধকার থেকে অপর অন্ধকারে । এত দিনে পেয়ে গেলেন পরম পন্থা । এ পথ বিত্তময়ী সৃক্কা নয় । অথবা নয় রক্তপিচ্ছিল বর্ত্ম ।

'তা বলে কি মশামাছিও মারবেন না ?' প্রশ্ন করেছিল রত্ন ।

'আরে না, না ।' হেসে উত্তর দিয়েছিলেন গ্রেগরী । 'তা নয় । আমি পরখ করে দেখছি কত কম বোঝা বইতে পারি । মশারিও তো একটা বোঝা । গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয় । কোথায় রাত কাটে তার ঠিক নেই । অভ্যাস যদি করি তবে মশারি ঘাড়ে করে ফিরতে হয় । বরং অভ্যাস কাটিয়ে ওঠাই ভালো ।'

ভদ্রলোকের আহারে বৈশিষ্ট্য ছিল । তিনি নিরামিষাশী তো ছিলেনই, তার উপর ছিলেন আধসিদ্ধ বা কাঁচা খাওয়ার পক্ষপাতী । দুধ না, চিনি না, যাতে চিনি বা দুধ আছে তেমন কোনো খাদ্য না । ওজন কমে গেছে, কিন্তু স্বাস্থ্যহানি হয়নি ।

অহিংসা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছিলেন, 'প্রাণে যদি প্রেম না থাকে তবে অহিংসা অহিংসাই । তার বেশী নয় । তা দিয়ে অন্যায়কারীর অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো যায় না । প্রেম । প্রেমই অহিংসার ক্রিয়াত্মক গুণ । প্রতিদিন কত মন্দ লোক আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে। বলছে, আমাকে ভালোবাসতে পারো ? আমরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব । মন্দ লোককেও ভালোবাসব । কিন্তু মন্দকে নয় । মন্দকে পরিবর্তিত করব ভালোয় ।'

জন গ্রেগরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি । অনেক দিন মনে ছিল না তাঁর কথা । এখন স্মরণ হলো । গৌরীর রক্ষক হওয়া রত্নর সাধ্য নয় । কিন্তু তার ভক্ষকের অন্তঃপরিবর্তন আনা কারো না কারো সাধ্য । গৌরীর কিংবা রত্নর কিংবা তাদের কোনো বন্ধুর । যার প্রাণে প্রেম আছে । যশোবাবুর প্রতি প্রেম । রত্ন আত্মপরীক্ষা করে দেখল গৌরীর স্বামীকে সে ঘৃণা করে না। তাঁর সম্বন্ধে সে অহিংস । অহিংস, কিন্তু সপ্রেম

নয় । গৌরীকে ভালোবাসতে গিয়ে তার স্বামীকেও ভালোবাসতে হবে এত দূর যেতে তার আপত্তি । সে গৌরীর জন্যে এমনিতেই যথেষ্ট জড়িয়ে পড়েছে। আরো জড়িয়ে পড়লে নিজের স্বাধীনতা হারাবে । প্রেম আর স্বাধীনতা উভয়ের ভারসাম্য রাখতে চাইলে গৌরীকে ভালোবেসেই ক্ষান্ত হতে হবে, তার স্বামীকে সুদ্ধ ভালোবাসার দায় মাথায় নেওয়া চলবে না ।

একটু একটু করে রত্নর মনে উদয় হলো যে যশোবাবুর হৃদয় বদলানোর ভার নিতে পারে রত্ন নয়, গৌরী নয়, ললিত নয়, জ্যোতি নয়—সুধা । একমাত্র সুধা । একমাত্র সে-ই ভালোবাসে তাঁকে । যে ভালোবাসে সে-ই হৃদয় বদলানোর ভার নিতে পারে । জাদু দণ্ড তারই হাতে । আর কারো হাতে নয় ।

সুধা মেয়েটি কে বা কেমন রত্নর কোনো ধারণাই ছিল না । তার সম্বন্ধে সে যা পড়েছে বা শুনেছে তার থেকে অনুমান হয় সে সাধারণ উপপত্নী নয় । সে-ই প্রকৃত সহধর্মিণী । কিন্তু এমনি এ দেশের রীতি যে তার সঙ্গে বিবাহ অভাবনীয় । সে যে বিধবা । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিদিবসে তাঁর চারিত্রের তাঁর ব্যক্তিত্বের তাঁর অশেষ সদগুণের প্রশস্তি গান করা হয়, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে উচ্চারণ করবে না যে তিনি বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা নারীকে সমান অধিকার দিয়ে গেছেন । পুনর্বার বিবাহের সমান অধিকার । তিনি নরনারীর সমানাধিকারবাদী । বিপত্নীক যশোমাধবের পুনরায় বিবাহ হবে, কিন্তু বিধবা সুধার পুনরায় বিবাহ হবে না । এই বৈষম্য যশোবাবুরও সহ্য হয়নি । সেইজন্যে তিনি অনেক বছর বিপত্নীক অবস্থায় কাটিয়েছেন । শেষপর্যন্ত পিতামাতার অনুরোধ বা আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহস হলো না । নিজেরও তো বংশরক্ষার বাসনা ছিল । সুধা সে বাসনা মেটাতে পারবে কেন ? আর সব বাসনা তার দ্বারা অপূরণীয় নয় ।

সুধার জন্যে দুঃখ হয় রত্নর । তার ন্যায়বোধ তাকে বলে যে সুধাকে বিয়ে করাই উচিত ছিল যশোবাবুর । এখনো করা যায়, কিন্তু তার আগে গৌরীকে ছাড়পত্র দিতে হবে । গৌরী স্বাধীন হলে যশোবাবুও স্বাধীন । একজন বিয়ে করবে রত্নকে, অপর জন বিয়ে করবেন সুধাকে । দেখতে গেলে রত্ন ও সুধা দু'জনে দু'জনার মিত্র । চার জনে মিলে তাস খেলতে বসেছে । এ এক নতুন ধরনের খেলা । এ খেলায় রত্ন জিতিয়ে দেবে সুধাকে, সুধা জিতিয়ে দেবে রত্নকে । খেলার শেষে রত্নর জয়বিভব গৌরী, সুধার জয়বিভব যশোমাধব ।

সুধা যে কার কী হয় রত্ন কোনো দিন খোঁজ করেনি । যদি ললিতের কেউ হয়ে থাকে তবে ললিতকে দিয়ে সুধার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে । তার পর সুধা যদি রত্নর পরামর্শ শোনে ও যশোবাবুর হৃদয়ের পরিবর্তন আনে তা হলে গৌরীও স্বাধীন, যশোবাবুও স্বাধীন, রত্নও সুখী, সুধাও সুখী । কিন্তু রত্নর নিজের মনেই একটু দ্বিধা ছিল । বিয়ে ? গৌরী কি রত্নকে বিয়ে করবে ? তেমন প্রতিশ্রুতি তো সে দেয়নি । মাঝে মাঝে কবিত্ব করে 'বর' বলেছে । ছেলেবেলায় আরো কত মেয়ে খেলাচ্ছলে রত্নকে 'বর' বলেছিল । কোথায় তারা আজ ! যে যার স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করছে। আর রত্নও তো বিয়ে করবে বলে কথা দেয়নি । বিবাহ নামক প্রথাটাতে তার আন্তরিক বিশ্বাস নেই।

এক দিক থেকে ওটা প্রেমের পরিপন্থী । বিয়ে হয়ে গেলে লোকে ধরে নেয় যে প্রেম আপনি হবে, তার জন্যে সাধনা করতে হবে না । আরেক দিক থেকে ওটা স্বাধীনতার অন্তরায় । বিয়ের পরে মেয়েরা তো পরাধীনই, পুরুষরাও কি স্বাধীন ? সংসার করতে হয় যে । ভাত কাপড় জোগাতে হয় যে । চাকরি রাখতে হয় যে । রত্নর বাবা ফী মাসে ভয় দেখান সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন । পারেন কই ?

তার পর সুধাকে রত্ন যে ভার দিতে চায় সে ভার সুধাই বা বইতে রাজী হবে কেন ? সে সংস্কারবদ্ধ হিন্দু বিধবা । হিন্দুর মেয়ের বিয়ে একবারই হয়ে থাকে । দু'বার হবার জো নেই । বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধান দিলে কী হবে ! বিধবা মহাশয়ারা বিবাহবিমুখ । কারণ সমাজ মহাশয় অগ্নিশর্মা । যে সমাজে কুমারী মেয়েদেরই পাত্র জোটে না সে সমাজে বিধবার প্রতিযোগিতা ! তা ছাড়া মামুলি যুক্তি তো আছেই । বিধবারা যদি বিয়ে করে তবে যে কারো সম্পত্তি নিরাপদ নয় । স্থাবর অস্থাবর কোনো রকম সম্পত্তি । মায় নারী নামক সম্পত্তি । সুতরাং সতীত্বের দোহাই পাড়তে হয় । বিধবার বিয়ে হলে সতীত্ব যায় । না হলে থাকে । এই যেমন সুধার আছে ।

কিন্তু সুধা কেন ? সুধাদি । সেই দূরবর্তিনী অপরিচিতা অন্তঃপুরচারিণীকে শ্রদ্ধা করতে হয় । তিনি যাঁকে ভালোবাসেন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ । সেই অর্থে সতী । তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিদি বলতে হয় । তিনি বলতে হয় । তিনি যদি সদয় হন, সবল হন, তবে তাঁরই মধ্যস্থতায় গৌরী স্বাধীন হবে । তিনি স্বয়ং সার্থক হবেন । পরিপূর্ণ হবেন । রত্ন ললিতকে দিয়ে সুধাদিকে বলাবে । দেখা যাক কী হয় । আপাতত গৌরীকে জানাবে না । জানাবে যখন সময় পরিপক্ক হবে ।

এমনি করে রত্ন দিন দিন জড়িয়ে পড়ছিল একটি অচেনা অজানা পরিবারের ঘরোয়া ব্যাপারের জালে । তার নিয়তি জড়িয়ে যাচ্ছিল তাদের নিয়তির সঙ্গে । ললিতের সঙ্গে তার বন্ধুতার থেকে এলো গৌরীর সঙ্গে ভালোবাসা । গৌরীর সঙ্গে ভালোবাসার থেকে এলো যশোবাবুর চিত্তপরিবর্তনের পরিকল্পনা । তার থেকে আসছে সুধাদির শরণ নেওয়া। এর পরে কী ? কে জানে কী ! রত্নর ভালো লাগছিল না ভাবতে যে তার স্বাধীনতা ক্রমেই দায়বদ্ধ হচ্ছিল । প্রেমের মূল্য কি এমনি করেই দিতে হয় ! তার আরো খারাপ লাগছিল ভাবতে যে পদ্মফুলের চার দিকে পাঁক ! ফুলটি তুলে আনতে গেলে পাঁকটি গায়ে মাখতে হয় । পাঁকে তলিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয় । গৌরী যেমন সুন্দর তার পারিপার্শ্বিক তেমনি অসুন্দর ।

রত্নর একটুও স্পৃহা ছিল না যাকে ভালোবাসে তার জন্যে যাদের ভালোবাসে না তাদের সংস্পর্শে আসতে । কিন্তু সে যে প্রেমিক । তাকে যে প্রমাণ করতে হবে প্রেম সর্বশক্তিমান । প্রেম কাউকেই অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না । সবাইকেই কোল দেয় । শত্রুকেও। কুষ্ঠীকেও । তা যদি সে না পারল তবে তার ওটা প্রেম নয় । যার হৃদয়ে তেমন প্রেম নেই সে প্রেমিক নয় । রত্নর প্রেম কি তেমন প্রেম ? না ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ?

রত্নর কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ । সে যদি সত্যিকার প্রেমিক হয়ে থাকে তবে তার প্রেম কেবল গৌরীকেই কেন্দ্র করে ঘুরবে না, প্রেমের পরিধির মধ্যে যশোবাবুও

আসবেন, সুধাদিও আসবেন, আসবেন আরো অনেকে। কী করে যে কেউ ভালোবাসতে পারে একজনের জন্যে একটা পরিবারকে, বিশল্যকরণীর জন্যে গন্ধমাদনকে, তা রত্নর কল্পনাতীত। তবু আশ্চর্যের কথা, তার মনে হতে থাকল সে সবাইকে ভালোবাসতে পারে, তার অন্তঃকরণে সকলের জন্যে ঠাই আছে, সে উদারহৃদয়, সে গোরীর বান্ধবদেরও নিজের বান্ধবদের মতো ভালোবাসবে। কুণ্ঠিত হবে না, সঙ্কুচিত হবে না, বিকার বোধ করবে না। নয়তো সে সত্যিকার প্রেমিক নয়।

কিন্তু একটা জায়গায় তার বাধছিল। সে বহুদিন থেকে সংকল্প করেছে যে বি-এ পরীক্ষার পর পথে বেরিয়ে পড়বে। দেশবিদেশ দেখবে। দশ বছর আগে কোথাও থামবে না। কিন্তু গোরী এসে সব ওলটপালট করে দিয়েছে। গোরী তাকে ভারতের বাইরে যেতে দেবে না। বাংলার বাইরেও না। এই তো সেদিন আবার লিখেছে, 'তোমার আমার মাঝখানকার দূরত্বটাকে কমিয়ে আনতে পার না, মণি ? কলকাতায় চলে এলে কেমন হয় ? দেখা হয়তো হবে না। কিন্তু তুমি যে আমার আরো কাছে এসেছ ও কথা ভেবে আমি আরো সোয়াস্তি পাব। তুমিও কি পাবে না ?'

গোরী ও রত্নর মাঝখানকার দূরত্বটা এক বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি রয়েছে, অথচ তার চেয়ে বেশী লাগছে। যেন পৃথিবীর এ প্রান্ত ও প্রান্ত। প্রেম যতই বাড়ছে দূরত্ববোধ ততই বাড়ছে। যত প্রেম তত দূরত্ববোধ। আর যত দূরত্ববোধ তত আকর্ষণ। রত্ন অনুভব করে গোরী তাকে জোরে আরো জোরে টানছে। দুই ভুজ দিয়ে টানছে। মাথার দিকে মাথা। চোখের দিকে চোখ। মুখের উপর নিঃশ্বাস। গায়ের উপর চুল। রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন মনে হয় বিছানায় আরো একজন শুয়ে। একটু উসখুস করলেই সে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার চেয়ে অসাড় হয়ে শুয়ে থাক। শোন তার শ্বাসপতনের শব্দ। নাসায় নাও তার অঙ্গের সুবাস। তাকে ঘুমোতে দাও। তার বালিশে মাথা রেখে আবার নিদ্রা যাও।

রত্নর মনে সংশয় ছিল না যে বিরহপ্রবাহিণীর অপর পারে সেই রাত্রের সেই যামে ঘুম ভেঙে গেছে আর একজনের। তার সুন্দরকে সে অনুভব করছে একাকী শয্যায়। মিলন ? হাঁ, এও একপ্রকার মিলন। ধীরে ধীরে মুদিত হয়ে আসছে তার নয়নকলি। চাঁপার কলি। রুপোর কাঠির ছোঁয়ায়। পরে কখন আবার লাগবে সোনার কাঠির পরশ। সে জেগে উঠবে। রত্নকে অনুভব করবে তার শিয়রে। তার পাশে।

গোরীর সঙ্গে দেখা করতে রত্নর ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। যদি ও মেয়ের ভুল ভেঙে যায় ! যদি ওর চাউনিতে প্রকাশ পায় ওর মোহভঙ্গ, ওর নৈরাশ্য ! এই রত্ন ! এই আমার সুন্দর ! দূর ! এ যে পুরুষই নয়। সুপুরুষ তো পরের কথা। তা সত্ত্বেও রত্ন হৃদয়ঙ্গম করল যে গোরীর সঙ্গে একটি বার দেখা না করে সে দেশান্তরী হতে পারে না। সেই একটি বার দেখাতেই তাদের জীবনের এসপার কি ওসপার হয়ে যাবে। গোরী যদি হতাশ হয় তবে প্রথম দর্শনই শেষ দর্শন। প্রথম অঙ্কেই নাটকের যবনিকা। তার পরে হয়তো ভদ্রতা বা বন্ধুতা বা রাখীবন্ধ ভাইবোনের আনুগত্য। কিন্তু মধুর রস আর নয়। প্রেম আর নয়।

রত্ন আরো হৃদয়ঙ্গম করল যে প্রথম দর্শনের জন্যে প্রস্তুতি চাই। যেমন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি । প্রথম দর্শনের মতো অত বড় পরীক্ষা আর কী আছে ! বি-এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় সুযোগে সফল হওয়া যায় । কিন্তু প্রথম দর্শনে ব্যর্থ হলে সে ব্যর্থতার প্রতিকার নেই । বি-এ পরীক্ষায় খারাপ করলে এম-এ পরীক্ষায় কালিমা ক্ষালন হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই রঙের নেশা ছুটে গেলে পরে আর তেমন নেশা ধরে না । প্রথম দর্শনের জন্যে প্রস্তুতি আরো কঠিন । রত্ন এত দিন এ প্রস্তুতির কথা ভাবেনি । কেননা প্রথম দর্শনের কথা ভাবতে চায়নি । এবার মনঃস্থ্ করল যে দেশান্তরী হবার আগে গোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সাক্ষাৎকারের পূর্বে প্রস্তুত হবে ।

সে স্থির করল দুই ভাবে প্রস্তুত হবে । এক, প্রেমের মূলভিত্তি এমন গভীর করে পাতবে যে চোখের ভালো লাগা না লাগার উপর অনুরাগের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্ভর করবে না । দুই, চোখের ভালো লাগার জন্যে চেহারার যত্ন নেবে। অশরীরী প্রেমে চেহারার জন্যে চাড় না থাকতে পারে । যেমন উদাসিনী মালাদি তেমনি উদাসীন রত্ন । কিন্তু গোরীর সঙ্গে প্রেম ঠিক অশরীরী নয় । গোরীও ঠিক উদাসিনী নয় । রত্ন কেমন করে উদাসীন হবে ?

গোরীকে তার প্রস্তুতির কথা জানাতেই উত্তর এলো অতি অপূর্ব । লিখেছিল ও মেয়ে—

বেশ ছেলে তো ! তুমি ভেবে মরছ তোমার রূপ নেই দেখে আমি মূর্চ্ছা যাব ! আর আমি ভয়ে মরছি আমার যৌবন চলে যাচ্ছে দেখলে তোমার প্রেমও চলে না যায় ! তোমরা পুরুষ ! কুড়িতে কুঁড়ি । আর আমরা নারী । কুড়িতে বুড়ী । ফুল যেমন দেখতে সুন্দর কিন্তু দুদিনেই এলিয়ে যায় শুকিয়ে যায় আমরাও তেমনি । তেমন সৌন্দর্য নিয়ে আমি কী করব ! আর আমার সৌন্দর্য নিয়ে তুমিই বা করবে কী ! বাসি ফুল সুন্দর বলে কি কেউ বাসি ফুলের মালা পরে !

ওগো তোমার রূপ না হয় নেই, কিন্তু যৌবন তো আছে । থাকবেও অনেক দিন। তুমি আমার চোখে যৌবনের প্রতীক । আমাদের দেশের যৌবন । আমাদের সমাজের যৌবন । তুমি সেই যৌবনের প্রতিনিধি । তোমার সঙ্গে থাকা যৌবনের সঙ্গে থাকা । তোমার সঙ্গে থাকলে আমি চিরযৌবনা হব । রূপ ! আমার রূপই তোমার রূপ । এর থেকে স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে তুমি করবে কী ! কাকে দেবে, ওগো ভ্রমর ? না, না, তোমাকে রূপবান হতে হবে না । হলে তুমি কি আমার থাকবে ? কে কখন চুরি করে নেবে !

প্রস্তুতির নাম করে আর কত কাল অদর্শন হতে চাও বল তো । কিন্তু আমি যে আর সইতে পারছিনে । আমার কেবলি মনে হচ্ছে এ জন্মে নয় । তোমার আমার দেখা এ জন্মে নয় । হাত পা অবশ হয়ে আসে, রক্ত হিম হয়ে আসে, যখন ভাবি যে মিলন তো দূরের কথা, দর্শনও হবার নয় । আমাদের প্রেম শুধু চিঠিতে চিঠিতে । জ্যোতি বলছিল বার্নার্ড শ আর এলেন টেরি । শুনে এত রাগ

হলো । বলে বসলুম, রত্ন যদি আমাকে দেখতে না আসে আমি যাব রত্নকে দেখতে। জ্যোতি বলল, শাস্ত্রেও তাই লিখেছে । রত্ন কারো অন্বেষণ করে না। রত্নকেই অন্বেষণ করতে হয় ।

আর ভালো লাগছে না, মণি । আর ভালো লাগছে না । ওগো তুমি পরীক্ষার পরেই তেমার ভাঙা দেহমন নিয়ে চলে এস । জ্যোতির আশ্রমে তোমার জন্যে ব্যবস্থা করব । সেখানে আমার যাওয়াআসার স্বাধীনতা আছে । কেউ কিছু মনে করবে না । জ্যোতি স্বয়ং আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে । কানন সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আর আমি গিয়ে দূর থেকে একটি বার দেখেই এক ছুটে পালিয়ে আসব। তোমাকে দেখা দেব না । কেন দেখা দেব ? আমি তোমার কে যে আমার দেখা পাওয়া তোমার চাই ? কই, তেমন আগ্রহ তো দেখিনে । আগ্রহ যত সবই আমার দিক থেকে। লজ্জায় মরি ।

কি শীত কি বর্ষা রত্ন প্রতিদিন গঙ্গায় নাইতে যায় । সময় থাকলে সাঁতার কাটে । সাঁতরাতে সাঁতরাতে অর্ধেক নদী পার হয় । কিংবা এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে গিয়ে হাজির হয় । তার ক্লান্তিমোচনের পদ্ধতি এই । নদীর সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ । বহমান স্রোত তাকে প্রাণ দান করে। সে শিশুর মতো লাফায় ঝাঁপায়, গা মেলে দেয়, হাত পা ছোঁড়ে । জল থেকে যখন উঠে আসে তখন তার দম ফুরিয়ে এসেছে, তবু তার মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তাকে যেন দম দেওয়া হয়েছে । গোরীর চিঠি পড়ে সে যেদিন উন্মনা হয় সেদিন নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় । অনেকক্ষণ ডুবসাঁতার দিয়ে হঠাৎ এক সময় পানকৌড়ির মতো মাথা তোলে । হাত পা ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে ভেসে থাকে । স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় । হাত পা চালিয়ে ভাঁটির ঘাটে ওঠে । সেখান থেকে উজিয়ে আসতে পারে না । পায়ে হেঁটে ফিরে আসে । অঙ্গ শীতল না হয়ে থাকলে আবার ঝাঁপ দেয় ।

গোরীর এই চিঠি পেয়ে সে গঙ্গার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিশু যেমন মায়ের কোলে । অর্ধেক নদী পারাপার করে তার প্রাণ জুড়াল। এত দিন তার ধারণা ছিল প্রেমের পক্ষে দর্শনের চেয়ে অদর্শনই শ্রেয় । সেইজন্যে সে নানা ছলে অদর্শনটাকে সুদীর্ঘ করার চেষ্টায় ছিল । এখন তার খেয়াল হলো যে একজনের রূপের প্রদীপ থেকে অপর জন তার প্রদীপ জ্বালিয়ে নিলেই রূপান্বিত হবে । তেমনি একজনের যৌবনের পরশমণির পরশ লাগলে অপর জনের তনু যৌবনান্বিত হবে ।

সে লিখল সে পদ্মার চর থেকে ফিরে গোরীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজবে । কিন্তু কোথায় ও কবে তা বলতে পারবে না । আশ্রম তার আস্তানা হবে না ।

গোরী অধীর হয়ে লিখে পাঠাল—

সত্যি তুমি আসবে ! আমার যে বিশ্বাস হয় না গো । সত্যি আমাদের চার চোখ এক হবে ! ওগো কবে ? ওগো কোন দিন ? আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখো

না । আমি বার বার প্রত্যাশা করেছি । বার বার হতাশ হয়েছি । আর আশা করতে ভরসা পাইনে। কাননকে খবর দিতে হবে । সে আর তুমি এক সঙ্গে এসো । নয়তো কথা উঠবে । জ্যোতির আশ্রমে তুমি বিশ্রাম করবে না জানি । সবাই যেখানে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে একজন সেখানে বিশ্রাম করবে কোন মুখে !

কত যে কথা আছে তোমার সঙ্গে ! কোনো দিন কি মুখ ফুটে বলতে পারব ! যদি দেখা হয়ও । না গো না । পারব না । চিঠিতে কত কী বলা যায় । মুখোমুখি বলা যায় না । আমাদের এই চিঠি লেখালেখিই ভালো । মুখোমুখি ভালো নয় । আমি এখন থেকেই ভয় পেতে আরম্ভ করেছি । তোমার চাউনির সামনে আমি কি মাথা তুলতে পারব ! তোমার দৃষ্টি যে অন্তর্ভেদী । ধরা পড়ে যাব যে । তুমি তখন কী মনে করবে আমাকে ! আমি ভয় করি । আমি তোমাকেই ভয় করি। তোমার কাছ থেকে আমি আত্মগোপন করতে চাই । পর্দার আড়াল থেকে আমি তোমাকে দেখব। তুমি আমাকে দেখতে পাবে না । ওগো তুমি আমাকে দেখতে চেয়ো না । শুধু আমাকে দেখা দিয়ো ।

সাত

পরীক্ষার ঝঞ্ঝাটে রত্ন বড় চিঠি লিখতে পারে না । গৌরীর তাতে কী আফসোস ! সে তার অভ্যাসমতো পাতার পর পাতা লিখে যায় । সেসবও রত্নর পাঠ্য । তবে সবকিছু উত্তরযোগ্য নয় । পরীক্ষার পরে এক সময় উত্তর দিলে ক্ষতি নেই ।

ইদানীং গৌরীর চিঠিতে বিচিত্র খবর থাকে । শিকারের বিবরণ । তার জন্যে আলাদা একটা হাতী বরাদ্দ । হাতীটার নাম মান বাহদুর । হাওদার উপর পর্দা খাটানো থাকলেও সে যখন খুশি পর্দা ঠেলে সরিয়ে দেয় । মুখ খোলা রাখে । তার হাতেও বন্দুক । কিন্তু গুলী যদিও ছুঁড়েছে এখনো জীবহত্যা করেনি । বাঘ ভালুক পেলে মারত । কিন্তু তা হলে জঙ্গলে রাত কাটাতে হয় । তাতে সে নারাজ । দিনের বেলা পাখী মারার জন্যেই অভিযান । শূয়োর খোঁচানোর দলে সে যাবে না । সাহেব খোঁচাতে পারলে যেত । ডোমকলের সাহেবদের সঙ্গে তার প্রোপ্রাইটর যান । কী যে আনন্দ পান তাতে ! আনন্দ মদিরা ।

বন্দুক ও শিকারের কুহক গৌরীকে ঘরে থাকতে দেয় না । ভোর না হতেই বাইরে টেনে নিয়ে যায় । বাইরে গিয়ে বুঝতে পারে ওটা বাইরেরই কুহক । যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ ভুলে থাকে । কিন্তু বিকেল চারটের সময় থেকে মন কেমন করা শুরু হয় । ওটা যে ডাক আসার সময় । ডাকে যে রত্নর চিঠি থাকে বা থাকতে পারে । তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে চায় । কিন্তু শিকারের নেশায় এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে ফিরতে বললেই ফেরা তখনি হয় না । ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় ।

রত্নর চিঠি পেতে এই কয়েক ঘণ্টার বিলম্ব তার সমস্ত দিনটা মাটি করে দেয় ।

ফেরা যাক ফেরা যাক করে সে অন্যান্যদের দিনটাও মাটি করে। পদ্মার চরে যারা চখা শিকারে গেছে তারা কি অত সহজে থলে ভর্তি করতে পারে ; চখা অতি হুঁশিয়ার পাখী। খালি হাতে ফিরতেও কেউ রাজী নয়। এক গোরী ছাড়া। তার লক্ষ্য জ্ঞান নেই। কেবল ফাঁকা আওয়াজ। তার তাতে লজ্জা নেই। সে যে নির্ভয়ে গুলী ছুঁড়তে পেরেছে এই যথেষ্ট কেরদানী। এমনি কিছু দিন চালাতে পারলে ইংরেজ ফেরার হবে। ঐ মহিষমর্দিনীর সঙ্গে লড়তে যাবে কে !

গোরী তার শিকারকাহিনীর শেষে লেখে, 'আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ কী, জান ? তোমার চিঠি পাওয়া। চিঠি যখন পাই তখন প্রাণ ফিরে পাই। তার আগে তিন চার ঘণ্টা ছটফট করতে হয়। মনে হয় বাড়ী আজ আর পৌঁছব না। পথে পথেই রাত কাটবে। হাতী হয়তো পথ ভুলে উলটো দিকে চলল। সত্যি সত্যি পৌঁছে যাই। ওরা বলে, এমন কী রাত হয়েছে ! আমি বলি, এমন দেরি হবে জানলে আদৌ যেতুম না। লোকগুলো কী শয়তান ! কত যে নিরীহ পাখী মেরেছে তার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল নেই। আহা ! কী যে কান্না পায় দেখে ! নরম তুলতুলে শরীর কাঠের মতো শক্ত। যেন কাঠের পুতুল। চোখের মণি যেন জমাট অশ্রু। কী যে মায়া লাগে দেখতে!'

আরেক দিন লেখে, 'চিঠি পেতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়, তাই শিকারে যেতেই পা ওঠে না। ওগো কেমন করে আমি জেলে যাব ! সেখানে কি তোমার চিঠি পাব! পেতে অশেষ বিলম্ব হবে না ? ওগো কেমন করে আমি গা ঢাকা দিয়ে দেশের জন্যে লড়ব ? মাটির তলায় লুকোব ? তোমার চিঠি কি রোজ চারটের সময় মিলবে ! আজ এক জায়গায় কাল এক জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে লুকিয়ে বেড়াতে হবে আমাকে। কে আমার ঠিকানা জানবে যে তোমার চিঠি পৌঁছে দেবে ! প্রিয়তম, তুমি আমার সব পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করেছ। এ নেশা যার আছে সে কেমন করে দেশের স্বাধীনতা আনবে ! এ যে মদের চেয়েও প্রবল !'

একদিন রত্নর চিঠি না পেলে সে দিশেহারা হয়। চিঠি তো এক টুকরো কাগজ নয়। একটুখানি সঙ্গসুখ। দিনান্তে ওটুকু যদি না পায় তবে রাত কাটে কী করে ! কালরাত্রি যেন পোহাতে চায় না। বার বার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। যা নয় তাই কল্পনা করে। রত্ন কি আর আছে ! সে নেই। সে মরে গেছে বা চলে গেছে বা অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে। চোখের জলে ভিজে যায় বালিশ। ভিজে যায় বিছানা। গোরী ওঠে, দীপ জ্বালায়। কেরোসিনের টেবল ল্যাম্প। রত্নকে লিখতে বসে।

> আমার স্বাধীনতার জন্যে তুমি দিনরাত ভাবছ। স্বাধীনতা আমি চাই। কিন্তু তোমার হাত থেকে নয়। আমার স্বাধীনতা তোমার অধীনতার জন্যে। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি মরতে চাই। এই আমার জীবনের চরম অভিলাষ। তার পর তুমি আমার চিতার উপর তাজমহল গড়ে দিয়ো, যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাক।

স্বাধীনতার সংকল্প আমি নিয়েছি। স্বাধীন আমি হবই। কিন্তু আমার স্বাধীনতা তোমার স্বাধীনতার মতো নির্ব্যূঢ় নয়। আমি তোমার হতে চাই বলেই স্বাধীন হতে চাই। তুমি আমার না হয়েও স্বাধীন। নারী ও পুরুষ সমান স্বাধীন কেন হবে না এ নিয়ে তর্ক করেছি আমিও। এখনো তর্ক করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তো জানি আমার দৌড় কত দূর। লক্ষ্মীবাঈ হব বলে ঘোড়ায় চড়তে গেলুম, মারাঠা মেয়েদের মতো কাছা দিয়ে শাড়ী পরতে পারলুম না। বসতে গিয়ে দেখি বসা অস্বস্তিকর। লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো অস্ত্র হাতে নিলুম। মানুষ মারার আগে পশুপাখী মারতে গেলুম। শিকারের তোড়জোড় করে জীবহত্যা করতে পারলুম না। প্রিয়তম, আমার মতো অপদার্থকে দিয়ে দেশের কাজ হবার নয়। আমি বিপ্লবী নায়িকা নই। আমি একান্তভাবে প্রেমাধীনা পরাধীনা নারী। তোমারই অধীনা।

আচ্ছা, তুমি কি যীশু খ্রীস্ট না মহাত্মা গান্ধী? তোমার পুরোনো চিঠিগুলি আজ আবার নাড়াচাড়া করছি আর ভাবছি তোমার অমন সাধু হবার সাধ হলো কেন? তুমি যাঁকে যশোবাবু বল আমি তাঁকে মিস্টার ফৌজদার বলি। তাঁকে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও ভালোবাসতে পারবে না। ভালোবাসব বললেই কি ভালোবাসা যায়! এই যেমন হিং বা রসুন। বহু সদ্‌গুণের অধিকারী। কিন্তু ব্যঞ্জনে দাও দেখি। ক'জন খেতে ভালোবাসবে? আলাদা করে দাও দেখি। কারই বা মুখে রুচবে! আমার তো গন্ধে বমি আসে। জোর করে বমি চাপতে যাওয়া কি ভালোবাসা? তার চেয়ে ভোজন ত্যাগ করাই শ্রেয়।

তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। তুমি চাও অন্তঃপরিবর্তন। ধর তাই হলো। কিন্তু হলে কার কোন কাজে লাগবে! এরা আমার কে! সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অজানা বিদেশী লোক। আমি এদের কে! বেঁধে আনা বিদেশিনী ক্রীতদাসী। এরা দেবতা হলেই বা আমার কী! আমার দাসীপনা তো ঘুচবে না। আমাকে মর্যাদা দেওয়া হবে দেবীর, কিন্তু সে দেবী খড়ের। তাকে বিসর্জন দিতে বাধবে না। সে যদি মা না হয় তবে তার পরিণাম কী হবে তা কে না জানে! সে থাকতেই আর একটি দেবী আসবে। কথাটা কেউ মুখ ফুটে বলবে না। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে বাকী থাকে না। আমার মূল্য আমার জন্যে নয়। বংশধরের জন্যে। এরা কি কোনো দিন আমার মূল্য অন্যনিরপেক্ষ বলে মানবে। বাইরে মানতে পারে, অন্তরে মানবে না। তা হলে অন্তঃপরিবর্তন কিসের?

কান্ত, তোমার প্রেম আর আমার মুক্তি একসূত্রে গাঁথা। তুমি থাকতে আমি আর কারো দিকে তাকাব না। আর কেউ আমার নয়। আমি আর কারো নই। ওদের অন্তঃপরিবর্তনে আমার কী! রত্ন আছে আমার। আমি রত্নসম্পন্না। আর কোনো সম্পদে আমার কাজ কী! রত্নকে লোকে যত্ন করে সিন্দুকে তুলে রাখে। সাধ করে কণ্ঠে ধারণ করে। কিংবা করে কর্ণাভরণ, নাসাভরণ। আমার রত্নকে নিয়ে আমি কী যে করি, কোথায় যে রাখি! আমার ঘর থাকলে আমি ঘরে বন্ধ করে রাখতুম। আমার বাহির থাকলে আমি চোখে চোখে রাখতুম। আমার রত্নকে

কে কোন দিন চুরি করে নিয়ে যাবে, ভুলিয়ে নিয়ে ধরে রাখবে, ভেবে আমার ঘুম আসতে চায় না। আমার জীবনে এ কী যাতনা এলো। এমন হবে কে জানত। আমার স্বাধীনতার জন্যে আমি জ্বলেপুড়ে মরছিলুম, এখন দেখছি তোমার স্বাধীনতা আমার গায়ে সয় না। ওগো আমি কী যে অসহায় বোধ করি যখন ভাবি যে আমার রত্নকে আমি বুকে করে রাখতে পারছিনে। আর কেউ যদি তা করে তখন!

রত্ন কিছু দিন আগে গৌরীকে লিখেছিল যশোবাবুর যাতে অন্তঃপরিবর্তন হয় তাই তার কাম্য। জন গ্রেগরীর হতে পারে, যশোবাবুর হতে পারে না? অন্তঃপরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা সে স্পষ্ট করেনি। তার মতে অন্তঃপরিবর্তন হচ্ছে গৌরীকে স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র দেওয়া। কিন্তু গৌরীর মতে তা নয়। অন্তত ওর চিঠি থেকে মনে হয় না যে ও ছাড়পত্রের কথা ভাবছে। ও ভাবছে মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি অথচ সেই সঙ্গে সপত্নীজ্বালা থেকে অব্যাহতির কথা। যশোবাবুর অন্তঃপরিবর্তন বলতে গৌরী বোঝে তিনি তাকে মা হতে বাধ্য করবেন না, সে যদি মা না হয় তবু আরেকটি বিয়ে করবেন না। কিন্তু গৌরী বিশ্বাস করে না যে সে অর্থে তাঁর অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। ঘটলে এই পর্যন্ত ঘটবে যে তিনি ওকে দেবীর মর্যাদা দেবেন। ওর উপর জোর খাটাবেন না। কিন্তু প্রত্যাশা খাটাবেন। প্রত্যাশা বিফল হলে পুনশ্চ বিবাহ। পুরুষের সে অধিকার আছে।

রত্নর মনে একটা খটকা বাধল। গৌরী যদি মা না হয় ও যশোবাবু যদি আবার বিয়ে না করেন তা হলে দু'জনের বোঝাপড়া এমন কী কঠিন যে সম্পর্কচ্ছেদ করতেই হবে? তা হলে মুক্তি মানে কী? বিবাহ থেকে মুক্তি নয় বোধ হয়। বিবাহ যেমন আছে তেমনি রেখে যশোবাবু যে অর্থে মুক্ত পরুষ গৌরীও সেই অর্থে মুক্ত নারী হতে চায় না তো? যশোবাবুর যেমন সুধা গৌরীর কিনা তেমনি রত্ন?

চার জনের তাস খেলার উপমা একবার মনে এসেছিল। খেলায় জিতলে সুধাদি পাবেন যশোবাবুকে, রত্ন পাবে গৌরীকে। এই ছিল সে খেলার পণ। এবার যখন সেই উপমা মনে এলো, তখন তার মর্ম বদলে গেল। খেলায় জিতলে যশোবাবু পাবেন সুধাকে, গৌরী পাবে রত্নকে। বিবাহ ব্যতিরেকে। রত্নের মনে খট করে বাজল। সে বিবাহ নামক প্রথাটায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু বিবাহিতা নারীর উপনায়ক হতে ঘৃণাবোধ করে। গৌরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধের ভিত্তি হবে গৌরীর কুমারীত্ব, তার কুমারত্ব। গৌরীকে তা হলে ছাড়পত্র নিতে হয় বা বিবাহ নাকচ করতে হয়। এ রকম জল্পনা মাস কয়েক আগেও শোনা যেত। কিন্তু ইদানীং তার স্বামীর সঙ্গে তার শিকারে যাওয়া ও ঘোড়ায় চড়ার সূত্রে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। খুব একটা বৈরীভাব নেই। তিনি তাকে লক্ষ্মীবাঈ হবার সুযোগ দিয়েছেন বলে সে কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ।

ওদের ওই চারজনের তাস খেলায় সুধাদির হাতের পাঁচ ছিল—'আমার বাপের দেওয়া ঘরদোর পড়ে রয়েছে, জায়গাজমি বারো ভূতে লুটে খাচ্ছে। আমি চললুম রে, যশো। চলি তবে, রানী বোন।' মাঝে মাঝে তিনি ওটা তুলে দেখাতেন আর অমনি দু'দিক থেকে রব উঠত, 'না। না। তুমি যেয়ো না। তোর যাওয়া হতে পারে না।'

তেমনি রত্নর হাতের পাঁচ ছিল—'এখন থেকে আমরা আবার রাখীবন্ধ ভাইবোন ! মোগল বাদশা আর রাজপুত রানী । ইতিহাসে অমর ।' মাঝে মাঝে সে ওটার উল্লেখ করত আর অমনি আর্তনাদ উঠত, 'তা হলে আমি মরে যাব ।'

এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না । রত্ন লিখল, 'তুমি হবে লক্ষ্মীবাঈ আর আমি হব তোমার রাখীবন্ধ ভাই । দেশ স্বাধীন হবে । তুমিও স্বাধীন হবে । আমাদের দেখাশোনার দ্বার অবারিত । এই সম্পর্ক মেনে নাও তো আমি পরীক্ষার পর সোজা বেগমপুর গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব । এই জন্মে কেন, এই মাসেই চার চোখ এক হবে, গোরী বোন ।'

গোরী উত্তর দিল, 'আমি তোমার পায়ে কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে বোন বলে ডেকে চরম শাস্তি দিলে ! তুমি কি জান না যে ও ডাক আমার প্রাণদণ্ড ! আমার মনে হলো আমি মূর্চ্ছা গেছি । ফিটের ব্যারাম আমার কোনো কালে ছিল না । এই প্রথম । রতন, অরূপ রতন, অভাগিনীকে আর কত পরখ করবে ! পরখ করতে গিয়ে দেখবে নারীবধ করে বসেছ । রতন, মনের মতন, তুমি কেন আমাকে নিয়ে যাও না? হরণ করে নিয়ে যাও না ?'

প্রভাতের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বাকী ছিল । রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তার ঘরে গিয়ে তার পড়ার ব্যাঘাত করল রত্ন । অন্যান্য প্রসঙ্গের পর প্রিয় প্রসঙ্গ উঠল ।

'তার পর ? তুমি কি তোমার ও অধ্যায় শেষ করে দিয়েছ না এখনো গৌর প্রেমে মাতোয়ারা ?' প্রভাত বলল রহস্য করে ।

'আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয় ?' রত্ন রঙীন হলো ।

'কী মনে হয়, বলব ? মনে হয় তোমার মুখে কেউ মুঠো মুঠো ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে । হোলি খেলেছে তোমার সঙ্গে । তুমি যার হৃদয় জয় করেছ তার মতো নারীরত্ন আমিও দেখিনি, তুমিও দেখবে না । কিন্তু ওর ভালোবাসা পাওয়া আর ওকে পাওয়া একই কথা নয় । ও যদি তোমাকে অমন আশা দিয়ে থাকে তবে না বুঝে দিয়েছে। আমার ওই বোনটির উপর আমার অগাধ স্নেহ, কিন্তু ওর সংসারজ্ঞান নেই ।'

'কেন ও কথা বলছ ?' রত্ন আশ্চর্য হলো ।

'কেন বলছি ? আচ্ছা, তুমিই বল । ভাগবতে ষোল হাজার গোপবধূর দৃষ্টান্ত আছে । তাঁদের মতো প্রেম আর হয় না । কিন্তু প্রেমের জন্যে তাঁদের একজনও কি কুল ছেড়েছিলেন ? পদাবলীতে আমরা রাধার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি । তিনিই প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ । তিনিও কি শ্যামের জন্যে কুল ছেড়েছিলেন ? সেকালের শ্রীমতী যা পারলেন না একালের শ্রীমতী কি তা পারবেন ? সেইজন্যে বলছিলুম আমার বোনটির সংসারজ্ঞান নেই ।'

'ভাই প্রভাত, তুমি তা হলে আমাদের কী করতে বল ? ওকে আর আমাকে ?' রত্ন সুধাল অন্তরঙ্গ ভাবে ।

'ভালোবাসতে । কিন্তু কামনা না করতে । কামনা থাকলে পূরণ না করতে ।' প্রভাত বলল আরো অন্তরঙ্গ ভাবে ।

রত্ন ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল । তার পর প্রশ্ন করল, 'এটা কি তুমি সংস্কারবদ্ধ

বলে বলছ ? না তুমি ভুক্তভোগী বলে বলছ ?'

'না, ভাই । আমি সংস্কারবদ্ধ নই । আমি বিশ্বাস করিনে যে একটি মেয়ে একটি পুরুষের সঙ্গে নারায়ণশিলা সাক্ষী করে মন্ত্র পড়েছে বলে সেই সুবাদে চিরকালের মতো তারই হয়ে গেল । এমন কি পরকালেও । মানুষের ইহকাল পরকাল একরাত্রের একটি অনুষ্ঠানে নির্ধারিত হয়ে যায় না । স্বয়ং নারায়ণই ষোল হাজার গোপবধূর সঙ্গে বিহার করে অন্য রকম সাক্ষ্য দিয়েছেন ।' প্রভাত রঙ্গ করে বলল ।

রত্ন আবার রঙীন হয়ে উঠছে লক্ষ করে প্রভাত তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরিয়ে দিল । বলল, 'হৃদয়ের ভালোবাসা ও অঙ্গের কামনা দুই এক নয় । হৃদয়ের টান নাড়ীর টানের মতো আজীবন থাকে । যদি তাই নিয়ে তোমরা তুষ্ট হও তবে তোমাদের সুখ চিরন্তন হবে । আর যদি অঙ্গের কামনাকে তার সঙ্গে জড়াও তা হলে অঙ্গ যত দিন না জুড়ায় তত দিন জ্বলতে থাকবে । জল যেমন এক দিকে যেতে না পেলে আরেক দিকে গড়ায় আগুন তেমনি এক ইন্ধন না পেলে আরেক ইন্ধন পোড়ায় । কামনা থাকলে তাকে পাত্রান্তরিত করতেই হবে একদিন না একদিন । তোমাকেও, তাকেও । তা বলে প্রেম কেন পাত্রান্তরিত হবে ?'

রত্ন স্তম্ভিত হলো । কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল, 'তোমার যুক্তি যদি যথার্থ হয় তবে প্রত্যেক পুরুষের দুটি করে নারী চাই আর প্রত্যেক নারীর দুটি করে পুরুষ । একটি হৃদয় ভরাতে । একটি অঙ্গ জুড়াতে । তা হলে তুমি একবিবাহ প্রচার কর কেন ?'

প্রভাত অসঙ্কোচে বলল, 'হৃদয় ভরাতেও নয় । অঙ্গ জুড়াতেও নয় । ঘরসংসার করতে । মা হতে । ছেলে মানুষ করতে । পরিবারের বাঁধুনি ঠিক রাখতে ।'

'তা হলে এক একটি পুরুষের তিন তিনটি নারী ? এক একটি নারীর তিন তিনটি পুরুষ ? বহুবিবাহ না বহুবিহার—কোনটা তোমার লক্ষ্য ?'

রত্ন বিমূঢ় হয়েছিল । তাকে আরো বিমূঢ় করল প্রভাতের এই উক্তি—'আমার বক্তব্যের সারতত্ত্ব তুমি ধরতে পারনি, রতন । আমি একবিবাহেরই পক্ষপাতী । বহুবিবাহের নয় । বহুবিহারেরও নয়। আমার পরিকল্পনায় রামের গৃহিণী হবে শ্যামের প্রেমিকা আর হরির নায়িকা । শ্যামের গৃহিণী হবে হরির প্রেমিকা আর রামের নায়িকা। হরির গৃহিণী হবে রামের প্রেমিকা আর শ্যামের নায়িকা । তেমনি রাম হবে মালতীর স্বামী আর মাধবীর কামী আর মল্লিকার প্রেমী । শ্যাম হবে মাধবীর স্বামী আর মল্লিকার কামী আর মালতীর প্রেমী । হরি হবে মল্লিকার স্বামী আর মালতীর কামী আর মাধবীর প্রেমী । তা হলে সকলেই সুখী । সকলেই সমৃদ্ধ । এক সেট ব্যবস্থায় যেটা কদাচিৎ সম্ভব তিন সেট ব্যবস্থায় সেটা সাধারণত সম্ভব ।'

রত্নর মুখে চোখে আতঙ্কের লক্ষণ দেখে প্রভাত তাকে অভয় দিল । 'অবশ্য আমি প্রস্তাব করব না যে তিন সেট ব্যবস্থা আমাদেরই দ্বারা প্রবর্তিত হবে । কালক্রমে আপনাআপনি বিবর্তিত হবে । সেকালে একই ব্যক্তি ছিল পুরোহিত ও বৈদ্য ও সৈনিক ও কৃষক । শ্রমবিভাগ ঘটে বৈদ্যকে করে দিল স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি । একালে বৈদ্য কত

ভাগ হয়েছে, লক্ষ্য করেছ তো ? দাঁতের ডাক্তার, চোখের ডাক্তার, কানের ডাক্তার, চামড়ার ডাক্তার, ফুসফুসের ডাক্তার । প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে এক একটি ডাক্তার। একজন আরেক জনের কাজ করবে না । যে যার নিজের কাজ করবে । তেমনি—'

রত্ন ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল । এ শর্তে সে স্বামী হতে চায় না, কামী হতে চায় না, প্রেমী হতেও তার অরুচি । যে মেয়ে অন্যের গৃহিণী হবে রত্ন হবে তার প্রেমিক বা নায়ক ! কক্ষনো না । যে মেয়ে অন্যের প্রেমিকা হবে রত্ন হবে তার নায়ক বা স্বামী ! কক্ষনো না । যে মেয়ে অন্যের কামিনী হবে রত্ন হবে তার স্বামী বা প্রেমিক ! কক্ষনো না । স্বাধীন পুরুষ সে বহু নারীর সঙ্গে বহু প্রকার সম্পর্ক পাতাবে, যেমন বহু পুরুষের সঙ্গে । সেসব হলো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক । মানুষের সঙ্গে মানুষের । কিন্তু নরনারী সম্পর্ক কেবল একজনের সঙ্গে একজনেরই। তেমন স্বাধীনতা নারীরও থাকবে। গোরীরও থাকবে ।

প্রভাত তা শুনে বলল, 'সে কি কখনো হয় ! মেয়েমানুষ প্রথমে মেয়ে, তার পরে মানুষ । নারীর মধ্যে নারীত্বই প্রধান, ব্যক্তিত্ব অপ্রধান । তুমি যার সঙ্গে ব্যক্তি বলে বা মানুষ বলে সম্পর্ক পাতাবে সে-ই একদিন তোমাকে স্বামী বলে বা কামী বলে কল্পনা করবে । গোরী কি তা সহ্য করবে ? করত, যদি গোড়া থেকে তুমি তিন সেট ব্যবস্থায় সায় দিতে । তার স্বামী অন্যজন, কামী অন্যজন, প্রেমিক শুধু তুমি । তা হলে তোমার কত বেশী স্বাধীনতা থাকত ভেবে দেখ । ঘর তো ওকে তুমি দেবে না । সংসারী হবে না তো। কেন তবে বেচারিকে ঘরসংসার ছেড়ে পথে বেরোতে বলা ! স্বাধীনতার জন্যে ? কী হবে তেমন স্বাধীনতা দিয়ে ? নারীর কাছে তার ঘরের নিরাপত্তাই সব চেয়ে বড় । যেমন পুরুষের কাছে তার জীবিকা । তার কেরিয়ার ।'

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। রত্ন সংসারী হবে না, অথচ গোরী স্বাধীনা হবে । কেমন করে তা হলে তাদের সামঞ্জস্য হবে ? গোরীর অসংসারিত্বে না রত্নর সংসারিত্বে ?

রত্ন ভাবছিল । প্রভাত তার পরীক্ষার পড়া সরিয়ে রেখে নিচু গলায় গল্প বলতে বসল । এমন সব গল্প যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয় । আরব্য রজনীর মতো অশ্লীল, অথচ ভারতীয় রজনীর ঘটনা । যাদের সঙ্গে যাদের যোজনা তারা সবাই প্রভাতের চেনা মহলের । তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে আপোসে বা গোপনে । তাতে কোনো পক্ষই বঞ্চিত হয়নি । স্বামীরাও বদলি পেয়েছে। প্রেমিকরাও সংসারী হয়েছে । বিয়ে ভেঙে যায়নি । আবার ছাঁদনাতলায় যেতে হয়নি । রক্ষিতা হতে হয়নি । বন্ধ্যা থাকতে হয়নি । অথচ সন্তানের অঙ্গে কলঙ্কও লাগেনি! সব দিক রক্ষা হয়েছে। সকলেই সুখী ।

রত্ন কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই । আমি চাই অবিভক্ত সমগ্র নারী । সেও পাবে অবিভক্ত সমগ্র পুরুষ । এই ভিত্তির উপর দাঁড়াবে পরিপূর্ণ নরনারী সম্পর্ক । শ্রমবিভাগ এ ক্ষেত্রে খাটে না । ওটা মিথ্যা লজিক ।'

'অমন করে কাঁপছ কেন ? শীত করছে ? নাও, নাও, এই পশমিনাটা নাও । গায়ে জড়াও ।' প্রভাত তার কাঁপুনির অন্য কারণ অনুসন্ধান করল না ।

রত্ন ঝাঁকিয়ে বসল । সে জানত প্রভাতের মনের কোণে একটা কম্‌প্লেক্স ছিল । সেটা এক কথায় এই যে, শ্রদ্ধার পাত্রীকে সম্ভোগ করা যায় না, সম্ভোগের পাত্রীকে শ্রদ্ধা করা যায় না। একবার সে বলেছিল, 'আমার গুরুজন যদি আমার বিয়ে দিতেন আর আমার বৌ যদি হত সত্যিকারের দেবী তা হলে আমি তাকে সারা জীবন পূজা করে যেতুম, কিন্তু কোনো দিন তার গায়ে হাত দিতুম না । আমাকে দায়ে পড়ে আর কারো দিকে তাকাতে হতো যাকে আমি ভয় করতুম না, ভক্তি করতুম না; অসঙ্কোচে বিনা অনুমতিতে ভোজন করতুম ।'

শুনতে কালাপাহাড়ের মতো, কিন্তু আসলে এটা মান্ধাতার আমলের সংস্কার । এবং এটারই উপরে দাঁড়িয়েছে তার নিঃশ্বাস উড়িয়ে দেওয়া পরিকল্পনা । আগে ছিল দ্বয়ী । এখন হয়েছে ত্রয়ী । এর নাম সংস্কারমুক্তি নয় । প্রকৃত সংস্কারমুক্তি হচ্ছে কামনার পাত্রীকে শ্রদ্ধা করতে শেখা, শ্রদ্ধার পাত্রীকে কামনা করতে কুণ্ঠিত না হওয়া ।

প্রভাত বলল, 'আমি তোমার প্রেমে বাধা দিচ্ছিনে । আমার বক্তব্য হলো তুমি ওর সঙ্গে সীমা মেনে চলবে । ওর মধ্যে প্যাশন এত বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমরা তোমাদের বন্ধুরাই বাধা দেব ।'

রত্ন চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলল, 'আমার সাধনা হচ্ছে রসের সাধনা । সেই সঙ্গে রূপের সাধনা । রস থেকে আসবে রূপ । আমাকে রূপান্তরিত করবে । রূপান্বিত করবে । কায়া না থাকলে রূপ রাখব কোথায় ? রূপ তো নিরাকার নয় । প্রতিমাপূজার পক্ষে সব চেয়ে জোরালো যুক্তি, প্রতিমা না থাকলে রূপ রাখবার আধার থাকে না । কায়া থাকবে, তাতে রূপ থাকবে, এই পর্যন্ত যদি মেনে নাও তবে যার জীবন্যাস হয়েছে তেমন প্রতিমাকে তুমি লীলা করতেও দেবে। আমরা জীবন্ত প্রতিমা। তাঁরই প্রতিমা।'

'প্রেমকে তুমি অত সীরিয়াস ভাবে নিচ্ছ কেন ? আর কেউ কি কোনো দিন প্রেমে পড়েনি ? আমরা প্রত্যেকেই এক আধ বার এর ভিতর দিয়ে গেছি । যাওয়া ভালো । কিন্তু মাথা হারানো ভালো নয় । তোমার বাস্তববোধ নেই ।' প্রভাত সস্নেহে অনুযোগ করল ।

'আমার কাছে,' রত্ন বলল তন্ময় হয়ে, 'প্রেম হচ্ছে পূজা । এর চতুরঙ্গ উপচার । দেহ মন হৃদয় আত্মা কোনো একটি অঙ্গ বাদ পড়লে অঙ্গহানি । বিভিন্ন উপচার বিভিন্ন দেবতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না । পূজা যেমন একটি দেবতাও তেমন একটিই । আমরা যে যার দেবতা পেয়ে গেছি। আর খুঁজতেও চাইনে, হারাতেও চাইনে । সীমাবদ্ধ সম্পর্ক কেন ? সীমার বাইরে কি আর কেউ আছে ? মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসর ন কোই । ভক্তি আর প্রেম আর কামনা আর ভোগ সব ওই একজনকে ঘিরে । মীরার বেলা সে ছিল পুরুষ । আমার বেলা সে নারী । সে যদি আমার হয় তো আর কোনো নারী আমার নয়। আমার না হয় তো আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব । যা ছিল আমার পূর্বকল্পনা ।'

প্রভাত খানিকটা মেনে নিয়ে বলল, 'তোমার হতে পারে, কিন্তু তোমারই হবে এটা

দুরাশা। ওর স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়। একজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না হলে যদি আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন না হয় তবে তুমি যা করতে চেয়েছিলে তাই কর। আরো পশ্চিমে চলে যাও। ওর মুক্তির দায় আমরা অন্যান্য বন্ধুরা নেব। বিবাহের কাঠামো ঠিক রেখে তার ভিতরে যতটা মুক্তি আঁটে ততটা মুক্তি ও আদায় করে নেবেই। ও কি সামান্য মেয়ে! ও রাধা কি দ্রৌপদী, এ যুগে জন্মান্তর নিয়েছে।'

রত্নর মাথায় ঘুরছিল, 'ওর মধ্যে প্যাশন এত বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমরা তোমাদের বন্ধুরাই বাধা দেব।' এর একটা জুৎসই উত্তর হাতের কাছে খুঁজে না পেয়ে সে ভারি অসহায় বোধ করছিল। তথ্যের সঙ্গে তো তর্ক করা চলে না। নাকাল হলে তথ্যকে যারা উড়িয়ে দেয় রত্ন তাদের একজন নয়।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় প্রভাত তার আপন কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছিল। রত্নর হোঁশ হলো যখন তখন শুনতে পেল প্রভাত বলছে, 'সন্ন্যাসিনীকে ভগিনী বলে ডাকতে হয়। আমিও ডাকি। কী যন্ত্রণা বল দেখি! যদি ওকে বিয়ে করি—ওদের সঙ্ঘে তার নজির আছে—বিয়ের পরে ও আমার ঘরে আসবে না, ওকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। সঙ্ঘের মেয়ে সঙ্ঘেই থাকবে। ওটাই ওদের সঙ্ঘের নিয়ম। দেবজন্ম হবে, অথচ তার জন্যে হরপার্বতীকে মিলতে দেওয়া হবে না।'

রত্ন গরম হয়ে বলল, 'তা তুমি মরতে ওখানে প্রেমে পড়তে গেলে কেন?'

প্রভাত মুচকি হেসে বলল, 'তার আগে তুমিই বল মেয়েরা সাধুসন্ন্যাসী দেখলে পতঙ্গের মতো ছুটে যায় কেন? গুরু গুরু করে পাগল হয় কেন?'

রত্ন কী যেন বলতে যাচ্ছিল, প্রভাত তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সেদিন চোখে পড়ল টলস্টয় বলেছিলেন গোর্কীকে —'Not that a woman is dangerous who holds a man by his....but she who holds him by the soul.' মাঝখানের ডটগুলো আমার নয়।'

শরমে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিল না। দু'জনেরই মুখ শিমুল ফুলের মতো লাল। প্রভাত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। বলল, 'যোগিনীর প্রেমে পড়ে আমাকে সারা জীবন যোগী হতে হবে দেখছি। নয়তো একজনকে ভালোবেসে আরেকজনকে বিয়ে করতে হবে। যা সকলে করে। রতন, তুমি হলে কী করতে? গোরী যদি যোগিনী হতো তুমি কী হতে?'

ওটা একটা চ্যালেঞ্জ। রত্ন ঘেমে উঠে বলল, 'আমিও যোগী হতুম।'

'দূর মিথ্যুক! যার মধ্যে প্যাশন অত কম সে যোগী হতে পারে না। তার জন্যেও প্যাশন লাগে। গোরী ইচ্ছা করলে যোগিনী হতেও পারে, ভোগিনী হতেও পারে। তুমি পার না। ও মেয়ে তোমাকে ভোগেও হারাবে, যোগেও হারাবে। ও যদি আর্টিস্ট বা ইনটেলেকচুয়াল হয় তা হলেও তুমি ওর কাছে হারো। রতন, কেবল একটি বিষয়ে তুমি জিততে পার। হৃদয়ভরা ভালোবাসায়। তোমার হৃদয়টি সোনা দিয়ে তৈরি।

সোনালী হৃদয় । গোরী তোমার কাছে হারে তো ওইখানেই হারবে ।'

রত্ন অভিভূত হয়েছিল । আবেগের সঙ্গে বলল, 'আমি ওর কাছে সব বিষয়ে হারতে রাজী । ও আমাকে সর্বতোভাবে জিতে নিক । ওর নামেই আমার নাম হোক । চাঁদের মতো আমি হই সূর্যের আলোয় আলোময় । কান্তার রূপে কান্তিমান ।'

প্রভাত তার কানে টান দিয়ে বলল, 'এসব কথা পুরুষের মুখে মানায় না । পুরুষের মতো পুরুষ হতে হবে তোমাকে । নয়তো মেয়েরা তোমাকে নামঞ্জুর করবে। গোরীও ।'

আট

রত্ন তার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা মেলে দিল । তার পরীক্ষা শেষ হয়ে এসেছে । আর একটা দিন বাকী । তা নিয়ে ভাবতে হবে না । অনার্স সাবজেক্ট তো নয় ।

তার চোখে ঘুম আসছিল না । জল আসছিল । এমন করে গোরীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার জীবন যে ছাড়িয়ে নিতে বাধে । ছাড়িয়ে নেবার কথা ভাবতেই পারা যায় না । তার একমাত্র আশ্বাসনা যুগ্ম ইচ্ছা। গোরীর বা তার একার ইচ্ছায় তো সব কিছু হতে পারে না । গোরী যদি নীড় চায় ও সে চায় আকাশ তা হলে মাঝামাঝি একটা নীড়াকাশ কি সম্ভব হবে না ? তেমনি গোরী যদি যোগিনী হতে চায় ও সে চায় ভোগী হতে তা হলে কি মাঝামাঝি এমন কিছু নেই যা যোগও বটে ভোগও বটে ? তার কেমন এক অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে সহজিয়ারা এইরূপ এক মধ্যপন্থার সন্ধান পেয়েছিল । কিন্তু এখন থেকে ও কথা ভাবা বৃথা । প্রথম পদক্ষেপ প্রথমে । রত্ন উঠে চিঠি লিখতে বসল । গোরীকে ।

মাঝ রাত্রে বিদ্যুৎ নিবে গেল । তখন মোমবাতি জ্বালাতে হলো। এক সময় মোমবাতিও নিঃশেষ । তখন আবার মোমবাতি । মোমবাতির পর মোমবাতি । শিবরাত্রির জাগর চলল চৈত্রমাসের অন্য তিথিতে । দখিন হাওয়া এসে কেলি করে যাচ্ছিল আলোর শিখার সঙ্গে। মাঝে মাঝে নিবিয়ে দিচ্ছিল ।

রত্নর মনে হতে থাকল তার দৃষ্টি খুলে গেছে । সে আগের চেয়ে অনেক বেশী দেখতে পাচ্ছে । তার বয়সের ছেলেরা কেউ অত দূর দেখতে পায় না । বিশ্বরহস্য কি পুঁথি পড়ে ভেদ করা যায় ! ভেদ করতে হয় দৃষ্টি দিয়ে । আর দৃষ্টির উপর থেকে পর্দা সরে যায় প্রেম যখন গৃহপ্রবেশ করে । অন্তরে ঘর করে ।

রত্ন লিখছিল । লিখতে লিখতে লেখার কুহকে লিখে চলল—

আমার এ চিত্ত তোমার গৃহ । তুমি এ গৃহের গৃহিণী । প্রেমিকা তুমি । মানসী তুমি । আর কী তা আমি বলতে পারব না । গোরী, জ্যোৎস্না-গোরী, জানিনে তোমার মনে কী আছে । আমার মনে যা আছে তাও বলতে পারছিনে । ভাষা

এখনো তত সুন্দর হয়নি ।

আমি দিন দিন উপলব্ধি করছি যে ভাষা সৃষ্টি করতে হবে। প্রেমের ভাষা। যে ভাষায় প্রেম নিবেদন করবে দেশের তরুণতরুণীরা । সুন্দর প্রেম । চতুরঙ্গ প্রেম । যে প্রেম সুধার চেয়েও স্বাদু । মধুর চেয়েও মধুর । যার অন্য নাম মধুর রস । সেই মধুর রসের জন্যে চাই মধুরতর ভাষা । মধুরতম ভাষা ।

এটাও একটা কাজ । এই ভাষা সৃষ্টি করা। এ না হলে প্রেম বেশী দূর উড়তে পারে না, উঠতে পারে না । মানুষের প্রেম যে পাখীর প্রেমের চেয়ে এত দূরে এত উর্ধ্বে গেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের মুখের ভাষা । এ যদি পিছিয়ে পড়ে তবে প্রেম এগিয়ে যেতে বাধা পায় । সেইজন্যে এটাও একটা দরকারী কাজ। কাজের মতো কাজ ।

আমাদের পরে যারা ভালোবাসবে তারা আমাদের ভালোবাসার ভাষায় ভালোবাসা জানাবে । সেইজন্যে এ ভাষা নিখুঁৎ হওয়া চাই । শুধু কি ভাষা নিখুঁৎ হবে ? ভাষা যার বাহন সেও কি নিখুঁৎ হবে না ? হবে বই-কি । ভালোবাসা নিজে নিখুঁৎ হবে। মধুর থেকে মধুরতর। মধুরতর থেকে মধুরতম । প্রেমের আস্বাদন যদি কোনো দিন মাধুর্য হারায় বা তাতে মাধুর্যের ভাগ কম পড়ে তবে ভাষা দিয়ে সে অভাব পূরণ হবে না, প্রিয়ে । সেইজন্যে আমাদের সদা সজাগ থাকতে হবে প্রেম যাতে ফুরিয়ে না যায়, হারিয়ে না যায়, পালিয়ে না যায়, তিতিয়ে না যায়, বিষিয়ে না যায়, পাতলা হয়ে না যায় ।

তা বলে তাকে ধরে রাখতে বেঁধে রাখতে চাইব না আমরা । পারব না, যদি চাইও । একটি ভালোবাসার পক্ষে একটা জীবন কিছু নয় । সারা জীবন ভোর করে দিলেও ভালোবাসার অ আ ক খ সারা হয় না । আমার তো সবে হাতে খড়ি । আমার তো মনে হয় না যে তোমার কাছে আমার প্রেম শেখা কোনো দিন শেষ হবে । এ জীবনটা আমি তোমাকেই দিয়ে রেখেছি । যা তোমারই তাকে তুমি আলো বাতাসের মতো ভোগ করতে পার । কিন্তু তাকে বেড়া দিয়ে দখল করতে গেলে ঠকবে । দরজা জানালা বন্ধ করে কি আলো বাতাস ভোগ করা যায় ?

আমার দিক থেকে যা বলা হলো তা তোমার দিক থেকেও বলা। আমি তোমাকে সর্বতোভাবে পেলে ধন্য হব । কিন্তু তার জন্যে একটি বারও বলব না । আজ প্রভাত আমাকে একটা নতুন সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন করল । শুনে হাসবে । বলল, 'গোরী যদি যোগিনী হতো তুমি কী হতে ?' আমি তার মুখে মুখে জবাব দিলুম, 'আমিও যোগী হতুম ।' তার পর থেকে ভাবছি আর ভাবছি । ঘুম আর আসছে না । কত রকম সন্ধি ও সমন্বয়ের কল্পনা উঁকি মারছে । কিন্তু যতই ভাবছি ততই বুঝছি প্রভাতকে যে উত্তর দিয়েছি সে-ই যথার্থ ।

আর আমি যদি যোগী হই তা হলে ? এর উত্তর আমি দিতে পারিনে, দিতে পার তুমি । তুমি কী উত্তর দেবে তুমিই জান । যাই দাও সত্য করে দেবে । একবার

দিয়ে পরে যদি বুঝতে পার যে ভুল হয়েছে তবে ভুল শুধরে দিয়ো । পরস্পরকে প্রতারণার মতো পাপ আর নেই । প্রেম কখনো প্রতারণা সইতে পারে না । কিছু দূর পর্যন্ত পারে হয়তো । বেশী দূর পর্যন্ত নয় ।

ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করছি যে প্রেম একতরফা হতে পারে, সমস্ত বঞ্চনা সত্ত্বেও । পারে সারা জীবন । কিন্তু তার পরিণতি রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি অপর পক্ষ সাড়া না দেয় । ঠিকমতো সাড়া না দেয় । পরিণতি দু'পক্ষের অপেক্ষা রাখে । দু'পক্ষের সাড়ার । ঠিকমতো সাড়ার। নয়তো ছন্দ কেটে যায় । সেই তো বিচ্ছেদের নিদান । বিরহকে ভয় নেই। বিচ্ছেদকে ভয় । প্রিয়তমে, বিচ্ছেদেরও ভয় নেই, যদি আমরা সাড়া দিয়ে থাকি, সাড়া পেতে থাকি—হোক না কেন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে ।

রত্ন আরো কত কথা লিখত জমে যাওয়া চিঠিগুলোর উত্তরে । কিন্তু তার কানে এলো, 'রতন, তোমার ঘরে তখন থেকে আলো জ্বলছে কেন, ভাই ? পরীক্ষার পড়া এত কি বাকী আছে ? আমি কি তোমার মনে কোনো রকম আঘাত দিয়েছি ? আমার সেই পরিকল্পনাটার দোষ নয় তো ? না প্রেমের সীমানির্দেশ করেছি বলে উত্তেজিত হয়েছ ?'

রত্নর মনে বিঁধে রয়েছিল প্রভাতের সেই উক্তি—'ওর মধ্যে প্যাশন এত বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমরা তোমাদের বন্ধুরাই বাধা দেব ।' তার ঘুম না আসার সেটাই সব চেয়ে বড় কারণ । অথচ গৌরীকে সাত আট পাতা জুড়ে এত ক্ষণ ধরে যে চিঠি লিখেছে তাতে ও কথার আভাসটুকুও নেই ।

দরজা খুলে দিল রত্ন । প্রভাত ঘরে ঢুকল না । প্রস্তাব করল বাইরে গিয়ে বসতে। শীত সামান্যই ছিল । তিন প্রহর রাত্রে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের ঘন ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আকাশ পারাবারের তটে বালুকণা গুনতে বসল দুই বন্ধুতে । খুঁজতে লাগল আপন আপন তারা ।

প্রভাত বলল, 'যার যেমন তারা তার তেমন ভাগ্য । আমি জ্যোতিষ না মানলেও এটা মানি যে নারীর প্রভাব ও পুরুষের ভাগ্য একসঙ্গে যায় । কে তোমার নারী, আমাকে বল । আমি বলে দেব, কী তোমার ভাগ্য ।'

তাজ্জব ! রত্ন বিশ্বাস করল না । তখন প্রভাত আবার বলল, 'আমার ভাগ্য আমার জানতে বাকী নেই । আমার তারা হবে সন্ন্যাসিনী আর আমি হব ষোল আনা স্বাভাবিক মানুষ । যোগিনীর সঙ্গে ভোগীর প্রেম । দেবীপ্রতিমার পায়ের দিকে যেমন মহিষাসুর মূর্তি তেমনি আমার তারার দিকে নয়ন তুলে আমি । দেবী দেবীই থাকবে, দানব দানবই থাকবে, প্রেম প্রেমই থাকবে । থাকবে না শুধু সামঞ্জস্য । তার স্থান নেবে টেনসন । ভাই রতন, যোগে আর ভোগে স্বতোবিরোধ । সন্ধি হবে কোন শর্তে ?

রত্নরও সেই জিজ্ঞাসা। কোন শর্তে?

প্রভাত বলল, 'যাক, তোমার কাছে এ প্রশ্ন গুরুতর নয়। কারণ তোমার তারা

যোগিনী নয়।' তার পর কী মনে করে বলল, 'তবু তোমার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তোমার তারা সুদূর। কে জানে কত কাল সুদূর থাকবে। তার মুক্তির পরেও কি তাকে তুমি পাবে ? ডিভোর্স হিন্দু সমাজে অচল। তা হলে হরে দরে সেই একই দাঁড়াল। যোগে আর ভোগে স্বতোবিরোধ। সামঞ্জস্যের পরিবর্তে টেনসন।'

'না, টেনসন কেন হবে ! ও যদি যোগিনী হয় তবে আমিও যোগী হব।' রত্ন বলল অস্ফুট স্বরে। বোধ হয় বুকে আর মুখে অসহযোগ।

'আর ও যদি যোগিনী না হয় ?' প্রভাত বলল অর্থপূর্ণ ভাবে।

রত্ন এর জন্যে তৈরি ছিল না। ঘাবড়ে গেল। প্রভাতের নীরবতাও অর্থপূর্ণ। রত্ন মুষড়ে পড়ল। প্রভাতের প্রশ্নের যত রকম উত্তর দিতে যায় কোনোটাই জুতসই নয়।

প্রভাত বলল, 'তোমাদের কথা আমি যখন অবসর পাই ভাবি। কিন্তু কোনো মতেই তোমাদের মেলাতে পারিনে। মেলাতে গেলে দেখি উলটো বিপত্তি। সেইজন্যে তোমাকে নিরুৎসাহিত করি। ওকেও। কিন্তু ক্রমেই আমার প্রত্যয় হচ্ছে তোমাদের প্রেম সত্য। প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল তোমরা প্রেমের আইডিয়াটারই প্রেমে পড়েছ। অদেখা অচেনারও তো একটা মাদকতা আছে। একটু একটু করে বোধগম্য হচ্ছে তোমরা দু'জনেই খুব সীরিয়াস। তোমাদের মেলাতে পারলে আমি সুখী হতুম, কিন্তু সমাজ তো আমার হাতে নয়। হিন্দুরা বিধবাবিবাহে নিমরাজী হয়েছে, কিন্তু সধবাবিবাহে গররাজী হবেই। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে ডিভোর্স একদিন সম্ভব হবে ততঃ কিম্? তুমি তো বিবাহে বিশ্বাস কর না, সংসারী হতে চাও না।'

রত্ন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'গোরী যদি প্রস্তাব করে আমি ঠেলতে পারব না।' তার বুকের স্পন্দন কানে বাজছিল।

'দূর বুদ্ধু ! মেয়েরা কি প্রস্তাব করে ! প্রস্তাব করতে হয় পুরুষদেরই। কবে যে তুমি পুরুষের মতো পুরুষ হবে ! গোরী যদি তোমাকে পুরুষ করে তুলতে পারে আমি তাকে সাত ভাই চম্পার তরফ থেকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবার প্রস্তাব আনব।'

এর পরে প্রভাতের মনে পড়ল সে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। 'হাঁ, যা বলছিলুম। তোমরা কি সত্যি বিয়ে করবে ! কর তো আমি তোমাদের বিয়ে দিতে পারি।'

রত্ন যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'কী করে ? কী করে ?'

প্রভাত তাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বলল, 'ইসলামী মতে।' তার পর ভয় ভাঙাবার জন্যে বলল, 'কেন ? ভয় কিসের ? এই তো আমাদের বাবুলাল মুসলমান। কে বলবে যে হিন্দু নয় ! ধর্মে হিন্দু নয়, কিন্তু আর সব বিষয়ে হিন্দু। হিন্দুর মতোই আচার ব্যবহার। আমরা সকলে ওর হাতে খাই। 'এ মল্লিক' যে মুসলমান ক'জন খোঁজ রাখে ? 'কে মল্লিক' যে মুসলমান তা তুমিও কি জান ? তেমনি 'আর মল্লিক' যে মুসলমান তা কেউ টের পাবে না। মিসেস মল্লিকের প্রথম নাম যে কী তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামাবে না।'

রত্ন ভেবে বলল, 'তা নয়। আমি যে ভগবানকে নারীরূপে ধ্যান করি। নারীতে

ভগবান দেখি। আমি যদি ইসলামে দীক্ষা নিই ওরা কি আমাকে আমার বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেবে ? আর ও বেচারির দিকটাও ভেবে দেখতে হয়। ওর গৃহদেবতা মাধব ওর কাছে আমার চেয়েও প্রিয়। মাধবকে কি ও ছাড়তে পারবে ? জোর করে ছাড়াতে গেলে আবার সেই বলপ্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে। মানুষের উপর মানুষ ফোর্স খাটাবে এখানে আমার মৌলিক আপত্তি। তা সে কায়িক অর্থেই হোক আর মানসিক অর্থেই হোক।'

প্রভাত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তা হলে আমি নাচার। তোমরা কেউ সীরিয়াস নও। প্রেমে সীরিয়াস হতে পার। বিবাহে সীরিয়াস নও। বেশ, তবে হাত গুটিয়ে বসে থাক। আমি আগে কাউন্সিলে যাই। আইন বদলানোর জন্যে হৈ চৈ করি। তোমাকে ভরসা দিতে পারি যে আগামী নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির টিকিট নিয়ে আমি দাঁড়াচ্ছি। খোদ দেশবন্ধু আমাকে ভালোবাসেন। তিনি বেঁচে থাকতে আমাকে রুখবে কে ? তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না, শুনছি। ভাবছি একবার দার্জিলিং গিয়ে দর্শন করে আসব। একটা চাকরির জন্যেও উমেদারি করতে হবে। ক্যালকাটা করপোরেশনে।'

রত্ন জানত না যে প্রভাত আর পড়বে না। চাকরি করবে। প্রভাত বলল, 'ওরা যদি অনুমতি দেয় সন্ধ্যাবেলা ল কলেজে হাজিরা দেব। আইনের ডিগ্রী পাব। তার পর চাকরি ছেড়ে ওকালতী। ওকালতীতে দু'পয়সা হলে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হতে সাধ। আরে, ভাই! ব্যারিস্টার না হলে তোমাকে চিনবে কে। তোমার কথার দাম কী! দেশবন্ধু যদি ব্যারিস্টার না হয়ে মোক্তার হয়ে থাকতেন কি উকীল হয়ে থাকতেন তা হলে কি তাঁর এমন দেশজোড়া নাম হতো। তা যদি বল, সুভাষদা যদি আই সি এস না হয়ে ডেপুটি কি সাবডেপুটি হয়ে থাকতেন বা লেকচারার হয়ে থাকতেন তা হলে কেউ তাঁকে এত বেশী সম্মান করত! দেশের লোকের দুর্বলতাগুলো ভালো করে অধ্যয়ন করতে হয়। তা যদি বল, তোমার মহাত্মা গান্ধী যদি ব্যারিস্টার না হয়ে ঝাড়ুদার হয়ে থাকতেন তা হলে কী হতো আমি লিখে দিতে পারি। ওই বিরাট ব্যক্তিত্ব কারো নজরে পড়ত না। ওকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে আবার সন্ন্যাসেরও দরকার ছিল। তা না হলে তিনি কি তিলকের চেয়ে জনপ্রিয় হতে পারতেন ? ওটা ভারতের সনাতন দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। সন্ন্যাস চিরদিন এ দেশের মনোহরণ করে এসেছে।'

গান্ধীর সমালোচনা রত্ন সহ্য করতে পারত না। যদিও নিজে সমালোচনা করতে পেছপাও হতো না। তার ভাবখানা যেন এই যে, আমার আপনার লোকের দোষ আমি ধরব, তুমি ধরবার কে ?

রত্ন টিপ্পনী কাটল, 'ভারতের সনাতন দুর্বলতা তোমারও তো মনোহরণ করেছে।'

প্রভাত যেন ঠিক এই জিনিসটির প্রতীক্ষায় ছিল। আলোচনাটাকে ঠেলতে ঠেলতে সন্ন্যাসের দিকে নিয়ে আসা প্রকারান্তরে সন্ন্যাসিনীর দিকে নিয়ে আসা। মহিলাটির নাম সে কিছুতেই ফাঁস করবে না। বয়স ? সমবয়সিনী। রূপ ? অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী। গুণ ? সর্বগুণান্বিতা। তবে তিনি সন্ন্যাস নিলেন কেন ? সেইখানেই তো রহস্য। বোধ হয় তাঁর আকর্ষণ শতগুণ করার জন্যে। চিরন্তন করার জন্যে।

প্রভাত হাহুতাশ করে বলল, 'আমার ভাগ্যে সুখ নেই। আমার তারা আমাকে

সুখী হতে দেবে না । ওকে পেলে তো সুখী হব ! তা হবার নয় ।'

রত্নর মনে পড়ছিল অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রভাত তাকে কী পরামর্শ দিয়েছিল । মালাদি যদি তার প্রেমের প্রতিদান দিতেন, যদি তাঁকে বিয়ে করতেন, তা হলে বাকীটুকু তাঁর করুণা নয়, তার পৌরুষ । প্রভাতকে ও কথা মনে পড়িয়ে দিতেই সে লাফ দিয়ে উঠল ।

'কী সর্বনাশ ! সন্ন্যাসিনীকে সন্ন্যাসভ্রষ্ট করা ! পাপ হবে যে ! অনির্মল নর যদি অঙ্গস্পর্শ করে দেবীপ্রতিমা কলুষিত হবে যে !' প্রভাত ত্রস্ত হয়ে বলল ।

'আর নির্মল নর যদি অঙ্গস্পর্শ করে ?'

'তুমি যতই নির্মল হও না কেন অঙ্গস্পর্শ ব্যাপারটাই অনির্মল । আমি তো ওর মধ্যে শুচিতার নামগন্ধ পাইনে । বিবাহসত্ত্বেও না । মাতৃত্বসত্ত্বেও না । যা অশুচি তা অশুচি । গোবর ছিটিয়ে তাকে শুচি করা যায় না। ওটা মনকে চোখ ঠারা ।'

রত্ন চেপে ধরল, 'তা হলে মানতে হয় যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরাই ঠিক ।'

প্রভাত কোণঠাসা হয়ে বলল, 'সে বিষয়ে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রীস্টান একমত । ন্যায়ত আমারও সন্ন্যাসী হওয়া সঙ্গত । কিন্তু আমি আধুনিক সভ্যতায় দীক্ষিত হয়েছি । নারী ও নর একসঙ্গে হাত না লাগালে এ সভ্যতার রথ চলবে না । সেইজন্যে আমি সন্ন্যাসের উপর খড়গহস্ত । ভোগ বাদ দিলে এ সভ্যতার প্রায় সবটাই বাদ পড়ে । ভোগ বলতে কেবল সম্ভোগ নয়, শিল্প বিজ্ঞান স্থাপত্য বাণিজ্য সব কিছুই বোঝায় । আমি ভোগী হব । তুমি ভোগী হবে । দেশসুদ্ধ লোক ভোগী হবে । নইলে ভালো ঘরবাড়ী, ভালো আসবাবপত্র, ভালো পোশাক, ভালো খাবার, ভালো ছবি, ভালো গান, ভালো যন্ত্রপাতির সমজদার থাকবে না, খরিদদারও জুটবে না । উৎপাদন লোপ পাবে। সভ্যতা দেউলে হবে ।'

তারা ভরা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রত্ন বলল, 'ভাই প্রভাত, আমি তো ঐশ্বর্যের উপাসক নই । মাধুর্যের উপাসক । আধুনিক সভ্যতা বলতে যদি ঐশ্বর্য বোঝায় তা হলে তার শোভাযাত্রায় আমার স্থান কোথায় ? আমি ওই আকাশের তারাদের দলে । ওই সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের । সপ্তর্ষি মণ্ডল ও অরুন্ধতীর ।'

তার পর বলতে লাগল, 'কাল অনুসারে আধুনিক হওয়া তো গুণ অনুসারে আধুনিক হওয়া নয় । গুণ অনুসারে আধুনিক হতে হলে ফোর্স জিনিসটাকে পরিহার করতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হবে স্বাধীন ও সপ্রেম । যত রকম মানবিক সম্বন্ধ আছে সব ক'টা হবে স্বাধীন ও সপ্রেম । আরো কত রকম সম্বন্ধ সৃষ্টি হবে । সেও হবে স্বাধীন ও সপ্রেম । মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যদি বল দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হলো তবে ভদ্রবেশে আদিম পশুই রয়ে গেল । তার হাতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক । আর ভোগ-বিলাসের অশেষ উপকরণ তুলে দেওয়াও অপচয়কর । অমনি করেই এ সভ্যতা দেউলে হবে বা অপঘাতে মরবে ।'

'তার পর,' রত্ন আরো বলল, 'কোনটা আদিম আর কোনটা এলিমেন্টাল তা যদি আমরা খুঁটিয়ে না দেখি তা হলে ভুল করব । যাকে তুমি অশুচি ভাবছ তা এলিমেন্টাল । নারীর সঙ্গে নরের সম্বন্ধ যদি বলবর্জিত হয়, যদি স্বাধীন ও সপ্রেম হয়, তা হলে কোনো

অবস্থায় অশুচি হতে পারে না। প্রাণগঙ্গার গঙ্গোত্রী কি অশুচি হতে পারে ? তা হলে প্রাণও অশুচি। এলিমেন্টালকে আদিম বলে ভুল বোঝার ফলে এই কুসংস্কার।'

প্রসঙ্গটার পরিবর্তন করে প্রভাত বলল, 'ও তোমাকে বড্ড ভালোবাসে। না, রতন ?'

রত্ন যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বিশ্বাস করে বলল, 'হ্যাঁ, ভাই। মা'র মতো। মানে, তেমনি। মানে, মাত্রাতীত। অনেক ভালোবাসাই এ জীবনে পেলুম। কিন্তু এর মতো কিছু নয়।'

প্রভাত গদগদ ভাবে বলল, 'ভালো। ভালো। সব ভালো। শুধু এক বাটি দুধে এক ফোঁটা ব্রাণ্ডি যদি না মিশত তা হলে আরো কত ভালো হতো! বুঝলে ?'

রত্ন বুঝেছিল। বলল, 'কেন ? প্যাশন কি মন্দ ?'

'মন্দ নয় তো কী! প্যাশন যদি একের দ্বারা তৃপ্ত না হয় অন্যের দিকে ছোটে। একাধিকের দিকে তাকায়। তার একনিষ্ঠতা নেই। অথচ প্রেম স্বভাবত একনিষ্ঠ। যা থাক কপালে সে একজনকেই বেছে নেয়। প্রেম বলে, আমার প্রিয়া যদি সন্ন্যাসিনী হয় তবে সন্ন্যাসিনীই শ্রেয়। আর প্যাশন বলে, শ্রেয় হলে কী হবে! প্রেয় নয়। সে তো তৃপ্তি দিতে পারে না। যে তৃপ্তি দেবে তারই সঙ্গ চাই।'

রত্ন ভেবেছিল প্রভাত তার নিজের পরিস্থিতি ব্যক্ত করছে। কিন্তু প্রভাত আরো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল। 'প্যাশনের ভাষা সর্বত্র এই। নরনারী নির্বিশেষে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রত্ন বলল কাঁপতে কাঁপতে, 'ও যদি আমাকে নিয়ে সুখী না হয় আমি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সরে যাব, প্রভাত। আমার মনে হয় প্রথম দর্শনেই তার আভাস পাব। তোমার কী মনে হয় ?'

প্রভাত বলল, 'হাঁ। প্রথম দর্শনেই তোমার ভাগ্যনির্ণয় হয়ে যাবে। তবে এ ব্যাপারে প্রথম দর্শনই শেষ কথা নয়। মিলনকামী নরনারী পরস্পরকে চেনে শুভদৃষ্টির লগ্নে নয়, ফুলশয্যার রাত্রে। আলোতে নয়, অন্ধকারে। মানুষের জগতে এই একটিমাত্র চেনা যা অন্ধকারের অপেক্ষা রাখে। যা সূর্যের আলোকে ভয় করে, চাঁদের আলোকে ভয় করে, তারার আলোকে ভয় করে। এমন কি দীপের আলোকেও ডরায়। যেখানে ধর্ম অভয় দিচ্ছে সেখানেও কেন এই ত্রাস ? সেইজন্যেই বলি অশুচি। তুমি যাই বল না, ভাই রতন, আমি কিছুতেই স্বীকার করব না যে নরনারীর মিলন কোনো অবস্থায় শুচি হতে পারে। অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্র পড়াও মনকে চোখ ঠারা।'

'অথচ', প্রভাত এই পর্যন্ত মেনে নিল, 'মনকে চোখ ঠারাও দরকার। মনটা একটা ইডিয়ট। কত সহজে ভোলে। এই যে আমি তোমার সঙ্গে এত তর্ক করছি, কখনো কি পারতুম আমার ওর সঙ্গে তর্ক করতে, যদি আজকের এই অন্ধকার রাত্রে তোমার বদলে ও বলত এই সব কথা ? গন্ধর্বদের মতো প্রাণপণে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াতুম। দু'জনে মিলে।'

রাত হয়ে যাচ্ছিল। দুই বন্ধুরই পরীক্ষা বাকী ছিল। উঠতে হলো অগত্যা। চলতে চলতে প্রভাত বলল, 'একটা কথা আমি এখনো বুঝতে পারিনি। ওর চারদিকে এত

পুরুষ থাকতে তোমাকেই কেন ওর পছন্দ হলো ? তুমি কি পুরুষোত্তম ? কী তোমার সিক্রেট ? তোমার হৃদয়টি সোনালী । এই কি ? তার জন্যে কি মেয়েরা সব সমর্পণ করে ?'

রত্ন বিমূঢ় হয়ে বলল, 'কী জানি । অত ভেবে দেখিনি । এক হতে পারে আমি ফ্রী ম্যান । আমি ওকে ডাক দিয়েছি মুক্ত আকাশের তলে । আমার প্রেম আউটডোর প্রেম । আমার জীবনটাও আউটডোর জীবন । আমি ঘরের মানুষ নই, চরের মানুষ। চরের মানুষ ঘর বাঁধে না । বাঁধলেও সে ঘর কাঁচা । আমি ঝড় জল আলো বাতাস আগুন বিদ্যুতের স্বজাতি । আমি ফ্রী স্পিরিট । মুক্তি বলতে ও এত দিন যা বুঝেছিল তা নেতিবাচক । বিযোড় থেকে মুক্তি । মনে হয় এবার একটা কিছু ইতিবাচক বুঝেছে। যোড়ের মধ্যে মুক্তি । আমার বিশ্বাস বিধাতা আমাদের যোড়ে যোড়ে পাঠান । কে যে কার জুড়ি তা আবিষ্কার করতে হয় । মনে হয় ও ওর জুড়িটিকে আবিষ্কার করেছে। আমিও আমারটিকে ।'

প্রভাত তার হাতে চাপ দিল । চাপটা বিদায় সূচক । বলল, 'আমিও আমারটিকে ।'

আবার কবে দেখা হবে কে জানে ! তাই কথা যেন ফুরোতে চায় না । তার আগে রাত হয়তো ফুরোবে । প্রভাত পা বাড়ালে রত্ন তার সঙ্গে পা মেলায় । রত্ন ফিরতে গেলে প্রভাতও তার সঙ্গে ফেরে । ফিস ফিস গুজ গুজ চলতে থাকে ।

রত্ন বলল, 'আরেক হতে পারে অন্যের কাছে ও যা পেয়েছে তা প্রেম নয়, শেম । আমার কাছে যা পাবে বলে আশা করেছে তা শেম নয়, প্রেম । তোমার সঙ্গে আমার কোথায় মিলছে না, বুঝেছ ? তুমি ধরে নিচ্ছ যে মিলনমাত্রেই শেম । অথচ অপরিহার্য । আমার বিশ্বাস তা নয় । গোরীর বিশ্বাস তা নয় । তা যদি হতো তবে ওর অন্য উপায় ছিল । নিরুপায়ের মতো ও আমার দিকে অমন একান্তভাবে তাকিয়ে রইত না। বাউলদের একটা গান আছে। শুনেছ বোধ হয় । লালন ফকিরের ভণিতা ।

চাতকের এমনি ধারা
তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা
তবুও অন্য বারি খায় না তারা
মেঘের জল বিনে ।

আমাকে পাগল করে দেয় যখন ভাবি যে মধুর রসের আস্বাদন পাবার জন্যে একটি কন্যা তৃষিত হয়ে চেয়ে আছে চাতকের মতো আমার দিকে । আর আমি কিনা দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াব বলে সংকল্প করেছি বৈশাখের মেঘের মতো ।'

প্রভাত বলল, 'একটি মেয়ের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানোতেই পৌরুষ বেশী । তোমার সংকল্প তুমি কেন ত্যাগ করবে ? ত্যাগ যদি করতে হয় ও-ই করবে ওর গৃহ । বৃহত্তর জীবনের জন্যে। ভাই রতন, তোমায় শক্ত হতে হবে । আমি স্বীকার করি যে গোরীর মতো নারী আর হয় না, তোমার কাছে গোরীর প্রেমই সাধ্যাশিরোমণি । তা বলে তুমি কেন তোমার জীবনের পরিকল্পনা বিসর্জন দেবে?

পুরুষ যদি তার কেরিয়ার বিসর্জন দেয় তা হলে তার জীবনে কাজ কী ? মেয়েরা কেন যে এটা বোঝে না !'

পুরোনো তর্ক । রত্ন ওটার পাশ কাটিয়ে গেল । বলল, 'আমার ভালোবাসা সসীম নয় । আমার ভালোবাসা নয় তেমন ভালোবাসা যে ভালোবাসা বলে, এত দূর পর্যন্ত, এর বেশী নয় । আমি হাতে রেখে ভলোবাসতে জানিনে । একজনকে ভালোবেসে আরেকজনের জন্যে কিছু হাতে রাখিনে । আমার ভালোবাসা সর্বস্ব পণ করে । কেরিয়ার তো তুচ্ছ । ভাই প্রভাত, গৌরীর সঙ্গে আমার তাস খেলার স্টেক অত্যন্ত উঁচু । জিতলে সব কিছু জিতে নেব । হারলে সব কিছু হারাব । যায় যাবে জীবনের পরিকল্পনা ।'

প্রভাত তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তা বলে কালকের পরীক্ষায় ফেল করা চলবে না । যাও, শুয়ে পড় গে ।'

ভোরের আগে রত্নর ঘুম ভেঙে গেল । কিন্তু কী এক অপরূপ অনুভূতি তাকে অনেকক্ষণ অবধি আচ্ছন্ন করে রাখল । তার সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু নির্ণয় করার শক্তি ছিল না কিসের অনুভূতি । পরে যখন তার ভালো করে জ্ঞান হলো তখন মনে হলো প্রেম এসেছিল তার সমস্ত সত্তা ছেয়ে । ওই অব্যক্ত অনুভূতি প্রেমের অনুভূতি ।

কিসের সঙ্গে ওর উপমা দেওয়া যায় ? তার হৃদয় ভরে উঠেছে, ভারী হয়ে উঠেছে, ব্যথা করছে স্তনের মতো স্তন্য রসে । সেখানে ক্ষীর জমে গেছে, উপচে পড়ছে । কে সেই ক্ষীর টেনে নেবে ? নিঃশেষে পান করবে ?

গৌরীকে তার মনে ছিল না । একটু একটু করে মনে পড়ল । আছে । আছে একজন যে তার ভরা বুক খালি করবে, ভারী বুক হালকা করবে, জমে ওঠা ক্ষীর নিঃশেষে আকর্ষণ করবে । তখন এ ব্যথা থাকবে না । এই উপচয়ের ব্যথা ।

রত্নর মনে হলো তার কোনো অভাব নেই, অভাববোধ নেই । তার আছে ঐশ্বর্য । অপার্থিব ঐশ্বর্য । যা দিয়ে সে গৌরীকে ধনী করে দিতে পারে । তার আছে মাধুর্য । অন্তরের মাধুর্য । যা দিয়ে সে গৌরীর পিপাসা মেটাতে পারে । পরিবর্তে সে কিছু চায় না । তার কোনো কামনা নেই । সে পূর্ণ ।

পরীক্ষা অবশেষে সারা হলো। শেষ খাতাখানি প্রহরীর হাতে সমপর্ণ করে রত্ন চলে গেল গঙ্গার ধারে । সেখানে গা মেলে দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত চুপচাপ পড়ে থাকল । নদীর দিকে চেয়ে রইল অপলক নেত্রে । কাল থেকে দেখতে পাবে না পারাপারের দৃশ্য । তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল নুয়ে পড়া মাঝি দূরে থাকা নৌকার গুন টেনে । তার সামনেই হঠাৎ মাথা তুলে উঠছিল শুশুক । তক্ষুনি ডিগবাজি খেয়ে ডুব দিচ্ছিল । মেয়েরা ঘট ভরছিল । রত্ন নয়ন ভরে নিল ।

সে রাত্রে গেট বন্ধ হলো না । সারা রাত মানুষের পায়ের শব্দ, ঘোড়ার খুরের শব্দ । হস্‌টেল ছেড়ে ছেলেরা বাড়ীর পথ ধরেছে । কে ফিরবে, কে ফিরবে না, এই তাদের একমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ । 'রত্ন, তুমি ফিরবে তো ?' 'না, ভাই ।' বলতেও কষ্ট, শুনতেও কষ্ট । কে জানে হয়তো আবার দেখা হবে। 'পুনর্দর্শনায় চ ।'

রত্নও বেরিয়ে পড়ত সেই রাত্রেই । বেরিয়ে পড়ার গণ-উত্তেজনায় । কিন্তু তার

মন পড়ে রয়েছিল পরের দিন সকালবেলার ডাকের উপর । গৌরীর চিঠির আশায় । কী বন্ধন ! কী মধুর বন্ধন ! গৌরীকে মুক্ত করতে গিয়ে রত্ন পড়েছে বাঁধা । আনন্দের সঙ্গে বাঁধা ।

ঘুম আসছিল না । ঘুম যদিবা আসতে চায় রত্নই তাকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠেকিয়ে রাখে । গৌরীর সঙ্গ আরো কিছু ক্ষণ পেতে চায় । ধ্যানে ।

নয়

যাত্রার জন্যে রত্ন পা বাড়িয়ে বসেছিল । কিন্তু ন'টার আগে তো ডাক দিয়ে যাবে না। ততক্ষণ যাত্রীদের যাত্রা দেখবে, না গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটবে ? মনঃস্থির করা শক্ত । যাত্রা দেখারও একটা আকর্ষণ আছে ।

এমন সময় তার কানে এলো কে যেন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'রত্নকান্ত মল্লিক । আছেন না চলে গেছেন ?'

রত্ন চিনতে পেরেছিল কার গলা । রমেনদা তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আবার দেখা হলো তা হলে !'

'পরেও কত বার দেখা হবে ।' রত্ন আশ্বাস দিল ।

'তোমার পরীক্ষা চলছিল বলে তোমাকে বিরক্ত করিনি । কেমন পরীক্ষা দিলে ? ভালোই ? সাবাস । এবার কী করবে কিছু ভেবেছ ?' এমনি কত কথার পর রমেনদা বলে বসলেন, 'তুমি যদি বিনয় সরকারের মতো বিশ্বময় ঘুরে বেড়াও, দশ বছর পরে ফের, আমি কি তত দিন বেঁচে থাকব ?'

'কেন ? কেন ? বেঁচে থাকবেন না কেন ? কতই বা আপনার বয়স ? আমি ফিরে এসে দেখব আপনি হাইকোর্টের য়াডভোকেট হয়ে দিব্যি পসার জমিয়েছেন । যেমন মোটা পসার তেমনি মোটা আপনি । এখনকার মতো তালপাতার সেপাই নন ।'

রমেনদার চোখে জল এসে পড়ল । কতকটা আপন মনে বলে ফেললেন, 'তোমাকে আজ যদি না জানাই আর কবে জানাব ? আমার মানসী নারী সাবিত্রী । যে নারী এক বছর বাদে বিধবা হবে শুনেও স্বয়ংবরা হয় আর যমের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধে জিতে অবিধবা হয় ।'

রত্ন প্রথমটা ঠাহর করতে পারল না । তার পর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল । বলল, 'রমেনদা, আপনি কি সত্যবান ?'

তিনি হাসির ভাণ করে বললেন, 'কেন ? আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি এক বছর পরে থাকব না ?'

'কেন থাকবেন না ?' রত্ন ত্রস্ত হয়ে বলল, 'আলবৎ থাকবেন ।'

'কিন্তু জ্যোতিষীরা তা বলে না, ভাই । একজন নয় । একাধিক জন ।'

'আমরা সাত ভাই চম্পার দল জ্যোতিষ মানিনে । ওরা আপনাকে এমন ভয় পাইয়ে

দিয়েছে যে শেষটা হয়তো ভয়ে ভয়েই আপনার দেহান্ত হবে । তখন ও বেটারা বলবে ওদের গণনা অভ্রান্ত । বেটাদের ফাঁসী হওয়া উচিত।' অহিংসাবাদী বলে উঠল ।

'বলেছ বেশ !' রমেনদা করুণ স্বরে বললেন, 'কিন্তু বাংলাদেশের [illegible] কাছে ওদের লিখনই বিধাতার লিখন । আর কুমারীরা যদিও সাবিত্রীসমান হতে উপদেশ পায় তবু জ্যোতিষীদের সতর্কতাবাণী শুনে বৈধব্যের ভয়ে পেছিয়ে যায় । গরিবের মেয়ে । দেখতে ভালো নয় । তাকে যদি পছন্দের স্বাধীনতা দেওয়া হয় সেও পছন্দ করবে না আমাকে । সেও বিধবা হতে ভয় পায় । আর আমি জলজ্যান্ত মানুষটা যে মরে নাস্তিত্ব হয়ে যাব আমার দিকটা সে ভেবে দেখবে না ।'

রমেনদার কণ্ঠস্বরে হতাশা । রত্ন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছিল না যে জলজ্যান্ত মানুষটা নাস্তিত্ব হয়ে যাবে বছর না ঘুরতে । ধর, তাই যদি হয় তবে কী হবে আরেক জনের জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে ! তার চেয়ে মহাপ্রয়াণের জন্যে প্রস্তুত হওয়া শ্রেয় ।

'তুমি যে বল মেয়েরা যদি পছন্দ করে বিয়ে করে তা হলে আর কোনো গোল থাকে না, কই, তা তো এখানে খাটছে না ?' রমেনদা সমাজসংস্কারককে চেপে ধরলেন ।

'কিন্তু, রমেনদা, কেন বেচারিদের পরীক্ষায় ফেলবেন ? বিয়ে করে কাজ কী আপনার ? যদি বাস্তবিক জীবনের আশা ফুরিয়ে এসে থাকে ?'

'উঁহু । তা নয় । তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না, ভাই । সত্যবানের একমাত্র আশা সাবিত্রী বলে এ জগতে কেউ একজন থাকবে যে তাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে । বিধাতার লিখন রদ করবে। সেই সাবিত্রী কি আছে না নেই ? সে কি কবিকল্পনা ? তা হলে কেন মেয়েদের আশীর্বাদ করা হয়, সাবিত্রীসমান হও ? তবে দুটি একটি মেয়ের নাম জানি যারা ডাক্তারের নিষেধসত্ত্বেও বাপ মার অমতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বৈধব্যের ঝুঁকি নিয়ে যক্ষ্মারোগীকে বরণ করেছে, বিয়ে করেছে । যমদূতকে বেশ কিছুকাল ঠেকিয়ে রেখেছেও । এরাই নারীরত্ন । এদের একজনের ভালোবাসা পেলে এ জীবনে আমারও আশা থাকত, ভাই ।' রমেনদার আশা দুর্মর । তিনি এখনো আশা রাখেন ।

'নারীরত্ন' শুনে গৌরীকে মনে পড়ছিল রত্নর । গৌরী কি রত্নকে সত্যবান জানলে সাবিত্রীর মতো ভালোবাসত, সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসত ? কে জানে ! কিন্তু রত্নর নিজের প্রেম যেন সাবিত্রীর সমান হয়, যেন যমের সঙ্গে যুঝে বিজয়ী হয়, যদি তেমন কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে গৌরীর জীবনে । ভগবান না করুন।

আচ্ছা, সোনালী কি পারত না রমেনদাকে বাঁচাতে ? তা হলে তো সোনালীও বাঁচত। জ্যোতিষীদের মুখে ছাই পড়ত । সাত ভাই চম্পার মুখ উজ্জ্বল হতো ।

রমেনদা তা শুনে রসিয়ে রসিয়ে বললেন, 'রত্নভাই, তোমার প্রতিভা আছে । কী রকম একখানি যোজনা ! অযোগ্যং অযোগ্যেন যোজয়েৎ ! যে পুরুষকে কোনো নারী বরণ করবে না আর যে নারীকে কোনো পুরুষ গ্রহণ করবে না সেই নাবালুর মানবমানবীর একজনের ব্যর্থতার সঙ্গে আরেক জনের ব্যর্থতা যোগ করলে যোগফল দাঁড়াবে একজোড়া সার্থকতা ।' তার পর সস্নেহে বললেন, 'আসলে তুমি চাও না যে তোমার ভাইবোনেরা

কেউ অসার্থক হয় বা অসার্থক হয়ে অকালে ঝরে যায় ।'

রত্ন অপ্রতিভ হলো । কিন্তু তার মন মানল না । তার স্থির বিশ্বাস রমেনদা যদি সোনালীকে বাঁচাতেন সোনালীও রমেনদাকে বাঁচাতে পারত । তাঁকে বাঁচতে দিচ্ছে না তাঁর সমাজভয় । সোনালী যে পতিতা ।

'আচ্ছা, রমেনদা, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি । সোনালীর হয়ে কথা বলবার অধিকার নেই আমার । তার চেয়ে বরং আর একটি মেয়ের নাম করতে পারি ।' কিন্তু বলতে গিয়ে থমকে গেল রত্ন । অনধিকারচর্চা নয় তো !

'কে ? কে ? কার নাম ?' রমেনদার নয়নদীপ দীপ্ত হয়ে উঠল ।

'আপনি চিনবেন না । মালবিকা দেবী । মালাদি ।' রত্ন জিব কাটিল ।

'নাম শুনিনি তো । তোমার আপন দিদি ? এত বয়সেও বিয়ে হয়নি ?'

'না, আপন দিদি নন । বিধবা । শিক্ষিতা। সদ্‌বংশীয়া । সচ্চরিত্রা । আমি তো ঘটকালিতে বিশ্বাস করিনে । নয়তো বলতুম রাজযোটক ।'

রমেনদা ঘাড় নাড়লেন । 'না, না । বিধবা মেয়েকে দ্বিতীয় বার বৈধব্যের শোক দেওয়া যায় না । বিধবারা এমনিতেই বিয়ে করতে অনিচ্ছুক । ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, জান তো । তেমনি বিধবারা ডরায় সিঁদুর দেখলে । আমার তো মোটে একটি বছর পরমায়ু । তোমার দিদি আমার মুখ দেখেই মূর্চ্ছা যাবেন । ভাববেন এ তো সত্যবান নয় । এ যে সাক্ষাৎ যমরাজ !' হেসে উঠলেন রমেনদা। করুণ হাসি ।

রত্নর মনে হলো এখানেও সেই একই বাধা । সমাজভয় । মালাদি যে বিধবা । রমেনদার সংস্কার বিমুখ । সংস্কারটা সমাজভয়ের নামান্তর । তাঁকে বাঁচতে দিচ্ছে না তাঁর সমাজের চিরাচরিত অত্যাচার । সবার উপর সমাজ সত্য !

রমেনদা যেতে না যেতে গৌরীর চিঠি এসে হাজির। বন্ধুর জন্যে দুঃখকাতর যার মন তার মেঘলা আকাশে রামধনু আঁকা হলো । কী আনন্দ ! কী আনন্দ ! জগতে মৃত্যু আছে, শোক আছে, সন্দেহ নেই । কিন্তু প্রেম আছে! প্রেম আছে ! গৌরী লিখেছিল—

> তোমার প্রেম আমাকে নিশিদিন ঘিরে রয়েছে, মোহন । সারাক্ষণ ঘিরে রয়েছে যেমন বায়ুমণ্ডল ঘিরে রয়েছে পৃথিবীকে । আমি তোমার প্রেমের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি । কিন্তু বেঁচে থেকে কী হবে, মোহন ! পানিমে মীন পিয়াসী । এত প্রেম আমাকে ঘিরে রয়েছে, তবু আমার পিয়াসা যায় না । আমার মতো দুঃখিনী কে ! সুখিনীই বা কে !
>
> মাণিক, তোমার চেয়ে তোমার প্রেম বড় । যে প্রেম আমাকে ঘিরে রয়েছে সে কি মানুষের প্রেম ! সে বোধ হয় কোনো দেবতার ! কিন্তু দেবতা তো তুমি নও । দেবতা হচ্ছে মাধব । তোমাকে আমি মাধবের স্থানে বসাতে পারিনে । বসালে অপরাধ হবে । অমঙ্গল হবে তোমার আমার দু'জনারই । না, ধন, তুমি মাধবের চেয়ে বড় নও । মাধবের সমান নও । তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে ঐ একটিই । মনুষ্যলোকে তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই । কেউ তোমার সমকক্ষ নয় । কিন্তু

দেবলোকে মাধব । ঐ কষ্টিপাথরের বিগ্রহের সঙ্গে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওর সঙ্গে তুমি পারবে কেন ? কিন্তু তোমার প্রেম তোমার চেয়ে বড় । প্রেম পারে ওর সঙ্গে যুঝতে । ও আমাকে ছাড়তে চায় না । তোমার প্রেম চায় আমাকে কাড়তে। এই অসম সমরে কে জিতবে ? কে হারবে ? ওগো তোমার প্রেম যেন জয়ী হয় । জয়ী হয় নিজের জোরে ।

আচ্ছা, আমাকে তুমি গোরী বলে আর কত কাল ডাকবে, বল তো ? যে নামে আমাকে এত লোক ডাকছে সে নামে তুমিও যদি ডাকো তবে তোমার নিজত্ব কোনখানে ? আমি যে তোমাকে অষ্টোত্তর শত নামে ডাকি । না ডেকে তৃপ্তি পাইনে। তুমিও কেন আমাকে অষ্টোত্তর শত নামে ডাকো না ? শোন, যেখানে যত সুন্দর নাম দেখবে আমার জন্যে চুরি করবে। তাদের প্রিয়রা তাদের যে সব নামে ডাকে আমার প্রিয় তুমি আমাকে সেই সব নামে ডাকবে । আমিই তোমার অরুণা, অমিয়া, অশোকা, অনীতা । আমিই তোমার আভা, আশা, আলোকলতা । এমনি প্রত্যেক অক্ষরে এক বা একাধিক নাম । ই'তে ইলা, ইন্দিরা, ইন্দ্রাণী । ঈ'তে ঈশিতা । উ'তে উর্বশী, উমা । ঊ'তে ঊর্মিলা, ঊষা । ঋ'তে ঋতা । ৯'তে কোনো নাম আছে কি ? এ'তে এণা । ঐ'তে ঐন্দ্রিলা । ও'তে ? ও'তে ও'গো । ঔ'তে ? ঔ'তে কী গো ? ঔ'তে কী তা বলতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।

চিঠিখানি সুটকেসে ভরে রত্ন নাইতে গেল । গঙ্গায় । এই শেষ বার । তার বড় আশ্চর্য লাগছিল ভাবতে যে প্রতিমাভঙ্গকারীর সব চেয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী—কিনা মাধব বলে একটি বিগ্রহ, একটি প্রতিমা ! একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা । আয়রনি অফ ফেট । কালাপাহাড়ের মতো তলোয়ার দিয়ে ওই মূর্তিটাকে খণ্ড বিখণ্ড করতে পারা যায় । কিন্তু তার ফলে গোরীর হৃদয়টা খণ্ড বিখণ্ড হবে । সে তার মাধবকেই একান্ত করবে । কান্তকে প্রত্যাখ্যান করবে । না, ফোর্স দিয়ে এর কোনো সমাধান হবে না । ফোর্স-এর সাহায্য নিলে রত্নর হার হলো । সে যে ফোর্স জিনিসটার বিরুদ্ধে ।

খেতে বসে দেখা হয়ে গেল বিদ্যাপতির সঙ্গে । 'কী আশ্চর্য ! তুমি এখনো যাওনি !' রত্ন সুধায় বিদ্যাপতিকে । বিদ্যাপতি সুধায় রত্নকে ।

বিকেলে ট্রেন। তার দেরি ছিল । বিদ্যাপতি প্রস্তাব করল, 'চল দীঘা ঘাটে গিয়ে আচার্য ধ্যানচন্দ্রকে প্রণাম করে আসা যাক ।' রত্ন রাজী হলো ।

ধ্যানচন্দ্র অসহযোগের সময় কলেজের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন । ক্রমেই তাঁর ছাত্রসংখ্যা কমে আসছে । তা বলে তাঁর আশাবাদে ভাঁটা পড়ছে না । তিনি আপনার ভিতর থেকেই উৎসাহ লাভ করছেন । উৎসাহের উৎস তাঁর অন্তরে। বলেন, 'আমরাই একদা নালন্দা বিক্রমশিলা প্রতিষ্ঠা করেছি । সে ক্ষমতা আমাদের হারিয়ে যায়নি, আছে । তা হলে ছাত্রেরা চলে যাচ্ছে কেন ? এর উত্তর, ওরা নালন্দা বিক্রমশিলার ছাত্র নয় । পথ ভুলে এসেছিল, ভুল বুঝতে পেরে পিছু হটছে ।

ওরা চায় জীবিকা, ওরা চায় মর্যাদা । ওদের মধ্যে এমন ছেলেও আছে যে চায় জ্ঞানের জন্যে জ্ঞান । কিন্তু সাধক ওদের মধ্যে কোথায় ? যারা সংসারের জন্যে নয়, সত্যের জন্যে উৎসর্গীকৃত ।'

ধ্যানচন্দ্র বিদ্যাপতিকে বা রত্নকে পড়াননি বা পড়ান না । লোকমুখে তাদের সুখ্যাতি শুনে তাদের দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । তারা গিয়ে আলাপ করে আসে। তার পর থেকে মাঝে মাঝে যায়, দু'দণ্ড গঙ্গার ধারে বসে, আচার্যের সঙ্গে ভাববিনিময় করে । তাঁর বয়স এমন কিছু বেশী হয়নি । ত্রিশের কোটায় । মুখে সৌম্য শ্রী । চোখে স্নিগ্ধ আভা । কিছুক্ষণ কাছে বসলে বোঝা যায় তিনি একজন সাধক ও সত্যিকার জ্ঞানী। কেবলমাত্র বিদ্বান বা মস্তিষ্কবান নন । রত্ন ও বিদ্যাপতি তাঁর দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে নেয় । আর তিনিও তাদের পেলে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন ।

'বিদ্যাপতি আর রত্না । কোলরিজ আর শেলী । এস, এস । তোমাদের পরীক্ষা সারা হয়ে গেছে তা হলে ?' এই বলে তিনি তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে পাটির উপর বসালেন ও বসলেন । সেইখানেই শোওয়া বসা । সেইখানেই খাওয়া । একটা নিচু ডেস্কে লেখাপড়া । ডেস্কের তলায় দামী জিনিস রাখা । দেয়ালজোড়া বুকশেলফ । তাতে রাজ্যের বই । ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি অসহযোগ করেননি । বলেন, 'ইউরোপ তো আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে অসহযোগ করছে না । জমিন আলাদা আলাদা । কিন্তু আসমান তো এক । আলোর সঙ্গে অসহযোগ ? তা কি কখনো হয় ? আমাদের অসহযোগ আলোর সঙ্গে নয়, বিশেষ একটা সিস্টেমের সঙ্গে ।'

রত্ন ফিরবে না শুনে তিনি বিমর্ষ হলেন । বললেন, 'রত্নাজী, অনেক কথা তোমাকে বলার ছিল । আবার কবে সুযোগ হবে, কে জানে ! একটা কি দুটো বলি । মনে রাখবার মতো হলে মনে রেখো ।'

রত্ন ও বিদ্যাপতি উভয়ে অবধান করল । জানালার বাইরেই গঙ্গা । ছলাৎছল ছলাৎছল কানে আসছিল । কী মনোরম আবেষ্টন !

'তুমি একজন স্বাপ্নিক । বিদ্যাপতিও তাই । স্বপ্ন যদি দেখতে চাও তোমরা তবে বর্তমান কালের জন্যে দেখো । ভাবীকালের জন্যে নয় । ভাবীকাল হচ্ছে পরকাল । পরকালের স্বপ্ন দেখলে ইহকালকে অবহেলা করা হয় । মাত্র এইটুকুর উপর নজর রাখলে চলবে যে স্বদেশের উত্তরপুরুষকে তোমরা দায়বদ্ধ রেখে যাচ্ছ না । আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ভুলটি করেছিলেন । আমাদের পরাধীনতা তো তাঁদেরই ভুলের পরিণাম । তাঁদের ভুল পরকালের খাতিরে ইহকালকে উপেক্ষা, পরলোকের আশায় ইহলোকের উপর অনাস্থা । উপনিষদে বলেছে, যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ । যা এখানে তাই সেখানে । যা সেখানে তাই এখানে । তা হলে কেন আমরা সেখানকার জন্যে ভেবে এখানকার কাজ কামাই করব ? সেখানকার পালা তো একদিন আসবেই । এখানকার পালা কি আর আসবে ? যখনকার যা তখনকার তাই নিয়ে আমরা থাকব । স্বপ্ন দেখতে হলে এখনকার স্বপ্নই দেখব । এই জীবনের স্বপ্ন । সামনের বিশ ত্রিশ বছরের স্বপ্ন ।'

বিদ্যাপতি রত্নর দিকে রত্ন বিদ্যাপতির দিকে তাকাল । কী এর তাৎপর্য !

ধ্যানচন্দ্র এর পর একটু দম নিলেন। তার পর বলতে লাগলেন, 'মনে রেখো, জীবৎকাল ছোট। যা করতে চাও অবিলম্বে কর। ভবিষ্যতের জন্যে চেয়ে থেকো না। কিন্তু কী করতে চাও সেটা আগে স্থির করে নাও। স্থির করতে যদি পাঁচ দশ বছর সময় লাগে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু স্থির করা অত্যাবশ্যক। রত্নাজী, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি পরমাত্মার কাছে যে যা চায় সে তা পায়। সেইজন্যে চাওয়া এমন বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক!' বিদ্যাপতি বাধা দিয়ে বলল।

'হাঁ, ভাই। বিপজ্জনক। তুমি হয়তো এক ঘড়া মোহর চাইলে। পেয়েও গেলে এক ঘড়া মোহর। করবে কী সেই মোহর নিয়ে? তা তো তুমি ভেবে দেখনি। হঠাৎ বুক ফেটে মারা যাবে। নয়তো বেপরোয়া খরচ করবে। উড়িয়ে দেবে। নয়তো পুঁতে রাখবে, ডাকাতকে ডেকে আনবে। কেমন ঠিক কি না? সেইজন্যে বলি, চাওয়া এমন বিপজ্জনক। সব রকম চাওয়ার মধ্যেই বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। ভক্তরা তাই বলেন, আমি কিছুই চাইনে। এমন কি স্বর্গও চাইনে। আমি তোমাকেই চাই, হে কৃষ্ণ! হে রাম!'

ধ্যানচন্দ্র ভাবে বিভোর হলেন। রত্ন কান পেতে রইল। বিদ্যাপতিও তন্ময়।

'আমি কিন্তু তাও বলিনে। আমি কী বলি, শুনবে? আমি বলি, আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও। ব্যস্‌। এইটুকুই আমার প্রার্থনা।' এই বলে ধ্যানচন্দ্র অন্যমনস্ক হলেন। বোধ হয় মনে মনে জপ করছিলেন, তুমি আমাকে চাও, তুমি আমাকে চাও। আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও। হে কৃষ্ণ! হে হরি!

রত্ন ও বিদ্যাপতি অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকল। ধ্যানচন্দ্র তদ্‌গত ভাবে বসে রইলেন। বিদ্যাপতি কী ভাবছিল সে-ই জানে। রত্ন ভাবছিল গোরীর কথা। পরমাত্মাকে গোরীতে তর্জমা করে নিলে প্রার্থনার ভাষা এই রূপ শোনায়। 'আমি কিছুই চাইনে। এমন কি স্বর্গও চাইনে। আমি তোমাকেই চাই, হে গোরী, হে প্রিয়া!'

না। তাও নয়। রত্ন মনে মনে বলল, 'আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও, হে নারী, হে দেবতা!'

এর মর্ম কী তা অনুধাবন করে রত্ন। অতি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা। একটিমাত্র বাক্য। ছোট একটি সূত্র। কিন্তু এর মধ্যে নেই হেন কথা নেই। সেইজন্যে এই ভাষায় চাওয়া এমন বিপজ্জনক। যদি পায় তা হলেও পশতাবে। রত্নকে তাই মনঃস্থির করতে হবে। যত দিন মন স্থির হয়নি তত দিন কিছু চাইবে না। ভুল চাওয়ার চেয়ে না চাওয়া ভালো।

আচার্য অবশেষে মৌনভঙ্গ করলেন। বললেন, 'বিদ্যাপতি, তোমাকেও কিছু বলার ছিল। তুমি অবশ্য ফিরে আসছ। আবার এ নিয়ে কথাবার্তা হবে।'

বিদ্যাপতি বলল, 'তা হলেও শুনে রাখি।'

'তোমার বয়সের ছেলেরা সাধারণত কিসের অন্বেষণে জীবনযাত্রা শুরু করে? এক কথায় তার নাম ধন। কিন্তু ভারতের কোটি কোটি সন্তান যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ধনের অন্বেষণে বাহির হয় তবে সেই কি হবে আমাদের সাধনার স্বরাজ? স্বরাজের

আমলে তাদের ক'জনের ভাগ্যে ধন জুটবে বা জুটতে পারে ? আমি একটি হিসাব তৈরি করেছিলুম আয়কর বিভাগের বন্ধুদের সৌজন্যে । যারা আয়কর দেয় ও যারা আয়কর ফাঁকি দেয় তাদের সংখ্যা সব জড়িয়ে বিশ হাজারের বেশী হবে না কিছুতেই । তা হলে নিম্নতম আয়কর দেবার সামর্থ্য জন্মাতে কোটি কোটি ভারতসন্তানের ক'শতাব্দী সময় লাগবে হিসাব করে দেখবে কি ? স্বরাজ কি আলাদীনের প্রদীপ যে কয়েক শতাব্দীর কাজ কয়েক দশকেই সম্ভব হবে, ভাই ? না আমরা কোটি কোটির জন্যে স্বরাজ চাইনে, চাই বিশ হাজারের জায়গায় বিশ লাখের জন্যে ?' আচার্য উত্তর প্রত্যাশা করলেন ।

রত্ন আশঙ্কা করছিল এই বার আসছে চরকা ও খাদি । ছিলও একটা চরকা ও ঘরে । কোটি কোটি ভারতসন্তানের মুখ চেয়ে দিনে আধ ঘণ্টা সুতো কাটতে বলা হবে তাদের । পড়েছে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে । সুতো কাটতে হবে তাঁর সঙ্গে এখনি ।

উত্তরের জন্যে চেয়ে থেকে উত্তর না পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'তা ছাড়া কোটি কোটি লোক ধনের অন্বেষণ করবে এটাও তো ভালো নয় । কাম্য নয় । কেননা ধনের অন্বেষণ হচ্ছে এমন এক অন্বেষণ যার জন্যে অল্পবিস্তর আত্মবিক্রয় করতে হয়ই । যার জন্যে পরকে শোষণ করতেও হয় অল্লাধিক । তার সম্বন্ধে শেষ কথা যীশু খ্রীস্ট বলে গেছেন দু'হাজার বছর আগে । কেউ কখনো দুই প্রভুর সেবা করতে পারে না । গড আর ম্যামন উভয়ের আরাধনা করা যায় না । দেশের কোটি কোটি লোক যদি ধর্মের অন্বেষণ না করে ধনের অন্বেষণ করে তবে ধন মেলে বই-কি । মেলে হয়তো দু'এক শতাব্দী পরে । কিন্তু ধর্ম রসাতলে যায় । ফলে মহতী বিনষ্টি ।'

বিদ্যাপতি কী যেন বলবে বলবে করছিল, আচার্য অনুমান করে বললেন, 'কাম্য যা তা সকলের পক্ষেই কাম্য । নয়তো কারো পক্ষেই কাম্য নয় । কোটি লোকের পক্ষে যা অকাম্য তোমার পক্ষেও তা অকাম্য । তোমার বন্ধুর পক্ষেও তাই । যে শিক্ষা তোমাদের কাম্যাকাম্য বিনিশ্চয় করতে না শেখায় সে কি শিক্ষা ? তোমাদের মন পড়ে আছে লক্ষ্মীর পায়ের তলায় । আর করছ তোমরা সরস্বতীপূজা । না, না, রত্নাজী, তোমাদের লক্ষ্য করে বলিনি । তোমাদের বয়সের ছেলেদের কথা বলছি । ওরা সবাই সিদ্ধার্থ হবে। অর্থ বলতে ওরা বোঝে অর্থনীতি যাকে বলে অর্থ । আমার বিচারে ধন কথাটির অন্য মানে । স্নেহ, প্রেম, সৌহার্দ, সকলের প্রতি দরদ, ভগবানে বিশ্বাস, ভগবান না মানলে সত্যে বিশ্বাস, ন্যায়ে বিশ্বাস, জগতের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস, সরল প্রকৃতি, আভ্যন্তরিক বীর্য, কঠোর শ্রম করার শক্তি, অপরকে শোষণ করতে অনিচ্ছা, ধর্মভয়, বিবেকবোধ, আত্মবলি দিতে প্রস্তুতভাব, আত্মবিক্রয় এড়াতে দারিদ্র্যবরণ—এইগুলিকেই বলি ধন ! এ ধন যাদের আছে তাদের যদি বলি ধনী আর যাদের নেই তাদের যদি বলি দীনহীন তা হলে কি ভুল হবে, বিদ্যাপতি ? ভুল হবে, রত্নাজী ?'

আরো দু'চার কথার পর তিনি হাত যোড় করে বিদায় নমস্কার জানালেন । বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকা এক্কায় উঠে বসল দুই বন্ধু । ঘোড়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে । রত্নর মালপত্র আগে থেকেই চাপানো হয়েছিল । সে আর হস্টেলে ফিরবে না । সোজা স্টেশনে

যাবে। মাঝ পথে নামিয়ে দেবে বিদ্যাপতিকে । ওর ট্রেন রাত্রে। ও যাবে দারভাঙ্গা । ওর বাড়ী ।

'কি হে, কিছু বুঝলে ?' দুলতে দুলতে প্রশ্ন করল বিদ্যাপতি ।

'হাঁ । আচার্যজী আমাদের প্রার্থনার ভাষা ঠিক করে দিলেন । কাম্যাকাম্য বিনিশ্চয় শিখিয়ে দিলেন । মূল্যবোধ শুধরে দিলেন ।' দুলতে দুলতে জবাব দিল রত্ন ।

দশ

পরের দিন সকালে শেয়ালদা ।

প্লাটফর্মে পায়চারি করছিল ললিত ও কানন । রত্নকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো । কানন আরো আধ ফুট ঢ্যাঙা হয়েছে এই ছ'মাসে । আর ললিত হয়েছে আরো চোয়াড়ে । আরো নীরেট ও বলিষ্ঠ ।

'আরে এ কে ! এ যে সাক্ষাৎ রবি ঠাকুর !' পরিহাস করল ললিত ।

'মাইনাস তাঁর দাড়ি ।' সংশোধন করল কানন ।

সেই যে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে পায়জামা ধরেছিল ও চুল ছেড়ে দিয়েছিল বিদ্যাপতি অঞ্জন ও রত্ন এত দিনে সেটা রত্নর নিজের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিল, কিন্তু খট করে চোখে ঠেকল ললিতের ও কাননের ।

'ওহে রৈবিক, তুমি কি ওই পায়জামা পরে আমার পিসির বাড়ী উঠবে নাকি ! তা হলে হাঁড়ি ফেলা যাবে যে ! খাবে কী ! তোমার সঙ্গে ধুতী থাকে তো চল ওয়েটিং রুমে গিয়ে ভোল ফেরাবে । ওহে কানন, আজকেই ওকে একটা হেয়ারকাটিং সেলুনে নিয়ে যেতে হবে । মেয়েলি চুল আমার অসহ্য ।' কুলীর পিছন পিছন চলতে চলতে বলল ললিত ।

'শুধু কি সেলুনে ! আমার উপর হুকুম আছে ওকে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে ওর ফোটো তোলাতে । ওহে রাবীন্দ্রিক, তোমার জন্যে একজোড়া ফুল তোলা কার্পেটের জুতো আমার হাতে দেওয়া হয়েছে । আমি তোমার জুতোবরদার হয়ে ললিতের পিসির বাড়ী যেতে পারব না কিন্তু । আমি বলি, তুমি আমার সঙ্গেই যাদবপুর চল । জ্যোতিদার দাদা ওখানকার অধ্যাপক । জান, রতন, বৌদি হচ্ছেন নরওয়ে দেশের মেয়ে ।' কানন বলল উৎফুল্ল হয়ে ।

রত্ন পড়ে গেল দোটানায় । ললিত আর কানন দু'জনেরই ইচ্ছা তাকে কাছে রাখা। সেও দু'জনকেই কাছে পেতে চায় । তা তো হবার নয় । সে ললিতের দিকেই ঝুঁকল । কারণ ললিতকে দিয়ে সে সুধাদিকে বলাবে, সুধাদি ঘটাবেন যশোবাবুর অন্তঃপরিবর্তন। তার থেকে ঘটবে গৌরীর মুক্তি ।

মির্জাপুর পার্কের গায়ে ললিতের পিসির বাড়ী । উঠোনের চার দিকে চকমিলান । উপরে একটা জালির মতো। তা দিয়ে আলো হাওয়া নেমে আসে কুয়োর ভিতরে নামার

মতো । তেতালা ছাড়িয়ে দোতালা অবধি পৌঁছয় । একতলাটা অন্ধকূপ । সেখানে দম বন্ধ হয়ে আসে। এঁরা কলকাতার একটি বনেদী পরিবার । এঁদের পূর্বপুরুষ জব চার্নকের আমলে কলকাতায় এসে জমি কেনেন । এখন সে জমি সোনার খনি । পিসেমশায় কর্পোরেশনের কাউন্সিলার । তাঁকে বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতে পাওয়া যায় না । বাড়ীর মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা ।

রত্নর স্থান হলো তেতালায় ললিতের ঘরে । অন্দর ঘেঁষে সিঁড়ি । কানে আসছিল 'বেশ ছেলেটি ।' 'ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।' 'আমাদের ক্ষেন্তির সঙ্গে মানাত কিন্তু ।' 'কি লো ক্ষেন্তি ! বর মনে ধরেছে ?'

পাশের ঘর থেকে সাফসুতরো হয়ে এসে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করল রত্ন । ভিতর থেকে বয়ে আনা হতে থাকল থালা থালা ফলমূল মিষ্টান্ন পেস্তা বাদাম কিসমিস খেজুর চা রুটি বিস্কুট । এর নাম প্রাতরাশ । এর পর কে একটি ছোট মেয়ে দৌড়িয়ে এসে রুপোর তবকে মোড়া সুগন্ধি পান দিয়ে পালিয়ে গেল । তারও মাথায় ঘোমটা । বয়স যদিও দশ কি এগারো । আড়াল থেকে কানে এলো, 'বর কী বলল রে ? পছন্দ হয়েছে তো ?'

এর পর পিসিমার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো রত্নকে । মধ্যবয়সী মোটাসোটা গিন্নীবান্নি মানুষ । অতিরিক্ত ফরসা । আপাদমস্তক অলঙ্কার । কিন্তু ওই একখানাই বসন । তার অনেকখানি লেগেছে ঘোমটা দিতে । রত্ন তাঁর পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়ালে তিনি তার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন ।

বললেন, 'এস, বাবা, বস । তোমাকে দেখব বলে ব্যাকুল হয়ে রয়েছি । ললিতের কাছে তোমার নাম প্রায়ই শুনি । ও তোমাকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসে। আমার কাছে তোমরা দু'ভাই এক মায়ের পেটের ভাই । আমাদের এই গরিবের বাড়ীতে তোমার অবশ্য খুবই কষ্ট হবে । তা হলেও তুমি তোমার যতদিন খুশি থাকবে । তুমি যত বেশী দিন থাকবে আমরাও তত বেশী খুশি হব । তোমাকে আলাদা একখানা ঘর দিতে পারছিনে বলে লজ্জায় মরে যাচ্ছি, বাবা । নিচের তলা কি তোমার যোগ্য !'

পিসিমাকে রত্ন অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার করে নিল । এ বিষয়ে তার একটা সহজাত দক্ষতা ছিল । ললিত তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার সময় রসিকতা করল, 'আমাকে কি তুমি সর্বস্বান্ত করবে ?'

'কেন, বল তো ?'

'যার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই তাকেই তুমি আপনার করে নাও । তখন আপনাকে সে পর মনে করে । তোমাকে আপন ।'

এটা কিন্তু ঠিক পরিহাসের মতো শোনাল না । শোনাল আক্ষেপের মতো । রত্ন বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে বলল, 'ওটা তোমার ভুল। তুমি বড় অভিমানী ।'

ললিত কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'আমার মনে সাধ ছিল তোমাকে আমাদের দেশের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব । কিন্তু ভরসা হয় না । সাবু হয়তো গৌরীর মতো আমাকে পর করে দেবে ।'

গৌরীর নাম উঠতেই রত্নর মনে পড়ল যে আজ ও মেয়ের চিঠি আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে সে উতলা বোধ করল গৌরীর হাতের কার্পেটের জুতো জোড়ার জন্যে। ওই যেন তার লিপি। তার প্রণয়লিপি।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গল্প করতে বসল দুই বন্ধুতে। রত্ন বলল, 'তোমার বিয়েতে যোগ দিতে পারিনি বলে আমি সত্যি খুব দুঃখিত। জান তো, আমি প্রেমহীন বিবাহ সইতে পারিনে। আমাকে ক্ষমা কোরো ভাই।'

'ক্ষমার প্রশ্ন উঠলে তো ?' ললিত তাকে অভয় দিল। 'আমার বিয়েতে আমারই কি যোগ দিতে ইচ্ছা ছিল ? প্রেমহীন বিবাহ বলে নয়। অন্য কারণে।'

এই বলে সে তার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করল। সাবুর সঙ্গে তার বিয়ে গৌরীরই নির্বন্ধে। গৌরী বলে যশোবাবুকে। যশোবাবু বলেন ডোমকলের কুঠিয়াল সাহেবকে। কুঠিয়াল সাহেব বলেন পুলিশ সাহেবকে। পুলিশ সাহেব বলেন ললিতের বাবা লালাবাবুকে। লালাবাবু ছেলের আন্দামানযাত্রার ভয়ে সরাসরি সম্মতি দেন, তার ফলে ললিত বেকসুর ছাড়া পায়। বাড়ী গিয়ে শোনে তার বিয়ে। ভিতরের খবর কেউ তার কাছে ভাঙে না। ভাঙলে সে হয়তো আবার জেলে যেত।

বিয়েটা চোখ বুজে করে ফেলার পর সে ভেবেছিল পুনরায় বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে দেশোদ্ধার করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। যার কাছে যায় সে-ই বলে, 'তোমাকে বিশ্বাস নেই। পুলিশ তোমার বিয়ে দিয়েছে। তুমি গবর্নমেণ্টের জামাই।' সে প্রতিবাদ করে, কিন্তু অভিযোগটা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। বিয়ে করলে খালাস পাবে এ রকম একটা কথাবার্তা হয়েছিল তার গুরুজনের সঙ্গে সাহেবদের। তাঁদের প্রত্যাশাও ছিল যে বিয়ের পর সে বৌ নিয়ে ঘরসংসার করবে। জান নিতে জান দিতে জোর পাবে না। পোষ মানবে। পোষ মানা পলিটিক্স করবে।

'এখন আমি করি কী !' ললিত বলল কাতর কণ্ঠে। 'কে আমাকে বিশ্বাস করে বিপ্লবী দলে নেবে। বাংলাদেশের বিপ্লবী সম্প্রদায় আমার মুখ দর্শন করবে না। বাংলার বাইরেও কি আমার ঠাঁই হবে ! দু'দিন বাদে ওরাই টের পাবে। টের পেয়ে চর বলে আমাকে গুলী করবে ! চিরকালের মতো আমার মুখ পুড়ে গেছে। তাই তো দিন দিন আমার চেহারা হনুমানের মতো হচ্ছে।'

রত্ন ব্যথা বোধ করছিল। বেচারা ললিত ! সে এখন করবে কী ! কোন কাজে লাগবে ! নিজে বিপ্লবী না হলেও রত্ন বিপ্লবীদের অন্তর বুঝত।

'এর জন্যে—এই ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী কে ?' ললিত গর্জে উঠল।

রত্ন প্রমাদ গনল। অন্তরাল থেকে সবাই শুনতে পাবে নাম।

'এই ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী কে ? তোমার জন্যে যিনি পাদুকা রচনা করেছেন। একেই বলে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ !' ললিত ধীরে ধীরে সুর নামিয়ে আনল।

রত্ন আঘাত পেয়ে তাকিয়া চেপে ধরল। কোন মুখে প্রতিবাদ করবে !

'অনেক দিন থেকে আমি সুযোগ খুঁজছি। তোমাকে বলব তোমার ভাগ্যদেবীর কীর্তি। তোমাকে ঈর্ষা করি বলে নয়। তোমাকে ভালোবাসি বলে। তুমি আমার প্রিয়।

বিশ্বাস কর, সেও আমার প্রিয় । বলতে পারতুম প্রিয়া । কিন্তু তা হলে তুমি বেদনা পেতে ।'

রত্ন এটা অনুমান করেনি । চমকে উঠল । পাঁশুটে হয়ে গেল তার মুখ ।

'কী করে জানব, বল, যে তুমি আসবে ওর জীবনে ? জানলে কি আমি ওর প্রেমে পড়তুম ? শুধু কি আমি ? আরো কত ছেলে ওকে ভালোবেসেছে । এমন কি, জ্যোতিদাও । তাঁর মতো স্থিতপ্রজ্ঞ সাধুপুরুষও । আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওর পুরুষকে ভালোবাসার । কেবল কি পুরুষকে ? নারীকেও ।' ললিত বলল চাপা গলায় ।

রত্ন উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল । মন্ত্রমুগ্ধের মতো । বাধা দিল না । ললিত বলে গেল, 'তোমার পরিচয় দিয়েছিলুম সোনালীর কথা ভেবে । তখন তো স্বপ্নেও ভাবিনি যে পরিচয় পরিণত হবে প্রেমে । রতন, তোমার প্রথম চিঠি যেদিন এলো আমি ওর কাছে উপস্থিত ছিলুম । ও তোমার চিঠি পড়ে এমন অভিভূত হলো যে কথা বলতে পারল না । ওর মুখে নতুন এক আলোর উদয় হলো । চিঠিখানা ও আরেক বার পড়ল । তার পর আমার দিকে বাড়িয়ে দিল । আমি পড়ে দেখলুম সবই আমার জানা কথা। নতুন আলো কোথায়! কিন্তু ওর সেই ভাবাবেশ কাটল না । কয়েক সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখি ওর জাগরণ ঘটেছে । ও পুষ্পিতা হয়েছে। প্রেমের জোয়ার এসেছে ওর জীবনে । তখনো বুঝতে পারিনি যে তুমিই ওর সোনার কাটি । পরে শুনলুম জ্যোতিদার কাছে । জ্যোতিদার কাছে ও হৃদয় খুলে দেখায় । ওর কিছু গোপন নেই ওই একটি মানুষের কাছে । জ্যোতিদাকে ও পুরুষ বলে গণ্য করে না । কিন্তু আমাকে গণ্য করে ।'

একটু দম নিয়ে ললিত আবার বলে চলল, 'আমি অভিমানী মানুষ । জেলের সড়ক ধরলুম । পৌঁছে গেলুম জেলে । ওরও সাধ ছিল জেলে যেতে । কিন্তু ইংরেজের বুদ্ধিসুদ্ধি আছে । বন্দুক বাজেয়াপ্তির ভয় দেখিয়ে ফৌজদার বংশকে হাত করল । ওরা ওকে এমন বোঝান বোঝাল যে ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ভোজ দিয়ে আপ্যায়িত করল । ঘরের বৌ ঘরে রইল, মালখানার বন্দুক মালখানায় রইল, ধরা পড়ল কিনা ওর মণ্ডলীর জনকয়েক হতভাগা বিপ্লবকর্মী। তাদের মধ্যে আমি। ওর হতাশ প্রেমিক। আমার দ্বীপান্তর হতে পারে শুনে ওর মাথায় ঢুকল যেমন করে হোক আমাকে বাঁচাতেই হবে ।'

রত্ন অধীর হয়ে বলল, 'তার পর ?'

'তার পর যা হলো তা তোমাকে আগেই বলেছি। কিন্তু তার তাৎপর্য বলিনি । সাবু হচ্ছে আমার কনসোলেশন প্রাইজ । ওই নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে । আসল প্রাইজ আমার জন্যে নয় । তোমার জন্যে ।' ললিত বলল রহস্যময় ভাবে ।

রত্ন তার বন্ধুর হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'যা হবার তা তো হয়ে গেছে । এখন সাবুকে সুখী কর । শুনেছি সে তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে । সে কেন দুঃখ পাবে ? একজনের ট্র্যাজেডীকে দু'জনের হতে দিয়ো না । প্রকৃতিস্থ হও ।'

'সব বুঝি, ভাই । সমস্ত বুঝি । সাবুর প্রেম পেয়ে আমি ধন্য । তাকে সুখী করতে পারলে ধন্য হব । কিন্তু ভালোবাসা কি অত সহজে পাত্রান্তরিত হয় ? কেমন করে আমি একটি নারীকে ভালোবাসব, আরেকটি নারীকে আদর করব ? সাবুকে আমি ঠকাতে

পারব না । ওর কাছে আমি তিন বছর সময় চেয়ে নিয়েছি । এই তিন বছরে আমার ভালোবাসা পাত্রান্তরিত হবে । কী জানি কখন কী হয়ে যায়, সেইজন্যে দূরে দূরে থাকি। আরো দূরে চলে যেতে চাই। জাপান কি আমেরিকা ।'

রত্ন বলল, 'ভাই ললিত, তোমার পথের কাঁটা হব জানলে আমি গোড়া থেকেই সাবধান হতুম । এখন যে বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে, ভাই । কী আমি করতে পারি যাতে তুমি সুখী হও ? দেশান্তরী হব ?'

'না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না । তোমার সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় । গোরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেটে গেছে। সাবুর সঙ্গেই আমার যা কিছু সম্পর্ক । তবে তোমাকেও একটা কথা বলে রাখি । গোরী যাকে খুঁজছে সে পুরুষোত্তম । তুমি যদি তা হয়ে থাক তবে তোমার মধ্যেই তার সন্ধান সমাপ্তি পাবে । যদি না হয়ে থাক তবে তোমার কপালেও আছে সান্ত্বনা পারিতোষিক ।'

রত্ন শিউরে উঠল । বলল, 'কার সঙ্গে ও আমার বিয়ে দেবে ?'

'আছে ওর হাতে কয়েকটি রাঙা টুকটুকে মেয়ে । কিন্তু যা বলছিলুম । ওর স্বামীর সঙ্গে ওর নৈশ যুদ্ধের আদত কারণ হলো এই । তিনি নন পুরুষোত্তম । তিনি নন বীর । ও হবে বীরভোগ্যা । আর কারো কাছে ও আত্মসমর্পণ করবে না । অন্য যত কারণ সব গৌণ । প্রেমহীন বিবাহ দিতে ওর একটুও বাধল না । ও কিসের বিদ্রোহী !'

'ঠিক প্রেমহীন তো নয় । সাবু ভালোবাসত যে ! যাক, গোরীব স্বামী পুরুষোত্তম কি না বলতে পারব না । কিন্তু তিনি ওর কাছে পরপুরুষ । ওর বিয়েটা বিয়েই নয় ।'

এইবার বোঝা গেল গোরী কেন বলেছিল ললিত প্রতিক্রিয়াশীল । সে বলল, 'দূর। বিয়ে কখনো বিয়ে না হয়ে পারে ! স্বামী কখনো পরপুরুষ হতে পারে !'

রত্ন সরাসরি সুধাল, 'কেন? বিবাহভঙ্গে তোমার আপত্তিটা কিসের ?'

ললিত টাল সামলাতে সময় নিল । বলল, 'ওঃ । প্রতিমাভঙ্গ থেকে তুমি বিবাহভঙ্গে পৌঁছেছ ! যার মানে পরিবারভঙ্গ !' সে যে অনুমোদন করে না তা স্পষ্ট ।

'আচ্ছা, গোরী যদি আমাকে ভালো না বেসে তোমাকে ভালোবাসত তা হলে শেষপর্যন্ত বিবাহভঙ্গ না করে আর কী করত ?' রত্ন ললিতকে চেপে ধরল ।

'সেই ডাক্তারকে নিয়ে যা করত ।' ললিত পিছনে গেল ।

'কী করত ! কী করত !' উত্তেজনায় কাঁপতে থাকল রত্ন ।

'ইলোপমেন্ট ।' ললিত বলল ফিস ফিস করে । মৃদু হেসে ।

রত্ন এর জন্যে তৈরি ছিল না । তার মাথায় বাজ পড়ল । শাদা হয়ে গেল তার মুখ । ললিত তা লক্ষ করে তাকে ঝাঁকুনি দিল । সে যে কী ভাবছিল তা সে-ই জানে । সে যে ভয় পেয়েছিল তা প্রত্যক্ষ ।

এর পরে চাকর এসে তেল মাখিয়ে দিল । স্নান করিয়ে দিল । অন্দর থেকে ডাক পড়ল পিসেমশায়ের সঙ্গে বসে খেতে। সে এক এলাহি কাণ্ড । অতগুলো পদ সে কোনো দিন চোখে দেখেনি । চেখে দেখা তো দূরের কথা । পাখা হাতে পাশে বসেছিল স্বয়ং

ক্ষেন্তি । মাথায় ঘোমটা । সে-ই যেন রত্নর প্রোপ্রাইটর । কানে আসছিল, 'ওলো ক্ষেন্তি, বর যে হাত গুটিয়ে বসে রইল । কিছুই যে মুখে দিল না ।'

ভোজনের পর বিশ্রাম । রাত্রে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি । হাই তুলতে তুলতে রত্ন কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল । কিন্তু তাকে ঘুমতে দিচ্ছে কে ? বাড়ীর মেয়েরা চক্রান্ত করে ললিতকে পাঠিয়ে দিলেন কী একটা কাজে । ঘরে ঢুকল রত্নর হতে ইচ্ছুক শ্যালিকার দল । চন্দন দিয়ে কুঙ্কুম দিয়ে তাকে চিত্রবিচিত্র করা হলো। কেউ একটু হলুদ ছুঁইয়ে দিয়ে গেল। কেউ ঠেকিয়ে দিয়ে গেল চুয়া । কেউ বুলিয়ে দিয়ে গেল পাউডার । কেউ মাখিয়ে দিয়ে গেল ক্রীম । কামানো গোঁপে যখন রং লাগানো হচ্ছে তখন রত্নর ঘুম ছুটে গেল । সে চোখ মেলে চাইতেই মায়াকন্যারা কোথায় মিলিয়ে গেল ।

প্রবেশ করলেন শুভ্রকেশা শুভ্রবেশা ঠানদি । রত্ন ধড়মড় করে উঠে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল । তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন । তার পর আসন নিলেন ।

'এলুম নাতজামাইকে দেখতে । ওরা বলছিল পায়জামা পরা মোচনমান । মোচনমান তো নুর কোথায় ?' এই বলে তিনি থুতনিতে হাত দিয়ে একটু নাড়লেন ।

সকালবেলার মতো ভিতর থেকে আসতে থাকল থালায় থালায় লুচি মাংস গলদাচিংড়ি বেগুনি ফুলুরি আলুর দম কচুরি নিমকি সিঙাড়া হালুয়া সন্দেশ । দুপুরের ভূরিভোজনের পর কার পেটে খিদে থাকে । রত্ন হাত যোড় করে মাফ চাইল ।

কে শোনে কার কথা । দুপুরে নাকি ওর বৌ ওকে পেট ভরে খাওয়ায় নি । তাই ওর পেটে খিদে মুখে লাজ । ঠানদি ওকে উপরোধে ঢেঁকি গেলাবেন । এক এক করে কাঁকন বাজিয়ে চুড়ি বাজিয়ে তাঁর নাতনিরা ওকে ঘিরে বসল ।

'হাঁ রে, নাতজামাই ! যাত্রার দলের ছোকরাদের মতো তোর ওই বাবরি চুল কেন রে ! গান জানিস তো গা না একটা !' ঠানদি আবদার ধরলেন আহারপর্বের পরে ।

রত্ন যত বলে সে গান জানে না সমবেত কণ্ঠে কোরাস ওঠে, 'গান ! গান !' ভিতর থেকে একটা হারমোনিয়াম এলো । এ যে কী বিপদ তা কল্পনা করা যায় না। ওস্তাদজীর উদ্দেশে নেপথ্য থেকে ফরমায়েস আসছিল, মিঞা কী মল্লার, দরবারী কানাড়া, বাগেশ্রী, মালকোশ । রত্ন জানে না শুনে খিল খিল হাসি । সঙ্গীতের পরীক্ষায় সে সসম্মানে ফেল করল । তখন তাকে সঙ্গীতরত্ন উপাধি দেওয়া হলো । তার পর তার বামে বসানো হলো ক্ষেমঙ্করীকে। সেও চন্দনচর্চিতা ।

এমন সময় ললিত এসে পড়ল । আর অমনি রসভঙ্গ হলো। ঠানদি তাঁর দলবল নিয়ে অন্তর্ধান করলেন । রত্নর চেহারা দেখে ললিত রেগে বলল, 'তোমাকে বাঁদর সাজিয়েছে । আর তুমি তা সেজেছ ।' পাশের ঘরে গিয়ে আয়নায় মুখ দেখে রত্নর চক্ষুস্থির । তৎক্ষণাৎ ধুয়ে ফেলতে হলো । ছি ছি ! ললিত কী মনে করল !

সকাল থেকেই গোরীর দেওয়া জুতো জোড়াটার জন্যে রত্ন ছটফট করছিল । কানন কথা দিয়েছিল বিকেলে বহন করে আনবে । তার দয়ামায়া আছে । তাই ললিত যখন তাগিদ করল নবনীর খোঁজে বেরোতে তখন রত্ন বলল কাননের জন্যে সবুর করতে ।

অবশেষে কানন এলো। এসে রত্নর মাথায় চাপিয়ে দিল কাগজের মোড়া একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স। জুতোর দোকানে যেমনটি পাওয়া যায়। বলল, 'এখন থেকে তোমার নাম পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী। কেন, বল তো ?'

এই বলে হেসে আকুল হলো নিজেই নিজের রসিকতায়। কানন যখন হাসে তখন ছাদ ফাটিয়ে হাসে। মৃদু হাসি বা মুচকি হাসি তার ধাতে নেই। কে কী মনে করছে তা সে গ্রাহ্যই করে না। কথা বলে উচ্চ স্বরে। কে শুনছে না শুনছে ভ্রুক্ষেপ নেই। অন্তরালে গুঞ্জন উঠল, 'চাঁদমামার মতো হাসিখুশি গোল মুখ।' 'হাসিখুশির মলাটে ওর ছবি আছে।' 'যা বাজখাঁই গলা।' 'আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা—'

রত্ন তখন মাথার জুতো কোলে চেপে ধরে রোমাঞ্চ বোধ করছে। কাননের প্রশ্নের উত্তর দিল না। হয়তো শোনেইনি।

'বলতে পারলে না তো ?' কানন এক গাল হেসে বলল, 'আরে বোকা, ওকি তোমার পায়ের জুতো ? ওটা ওর নিজের পায়ের মাপে। ওর কেমন যেন ধারণা তোমার সঙ্গে ওকে এক মাপে তৈরি করেছেন বিধাতা। প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গ মিলিয়ে। আমি বলি, তা কি কখনো হতে পারে! ও বলে, রাখ বাজি। আমি বাজি রেখেছি একশো এক টাকা। জানি জিতবই। ফিরে গিয়ে ওটা আদায় করতে হবে।'

ললিত বলল, 'দেখাই যাক না। রত্ন, বাক্স খুলে পায়ে দাও।'

পায়ে দিতে রত্নর পা সরছিল না। ও কি পায়ে দেবার মতো! ও যে মাথায় করে রাখবার মতো! ও যে বুকে চেপে ধরবার মতো! ও যে প্রিয়ার পাদস্পর্শে পবিত্র! তারও সন্দেহ ছিল না যে একজনের জুতো আরেক জনের পায়ে হবার নয়।

ললিত বাকস খুলে জুতো জোড়া বার করল। কালোর উপরে সোনালী আর গোলাপী। চমৎকার দেখতে। রত্নর পা টেনে নিয়ে দোকানদারের মতো পরিয়ে দিল ললিত। কী আশ্চর্য! ছোট হলো না যে! বড়ও হলো না! অবিকল এক সাইজ। কেবল আঙুলের দিকটা আঁটসাট। ভালো মুচিকে দিয়ে বাঁধিয়ে নিলে ষোলো আনা ফিট করবে।

কাননের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। সে কি স্বপ্ন দেখছে! ললিত বলল, 'এবার জানা গেল কে বোকা। ওহে কানন, তুমি সরল বলে কি এত সরল! বাজি রাখার আগে ভেবে দেখলে না যে যারা ঘন ঘন পত্রবিনিময় করে তারা সেইসূত্রে মাপ বিনিময়ও করে থাকতে পারে। মর এখন নগদ একশো একটাকা গুনে!'

'মাপ সেও চায়নি, আমিও দিইনি।' রত্ন বলল লাজুক ভাবে।

কানন প্রতীতির সঙ্গে বলল, 'মিথ্যা পারুলদিও বলেনি, রত্নও বলছে না। বিধাতা ওদের দুটিকে একই মাপে সৃষ্টি করেছেন।'

এ কি সত্য! রত্নর অন্তরে অপরিসীম বিস্ময় ও অব্যক্ত পুলক

ললিত তাড়া দিয়ে বলল, 'ওঠ। ওঠ। আমি ওসব ভেলকি ও ভোজবাজিতে বিশ্বাস করিনে। রত্ন ওর চেয়ে মাথায় আধ ফুট উঁচু। পায়ের মাপ তো সেই অনুপাতে হবে।'

রত্ন কিন্তু ঠিক করে ফেলল নিজের পায়ের মাপের জরিন নাগরা বা লপেটা কিনে গৌরীকে উপহার পাঠাবে । কাননেরই হাতে । কিনতে যাবার সময় ললিতকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না । বিধাতা যাদের এক মাপে বানিয়েছেন সে তাদের এক মাপের জুতো পরতে দেবে না ! এমন গোঁয়ার ! যা চোখে দেখল তাও বিশ্বাস করবে না ! এমন যুক্তিহীন !

রত্ন কাননের হাতে যে চিঠি দেবে তাতে লিখবে, গৌরীকে—কাননের কাছ থেকে বাজির টাকা নিয়ো না । তোমার ঋণ ও অন্য ভাবে শোধ করবে ।

এগারো

নবনী কলকাতায় নেই । শ্বশুরবাড়ী গেছে। গোলদীঘিতে সমবয়সী কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কানন ফিরে গেল যাদবপুর । ললিত ও রত্ন বাড়ী ফিরল ।

হেয়ারকাটিং সেলুনে যেতে রত্ন রাজী হয়নি । সে এখন চুল ছাঁটবে না, আরো বড় হতে দেবে । ফোটোগ্রাফিক স্টুডিওতেও যাবে না । তার চেহারা গৌরীকে দেখাবার মতো নয় ।

রাত্রে ভোজনবিলাসীর স্বর্গ । রত্ন কিন্তু বলে বসল, 'এক বাটি পায়েস । তার বেশী খাব না ।' এ কথা আগে জানায়নি কেন ? জানালে পিসিমার আয়োজন সংক্ষেপ হতো। রত্নর সম্মানেই অমন রাজসূয় যজ্ঞ ।

'জানিনে তোমার মনে কী আছে ।' বিছানায় গিয়ে ললিত বলল, 'তুমি ওকে দেখতেও যাবে না, দেখাও দেবে না। চিঠি পাবে আর চিঠি লিখবে । জুতো খাবে । এই তোমার প্রেম । ওর প্রেম কিন্তু এমন ফিকে নয় ।'

রত্ন বলল, 'তুমি কেমন করে জানলে ?'

'আগুন কখনো ঢাকা থাকে ? প্রেম কখনো চাপা থাকে ? ওকেও দেখেছি, তোমাকেও দেখছি । তুমি হাত খালি করে উড়িয়ে দিতে জান না । আর ও হলো উড়নচণ্ডী ।'

এমনি কথায় কথায় বলা হয়ে গেল প্রেমের ইতিবৃত্ত। রত্নর দিক থেকে । ললিত অত কথা জানত না । এক মাস আগে আদৌ জানত না যে রত্নও গৌরীকে ভালোবাসে । ওর ধারণা ছিল প্রেমটা গৌরীর একতরফা । প্রথমে শুনতে পায় বৌদির কাছে । যশোবাবুর বড় বোন। পরে সাবুর কাছে। যশোবাবুর ছোট বোন। খবরটা যশোবাবুর কানেও পৌঁছেছে ।

'সত্যি ?' রত্নর চমক লাগল ।

'সত্যি ।' ললিত তার সন্দেহ ভঞ্জন করল ।

রত্নর বুকটা দমে গেল । সে মনে মনে একটা বক্তৃতা মুসাবিদা করেছিল । ললিতের জন্যে। ললিতের মুখ দিয়ে সুধাদির জন্যে । সুধাদির মুখ দিয়ে যশোবাবুর জন্যে । কিন্তু কার্যকালে তার মুখ দিয়ে বাক্য সরল না। সে কান পেতে রইল ললিতের উক্তির জন্যে।

ললিত বলল, 'যশোবাবু লোকটা যাকে বলে গুড স্পোর্ট। কোথায় ক্রোধে অনর্থ বাধাবেন, তা নয় হেসে অস্থির। বললেন, এ এক নতুন রূপকথা। চোখে না দেখতেই তনু মন সঁপে দেওয়া। তার পর চোখে দেখে চক্ষুস্থির। ওদের একবার চোখোচোখি ঘটালে হয় না? বেশ একটা মজাদার ব্যাপার হতো। এক দাগ ওষুধেই প্রেমজ্বর সেরে যেত।'

রত্ন গদগদ স্বরে বলল, 'তোমার কাছে অকপটে বলছি, ভাই। যশোবাবুকে আমি দাদার মতো ভালোবাসি। তাঁর যদি চিত্তপরিবর্তন হতো, তিনি যদি গোরীকে ছেড়ে দিয়ে সুধাদিকে বিয়ে করতেন তা হলে আমরা চার জনেই চিরসুখী হতুম। তিনি আর সুধাদি, গোরী আর আমি। তখন আমরা চার জনেই চার জনের প্রিয়পাত্র হতুম।'

'কেমন মজা হতো। না?' ললিত বলল শ্লেষ দিয়ে।

'এখন যা হয়েছে তার চেয়ে তো ভালো হতো।' রত্ন তর্ক করল।

'ছাই হতো!' ললিত রাগত ভাবে বলল।

'কেন? কেন?' রত্ন অনুনয়ের স্বরে সুধাল।

'কেন? কেন? তা হলে অনেক কথা বলতে হয়। অনেক অন্তরঙ্গ কথা। যা বলতেও লজ্জা। শুনতেও লজ্জা। শেষ কালে না বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে যায়!'

'না। ঘটবে না।' রত্ন নিশ্চয়তা দিল।

তখন ললিত বলল, 'আমার দোষ নেই কিন্তু। আমি তিক্ত হয়ে রয়েছি। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসবে। তখন আমাকে মেরো না।'

রত্নর মুখ শুকিয়ে গেল। সে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'তোমার কী দোষ!'

ললিত বলল, 'তবে শোন।'

রত্নকে রাজশাহীতে মাস ছয়েক আগে ললিত যা বলেছিল তার পরে পদ্মানদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সকলেরই জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। কারো কম, কারো বেশী। রত্ন প্রেমে পড়েছে। ললিত বিয়ে করেছে। তেমনি যশোবাবুও ঠিক সেই মানুষটি নেই। কংগ্রেসের যুগ গেছে বুঝতে পেরে তিনি ইংরেজের সঙ্গে দহরম মহরম করছেন। এই কারণে তাঁকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে।

হাকিম হয়ে তিনি দেখছেন তাঁর সদরে এসে বাস করা দরকার। নইলে কর্তব্যহানি হবে। একরারি আসামীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে হলে, জখমী ফরিয়াদীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখে নিতে হলে সদরে হাজির থাকা একান্ত আবশ্যক। দুষ্টু লোকেরা বলে, তা নয়। ক্লাবে গিয়ে তাস খেলতে হলে, পেগ টানতে হলে, বল নাচতে হলে মফঃস্বলের চেয়ে সদর প্রশস্ত।

আসলে তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হতে না পারলেও মনেপ্রাণে ব্যারিস্টার হয়েছেন। গ্রামে তাঁকে ধরে রাখা যায় না। এক দল মোসাহেবকে নিয়ে তাঁর দিন আর কাটে না। বেহালা বাজিয়ে বাজিয়ে তিনি শ্রান্ত। গোরীর মন পাওয়া গেল না। এখন সদরে গিয়ে তিনি বসবাস করবেন। গোরী যদি সদরের টানে যায় তা হলে একসঙ্গে ঘর করতে করতে মনের মিলও হয়ে যাবে। সেখানে সুধা থাকবে না ব্যবধান রচনা করতে। সুধার সঙ্গে তিনি অন্যত্র মিলিত হবেন।

গৌরীর কাছে যখন প্রস্তাবটা তোলা হলো সে উত্তেজনার আতিশয্যে উদ্বাহু হলো। বেগমপুরের পচা ডোবায় থেকে যে মাছ কোনো দিন বাড়বে না সদরের সরোবরে যাবার পথ কেটে দিলে সে তো চঞ্চল হয়ে উঠবেই। কিন্তু দু'দিন পরে সে বলতে আরম্ভ করল, না, মাধবকে ছেড়ে আমি যাব না। আমাকে নিয়ে যেতে চাও তো মাধবকেও নিয়ে চল।

তার বোঝা উচিত ছিল সেটা সম্ভব নয়। গৃহদেবতাকে মন্দিরভ্রষ্ট করলে গোটা পরিবারটাই উৎসন্ন যাবে। কিন্তু তার জেদ সে মাধবকেও নিয়ে যাবে। পরে একটা রফা হলো। মাধব যাবেন না। তাঁর একটি প্রতিনিধি গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যখন সব এক রকম স্থির তখন শেষ মুহূর্তে বলে কী! কই, সুধা যাচ্ছে না যে?

আর কেউ হলে বলা যেত ন্যাকামির চূড়ান্ত। কিন্তু গৌরীর বেলা সে কথা বলা চলে না। সুধা ওর মিলিটারি স্ট্র্যাটেজীর অঙ্গ। সুধা না থাকলে ও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে না। দুর্বল হয়ে পড়ে। দৃশ্যত ওরা দুই সতীন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। বস্তুত ওরা পরস্পরের রক্ষাকবচ। সুধা যদি না থাকত গৌরী কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারত না। আর গৌরী যদি না থাকত যশোবাবু এত দিনে আর একটি বিয়ে করে থাকতেন ও নতুন বৌ সুধাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে থাকত।

কই? সুধা যাচ্ছে না যে?

এর উত্তরে যশোবাবু বললেন, সুধা কোন সুবাদে সদরের বাড়ীতে থাকবে? লোকের কাছে মুখ দেখাবে কী বলে?

গৌরী বলল, আমার দিদি বলে।

যশোবাবু তো হতভম্ব। তিনি যতই বলেন, তা হয় না, গৌরী ততই রুখে দাঁড়ায়। কেন হবে না? আলবৎ হবে। জরুর হবে। আমার দিদি আমার কাছে থাকবে না? কে আমার সংসার দেখবে? বাজার হিসাবের আমি কী বুঝি? সবাই আমাকে ঠকাবে।

প্রতিবারের মতো এ বারেও গৌরী জিতল। যশোবাবু ভেবেছিলেন তাঁর মতো চালাক লোক আর নেই। গৌরীকে ফাঁদে ফেলবেন সুধাকে আলাদা রেখে। ডিভাইড য্যাণ্ড রুল। একালের চাণক্য শ্লোক। কিন্তু ইংরেজ হেরে গেল ভারতনারীর কাছে। গৌরী সুধাকে ঘরে ডেকে ভোজ দিল। সুধা গৌরীকে ঘরে ডেকে ভোজ দিল। দুই বোনে গলাগলি ভাব।

যশোবাবু এর পর নতুন ট্যাকটিকস প্রয়োগ করলেন। গৌরীর সাধ ঘোড়ায় চড়ে দেশের জন্যে লড়তে। নবাবের আস্তাবল থেকে ঘোড়া কেনা হলো। অতি সুলক্ষণ কালো ঘোড়া। যার পূর্বপুরুষের পিঠে চড়ে সিরাজ উদ্দৌলা নাকি ক্লাইভের সঙ্গে লড়েছিলেন। চার দিকে পর্দা খাটিয়ে একটা ঘোড়াদৌড়ের মাঠ ঘেরাও করা হলো। বোধ হয় লড়াইয়ের মাঠও পর্দা দিয়ে ঘিরে ফেলা হতো। কিন্তু বার তিন চার ঘোড়ায় চড়ার পর গৌরীর উৎসাহ নিবে গেল। ও মেয়ে হাড়ে হাড়ে বাঙালী। ঝাঁসীর রানী সেজে অভিনয় করতে

গেলে সইবে কেন ? একদিন চিৎপাত। কাছা দিয়ে শাড়ী না পরলে যা হয় । সইসের সামনে বেআব্রু । যশোবাবু বললেন ব্রীচেস পরতে । গোরী বলল ও মেমসাহেব নয়। দেশের জন্যে লড়তে গিয়ে মেমসাহেব বনবে না ।

ঘোড়াটা যদিও সিরাজের ঘোড়ার বংশধর তবু তার দ্বারা বাংলার সিংহাসন ফিরে পাওয়া গেল না । এবার হাতীর পালা । হাতীর পিঠে চড়ে শিকারে যাবার শখ গোরীর ছেলেবেলার । যশোবাবু তার জন্যে আলাদা একটা হাতী বরাদ্দ করলেন । হাতীটা তাঁর নিজের পূর্বপুরুষের । তার হাতে আলাদা একটা রাইফেল দেওয়া হলো । শিকারের ছলে কোথায় কোথায় নিশিযাপন করা হবে তারও একটা নির্ঘন্ট তৈরি হলো । তাঁবু পাঠানো হলো গোরুর গাড়ী করে । গোরী কিন্তু বেলা চারটের মধ্যেই ফিরতে চাইবে। কিছুতেই রাত কাটাবে না বাড়ীর বাইরে, তাঁবুতে। চারটের মধ্যেই তার হাতে পাখী পড়বে এ রকম ভরসা কে দেবে ? প্রত্যেক বার দেরি হয়ে যায় । পাখী পড়ে না। শূন্য থলে নিয়ে ঘরে ফিরতে হয় । ফিরতে ফিরতে আটটা ন'টা । গোরীর কী রাগ! কী রাগ !

রেগেমেগে দিল বন্ধ করে শিকার । রাইফেল চালাতে শিখেছে । কিন্তু চিড়িয়া মারতে নয় । ও কি পারবে কোনো দিন সাহেব মারতে ? অস্ত্র হাতে নিলে কী হবে, শিক্ষা চাই, শৌর্য চাই । যশোবাবু ওকে খুশি করার জন্যে অনেক কিছু তো করলেন । কিন্তু ওর মন পেলেন না । ওর ধৈর্য নেই । একটা কিছু নিয়ে লেগে থাকতে জানে না । ওর দ্বারা রাজনীতিও কি হবার ? ভেবেছিল ওকে ধরে মাগুলে কি আন্দামান চালান দেওয়া হবে। তা তো হলো না। আশা করেছিল গান্ধী জেল থেকে বেরিয়েই গণসত্যাগ্রহ করবেন, সেও ঝাঁপ দেবে । সেটা দূর আশা ।

যশোবাবুর গুরুজন তাঁকে আবার বিয়ে করতে বলছেন । তিনি আগেও 'না' বলেছেন । এখনো তাই বলছেন । এবার কিন্তু মন থেকে নয় । এবারকার বলায় তেমন আন্তরিকতা নেই । ললিতের বৌদিকে নাকি মুখ ফুটে বলেছেন, আর কেন ! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যাই । নতুন বৌ এলে সেও তো এরই ধারা ধরবে ! এরই প্রভাবে পড়বে ! আমি বৈরাগী হব তাতে দুঃখু নেই, বোন । আমার দুঃখু শুধু এই যে গোরীর দৃষ্টান্ত দেখে দেশের বৌঝিরা অবাধ্য হবে ।

ভিতরে ভিতরে মেয়ে দেখা চলেছে। আঁচতে পেরে সুধা বলছে সেও আর থাকবে না । তা শুনে যশোবাবু বলছেন নতুন বৌকে সুধার অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে, নয় তো তিনি বিয়ে করবেন না । এ হেন শর্তে রাজী হবে এমন মেয়েই বা কোথায় ! মেয়ের বাপই বা কোথায় ! যশোবাবু গোরীর মায়া কাটাতে মন বাঁধছেন । কিন্তু সুধার মায়া কাটাতে বললে কেঁদে ফেলবেন । কত কালের সম্পর্ক ! তিনি যখন প্রথমবার বিয়ে করে বিলেত যান তখন তাঁর বালিকা বধূর বিধবা দিদি সুধা এসে তার দেখাশুনার ভার নেয়, তার শ্বশুর-শাশুড়ীরও । প্রসবকালে তার মৃত্যুর পর সুধা এই বাড়ীতে আটকা পড়ে যায় । যশোবাবু ওকে লিখেছিলেন যে তিনি এ জীবনে আর বিয়ে করবেন না, সুধাকেই সঙ্গ দেবেন ও তার সঙ্গ পাবেন ।

পরে অবশ্য তাঁর সেই ভীষ্মের পণ ভঙ্গ হলো । সেটা পুত্রার্থে । তিনি সুধার কাছ

থেকে বিদায় নিয়ে গোরীর পাণিগ্রহণ করেন । বিনিময়ে হৃদয় অর্পণ করেন না । গোরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা বিশেষ একটি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে । উত্তরাধিকারী লাভ । এর জন্যে তিনি সুধাকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন । কিন্তু বিয়ের পর গোরী যখন বিদ্রোহ করল তখন তিনি পায়ে ধরে সুধাকে ঘরে নিয়ে এলেন । মনে করেছিলেন তিনি এমন একটা চাল চাললেন যে বিদ্রোহিণীর আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কোনো গতি রইল না । গোরীকে তার গুরুজন শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু সে তার পতাকা নত করল না । অসুখ বাধিয়ে মামার বাড়ী গেল ।

ইতিমধ্যে গোরীতে সুধাতে সখী সম্পর্ক স্থাপিত হয় । দু'জনে দু'জনের কাছে অঙ্গীকার করে যে কেউ কারো অনিষ্ট করবে না । যদি করে তবে নারীবধের পাপের ভাগী হবে । মাধবের সাক্ষাতে অঙ্গীকার । তিনি সাক্ষী । স্বামীর অধিকার খাটাতে যশোবাবু অশেষ চেষ্টা করেছেন । কিন্তু দুই নারীর সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছেন না । তারা তাস খেলতে বসে তাদের দু'জনের হাত যোগসাজস করে অতি সুকৌশলে খেলছে। যশোবাবুর একমাত্র ভরসা বাহুবল, কিন্তু গোরী তো আর চোদ্দ বছর বয়সের কিশোরী নয় । তার গায়ে যথেষ্ট জোর । বরং যশোবাবুরই সামর্থ্য কমে আসছে । এখন আর চোদ্দ বনাম আটাশ নয় । বিশ বনাম চৌত্রিশ । কিন্তু তাঁর শেষ চালটা গোরীকে বেকায়দায় ফেলেছে । সত্যি সত্যি যদি তিনি আর একটি বৌ ঘরে আনেন তাহলে সুধাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না । সে যাবেই । তার বাপ প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন । সে কারো গলগ্রহ নয় । প্রেমের টান না থাকলে সে কবে চলে যেত । সে যদি চলে যায় গোরীর জীবন দুর্বহ হবে । সে আর বেগমপুরে টিকতে পারবে না । অথচ মাধবকে ফেলে যেতেও তার পা ওঠে না । তার নিজের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিলে সে কি কোনো দিন মনঃস্থির করতে পারবে ! সিদ্ধান্তটা নিতে হবে অন্য একজনকে । যে তাকে ভালোবাসে তাকে । যাকে সে ভালোবাসে তাকে । সেই একজন কি রত্ন ? তবে রত্নকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সিদ্ধান্তটা গোরীর উপর খাটাতেও হবে জোরসে । নয়তো গোরী নতুন বৌয়ের ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে কি আত্মহত্যা করবে ।

রত্ন যদি কিছু করতে চায় তো সময় বেশী নেই । সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না । কিন্তু তার মাথা ব্যথা আছে কি ? মনে তো হয় না । মনে হয় তার পায়ে ব্যথা । তাই ফুলবাবুর মতো ফুল তোলা কার্পেটের জুতো পায়ে দেওয়া । গোরীর আপন হাতের কাজ । অন্য কারো জন্যে সে আর কোনো দিন পাদুকা রচনা করেনি । যে তেজস্বিনী মেয়ে ! রত্ন তাকে দিয়ে পাদবন্দনা করিয়ে নিল । ছি! ছি ! এ যে প্রকারান্তরে পায়ে ধরে প্রেম সাধা ! এমন সুন্দর সামগ্রীও সে আর কোনো দিন অন্য কারো জন্যে তৈরি করেনি । করে থাকলে মানুষের জন্যে নয় । মাধবের জন্যে ।

বাস্তবিক গোরীর এ দানের প্রতিদান বাজারের নাগরা দিয়ে হয় না । দিলে দিতে হয় নিজের হাতের কাজ । নাগরা কিনে দেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করল রত্ন । স্বগতভাবে বলে উঠল, 'আমার আপন হাতের কাজ কী আছে যে পাঠাব !'

'হাতের কাজ তো তুচ্ছ । করতে চাও তো বীরের মতো কিছু কর ।' ললিত এর

উত্তর দিল । 'হাতের কাজ তো মেয়েলি । এমন কিছু কর যা পুরুষোচিত ।'

রত্ন চমকে উঠে বলল, 'যথা ?'

'যথা ? আমি হলে যা করতুম ।'

'তুমি হলে কী করতে ?' রত্ন উৎসুক হয়ে সুধাল ।

'কেন ? বলিনি ?' ললিত রত্নকে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রেখে তার কানের কাছে মুখ এনে বিশ্বাস করে বলল, 'ইলোপমেণ্ট ।'

রত্নর মুখ এবার শাদা হয়ে গেল না । কিন্তু তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততব হলো । বুকে বালিশ চেপে সে স্থির হযে পড়ে থাকল । নির্জীবের মতো । যখন ভাষা ফিরে পেলো তখন শুধু এই কথা ক'টি বলল । 'কিন্তু ও যদি না চায় ?'

'ও যদি না চায় তবে তুমি ওকে নাচাবে ?' ললিত বলল 'পান' দিয়ে । বলে হো হো করে হেসে উঠল । আর রত্নকে ঠেলা দিল ।

সে রাত্রে আর কথাবার্তা হলো না । স্যাকরাব ঠুকঠাক কামারের এক ঘা । ললিতের ঘা খেয়ে রত্নর ঠুকঠাক স্তব্ধ ।

পরের দিন সকাল সকাল উঠে চা খেয়ে ওবা দু'জনে যাদবপুর চলল জ্যোতিদাকে ধরতে । ও কলকাতা এসেছে, কিন্তু চরকাব কাজ নিয়ে চরকির মতো ঘুরছে। রত্নকে দেখতে ওরও খুব ইচ্ছা । কিন্তু যোগাযোগ হযে ওঠা শক্ত ।

পথে যেতে যেতে রত্ন বলল ললিতকে, 'কাল যে কথা হচ্ছিল । ওর সামনে একটি নয় দুটি পদক্ষেপ । প্রথম পদক্ষেপ মুক্তি । এটি ওকে নিতে হবে নিজের দাযিত্বে । একক ভাবে । সাত ভাই চম্পার সাত জনেই সহায় । কোনো একজন বিশেষ কবে নয় । আমার অংশ সাত ভাগের এক ভাগ । আমিও অংশ নেব ।'

ললিত শুনতে চাইল, 'দ্বিতীয় পদক্ষেপ ?'

'দ্বিতীয় পদক্ষেপ সংযুক্তি । তার মানে বিশেষ কোনো একজনেব সঙ্গে সংযুক্ত হওযা । প্রণয়সূত্রে । প্রণয়মূলক পবিণযসূত্রে । ও যদি স্বযংববা হয়ে আমাকেই ববণ করে তবে অর্ধেক দায়িত্ব ওর, অর্ধেক দায়িত্ব আমাব । তখন আর ও একক নয় । আমরা দু'জনে মিলে এক। তখন সাত ভাই চম্পার কোনো অংশ নেই। তাদের ছুটি ।'

রত্ন সারা রাত চিন্তা করেছিল । তার চিহ্ন তাব চেহারায় আঁকা ছিল । ললিত তা লক্ষ করে সংযত হলো । বলল, 'আচ্ছা ।'

কিছুক্ষণ বাদে রত্ন আবার বলল, 'শুধু সাত ভাই চম্পার সহায়তা নয় । সুধাদির সহযোগিতা চাই । যশো-দার সহযোগিতা চাই ।'

'যশোদার সহযোগিতা । যশোদা মেয়েটি কে ।' ললিতের খটকা বাধল ।

'যশোদা নয় । যশো দা । যশোমাধব দাদা ।' রত্ন বিশদ করল ।

'তুমি তো আশ্চর্য ছেলে হে । যার স্ত্রী কুলত্যাগিনী হবে সে করবে সহযোগিতা । আর সুধাদির কথা তো কাল রাত্রে শুনলে । এর মধ্যেই ভুলে গেলে । সুধাদি যদি গৌরীকে যেতে দেয় নতুন বৌ এসে সুধাদিকেও তাড়াবে । সুধাদির স্বার্থ গৌরীকে ধরে রাখা। না, যশোবাবুর সহযোগিতা সুধাদির সহযোগিতা আশা করা যায় না । এমন কি সাত

ভাই চম্পার সহায়তারও আশা নেই ।'

রত্ন বিস্মিত হলো । 'বল কী । সাত ভাই চম্পাও সহায় হবে না ?'

ললিত গম্ভীর ভাবে বলল, 'রত্ন, ভাই, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বিবাহিত । নবনীও তাই । হৈমও তাই । আমরা কেউ প্রেমে পড়ে বিয়ে করিনি । আমাদের স্ত্রীদের বিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের সঙ্গে, যেমন গৌরীর বিয়ে দেওয়া হয়েছে যশোবাবুর সঙ্গে । আমরা যদি গৌরীর পিছনে দাঁড়াই বা যশোবাবুর ঘর ভেঙে দিই তা হলে কেউ না কেউ আমাদের স্ত্রীদের পিছনে দাঁড়াবে ও আমাদের ঘর ভেঙে দেবে । দিলে আমাদের বলবার কিছু থাকবে না । আমরা বেকুব বনে যাব । কাজেই তোমার গণনা থেকে তুমি আমাদের তিন জনের নাম বাদ দাও । গিরীন বোধ হয় বাঁচবে না । ওর বসন্ত হয়েছে। খবর ভালো নয় ।'

রত্নর গলা শুকিয়ে গেল । সে বিহ্বল স্বরে বলল, 'বসন্ত হয়েছে !'

'হাঁ । বসন্ত । পথে পড়ে থাকা বসন্তরোগীর সেবা করতে গিয়ে এই বিপত্তি । গিরীনকে বাদ দিলে বাকী থাকে কানন ও প্রভাত । তোমাকে আমি ধরিনি । হ্যামলেট নাটকের অভিনয়ে ডেনমার্কের যুবরাজ তুমি । ওদের দু'জনের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ ওরা ওদের পারুলবোনের জন্যে কত দূর কী করতে পারে ।' এই বলে ললিত হাত ধুয়ে ফেলল ।

সে যে প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে গৌরীর এ অনুযোগ অক্ষরে অক্ষরে সত্য । তা যদি হয় তবে সে কোন মুখে ইলোপ করতে পরামর্শ দেয় ?

'ইলোপ করতে কোন মুখে বলি ?' ললিত রত্নর প্রশ্নের উত্তরে স্মিত হেসে বলল, 'এই মুখে । ইলোপ করা তো সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা নয় । কালাপাহাড়ের মতো প্রতিমাভঙ্গ নয় । কত ছেলে কত মেয়ে আদি কাল থেকে ইলোপ করে এসেছে । তাতে কি সমাজের ইমারতে ভাঙন ধরেছে ? কিন্তু ঘটে যাওয়া বিবাহকে অঘটিত করে স্বয়ংবরের অধিকার আদায় করা হলো অন্য জিনিস । তাতে সমাজের ভিৎ পর্যন্ত নড়ে ওঠে । ভূমিকম্প হলে আমারও তো ভিটেমাটি ফাটবে । ফৌজদার বংশের হাওয়া বর্মণ বংশেরও গায়ে লাগবে ।'

রত্নর হৃদয়ঙ্গম হলো যে ললিতের মতে ইলোপমেন্ট হলো নিয়মের ব্যতিক্রম । সমাজ নিন্দা করতেও পারে, ক্ষমা করতেও পারে, সাজা দিতেও পারে, সয়ে যেতেও পারে । কিন্তু বিয়ে বলপূর্বক দেওয়া হয়েছে বলে বিবাহকে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা ও বিবাহিতাকে কুমারী বলে স্বীকার করা হচ্ছে নিয়ম উলটিয়ে দেওয়া । স্থিতাবস্থার যারা রক্ষক তারা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেবে না । দিলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই তলে তলে ক্ষয়ে যায় ।

'ইলোপমেন্ট যদি গৌরীর স্বতঃপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত হতো তা হলে না হয় কথা ছিল । কিন্তু অমন একটা সিদ্ধান্ত কি আমি ওর উপর চাপিয়ে দিতে পারি ? জোর খাটানো যদি মন্দ হয়ে থাকে তবে সব ক্ষেত্রেই মন্দ । এ ক্ষেত্রেও ।' রত্ন বিধান দিল ।

'গৌরী যদি মনঃস্থির করতে না পারে তবে তার হয়ে তোমাকে মনঃস্থির করতে

হবে। আর তুমি যদি মনঃস্থির করতে না পার তবে তোমার হয়ে গৌরীকে মনঃস্থির করতে হবে। প্রেম পরস্পরের উপর পরস্পরকে এই অধিকারটুকুও যদি না দেয় তবে তা প্রেম নয়। দু'পক্ষে প্রেমও থাকবে অথচ কেউ কারো দিকে এক পাও এগোবে না, দেখবেও না, দেখা দেবেও না, এই ধরি মাছ না ছুঁই পানি কি একপ্রকার স্নায়ুযুদ্ধ নয়? এই যুদ্ধটা ওই যুদ্ধটার চেয়ে কী এমন ভালো?'

'কোন যুদ্ধটার চেয়ে?' রত্ন মূঢ়ের মতো জিজ্ঞাসু হলো।

'শোবার ঘরের দরজা খোলা রাখা। কেউ ঘরে ঢুকলে ঘুমের ভাণ করা। তার পর চোরের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। চোরকে তাড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধে জেতা। যাক গে, ওসব কথা বলতেও লজ্জা, শুনতেও লজ্জা। এই যে আমরা এসে পড়েছি। থাক, তোমাকে দিতে হবে না। ট্যাক্সির ভাড়াটা আমিই দেব। তোমাকে এখানে রেখে আমি একটু ঘুরে আসি। কেমন? কাছেই একজন জাপানফের্তা অধ্যাপক থাকেন।' ললিত রত্নকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

রত্ন লক্ষ করল গেটে সাইনবোর্ড লাগানো: ডক্টর মোতিময় মুস্তফী।

বারো

কানন তার বন্ধুকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। প্রাতরাশ চলছিল। 'আমার বন্ধু রত্ন মল্লিক। আমার বৌদি ইঙ্গেবর্গ মুস্তফী। আমার দাদা ডকটর মুস্তফী। আর—আমার অগ্রজ জ্যোতির্ময় মুস্তফী।

ইঙ্গেবর্গ রত্নকে সমাদর করে তাঁর ডান পাশের আসনে বসালেন ও স্বহস্তে তার পরিবেশনের ভার নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক'চামচ চিনি?' মোতিময় জানতে চাইলেন ললিত কোথায়। কানন এক রাশ প্রশ্ন করল। শুধু জ্যোতিদা নীরব।

কথাবার্তার স্রোত যখন রত্নকে ফেলে অন্যত্র সরে গেল তখন সে জ্যোতিদার দিকে ভালো করে তাকাল। এক মুখ দাড়ি গোঁপ। চুলও বহু দিন ছাঁটায়নি। নাপিতের সঙ্গে অসহযোগ বা নাপিতের ধর্মঘট। চোখ দুটো আঁধার রাতের জোনাকির মতো জ্বলজ্বল করছে। কৌতুকে উজ্জ্বল। উন্নত নাসা। প্রশস্ত ললাট। গায়ে জোর আছে বোঝা যায়। গড়নে সৌকুমার্য। রং ময়লা। বোধ হয় রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সব ঋতুতে খোলা জায়গায় শুয়ে। অনেকখানি ক্ষিতি আর অপ, তেজ আর মরুৎ আর ব্যোম লেগেছে ওকে বানাতে। বয়স পঁচিশের মতো হবে।

ওর দাদা মোতিময় দীর্ঘকাল পশ্চিমে থেকে ওর চেয়ে ঢের বেশী ফরসা হয়েছেন বয়সেও অনেক বড়। পঁয়ত্রিশের কম নয়। তাঁর স্ত্রী তাঁর চেয়ে মাথায় উঁচু, দোহারা, মার্বেল কেটে মূর্তির মতো খোদাই করা। চুলের রং মলিন সোনালী। চোখের রং নীল। বয়স স্বামীর চেয়ে কম নয়। বাংলা শিখেছেন, কিন্তু উচ্চারণ বাঙালীর মতো নয় বলে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ইংরেজী দিয়ে চালান।

ললিতের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে যে যার কাজে গেলেন । তখন জ্যোতিদা এসে রত্নর হাতে হাত রাখল । রত্ন তাকে এত সহজ ভাবে নিল আর সেও রত্নকে যে কাননের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তোমরা কি আগে একজন আরেকজনকে দেখেছিলে ?'

জ্যোতিদা বলল, 'হাঁ । আধ ঘণ্টা আগে ।'

তখন কানন বলল, 'হারাধনের দুটি ছেলে অনেক দিন পরে যে যার হারানো ভাইকে খুঁজে পেয়ে কী রকম ব্যবহার করেছিল তার একটা আভাস চোখে পড়ল । নিশ্চয় চিঠি লেখালেখি হয়েছে বহু বার ?'

রত্ন বলল, 'একবারও না ।'

'তা হলে তোমরা আমাকে অবাক করলে !' কানন হাল ছেড়ে দিল ।

জ্যোতিদা ভীষণ কাজের লোক । দশ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারল না। রত্নকে নিমন্ত্রণ করল কাপালিপাড়ায় । তার আশ্রমে । রত্ন তাকে পালটা আমন্ত্রণ করল পদ্মার চরে । স্থির হলো জ্যোতি আসবে প্রথমে । দু'সপ্তাহ থাকবে । রত্ন যাবে তার পরে। এক মাস থাকবে। কথা জমে গেছে বিস্তর । রোজ একটু একটু করে হবে । বাকী সময়টা যে যার নিজের কাজ করবে । জ্যোতিদার কাজ সুতো কাটা ।

রত্ন লক্ষ করল যে জ্যোতিদার পরনে কটিবস্ত্র । শুনল সেটা তার নিজের হাতে কাটা সুতো থেকে তৈরি । তার কাঁধের উড়নিটাও তাই । এ ছাড়া আর কোনো বহির্বাস ছিল না । পায়ে ঘাসের চটি । গান্ধীটুপির কথা জিজ্ঞাসা করায় সে হেসে বলল, 'আমার তো টাক পড়েনি । কিংবা মা বাপ মারা যায়নি ।'

রত্ন আশা করেছিল জ্যোতিদা গোরীর কথা তুলবে, কিন্তু সে ওর নামও করল না। রত্নও লজ্জায় ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল । তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে গোরী তাদের দু'জনেরই মন জুড়েছিল । দু'জনের সঙ্গে সেও উপস্থিত ছিল অদৃশ্যে । তা বলে সে-ই দু'জনের সেতুবন্ধ নয় । সে না থাকলেও এরা দু'জনে দুই ভাই হতো । আত্মিক সম্বন্ধে । যাকে বলে হরিহর আত্মা । গোরী শুধু নিমিত্তমাত্র ।

জ্যোতিদা চলে গেলে ললিত এলো, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকল না । কাননকে বলে গেল রত্নকে পৌঁছে দিতে ও দুপুরে খেতে । সে নিজে যাবে জাপানযাত্রার ছাড়পত্রের তদ্বির করতে । দরখাস্ত ইতিমধ্যে করা হয়ে গেছে । এখন ইংরেজ রাজী হলে হয় । ওরাও ললিতকে বিশ্বাস করে না । তার এ কূল ও কূল দু'কূল গেছে ।

কানন বলল, 'কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে ?'

রত্ন বলল, 'না, ভাই । তোমার ঘরে নিয়ে চল । গল্প করি ।'

কানন ওকে উপরে নিয়ে গেল । জ্যোতি আর কানন দু'জনের ঘরে । জ্যোতিদা তো নেই । তার খাটে আরাম করে শুয়ে পড়ল রত্ন । গত রাত্রের ক্লান্তি তার অঙ্গে ।

কানন বলল, 'তোমার জন্যেও একটা ছোট ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন বৌদি । তা তুমি তো এলে না । নিরাশ হলেন সকলে । বিশেষ করে জ্যোতিদা ।'

রত্ন বলল, 'কী করি, বল ? আমি যে তোমাদের চেয়ে ললিতকে বেশী ভালোবাসি

বলে তার পিসির বাড়ী উঠেছি তা নয় । তার সঙ্গে আমার গুরুতর কাজ ছিল । আমি চেয়েছিলুম তার মধ্যস্থতায় গোরীর মালিকের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে। তা আর হলো কোথায় ! সে আমাকে উলটে পরামর্শ দিচ্ছে—'

'তোমার নিজের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে ।'

'দূর ! সে কী বলছে, শুনবে ? ইলোপ করতে ।' রত্ন বিশ্বাস করে বলল ।

'আমিও তো সেই মন্ত্রণাই দিচ্ছি । তোমার অন্তঃপরিবর্তন বলতে আমি যা বুঝি তা শাদা বাংলায় ইলোপমেণ্ট । পারুলদিকেও সেই মন্ত্রণা দিয়ে এলুম । তারও অন্তঃপরিবর্তন চাই । মাধব বলে ও বাড়ীতে একটা পুতুল আছে । সেই পুতুলের মায়া ও কাটাতে পারছে না । বিশ একুশ বছর বয়স হলো । এত বয়সেও পুতুল খেলার সাধ মিটল না । আর কবে মিটবে ! আমি বলি, দিদি, তোর কাছে মানুষ বড় না মানুষের হাতে গড়া পুতুল বড় ? চণ্ডীদাস বলে গেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই । সেই মানুষকে আড়াল করবে পুতুল ?'

রত্ন ভেবে বলল, 'যার সঙ্গে যার চোখের দেখা পর্যন্ত হয়নি তার সঙ্গে তার ইলোপমেণ্ট তো আঁধারে ঝাঁপ দেওয়া । ঝাঁপ দিয়ে তার পর যদি আমাকে ওর মনে না ধরে ? বা আমার ওকে ? ভাই কানন, এখন মনে না ধরলে মোহভঙ্গ হবে, কিন্তু তখন মনে না ধরলে মনোভঙ্গ । হৃদয়ভঙ্গ । জীবনভঙ্গ ।'

কানন বলল, 'তা হলে চল আমার সঙ্গে বেগমপুর ।'

রত্ন আঁতকে উঠল । 'যশোবাবুর বাড়ী ! না, না, সে আমার দ্বারা হবে না । এক যদি তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন তা হলে যেতে পারি ।'

কানন মাথায় হাত দিয়ে বলল । 'তিনি আমন্ত্রণ করবেন তোমাকে ! কেন ? কোন সুবাদে ? এমন পরামর্শ আমি কি তাঁকে দিতে পারি ? সে হয় না ।'

রত্ন বলল,'গোরী লিখেছিল আমি যদি জ্যোতিদার আশ্রমে যাই ও সেখানে অনায়াসে আসতে পারবে । কিন্তু তার জন্যে জ্যোতিদার অনুমোদন দরকার । সে কি ওটা পছন্দ করবে ? আশ্রম তো প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্কেতস্থল নয় ?'

'না, সেখানেও দেখা হওয়া শক্ত । দিদিকে আজকাল খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয় । যশোবাবুর আত্মীয়রা তাঁর জন্যে পাত্রী অন্বেষণ শুরু করেছেন । চমৎকার একটা অজুহাত পাবেন, যদি দিদি কাপালিপাড়ায় গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসে । সেটা সঙ্গত কখন ? না যখন দিদি একেবারে মনঃস্থির করে ফেলেছে । কিন্তু এটাই বা কেমন করে সম্ভব, যত দিন না তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ? একেই বলে ভিসাস সার্কল । দেখা না হলে মনঃস্থির হয় না । মনঃস্থির না হলে দেখা হয় না ।' কানন ভাবনায় পড়ল ।

রত্ন খুলে বলল, 'আমার সারাক্ষণ ভয় আমার চেহারা দেখে ওর যদি মোহভঙ্গ হয় ! সেটা আগে ভাগে হয়ে গেলে সেও বাঁচে আমিও বাঁচি । মনে দুঃখ হবে, কিন্তু জীবনে ভুল হবে না । তবে এমনও হতে পারে যে ওর মোহভঙ্গ হবে না, হবে আমার । তখন কি ওকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে পাশ কাটিয়ে যেতে পারব ? না, আমার

আর ফেরার পথ নেই। তা হলে দেখা করার কথা ওঠে কেন ? ওঠে ওরই মনঃস্থির করার জন্যে।'

'আমার নিজের সে রকম কোনো আশঙ্কা নেই.। যেখানে এত নিবিড় ভালোবাসা সেখানে চেহারাই সব কথা নয়। কিন্তু কে জানে! বলা তো যায় না। আঁধারে ঝাঁপ দেবার আগে কার সঙ্গে ঝাঁপ দিচ্ছি সেটা আমি হলে আমিও দেখতে চাইতুম।'

রত্ন মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমার বিবেচনায় প্রথম জিনিস প্রথমে। আগে মুক্তি। মুক্তির জন্যে মুক্তি। পরে প্রেম। প্রেমের জন্যে প্রেম। গৃহত্যাগ যদি করতে হয় মুক্তির জন্যেই করা হোক। মুক্তির জন্যে ও কত কাল ধরে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। প্রেম তো এলো সেদিন। দুটোকে একসঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলা কি ভালো ?'

কানন মাথা নেড়ে বলল, 'এটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। ইতিমধ্যে আমি বার দু'তিন বেগমপুর গেছি। দিদিকে এই কথাই বলেছি। ও কী উত্তর দিল শুনবে ? মুক্ত হয়ে ও তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। কার পায়ে দাঁড়াবে ? সুন্দর মুখের বিপদ সর্বত্র। খারাপ লোক পিছনে লাগবে। ওর বন্ধুরা ওকে কত কাল বাঁচাবে! ও শেষ পর্যন্ত হবে রূপোপজীবিনী। আর একটি সোনালী।'

রত্নর মনে হলো সে ভির্মি খেয়ে পড়বে। এই কি তার ফ্রী উওম্যান ? না, কখনো নয়। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আর কী উপায় আছে তার, যার লেখাপড়া এত কম, রূপ এত বেশী ? কায়িক শ্রম তো সে করবে না। করলেও কি খারাপ লোকের সংসর্গ এড়াতে পারবে ? মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমেরও প্রয়োজন। যে প্রেম বাঁচাবে। আত্মবিক্রয় থেকে। মন্দ থেকে। কিন্তু তেমন প্রেম কি চাইবামাত্র মেলে ?

রত্ন তার মনীষা দিয়ে এর কোনো কূলকিনারা পেত না। মুক্তি আর প্রেম এমন ভাবে জট পাকিয়েছিল যে একটির থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হতো না। এই মেয়েটির মুক্তির আয়োজন করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আয়োজনও করতে হয়। আগে মুক্তি পরে প্রেম এটা অন্য কারো বেলা খাটতে পারে, কিন্তু এর বেলা খাটে না। তা বলে প্রথম দর্শনে যদি কেউ কাউকে মনোনয়ন না করে তা হলেও কি ভালোবেসে যেতে হবে ? তা হলে স্বাধীনতা কোনখানে ? কার হাত থেকে ?

না, মনীষা দিয়ে এর মীমাংসা হতো না। হলো আবেগ দিয়ে। হৃদয়াবেগ। সহসা কে যেন বলে উঠল রত্নর মুখ অবলম্বন করে, 'আমি থাকতে গোরী সোনালী হবে ? কদাপি নয়।'

ঐ ক'টি কথা বলতে তার সাংঘাতিক উদ্যম লেগেছিল। সে শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বেশ! ও যদি আমার সঙ্গে ইলোপ করতে চায় তবে তাই হবে। তার আগে আমাদের দেখা নাই বা হলো। পরে দেখা হলে পছন্দ হবে না ? এই তো! তখন আমরা রাখীবন্ধ ভাইবহিন হব।'

কানন যেন অকূল সমুদ্রে ভূমির সন্ধান পেলো। চাঁদমামার মতো আহ্লাদে আটখানা হয়ে পরক্ষণে আত্মসংবরণ করল। চুপি চুপি বলল, 'কেবল একটু সংযম চাই।'

'একটু ?' রত্ন সংশোধন করে বলল, 'অনেকখানি!'

এর পর কানন বলতে বসল বেগমপুরের গল্প । রাজশাহী থেকে সে একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা আবিষ্কার করেছে । পদ্মা পার হয়ে কাতলামারি । কাতলামারি থেকে পায়ে হেঁটে বেগমপুর । বড়দিনের পর সরস্বতী পূজার সময়, তার পর দোলের সময়, তার পর পরীক্ষা শেষে বেগমপুর গিয়ে সে পারুলদিকে দেখে এসেছে । তার চেয়েও বড় আকর্ষণ যশোবাবুর বিলিতী বেহালা । যেটার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড না থার্ডহ্যাণ্ড দাম হলো গিয়ে বারো হাজার টাকা । স্ট্রাডিভেরিয়াস বেহালা ভারতে বোধ হয় ওই একখানিই । সারা পৃথিবীতেও খুব বেশী নেই । যা বিকোয় তা আসলি নয় । নকলি । আসলের কপি । বেহালা আবার যত পুরোনো হয় তত দামী হয় ।

পারুলদি ওকে যশোবাবুর ওখানে উঠতে দেয় না, যদিও তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন তাঁর অতিথি হতে । সে ওঠে জ্যোতিদার আশ্রমে । মাইল দুই দূরে । কাপালিপাড়ায় । কাপালি বলে একটি অনুন্নত বা অস্পৃশ্য জাত আছে তারাই আশ্রমের মালিক ও শ্রমিক । জ্যোতিদা কেবল ট্রাস্টী বা ন্যাসী । আর দশ জনের মতো সেও গতর খাটায়, খেটে খায় । আশ্রমের জমিতে প্রায় সবকিছু জন্মায় । ধান থেকে আরম্ভ করে কাপাস । সুতো কাটা তো হয়ই, ধুতি লুঙ্গি গামছাও বোনা হয় । জ্যোতিদার ইচ্ছা ঠিক সেই রকম একটি আশ্রম স্থাপন করা হয় মেয়েদের জন্যে । স্থাপন করে পারুলদি। ট্রাস্টী হয় । গতর খাটায় । খেটে খায় । সেই পথেই তার মুক্তি । ওদের বিয়ে ভেঙে যায় স্ত্রী যদি স্বামীর ভাত না খায় । তখন সে আবার বিয়ে করে । সকলে যোগ দেয় । পারুলদিকে তা হলে আইন আদালত করতে হয় না । সোজা সড়ক থাকতে বাঁকা গলি খুঁজতে হয় না ।

পারুলদি কী বলে ? পারুলদি বলে, না । যে শ্রেণীতে তার জন্ম সে শ্রেণী থেকে সে বড় জোর এক ধাপ নিচে নামতে পারে । উচ্চ শ্রেণী থেকে মধ্য শ্রেণীতে । কিন্তু সব চেয়ে নিচু ধাপটাতে নয় । নিম্নতম শ্রেণীতে নয় । তার চেয়ে গণিকা হওয়া শ্রেয় । গণিকাদের মধ্যে উচ্চতম শ্রেণীর গণিকা । যেমন কাশীর বাঈজী । সে জানতে চায় গতর খাটানো যদি পুণ্য হয় তবে দেহ খাটানো বা রূপ খাটানো কেন পুণ্য হবে না ? কেন পাপ হবে ? জ্যোতিদা তার সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠতে পারে না । ইঙ্গে বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় । ইঙ্গে বৌদি কাপালিপাড়া ঘুরে এসেছেন । তিনি ইবসেনের মন্ত্রশিষ্যা । নীতির দিক থেকে তিনি আদপেই কনভেনশনাল নন । তিনিও চান পারুলদির মুক্তি । কিন্তু ও সাফ বলে দিয়েছে, গতর খাটিয়ে মুক্তি সে আমার নয় । ছোটলোক হয়ে সাঙ্গা সে আমার নয় ।

গতর খাটাবে না, কিন্তু শরীরকে শুকিয়ে সলতে পাকাবে । মাছ মাংস খাবে না। স্বামীর ভাত শ্বশুরের ভাত খাবে না । মাধবের প্রসাদ পাবে । তার জন্যে মাধবের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দেবে । আগে দেখা যেত সকালবেলা তার কাছে প্রজারা এসে দরবার করত, সে তাদের হয়ে শ্বশুরকে বলত, ম্যানেজার মশায়কে বলত । আজকাল সে ফুল তোলে মালা গাঁথে । এই সব করে সকালটা যায় । আগে দেখা যেত দুপুর গড়ালে পাড়ার বৌঝিরা এসে তাকে ঘিরে বসত । শৌখীন সূচীশিল্প শিখত । শেখাত নক্সী

কাঁথার কাজ । সেই সূত্রে সে তাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে ভজাত । বীরাঙ্গনা হতে হবে, বীরজায়া হতে হবে, বীরমাতা হতে হবে । স্বামী বা ছেলে যদি দেশের জন্যে প্রাণ দেয় তবে আনন্দ করতে হবে । আনন্দের সঙ্গে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে । আজকাল বৌরানীর বৈঠক বসে না । বৌরানীকে দেখা যায় মাধবের মন্দিরে । সেখানে শীতল সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে । পুতুলের ভোগ ।

সন্ধ্যাবেলা দেখা যেত সে জ্যোতিদার সঙ্গে বসে পড়াশুনা করছে । দাদা তাকে ভালো ভালো ইংরেজী বই মুখে মুখে তর্জমা করে শোনাত । কাব্য উপন্যাস থেকে দর্শন বিজ্ঞান । দু'জনে মিলে তর্ক বিতর্ক করত । আজকাল সে আরতি দেখবে বলে উঠে যায় । ফিরে আসে না । এ ছাড়া তার মণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে যখন তখন তার রাজনীতিচর্চা চলত । ওরা এখন কেউ জেলে কেউ আড়ালে আবডালে । সে একা একা এক হাতে কতটুকু রাজনীতির রণ করবে ! ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো এক দিন হয় তো সাত দিন বন্ধ থাকে । তার পর বেবাক বন্ধ হয়ে যায় । তার বদলে হয় মাধবের রাজবেশ, রাখালবেশ । মাধবের সঙ্গে যে রাধা আছেন তাঁকেও রানী সাজানো হয় গোপী সাজানো হয় । এই তো সেদিন দোললীলা হয়ে গেল ।

ক্রমেই সে জ্যোতিদার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে । জ্যোতিদা বলছে, রত্ন যদি নিতে চায় নিক এ দায়িত্ব । আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি । এর চেয়ে ভারত উদ্ধার সহজ । ইঙ্গে বৌদি বলছেন, ওকে ডুবতে বা সাঁতার কাটতে দাও । ও তো কচি খুকী নয় । যতদিন নাবালিকা ছিল ততদিন তোমার দায়িত্ব ছিল । এখন ও পূর্ণ সাবালিকা ।

কিন্তু জ্যোতিদার মুশকিল হয়েছে এই যে পারুলদি তার চোখে এখনো সেই ষোল বছরের বিষাদিনী অসুখিনী । ক্ষয়রোগ হয়েছে বলে সন্দেহ করে যাকে ভাগলপুরে মামার বাড়ী পাঠানো হয়েছিল । ও নাকি তখন ছিল জ্যোতিদার মেলিসান্দা । আর জ্যোতিদা নিজেকে কল্পনা করত পিলিয়াস । ও যদি রাজী হতো ওকে নিয়ে সে কোথাও পালিয়ে যেত । সেবা দিয়ে শুশ্রূষা দিয়ে সারিয়ে তুলত বাঁচিয়ে রাখত । ওর মন পেলে ওকে বিয়ে করত । তা হবার নয় । ও পড়ে গেল এক ডাক্তারের প্রেমে । সেটা অস্বাভাবিক নয় । ডাক্তার যে ওকে চিকিৎসা দিয়ে সারিয়েছে । যত্ন দিয়ে বাঁচিয়েছে । তার পর ওকে ফিরিয়ে আনা হলো শ্বশুরবাড়ীতে । জ্যোতিদা-ই ওর ভগ্ন হৃদয়ের ধন্বন্তরী হয়। ওকে জ্ঞান দিয়ে নিরাময় করে। রাজনীতি দিয়ে ব্যাপৃত রাখে । তার চোখে ও মেলিসান্দা-ই রয়ে যায় । কিন্তু ওর চোখে সে পিলিয়াস হয় না। হবেও না। জ্যোতিদার মনে আফসোস । কিন্তু সে এখন অনেক বড় সাধনা নিয়ে মগ্ন । সে সাধারণ রাজনীতিক নয় । সে তার বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। তার জীবনটা তার পিতার জীবনের প্রতিবাদ ।

জ্যোতিদার বাবা মুস্তফী মশায় সামান্য জমিদারি কর্মচারী থেকে উঠতে উঠতে এখন বেগমপুরের ষোল আনা শরিকের কমন ম্যানেজার । প্রজারা বাঘের মতো ভয় করে, অধীনস্থরা ভূতের মতো ডরায়, বাবুরাও সমীহ করেন । তাঁর হাত কিন্তু পরিষ্কার নয় । বিষয় সম্পত্তি বিস্তর করেছেন । প্রজা আর জমিদার উভয় পক্ষের মাথায় কাঁঠাল

ভেঙেছেন । ওদিকে তান্ত্রিক সাধক । প্রচ্ছন্ন কাপালিক । ছেলে তাই কাপালি হয়ে শোধ তুলছে । বাপ চলে ডালে ডালে তো ছেলে চলে পাতায় পাতায় । হিরণ্যকশিপু বনাম প্রহ্লাদ । এই যুদ্ধ জ্যোতিদাকে মাতিয়ে রেখেছে । এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ । ইংরেজ বনাম ভারতীয় । বোঝার উপর শাকের আঁটি পারুলদির মুক্তির সংগ্রাম । যশোমাধব বনাম শ্রীমতী । তিন তিনটে লড়াই যার কাঁধে সে একজন জাতসৈনিক । ঐ খাদি হচ্ছে ওর ইউনিফর্ম । এর ঐ আশ্রমটা ওর শিবির । ও কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ধার ধারে না । হিংসাপ্রতিহিংসায় মনের পরিচ্ছন্নতা লোপ পায় । অপরিচ্ছন্ন মন দিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় না । ভাবী ভারতের ভাবী সমাজের স্বপ্ন । তা ছাড়া জ্যোতিদার ধাতটা আন্তর্জাতিক । ইঙ্গে বৌদির প্রভাবে সে মানুষ হয়েছে । সাহেব খুন করার কথা সে ভাবতেই পারে না । শুনলে কষ্ট পায় ।

অনেক লোক আছে যাদের সাজপোশাক পাশ্চাত্য কিন্তু ভিতরটা প্রাচ্য । তেমনি কতক লোক আছে তাদের বেশভূষা আচারব্যবহার ভারতীয়, কিন্তু চারিত্র্য ও চিন্তাপ্রণালী ইউরোপীয় । এ রকম একজন ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় । একজন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী । একজন জ্যোতিদা । তাকে চিনতে সময় লাগে, সূক্ষ্মদৃষ্টি লাগে, বিশ্লেষণশক্তি লাগে । তার বন্ধু ও সহকর্মীদেরই কাছে সে অচেনা । পারুলদিও কি তাকে চেনে ? এটাও তার অন্যতম আফসোস । তা বলে তার লেশমাত্র ত্বরা নেই আপনাকে চেনাতে । আপনাকে সে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত । জাহির করতে নয় । সাধারণ রাজনীতিকদের সঙ্গে তার বনবে কেন ? অন্যেরা যখন চক্রান্ত করছে সে তখন হাল ঠেলছে বা বীজ বুনছে। অন্যেরা যখন নাম কিনছে সে তখন কুয়ো খুঁড়ছে বা জল সেচ করছে । তবে গান্ধীজীর ডাক শুনে সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে জেলে যেতে লাঠি খেতে সে প্রতিদিন প্রস্তুত হচ্ছে । সে যা খায় তা জেলের খোরাক বা সেই জাতীয় ।

রত্নকে সে গোড়ার দিকে সুনজরে দেখেনি । মনে করেছিল মধ্যশ্রেণীর আর একটি রোমান্টিক ইনটেলেকচুয়াল । ও রকম তো আরো দেখা গেছে । ধীরে ধীরে তার ধারণা বদলে গেছে । এখন শ্রদ্ধা ও স্নেহচক্ষে দেখে । বলে, রত্ন কোনোখানেই খাপ খাবার ছেলে নয় । কোনো দেশে, কোনো জাতিতে, কোনো ধর্মে, কোনো শ্রেণীতে, কোনো সঙ্ঘে, কোনো সমাজে । কেউ বলতে পারবে না যে রত্ন পুরোপুরি আমার দলে । এমন কি সাত ভাই চম্পাও তেমন দাবী করতে পারে না । কিন্তু এইখানেই ওর দুর্বলতা । জনগণের সঙ্গে খাপ খেতে না জানলে বিংশ শতাব্দীর জগতে কোনো বড় কাজ করা যায় না ।

জ্যোতিদা ললিতকেও ভালোবাসে। কিন্তু তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমর্থন করে না । ওটা একপ্রকার য়্যাডভেঞ্চার । পারুলদির রাজনীতি তো রীতিমতো রোমান্স । কিন্তু সে তার নিজের মতবাদ এদের কারো উপর চাপাতে চায় না। তার বিশ্বাস এরাও একদিন জনগণের কাছে যাবে ও তাদের উপর এদের রাজনীতি না চাপিয়ে তাদেরই স্বার্থে সংগ্রাম করতে শিখবে ।

এর পর কানন ও রত্ন ললিতের পিসির বাড়ী গেল । সেখানে রত্ন যতক্ষণ স্নান

করতে থাকল কানন ততক্ষণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রঙ্গ করতে থাকল । ক্ষেন্তির সঙ্গেও। কাননের কাছে ওর ঘোমটার বালাই নেই । পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা । নাকে নাকছাবি ।

ললিত বাড়ী ফিরল মুখে হাসি নিয়ে । হাতে একখানা গাঢ় নীল রঙের বই । কানন সেখানা কেড়ে নিয়ে সেখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রত্নর দিকে বাড়িয়ে দিল । রত্ন কিন্তু সহজে হাতছাড়া করল না । মুগ্ধের মতো নিরীক্ষণ করল । পাশপোর্ট ! এই নিয়ে বিদেশ যাত্রা করতে হয় । কবে তারও এমনি একখানি পাশপোর্ট হবে !

'তার পর জাহাজের খবর কী ? প্যাসেজ বুক করা হয়েছে ?' রত্ন কৌতূহলী হলো ।

'পাশপোর্ট মিলবে কি না সন্দেহ ছিল বলে ওসব দিকে নজর দিতে পারিনি । চল কাল আমার সঙ্গে বেরোবে । টমাস কুকের ওখানে ।' প্রস্তাব করল ললিত ।

রত্ন খুশি হয়ে বলল, 'বেশ তো ।' সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল যে গৌরীর চিঠিপত্র কুষ্টিয়ার ঠিকানায় যাচ্ছে । সেখানে কার হাতে পড়ছে কে জানে ! তাকে কলকাতার ঠিকানা দেওয়া হয়নি । কোথায় ওঠা হবে তা অনিশ্চিত ছিল । রত্ন একই নিঃশ্বাসে বলল, 'ওঃ তোমাকে বলতে ভুলে গেছি । আজকেই আমি বাড়ী চললুম পাঁচটার ট্রেনে । বিশেষ কাজ আছে । বুঝলে ? না আরো খুলে বলতে হবে ?'

ললিত ও কানন দু'জনেই হেসে উঠল । বিশেষ কাজ আছে ! কী কাজ তারা বুঝেছিল ।

খাওয়াদাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিয়ে ললিত বলল, 'চল না একটা স্টুডিওতে গিয়ে গ্রুপ ফোটো তোলানো যাক । জাপান চলে যাই তো তিনজনে আবার কবে একত্র হব !'

কানন বলল, 'পারুলদি কিন্তু গ্রুপ ফোটো চায়নি । চেয়েছে একার ফোটো ।'

রত্ন রক্তিম হলো । ললিত বিবর্ণ । দু'জনে দু'জনকে এক নজরে দেখে নিল । কানন টের পেল না রহস্য । সে তো জানত না যে ললিতও পারুলদিকে ভালোবাসত। এখনো বাসে । সেই জন্যেই জাপান যাচ্ছে । যত দূরে পারে তত দূরে ।

রত্ন গভীর শ্বাস ফেলে বলল, 'থাক ! আজ আমি ক্লান্ত । তোমাকে জাহাজে তুলে দিতে আমরা সকলেই আসব । সেসময় আরো বড় গ্রুপ ফোটো তোলানো যাবে ।

তেরো

"Home! Sweet home! There's no place like home!"

বাড়ীতে পা দেবার আগেই গুনগুনিয়ে উঠছিল রত্ন । মার্কিন গীতিকার বিখ্যাত কলি । মা নেই যদিও, ঠাকু'মা নেই যদিও, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে যদিও, তবু বাড়ী হচ্ছে বাড়ী । তার মতো আর কিছু নয় ।

রত্নর বাবা ছেলেমেয়েদের জীবনে হস্তক্ষেপ করতেন না । উপদেশ পর্যন্ত দিতেন না । একটিমাত্র আশীর্বচন ছিল তাঁর মুখে—'কৃষ্ণে মতি হোক ।' রত্ন বাড়ী পৌঁছে তাঁকে

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—'কৃষ্ণে মতি হোক।' সঙ্গে সঙ্গে সেও তার নিজের ভাষায় তর্জমা করে নিল । মনে মনে। রাধায় মতি হোক । গোরীতে মতি হোক ।

বড়মাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গেলে তিনি তাকে কোলে টেনে নিয়ে অশ্রুমোচন করলেন । আহা ! মা অভাগী বেঁচে থাকলে কত সুখী হতো । তিনি বার বার উচ্চারণ করতে থাকলেন , 'আমার রতনমণি ! আমার রতনমণি !'

ছোট ভাই রম্যকান্ত চাষগাঁয়ে থাকে । ছোট বোন টুকু দাদাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল । বাইরে থেকে শোনা গেল, 'দেব না । দেব না । আমার জন্যে কী এনেছ আগে বল ।'

রত্ন অনুমানে বুঝেছিল গোরীর চিঠি পড়েছে টুকুর হাতে । সর্বনাশ ! যদি খুলে থাকে ! বয়স বারো তেরো, কিন্তু দেখতে আরো বড় দেখায় । শ্যামা মেয়ে । সুশ্রী । তার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে । দাদাদের ইচ্ছা নয়, কিন্তু বাবার ইচ্ছা যথাসত্বর কন্যাদায়মুক্ত হয়ে বৃন্দাবনযাত্রা করা ও ব্রজবাসী হওয়া ।

তবু ভালো যে গোরীর চিঠি টুকুর হাতে পড়েছে । বাবার হাতে পড়েনি । নয়তো তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা বলতে হতো । ছিল তার সঙ্গে টুকুর জন্যে কেনা কেশতৈল তরল আলতা সুগন্ধ সাবান শৌখীন প্রসাধন পেটিকা । বার করে দিতে হলো তক্ষুনি ।

চিঠিগুলো টুকু নিমেষের মধ্যে কোনখান থেকে এনে সুটকেসের ভিতরে গুঁজে দিয়ে গেল । কেউ দেখতে পেলো না কার চিঠি । সে বোধ হয় আন্দাজ করেছিল যে চিঠিগুলো তার সম্ভবপর বৌদির । কিন্তু কাউকে জানতে দেয়নি ।

সুটকেস সমেত রত্ন চলল তার কোটরে । দোতলায় একখানিমাত্র ঘর । সিঁড়িটা বাড়ীর বাইরে । ঘরখানি রত্নর বইপত্রে ভরা । তাই সে না থাকলে বন্ধ থাকে । ওখান থেকে নদী দেখা যায় । গোরাই নদী । উত্তরে । উত্তর দক্ষিণ খোলা ।

যার জন্যে সে কলকাতার জামাই আদর ছেড়ে চলে এলো এই সে চিঠি । প্রিয়ার চিঠি । তিন তিনখানা চিঠি । অহো ভাগ্যম্ !

কোনখানা ফেলে কোনখানা আগে পড়বে ? রত্ন একসঙ্গে তিনখানা খুলে সামনে রাখল । কোনোখানাই খুব ছোট নয় । এখানার একটু ওখানার একটু এমনি করে তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদ নিতে লাগল । গোরী যেন তার নির্জন ঘরে তার সঙ্গে বসে কথা বলছে । কেরোসিনের নরম আলোয় । ইচ্ছা করলে তাকে ছোঁয়া যায় । তবু সে ধরাছোঁয়ার অতীত ।

রত্নর হৃদয়ে অব্যক্ত ব্যথা । অসহায় বিরহের । কথা বলাবলি কত কাল চলবে! কথা বলতে কথা শুনতে ভালো লাগে । কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে কথা না বলতে কথা না শুনতে। চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকতে । নীরব সান্নিধ্য পেতে । শুধুমাত্র সান্নিধ্য । আর কিছু নয় । এমনি কেরোসিনের আলোয় । এমনি আলো-আঁধারিতে। একটুখানি দেখা। অনেকখানি না দেখা । ইচ্ছা করলে ছোঁয়া যায় । তবু না ছোঁয়া ।

চিঠি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল গোরী যেন পাশে বসে কথা বলছে। জ্যোতির

কথা । কাননের কথা। কাননের হাতে পাঠানো জুতোর কথা । এমনি কত কথা । সুধা নাকি তাকে বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে অমন করে সতীন ডেকে না আনতে । আপোস করতে। মেয়েমানুষের অত তেজ ভালো নয় । কাঁদতে জনম যাবে ।

তার মন এখন অতিশয় অশান্ত । শান্ত অবশ্য কোনো দিন ছিল না, তা বলে এ রকম অশান্তও এর আগে ছিল না । কেন এই অপরূপ অশান্তি ? নতুন বৌ আসবে বলে কি ? না । সে জন্যে নয় । আসে আসবে । গোরী তত দিন থাকলে তো ! সে কাউকেই ভয় করে না । ভয় করে শুধু একজনকে । সেই একজনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে । সেই একজন যদি বলে, 'এই গোরী ! না, না । একে তো আমি চাইনি । একে তো আমি ভালোবাসিনি । না, না । এ নয় । এ নয় ।' রাজা দুষ্যন্ত যেমন শকুন্তলাকে দেখে চিনতে পারলেন না । কিংবা চিনেও চিনলেন না । অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন । প্রেমবতীকে প্রত্যাখ্যান করলেন ।

গোরী তখন কী করবে ? সে কি শকুন্তলার মতো পথে পথে ঘুরবে ? কোনো এক মেনকা এসে তাকে মেনকালয়ে নিয়ে যাবে ? একালের মেনকার মেনকালয় শহরের বুকে । সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সোনালীর মতো কত সোনার মেয়ে । গোরীও আশ্রয় পাবে। না, অত বড় অপমানের পর সে আর কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না । শ্বশুরবাড়ীর দ্বার তো চিরদিনের মতো রুদ্ধ । বাপের বাড়ীর দরজাও বন্ধ । বন্ধুরা নিশ্চয় সদয় হবে, সে কিন্তু দয়ার দান নেবে না । যেখানে তার জোর নেই সেখানে সে যাবে না । সেখানে সে থাকবে না । অগত্যা অগতির গতি মেনকালয় । সেখানে তার কিছুটা জোর খাটবে । রূপের জোর । তার থেকে রুপেয়া আসবে । সে কারো গলগ্রহ হবে না । রাখীবন্ধ ভাইয়েরও না । রূপ ছাড়া আর কীই বা আছে তার ! তার কি বিদ্যা আছে না শিক্ষা আছে যে সে ব্রাহ্ম মেয়েদের মতো স্বাবলম্বী হবে ? যার যা আছে সেই তার উপজীবিকা ।

পড়তে পড়তে রত্ন থ হয়ে যায় । সম্পূর্ণ মরীয়া না হলে কি কেউ এসব লেখে ? সে চিঠি রেখে দিয়ে ভাবে । আবার পড়ে । আরো পড়ে ।—

ঘরে থাকা আমার হবে না । মাধবও আমাকে ধরে রাখতে পারবে না । তুমিই জিতবে । তুমিই আমার প্রিয়তর । আমি যাবই । যাব একদিন তিমির রাত্রে শ্রীরাধার মতো । বাঁশির ডাক শুনে । বৃষ্টি পড়ছে, হাওয়া উঠছে, পথ দেখা যাচ্ছে না । তবু আমি যাব । যাব বাঁশির সুর ধরে । কে জানে কোন দিকে বাঁশি । কে জানে পশ্চিমে না পূবে । তবু আমি যাব । কে জানে কতদূরে বাঁশি । এক রশি দূরে না এক ক্রোশ দূরে । তবু আমি যাব । তবু আমি পৌঁছব ।

পৌঁছব তোমার কাছে । কিন্তু এমন অন্ধকার যে তোমার মুখ দেখতে পাব না । কে তুমি ? কেমন দেখতে ? জানতে পাব না । কেমন করে তা হলে তোমাকে চিনব ? ওগো আমার অদেখা অচেনা বল্লভ, তুমি যে আমার চিরপরিচিত কান্ত। তোমাকে যদি ভালোবেসে থাকি, ভালোবাসা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে ভালোবাসার আলোয় আমি চিনব । যেখানে আলো আছে সেখানে আঁধার কোথায় ?

আর তুমিও তো আকাশের ধ্রুবতারার মতো দেখতে । শত অন্ধকারেও চেনা যায়। যার হাতে আলো নেই সেও চিনতে পারে কোন সুদূরের ধ্রুবতারাকে ।

কিন্তু জানিনে, তুমি চিনবে কি না আমাকে । আমি তো ধ্রুবতারা নই । আর তোমার অন্তরে আলো আছে কি না কেমন করে বলব ! ওগো তুমি রাগ করলে না তো ? এখনো আমার সন্দেহ ? তোমার কাছে আমার কিছুই লুকোনো নেই । তবু কোন নারী কোন পুরুষকে সব কিছু খুলে দেখায় ! তুমি যদি অন্তর্যামী হয়ে থাক তবে আপনি জানবে । জানলে কি ভালোবাসতে পারবে ? না । আমার প্রত্যয় হয় না । দোষ তোমার নয় । দোষ আমারও নয় । দোষ আমার পরিস্থিতির । আমার পরকীয়া অবস্থার । এর থেকে আমি পরিত্রাণ চেয়ে পাইনি । নয়তো আমি তোমার সম্মুখীন হতে লজ্জায় মরে যেতুম না ।

দেখা না দেখায় কী আসে যায় ? আমরা যে কেউ কাউকে দেখিনি সঙ্কট এখানে নয় । হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের ছেলেমেয়েরা অদেখা অচেনার পাণিগ্রহণ করে এসেছে। শুভদৃষ্টি ঘটেছে বিবাহের পূর্বে নয়, পরে । তা বলে মোহভঙ্গ ঘটেছে ক'জনের ! অনুতাপ করেছে ক'জন ! অসুখী যারা হয় তারা অন্য কারণে হয় । যারা দেখে শুনে বিয়ে করেছে তারাও । এক কথায় বলতে গেলে—যে যার নয়, সে তার নয় । যে যার, সে তার । একবার যখন বোঝা গেল কে কার তখন কেন আমি চোখের দেখার জন্যে সবুর করতে যাব ? আমি তোমার হাতে আমার হাতের রাখী বেঁধেছি । তার মানে কী তাও তোমাকে বলেছি । ওই আমার মালাচন্দন । ওই আমার স্বয়ংবর ।

ওগো তোমাকে চোখে দেখে যদি আমার পছন্দ না হয় তা হলেও তুমি আমার । দেখতে ভালো হলেও আমার, কালো হলেও আমার । খোঁড়া হলেও আমার। কানা হলেও আমার । আমার দিক থেকে চোখের দেখার তেমন গুরুত্ব নেই । যেমন তোমার দিক থেকে । তুমি তো কই, আমাকে তোমার হাতের রাখী পাঠাওনি । তুমি স্বাধীন পুরুষ । প্রেমের জন্যে তোমার স্বাধীনতা খাটো করনি। করবেও না। আমাকে চোখে দেখে যদি তোমার অপছন্দ হয়, যদি তোমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার অন্তর ভেদ করে এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমার অরুচিকর, তা হলে আমি কোথায় দাঁড়াব ! ওগো আমি যে তোমার মর্মভেদী দৃষ্টির বাণে বিদ্ধ হয়ে মরে যাব । না, না । আমি তোমার সম্মুখীন হতে পারব না । আমার সাহস হয় না। আমি কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতেই পারি । ওই পর্যন্ত আমার সাহসের দৌড় ।

তবু যেতে হবে । পালে বাতাস লেগেছে । বেশ বুঝতে পারছি বন্দরের কাল হলো শেষ । এবার ভাসতে হবে । ভাসতে ভাসতে আমি তোমার ঘাটেই যাব । তুমি যদি ভিড়তে না দাও আবার ভাসব । ভাসতে ভাসতে অঘাটায় যাব। ভাসতে ভাসতে দরিয়ায় যাব ।

রত্নর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো । সে কোনো মতে বাকীটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিচে নেমে গিয়ে গল্প করতে বসল । আজ তার আসার কথা ছিল না । অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে পেয়ে সবাই খুশি । কিন্তু রান্না যা হয়েছে তা খুশি হবার মতো নয় । আবার রাঁধতে হচ্ছে । তাই বসে বসে গল্প ।

বাবা বলছিলেন, একবার খুব মজা হয়েছিল । নারদ গিয়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে বলেন, ঠাকুর, আমার চেয়ে বড় ভক্ত তোমার কেউ আছে ? নারায়ণ একটু ভেবে বললেন, হাঁ । আছে বই-কি । মর্ত্যলোকে অমুক গ্রামে এক গৃহস্থ থাকে । সে-ই আমার সব চেয়ে বড় ভক্ত । নারদ গিয়ে দেখেন লোকটা স্ত্রীপরিবার গোরুবাছুর অতিথি অভ্যাগত চাষবাস বিষয় আশয় নিয়ে আকণ্ঠ ডুবে আছে । সেবাপূজা করবে কখন ! হরিনাম করতেও ফুরসৎ পায় না । যখন শুতে যায় তখন শুধু বলে, 'হরি হে, দীনবন্ধু ।' আর দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে । শেষ রাত্রে উঠে আর একটি বার বলে, 'হরি হে, পার কর ।' ও যে ঘোর সংসারী লোক ! ও-ই হলো তোমার সব চেয়ে বড় ভক্ত ! আর আমি নারদ চব্বিশ ঘণ্টা তোমার পায়ের কাছে আছি, সেবা করছি পূজা করছি নামগান করছি, আমি কিনা ওর চেয়ে ছোট ! আমার না আছে স্ত্রী, না আছে পরিবার, আমি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী মায়ামুক্ত বাসনাকামনাহীন । তবু ছোট ! এই তোমার বিচার !

নারায়ণ বললেন, আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল । আমি তোমাদের দু'জনকে পরীক্ষা করব । ছদ্মবেশ ধরে তাঁরা সেই গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হলেন । গৃহস্থ করযোড়ে বললেন, কী আদেশ ? নারায়ণ বললেন, দুটি কলস নিয়ে এস । তেল ভর কানায় কানায় । একটি তুলে নাও তোমার মাথায় । একটি তুলে দাও আমার শিষ্যের মাথায় । দু'জনে আমাকে দশ হাত দূর থেকে প্রদক্ষিণ কর । আমি যখন বলব তখন থামবে ।—তাই হলো । নারদ ভাবলেন এ আর কঠিন কথা কী ? প্রদক্ষিণও চলবে, নামগানও চলবে। চললেন নেচে নেচে হরিগুণ গেয়ে । আর গৃহস্থ জানতেন একটু অসতর্ক হলে তেল গড়িয়ে পড়বে। তেল তো এখন তাঁর নয় । তাঁর অতিথির । তেল নষ্ট করলে অতিথির অসম্মান হবে । গৃহস্থ তাই পরম একাগ্র ভাবে কর্তব্য সম্পাদন করতে লাগলেন । হরিনাম করবেন কখন ? করলে কি একাগ্রতা থাকবে ?

ওদিকে নারদের ভ্রূক্ষেপ নেই । তেল গড়াতে গড়াতে ভাঁড় খালি । ঠাকুর তখন থামতে বলেন । দু'জনেই তাঁর কাছে এলেন । ঠাকুর হাসলেন । হেসে বললেন, খালি ভাঁড় মাথায় করে নাচতে তো বলা হয়নি । সে তো সকলে পারে । তেল এক ফোঁটা কম হবে না । অথচ আমাকে প্রদক্ষিণ করা হবে । তুমি তোমার মাথার বোঝা ফাঁকি দিয়ে হালকা করে নিয়েছ । গৃহস্থ তা করেনি । তার বোঝা সমান আছে । তা নিয়ে সে একমনে প্রদক্ষিণ করেছে । কোনটা কঠিন ? আমি চাই কথা নয়, কাজ । নাম নয়, কাম । সেবা বল, পূজা বল, সমস্তই ফাঁকি, যদি কাজে ফাঁকি দাও । সকলে যদি কাজে ফাঁকি দেয় এ সৃষ্টি একদিনেই অচল হবে । যাদের উপর সংসারের ভার দিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে বসে আছি তারা যদি যে যার কর্তব্য না করে তা হলে আমারও বৈকুণ্ঠবাস হবে না । এই গৃহস্থ আমাকে বৈকুণ্ঠে রেখেছে । অতএব এই আমার সব চেয়ে বড় ভক্ত ।

গল্প সারা হলো। রত্ন বুঝতে পারল গল্পচ্ছলে বাবা তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। পরে বড়মার কাছে শুনল ওটা পরোক্ষে পুত্রকে উপদেশ। ও যেন নারদের মতো অসংসারী না হয়ে গৃহস্থের মতো সংসারী হয়। সংসারের বোঝা ঘাড়ে নেয়। বাপকে বৃন্দাবনে রাখে। বড়মাকে রত্ন মুখ ফুটে বলতে পারল.না যে সংসারী হওয়া তার কাম্য নয়, যদি হয় তবে গোরী বলে একটি মেয়েকে ঘর দেবার জন্যে হবে।

যে বোঝা সে মাথায় তুলে নিয়েছে সংসারভার তার তুলনায় ভারী নয়। একটি বন্দিনী নারীকে বন্ধনমুক্ত করা, একটি কায়িক প্রতিরোধকারিণীকে মনের জোর জোগানো, একটি প্রেমিক প্রাণকে তৃষ্ণার জল দিয়ে বাঁচানো, একটি সুন্দর সত্তাকে শতদলের মতো বিকশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া— এ ভার সে সাধ করে নেয়নি। নারায়ণই তাকে নিতে বলেছেন। এক মনে বহন করাই তার কর্তব্য। কিন্তু ও কথা সে বোঝায় কাকে! কে বুঝবে!

রত্ন সে রাত্রে ক্লান্তিতে কাতর বোধ করছিল। গোরীকে চিঠি লিখতে পারল না। পরের দিন ভোরে উঠে লিখতে বসল। লিখল প্রথমে কার্পেটের পাদুকার প্রসঙ্গ। কী বলে ধন্যবাদ দেবে? সম্বন্ধটাও ধন্যবাদ দেওয়ানেওয়ার নয়। তবু সে তার ধন্যতা না জানিয়ে থাকতে পারছিল না। তার পদযুগ ধন্য। প্রিয়ার পদপল্লবের অপ্রত্যক্ষ স্পর্শে পুলকিত! প্রিয়ার করাঙ্গুলিও অলক্ষিতে ছুঁয়ে গেছে তার চরণ। উল্লাসের আতিশয্যে তার প' পড়ে না মাটিতে। গোরী তাকে আসমানে তুলে দিয়েছে।

গোরী, তোমাকে আমি গোরী বলে ডাকি এতে তুমি খুশি নও। নিত্য নতুন নামে ডাকতে বলেছ। কিন্তু তোমার দেওয়া তালিকায় যতগুলি নাম আছে গোরী নামটির মতো সুন্দর একটিও নয়। আজ পর্যন্ত যত নাম আমি পড়েছি বা শুনেছি গোরী নামটির মতো মধুর কোনোটি নয়। না জানি কতেক মধু গোরী নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে। গোরী, গোরী, গোরী, কত বার যে মনে মনে ডাকি, লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকি, তা যদি তুমি জানতে! কেন ডাকি? এমনি। ডেকে সুখ পাই। স্বাদ পাই। এ নাম যদি তোমার কানে সুধা বর্ষণ না করে তবে মনে রেখো নামের উপর কানের দাবীর চেয়ে মুখের দাবী আরো বড়। কান খুশী নয় বলে মুখ কেন তার দাবী ছাড়বে? তবে তোমার যদি সাড়া না পাই তবে ও নামে ডাকব না। তার বদলে ডাকব—প্রেম। তুমিও আমাকে এই নামে ডেকো। দু'জনের একই নাম হোক। প্রেম।

প্রেম, তুমি আমার কাছে আসবে এমন ভাগ্য কি আমার হবে! আমি চাই যে তুমি আমাকে চাও। তুমি আমাকে যে ভাবে চাইবে সেই ভাবেই পাবে। যদি বল ভাই তা হলে ভাই। যদি বল কান্ত তা হলে কান্ত। যদি বল বর তা হলে বর। আমি তোমাকে 'না' বলব না। তোমার হয়তো মোহভঙ্গ হবে। তখন তুমি অন্য ভাবে চাইতে পার। আর আমার যদি মোহভঙ্গ হয়? হবে না, জানি। তবু যদি হয় তবে আমি তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বদলে নেব। আমরা যে একই মাপে

তৈরি । যুগল যদি না হই তবে যমজ ।

তোমাকে উপহার পাঠাতে গিয়ে দেখলুম আমার হাতের কাজ তো নয় । বাজারের কেনা । কী তার মূল্য ! ভাবছি কী দিই । রাখীর বিনিময়ে রাখী দিইনি বলে তুমি এত দিন পরে ভুল বুঝেছ । ওগো তুমি যেমন আমাকে বরণ করেছ আমিও তেমনি তোমাকে বরণ করেছি । বলিনি কি তোমাকে রাম না জন্মাতে রামায়ণ রচনার কাহিনী ? কেমন করে কী যে হয়ে গেল তা উপন্যাসের চেয়েও আজব । গত মাঘী পূর্ণিমার আগের মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে প্রভাতের মুখে শুনি তোমার রূপবর্ণনা । তোমার ভালো নাম । সেদিন কি আমি জানতুম তুমি কে ? সেদিন কি আমি ভাবতে পেরেছি যে তুমি অগ্রণী হয়ে চিঠি লিখবে আমাকে মাস ছয়েক বাদে ? সেদিন কি ধ্যানগম্য ছিল যে তুমি আমার, আমি তোমার ? কেন তা হলে আমার আতঙ্ক জাত হলো ? তোমার প্রতি আতঙ্ক ! সেই যে আতঙ্ক সেটা প্রেমেরই ছদ্মবেশ । আমার অচেতন মন সেইদিনই তোমাকে বরণ করে নিয়েছে । আমার সচেতন মন তা টের পায়নি । মাস ছয়েক পরে যখন তোমার চিঠি এলো তখন আমার অচেতন মন আবার তোমাকে চিনে নিল ।সচেতন মন তা স্বীকার করল না । কেটে গেল আরো মাস ছয় । এবার যখন মাঘী পূর্ণিমার রাত এলো এখন এলো স্বীকৃতি ।

এখন বল তুমি আমাকে চিনে নিলে না আমি তোমাকে চিনে নিলুম ? কে কাকে বরণ করল ? কে আগে ? কে পরে? আমি যদি বলি, আমিই আগে! এই অসম্ভব রূপকথা কেই বা বিশ্বাস করবে ! অবিশ্বাস্য বলে আমার সংশয়ী মনীষা আজো নিঃসংশয় হয়নি । সে বলে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে নেই । সে বলে প্রথম দর্শনের ক্ষণে মোহভঙ্গ হতে পারে । আমার নয় । তোমার। এত দিন আমি আশঙ্কা করে এসেছি মোহভঙ্গ হবে তোমারি । কিন্তু তুমি যা লিখেছ তা পড়ে মনে হয় আশঙ্কাটা তোমারও কম নয় । বরং তোমারি বেশী। তুমি ওকে সঙ্কট বলেছ । ওর কারণও ব্যক্ত করেছ ইঙ্গিতে । তুমি এত ভয় পেয়েছ যে আমাকে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না । আমার মর্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে আসতে পারবে না ।

তাই যদি হয় তবে তুমি আমার কাছে আসবে এটা দুরাশা । আমিই বা তোমার কাছে গিয়ে কী করব ! ওদিকে ললিত আর কানন দু'জনেই আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছে —কী মন্ত্রণা দিয়েছে, শুনবে ? তোমাকে নিয়ে ইলোপ করতে ! শোন কথা ! যারা কেউ কাউকে চক্ষে দেখেনি, কবে দেখবে তাও জানে না, দেখলে পেছিয়ে যাবে কি না ঠিক নেই, যাদের একজনের ভয় আরেক জনের চাউনিকে, যারা যুগল না যমজ এখনো অপরীক্ষিত—তারা করবে ইলোপ ! এ কি সম্ভব ! কিন্তু কানন যা বলল তা আমার যুক্তিসেনাকে বিপর্যস্ত করল । আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি থাকতে গোরী সোনালী হবে ! কদাচ নয় ! ও যদি আমার সঙ্গে ইলোপ করতে চায় তবে তাই হবে । তার আগে আমাদের দেখা নাই বা হলো । পরে

দেখে পছন্দ হবে না, এই তো ? পছন্দ না হলে আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হব।

ইলোপ করার বিরুদ্ধে একাধিক যুক্তি আছে । তুমি যদি আমার সঙ্গে ইলোপ কর সমাজকে তার পরে সমঝাতে পারবে না যে তুমি নির্দোষী, তোমার বিবাহ বলপূর্বক দেওয়া হয়েছিল বলে অসিদ্ধ হবার যোগ্য । সমাজ তোমাকেই দোষ দেবে । বিবাহ থেকে মুক্তি না পেলে তোমার মুক্তি অসমাপ্ত রয়ে যাবে । দ্বিতীয় বার বিবাহ সমাজসম্মত হবে না । সমাজের চোখে তুমি হবে পরকীয়া । হয়তো তোমার আপন চোখেও । তোমার চিঠিতেও পরকীয়া এই শব্দটির উল্লেখ আছে । আমাকে ওটি এমন বেদনা দিল ! সারাজীবন দেবে, যদি তুমি ওই ধারণা পোষণ কর । পরকীয়া প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই । আমার প্রেমের ভিত্তি স্বকীয়া প্রেম । তুমি আমার স্বকীয়া । তুমি পরকীয়া নও, পরাধীনা । কিন্তু সমাজ তা মানবে না । তুমিও যদি না মানো তবে পরে অসুখী হবে, অসুখী করবে । এবং অসুখটার নিদান ঠাওরাবে যা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছ । যা তোমাকে আমার দৃষ্টিভীরু করেছে ।

আজ তাই আমি তোমাকে খোলাখুলি বলতে চাই তুমি যে সঙ্কটের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়েছ সেটা অমূলক । কেন, বলছি শোন । যে মেয়ে সব কিছু ফেলে আমার কাছে আসবে সে তার অতীতকেও ফেলে আসবে পিছনে। আমি দেখতে চাইব না কী তার অতীত, কেমন তার অতীত । তার বর্তমানকে নিয়ে আমার ঘরসংসার । তার ভবিষ্যৎকে ঘিরে আমার স্বপ্ন । তার অতীতের সঙ্গে আমি চাইব পরিচ্ছন্ন ছেদ । কেউ যেন কোনো দিন আমাকে স্মরণ করিয়ে না দেয় তুমি কে ছিলে, কী ছিলে, কার ছিলে, কোনখানে ছিলে । আমি ভাবতে ভালোবাসব যে তুমি চিরকাল আমার সঙ্গেই ছিলে, আমারি ছিলে । ছিলে অদৃশ্য অগোচর রূপে । নিরাকার দেবতার মতো । এলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে । সাকার দেববিগ্রহের মতো । আমিও তখন প্রতিমাভঙ্গকারী না হয়ে প্রতিমাপূজক হব । বিকার বোধ করব না। অরুচি বোধ করব না ।

. প্রেম, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে কে ! আমি ! কখনো নয় । তোমাকে আমি সোনালী হতে দেব না ।

চোদ্দ

কথাটা বাবার কানে তুলতে রত্নের প্রাণ আকুলিবিকুলি করছিল । কিন্তু এ কী মুখে আনবার মতো কথা যে, 'গোরী বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে আমি ভালোবেসেছি, সংসারী যদি হতে হয় তো তারই জন্যে ও তারই সঙ্গে ?'

এও তবু লেখনীর মুখে বলা যায়, কিন্তু 'গোরী আর আমি ভাবছি কোথাও চলে যাব' এ কথা কি বাবার বুকে শেলের মতো বাজবে না ! তিনি কী অপরাধ করেছেন যে তাঁকে তাঁর ছেলে প্রাণদণ্ড দেবে !

অথচ গোরীর সঙ্গে রত্নর যে সম্বন্ধ সেটাও পিতাপুত্র সম্বন্ধের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয় । ভগবানকে পিতা রূপে উপাসনা করা যায় । একদা সে তা করেছে । ভগবানকে মাতা রূপে আরাধনা করা যায় । একদা তাও সে করেছে । এখন যদি তিনি তার কাছে কান্তা রূপে অর্চনা চান তবে এটাও তার করণীয় । একদিন হয়তো তিনি গোপাল রূপে পূজা নিতে আসবেন । তখন সেটাও তার কর্তব্য হবে ।

কান্তাকে সে বঞ্চনা করবে না, প্রত্যাখ্যান করবে না । তা যদি করে তবে কে জানে হয়তো নারীবধের পাপের ভাগী হবে । গোরীর অপমৃত্যু সে কল্পনা করতে পারে না । তার চেয়েও ভয়াবহ গোরী যদি সোনালী হয়ে যায় । রত্ন থাকতে গোরী সোনালী হবে ? সব কিছু সম্ভব, কিন্তু এ কখনো সম্ভব নয় ।

'গোরীকে আমি সোনালী হতে দেব না ।' রত্ন মনে মনে বলে । বার বার বলে । নাম জপ করার মতো দু'বেলা জপ করে । 'গোরীকে আমি সোনালী হতে দেব না । তার চেয়ে ওকে নিয়ে কোথাও চলে যাব । ও যদি চায় । ও যদি হঠাৎ এসে হাজির হয় ।' রত্ন আপন মনে বলে যায় ।

তার গায়ে কাঁটা দেয় ও কথা মনে আনতে । ইলোপমেন্ট ! কী রোমাঞ্চকর ! কে জানে কোন দিন ! কে জানে কোনখানে ! কে জানে কী হবে তার পরে ! বিধাতাই জানেন । বাবা হয়তো লোকলজ্জায় দেশান্তরী হবেন । হয়তো পুত্রশোকে প্রাণ বিসর্জন করবেন । রাম সীতার বনবাস এর চেয়ে এমন কী শোকদায়ক ছিল ! রত্নগোরীর বনবাসের চেয়ে ! দশরথ তাও সইতে পারলেন না । রত্নর বাবা কেন পারবেন !

বাবার দিকে তাকালেই রত্নর অন্তর হায় হায় করে । বাবা ! বাবা ! তোমাকে কি আমরা হারাতে চাই ! আমরা চাই যে তুমিও বাঁচ আমরাও বাঁচি । তুমি চল তোমার সার্থকতার পথে । আমরা চলি আমাদের সার্থকতার পথে । বিশ্বাস কর আমরা কেউ আত্মসুখের জন্যে অপরকে দুঃখ দিতে চাইনে । সুখ নয় সার্থকতা আমাদের কাম্য ।

গোরীর প্রেম এসে রত্নর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল । ইলোপমেন্টের হাওয়া লেগে তার হৃদয় খুলে গেল । সবাইকে সে বুকে টেনে নিতে চায় । সকলের বুকে ঠাঁই পেতে চায় । কেউ পর নয় । সব মানুষ আপন । সব প্রাণী আপন । একটি তৃণাঙ্কুরকেও সে হেলায় মাড়িয়ে যাবে না । একটি পিঁপড়েকেও সে জলডুবি থেকে বাঁচাবে । এমন যার হৃদয় সে কি তার বাবাকে বাঁচাবে না ? কিন্তু কেমন করে ? রত্ন ভেবে আকুল হয় ।

যাদের সে সভয়ে পাশ কাটিয়ে যেত, সন্তর্পণে এড়িয়ে চলত, তারা যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করছে । আমাদের ভালোবাসতে পার ? পুলিশের লোক । জেল কয়েদী । পেশাদার গুণ্ডা ও দাঙ্গাবাজ । তারাও বলছে, আমাদের ভালোবাসতে পার ? যাদের দিকে সে শরমে চাইতে পারত না তারা যেন তাকে মিনতি করছে । পতিপরিত্যক্তা। পতিতা । পাতিতা । তারাও যেন তাকে ডেকে বলছে, আমাদের কেউ কেন ভালোবাসে না ? তুমি একটু ভালোবেসো ।

সত্যি । চতুর্দিকে প্রেমের এত অভাব । প্রেমের জন্যে এত ক্ষুধা । এত পিপাসা ।

একটি হৃদয় দিয়ে ক'টিকেই বা ভালোবাসা যায় ! ভালো করে নিবিড় করে প্রাণভরে ভালোবাসা যায় ! ওই একটি গৌরীকেই সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসা যায় কি ? ওর যে চ্যালেঞ্জ তার জবাব দেওয়া কি সোজা ? ওর যে মিনতি তার মর্যাদা রাখা কি মুখের কথা ? ওই একজনকে ঠিকমতো ভালোবাসতে জানলে ভালোবাসতে পারলে সে ভালোবাসা সর্বজনের হৃদয়ে পৌঁছবে । ভাণ্ডের ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড ।

ছোট ভাই রম্যকান্ত অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে পড়াশুনা ছেড়ে চাষবাস দেখছে । চাষগাঁয় থাকে, মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসে । দাদা এসেছে শুনে বাড়ী এলো । বলল, 'চল আমার সঙ্গে যাবে । তোমাকে আস্ত একটা কুঁড়ে ঘর দেব । খাবে দাবে বিশ্রাম করবে । তোমার শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ।'

রত্ন ইতিমধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিল যে চরে চিঠিপত্র যায় না, চর থেকে চিঠিপত্র আসে না। সেখানে গেলে গৌরীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয় । তাই তার উৎসাহ মন্দা হয়ে এসেছিল । তা ছাড়া এ গরমে গোরুও চরে না, দুধও মেলে না । এক বাটি পায়েস দিনান্তেও জুটবে না । বোধিদ্রুম বা কোনো রকম দ্রুমও নেই যে ছায়া দেবে ।

'তোর সঙ্গে যাব যে, চিঠিপত্রের কী হবে ?' রত্ন সুধায় রমুকে ।

'একদিন অন্তর একদিন ডাক পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে যায় নিয়ে যায়। তা ছাড়া আমার সাইকেলে করে তুমি রোজ ডাকঘরে হাজিরা দিতে পারবে। সাত মাইল দূরত্ব।' রমু আশ্বাস দিল। পোড়াদহ থেকে পশ্চিমে সাত মাইল ।

দুই ভাইয়ের আকৃতি এক রকম, কিন্তু আকারে ছোট ভাই বড় । আর প্রকৃতি অনেকটা বিভিন্ন । রমু ডানপিটে জবর জোয়ান । যেমন খেতে মজবুৎ তেমনি খাটতে মজবুৎ । তেমনি খেলতে ও শিকার করতে। ওর জনমজুরদের সঙ্গে ও খোল বাজিয়ে কীর্তনও করে, ওদের অসুখে বিসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করে, আবার ওদের গাফিলতি বা অবাধ্যতা দেখলে মারধরও করে । গালিগালাজও দেয় । দাদার মতো অহিংসক ভদ্রলোক নয় রমু ।

রত্ন বলল, 'আচ্ছা । আমি যাব তোর সঙ্গে । কিন্তু তার আগে ঠিকানাবদলের কথা জানানো দরকার । নইলে চিঠিপত্র খোয়া যাবে । ভীষণ জরুরি সব চিঠি ।'

রমু শাদাসিধে মানুষ । যা শোনে তাই বিশ্বাস করে । তলিয়ে দেখতে চায় না কেন জরুরি । কার চিঠি । রত্নও বলি বলি করে । বলতে ভরসা পায় না । রমুর পেটে কথা থাকে না । সাত কান ঘুরে বাবার কানে পৌঁছবে ।

এত পরে এলো গৌরীর আরো একখানি চিঠি । জ্যোতিদা ও কাননের সঙ্গে ওর আবার দেখা হয়েছে । ওরা কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে গল্প করেছে । গৌরী লিখেছিল —

জ্যোতির পছন্দ হয়েছে । সে তোমাকে দেখে এসে কী বলেছে, শুনবে ? বলেছে, তুই জহুরী । রত্ন চিনিস । তা শুনে আমি তাকে কী বললুম, জান ? বললুম, জহুরীর ওই একটিমাত্র জহরৎ । আর সব আমি বিলিয়ে দিয়েছি ও দেব ।

ওটিও যদি হারাই তবে আমি বাঁচব না। মুক্তি নিয়ে আমি কী করব? আমি চাই মুক্তো। তার মানে রত্ন।

জ্যোতি ভাবছে। ও বলে আমি নাকি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি পুড়ে যাচ্ছি। পাঁচ বছর আগে যেমন ক্ষয়ে যাচ্ছিলুম তেমনি। এবার তো কেউ আমাকে ভাগলপুর থেকে এসে নিয়ে যাবে না। আমিও গায়ে পড়ে যাব না। তবে কি এই চুলোতেই দগ্ধ হয়ে মরব? জ্যোতি বলে, না। আমি বলি, তা হলে কী? সে বলে, তা হলে তুই আমার সঙ্গে চল। আমি বলি, তা কেমন করে হবে? যে যার, সে তার। আমি কি তোর? না তুই আমার?

ও বলে, তা নয়। রত্নর মনঃস্থির করতে সময় লাগবে। তত দিন তোর মোমবাতি পুড়তে থাকবে। এটা তো তাকে দেখতে হচ্ছে না। আমাকেই দেখতে হচ্ছে। এ কি চক্ষে দেখা যায়! আমি বলি, তা হলে তুই তাকে চক্ষে দেখে যেতে ডেকে নিয়ে আয়। আমি ডাকতে পারিনে। আমি পরের ঘরে থাকি।

ওগো তুমি যদি আমাকে স্বচক্ষে না দেখে কিছু স্থির করতে না পার তবে জ্যোতির সঙ্গে তার আশ্রমে এস। আমি দেখা দেব। আমার সিদ্ধান্ত আমি মনে মনে নিয়ে ফেলেছি। তোমাকে চোখে দেখার আবশ্যক নেই। কিন্তু আমাকে চোখে দেখা হয়তো বা আবশ্যক। তোমার সামনে বেরোতে আমার লজ্জা করবে। কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে আমার ভয় ভেঙে গেছে। তুমি এত মহৎ! আমার অতীতের পঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করবে না। পঙ্ক থেকে তুমি পঙ্কজকে তুলে নেবে।

কানন কী বলে, জান? বলে, তোমার সঙ্গে যেতে। আমিও তাই ভাবি। সেইটেই শোভন ও স্বাভাবিক। কিন্তু জ্যোতি বলে, তা নয়—রোমাণ্টিক। আমার সঙ্গে গেলে চেঞ্জে যাবার মতো লাগবে। আর রত্নর সঙ্গে গেলে ইলোপমেণ্টের মতো লাগবে। রত্নর সঙ্গে রোমান্স। আমার সঙ্গে নীরস গদ্য।

তোমাকে বোধ হয় লিখিনি যে তোমার আমার রোমান্স আমার প্রোপ্রাইটরের অবিদিত নয়। সুধাকে আমি দিব্যি দিয়ে বলেছিলুম কাউকে যেন না জানায়: বড় ননদ লাবুও আমার কাছে দিব্যি করেছিল কাউকে বলবে না। সাবু আমার ছোট ননদ চাপা মেয়ে। সে কি কখনো ফাঁস করতে পারে? প্রাণ গেলেও না। তা হলে কেমন করে কার কাছে উনি শুনতে পেলেন? হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, ইংরেজীতে দুটি বচন আছে। একটি তো, Distance lends enchantment to the view. আর একটি হচ্ছে, Familiarity breeds contempt. কোনটি কার প্রতি প্রযোজ্য? আমার ধাঁধা লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তার মানে? উনি রসিয়ে রসিয়ে বললেন, দূর থেকে ঘন ঘন চিঠি লিখলে আমিও হতে পারতুম পরম প্রেমিক সুপুরুষ। কাছে থেকে অত বেশী নজরে পড়লে তিনিও হতেন বিষম বিতৃষ্ণার পাত্র।

আমি সেদিন চুপ করে সহ্য করে গেলুম। ভেবেছিলুম সেই শেষ। কিন্তু উনি আমাকে আরেক দিন বললেন, কত ছেলে আসে যায়। আমি কি কোনো

দিন নিষেধ করি ? তুমি ওঁকে আসতে বল না কেন ? আমার অমত নেই, জেনো। আমি ফোঁস করে উঠলুম, তোমার না হয় অমত নেই, তা বলে ওর কি আত্মসম্মান নেই ? ও কেন তোমাদের এখানে আসবে ? কোন সুবাদে আসবে ? উনি বললেন, কানন আসে কোন সুবাদে ? আমি কত খাতির করি। আমি বললুম, কানন আমার ভাই । সেই সুবাদে আসে । উনি বললেন, আহা! ওঁকেও তুমি ভাই বলে চালিয়ে দিতে পার । আমি কি ভাই ছাড়া আর কিছু বলে ইঙ্গিত করছি !

এসব কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে । কিন্তু কথায় কথা বাড়ে । তাই চুপ করে থাকি । তোমাকে নিয়ে প্রায়ই উনি আমাকে খোঁচান । তা বলে উনি যে এত দূর যাবেন তা আমি কল্পনাও করিনি । বোনদের বলেছেন আর একটি বৌদি হলে কেমন হয় ? ওরা তো প্রথমটা ঠাওরাতে পারেনি কার বিয়ে । উনি তা শুনে বলেছেন, এই ধর আমার বিয়ে । কেন, আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি ? বোনেরা গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা কী ঘেন্নার কথা ! যার অমন সুন্দরী বৌ, অমন গুণবতী বৌ, সে কেন আবার বিয়ে করতে যাবে ! উনি বলেন, আমার জন্যে তো নয় । আমার কী এমন গরজ ! তোদেরি বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না । শেষে দত্তক নিতে হবে । বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন । বোনেরাও কেঁদে আমার ঘরে হানা দিল । আমি তো হতভম্ব ।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে আর একটি নিরীহ স্ত্রী শিশুকে ছাগশিশুর মতো বিয়ের হাড়িকাঠে পুরে বলিদান করা হবে । এসব আইন করে বন্ধ করে দেয় না কেউ ? ইংরেজ কি ঘুমচ্ছে । কই, বিপ্লবীদের বেলা তো তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখিনে । ওই যে সুধা ওরই সঙ্গে ওঁর জোর করে বিয়ে দেওয়া উচিত । তা হলে আমার আর কোনো আফসোস থাকে না । বেচারা সুধার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয় । নতুন বৌরানী এলে ওকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবে । আমি তো এক পা তুলে বসে আছি । আমার কী ! আমার যেতে কতক্ষণ লাগবে ? জ্যোতি তৈরি । তবে আমি ওর সঙ্গে যেতে নারাজ । ওর সঙ্গে গেছি বলে তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তা হলে যে আমি শ্যাম ও কুল দুই হারাব । আমি বলি, যার ধন সে-ই বুঝে নিক । ও তো বলছে না যে নেবে না ।

জ্যোতি ভাবছে । সে তোমার ওখানে যাচ্ছে সামনের সপ্তাহে । তুমি তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করবে ও সে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করবে তা জানতে পেলে আমিও আমার মন স্থির করব । সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে । কিন্তু জ্যোতির সঙ্গে চেঞ্জ না তোমার সঙ্গে ইলোপমেন্ট না একা একা মেনকালয় না নদীর জলে আত্মহত্যা চারটের একটা স্থির করা বাকী । সব নির্ভর করছে তোমার উপর । কান্ত আমার, তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার ! ওই যে জ্যোতি, সেও একদিন পর হয়ে যাবে । যেদিন তার আপন জনের সাক্ষাৎ পাবে । আমি তো তাকে বরণমালা দিইনি ও দেব না । সে আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু আমি তো তাকে ভালোবাসিনে । আমরা পরস্পরের আত্মার

আত্মীয় । বন্ধুর অধিক । কিন্তু যুগল নই। কোনো দিন হব না । তা হলে কেন তার সঙ্গে যাই ? অবশ্য তোমার অনুমতি পেলে তার সঙ্গেই যেতে হবে । পরে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে তো ? কান্তার ভার নেবে তো ? প্রেম, তুমি কি সাড়া দেবে ?

চিঠি পড়তে পড়তে রত্নর মন চলে গেছল ছেলেবেলায় । শীতকাল । রাত দুপুর । রব উঠল—আগুন ! আগুন ! লেপ কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খালি গায়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে সে ও তার ভাইবোন পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল । খোঁজ নিয়ে জানা গেল মা বেঁচে আছেন, কিন্তু বাবাকে নিয়ে সমস্যা । তিনি আগে গোরুবাছুরকে বাঁচাবেন, তার পর আপনাকে বাঁচাবেন । গোয়ালঘরে ঢোকে কার সাধ্য ! দাউ দাউ করে চাল জ্বলছে । খুঁটি জ্বলছে । বেড়া জ্বলছে । চার দিকে ধোঁয়া । কয়েকটি গোরুর বাঁধন তিনি কেটে দিলেন । কয়েকটির বাঁধন আপনি পুড়ে গেল । কয়েকটি উন্মত্ত হয়ে নিজেদের বাঁধন নিজেরাই ছিঁড়ল । কিন্তু কয়েকটি কোনো মতেই উদ্ধার করা গেল না । পরের দিন দেখা গেল মুক্ত আকাশের তলে দু'তিনটি ছায়ামূর্তি শুয়ে আছে । গোরুর মতো দেখতে, কিন্তু গোরু নয়, গোরুর ছাই । তাদের মধ্যে ছিল সোনা গাই । রত্নর প্রিয় গাই ।

এই যে গোরী এও কি সেই সোনা গাইয়ের মতো পুড়ে যাবে ? কোনো মতেই একে বাঁচানো যাবে না ? রত্নর কতটুকুই বা সাধ্য ! যদি কেউ পারে তো জ্যোতিদাই পারবে । কিন্তু সেও পারবে কি ? না গোরী উন্মত্ত হয়ে নিজেই নিজের বাঁধন ছিঁড়ে পালাবে ? তখন সে আর সোনা নয় । সোনালী । তখন সে তার কারাগারিকদের নাগালের বাইরে । তার মুক্তিদাতাদেরও নাগালের বাইরে। তার সাত ভাই চম্পারও নাগালের অতীত। তখন তাকে সেই মেনকালয় থেকে উদ্ধার করতে যত মহৎ প্রাণ ও যত প্রবল প্রেম লাগবে তত কি তাদের আছে ? না । জ্যোতিরও নেই । রত্নরও নেই । এই তাদের শেষ সুযোগ । পরিস্থিতি এখনো তাদের আয়ত্তের মধ্যে । গোরীকে বাঁচাতে হলে এখন কিংবা কখনো নয় ।

রত্নর মন আবার ফিরে গেল ছেলেবেলায় । তার মায়ের মরণাপন্ন অসুখ । বাড়ীতে এমন একজনও নেই যে তাঁকে ওষুধ খাওয়াবে, বেডপ্যান দেবে, শুইয়ে রাখবে । পারতেন শুধু বাবা । কিন্তু তাঁর আপিস পরিদর্শন করতে আসছেন স্বয়ং কমিশনার সাহেব । তিন বছর পরে শুভাগমন । পথে ঘাটে তোরণ রচনা হচ্ছে । বাবা ছুটি চেয়ে পেলেন না । অগত্যা ইস্তফা দিয়ে বসলেন । তাঁর আপিসের বাবুরা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, করেন কী, দাদা ! বৌ মরে গেলে বৌ হবে, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে চাকরি ! তিনি উত্তর দিলেন, বুঝি সব । কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কর্তব্য মানুষটাকে বাঁচানো । বৌ বলে নয় । কৃষ্ণের জীব বলে । অতগুলো লোকের সামনে তিনি বলতে পারলেন না যে কৃষ্ণের জীব নয়, কৃষ্ণপ্রেয়সী । মাকে বাঁচানো গেল না। বড় বেশী দেরি হয়ে গেছল । কর্তাদের কথায় পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা হলো । সেই ছুটি মঞ্জুর হলো । কিন্তু হারামণি ফিরে এলো না ।

রত্ন ভাবছিল যেমন করে হোক বাবার কানে পৌঁছে দিতে হবে যে তাঁর ছেলেও একটি মানুষকে বাঁচাতে চায় । কৃষ্ণের জীব নয়, কৃষ্ণপ্রেয়সী । সমাজের চোখে স্ত্রী নয় বলে কি কেউ নয় ? মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি সমাজ সব সময় বোঝে ? সমাজ তো বাবাকে বলেছিল বৌকে মরতে দিয়ে আপিসে পড়ে থাকতে । তিনি যেমন তাঁর মানবিক কর্তব্য করাই স্থির করলেন তাঁর ছেলেও কি তেমনি তার মানবিক কর্তব্য করা স্থির করতে পারে না ? সমাজ সাজা দেবে । দেয় দেবে । কিন্তু বাবা কেন মারা যাবেন ?

গোরীর চিঠিখানি বার বার পড়ে রত্নর মনে হলো ওর অর্থ আরো গভীর । গোরী চায় রত্নর কাছে বিশেষ একটি প্রতিশ্রুতি । সেইটি না পেলে সে রত্নর সঙ্গে যাবে না, জ্যোতির সঙ্গে যাবে না, কারো সঙ্গে যাবে না, গেলে একা যাবে মেনকালয়ে বা যমালয়ে। তাকে উদ্ধার করতে যাওয়া নিরর্থক । তার আগে তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে । সে প্রতিশ্রুতি আর কেউ দিলে হবে না । দেবে রত্ন । যাকে সে বরণ করেছে । রত্ন কি দেবে তার মনের মতো প্রতিশ্রুতি ? দিলে পারবে প্রতিশ্রুতি রাখতে ? পরে যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তা হলে একটি কুলত্যাগিনী নারীর অপমৃত্যুর দায়িক হবে । অথবা তার নৈতিক অধঃপাতের । প্রতিশ্রুতি দিয়ে না রাখার চেয়ে না দেওয়াই ভালো । তা হলে যদি কিছু ঘটে রত্ন তার দায়িক নয় ।

দায়িক নয় । তাই কি ? রত্ন হৃদয় অন্বেষণ করে । যে ভালোবাসে তার দায়িত্বের কি সীমা আছে ! যে বিয়ে করে তার দায়িত্ব বরং সসীম । প্রেমিক বলে যে পরিচয় দেয় আর স্বামী বলে যে পরিচিত তাদের একজনের দায়িত্ব কিছু দূর গিয়ে ফুরিয়ে যায়, আরেক জনের দায়িত্ব অফুরন্ত । তাই যদি না হবে তবে জ্যোতি কেন নিজের বাপমাকে অমান্য করে রাজনৈতিক জীবনে জলাঞ্জলি দিয়ে ফৌজদার পরিবারের ফৌজদারির ঝুঁকি মাথায় করে গোরীকে কোথাও নিয়ে যেতে চায় ? জ্যোতির প্রেম তার দায়িত্ব নির্দেশ করছে । তেমনি রত্নর প্রেম করবে তারও দায়িত্ব নির্দেশ । জ্যোতির প্রেম প্রত্যাখ্যাত না হলে জ্যোতি গোরীকে বিয়ে করত, ঘর দিত। সেটা অবশ্য সাঙ্গা মতে। রত্নর প্রেম প্রত্যাখ্যাত নয়, প্রতিদত্ত । রত্ন কি গোরীকে বিয়ে করতে পারে না ? ঘর দিতে পারে না ? যে কোনো মতে ? ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে । ইচ্ছা আছে কি ?

'কি রে ! চিঠি লিখতে বসে কী এত ভাবছিস ?' হীরু সুধায় রত্নকে ।

'কে ? হীরু ? আয় । ভাবছি কী লিখি । কী লিখলে পরে পিছু হটতে হবে না । জীবনমরণের প্রশ্ন । আমার মতো অসুখী কে !' রত্ন এলিয়ে পড়ে ।

'জীবনমরণের প্রশ্ন ! কার জীবনমরণের প্রশ্ন !' হীরুর কাছে ওটা একটা হেঁয়ালি ।

'থাক । লিখব না । চল, আমরা নৌকায় করে বেড়িয়ে আসি । গোরাই ব্রিজ অবধি । কত কাল দেখিনি । চল, পিকনিক করা যাক । কে কে যাবে লিস্টি কর ।'

বাল্যবন্ধুর সঙ্গে হৈ হৈ করে রত্ন ভুলে রইল গোরীর জন্যে তার উৎকণ্ঠা, বাবার জন্যে আশঙ্কা, নিজের স্বাধীনতার জন্যে ভাবনা । ভুলে রইল প্রথম দর্শনের প্রস্তুতি, প্রেমের ভাষা সৃষ্টি, প্রার্থনার ভাষা নির্ণয়, কাম্যাকাম্য বিনিশ্চয় । পরের দিন ভোরে উঠে

তার হালকা বোধ হলো। গোরীকে চিঠি লিখতে গিয়ে লিখল—

ওগো প্রেম, আমার মনঃস্থির করা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এই তো সেদিন স্থির করলুম তোমাকে আমি সোনালী হতে দেব না। এবার স্থির হলো তোমাকে আমি মরতে দেব না। এর জন্যে যদি ইলোপ করতে হয় তাও করব। কিন্তু তার চেয়ে ভালো হয় জ্যোতিদার কথা যদি তুমি শোন। তার সঙ্গে যাওয়া অবশ্য আমার সঙ্গে যাওয়ার মতো রোমান্টিক হবে না। কিন্তু রোমান্সের সহায়ক হবে। আমার সঙ্গে গেলে পরে তুমি কি আবেদন করতে পারবে যে যশোবাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হোক ! জ্যোতিদার সঙ্গে গেলে তা পারবে। বিবাহ থেকে মুক্তি না পেলে বিবাহ পুনরায় হয় না। মেয়েদের বেলা এই কানুন। বিয়ে যদি আবার করতে চাও তবে জ্যোতিদার সঙ্গেই যাও।

আর বিয়ে যে আমাকেই করতে হবে এটা এখন থেকে ধরে নেওয়া কেন ? বিপুলা এ পৃথ্বী। বিশাল কর্মক্ষেত্রে এসে কত ছেলের সঙ্গে তোমার ভাব হবে। দেশ থেকে দেশান্তরে যাবে। কত অজানার সঙ্গে আলাপ হবে। কে যে তোমার পুরুষোত্তম তা কি তুমি ঘরে বসে জানতে পেরেছ না পারবে? বাইরে আসার পর জানবে। তখন আমাকে তোমার পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি তার সঙ্গে হারব। সে-ই তোমাকে জিতে নেবে। তা হলে কেন আমাকে বিয়ে করে নিজের হাত পা বেঁধে রাখবে, প্রেম ? এখন তোমার মনে হচ্ছে আমার মতো আর কেউ হয় না। কিন্তু তখন তোমার মনে হবে আমি তামসী নিশির চন্দ্র, সে উজ্জ্বল দিনের সূর্য। আমি বন্দিনী নারীর ধ্যান। সে মুক্ত নারীর মানস।

তুমি জ্যোতিদার সঙ্গে গেলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব বই-কি। এ প্রতিশ্রুতি রইল। আর রইল অঙ্গীকার। তুমি আমাকে যে-ভাবে চাইবে সে-ভাবে পাবে। কান্তভাবে চাইলে কান্তভাবে। পতিভাবে চাইলে পতিভাবে। যত কাল চাইবে তত কাল পাবে। এক বছর চাইলে এক বছর। দশ বছর চাইলে দশ বছর। এক জীবন চাইলে এক জীবন। জন্ম জন্মান্তর চাইলে জন্ম জন্মান্তর। তুমি আমাকে ছেড়ে না দিলে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেব না। ললিত সেদিন বলছিল যে তুমি আমার ভাগ্যদেবী। সেদিন বুঝিনি। আজ বুঝেছি। তোমার সঙ্গে প্রেম আমার ভাগ্যদেবীর সঙ্গে নিযুক্তি। আমার appointment with Destiny.

পনেরো

জ্যোতি পোড়াদায় নেমে ট্রেন বদল করবে এমন সময় রত্ন গিয়ে তার হাতে হাত মিলিয়ে বলল, 'এবার ট্রেন বদল নয়, দিক বদল করতে হবে। যেতে হবে পশ্চিমে। গোরুর

গাড়ী করে । আমার ছোট ভাই রমুর চাষগাঁয় ।'

গোরুর গাড়ী হাজির ছিল । রমুর পাঠানো। জ্যোতি কিন্তু গাড়ীতে চড়তে রাজী হলো না । বলল, 'তুমি উঠে বস । আমি পায়ে হাঁটব ।'

রত্ন বলল, 'সাত মাইল আমার কাছে কিছু নয় । আমিও হাঁটব ।'

দু'জনেই তার পর মৌন । পাশাপাশি চলতে চলতে কত কথা বলতে ইচ্ছা করছিল রত্নর । কত কথা জানতে ইচ্ছা করছিল । কিন্তু যার সম্বন্ধে কথা তার নাম কিছুতেই মুখে আসছিল না । তার যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ সে গোরীর নাম করবে না, যদি না জ্যোতিদা অগ্রণী হয় । ওদিকে জ্যোতিরও লেশমাত্র উদ্যোগ নেই। সে যেন চেনেই না গোরী কে ।

রত্ন জানত যে জোতি জানত রত্ন গোরীকে ভালোবাসে । সেইজন্যে জ্যোতির দিকে মুখ তুলে তাকাতেও তার লজ্জা করছিল । সে শরমে নতমুখ । আর জ্যোতি জানত যে রত্ন জানত জ্যোতি গোরীকে এখনো ভালোবাসে । সেইজন্যে রত্নর চোখে চোখ রাখতেও তার সঙ্কোচ । সে সঙ্কোচে তির্যকদৃষ্টি ।

জ্যোতি একসঙ্গে দুই কাজ করে না । যখন হাঁটে তখন কথা বলে না। যখন কথা বলে তখন হাঁটে না । একটু জিরিয়ে নেয় । গোরুর গাড়ী পিছনে পড়ে আছে আর তাতেই আছে তার নতুন চরকা । যেবাওদা চরকা । মহাত্মা গান্ধীব পরিকল্পিত । ছোটি একটা কাঠের সুটকেসের মতো বযে বেড়ানোর উপযোগী । তাই তার মন পড়ে আছে পিছনে ।

'আপনি কি সুতো না কেটে জলস্পর্শ করেন না ? আমার ফ্লাস্কে চা আছে । খাবেন ?' রত্ন অফার করল তার অতিথিকে ।

'চা-তে আমার না নেই । কিন্তু আপনি-তে আমার আপত্তি । আমি যাকে যা বলি সে আমাকে তাই বললে আমি খুশি হই । তুমি বলবে তুমি ।'

'আচ্ছা, জ্যোতিদা ।' রত্ন চা দিল ।

'দা কেন ? কাটবে নাকি ? কই, ইংরেজ আমেরিকানরা তো বড় ভাইকে জন কিংবা জ্যাক বলে ডাকতে কুণ্ঠিত হয না ?' জ্যোতি চায়ে চুমুক দিল ।

'ওইটি পারব না । বড় ভাইকে তুমি বলা চলে, কিন্তু শুধু নাম ধরে ডাকতে বাধে । আমরা তো ইংরেজ বা আমেরিকান নই ।' রত্ন ফ্লাস্ক উপুড় করে মুখে ঢালতে গেল ।

চরকার সূত্র ধরে জ্যোতিদার সঙ্গে বাক্যালাপ অনেক দূর গড়াল । কোনো এক সময় গোরুর গাড়ীব চাকাও গড়িয়ে গেল । ওদের হোঁশ ছিল না ।

জ্যোতি বলল, 'আমিও কি বুঝিনে যে দেশের লোকের বস্ত্রাভাব চরকা দিয়ে মেটবার নয় ! ও দেশেও চরকা ছিল । তা দিয়ে বস্ত্রের অনটন ঘুচল না বলেই না স্পিনিং জেনী উদভাবন করতে হলো । আমাদেরও তেমনি অনেক কিছু উদ্‌ভাবন করতে হবে। কিন্তু আমরা যে গান্ধীজীর সঙ্গে চবকা কাটতে বসে গেছি এর অন্য তাৎপর্য । রুশদেশে র রাজনীতিকরা আশা করেছিলেন জারের হাত থেকে যখন ক্ষমতা চলে যাবে তখন তা মধ্যশ্রেণীর হাতে পড়বে । কিন্তু তা পড়ল গিয়ে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকশ্রেণীর হাতে । ওদের নিশানে কাস্তে হাতুড়ি আঁকা । তেমনি ইংরেজের হাত থেকে যখন ক্ষমতা খসে পড়বে

তখন তা আমাদের মধ্যশ্রেণীর বাবুভায়াদের হাতে পড়বে না । পড়বে চাষীমজুরের হাতে । তাদের নিশানে চরকা আঁকা । আমরা গান্ধীপন্থীরা তাদেরি লোক । তাদেরি স্বার্থ আমাদের লক্ষ্য । তাদের মধ্যে যারা দীনতম আর হীনতম আমরা তাদেরি স্বার্থ রক্ষা করি, পাহারা দিই । সেই সঙ্গে আমরা জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকি । সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের । শ্রেণীদ্বন্দ্ব আমাদের সাজে না ।'

ওরা সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আবার পায়ে হেঁটে চলল । আবার চুপচাপ । পীরপুরে পৌঁছলে পরে রমু ওদের দু'জনকে দুটো আলাদা কুঁড়েঘর দিতে চেয়েছিল । ওরা একটাই নিল । রত্ন একটা তক্তাপোশে গা মেলে দিল । জ্যোতি তখনো অক্লান্ত । সে গেল রমুর সঙ্গে তার ক্ষেত খামার পুকুর বাগান পরিদর্শন করতে ।

'রমুর আইডিয়া আছে ।' জ্যোতিদা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু চাষকে ও অর্থকরী করতে চায় । সেইজন্যে পাটচাষকে আখচাষের চেয়ে, আখচাষকে ধানচাষের চেয়ে মূল্যবান মনে করে। অর্থই যদি পরমার্থ হয় তবে চাষ করতে যাব কেন ? ব্যবসা কেন করব না? বল, রমু, বল ।'

রমু এ ধাঁধার জবাব চট করে খুঁজে পেল না । রত্নর দিকে তাকাল । রত্নও নিরুত্তর । তখন জ্যোতি নিজেই উত্তর দিল ।'না, অর্থ এখানে মুখ্য নয় । আমরা ভালোবাসি মাটিকে, ভালোবাসি মাটির সঙ্গে যাদের দিনরাত কারবার সেই সব মানুষকে ও মানুষের সুখদুঃখের সাথী গোরুমোষকে । ভালো কথা, রমু, তোমার জমিতে গোরুমোষের জন্যে ফডার দেখলুম না । যাকে রাখ সে-ই রাখে ।'

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা পরিপাটী হয়েছিল, কিন্তু জ্যোতি অত কিছু খায় না । ও খায় কাঁচা তরকারি, সিদ্ধ গম, চীনা বাদাম ও ফলমূল । আমিষের মধ্যে ডিম । কিন্তু সেটা ওর মতে আমিষ নয় ।

রত্নর বড় আশা ছিল জ্যোতিদা আপনা হতে গোরীর কথা বলবে। কিন্তু সে রাত্রে তাকে যথেষ্ট বকবক করিয়েও তার মুখ দিয়ে গোরীর নাম বার করতে পারল না । তার সঙ্গে ছিল ফ্রয়েডের 'স্বপ্নব্যাখ্যা' ও ফ্রেজারের 'স্বর্ণশাখা' । চরকা কাটে বলে সে আধুনিক চিন্তার সঙ্গে সম্পর্ক কাটায়নি । যেখানেই যায় সঙ্গে থাকে হালফিল বিলিতী কেতাব। রত্নর আগ্রহ দেখে কথাবার্তার মোড় সেই দিকেই ঘুরিয়ে দিল ।

পরের দিন সকালে রত্ন সাইকেলে করে ডাকঘর থেকে গোরীর চিঠি নিয়ে এলো। তা দেখে জ্যোতি রহস্য করল ।'তোমরা দেখছি চিঠি লিখে লিখেই জীবনটা ক্ষয় করে দেবে । কোনো দিন জলে নামবে না, সাঁতার কাটবে না, ডুবে মরবে না । শৌখীন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ।'

রত্ন রঙীন হয়ে বলল, 'সিদ্ধান্তটা আমার হাতে নয়, ওর হাতে ।'

জ্যোতি হাসিমুখে বলল, 'সেও ঠিক এই কথাই বলে । সিদ্ধান্তটা আমার হাতে নয় ওর হাতে। সিদ্ধান্তটা কী ? নদীতে স্রোত আছে । ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । তাই নদীর ধারে বসে থাকব অনন্তকাল । যতদিন না নদী শুকিয়ে যায় । কিংবা দয়া করে কেউ

পার করে দেয় । কেমন, এই ? না আর কিছু ?'

রত্ন লজ্জায় নিরুত্তর রইল । তখন জ্যোতি গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমরা যদি দু'জনেই হাত গুটিয়ে বসে থাক, কেউ কিছু না কর, তা হলে অগত্যা আমাকেই ইনিশিয়েটিভ নিতে হয় । নয়তো চোখের সামনে একটা ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে । আমি তো সাক্ষীগোপাল হতে পারিনে । সত্যাগ্রহীদের নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হওয়া শোভা পায় না ।'

তখনকার মতো এইপর্যন্ত । সন্ধ্যাবেলা আবার ও প্রসঙ্গ উঠল । রত্ন জানতে চাইল ট্র্যাজেডী বলতে এ ক্ষেত্রে কী বোঝায় ? ক্ষয়রোগে মৃত্যু ? না সোনালীর অনুসরণ ?

জ্যোতি বলল, 'তার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী কি নেই ? ভেবে দেখ ।'

রত্ন ভেবে বলল, 'আর কী হতে পারে ? আত্মহত্যা ?'

জ্যোতি বলবে কি বলবে না করতে করতে বলে ফেলল, 'আত্মসমর্পণ ।'

রত্নর বুকের স্পন্দন স্থির হয়ে এলো । কী সর্বনাশ! আত্মসমর্পণ ! না, না । অসম্ভব ! পাঁচ বছরের উপর সংগ্রাম করে এসে সতীনের ভয়ে আত্মসমর্পণ ! ছি, ছি ! অসম্ভব !

জ্যোতি বলল, 'ওর মতো অপূর্ব স্বাস্থ্য যার তার কেন ক্ষয়রোগ হয় ? কারণটা প্রধানত মানসিক ও নৈতিক । যদিও কায়িককে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না । ফ্রয়েড পড়েছ নিশ্চয় ? গ্রডেক পড়েছ ? পড়তে দেব । দেখবে এসব অসুখের মূল কত গভীরে ঢাকা থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে আবিষ্কার করতে হয় । অসুখ কথাটার অর্থ অ-সুখ । অ-সুখ থেকেই অসুখ।'

অ-সুখ থেকে অসুখ । কথাটা শুনতে যত সহজ বুঝতে তত নয় । রত্ন ভাবতে লাগল । জ্যোতি বলতে লাগল, 'বাপুজীও জানেন । কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা । সাবলিমেশন । কার্যত ওটা রিপ্রেসন । অবদমনেরও একটা সীমা আছে । সীমা ছাড়িয়ে গেলে সাজা আছে । প্রকৃতি সাজা দেয় । আত্মসমর্পণেরও কি কম সাজা ! দেখছি তো ঘরে ঘরে পরাজিত নারীদের । করুণ দৃশ্য ! ওরই মাঝখানে একটি অপরাজিত আত্মা কার না মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে !'

জ্যোতি তার স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল । গোরীর সঙ্গে ওর প্রথম দেখা সবরমতী থেকে ফিরে । মাস ছয়েক গান্ধীজীর কাছে শিক্ষানবীশীর পরে । তাতাদার বৌ । ওর গ্রামসম্পর্কে বৌদিদি । আলাপ জমতে বেশী দিন লাগল না । কিন্তু তাতে দুঃখ কেবল বাড়ল । মেয়েটি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল কুঁড়িতেই । কেউ বলবে না কেন । জ্যোতিরও সংসারজ্ঞান স্বল্প । গোরীর মামা এসে ওকে ভাগলপুর নিয়ে যান । তাতাদাও বিলেত যান । জ্যোতিও জেলে যায় । বছর খানেক পরে আবার গোরীর সঙ্গে দেখা । গোরী ফিরেছে । জ্যোতি ফিরেছে । তাতাদা ফেরেননি । কিন্তু এ কোন গোরী ! সারা অঙ্গে রংমশাল জ্বলছে । মরা গাঙে বান এসেছে। ডাক্তারকে সে ভুলতেও পারছিল না, ক্ষমা করতেও পারছিল না। ভিতরে বাইরে জ্বলছিল ।

তার পর ওর সাবলিমেশনের জন্যে ওকে গান্ধীজীর কাছে নিয়ে যায় জ্যোতি । বেশী দূরে নয় । সদরে । ভাবের আবেগে ও অলঙ্কার খুলে দেয় । চরকা কাটে । খদ্দর

পরে । অহিংসায় দীক্ষা নেয় । জ্যোতি ওকে ইংরেজী বই পড়ে অর্থ করে শোনায় । জ্যোতির ইঙ্গে বৌদি ওকে দেশবিদেশের নারীপ্রগতির বার্তা বলেন । মধ্যযুগ থেকে এ আধুনিক যুগে উপনীত হয় । ওই ভাবে ওর উপনয়ন হয় । ও মুক্তির স্বপ্ন দেখে । মুক্তির জন্যে অধীর হয় । শ্বশুরকে জিতিয়ে দেবার জন্যে নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ দেয় । তাতে ওর অধীনতা কমে । ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদীদের একজন হয় । জ্যোতি তার নিজের আশ্রম নিয়ে ব্যাপৃত । গোরীর উপর তার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে । তবু প্রায়ই দেখা হয় । গোরী তাকে বিশ্বাস করে দলের কথা না বললেও মনের কথা বলে । একদিন কাঁপতে কাঁপতে স্বীকার করে ও নাকি ওর পুরুষোত্তমের সন্ধান পেয়েছে। সেই অর্জুনের চিত্রাঙ্গদা হবে । জ্যোতি ওকে বুঝিয়ে বলে ও যাঁকে অর্জুন মনে করেছে তিনি অর্জুন নন তিনি ভীষ্ম । তখন সে প্রকৃতিস্থ হয় ।

কিন্তু খবরটা তাতাদার কানে ওদেশে পৌঁছয় । তিনি ব্যারিস্টারি পড়া অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে আসেন । এবাব তিনি সরাসরি নিজের ইচ্ছা খাটাতে যান না । সন্ধির ছল খোঁজেন । ইংরেজ সরকার যেমন গরম নীতি ছেড়ে নরম নীতির দিকে ঝুঁকেছে । দেশের দিক থেকে নরম নীতির চেয়ে গরম নীতি ভালো । তাতে মুক্তি ত্বরান্বিত হয় । তেমনি গোবীর দিক থেকেও । ওদের বিয়ে এমন ভাবে ভেঙে গেছল যে আর জোড়া লাগল না । বাইরে একটা ঠাট বজায় রইল । ভিতরে ভিতরে কেউ কারো স্বামী স্ত্রী নয় । গোরী স্বীকার করে না যে তাতাদা ওর স্বামী । তাতাদাও অস্বীকার করতে পারেন না যে সুধাদির কাছে তিনি অনার বাউণ্ড । সুধাদি আপনা হতে ছেড়ে না গেলে তিনি ওঁকে ছাড়বেন না । সুধার কাছ থেকে স্বামী ভিক্ষা করতে গোরীরও আত্মসম্মানে বাধে । তা ছাড়া আরো কিছু ছিল, সেটা সুধাদি না থাকলেও থাকত, সুধাদি ছেড়ে গেলেও থাকবে। রিপালসন ।

মিটমাটেব জন্যে বহু লোক চেষ্টা করেছেন, জ্যোতিও মধ্যস্থ হয়েছে। দু'জনেই তার প্রিয় । তাতাদা লোক খাবাপ নন । কিন্তু তাঁর সংস্কার হলো সামন্তযুগের সংস্কার । আধুনিক যুগের নারীকে তিনি বল দিয়ে আয়ত্ত কববেন । না পারলে ছল দিয়ে আয়ত্ত করবেন । না পারলে কৌশল দিয়ে আয়ত্ত করবেন । কিন্তু আয়ত্ত তিনি করবেনই । তিনি যে প্রভু । প্রভুত্বের মোহ তাঁর গেল না । যদি বা যেত, তাঁর গুরুজন ও বয়স্যজন মিলে তাঁকে দু'বেলা ভজায়, তুমি কি পুরুষ না তুমি কাপুরুষ । যার লাঠি তার মাটি । যার বেত্র তার ক্ষেত্র । তাতাদার লক্ষ্য ঠিক থাকল । কিন্তু লক্ষ্যভেদের উপায় বদলাতে লাগল । বল থেকে ছল । ছল থেকে কৌশল । অপর পক্ষে গোরীরও লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল । যে ওর স্বামী নয় তার সঙ্গে ও থাকবে না । ও চায় মুক্তি । মুক্তিলাভের উপায় নিয়ে এক এক বন্ধুর কাছে এক এক রকম পরামর্শ পায । কিন্তু কোনোটাই ওর মনঃপূত হয় না । কারণ মনে মনে ও চায় প্রেমের মধ্যে মুক্তি । তার জন্যে চাই একটি প্রেমিক । যার সঙ্গে ও ইলোপ করবে । ওর ধারণা ও কুমারী মেয়ে, ওর বিয়েটা বিয়েই নয়, সুতরাং ইলোপমেন্টই যথেষ্ট । আইন কানুন ওর জন্যে নয় । ও নিজেই ওর আইন, ও নিজেই ওর কানুন ।

সব দিক ভেবে জ্যোতিই প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটা সাঙ্গার। গৌরী যদি স্বামীর ভাত না খায়, যদি কাপালি মেয়েদের নিয়ে আশ্রম চালায়, খেটে খায়, তা হলে ধীরে ধীরে জ্যোতির মতো শ্রেণীচ্যুত হয়ে জ্যোতির সঙ্গে সাঙ্গা বসবে। প্রস্তাবটা ও মেয়ে এক কথায় নাকচ করে। একমিনিটও ভাবে না। ওর চোখে জ্যোতি একটি এন্‌জেল। এন্‌জেলরা পুরুষ নয়। এমন মিষ্টি জুতো!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জ্যোতি আবার মুখ খুলল। বলল, 'গৌরীর সঙ্গে রোজ দেখা হয়, কিন্তু ও আমার কাছেও গোপন করে ওর মণ্ডলীর কার্যকলাপ। ও নাকি মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছে। তাতাদার আশঙ্কা ওরা খুব শীগগির ধরা পড়বে ও জেলে যাবে। ফৌজদার বংশের বৌরানী হরিণবাড়ী জেলের জেনানা ফাটকে! দৃশ্যটা রোমহর্ষক! গৌরী তাঁকে চালমাৎ করেছে। তিনি বিমর্ষ। এমন সময় এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। রত্ন বলে একটি ছেলেকে চিঠি লিখে ও তার চিঠি পেয়ে গৌরীর সাধ গেল জেলের বাইরে থাকতে। রত্নকে দেখতে।'

রত্ন চমকে উঠে বলল, 'তাই নাকি!'

জ্যোতি সকৌতুকে বলল, 'হাঁ, ভাই। তুমি তো আসবে না। তখন তোমাকে আনার জন্যে ললিতকে জেল থেকে টানা হলো বিবাহবেদীতে। গৌরীর ধারণা ছিল কান টানলে যেমন মাথা আসে ললিতকে টানলে তেমনি রত্ন। তা তুমি তো বরযাত্রী হলে না। তাতে গৌরীর যা নৈরাশ্য! বেচারি জেলে যাবে বলে আমাকে ধরে বসল। ওর দলবল তখন ছত্রভঙ্গ। কেউ জেলে, কেউ মাটির তলায়। একা একা তো জেলে যাওয়া যায় না। যেতে হলে সদলবলে যেতে হয়। এবার গান্ধীর চালনায়। কিন্তু বেলগাঁও কংগ্রেসে গণসত্যাগ্রহের কথা উঠল না। গান্ধীজী সবাইকে অবাক করে দিলেন। গৌরী তখন করে কী! বিষণ্ন চিত্তে গৃহদেবতার শরণ নেয়। মাধবের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। বাস্তবিক, ধর্ম না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যেত। আমি ধর্ম মানিনে, কিন্তু ধর্মের প্রয়োজন মানি।'

রত্নর কাছে এসব কথা নতুন নয়। তবু গল্পের নেশায় বলল, 'তার পর?'

'তারপর আবার এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। রত্ন সাড়া দিল। গৌরীর মনে হলো রত্নর রূপ ধরে মাধব সাড়া দিলেন। প্রেমের উত্তরে প্রেম পেয়ে ওর পা পড়ে না ভুঁয়ে। ও সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করে। আকাশে ওড়ে। ও যেন একটি পরী। ওকে দেখে আমারও চোখে পলক পড়ে না। কোথায় গেল সেই রংমশাল! তার বদলে এলো রসনির্ঝর। ভাবাকুলা অনুরাগিণী। দিনে দশ বার করে ডেকে পাঠায় বা আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়। বলে, তোর কী মনে হয়? ও কি দেখে পছন্দ করবে? না ওর মোহ ছুটে যাবে? ক্ষণিক মোহ। আমি বলি, রূপজ মোহ তো নয়। মন জানাজানি। মন দেওয়ানেওয়া। পাকা রং। ও বলে, তোর কী মত? আমি বলি, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের আমি দেখতে পারিনে। ওদের চলন বাঁকা। ওদের গায়ে রক্ত নেই। রক্তস্রোতের বদলে বয় বরফের স্রোত। ওদের মাথাও কি ওদের আপনার! বড়লোকদের পায়ে বাঁধা। ওদের আবিষ্কার সত্য নয়। ওদের সৃষ্টি সুন্দর নয়। ওদের কর্ম কল্যাণকর নয়। রত্ন কি ব্যতিক্রম?

বিশ্বাস তো হয় না ।'

প্রসঙ্গটা ক্রমে তার নিজের দিকে এগিয়ে আসছিল, তাই রত্ন বিব্রত বোধ করছিল । জ্যোতি তা আন্দাজ করে বলল, 'কিন্তু পরে বিশ্বাস হলো । তখন গৌরীকে ও তোমাকে আমি মন থেকে আশীর্বাদ করি । তোমাকেই বেশী, কেননা তুমি আমারি বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমাকে ছুটি দিচ্ছ । ও মেয়েকে ভালোবাসে আরো অনেকে, কিন্তু তাদের ভালোবাসা মধ্যবিত্তের ভালোবাসা । গৌরী বলে, প্রেম নয়, শেম । মধ্যবিত্তরা আবার ভালোবাসতে শিখল কবে ! রত্ন, তোমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে আমি মনে মনে খুব আরাম পাচ্ছি, ভাই । কিন্তু শোন যা বলছিলুম ।'

রত্ন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল । জ্যোতি বলতে লাগল, 'গৌরীটার যদি বুদ্ধিসুদ্ধি বলে কিছু থাকত ! তোমার কথা ও চুপি চুপি কেবল মেয়েকেই যে বলেছে ! চুপি চুপি বললে চাপা থাকে, এই ওর ধারণা । কিন্তু খবরটা চাপা রইল না । তাতাদা প্যাঁচোয়া লোক। ধরে বসলেন, শ্রীমানকে নিমন্ত্রণ কর ।'

'শ্রীমান কে ?' রত্ন কৌতূহলী হলো ।

'বুঝতে পারলে না ? শ্রীমতী থেকে শ্রীমান । গৌরী তো আহ্লাদে আটখানা । আহা ! উনি এত ভালো ! আমি বললুম, গৌরী, সাবধান ! প্যাঁচ আছে । তখন ও সাবধান হলো । আমার শুভবুদ্ধির উপর ওর অসাধারণ আস্থা । এর পর তাতাদা একটার পর একটা প্যাঁচ দেন আর আমি সে প্যাঁচ কাটাই । ঘোড়ায় চড়া । শিকার । সদরে গিয়ে ঘরকন্না । প্রত্যেক বারেই গৌরী আনন্দে উদ্বাহু হয় । আমি বলি, সাবধান ! তখন ও সাবধান হয় । নইলে এতদিনে আত্মসমর্পণ হয়ে যেত । কৌশলের কাছে পরাজয় ।'

রত্ন মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'এই শেষ ?'

'না, এই শেষ নয় । তার পর তাতাদার হাতে একটিমাত্র চাল বাকী রইল । বলতে পার একটিমাত্র বাণ । তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র । তিনি আভাস দিলেন যে গৌরীকে নিয়ে আর ঘর করা চলবে না । তিনি আবার বিয়ে করবেন । কেন যে এটা গৌরীর মাথায় এত দিন আসেনি বোঝা কঠিন । ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল । স্বামী বলে যাকে স্বীকার করিসনে সে যদি অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে তোর তাতে কী ? সে কাকে বিয়ে করবে না করবে তুই বলবার কে ? তোর কি তা হলে পিছুটান আছে ? তুই থাকতে চাস? সন্ধি করতে চাস ? বুঝতে কি পারিসনে এটাও একটা প্যাঁচ ? উদ্দেশ্যটা আর একটি বিয়ে করা নয় । ভয় দেখিয়ে লক্ষ্যভেদ করা । বলি এসব কথা গৌরীকে তবু ওর ভয় ভাঙে না । এটা যেন মনের ভয় নয় । অবচেতনের ভয় । কিংবা সংস্কারের ভয় । কিংবা ইনস্টিংক্টের ভয় । যুক্তি এখানে ব্যর্থ ।'

রত্ন বিমূঢ় হয়ে বলল, 'তা হলে কী উপায় !'

জ্যোতিও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কে জানে ! ও মেয়ে এক এক দিন এক এক রকম কথা বলে। ইলোপমেন্ট । হাওয়া বদল । গঙ্গায় ঝাঁপ ! মেনকালয় । তবে আর বিপ্লবের বুলি আওড়ায় না। ইংরেজকে ও ভুলে গেছে । ও নিজে বাঁচবে কি না জানিনে, কিন্তু

ইংরেজ ওর হাত থেকে বাঁচবে ।'

অতি দুঃখেও মানুষের হাসি পায় । রত্ন হাসল । কিন্তু কী বলবে ভেবে পেলো না । সেদিনকার মতো সেইখানেই সে প্রসঙ্গের ইতি ।

পরের দিন আবার সন্ধ্যাবেলা সেইখান থেকে জের টানা হলো । জ্যোতি বলল; 'ওর উপর ছেড়ে দিলে ও হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই নেবে না । তিলে তিলে দগ্ধ হবে ।'

রত্ন বলল কাতর স্বরে, 'ও যদি তিলে তিলে দগ্ধ হয় আমি কি তা সইতে পারব ! আমার কি লাগে না ! কিন্তু কোথায় আমি সুযোগ পাচ্ছি যে আমার সত্যবানকে আমি সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব !'

জ্যোতি বলল, 'সুযোগ যদি পেতে চাও, পাবে বই-কি । সুযোগকেও ছিনিয়ে নিতে হয় । লেনিন যা করেছিলেন । রত্ন, মনে রেখো, মরণের চেয়েও অসহন আত্মসমর্পণ । আত্মার পরাজয় । গৌরী যদি আত্মসমর্পণ করে, আত্মায় পরাজিত হয়, তা হলে ওর সর্বনাশ হয়ে গেল । ও বেঁচে থাকলেও মহত্ত্ব হারাল । মহিমা হারাল । ও তখন অসাধারণ মেয়ে নয় । অতি সাধারণ মেয়ে । তেমন মেয়ের প্রতি আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকবে না । তোমারও কি থাকবে ?'

রত্ন নিরুত্তর । জ্যোতি বলে চলল, 'ওর মধ্যে আমি সহস্র সম্ভাবনা দেখি । ও-ই আমার ভারতবর্ষ । গোরা যেমন বলেছিল আনন্দময়ীকে আমিও তেমনি বলে থাকি গৌরীকে—তুমিই আমার ভারতবর্ষ । আমার ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ করবে ! আত্মায় পরাজিত হবে ! তা যদি হয়ে তবে আমার জীবনটাও অর্থ হারাবে । আমি কি ওকে অমন করে পরাজিত হতে দিতে পারি ! তুমি সিদ্ধান্ত না নিলে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।'

রত্ন অভিভূত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি যদি বলি, ইলোপ কর, সেটা কি ওর উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না ? তেমনি তুমি যদি বল, চেঞ্জে চল, সেটাও কি ওর উপর জোর খাটানো নয় ? আমি চাই যে ও আপনা থেকে চায় ।'

জ্যোতি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'এক দিকে তুমি আমি । অন্য দিকে সারা পরিবার, সারা সমাজ । ওরা সবাই ওকে সমস্বরে বলছে, তুই যদি যাস তোর মহাল খালি থাকবে না । এবার সুধা নয়, এবার নতুন বৌরানী । ফিরে আসার পথে কাঁটা । ফিরে আসতে কি হবে না লো ? প্রেম ক'দিন থাকে । আর ও তোকে খাওয়াবে কী ? মুখমধু ? তা দিয়ে কি পেট ভরে ?'

পঞ্চমীর চাঁদের আলোয় রত্নর মুখ আবছায়া দেখা যাচ্ছিল । সে মুখে সুখের লেশ ছিল না । অপমানে অভিমানে লজ্জায় ভাবনায় তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তার অশ্রুর সরোবর শুকিয়ে গেছল ।

জ্যোতি বলতে থাকল, 'রতন, তোমার এখানে আমি বেড়াতে আসিনি । গল্প করতে আসিনি । এসেছি তোমাকে বাজিয়ে দেখতে । তা তোমার যদি বিবেকের বাধা থাকে, তুমি যদি জোর খাটানো পছন্দ না কর, তোমাকে আমি অপেক্ষা করতে দেব, কিন্তু

নিজে অপেক্ষা করব না। অপেক্ষা করলে একটা না একটা ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে, যাকে আর অঘটিত করা সম্ভব নয়। তাতে কে সব চেয়ে বেদনা পাবে ? যে সব চেয়ে বেদনা পাবে তারই সব চেয়ে অকর্তব্য হবে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো ঠায় বসে ট্র্যাজেডীর অভিনয় দেখা। বরং তারই সব চেয়ে কর্তব্য হবে হস্তক্ষেপ করে জোর খাটিয়ে ট্র্যাজেডীকে ঘটতে না দেওয়া। আমার উপর গোরীর আস্থা আছে। তাই আমি ওর হয়ে ওরই ভালোর জন্যে সাহস করে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। ও মেনে নেবে।'

বাস্তবিক জ্যোতি এমন মানুষ যে তাকে দেখলে তার সান্নিধ্যে এলে তার উপর স্বতঃ আস্থা জন্মায়। জন্মেছিল রত্নরও। রমুরও। তাদের চাষগাঁয়ের লোকজনেরও।

'তা হলে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে চাও, জ্যোতিদা ?' ধাঁধায় পড়ে রত্ন সুধাল।

এর উত্তরে জ্যোতি তাকে আরো কাছে সরে আসতে ইশারা করল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'প্রথমেই তোমাকে সাবধান করে দিই। শতং ভাবয়। মা বদ। মা লিখ। গোরীকেও না। ললিতের জাহাজ ছাড়ছে মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে। ওকে তুলে দেবার জন্যে যারা ডেকে উঠবে তাদের মধ্যে গোরী ও আমি থাকব। কিন্তু ডেক থেকে নেমে আসবে যারা তাদের মধ্যে গোরী ও আমি থাকব না। আগে থেকেই আমরা প্যাসেজ কিনে রাখব। আমাদের মালপত্র আগে থেকে বেনামীতে পাঠিয়ে দেব। বর্মা যাত্রীদের ছাড়পত্র লাগে না। রেঙ্গুনে নেমে আমাকে বাসা খুঁজতে হবে। চাকরি জোটাতে হবে। সঙ্গে যা থাকবে তাতে তিন চার মাসের বেশী চলবে না। প্রথম সুযোগেই গোরীকে আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেব। যাতে ও শিক্ষিতা হতে পারে, স্বাবলম্বী হতে পারে। খেলাধূলা করতে পারে, দৌড়ঝাঁপ করতে পারে। পরিপূর্ণ রূপে নর্মাল হতে পারে। ভারতে জন্মেছে বলে ও কেন ওর বয়সের পাশ্চাত্য মেয়েদের মতো বালিকা হবে না ? কেন ওর গার্লহুড থেকে বঞ্চিত হবে ? ওকে অকালে নারী করা হয়েছে। এবার ওকে গার্ল হবার সুযোগ দিতে হবে। বিপ্লব কাকে বলে ? বিপ্লব হচ্ছে ভুল অতীতকে স্রেফ মুছে ফেলে পরিষ্কার স্লেটে লেখা। পঁচিশে মে ওর জীবনে ফরাসী বিপ্লব। নতুন ইতিহাসের প্রথম দিবস।'

রত্ন থ হয়ে শুনছিল। কথাটি কইল না। ভাবছিল এর মধ্যে তার নিজের স্থান কোথায় ? তাকে কি বাদ দেওয়া হবে ? গোরীরও কি ওই মত ? সে অভিমানে ফুলছিল।

জ্যোতি আপন মনে বলে গেল, 'কিন্তু তুমি তো জান আমি অন্য এক বিপ্লবের ঝাণ্ডা কাঁধে তুলে নিয়েছি। গান্ধীজীর আহ্বানে আমাকে ফিরে আসতে হবে। গণসত্যাগ্রহে অংশ নিতে হবে। গোরীকে আমি ফেলে আসব কার কাছে ? দিয়ে আসব কার হাতে ? আমি চাইনে যে ও রাজনীতি করে। খুব কম সময়ের মধ্যে ওকে খুব বেশী শিখতে হবে। নইলে ও স্বাবলম্বী হবে না। ওর মনের বিকাশ দ্রুত হওয়া চাই। নইলে ও সাবালিকা হবে না। স্বাধীনতার দায়িত্ব বইবে কেমন করে ? রতন, তোমার মনঃস্থির করে তুমি পরের কোনো জাহাজে আসবে। তুমিও একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেবে। যত দিন না তোমরা দু'জনে বেশ গুছিয়ে নিতে পেরেছ তত দিন আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। ধর এক বছর। তার আগে বাপুজী গণসত্যাগ্রহ ঘোষণা করবেন বলে

মনে হয় না। আমার আশ্রমটা উঠে যাবে, এই যা আফসোস। কে চালাবে!'

রত্নর হৃৎপিণ্ড বেতালা ভাবে তাল দিচ্ছিল। সে বলি বলি করে বলতে পারছিল না লজ্জায়—সম্বন্ধটা কি ভাইবোনের হবে? নয়তো বিয়ে কেমন করে সম্ভব?

জ্যোতি যেন অন্তর্যামী। বলল, 'শরৎচন্দ্রের অভয়া আর রোহিণীদার কাহিনী মনে আছে নিশ্চয়? আমি তার গোড়ার দিকটা সেই রকম রেখে শেষের দিকটা বদলে দিতে চাই। রোহিণীদার সঙ্গে অভয়ার মিলন ঘটবে না। ঘটবে শ্রীকান্তর সঙ্গে। আর বিয়ে যদি নাও ঘটে তা হলেই বা কী হয়েছে? মহাভারত অশুদ্ধ হবে? মহাভারতে অশুদ্ধি কি বড় কম আছে? মহা ভারতেও থাকবে। মাইকেলের কি হেনরিয়েটার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? বিয়ে বলে সকলে মেনে নিয়েছিল। সকলে যদি মেনে নেয় তবে ফর্মালিটি থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে। ওই যে মেনে নেওয়া ওইটেই বিয়ে। এক দিনে মেনে নেবে না, কিন্তু আখেরে নেবে। তোমরা কি তা বলে পেছিয়ে যাবে?'

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না রত্নর বুকের রক্ত তার মুখে রক্ত চন্দন মাখিয়ে দিয়েছে। তার মাথা নত হয়েছে শরমে শ্রদ্ধায় ও ধন্যতায়। কত বড় বান্ধব এই জ্যোতিদা!

অনেকক্ষণ পরে রত্নর মুখে ভাষা ফুটল। কোনো মতে আবেগ দমন করে সে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমরা তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, ভাই জ্যোতিদা। ও আমাকে যেদিন যেতে বলবে সেই দিনই আমি যাব। যদি বলে সেই জাহাজে তো সেই জাহাজে।'

জ্যোতি উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'তা হলে এখন থেকেই পোঁটলাপুঁটলি বাঁধা শুরু কর। সময় মাত্র এক মাস। তোমার কাপালিপাড়া এসে কাজ নেই, রতন। তুমি বরং কলকাতা গিয়ে আমার দাদার ওখানে উঠো। ইঙ্গে বৌদি তোমাকে প্যাসেজ কিনে দেবেন। তিন জনের প্যাসেজ। সাবধান। আর কেউ টের না পায়। গৌরীও না।'

ষোল

আহা! সে কী রাত!

পঞ্চমীর চাঁদ কখন অস্ত গেছে। আকাশের চন্দ্রাতপ তারায় তারায় খচিত। তারা কি তারা? না চোখের তারা? কোটি কোটি চোখের তারা মেলে আকাশের দেবতারা দেখছেন পৃথিবীর সব চেয়ে সৌভাগ্যবান পুরুষকে।

চৈত্র গেছে। বৈশাখ এসেছে। তবু কোকিল কোকিলার কুহুরবে বিরতি নেই। তারা আরো কাছাকাছি হয়েছে। তাই তাদের উচ্ছ্বাস ক্ষীণতর, কিন্তু আকুতি তীব্রতর। পাপিয়া পাগলের মতো পাড়া কাঁপিয়ে মাথার উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার চোখ গেল শুনতে শুনতে মানুষের কান গেল। রত্নকে এরা কেউ ঘুমোতে দেবে না।

ঘরের বাইরে বিছানা পাতা রত্ন ও জ্যোতি ও রমু তিনজনের। মেহনতী মানুষ রমু। কুম্ভকর্ণের মতো তার ঘুম। আর জ্যোতিও তো দিনভর চরকা কাটে, ব্রেন কাটে,

ট্রেঞ্চ কাটে। সেচ দিতে সার দিতে সেলেরি ও লেটাস লাগাতে স্যালাড বানাতে শেখায়। সেও সকাল সকাল শুতে যায় ও দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম আসে না কেবল রত্নর।

বিছানার পাশেই বেলফুলের ঝাড়। কাছেই এক গাছ কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। অদূরে পুষ্করিণী। ওর পঙ্কোদ্ধারকালে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। যত দূর বোঝা যায় বজ্রশ্রী দেবী। তার থেকে অনুমান হয় পুষ্করিণীটিও বৌদ্ধ যুগের। রত্নর কল্পনা পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে পাল রাজাদের রাজত্বে রওনা দেয়।

রত্ন যে জগতে বাস করে সে জগতে শতাব্দী সহস্রাব্দীও কিছু নয়। সে জগতে কালগণনা নেই। বিংশ শতকের ভারতে জন্মেছে বলে যে সে তার নিত্যকালের জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তা সে একদিনের জন্যেও স্বীকার করেনি। সে যুগপৎ দেশেও রয়েছে জগতেও রয়েছে, শতকেও রয়েছে নিত্যকালেও রয়েছে। তার চেতনা আর দশজন ভারতীয় নাগরিকের মতো হয়েও চিরকালের বিশ্বনাগরিকের মতো। তাই তার চেতনায় নিত্য ঝুলন, নিত্য রাস, নিত্য দোল। সেখানে সে ও তার নিত্য গৌরী।

এ ছেলেকে সমঝানো শক্ত যে সংসারে জরুরি বলে কিছু আছে। জরুরি বলে কোনো শব্দ তার অভিধানেই নেই। বহু দিন থেকে সে শুনে আসছে গৌরীর মুক্তি না হলে নয়। হওয়া জরুরি। কিন্তু শুনলে কী হবে, হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম যে কয়েক মাস বা কয়েক বছর সবুর করলে এমন কিছু এসে যায়। হৃদয়ঙ্গম যদি বা করে তবে সেটা সত্তা দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে। এ ছেলেটি কোনো দিনই মনঃস্থির করত না। ক্রমাগত গড়িমসি করত। জ্যোতি এসে দিন ধার্য করল পঁচিশে মে। স্থান ধার্য করল কলকাতা, চাঁদপাল ঘাট। রত্ন যদি না যায় তা হলেও জাহাজ ছাড়বে। জ্যোতি চলবে। গৌরী চলবে। রত্নর জন্যে কেউ বসে থাকবে না। পরে যদি সে যোগ দিতে চায় দেবে, না দিলেও কিছু এসে যাবে না। তাকে বাদ দিয়েই গৌরীর জীবনের নবপর্যায় শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে।

রত্নর মনে মনে অভিমান ছিল যে গৌরীর অতীত তার নয়, অপর পুরুষের। কিন্তু এই অনুপস্থিতির পর বর্তমানও কি তার থাকবে! ভবিষ্যৎ কি তার হবে! পঁচিশে মে একটা ছেদ ঘটবে, যদি না রত্ন সেদিন সহযাত্রী হয়। কিন্তু ওদিকে বাবার দশা কী হবে! আর তার নিজের প্রস্তুতি! পঁচিশে মে। একটা মাসও নয়। সময় কি আছে! ইচ্ছা করে যেখানে যত ঘড়ি আছে সব ক'টাকে একসঙ্গে বন্ধ করে দিতে।। সূর্যচন্দ্রকেও হনুমানের মতো বগলদাবা করতে। তা হলে পঁচিশে মে যথাকালে আসবে না। আসবে রত্ন যখন বলবে। এদিকে আবার সেই দিনটির উন্মাদনা সে এক মাস আগে থেকেই অনুভব করছিল। তার মনে হচ্ছিল তার বুক ফেটে যাবে উত্তেজনায়। রাত তখন একটা কি দেড়টা সে যখন শয্যা ছেড়ে উঠল। পুকুরপাড়ে পায়চারি করে ঘাটে গিয়ে চুপচাপ বসল। সরোবরজলে রাশি রাশি তারা ফুল ফুটেছিল। এক ফালি আকাশ নেমে এসেছিল ভূতলে। রত্ন একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

এ বিশ্বের বিশাল দেহের অন্তরালে কোথাও একটি প্রেমিক হৃদয় লুকিয়ে আছে।

সেই অদৃশ্য উৎস হতে রত্নর হৃদয়ে আসছে প্রেমের ঝরণা ধারা। অলক্ষ্য প্রণালী দিয়ে। যেমন আসছে এই সরসীবক্ষে অফুরান ক্ষীরধারা কোন নিহিত নির্ঝর হতে। রত্নর হৃদয়ের প্রেম দৃশ্যত রত্নর প্রেম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রেম। সেই পরম প্রেমিকের। রত্ন তার আধার মাত্র। সেই পরম প্রেমের। ওই বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে সে তার একরত্তি হৃদয়ের সংযোগসূত্র অনবচ্ছিন্ন রাখবে, পরিষ্কৃত রাখবে। তা হলে কোনো দিন তার হৃদয়ে রসের অভাব হবে না, কমতি হবে না। গোরী যত চাইবে তত পাবে। তার তৃষা মিটবে। অ-সুখ সারবে। সে বাঁচবে।

রত্ন প্রার্থনা করে। হে উৎস, তুমি যেন তোমার প্রাণদায়িনী ক্ষীরধারা হতে আমাকে তথা আমার কান্তাকে বঞ্চিত না কর, বিচ্যুত না কর। সে ধারা যেন প্রণালীতে হারিয়ে না যায়, শুকিয়ে না যায়। ক্ষীণ না হয়, মলিন না হয়। হে উৎস, তোমার হৃদয়রস যেন নিঃশেষিত না হয়, বিকৃত না হয়।

রত্ন প্রণিপাত করে। ধন্যতা জানায়। সে ধন্য যে তাকে প্রেমের আধার রূপে মনোনয়ন করা হয়েছে। সে প্রেমদেবতার মনোনীত। ধ্যান করতে যায়। ধ্যানে দেবতাকে পায় না। পায় প্রিয়াকে। গোরী যেন তাঁর প্রতিমা। আর সে প্রতিমাপূজক। ধ্যান করতে করতে তার তন্দ্রা আসে। উত্তেজনা উপশমিত হয়। সে শয্যায় ফিরে যায়।

পরের দিন প্রভাতে তার হৃদয় ভরে যায় ভালোবাসার জোয়ারে। তার সাধ যায় যাকে দেখে তাকে আলিঙ্গন করতে। সব মানুষকে। সব প্রাণীকে। সব পদার্থকে। তার চোখে মন্দ বা অসুন্দর বলে কেউ নেই, কিছু নেই। থাকলেও তার প্রেমের রসায়ন লোহাকে সোনা করবে। মন্দকে ভালো করবে। অসুন্দরকে সুন্দর।

জ্যোতি কিন্তু বিশ্বাস করে যে এ জগতে মন্দ আছে, অসুন্দর আছে। তার সঙ্গে অনবরত দ্বন্দ্ব করলে তবে যদি তার সংশোধন বা পরিবর্তন হয়। দ্বন্দ্ব কেমন করে সপ্রেম হয় সেই শিক্ষাই দিতে এসেছেন গান্ধীজী। ইতিহাসে গান্ধীর অভ্যুদয় দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রেমকে আনতে। গান্ধীর অহিংসা দ্বান্দ্বিক অহিংসা। জ্যোতির অহিংসাও তাই। এর পশ্চাতে রয়েছে দ্বন্দ্বের আবশ্যকতা। মন্দের সঙ্গে অসুন্দরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। সুতরাং মন্দ বা অসুন্দর বলে কিছু আছে বই-কি। তবে সেটা মানুষের প্রকৃতিগত নয়। মানুষ সেটা ছেড়ে দিতেও পারে, ছাড়িয়ে উঠতেও পারে। সেইজন্যে কারো সম্বন্ধে হতাশ হওয়া উচিত নয়। মানবের অযুত সম্ভাবনার মধ্যে একটির নাম ঈশ্বর হতে পারে। সে রকম একটি সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করে মানব তার অভিমুখে যাত্রা করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন ও ডাকলে সাড়া দেন এটা মানবে না জ্যোতি।

সন্ধ্যার দিকে আবার যখন কথাবার্তার অবসর হলো রত্ন বলল, 'জ্যোতিদা, কেমন করে এক ভালোবাসার সঙ্গে আর সব ভালোবাসাকে মেলাই, বল তো? গোরীকে ভালোবাসি বলে আমি দেশকে দেশের লোককে ভালোবাসতে ছাড়িনি। আমাকে ভালোবাসে বলে সেও দেশকে দেশের লোককে ভালোবাসতে ছাড়েনি। তাদের ছেড়ে যাওয়া কি ভালোবাসার পরিচয় দেয়? ছেড়ে গেলে কি অভিমানে তারা আমাদের পর

করে দেবে না ?'

জ্যোতিও যে ওটা না ভেবেছে তা নয় । সে বলল, 'গোরীর দুর্বলতা কোনখানে, জান ? সে কূল ছাড়তে পারে, কিন্তু শ্রেণী ছাড়তে পারে না । মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না সে অভিজাত । মেনকা হলেও সে অভিজাতদের সঙ্গ পেতে পারে, কিন্তু শিক্ষয়িত্রী বা নার্স হলে তা পাবে না । কিন্তু আমাদের যা পরিকল্পনা তাতে তাকে শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বী হতে হবে । দেশে থাকলে সে তার পুরাতন সমাজে মিশতে চাইবে, মিশতে পারবে না, কষ্ট পাবে । চেনা লোকের সঙ্গে তার পদে পদে দেখা হয়ে যাবে, সে সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হবে । তার চেয়ে একটা পরিষ্কার ছেদ ঘটে যাওয়া ভালো । দেশান্তর । বলছি না যে চিরজীবনের জন্যে ।'

রত্ন অন্য কথা ভাবছিল । সে সবাইকে ভালোবাসবে । যশোবাবুকে বাসবে না ? সে বলল, 'কিন্তু যশোমাধবদা আমাদের কী ক্ষতি করেছেন যে আমরা তাঁর এত বড় ক্ষতি করব ?'

জ্যোতি চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলল, 'ওই বজ্রশ্রী মূর্তি কার কী ক্ষতি করেছিল যে ওকে পঙ্কশয্যায় শুয়ে থাকতে হলো কে জানে ক'শতাব্দীকাল ? রমু উদ্ধাব না করলে পাঁকে ডুবে থাকতে হতো কে জানে আবো ক'শতাব্দী ? আমাদের এখানে শক্ত হতে হবে । তাতাদাও মনে মনে জানেন যে গোরীকে তিনি সুধাদির মতো ভালোবাসেন না ।'

রত্নব বুকে একটা ক্ষত ছিল । সেখানে না জেনে জ্যোতি আঙুল দিল । ব্যথা পেয়ে রত্ন বলে উঠল, 'জ্যোতিদা, আমার চেতনাকে আমি সৌন্দর্য দিয়ে ভরে রাখতে চাই । কিন্তু কেন এমন হয় যে সৌন্দর্যের চাব দিকে পঙ্ক ঘিরে থাকে ?'

জ্যোতি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এই কেন-র উত্তর কে দেবে ? আমার চেতনার বাইরে এ জগতের অস্তিত্ব আছে কি না তাই জানিনে । চেতন হয়ে অবধি দেখছি সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দর, সত্যের সঙ্গে অসত্য, ভালোর সঙ্গে মন্দ, প্রেমেব সঙ্গে অপ্রেম দ্বন্দ্বরত অবস্থায় রয়েছে । গান্ধীজী আমাকে অসহযোগ করতে শিখিয়েছেন, কিন্তু অসুন্দরের সঙ্গে অসহযোগ করতে গিয়ে যখন চোখ কান রুদ্ধ করি তখন সুন্দরও প্রবেশপথ পায় না । অসত্যের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলে সত্যও মুখ খোলে না । মন্দের দিকে পিঠ ফেরালে ভালোর দিকেও পিঠ ফেরানো হয় । অপ্রেমকে ঘরে ঠাঁই না দিলে প্রেমও বাইরে থেকে যায়। তা হলে চেতনার জানালা দরজা খুলে রাখাই সুযুক্তি । মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের চেতনা কেমন মুক্ত হয়েছে, লক্ষ করনি ? আপাতত মনে হতে পারে ওটা পঙ্কোদ্ধার । কিন্তু পঙ্কোদ্ধার হতে হতে হবে বজ্রশ্রী মূর্তি উদ্ধার । তেমনি তুমিও পঙ্কোদ্ধার কর, তা হলেই তোমার সৌন্দর্যপ্রতিমাকে পাবে ।'

রত্নর মনে আর একটি কাঁটা ছিল । সে বলল, 'কিন্তু সুন্দরী নিজেই যদি ফিরে যেতে চান তাঁর ফিরে যাবার পথ খোলা থাকবে না যে । এটা কি তোমার মাথায় আসেনি ।'

জ্যোতি দৃঢ় হয়ে বলল, 'সুন্দরী নিজেই যদি ফিরে যেতে চায় তা হলে তুমি তোমার

প্রবল প্রেম দিয়ে তার পথ রোধ করবে । যদি আরো এগিয়ে যেতে চায় তা হলে কিন্তু পথ জুড়ে থাকবে না। পথ ছেড়ে দেবে ।' ইতস্তত করে বলল, 'এই যেমন আমি ছেড়ে দিয়েছি ।'

রত্ন এটা প্রত্যাশা করেনি । আঘাত পেয়ে বলল, 'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়, ভাই জ্যোতিদা । কিছুই তো তুমি পেলে না ও পাবে না । আমাদের জন্যে এত কিছু ছেড়েছ ও ছাড়বে । তোমার মতো মহৎ কে ! তোমার জন্যে আমরা গর্বিত ।'

জ্যোতি রগড় করে বলল, 'তুমি কেড়ে নিয়েছ বলেই আমি পাইনি । তুমি ছাড়িয়েছ বলেই আমি ছেড়েছি । তোমার সঙ্গে আমি পারব কেন ? ওই দগ্ধ সাহারা মরুভূমিকে দু'বেলা রস জোগানো কি আমার মতো নীরস পাষাণের সাধ্য ? আমার ভিতরে রস থাকলে তো রসের জোগান দেব । ভালোই হলো যে তুমি এসে ওকেও বাঁচালে, আমাকেও বাঁচালে ।'

রত্ন এইবার তার গোপন ভাবনাটি অনাবৃত করল । বলল, 'কিন্তু ও যদি আমাকে চোখে দেখে না-মঞ্জুর করে ! চিঠিতে ধরা পড়িনি । চাউনিতে ধরা পড়ে যাব ।'

জ্যোতি অভয় দিয়ে বলল, 'তোমার চোখে এমন একটা মায়া আছে যা ওকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে । তুমি বরং তোমার ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকস কাটিয়ে ওঠ । ও জানে তুমি সুপিরিয়র ।'

ওদিকে চিঠি লেখালেখির বিরাম ছিল না । গোরী লিখেছিল, 'খাসা ছেলে তো ! আমি কি কোনো দিন বলেছি না আভাস দিয়েছি যে তুমি পুরুষোত্তম নও ? তোমার সঙ্গে দেখা হলে পাছে সে রকম ভাবি তার জন্যে তুমি এখন থেকেই ভয়ার্ত। ওগো এই বিজিত মানসিকতা কি তোমার সাজে! তুমি হলে বিজেতা । এর মধ্যেই তুমি আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছ । একে একে সর্বস্ব জয় করে নেবে । সেই রাজপুত্রের মতো যে পাশাবতীর সঙ্গে পাশা খেলে এক এক করে সমস্ত জিতে নিল । তুমি যে আমার হৃদয় হরণ করেছ এ কি তুমি পারতে যদি পুরুষোত্তম না হতে ! আমার হৃদয় কি আমি অধমকে দিতে পারি ! মধ্যমকে দিতে পারি ! আমার কান্ত, তুমিই আমার পুরুষোত্তম ।'

রত্ন লিখেছিল, 'এবার তো আমি সুলভ হতে যাচ্ছি । জ্যোতিদার আশ্রমে । কত বার আমাদের দেখা হবে । তা সত্ত্বেও যদি তোমার মোহভঙ্গ না হয় তবেই জানব যে আমি তোমার মন পেয়েছি । আর নয়তো জানব যে নিজেকে দুর্লভ করে এত দিন একটি সরলবিশ্বাসী মেয়ের সরলবিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছি । আমাদের প্রেমের ভিত্তি পরখ করে দেখতে চাই ।'

এর উত্তরে গোরী—'কিন্তু আমার যে ওখানে যাওয়া বারণ । না, ঠিক বারণ নয় । আমার নিজেরি ভয় করে অনুমতি না নিয়ে যেতে । অনুমতি চাইতেও মুখ নেই । যদি শুনতে হয়, বেশ, তুমিও অনুমতি দাও, আমিও আরেক বার ছাঁদনাতলায় যাই । এসব লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে পদে পদে সতর্ক থাকতে হয় । তুমি যদি আমাকে চিরদিনের মতো পেতে চাও তবে কাপালিপাড়ায় কেন ? যেখানে যেতে বলবে সেখানে

যাব । সাহস করে চাইলে—চাইতে জানলে—আমাকে তুমি চিরদিনের জন্যে পাবে।'

সাহস করে চাইতে যে শুধু সাহস লাগে তাই নয়, অনেক রকম প্রস্তুতি লাগে। কায়িক মানসিক সাংসারিক । গোরীর প্রয়োজনের অনুপাতে রত্নর প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না। সে কোন মুখে চাইত ! এই যখন পরিস্থিতি তখন জ্যোতি এসে তাকে উদ্ধার করল ।

যাত্রার দিন ও দিশা প্রকাশ না করে রত্ন চিঠি লিখল গোরীকে—'ওগো তরুণী, এবার তুমি বালিকা হবে । চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে ফিরে যাবে । ঠিক সেইখানটি থেকে আবার আরম্ভ করবে যেখান থেকে তোমাকে জোর করে অপসরণ করা হয়েছিল। ভাবতে কী যে মজা লাগছে তুমি হবে আমার বছর পাঁচেকের ছোট । তোমাকে তখন আমি আর কান্তা বলব না । অকালে পাকাব না । তুমি হবে আমার গার্ল । আমার গার্লকে আমি নিজের হাতে গড়ে নেব । মুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করব আমার আপন হাতের প্রতিমাকে । আর আমি প্রতিমাভঙ্গকারী নই । আমি প্রতিমানির্মাতা ।'

গোরী এর মর্মভেদ না করতে পেরে অবাক হয়ে লিখল—'ব্যাপার কী, বল তো ! কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? কবে যাওয়া হচ্ছে ? না এখনো সব অনিশ্চিত ? শুধু জল্পনাকল্পনা ? জ্যোতি ফিরেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করেনি । একটা না একটা ছুতোয় এড়িয়ে থাকছে । শুনছি ওর আশ্রম উঠে যাচ্ছে । অজস্র দেনা । পুলিশেরও নেকনজর । তা হলে তুমি আসবে না ? কান্না পাচ্ছে । কিন্তু হঠাৎ তোমার এ কী খেয়াল ! বুড়ীকে তুমি বালিকা করবে ! বাসি ফুলকে করবে কলিকা ! আমি হব তোমার গার্ল । শুনে লজ্জায় মরি ! আমি হব তোমার বছর পাঁচেকের ছোট ! বুঝেছি । আবার সেই রাখীবন্ধ বহিন। আমাকে তুমি আর কান্তা বলবে না । আমার বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে যেতে । ওগো আমার মাথা খারাপ হতে বসেছে । জ্যোতি কেন আসছে না ? মনও খারাপ । তুমি আসবে না । অশোকবনে সীতার মতো আর কত কাল আমি পড়ে থাকব ! নিঃসঙ্গ ! একাকী !'

জ্যোতি ফিরে গিয়ে অবধি চিঠি লেখেনি । রত্ন চিন্তিত হয়েছিল । তবে কি যাত্রার আয়োজনটা পাকা নয় ? আগে থাকতে বাবাকে বলে কী হবে ? বলা মানে তো যুধিষ্ঠিরের মতো আধা সত্য আধা মিথ্যা বলা। ললিতের জাহাজে রেঙ্গুন যাচ্ছি। ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে ।

রত্ন ভাবছিল কুষ্টিয়ার বাড়ীর উপরতলার ঘরে বসে । এমন সময় তার চোখে পড়ল লম্বামতন কে একটি যুবক তাদের বাড়ীর গেটে ঢুকল । আরে ! এ যে কানন ! এ কি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম ! রত্ন তর তর করে নেমে গিয়ে কাননকে জড়িয়ে ধরল।

কানন নিচু গলায় বলল, 'জ্যোতিদার কাছ থেকে আসছি । পীরপুরে তোমাকে পাইনি। না, না, এমন কিছু জরুরি নয় । তুমি অমন ঘাবড়ে যেয়ো না । ঘাবড়ে যাবে বলেই তো টেলিগ্রাম করা হলো না । অন্য কোনো বার্তাবহ পাঠালে তোমার হয়তো সম্মানহানি হতো । আসলে এটা তাতাদার অনুরোধ । তিনি এখন তোমার কৃপানির্ভর । তুমি ইচ্ছা করলে বাঁচাতেও পার, মারতেও পার । তুমি কি কালকের মধ্যে তৈরি হতে পারবে ?'

কানন মানুষটা দিলখোলা । তার পেটে কথা থাকে না । কিন্তু সেও খুলে বলল না কী হয়েছে । কী এমন জরুরি । রত্নর হাতেই বা মরণ বাঁচন কেন । কার মরণ বাঁচন । অদম্য উদ্বেগ সেইদিনই যাত্রার জন্যে তৈরি করে তুলল রত্নকে । সেই দিনই রাত বারোটার সময় বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে নামল দুই বন্ধু । তাদের মালুম ছিল না যে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নামলে আরো সংক্ষেপ হয় ।

রাতভর পায়ে হেঁটে দুই দুই বার মাঝিদের জাগিয়ে সাধাসাধি করে দু'দুটো মদনদী পেরিয়ে কাপালিপাড়ার আশ্রমে পৌঁছতে সূর্যোদয় । আমবাগানের মাঝখানে খানকয়েক খড়ের ঘর । তার একটার থেকে বেরিয়ে এলো জ্যোতি । তার মুখে হাসি ধরে না, কিন্তু বদনে বিষাদের ছায়া । সেও কিছু ভাঙল না । লোক পাঠিয়ে দিল বেগমপুরে জানাতে । তার পর ওদিক থেকে জনা দুই বরকন্দাজ এসে আলাদা আলাদা করে চিঠি দিয়ে গেল জ্যোতিকে ও রত্নকে । তার পর আসতে থাকল ভারে ভারে ফলমূল চিড়ে দই সন্দেশ।

যশোবাবু মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ করেছিলেন জ্যোতিকে ও তার বন্ধুদ্বয়কে । ভোজটা রত্নর সম্মানে । আর গৌরী লিখেছিল রত্নকে ছি ছি । তুমি এমন ! তোমাকে তু করে ডাকবেন আর তুমি পোষা কুকুরের মতো ছুটে আসবে ! কী দরকার ছিল তোমার কাননের সঙ্গে অত কষ্ট করে আসার ! ওরই বা কী দরকার পড়েছিল তোমাকে ডেকে আনার ! জ্যোতিই বা কেন ওকে তোমার কাছে পাঠায় ! তোমাদের তিনজনের উপরেই আমি বিষম রাগ করেছি । তোমরা শত্রুপক্ষের চর । তোমাদের কথা আমি শুনব না, শুনব না, শুনব না । তোমরা কেউ আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না। উনি ভেবেছেন ওঁর নিজের কথায় যা হলো না তোমাদের কথায় তাই হবে । বিশেষ করে তোমার কথায় । ওগো তোমার সব কথাই আমি শুনব, কিন্তু ওই কথাটি নয় । তুমি কি চাও যে আমি পরাজিত হই ? তার আগে আমি বিষ খেয়ে মরব । বেশ, আমার মরা মুখ দেখতে চাও তো সূর্যাস্তের পর এসো । আরতির আগে । কিন্তু আমার মান রেখো । এ বাড়ীতে জলগ্রহণ কোরো না ।'

রত্ন নাচতে নাচতে আসছিল যে আজ শুভদৃষ্টি । সকালবেলাই লগ্ন । তা নয়, এ কী ! এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত । এ কিসের সূচনা করছে ! জ্যোতিদাকে এ চিঠি দেখাতে সে আঁধার মুখে বলল, 'থাক, ও বেলা যাওয়া যাবে । এ বেলা ঘুমিয়ে নাও ।'

কানন এক ঘুমে দিন কাবার করে দিল । কিন্তু ঘুমের ঘোরে রত্নর চোখের পাতা জুড়ে গেলেও ঘুম কিছুতেই এলো না । সে কেবল ঘণ্টা গুনতে মিনিট গুনতে থাকল । আজ প্রথম দেখা হবে রত্নগৌরীর সঙ্গে গৌরীরত্নর । এ যেন আয়নায় মুখ দেখা । রত্নকেই রত্ন দেখবে, গৌরী দেখবে গৌরীকেই । প্রেমের ইতিহাসে আর কখনো কি এ রকমটি হয়েছে ! অপূর্ব ! অপূর্ব ! আফসোস শুধু এই যে ভালো করে প্রস্তুত হতে সময় দিল না নিয়তি । টেনে নিয়ে এলো ধার্য তিথির সতেরো দিন আগে । রাত জেগে পায়ে হেঁটে কী ছিরি হয়েছে চেহারার ! আর গৌরীও তো কী এক অজ্ঞাত কারণে অপ্রসন্ন ।

কেউ খুলে বলবে না কী সে কারণ ।

বিকেলের দিকে আরো একখানি চিঠি । গৌরী লিখেছিল—'ওগো আমার রতন সোনা। আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের কোণা । তুমি কত দূর থেকে কত কষ্ট করে এসেছ! কাকে দেখতে এসেছ তা কি আমি বুঝিনে ! কেন তবে পাগলের মতো গোসা করি! এ বাড়ীর খাওয়া আমি অনেক দিন হলো ছেড়েছি! আমার জন্যে মাধবের প্রসাদ আসে। আমি মাধবের খাই, মাধবের ধারি । আর কারো খাইনে ও ধারিনে । সেই মাধবের প্রসাদও আজ আমি মুখে দিইনি । গোসা করেছি বলে কি? হাঁ, কিন্তু আরো একটি কারণ আছে । কানে কানে বলি । আজ আমাদের শুভদৃষ্টি । তাই আমার উপবাস । ওগো তুমি কি অন্তর্যামী নও ? জান না আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি লগ্নের অপেক্ষায় ? কাননকে আগে পাঠিয়ে দিয়ো, ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।'

ভগ্নপ্রায় মঞ্জিলের দেউড়িতে দুটি পতনোন্মুখ সিংহের পদতলে দুই আসাসোঁটা বরদার প্রতীক্ষা করছিল । জ্যোতিকে ও রত্নকে তসলিম করে সদরের খাস বৈঠকখানায় নিয়ে গেল । সেখানে অপেক্ষা করছিলেন স্বয়ং যশোবাবু। সাহেবী কেতায় করমর্দন করে নবাবী কেতায় ওদের গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিলেন । তার পর বাঙালী কেতায় ওদের গলায় গোড়ের মালা পরিয়ে দিলেন । ওরা সে মালা খুলে রাখল সবিনয়ে । তার পর সোনার তবকে মোড়া পান এলো, সিগার এলো । আর এলো রকমারী পানীয় । জ্যোতি নিচ্ছে দেখে রত্নকেও নিতে হলো ভদ্রতার খাতিরে বরফ-ঠাণ্ডা নারঙ্গীর সরবৎ । বরফের বাক্সয় রেখে শীতল করা । তাতাদা একটি জিমলেট হাতে করে উভয়কে উইশ করলেন। খসখসের পর্দা ঘেরা ঘরের আলো-আঁধারিতে গল্প জমিয়ে কারো নজরে পড়ল না রত্ন কেমন করে না খেয়ে না খেয়ে তার গ্লাস আধ-খালি করল ।

তাতাদা মানুষটি মধ্যবয়সী মোটাসোটা বেঁটে খাটো চিকণশ্যামল । পরিচ্ছন্ন মাজাঘষা চাঁচাছোলা চেহারা । নাকটি চাপা। ঠোঁট দুটি পুরু । পরনে মিহি মলমলের পিরান পায়জামা । পাড়গুলি কারুকার্যময় । সৌজন্যের অবতার । বিলেত যাত্রার পর থেকে তাঁর জীবনযাত্রায় বেশ একটা সাহেবী ছাপ পড়েছে । মেজাজটা জমিদারের, মর্জিটা ব্যারিস্টারের । জলি গুড ফেলো । রত্ন লক্ষ করল যে তিনি তাকে কথায় কথায় 'সার' বলে সম্বোধন করছিলেন । বাড়ীতে ডাক্তার এলে গৃহস্থের ভাবখানা যেমন হয় তাঁরও কতকটা তেমনি । কৃতার্থ, আশ্বস্ত, উদ্বিগ্ন, নার্ভাস । যেন রত্নর হাতেই মরণ বাঁচন ।

অবশেষে আহ্বান এলো সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী যে ঘরটিতে গৌরী তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের দর্শন দেয় সেই ঘরে । কানন সেখানে আগে থেকেই জুটেছিল । ঝালরঝোলানো সুজনিঢাকা গদি আঁটা দিওয়ানের উপর সে আর তার পারুলদি বসেছিল পাশাপাশি পা মুড়ে । জ্যোতিকে ও রত্নকে দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে তাতাদা ফিরে গেলেন । হাল কামরায় তাঁর বয়স্য সমাগম হয়েছিল । সেখানে তিনি বেহালা বাজিয়ে শোনাবেন। আসলে তিনি ছিলেন উৎসবের মউজে মশগুল । বিজয়ানন্দে বিভোর । রত্ন সেটা লক্ষ করেনি ।

ভাইবোনের কথাবার্তায় ক্ষণকালের জন্যে ছেদ পড়ল । পরক্ষণেই গৌরী তার

চাউনি ফিরিয়ে নিয়ে মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিল । জ্যোতি গিয়ে কাননের পাশে বসল । আর রত্ন ? রত্ন আসন নিল ফরাসের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়ে । যেখানে থেকে গৌরীকে দু'নয়ন ভরে দেখা যায়, দু'নয়নে ভরে নেওয়া যায়, অথচ ধরা পড়ে যাওয়া সহজ নয় । রত্ন নিরীক্ষণ করতে চায় দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব । তাই দর্পণের অত কাছে যাবে না ।

গৌরী ভেবেছিল বত্ন জ্যোতির অনুসরণে দিওয়ানের উপর গিয়ে বসবে । তা যখন হলো না তখন গৌরী অপ্রতিভ ও অস্থির হয়ে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে রত্নর দিকে আড় চোখে তাকাতে থাকল । তার পর সাহস করে মুখোমুখি চাইল । চাইতেই চার চোখ এক হলো । এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ । গৌরী যেন ধরা পড়ে গেল । রত্নও। চোখ নামিয়ে গৌরী ফিরে গেল কথাবার্তায় । আর রত্ন নিমগ্ন হলো ধ্যানে । ভাব-গৌরীর সঙ্গে সে মিলিয়ে নিচ্ছিল বস্তু-গৌরীকে । নিত্য গৌরীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ গৌরীকে । মোহভঙ্গ? না, তার মোহভঙ্গ হয়নি । মনে মনে সে তার ধন্যতা জানাল দেবতাকে। যাঁর দর্শন পেয়েছে নারীরূপে । গৌরীরূপে ।

তার পর এমন হলো যে রত্ন নয়ন মুদলেই গৌরীর দৃষ্টি তার অঙ্গ ছুঁয়ে যায় । নয়ন মেললেই ও দুটি আঁখিপাখী উড়ে পালায় । গৌরীও গোপনে গোপনে মিলিয়ে নিচ্ছিল তার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে । নিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষকে । মোহভঙ্গ ? হয়তো তাই । হয়তো তা নয় । হয়তো মাঝামাঝি একটা অনুভব । রত্নর কানে আসছিল অশ্রুত কণ্ঠস্বর । শুনে অবাক লাগছিল। সে আস্বাদন করছিল ধ্বনিমাধুরী । কোমল, ললিত, অনুচ্চ, ত্বরিত, উত্তেজিত, বালিকাসুলভ । সে কিন্তু কথা বলছিল না । ওরা যেখানে দু'জন সেখানে যেমন কূজন করা যায় ওরা যেখানে চার জনের দু'জন সেখানে কি তেমন চলে ! গৌরীকে নিভৃতে না পেলে সে মুখ খুলবে না । সে তিন জনের একজন হবে না । কানন ও জ্যোতির সমান হবে না । সে হবে একজনের একজন ।

ফরাস এসে দেয়ালগিরি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল । রত্ন চেয়ে দেখল একজনের গালদুটি ডালিমফুলের মতো রাঙা। ঠোঁটদুটি আনারের মতো রক্তিম । চোখদুটিতেও গনগনে কয়লার আগুনের মতো আভা । সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ মরীয়া ভাব । বাঘিনী যেন শিকারীর দ্বারা কোণঠাসা হয়েছে । পালাবার পথ নেই । ঝাঁপাতেও বল নেই। গুলি বিঁধেছে । রত্নর খেয়াল ছিল না, খেয়াল হলো যে গৌরীর মুখে হাসি নেই, চোখে হাসি নেই, কানন তাকে হাসির কথা বলে হাসাতে পারেনি । রত্ন আরো ভালো করে চেয়ে দেখল গৌরীর গায়ের রং কেয়াফুলের মতো । ঠিক শুভ্র নয় । দুধের উপর ঘন সর পড়লে দেখতে যেমন হয় । পরনে মিহি ঢাকাই শাড়ী । শাদা । জরি পাড় । দু'হাতে দু'গাছি সোনা বাঁধানো শাঁখা । একগাছি নোয়া । সিঁথিতে বা কপালে সিঁদুর ছিল না । কুমারী বলে ভ্রম হয় । কিশোরী বলেও । মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ষোড়শী কি সপ্তদশী । সে ভুল ভেঙে যায় বুকের দিকে তাকালে । সেই যে বজ্রশ্রীর মূর্তি তারই মতো ভরাট বুক । আঁটসাঁট ব্লাউস তাকে আরো প্রকট করেছে। বজ্রশ্রী মতো ও মেয়ে বজ্র দিয়ে গড়া । তেমনি বলিষ্ঠ গড়ন । সুবলিত সুঠাম। কমনীয় । রমণীয় । আঁচল দিয়ে ফুটে

বেরোচ্ছে বিপুল কৃষ্ণ কেশভার। বকুলফুলের হার দিয়ে জড়ানো এলো খোঁপা।

আরতির সময় হলো। এখনি গোরী উঠবে। আর কবে দেখা হবে কে জানে! হয়তো এই প্রথম এই শেষ। রত্ন ক্রমে উতলা বোধ করছিল নিভৃত আলাপের জন্যে। উৎকণ্ঠিত বোধ করছিল কী হয়েছে জানতে। ক্ষয়ে যাবার মতো চেহারা তো নয়। চোখে দেখে তো মনে হয় না তেমন কোনো অসুখ। জ্যোতি ঠাহর করতে পেরেছিল রত্নর মনের অবস্থা। কাননকে পিছন থেকে জামা ধরে টানছিল। কাননও নড়বে না, গোরীও তাকে নড়তে দেবে না। অফুরন্ত বাজে বকবে। রত্ন অবশেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। গোরী ওকে না-মঞ্জুর করেছে।

এমন সময় ভেসে এলো বেহালার লীলায়িত নিঃস্বন। কানন অমনি লাফ দিয়ে উঠল। বলল, 'আঃ! সেরেনেড!' সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার পিছু পিছু জ্যোতিও। রত্নও উঠে দাঁড়াল। উদাস নেত্রে শেষ বারের মতো গোরীর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই ও তাকে চোখের ইশারায় ডাকল। কাছে যেতেই আঁখিঠারে পাশে বসতে বলল। তার বুকে তখন তাণ্ডব।

দেখতে দেখতে গোরীর মুখচ্ছবি বদলে গেল। সে মুখে অপরিসীম মাধুর্য। হিঙ্গুলবর্ণ সূর্য অস্ত গেলে যেমন রূপোর থালার মতো চাঁদ হাসে। কোথায় প্রভাতবর্ণিত প্যাশন! এ যে বড় কচি মেয়ে! বড় মিষ্টি মেয়ে! জ্যোৎস্নার মতো জ্যোৎস্না-গোরীর রূপ। রত্ন সে রূপ দুই নয়নে ভরে নিল। সে রূপ চেতনা ছাইল। চেতনায় আর কোনো নারী নেই। আছে শুধু গোরী। চিরনবীনা কিশোরী। চিরন্তনী পিয়ারী। এই নারীই সব নারী। সব নারীই এই নারী। এই একজনকে ভালোবাসতে জানলে সব নারীকে ভালোবাসা হয়। আর কাউকে ভালোবাসতে হয় না।

গোরী একটু একটু করে তার কাছে আরো কাছে সরে সরে আসছিল। ওর তনুসুগন্ধ কী নির্মল! কী সুঘ্রাণ! রত্নর নয়ন তৃপ্ত হয়েছিল, শ্রবণ তৃপ্ত হয়েছিল। নাসাও তৃপ্ত হলো। বাকী রইল স্পর্শ। সে সবিস্ময়ে ভাবছিল তাও কি সম্ভব! গোরী ওর কবরী থেকে বকুলফুলের হার খুলে নিয়ে রত্নর ডান হাতের মণিবন্ধে রাখীর মতো করে বাঁধল। রত্ন আর কোথায় পাবে! ওই ফুলমালার আধখানা সে গোরীর বাঁ হাতের মণিবন্ধে বাঁধতে যেতেই গোরী ডান হাত বাড়িয়ে দিল। তখন ডান হাতে গ্রন্থি পড়ল। গোরী তার হাত ছেড়ে দিল না।

এর পর কথা। গোরীই প্রথমে বলল। মৃদু স্বরে। 'তোর সঙ্গে আমার প্রণয় প্রতিযোগিতা। কে বেশী ভালোবাসে? তুই না আমি?'

রত্ন বলল অস্ফুট স্বরে, 'তুই।' বলে লজ্জায় মিলিয়ে গেল।

গোরী বলল মুগ্ধের মতো, 'না। তুই। ক্ষীরের পুতুলের মতো তুই ভালোবাসা দিয়ে গড়া। তোর সঙ্গে আমি পারি! তবে তোর কাছেই আমি শিখছি। আমি তোর শিষ্যা।'

রত্ন ধন্য হলো। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আজ তোর সারাদিন খাওয়া হয়নি।'

গোরী সোল্লাসে বলল, 'প্রসাদ আসবে। তুই আমার সঙ্গে খাবি?'

রত্ন সাগ্রহে বলল, 'খাব । কিন্তু তোর আরতির কী হবে ?'
গৌরী তার চোখে চোখ রেখে মধুর হেসে বলল, 'এই যে । আরতি করছি ।'
এমনি করে প্রতিমাভঙ্গকারী প্রতিমায় পরিণত হলো ।

১৯৫৬-৫৭

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

রত্ন ও শ্রীমতী

তৃতীয় ভাগ

ভূমিকা

কথা ছিল "রত্ন ও শ্রীমতী" পাঁচ ভাগে সমাপ্ত হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লেখার পর আমি একটু দম নিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ জাপানযাত্রার নিমন্ত্রণ আসে। জাপান থেকে ফিরে ওদেশ সম্বন্ধে একখানা বই লিখতে মাসের পর মাস মশগুল থাকি। জাপানের নেশার ঘোর যেন কাটতেই চায় না। সে এক অপূর্ব অনুভূতি।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমার মন খারাপ হয়, সুর কেটে যায়। আমি স্থির করি "রত্ন ও শ্রীমতী" আর লিখব না। কারণ বাদসাদ দিয়ে বা অদলবদল করে লেখার চেয়ে না লেখাই ভালো। কাহিনীর সামান্যতম খুঁটিনাটি চাপা দিলেও তার অর্থহানি হয়। কাহিনী যে শোনাবে তার কি সে অধিকার আছে?

লিখব না, একথা আমি প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ঘোষণাও করে দিই। জোর করে মনকে বোঝাই যে মরে গেলেও তো বই অসমাপ্ত থাকত। মহৎ শিল্পীরা তো ইচ্ছে করেই তাঁদের সৃষ্টি অসমাপ্ত রেখে গেছেন। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনা লিসার চোখের ভুরু দুটি কোথায়? সেজানের অনেক ছবির মাঝে মাঝে ফাঁক। রং দেননি। ঠিক রংটি খুঁজে পাননি। কোলরিজের কুবলা খানও তো অসমাপ্ত। তবু অনবদ্য। আমার এই কাহিনীও তেমনি অসমাপ্ত তথা অনবদ্য হতে পারে।

কিন্তু এই যুক্তির অপর পিঠে ছিল আর একটি যুক্তি। "রত্ন ও শ্রীমতী" অসমাপ্ত থেকে গেলে তার পরবর্তী উপন্যাসপর্যায়ও অলিখিত রয়ে যায়। এ কাহিনী শেষ না করে পরের কাহিনীগুলিতে হাত দেওয়া যায় না। প্রত্যেকটি কাহিনীই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবু একটির সঙ্গে পারম্পর্য রক্ষা না করে আরেকটির অবতারণা করতে পারিনে। পরবর্তী ধাপগুলির কথা ভেবে এই ধাপটি পুরোপুরি অতিক্রম করা আবশ্যক। কাজেই মোনা লিসার নজীর এক্ষেত্রে খাটে না। যদি খাটাতে যাই তা হলে আমাকে পরবর্তী পর্যায়ের একাধিক উপন্যাসের মায়া কাটাতে হয়।

এত বড়ো একটা ত্যাগস্বীকার কেই বা আমার কাছে প্রত্যাশা করে? পাঠকসাধারণ তো "রত্ন ও শ্রীমতী"-র সমাপ্তির জন্যেই অধীর। প্রকাশকও আমাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেন যে আমি প্রতিশ্রুত। যে উপন্যাস কোনোদিন সমাপ্ত হবে না সে উপন্যাস কোনোদিন কেউ কিনবে না। হায়, কেন আমি প্রথমভাগের ভূমিকায় জানাতে গেলুম যে, বই পাঁচভাগে সারা হবে। তখন কিছু না বললেই হতো। এখন এই সমস্যার থেকে উদ্ধার পাই কী করে? দ্বিতীয়ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণে একটি উপসংহার জুড়ে দিলে কেমন হয়? যারা শেষটা জানতে চায় তারা শেষটা জানতে পাবে। সেইখানেই ইতি।

এমনি আমার বরাত যে দ্বিতীয়ভাগ নিঃশেষিত হতে চোদ্দ বছর লেগে যায়।

ইতিমধ্যে আমি নিষ্ক্রিয় বসে না থেকে পরবর্তী পর্যায়ের উপন্যাসমালায় হাত দিই। জীবন অনিশ্চিত, বয়সও তো ষাট বছর পেরিয়ে গেছে। লেখা হয় "বিশল্যকরণী" ও "তৃষ্ণার জল"। ও দুটি বই যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ তা হলেও ওদের মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য রয়েছে। ওরা একই সূত্রে গ্রথিত। সে সূত্র "রত্ন ও শ্রীমতী"-র ধারাবাহী। অথচ তার থেকে বিযুক্ত। কারণ মাঝখানের অংশটুকু অলিখিত। যত কমেই হোক না কেন, সেটুকু লেখা উচিত ছিল। অন্তত দ্বিতীয়ভাগের উপসংহার হিসাবে।

হারিয়ে যাওয়া খেই ধরিয়ে দিতে হলে দ্বিতীয়ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে অপেক্ষা না করে সোজাসুজি তৃতীয়ভাগে হাত দিতে হয়। অনেকদিন ধরে অনেকবার অন্তর মন্থন করে আমি এই নির্দেশ পাই যে তৃতীয়ভাগ লিখতেই হবে আর সেই তৃতীয়ভাগই হবে শেষভাগ। চতুর্থ পঞ্চমভাগ হবে তারই সামিল। আয়ুষ্কাল আর কতদিন জানিনে, চতুর্থ পঞ্চমভাগ লিখতে গিয়ে যদি ফুরিয়ে যায় "তৃষ্ণার জল"-এর অনুবৃত্তি এ জীবনে হবার নয়। এখনো তো আমার বক্তব্যের আসল কথাটাই বাকী। যা বলতে আমি এসেছি। এসব তার উপক্রমণিকামাত্র।

একদিন আমাকে কোমর বেঁধে বসে যেতেই হলো। তৃতীয়ভাগ লিখতে। কিন্তু বারো বছর আগে লিখলে যেমন প্রাণ খুলে লিখতে পারতুম এখন আব তেমন নয়। এখন আমি সাবধানী হয়েছি। পদে পদে আদেশ পাই, "মা লিখ।" কে কী মনে করবে! যৌবনে এ ভাবনা ছিল না। তখন আমি অকুতোভয়। কিন্তু এখন আমি রেসপেকটেবল গৃহস্থ ও প্রবীণ সাহিত্যিক। আমার কি সব কিছু লেখা মানায! তা ছাড়া আরো নিগূঢ় কারণ আছে, যা অব্যক্তই থেকে যাওযা ভালো। আমি নিজেকে যতটা স্বাধীন ভেবেছিলুম ততটা স্বাধীন নই।

একটি জায়গায় কাহিনীটির রদবদল করেছি। নইলে এক পাও এগোনো যেত না। এক অদৃশ্য শক্তি কলম চেপে ধরত। এগোবার জন্যেই পিছিয়েছি। এটাও একপ্রকার পরাজয়। আমি পরাজিত। অপরাজিত থাকতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু তা হলে লেখা বন্ধ থাকত। বারো বছর তো বন্ধ রেখে দেখলুম তার ফল কী হয়। ফল হয় নিষ্ফলতা। বন্ধ্যাত্ব। জেদেরও একটা সীমা আছে। বাবো বছর বড়ো কম সময় নয়। বিশেষত এ বয়সে। তাই সব দিক বিবেচনা করে কাহিনীর শেষ পৃষ্ঠাটি লিখলুম ১৫ই মার্চ ১৯৭১ তারিখে। সেদিন আমার জন্মদিন। সাতষট্টি পূর্ণ হলো। প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হলো। বত্রিশ বছর বয়সের প্রতিশ্রুতি।

অন্নদাশঙ্কর রায়

পাদটীকা :

এই উপাখ্যানের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কারো সঙ্গে কোনরকম সাদৃশ্য দেখলেই তাকে সেই ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না।

এক

আহা, সেই দুর্লভ ক্ষণটি যদি অনন্তক্ষণ হতো! আর সেই নিভৃত কক্ষটি নিকুঞ্জবন! তা হলে কি প্রেমের দেবতার কাছে ওদের দু'জনের আর কোনো বরপ্রার্থনা থাকত!

আরতির যেন বিরতি নেই। ক্লান্ত হয়ে আসে দু'জোড়া অনিমেষ নয়ন। যার আগে পলক পড়বে, তারই হার হবে। গোরী হার মানবে তেমন মেয়েই নয়। রত্নও কি সহজে হার মানত? কিন্তু তার যে সারা রাত জাগরণে কেটেছে।

আরতির পর ভোগ। গৃহদেবতা মাধবের প্রসাদ রত্নর সামনে রেখে পাখা হাতে বাতাস করে গোরী। নিজের ভাগটা সরিয়ে দেয় এক কোণে। রত্নর অনুযোগ কানে তোলে না। কে জানে কেন ওর দুই চোখে বাদল ঘনিয়ে আসে। হয়তো বিদায়ের কথা ভেবে। আর একটু বাদেই তো রত্ন অদর্শন হয়ে যাবে।

ও ছেলে জানত না কেন অসময়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর কয়েকটা দিন গেলেই তো ইলোপমেন্ট। গোরীকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা। জ্যোতিদাও সাথী হতো। হঠাৎ কী এমন ঘটল? কেউ ওকে খুলে বলছে না কেন? কানন নীরব। জ্যোতিদার বদনে বিষাদের ছায়া। গোরীর ভাবটাও কেমন থমথমে।

তবে কি সমস্ত জানাজানি হয়ে গেছে? ইলোপমেন্ট বন্ধ? রেঙ্গুন দূর অস্ত?

"কই, খাচ্ছিসনে তো?" গোরী পীড়াপীড়ি করে।

"আমি যে ঠাকুরদেবতা মানিনে। প্রসাদ সেবা করা কি ঠিক হবে?" রত্ন হাসে।

"বুঝেছি। আমার যেখানে অসম্মান, সেখানে তুই জলস্পর্শ করবি কী করে? তা হলেও, লক্ষ্মীটি, মাধবের অমর্যাদা করিসনে। তুই না মানিস, আমি তো মানি।" বলতে বলতে গোরীর গলা ধরে আসে। ওর চোখের এক ফোঁটা জল রত্নর পাতে পড়ে।

"ও কী! তুই কাঁদছিস! কেন, কী হয়েছে? একটু পরে চলে যাচ্ছি বলে? আচ্ছা, আবার তো ক'দিন বাদে দেখা হবে।" রত্ন এক টুকরো মালপোয়া ভেঙে নিয়ে মুখে দেয়।

গোরী তা দেখে হেসে ওঠে। "দেখছি আমাকেই খাইয়ে দিতে হবে। নয়তো ওটুকু শেষ করতেই এক ঘণ্টা লেগে যাবে মহাপ্রভুর।"

দরজা জানালা খোলা। কে কখন উঁকি মেরে লক্ষ করবে! কথাবার্তাও যে কেউ আড়ি পেতে শুনবে না তা নয়। এই নির্বান্ধব পুরীতে রত্ন পুরোমাত্রায় হুঁশিয়ার।

এমন ভাগ্য ক'জনের হয় যে, মালপোয়াতে পায় লবণাক্ত স্বাদ। প্রিয়ার অশ্রুর মাধুর্য আস্বাদন করে। অপূর্ব! অপূর্ব!

ও ছেলের স্বভাবটাই এমন যে, কাউকে কাঁদতে দেখলে ওরও কান্না পায়। কোনো

মতে আত্মসংবরণ করে গৌরীকে বলে, "ছি! কাঁদতে নেই। এটা তো আমাদের বিদায় নয়, এটা পুনর্দর্শনায় চ।"

গৌরী এবার দু' হাতে দু' চোখ চেপে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বারবার মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝায় যে, তা নয়। তা নয়। রত্নর মনে খটকা বাধে।

"আমার কাছে তোর তো কিছু গোপন নেই। গোরী, বল কী হয়েছে। আমি তো তৈরী। আমি পিছিয়ে যাব না।" রত্ন আশ্বাস দেয়।

গৌরী কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়। মাটির দিকে মুখ করে থেমে থেমে বলে, "আমরা দুটি স্রোতের ফুল ভাসতে ভাসতে এক ঠাঁই হয়েছি আজ। কাল আবার ভাসতে ভাসতে দূর থেকে দূরে সরে যাব। এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা, মানিক।"

"সে কী!" রত্ন ভীষণ শক পায়। প্রথম দেখাই শেষ দেখা!

"তোর কাছে আমার কোনো কথা গোপন নেই, তাই বলছি। আমি ওঁর কাছে হেরে গেছি, মানিক। ওঁর বাণ আমার বুকে বিঁধে রয়েছে। তারই জ্বালায় মরে যাচ্ছি আমি। মরে যাব শুনে ওঁরা তোকে ডেকে পাঠান। যদি তোর মুখ চেয়ে আমি বাঁচি। কিন্তু বাণবিদ্ধ হরিণ কি বাঁচে!" গৌরী করুণ চক্ষে তাকায়।

এর হয়তো কোনো সাঙ্কেতিক অর্থ আছে। কিন্তু রত্নর কাছে প্রহেলিকা। কানন বা জ্যোতি ওকে আভাসটুকুও দেয়নি। গৌরী যদি মরে যায় রত্নও কি বেঁচে থাকবে!

"আমি যে বুঝতেই পারছিনে কী হয়েছে, মণি। কী করলে তোর প্রাণ রক্ষা হয়?" রত্ন কাতর কণ্ঠে সুধায়।

"আমি কি জানতুম এরকম অঘটন ঘটবে!" গৌরী কাঁপতে কাঁপতে বলে। "এর আর কোনো কাটান নেই। একে অঘটিত করা যায় না। পালিয়ে গিয়ে এর হাত থেকে মুক্তি নেই। আমার মুক্তির আশা মিলিয়ে গেছে। তাই আমার পরমায়ুও ফুরিয়েছে। আমি আর বাঁচব না, মানিক!"

"তা হলে আমারও দিন ফুরিয়ে এল।" রত্নর অন্তর থেকে উঠে আসে।

"না, না। ও কী বলছিস, ধন! তোর কত বড়ো ভবিষ্যৎ। তোর জীবনে আরও কত প্রেম আসবে। আর পুরুষমানুষের জীবনে প্রেমই কি সব! তোকে কীর্তি রেখে যেতে হবে। আমার মুক্তি তো হবার নয়। এখন দেশকে মুক্ত কর। তোর কাছে এই আমার অন্তিম বাণী। আমার শক্তি আমি তোকে দিয়ে গেলুম, ধন।" গৌরী ওর খোঁপা থেকে একটি মল্লিকা খুলে রত্নর হাতে দেয়।

রত্ন তখনও অর্থভেদ করতে পারেনি। বিহ্বল বোধ করে। বলে, "দেশের আরও কোটি কোটি সন্তান রয়েছে। দেশকে তারাই মুক্ত করবে। তোর আর কে আছে, গৌরী? আর কে তোকে মুক্ত করবে? আমি তো এখনও ব্যর্থ হইনি। তবে কেন তুই ছেড়ে দিচ্ছিস মুক্তির আশা?"

"তা হলে তোকে আরও খুলে বলতে হয়। আমার ধারণা ছিল তুই বুদ্ধিমান। তুই যে এমন নিরেট তা আমি কী করে জানব!" বলতে গিয়ে গৌরী রেগে ওঠে। "তোকে লিখব ভেবেছিলুম। হাত ওঠেনি। কে জানে যদি তোর হার্ট ফেল করে! কিংবা আমার

উপর তোর ঘেন্না ধরে যায়!"

"এমন কী কথা যে, হার্ট ফেল করত। ঘেন্না ধরে যেত!" রত্ন বিমূঢ় হয়।

"আচ্ছা, তোর তো চমৎকার সূক্ষ্মদৃষ্টি। কত কী তোর চোখে পড়ে যা আর কারও চোখে পড়ে না। তোর চিঠিপত্রে তার পরিচয় পেয়েছি। আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক দেখি। কিছু দেখছিস যা ফোটোতে দেখিসনি?" গোরী রহস্যপূর্ণভাবে বলে।

অস্বাভাবিক পাণ্ডুর। কিন্তু তার তো কত রকম কারণ থাকতে পারে। রত্ন ঠাহর করতে অক্ষম হয়। বলে, "আমি কি ডাক্তার, না বদ্দি?"

"তোর সঙ্গে", গোরী আস্তে আস্তে বলে, "আমার বিনি সুতোর ডোর! সেইজন্যে মনে করেছিলুম তুই বিনে কথায় টের পাবি। আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে কেন? আর এ কি মুখে বলবার মতো কথা?"

"তা হলে আমি জানব কেমন করে কী হয়েছে? কী বৃত্তান্ত? কী ব্যাপার?" রত্ন উদ্ভ্রান্ত হয়ে বলে। "তবে এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইলোপমেন্ট হবার নয়। কিন্তু কেন হবার নয় সেটা আমার কাছে একটা হেঁয়ালি!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর গোরী বলে, "আচ্ছা, আমি তোকে চিঠি লিখেই জানাব। তখন তোর সামনাসামনি হতে হবে না।"

"কেন, আমি কি বাঘ, না ভালুক?" রত্ন অভয় দিয়ে বলে, "তোকে খাব না।"

"লেডী ডাক্তার যেদিন ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যান সেইদিনই আমি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে চেয়েছিলুম। সবাই মিলে ধরে আটক করে রাখে। নইলে কি তোর সঙ্গে এ জন্মে দেখা হতো, মানিক?" গোরী ঝরঝর করে চোখের জল ঝরায়।

একচক্ষু হরিণের মতো রত্ন কেবল একটা দিকই দেখেছে। ভাবতেই পারেনি যে, আরও একটা দিক আছে ও সেই দিক থেকে বাণ এসে তাকেও বিদ্ধ করবে। ক্ষণকালের জন্যে তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সপ্রতিভভাবে বলে, "ওঃ, এই কথা! অভিনন্দন আমারও। তোকে।"

গোরী ওর কাছে অভিনন্দন আশা করেনি। আশঙ্কা করেছিল বিরাগ, বিতৃষ্ণা, হেয়জ্ঞান। পরাজিতা নারীকে কেই বা শ্রদ্ধা করে বা ভালোবাসে! অভিনন্দিত হয়ে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন মেঘের কোলে রোদ।

"কিন্তু কেন? অভিনন্দন কেন? আমাকে কেন? এ যুদ্ধে আমি তো জানি আমার হার হয়েছে। এতদিন বলে এসেছিলুম আমি অপরাজিতা, এখন পরাজয়ের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে আর ও কথা মুখে আনতে পারব না। আর এ প্রাণ রাখব না। হায়, হায়, কেন যে এমন হলো!" গোরীর দুই গাল জুড়ে প্লাবন।

"আমার চোখে তো তুই অপরাজিতা।" রত্ন আন্তরিকতার সঙ্গে বলে।

"তোর চোখে সব কিছু সুন্দর। এ জগতে কোথাও কিছু অসুন্দর নয়। তুই মরমী। তুই মিস্টিক। তুই মিষ্টি। তুই মধুর।" গোরী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

রত্ন তা শুনে আশ্বস্ত হয়ে ভাবে, যাক, গোরী তা হলে বাঁচবে। কিন্তু ভবী ভোলে

না। গোরী কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কিন্তু আমার জীবনে সৌন্দর্য কোথায়? আমি তো কালো ছাড়া আলো দেখতে পাইনে। এই ক'দিন আমি অন্ধকার দেখেছি। তুই কীভাবে নিবি। বজ্রাহত হবি কি না। হেয়জ্ঞান করে ত্যাগ করবি কি না। আর কোনোদিন আমি মুক্তির সুযোগ ও সাথী পাব কি না। যিনি আসছেন তিনি কোনোদিন যেতে দেবেন কি না। যিনি জিতলেন তিনি আমাকে পদে পদে অপমান করবেন কি না। এই সমস্ত ভেবে ভেবে আমার জীবনের সাধ লোপ পেয়েছিল, মানিক। ভাগ্যে তোর সঙ্গে দেখা হল। এক ঝলক আলো এসে চোখে লাগল। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?" রত্ন অধীর হয়ে সুধায়।

"মুক্তি হতে হতে ফসকে গেল। উড়তে উড়তে পড়ে গেলুম ব্যাধের পাতা ফাঁদে। বাঁচতে বলিস তো বাঁচব। কিন্তু তোকে হারাব না তো?" গোরী সলজ্জভাবে বলে।

"না, না, তা কি কখনও সম্ভব? তোর এই বিপদে আমি কি তোকে ছাড়তে পারি? মনে রাখিস, মণি, আমি হচ্ছি মধ্যযুগের নাইট। আর তুই হলি লেডী ইন ডিসট্রেস। তোকে পাশমুক্ত করাই আমার ব্রত।" রত্ন কথা দেয়।

গোরী যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিল। এই বাগদানের। সেও তেমনি বাক্য দিল, "তোর জন্যেই বাঁচব, মানিক। তোর হাতে শাপমোচনের জন্যেই বাঁচব।"

দু'জনে দু'জনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বিদায় তো নয়, পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু কোথায়, কবে, কতকাল পরে সবই অনিশ্চিত। নিশ্চিত শুধু এই যে, গোরীর জীবনের আশঙ্কা কেটে গেছে। ও বাঁচবে।

দুই

ডাক্তার যখন রুগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখন রুগীর আত্মীয়স্বজন তাঁকে ঘিরে ধরেন। ভাবখানা এই যে, কেমন দেখলেন, ডাক্তারবাবু, আশা আছে তো?

এও কতকটা সেইরকম। বৈঠকখানা ঘরে পা দিতেই সে ঘরে যাঁরা উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা সবাই ছুটে এলেন তার দিকে। যশোবাবু মানী ব্যক্তি, তিনি তো মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করবেন না, আর জ্যোতিও স্বভাবত স্বল্পভাষী। কাননই ওঁদের হয়ে জানতে চাইল, "মুশকিল, না আসান?"

"আসান।" শুনে কানন ওর হাতে ঝাঁকানি দিল। জ্যোতিও তাই করল। তাতাদাও রত্নর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রত্ন হাতে হাত রেখে অনুভব করল যে, তাঁর হাত কাঁপছে।

এই অবিশ্বাস্য সুসমাচারে ভদ্রলোকের যা উল্লাস। তিনি জনে জনে সাধতে লাগলেন, "আসুন, একটু সেলিব্রেট করা যাক।"

সে কথার অর্থ কী তা অনুমান করে রত্ন সভয়ে মাফ চেয়ে নেয়। সে এইমাত্র প্রসাদ পেয়েছে। এবার সকাল সকাল শুতে যেতে চায়। অনিদ্রায় ও পথ চলায় সে অবসন্ন।

পানভোজনে কাননের অনুৎসাহ ছিল না। তার চেয়ে আরও উৎসাহ তাতাদার বেহালা শ্রবণে। সে তখনকার মতো থেকে গেল। জ্যোতি হলো তাতাদার আত্মীয় তথা বন্ধু। কিন্তু কখনো পান করে না। ভোজন তার চাষাভুষার মতো, শোষক শ্রেণীর মতো নয়। রত্ন আশ্রমে ফিরতে উদ্যত দেখে সেও তার সঙ্গে চলল।

বেশ কিছু দূর নীরবে হাঁটার পর কথা বলল জ্যোতিই প্রথম। "ওর অবস্থার খবর আমরা তোমাকে দিইনি বলে তুমি কিছু মনে করনি তো, রতন?"

"না, মনে করব কেন?" রত্ন পালটা প্রশ্ন করে।

"আগে থাকতে জানতে পেলে তুমি খুবই বিব্রত বোধ করতে। তোমার প্রথম দর্শন আনন্দের হতো না। আশা করি আনন্দের পর নিরানন্দ এসে ছায়াপাত করেনি। কিন্তু আগে থেকে ছায়াপাত করলে ফল খারাপ হতো।" জ্যোতি দরদের সঙ্গে বলে।

জ্যোতি একটু একটু করে জেনে নেয় ওরা দু'জনে মিলে কী স্থির করল। পঁচিশে মে রেঙ্গুন যাত্রা হচ্ছে কি হচ্ছে না। জ্যোতিকেও তো সেই অনুসারে কাজ করতে হবে।

"আশ্চর্য! এ নিয়ে তো একটি কথাও হয়নি!" অপ্রতিভ হয় রত্ন।

"কথা বলতে চাও তো কাল আবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করব।" জ্যোতি প্রস্তাব করে।

"না, না। আর আমি ও বাড়ির ছায়া মাড়াব না। আমার আত্মসম্মানে বাধবে। গোরী যদি আশ্রমে এসে দেখা দেয় তো কথা হবে।" রত্ন পালটা প্রস্তাব করে।

"তাতে আবার ওঁদের মর্যাদায় বাধবে।" জ্যোতি জবাব দেয়।

রত্ন মনে মনে জানত যে, পঁচিশে মে রেঙ্গুনযাত্রা হবার নয়। নতুন আবির্ভাবের আলোয় সব কিছু নতুন করে ভাবতে হবে। পঁচিশে মে ওদের যথেষ্ট সময় দেবে না। বলে, "কাজ কি আর দেখাসাক্ষাৎ করে? ফল তো ওই একই যে, পঁচিশে মে বাতিল। পরে ভেবে চিন্তে আবার দিন ফেলা যাবে।"

জ্যোতি এ কথায় সায় দেয়। "রেঙ্গুনযাত্রার জরুরিত্ব আর নেই। যখন দিন ধার্য করেছিলুম তখন এই ভেবে করেছিলুম যে, সময়মতো ওকে না সরালে ও সন্তানসম্ভবা হবে। দেখা গেল দু' মাস দেরি হয়ে গেছে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এখন আর রেঙ্গুনযাত্রার তাড়া কিসের? ধীরেসুস্থে গেলেই চলবে। যদি আদৌ যাওয়া হয়।"

"না, না, যাওয়া বাতিল হবে না। শুধু পঁচিশে মে বাতিল হবে। আমি ওকে কথা দিয়েছি যে, ওকে মুক্ত করবই। সেই কথা শুনেই ও বাঁচতে রাজী হয়েছে। এর পরে কি পিছিয়ে যাওয়া চলে? দিন পিছিয়ে দেওয়া অন্য কথা।" রত্ন তার অভিমত জানায়।

"আচ্ছা, তাই হোক। ওর সঙ্গে আমার দেখা হলে ওকে বলব যে, এ যাত্রা নয়, কিন্তু হবে একদিন রেঙ্গুনযাত্রা। তার আগে নবাগতের কথাটিও ভাবতে হবে। মেটার্নিটি কেস ঘাড়ে করে পথে বেরয় যারা তাদের সম্বল আরও বেশী হওয়া উচিত। তা ছাড়া ঝুঁকিটিও তো কম নয়। এ শুধু একজনকে বাঁচানো নয়, দু'টি প্রাণকে বাঁচানো।" জ্যোতি বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

পঁচিশে মে অমনি করে পরিত্যক্ত হয়। ধরে নেওয়া হয় যে, গোরীও একমত হবে।

রত্ন মনে করেছিল বিছানায় গা মেলে দিলেই ঘুম আপনি আসবে। দু' রাতের ঘুম। কিন্তু চোখ বুজে কেবল গৌরীর রূপ দেখতে থাকে। কী রূপ ! প্রিয়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কত বড়ো সৌভাগ্য ! অথচ কোথায় অবিমিশ্র আনন্দ ! কী অসুখী ওই মেয়েটি ! এর পরে আর বলতে পারবে না যে, ও কুমারী। সাক্ষ্যপ্রমাণ এখন ওর বিরুদ্ধে যাবে। বেচারি ! পাঁচ বছরের প্রতিরোধ একটি দিনেই ব্যর্থ।

আলোড়নের আরও একটা কারণ ছিল। সেটা এত গূঢ় যে, জ্যোতিদাকেও বলা যায় না। গৌরীকেও না। কাননকে তো নয়ই, কাউকেই না। রত্ন তার সেই গোপন ব্যথাটি গোপনেই বহন করে। তার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। এই প্রথম গৌরীর কাছ থেকে সে কিছু আড়াল করল।

রত্ন ও শ্রীমতীর শুভদৃষ্টির ক্ষণে দু'জনাতে একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। পুরুষ পরীক্ষা ও রমণী পরীক্ষা। রত্নর অন্তরাত্মা অনুভব করল যে, প্রেমিক হিসাবে সে পাস করলেও পুরুষ হিসাবে ফেল। গৌরীর চাউনিতে সেই দীপ্তি ছিল না যা এক মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠে তারই আলোয় জানিয়ে দিয়ে যায় যে, তুমি পুরুষ আমি নারী।

এটা হলো ইনটুইশন বা ইনস্টিংকটের ব্যাপার। যুক্তি দিয়ে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। গৌরী ওকে ভালোবাসে নিশ্চয়। অমন ভালোবাসা আর কেউ ওকে বাসেনি। কিন্তু ও ভালোবাসা হাতে রেখে ভালোবাসা। এমন কিছু হাতে রেখেছে যা পেলে পুরুষ জয়ী হয়, না পেলে প্রত্যাখ্যাত।

এটি ওর যেমন গোপন ব্যথা তেমনি একটি গোপন আশ্বাসও ছিল। গৌরীর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে প্রভাতের মুখে অপরিচিতার যে বর্ণনা শুনেছিল তা রত্নকে আতঙ্কিত করেছিল। ও মেয়ে নাকি প্যাশন দিয়ে গড়া । যার সঙ্গে পরিচয় কোনোদিন হবে কি না অজানা তার সম্বন্ধে এ আতঙ্ক সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পত্রযোগে পরিচয় হতে হতে প্রেম, প্রেম থেকে প্রথম দর্শন। রত্ন যা আশঙ্কা করেছিল তা নয়। এতখানি সময় ওর সঙ্গে নিরালায় কাটিয়েও প্যাশনের নামগন্ধ পায়নি ওর চেহারায় বা চোখে। রত্ন আশ্বস্ত হয়েছে। প্রভাতের ওটা হয়তো দৃষ্টিবিভ্রম। এমনও হতে পারে যে, নতুন আবির্ভাবের পর পুরাতন প্যাশন অন্তর্হিত হয়েছে। প্রকৃতি ওটা দিয়েছিল মাতৃত্বের প্রস্তাবনা রূপে। কিংবা পরাজয়ের বিষাদ ওকে আচ্ছন্ন করেছে বলে ওর সেই মোহিনী রূপ খুলছে না।

পরের দিন কানন ফিরল আশ্রমে। তার হাতে গৌরীর কয়েক ছত্র চিঠি। লিখেছে—

"কাল সারা রাত এ বাড়ীতে বিজয়োৎসব হয়েছে, জানিস। এমন হইহল্লা আমি জীবনে শুনিনি। আর এমন অপমানও আমি জীবনে পাইনি। এরই জন্যে কি তুই আমাকে বাঁচিয়ে রেখে গেলি। এই রাক্ষসপুরীতে ? সেই রাজকন্যার মতো ? তোর উপর আমি বিষম রাগ করেছি, মানিক। আমার বুঝতে বাকী নেই যে, তুই আমাকে ওঁর হাতেই তুলে দিতে চাস। ওঁরই কাজে এসেছিলি। তোর নিজের বলতে কোনো কাজ ছিল না। আমাকে বাঁচানো তোর নিজের জন্যে নয়। উনি এই ভেবে নাচছেন যে, বিজয়ীর মতো পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করবেন। কিন্তু ততদিন যদি আমি না বাঁচি !"

কাননের মুখে শোনা গেল যশোবাবু গৌরীকে একটি কথাও বলেননি। এমন কি অন্দরমহলেই যাননি। সারা রাত সদরমহলেই কাটিয়েছেন। কাননের অনুরোধে বেহালা বাজিয়েছেন, বয়স্যদের অনুরোধে বিলিতী গ্রামোফোনের রেকর্ড দিয়েছেন। আর পানভোজনের তো কথাই নেই। রামপক্ষীর সঙ্গে গঙ্গাজল। দীয়তাং নীয়তাং।

"তুমিও পান করেছিলে নাকি?" রত্ন চেপে ধরে।

"করব না কেন? বিশুদ্ধ গঙ্গাজল। বোতলটা শুধু স্কটলণ্ডে তৈরি।" কানন কবুল করে।

"গন্ধ থেকে টের পাওনি?" জ্যোতি জেরা করে।

"গন্ধটা কি জলের, না বোতলের?" কানন অম্লানবদনে বলে।

"আর স্বাদটা?" জ্যোতি হাসে।

"সেটাও বোতলের সংসর্গে।" শুনে সকলে গড়াগড়ি যায়।

এখন ওই বিলিতী গ্রামোফোনের রেকর্ডের একটাতে জয়যাত্রার বাজনা ছিল। সৈনিকরা যার সঙ্গে মার্চ করে যায়। কাননের তো ওটা অপূর্ব ঠেকেছিল। ওরই সনির্বন্ধ অনুরোধে ওটা বারবার বাজানো হয়।

সকালে যখন গৌরীর কাছ থেকে বিদায় নিতে যায় তখন দেখে ও মেয়ে অভিমানে কথা বলতেই চায় না। কেন বলবে? এত বড়ো অপমানের পরে কথা বলতে কার না গা জ্বালা করে! "কথা বলব কোন ছলে? কথা বলতে গা জ্বলে।"

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করে বোঝা গেল যশোবাবু রাত্রে অন্দরমহলে যাননি আর সদরে বসে যা করেছেন তা বিজয়োৎসব। যেন যুদ্ধে জিতেছেন। গৌরী অবশ্য খুলে বলেনি যুদ্ধটা কার সঙ্গে ও কী নিয়ে। কানন ঘুণাক্ষরেও জানে না। বোধ হয় শিকার অভিযানে সফল হয়েছেন। শিকারের নামে প্রাণিবধ গৌরী একেবারেই দেখতে পারে না। গৌরীর মুখেই কানন প্রথম শুনল যে, ও যা উদরস্থ করেছে তা রামপক্ষী নয়, চখা চখী। তা শুনে অবধি কানন মুসলমানের মতো তওবা তওবা করছে। কিন্তু গঙ্গজলের জন্যে নয়।

এই স্থির হলো যে, জ্যোতি গিয়ে গৌরীকে শান্ত করবে। রত্ন এক টুকরো চিঠি লিখে জ্যোতির জিম্মা দিল। লিখল, "আমারই উচিত ছিল আনন্দ উৎসব করা। তোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কি সেলিব্রেট করবার মতো নয়? আর তোর ওই বাঁচতে রাজী হওয়া তো হাজারটা 'মার্চ' সঙ্গীতের যোগ্য। কল্পনা করা যাক যে, ওটা আমাদের দু'জনেরই উৎসব। তবে ওই নিরীহ পাখীগুলি বাদে। আর ওই তথাকথিত গঙ্গাজল।"

রত্নর মনে কিন্তু আনন্দের রেশ ছিল না। বাণ যেন ওর বুকেও বিঁধেছে। নিষ্ঠুর বাস্তব ওর স্বপ্ন ভঙ্গ করেছে।

তিন

ফিরতি পথে কানন আবার সাথী হয়। বন্ধুকে একান্তে পেয়ে বলে, "এতদিন মৌন থেকেছি বলে তোমার কাছে মাফ চাইছি, ভাই।"

"মাফ চাইবার কী আছে?" রত্ন আশ্বাস দেয়।

"তোমাকে আগে থাকতে বলতে পারতুম। কিন্তু তা হলে তোমার প্রথম দর্শনের সমস্ত রোমান্স মাটি হতো। সেই জন্যে জ্যোতিদা আমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন। আশা করি রোমান্সটা সানন্দে উপভোগ করেছ।" কানন অকপটে বলে।

"রোমান্সের পরপৃষ্ঠায় ট্র্যাজেডী। উপভোগ করতে পারে কেউ?" রত্ন অতি দুঃখে বলে। বিষাদ গোপন করতে পারে না।

"না, না, ট্র্যাজেডী নয়। ট্র্যাজেডী হতে পারত। হতে হতে হলো না। মনে কর পারুলদি যদি ওই আবিষ্কারটা বেগমপুরে না করে রেঙ্গুনে করত তা হলে কি সেই মুহূর্তে ইরাবতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত না? পারতে কি তোমরা তখন ওকে বাঁচাতে? তোমরাও পড়ে যেতে বিপদে। কেউ বিশ্বাস করত না যে তোমাদের একজন ওর মাতৃত্বের জন্যে দায়ী নয়। এক তাতাদা বাদ।" কানন বলে ভীত স্বরে।

রত্নও ভয় পেয়ে যায়। "তা হলে সত্যি ট্র্যাজিক হতো তা মানছি, ভাই কানন। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই।"

ও-কথা ও ছেলেবেলায় মার কাছে শিখেছিল। ওই ছিল তাঁর জীবনদর্শন।

"ভগবান আছেন কি না তাই আমি জানিনে। থাকলে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে আমি পঞ্চমুখ। পঁচিশে মে তোমাদের রেঙ্গুনযাত্রা একটা অযাত্রা হতো, যদি না-জেনে না-বুঝে তোমরা তিনজনে মিলে আঁধারে ঝাঁপ দিতে।" কানন মন্তব্য করে।

"কিন্তু ওটা তো আমার আইডিয়া নয়। জ্যোতিদার আইডিয়া। ওর মতে গোরীকে সরানো জরুরী। না সরালে প্রকৃতি যা চাইত তাই হতো। মানুষ পরাস্ত হতো। আহা, বেচারি কতকাল ধরে প্রতিরোধ করে এসেছিল।" রত্ন আপসোস করে।

"প্রকৃতিই জয়ী হলো। কিন্তু আমি হলে বলতুম, প্রকৃতি নয় নিয়তি।" কানন বলে।

"নিয়তি আমি মানিনে। প্রকৃতিই মানি। কিন্তু প্রকৃতি জয়ী হলো এটা আমি স্বীকার করব না। গোরী আমার চোখে অপরাজিতা।" রত্নর আনন উদ্ভাসিত হয়।

"তা হলে আর কী। ট্র্যাজেডী ভেবে কাতর হচ্ছ কেন!" কানন সান্ত্বনা দেয়।

"না, কাতর হব কেন? ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই।" রত্ন পুনরুক্তি করে।

চলতে চলতে কানন বলে "তুমি যদি চার পাঁচ দিন আগে ওর সঙ্গে দেখা করতে! তা হলে দেখতে কত তেজ ও মেয়ের। কী স্পিরিট! সে পারুলদি কি আর আছে! যাকে দেখলে সে ওর ছায়া। বেচারি একেবারে চুপসে গেছে।"

রত্নর চোখে গোরীর যে রূপ আঁকা হয়ে গেছে তাতে আলো আছে, আগুন নেই। মাত্র চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এত বড়ো তফাতটা ঘটেছে। ও কী করে জানবে!

"লেডী ডাক্তার যেদিন সদর থেকে এসে কনফার্ম করে যান তার আগে থেকেই ওর ভাবান্তর লক্ষ করা যাচ্ছিল। আমি সে সময় ছিলুম না। শোনা কথা। কনফার্ম করার একদিন পরেই জ্যোতিদাকে খবর দেওয়া হয়, তার পরের দিন আমাকে। কখনো কেউ শুনেছে সন্তানসম্ভাবনাকে এত ভয়? যেখানে আপনার স্বামীর। পরপুরুষের তো নয়।" কানন তাজ্জব বনে যায়।

"ও যে ওর স্বামীকেই পরপুরুষ জ্ঞান করে। ও যে কুমারী।" রত্ন সলজ্জভাবে বলে।

"হা হা! হো হো!" কানন হেসে অস্থির হয়।

"তোমার বিশ্বাস হয় না?" রত্নর খটকা বাধে।

"বিশ্বাস হবে না কেন? সেই সঙ্গে বেশ কিছু গোলমরিচ মিশিয়ে দিতে হয়। আর লবণ।" কানন তামাশা করে।

"তুমি দেখছি বদলে গেছ। আগে তো সরলভাবে বিশ্বাস করতে।" রত্ন অনুযোগ জানায়। তার বন্ধু তো আগে এমন ছিল না।

"তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে আমি তাতাদার সঙ্গেও মিশি। তাঁকেই বা আমি অবিশ্বাস করতে যাই কেন, যখন তিনি বলেন ওটা ন্যাকামি?" কানন কৈফিয়ত দেয়।

"ন্যাকামি!" রত্নর মনে লাগে।

"আমি হলে বলতুম বোকামি। আজকাল কতরকম প্রিকশন হয়েছে। ওই লেডী ডাক্তারকেই আগে কল দিলে উনিই শিখিয়ে দিয়ে যেতেন।" কানন ইঙ্গিত করে।

রত্ন রাগ করে বলে, "তুমি দেখছি সীনিক হয়ে উঠেছ।"

"আরে, না, না। আমি জানি কোন্‌টা কার পক্ষে স্বাভাবিক। পারুলদি যোগিনী ঋষিণী নয়। সেই জন্যেই তো ওকে সময় মতো সরানোর কথা উঠেছিল। আর ওর স্বামীকেও ও ঠিক পরের স্বামী মনে করে না। সেই ভয়েই তো ও ম'লো। তাতাদা আবার বিয়ে করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। ফোটো দেখছিলেন পাত্রীদের।" কানন বর্ণনা করে।

"থাক, ভাই, আর ভালো লাগছে না শুনতে।" থামিয়ে দেয় রত্ন।

অন্যান্য দু'-চার কথার পর গৌরীর প্রসঙ্গ পুনরায় ঘুরে ফিরে আসে। কানন বলে, "ও সত্যি তোমাকে ভালোবাসে। তুমি ভিন্ন আর কেউ ওকে ওর নিজের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। তুমিই হয়তো একদিন ওকে ওর স্বামীর অধীনতা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু মুক্ত হলেই যে ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে এ কথা কি ও তোমাকে বলেছে, না তুমি ওকে বলেছ? মুক্তি যে মিলনান্ত হবেই এমন কোনো কথা আছে কি?"

রত্ন স্বীকার করে যে, তেমন কোনো কথা নেই। কেউ কাউকে তেমন কোনো কথা বলেনি। মুক্তির পরে কী হবে সেটাকে মুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছে।

"পারুলদির সঙ্গে কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। ওর সঙ্গে কথাও হয়েছে এই নিয়ে। ও বিবাহ নামক বন্ধনটার হাত থেকেও মুক্তি চায়, কেবল স্বামীর অধীনতার হাত থেকে নয়। ও আবার নতুন করে বিয়ে করবে বলে আমার মনে হয় না। তোমার সঙ্গে

ওর সম্বন্ধটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা ও নিজেই জানে না। আপাতত তোমরা হবে কমরেড। কিন্তু কমরেড যারা হয়, তারা একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। যেমন ইউরোপের কমিউনিস্টরা। শুনেছি এদেশেও কমিউনিস্ট দেখা দিয়েছে।" কানন ভয়ে ভয়ে বলে নিচু সুরে।

"হাঁ, সেদিন ভ্যানগার্ড বলে একটা পত্রিকা দেখলুম। হাতে হাতে ঘুরছিল। কিন্তু খুব গোপনে।" রত্নও তেমনি শঙ্কিত।

"পারুলদি কিন্তু কমিউনিস্ট নয়। ও হতে চায় ঝাঁসীর রানী। রানী যা অসমাপ্ত রেখে গেছেন ও তাই সারা করবে। ও কাজে ওর যে কমরেড নেই তা নয়। তুমি যদি হও তবে অধিকন্তু।" কানন তার ধারণা ব্যক্ত করে।

"না, আমি ওর কমরেড হতে পারব না। ঝাঁসীর রানীর অসমাপ্ত কাজ আমার জীবনের কাজ নয়। ও আমাকে ভালোবাসে। আমি ওকে ভালোবাসি। ওর পরাধীন অবস্থায় পরকীয়া প্রেম আমার সহ্য হয় না। ও যাতে স্বাধীন হয় তার জন্যে আমি ওকে সাহায্য করতে রাজী। স্বাধীন হয়ে ও যদি আমার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটাকে পূর্ণতা দিতে চায় তা হলে আমি ধন্য হব। আমার মতে সেই পূর্ণতার নামই পরিণয়। লোকচক্ষে যাই হোক না কেন।" রত্ন আবেগের সঙ্গে বলে।

"আমার মতেও তাই। তবে লোকে তা মানবে না। মন্ত্র না পড়ে এদেশে কারো বিয়ে হয় না। মন্ত্র পড়তে তোমার আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু পারুলদি এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য লঙ্ঘন করবে না। কিন্তু গোড়ায় গলদ, ডিভোর্স পেলে তো ?" কানন ঘাড় নাড়ে।

"ওদিক থেকে ভাবিনি। তা ছাড়া আমিও স্বাধীন থাকতে চাই।" রত্ন বলে।

ঘুরে ফিরে আবার সেই পঁচিশে মের প্রসঙ্গই ওঠে। কানন বলে, "ওটা একটা ফলস স্টেপ হতো। কেন যে জ্যোতিদা তোমাকে অমন যুক্তি দিয়েছিলেন ! সন্তানসম্ভাবনার কথা বাদ দিলেও আপত্তির আরো কারণ ছিল। পারুলদি কখনো লক্ষ্মী মেয়েটির মতো লেখাপড়া নিয়ে থাকত না। বাহাদুর শার কবরে গিয়ে রোজ লক্ষ্মীবাঈকে স্মরণ করত। ওখানেও ওর একটা বাহিনী জুটে যেত। একবার মুক্তির স্বাদ পেলে কি ও দেশের মুক্তির দিকেই ঝুঁকত না ? তোমরা কি পারতে ওকে আয়ত্তে রাখতে ? প্রেমের জন্যে যারা ঘর ছাড়ে পারুলদি তাদের একজন নয়, ওটা তোমার ভুল। ও যদি ঘর ছাড়ে তবে কর্মের জন্যেই ছাড়বে।"

রত্ন এর প্রতিবাদ করে না। কে জানে হয়তো কাননের বক্তব্যটাই ঠিক কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে তবে তো ওটা ইলোপমেন্ট নয়।

"ইলোপমেন্ট !" কানন হেসে ওঠে। "ভাই রতন, ইলোপ যারা করে তারা দুজনে মিলে করে। তিনজনে মিলে নয়। তিনজনে মিলে প্রবাসে যাত্রা করলে ওর অর্থ দাঁড়াত ওটা ইলোপমেন্ট নয়। লোকের সন্দেহ দূর হতো। অপর পক্ষে কেউ বিশ্বাস করত না যে তোমরা নিঃস্বার্থ দুটি পুরুষ। অথবা নিষ্কাম।"

রত্ন মরমে মরে যায়। এবার প্রতিবাদ করে বলে, "কী অন্যায়। আমরা মনে মনে সংকল্প করেছিলুম যে গৌরীকে সম্পূর্ণ প্রোটেকশন দেব। যেমন পরের হাত থেকে

তেমনি নিজেদের হাত থেকে। আগে তো ও স্বাবলম্বী হোক, দাঁড়িয়ে যাক, তারপরে যদি আমার সঙ্গিনী হতে চায় তো আমি ওর সঙ্গী হব। সঙ্গী সঙ্গিনী, মনে রেখো। কমরেড নয়। কমরেড হয় তো জ্যোতিদা।"

"বুঝেছি, তোমরা মনে মনে ভূমিকা ভাগ করে নিয়েছিলে। তুমি হতে সঙ্গী, জ্যোতিদা হতেন কমরেড। অবশ্য গোড়া থেকেই নয়। মাঝখানে যেত একটা সময়ের ব্যবধান। ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে লায়েক করে দেওয়া হতো । চমৎকার, একটি রূপকথার মতো শুনতে। আমেরিকায় ওরকম হয় কিনা জানিনে। বোধহয় রাশিয়ার পুরাতন বিপ্লবীদের মধ্যে হতো। জ্যোতিদার দুই গুরু কিনা। কোন্ গুরুর শিক্ষা কে জানে ! কিন্তু দেশটা যে ভারত। আর মেয়েটি যে পারুলদি। আর তুমিও যে জ্যোতিদার মতো সংস্কারমুক্ত তা নয়। তুমি একটি রোমান্টিক প্রেমিক। শেলীর দোসর। অবিকল ইংরেজী কবিতার থেকে নেওয়া। কিন্তু ওরাও বিবাহিতা নায়িকাকে ডরায়।" কানন মন্তব্য করে।

চার

জীবনদেবতা যা করেছেন ভালোর জন্যেই করেছেন। তবু শ্রেয় কখনো প্রেয়র পরিবর্ত হতে পারে না। এ যেন মিষ্টিমুখ করতে ডেকে পঞ্চ তিক্ত কষায় খাওয়ানো।

বাড়ী ফিরে গিয়ে রত্ন কোনো কাজে মন দিতে পারে না। মুখটা যেন তেতো হয়ে রয়েছে। ও কি কোনোদিন প্রেমে পড়তে চেয়েছিল ? ও কি কোনোদিন বলেছিল, আমার সঙ্গে ইলোপ কর ? না। ওর প্রাণে একপ্রকার শঙ্কা ছিল। নারীকে ও গোরীকে।

একেই কি বলে গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া ? বিশ্বাস করা শক্ত যে জীবনে দ্বিতীয়বার এহেন সুযোগ আসবে।

কিন্তু ওটা কি সুযোগ না দুর্যোগ ? যার থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ বর্তে যায় তাকে বরঞ্চ সুযোগই বলতে হয়।

দেখতে দেখতে গোরীর চিঠি এসে পড়ল। চিঠিতে সে একবার তার স্বামীর উপর রেগে টং। একবার লেডী ডাক্তারের উপর। ও বিশ্বাস করতে পারছে না যে ওর সত্যি কিছু হয়েছে। ওর সন্দেহ লেডী ডাক্তার যশোবাবুর টাকা খেয়ে ওঁর মন রাখা কথা বলেছে। ও এখন ধুয়ো ধরেছে যে ওকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে।

"আমি যদি কলকাতা যাই তুই আসবি তো ? চেষ্টা করছি যাতে পঁচিশে মে তোর সঙ্গে দেখা হয়। রেঙ্গুনযাত্রার আশা নেই যদিও। এমন অনিশ্চিত অবস্থায় কি শুভযাত্রা হয় ? বেঁচে আছি এইটিই আমাকে প্রতিদিন আশ্চর্য করছে। কে বলে ভগবান আছে ! নেই। নেই। সব মিথ্যে। সব শূন্য।"

পরে ওর আরেক রকম মেজাজ। "আমি গোড়া থেকেই বলেছি যে দুনিয়ায় আরো ঢের ঢের জায়গা আছে। রেঙ্গুন ! যেখানকার লোক পচা মাছ খায়। ওই যে বলে, 'বর্মার ঙাপ্পিতে বাপ রে কী গন্ধ !' ও গন্ধ আমি এখানে বসেই নাকে শুঁকতে পাচ্ছি। তোমরা

অন্য কোনো জায়গার সন্ধান কর। যেখানকার মানুষ অমন ম্লেচ্ছ নয়।"

রত্নর হাসি পায়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হয় কে বলবে যে গোরী মেয়েটি সীরিয়াস। মুক্তি চায় যে তার কাছে রেঙ্গুনের মতো মুক্ত নারী আর কোথায়! বর্মার মেয়েরা ভারতের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী মুক্ত। বর্মায় না গিয়ে বিলেতে গেলেও তো সেই একই প্রশ্নই উঠবে। সেখানকার মানুষও তো ম্লেচ্ছ। বীফ ওদের খোরাক।

কিন্তু লেখে না ওসব কথা গোরীকে। আশা দেয় যে কলকাতায় দেখা করবে। এমনিতেই ও কলকাতায় যেত ললিতকে বিদায় দিতে। সে জাপানযাত্রী।

চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ভিড়েছে দেখে ললিতের যা আনন্দ রত্নর তার চেয়েও বেশী। ওটা যেন ওর জন্যেই ওসাকা থেকে এসেছে। ওকে রেঙ্গুনে নামিয়ে দিয়ে জাপানে ফিরে যাবে। ওর জন্যে আর ওর প্রিয়ার জন্যে আর ওদের দু'জনার বন্ধুর জন্যে। কিন্তু কী আপসোস। জ্যোতিদা ইতিমধ্যে প্যাসেজ ক্যানসেল করে দিয়েছে।

ললিতকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানানোর পালা শেষ হয়নি, এমন সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ি কোনখান থেকে এসে দাঁড়ায়। দুই পাল্লার মাঝখান থেকে উঁকি মারে একখানি মুখ। ও কে! গোরী। রত্ন তো হতবাক। আর ললিতের আকর্ণবিস্তৃত হাসি। ওর বৌও ছিল ওই গাড়িতে। তা ছাড়া আরো কয়েকজন পর্দানশীন।

রত্ন তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাহস হয় না যে এগিয়ে গিয়ে গোরীর সঙ্গে আলাপ করে। লোকচক্ষে ও কে। ললিতের একজন সহপাঠী বই তো নয়। এমন সময় নবনীর আবির্ভাব। "আরে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? সন্ধ্যার আকাশের তারা!"

জাহাজটা রাত্রে একসময় ছাড়বে। ততক্ষণ কেউ অপেক্ষা করবে না। ললিতকে বলা হয়েছে জাহাজেই ডিনার। সে ঘোড়ার গাড়ির কাছে গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে। গোরীর সঙ্গেও। কিন্তু রত্নকে ডেকে নিয়ে যায় না।

তখন ললিতই করুণা করে ওকে নিয়ে গিয়ে যথারীতি পরিচয় করিয়ে দেয়। যেন অপরিচিতার সঙ্গে অপরিচিতের পরিচয়। অথচ এটা তো ওদেরই স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী।

অত লোকের সামনে বেশী কথা বলা যায় না। গোরী বলে, "আপনাদেব সাত ভাই চম্পার সব খবর আমার জানা। আপনিও আমাব অচেনা নন। ললিত আমার কাছে প্রায়ই আপনার গল্প করত। আচ্ছা, আপনার কি সময় হবে কাল দুপুবে? খাবেন আমাদের ওখানে?"

ললিতকেও আগে থেকে তালিম দেওয়া হয়েছিল। সে বলল, "সাত ভাই চম্পার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমরা দু'জনে মিলে আলোচনা করলে আমিও সুখী হব।"

নবনীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার চিন্তা ছিল রত্নর মনে। ও এমন লাজুক যে পরের বাড়ী যেতে ভয় পায় একজন সঙ্গী না হলে। কিন্তু গোরীর কটাক্ষ থেকে অনুমান করে যে, সাক্ষাৎটা শুধু ওদের দু'জনাতে! নবনীকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিল না গোরীর সঙ্গে। যদিও ওরা অপিরিচিত নয়। পর্দানশীনদের গাড়ির দিকে ঘেঁষতেই সাহস হলো না নবনীর।

গোরীদের গাড়ি চলে যাবার পর নবনী বলে রত্নকে, "ভদ্রমহিলাটি কে, বল তো?

ললিতের কেউ হন?"

রত্ন ওর কানে কানে বলে, "শ্রীমতী।"

রত্ন ও শ্রীমতীর ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে এ সম্বন্ধে নবনী একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিল না। ও হয়তো মূর্চ্ছা যেত যদি শুনত যে ওই জাহাজেই ওরা পালাতে যাচ্ছিল।

"আমাকে কেন আলাপ করিয়ে দিলে না, ভাই?" নবনীর খেদ।

"আমি আলাপ করিয়ে দেবার কে? উনি তো ললিতের আত্মীয়া। আমার কেউ নন। আর তুমি যে একজন বিবাহিত পুরুষ! তোমার স্ত্রী শুনলে কী মনে করবেন?" রত্নর টিপ্‌পনী।

"হুঁ! উনি বিবাহিতা নারী নন! ওঁর স্বামী শুনলে তোমার উপর কিছু মনে করবেন না!" নবনীর পরিহাস।

রত্ন এর পর ধরাছোঁয়া দেয় না। নবনী যাতে জানতে না পায় যে ওরা দু'জনে ওই জাহাজে করে পালাবার কথা ভেবেছিল। জানতে পেলে নবনী অনুমোদন করত না।

দুই বন্ধু পরস্পরকে অসীম শ্রদ্ধা করত। ওদের প্রীতির সম্পর্কও নিখাদ। কিন্তু নবনীর মতে বিবাহিতা নারীর সঙ্গে সাহিত্যিক সহযোগিতা যদিও প্রগতির লক্ষণ তার চেয়ে একটি পা এগিয়েছ কি মরেছ। নবনী মরতে চায় না, তার বন্ধুকেও মরতে দেবে না। হিতোপদেশ দিয়ে রক্ষা কববে। মেয়েটি যে দুঃখিনী, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিতা ও বন্দিনী, নবনীর কাছে এ যুক্তি মূল্যহীন। সে নিজেও তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিত ও গুরুজনের দ্বারা শাসিত, তা বলে কি বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবে? বা পরকীয়া প্রেমে পড়বে?

নবনী তার অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে। তার স্ত্রীও তাই। সুখে না হোক স্বস্তিতে আছে ওরা। সুখেই বা নয় কেন? নবনী বলত, "প্রেমে পড়ে কেউ কখনো সুখী হয়নি। প্রেম নয় সুখের জন্যে। ওর স্বাদই আলাদা।"

রত্নর এখনো সে শিক্ষা হয়নি। ওর ধারণা প্রেমেই পরম সুখ। প্রেমে যারা পড়েনি তারা সুখ বলতে যা বোঝে তা নিতান্তই গার্হস্থ্য সুখ। গৃহসুখের উপর সমাজ দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সঙ্গীত বা কাব্য, কাহিনী বা নাটক যদি দাঁড়ায় তবে তার বাড় থেমে যায়। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ যেটুকু হয়েছে সেটুকু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের জন্যেই। ইংরেজী সাহিত্য ওর তুলনায় শতগুণ বিকশিত।

সাত ভাই চম্পার দৃষ্টি যদিও ইংরেজী বা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের উপরে তবু ওদের পদক্ষেপ তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার মতো নয়। বদ্ধ জলাশয়ে স্নান করে এরা সমুদ্রের গান লিখবে। নবনী এদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত, সংযত, শুদ্ধশীল অথচ লিপিকুশল। শুধু তাই নয় সৌন্দর্যের উপরেও তার একটা সহজাত অনুরাগ। প্রকৃতিটিও উদার। কিন্তু সমাজকে ঘাঁটাতে চায় না। নিরাপত্তা আগে।

সমাজ যাকে যা দিয়েছে তাই নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই হচ্ছে নবনীর

সামাজিক দর্শন। স্বামী বা স্ত্রী হাজার অসুখী হলেও বিবাহ হচ্ছে পবিত্র এক বন্ধন। তার হাত থেকে মুক্তি চাইতে নেই। তবে তারই ভিতরে থেকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দাবি করা মন্দ নয়। শ্রীমতী যদি চলাফেরার স্বাধীনতা আলাপ করার স্বাধীনতা চান সে সমর্থন করবে। দেশের জন্যে কাজ করার স্বাধীনতা চান তো তাও সমর্থনযোগ্য।

"আমার মনে পড়েছে, তুমি তো ললিতের বিয়েতে ওকে দেখেছিলে।" রত্ন বলে।

"হাঁ, উনিও আমাকে দেখেছিলেন। সেই জন্যেই তো চেয়েছিলুম আলাপটা ঝালিয়ে নিতে। সেবার কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হয়নি। যেই শুনলেন যে আমি রত্ন নই অমনি নমস্কার করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।" নবনী বলে।

"চেহারায় কোনো তারতম্য দেখলে?" রত্ন সুধায়।

"দেখলুম বইকি। সে কী চোখ ঝলসানো রূপ! চাইলে চোখ নুয়ে আসে। যেন সূর্যের দিকে চেয়ে আছি। এ তা নয়। এ যেন শরতের শশী।" নবনী উত্তর দেয়।

তা হলে সত্যিকার গৌরীকে তো কোনোদিন আমি চোখে দেখতে পেলুম না। রত্ন মনে মনে দুঃখ করে।

ঘোড়ার গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে। ওদিকে জাহাজ ছাড়ার যদিও দেরি আছে, যাত্রীদের সবাইকে জাহাজে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। রত্ন আর নবনী ধীরে ধীরে গড়ের মাঠের অভিমুখে যায় ও কথাবার্তায় আরো কিছুক্ষণ কাটায়।

নবনী কেমন করে জানতে পেরেছিল যে শ্রীমতীকে রত্ন ভালোবেসেছে ও সে ভালোবাসা একতরফা নয়। নিছক অশরীরী প্রেমে ওর আপত্তি ছিল না। যদি ওটা ওই স্তরেই নিবদ্ধ থাকে। যেমন লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রেম। কবিরা তো ওইভাবেই প্রেরণা পায়। কিন্তু যেখানে বিয়ের আশা নেই, বিয়ের কথা ভাবাই যায় না, সেখানে মন দেওয়া নেওয়ার একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অসামাজিক, সুতরাং অনুচিত।

এই তত্ত্বটা একটু মোলায়েম করে রত্নকে শুনিয়ে দিতেই ও ছেলে বিদ্রোহ করে ওঠে।

"সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াই মানুষের স্বধর্ম। যে প্রেম সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত থাকে সে প্রেম সমাজের ভয়ে আপনাকে আপনি অপমান করে। তার চেয়ে সমাজের হাতে মার খাওয়াও ভালো। মার আমাকে মহৎ করবে, নবনী।"

"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমাদের সমাজ পুরুষকে যতটুকু মারে নারীকে মারে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। সেই জন্যে নারী হয় বহুগুণ ভীরু। প্রেম সীমা ছাড়াবার আগেই থেমে যায়।" নবনী বলে তার অধিকতর বয়সের অভিজ্ঞতার জোরে।

পাঁচ

বাদুড়বাগানের সেই চারতলা বাড়ীর গোলোকধাঁধায় বেগমপুরের শ্রীমতী দেবীকে কেই বা দয়া করে খবর দিত, যদি না তেতালার জানালা দিয়ে গৌরী দেখতে পেত যে একটি

লাজুক ছাত্র সদর দরজার বাইরে ঘুর ঘুর করছে, ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

"আসুন, আসুন, আপনি কি রতনবাবু?" বলে সরকার গোছের একজন বেরিয়ে আসেন।

"আপনার জন্যে আমরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। রাস্তা চিনতে দেরি হলো বুঝি?"

হাঁ, সেটাও একটা কারণ। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কারণ সরকারবাবুর রত্নকে চিনতে দেরি হলো। কে বিশ্বাস করবে যে রতনবাবু বলতে বোঝায় অল্পবয়সী এক ছোকরা, যে পায়ে হেঁটে এসেছে। যার পরনে আটপৌরে খদ্দর।

সরকারকে অবাক হতে হলো যখন শ্রীমতী দেবীর খাস পরিচারিকা এসে রতনবাবুকে সোজা উপরে নিয়ে গেল। কোনো আত্মীয় হবেন বোধ হয়। স্বদেশী আন্দোলন করছেন।

শীতলপাটি দিয়ে মেজের সমস্তটা মোড়া। তার উপরে ফরাস পাতা। রত্নকে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসানো হলো। তার সামনে রাখা হলো ফল আর সরবৎ। পরে একটা মার্বেলের জলচৌকি পাতা হলো। তার উপর রাখা হলো দুপুরের আহার্য।

রত্ন আশা করেছিল আর কেউ তার সঙ্গে খাবে, কিন্তু বাড়ীর ছেলেরা সবাই তখন কলেজে বা স্কুলে আর বাবুরা আপিসে বা আদালতে। মেয়েরা তো স্বতন্ত্র খান। গৌরী ওদের সঙ্গে পরে একসময় বসবে।

রত্নর খাওয়া দেখবার জন্যে গৌরী তো ছিলই। আর ছিল ললিতের বউ। সাবু। ওর মাথায় আধ-হাত ঘোমটা। ললিতের বন্ধু এই সুবাদেই রত্নর সেদিন ও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। শ্রীমতীর দর্শনার্থী বলে নয়।

সাবু বেচারি সত্যিই ললিতের জন্যে ভাবছিল। জাহাজের জীবন ওর অজানা। তাই গৌরী ওকে অভয় দিচ্ছিল এই বলে যে জাহাজে চড়া স্টীমারে চড়ার মতোই ব্যাপার। পদ্মার স্টীমারের সঙ্গে পরিচয় যার আছে সে নির্ভয়ে সমুদ্রযাত্রা করতে পারে।

ললিতের প্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় কাটে। তার পর ওঠে সাত ভাই চম্পার প্রসঙ্গ। শেষে সাবু ওঘরে গেলে গৌরী এদিক ওদিক তাকায় ও আস্তে আস্তে বলে, "জাহাজটা যাকে যাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল তাকে তাকে নিয়ে গেল না কাল একজনের মনে যে কী কষ্ট তা বলবার নয়। আরেকজনের মনে?"

"আরেকজন তো সারারাত ঘুমোতেই পারেনি সেই দুঃখেই।" রত্ন বলে নিচু গলায়।

"কিন্তু গেলে পাগলামি হতো না কি? জীবনের শুরুতেই পাগলামি?" গৌরী বলে।

"তা ছাড়া আর কী?" রত্ন সাড়া দেয়।

"ধৈর্য ধরাই শ্রেয় মনে হয় নাকি?" গৌরী জানতে চায়।

"অগত্যা।" রত্ন জবাব দেয়।

"মানুষের জীবনে অবিচ্ছিন্ন সুখ কোথায়?" গৌরী দার্শনিকতা করে।

"বিচ্ছিন্ন সুখই বা কোথায়।" রত্ন আক্ষেপ করে।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর গৌরী একটু সাহস পেয়ে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে

দেয়। বলে, "তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে কলকাতার লেডী ডাক্তার মিসেস গাঙ্গুলিও একমত। কলকাতা এসে আমার নতুন কোনো অভিমত শোনা হলো না। শুধু আশঙ্কা বেড়ে গেল।"

"আশঙ্কা কিসের?" রত্ন উদ্বিগ্ন হয়।

"বিশ বছর বয়সে যারা প্রথম মা হয় তাদের খালাসের সময় বেশী কষ্ট হয়। কে জানে আমাকে কাটবে কি না! কাটলে কি আমি বাঁচব!" গোরী চোখ মোছে।

"কত মেয়ে বাঁচছে। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো থাকলেই হলো। তোর—মানে তোমার—স্বাস্থ্য ভালো থাকা দরকার।" রত্ন ভরসা দেয়।

"সেইজন্যেই তো বাপের বাড়ী যাবার কথা হচ্ছে। যদি যাই তুমি কৃষ্ণনগরে আসবে তো?" গোরী সুধায়।

"কোন সুবাদে আসব?" রত্ন বিস্মিত হয়।

"সে ভার আমার উপর ছেড়ে দে—দাও।" গোরী হাসে।

ঠাকুর এসে আরেকবার পরিবেশন করে গেল। রত্নর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গোরীর হুকুম। আসলে ওরা চেয়েছিল আরো কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটাতে।

"এরা খুব ভালো। এই বাড়ীর মেয়েরা। ললিতের মামার বাড়ী এটা। আমাকে যা খাতির করছে তা দেখবার মতো।" গোরী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে।

"তা বলে আমি তো ললিতের অনুপস্থিতিতে একটুও স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারিনে।" রত্নর মনে হয় তার স্বাগতের সময় অতীত হয়েছে।

"আচ্ছা, তা হলে সেই কথা রইল। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে। কে জানে হয়তো এই কলকাতাতেই, যদি আবার পরীক্ষার জন্যে আসতে হয়। শুনছি আসতে হবে। মিসেস গাঙ্গুলি যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন।" গোরীর মুখে ভয় মেশানো হাসি।

"দেখা যাক। তোর ভয় কেটে গেলেই খুশি হব।" রত্ন বিদায় নেয়।

বিদায় দেবার সময় গোরী আরো নিচু গলায় বলে, "এই কলকাতা শহরেই আমার আপনার লোক অন্তত আট দশ ঘর। কিন্তু কোথাও আমার ওঠবার জো নেই। যা কড়া পাহারা। নইলে তোর আদর আপ্যায়ন এমন যাচ্ছে তাই হতো না।"

প্রথম দর্শনের দিন গোরীকে যেমন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল এখন তার তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত। এতদিনে সে ওই অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে। বিশেষ করে মিসেস গাঙ্গুলির অভিমত শোনার পর। যা হবার তা হবেই। মেনে না নিয়ে উপায় কী। তাই ওর মুখে একটু হাসির আমেজ ফুটেছে। বেগমপুরের মতো মেঘলা নয়।

জ্যোতিদা বলেছিল পঁচিশে সে কলকাতা আসতে পারবে না। কিন্তু পরে একদিন আসতে পারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় হাজিরা দিতে। রত্ন যদি ততদিন কলকাতায় থাকে তা হলে দেখা হবে। রত্ন উঠেছিল ওর এক কাকার সঙ্গে, তাঁর মেসে। সেইখানেই আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করল।

জ্যোতিদার সঙ্গে ওর একটা বিনি কথার আত্মীয়তা ছিল, যেমন আর কারো সঙ্গে নয়। সেইজন্যে সাত ভাই চম্পার বন্ধুদের চেয়ে নতুন হলেও ওদের বন্ধুতা গভীরতর

স্তরের। কেউ কারো সঙ্গে একটি কথা না বলেও মনের ভাব আঁচ করে নিত।

রত্ন বেচারা অনিশ্চয়তার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। রেঙ্গুন তো মুখের গ্রাস, মুখ থেকে ফস্কে গেল। এর পরে কবে কোথায় যাওয়া হচ্ছে কে জানে। হবে কি না তারই বা স্থিরতা কী। যা হওয়া আর না হওয়ার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক।

"গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে? কিছু বলল?" জ্যোতি জানতে চায়।

"হয়েছে। বলেছে আবার দেখা হবে। কৃষ্ণনগরে কিংবা কলকাতায়। কিন্তু কাজের কথা কিছু বলেনি। বোধ হয় নিজেই জানে না।" রত্ন উত্তর দেয়।

"মুক্তি বলতে এতদিন বোঝাত এমানসিপেশন। এখন বোঝায় ডেলিভারি। মেয়েদের জীবনে ওর মতো দুর্ভাবনা আর নেই।" জ্যোতি সমবেদনার সঙ্গে বলে।

"হাঁ, মনে হলো দুর্ভাবনায় পড়েছে। প্রাণের ভয় আছে।" রত্ন গম্ভীরভাবে বলে।

"না, না। ওটা ওর বাড়াবাড়ি। ও বাঁচবে ঠিকই। তুমি ভেবো না। নার্ভাস ভাবটা একটু একটু করে কেটে যাবে।" জ্যোতিদা অভয় দেয়।

"যাক, আমাদের তা হলে এখনকার মতো ছুটি। পরের কথা পরে।" রত্ন হালকা বোধ করে। দুর্ভাবনা তো বড়ো কম ছিল না ওদের।

"ছুটি হলেও ছুটির সময়টা হচ্ছে প্রস্তুতির সময়। আরো পাকা প্রস্তুতি চাই। ও হয়তো ওর বেবীকেও সঙ্গে নিতে চাইতে পারে। আগে তো এ সমস্যা ছিল না। আমাদের দায় দায়িত্ব কত বেশী বেড়ে যাচ্ছে!" জ্যোতিদা অভিভাবকের মতো বলে।

রত্ন মনে মনে শঙ্কিত হয়। বেবীকে কেমন করে সামলাতে হয় ও কি তা জানে! ভাগ্যিস জ্যোতিদাও সঙ্গে থাকবে।

"না, না, তোমাকে ওসব নিজের হাতে করতে হবে না। ওর জন্যে আয়া থাকবে। তবে আয়ার জন্যে বাড়তি খরচটা তোমাকেই জোটাতে হবে।" জ্যোতি হাসে।

রত্ন বিহ্বল হয়ে বলে, "আমার জীবনের গতি যেদিকে যাবার সেদিকে না গিয়ে এ কোনদিকে মোড় নিল, জ্যোতিদা! আমি তো কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে গৌরী বলে একটি নারী আছে ও আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে নিরুদ্দেশযাত্রায়। কেন নিয়ে যাবে তাও কি আমি জানি! মুক্ত হবে, কিন্তু মুক্তির পর কাকে যে ওর জীবনের সাথী করবে তা তো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।"

"মুক্তির পরে ও কাকে বরণ করবে না করবে ওটাও মুক্তির অঙ্গ। স্বাধীন না হলে কেউ স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তোমারও তো আর কাউকে ভালো লেগে যেতে পারে। হৃদয় দেওয়া-নেওয়া করেছ, কিন্তু তার বেশী করতে যেও না। আগে মুক্তি, তার পরে সামাজিক বন্ধন, যদি দু পক্ষের ইচ্ছা থাকে। আপাতত তুমি ফ্রী, গৌরী ফ্রী, সেই ভিত্তিতেই তোমাদের প্রেম বা বন্ধুতা।" জ্যোতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

"তুমি কি চাও যে আমিও তোমার সঙ্গে এখন থেকেই যোগ দিই? রেঙ্গুনের জন্যে নিষ্ক্রমণ করে এখন আর ঘরে ফিরতে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে মন চায় না। কে জানে আবার কখন গৌরীর ডাক পড়বে। সব ছেড়েছুড়ে ছুটতে হবে।" রত্ন বলে।

"ডেলিভারির আগে তো নয়ই, পরেও কিছুদিন নয়। আমরা মোটের উপর এক

বছর সময় পাচ্ছি। আমি ভাবছি বম্বে গিয়ে চাকরির তল্লাস করব, ও গুছিয়ে বসব। তোমাকে রেখে যেতে চাই গৌরীর কাছাকাছি। সময় হলে তোমরা আমার সঙ্গে যোগ দেবে। এই সময়টা কীভাবে কাজে লাগাবে সেইটেই প্রশ্ন। এম এ পড়লে তো ভালোই হত, কিন্তু কে জানে মাঝখানে ছেদ পড়ে কি না। যেমন পড়ল আমার বি এ পড়ার মাঝখানে। আমি হলে এম এ-টা আরম্ভ করে দিতুম। সেটা পরে কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, সেটাও প্রস্তুতির একটা ধাপ।" জ্যোতি আর কোনো পরামর্শ দিতে পারে না।

রত্ন বলে, "কিন্তু তুমি তো এক বছরের বেশী আমাদের দেবে না।"

"সাধ্য থাকলে দেব বইকি। গান্ধীজীর ত্বরা না থাকলে আমারও ত্বরা নেই।" জ্যোতি আশ্বাস দেয়।

ছয়

জ্যোতি যখনই যেখানে যায় ওর কাঁধে একটা ঝোলা থাকে আর সে ঝোলা থেকে যা বেরিয়ে পড়ে তা বেড়াল নয়, তা রকমারি কেতাব। আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, ফ্রেজার, শ, রাসেল, রলাঁ যেমন তার পাঠ্য তেমনি মার্কস, লেনিন, রোজা লুকসেমবুর্গ।

"এঁরা কারা? এঁদের নামও তো আমি শুনিনি, এক লেনিন বাদ।" রত্ন বলে।

"এঁরা হলেন সমাজবিপ্লবী। কমিউনিস্ট।" জ্যোতিদা পরিচয় দেয়।

"তা হলে তুমি এঁদের বই পড় কেন?" রত্ন জিজ্ঞাসা করে।

"তুমিও তো ফরাসীবিপ্লবের অন্ধিসন্ধি জানো। সোসিয়ালিজমের উপর অনেক বই পড়েছ। আমার বেলা যত দোষ!" জ্যোতিদা হাসে।

"কিন্তু তুমি যে গান্ধীপন্থী। তোমার পঠনীয় রাস্কিন, থোরো, টলস্টয়। কই, ওসব তো তোমার ঝোলায় দেখিনে।" রত্ন মন্তব্য করে।

"ভারত যতদিন না স্বাধীন হয়েছে ততদিন আমি গান্ধীজীর সঙ্গেই আছি, কেননা আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে গান্ধীনেতৃত্ব না হলে গণসংগ্রাম হবে না, আর গণসংগ্রাম না হলে দেশের স্বাধীনতা হবে না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আর গান্ধীপন্থায় কাজ দেবে না। কারণ তখন আমাদের লক্ষ্য হবে সমাজবিপ্লব। সেটা ফরাসীবিপ্লবের অনুরূপ হবে, না রুশবিপ্লবের, তা আমি বলতে পারব না। হয়তো সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব এক রূপ নেবে। মার্কস পড়ছি বলে মনে কোরো না যে আমি মার্কসপন্থী। বা লেনিন পড়ছি বলে লেনিনপন্থী। রোজা লুকসেমবুর্গের জন্যে আমার দুঃখ হয়।" জ্যোতি তাঁর সম্বন্ধে আরো বলে।

"তা হলে স্বাধীনতার পরে তুমি গান্ধীকে ছাড়বে?" রত্ন জেরা করে।

"কী করি বল! গান্ধীজী কিছুতেই ধর্মের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করবেন না। ওঁর মতবাদও তেমনি ধর্মনির্ভর। সেই ধর্মও আবার ঈশ্বরনির্ভর। সেই ঈশ্বরও আবার

পার্সনাল গড। সেই পার্সনাল গডও আবার কারো কাছে আল্লা, কারো কাছে রাম, কারো কাছে কালী। গোঁজামিলের একশেষ। গোঁজামিল দিয়ে সমাজবিপ্লবের ভূমি তৈরি হতে পারে না। আমি এখন বুঝতে পারি লেনিন কেন বলেছেন ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। আমার অভিজ্ঞতাও আমাকে এই কথা বলছে। গান্ধীজীকে আমি জানিয়েও এসেছি যে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার একদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। স্বাধীনতার পরে।" জ্যোতি বিস্তারিত করে।

"স্বাধীনতার আর কত দেরি?" রত্ন কৌতূহলী হয়।

"আমি কি গণৎকার? লোকে যদি গণসংগ্রামে ঝাঁপ দেয় তবে পাঁচ বছরই যথেষ্ট। যদি আশানুরূপ সাড়া না দেয় তা হলে কে জানে কতকাল! দেখছ না অধৈর্য হয়ে একদল তরুণ সন্ত্রাসবাদী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা কোনোদিন এদের হাতে পড়বে না। পড়লে পড়বে ওই তোমার পার্লামেন্টারি বন্ধুদের হাতে। যাদের ব্যঙ্গ করে বলা হয় বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট।" জ্যোতি রঙ্গ করে। বিশদ করে।

রত্ন তখন গোরীর কথাই ভাবছিল। গোরী ওকে গুঁতিয়ে মারবে। 'গোর' করবে। যার সঙ্গে যার এমন অমিল তার সঙ্গে তার মিল হবে কী করে? জিজ্ঞাসা করে রত্ন।

"কথাটা ঠিকই।" জ্যোতি উত্তর দেয়, "ও যেমন সন্ত্রাসবাদের পক্ষপাতী তেমনি বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্টদের দলে। কৌতুকের বিষয় যশোবাবুরা সবাই এখন কংগ্রেসের প্রোচেঞ্জার গ্রুপে ভিড়েছেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে। তোমার গোরীও নির্বাচনী প্রচারে নামে। সেইজন্যেই তো বলছিলুম, 'তোমার পার্লামেন্টারি বন্ধুরা'। কেন, প্রভাতও তো তাই।"

রত্নও শুনেছিল যে গোরী নির্বাচনে জিতিয়ে দেয় ওর শ্বশুরকে। ক্ষতিটা কী? যদি নির্বাচন জিনিসটাই কাম্য হয়ে থাকে। ইংরেজরা তো নির্বাচন ভিন্ন আর কিছু বোঝে না। ওদের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের জন্যে ওরা প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে।

জ্যোতি এর উত্তরে বলে, "এ প্রসঙ্গে গান্ধী ও লেনিন একমত। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র জনগণের জন্যে নয়। ওতে বুর্জোয়াদেরই সুবিধে। আমাদের লক্ষ্য পঞ্চায়তী গণতন্ত্র।"

"গোরী তা হলে বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট?" রত্ন সুধায়।

"হাড়ে হাড়ে। না, পুরোপুরি বুর্জোয়া নয়, অর্ধেকটা ফিউডাল। ওরা নবাবী আমলের রইস। ইংরেজ আমলে বিপাকে পড়েছে। ইংরেজরা ওদের এনতার লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করেছে। তাই বাধ্য হয়ে ওরা এখন উকীল ডাক্তার ইনজিনীয়ার হাকিম মাস্টার কনট্রাকটর হয়েছে। ওর এক মাসতুত দাদা আমদানী রপ্তানীর কারবার খুলেছে। গোরী সেইসূত্রে জাহাজের খবরও রাখে।" জ্যোতি বিবরণ দেয়।

গোরী তা হলে বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট! শুনতে ভালো লাগছিল না রত্নর। কিন্তু ওর পক্ষে ও ছাড়া আর কী সম্ভব ছিল? চাষীদের সঙ্গে চাষাণী হওয়া?

"সেইরকমই তো স্বপ্ন দেখেছিলুম আমি।" জ্যোতি স্বীকারোক্তি করে। "তোমার আসার আগে আমিও ভালোবেসেছিলুম ওকে। কিন্তু ওর দিক থেকে সাড়া ছিল না। এটাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো যে ও কখনো নিজের হাতে ঘর নিকোবে না, হাঁড়ি ঠেলবে

না, ধান ভানবে না, গোবর তুলবে না। ওর জন্যে ঝি রাখতে হবে, রাঁধুনি রাখতে হবে। হাতে দাগ লাগবে বলে কড়া পড়বে বলে ওদের বাড়ীর মেয়েরা নিজের হাতে রাঁধে না। এই যাদের প্রথা ওদের একজন অসামান্য স্বাধীনা নারী বলে যে আমার কর্মসহচরী হবে এর কতটুকু আশা? শেষে আমিও কি ওর টানে বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট হব?"

ভাববার কথা। গৌরীর জন্যে একটি ঝি, একটি রাঁধুনি তো রাখতে হবেই, ও যদি সসন্তানে আসে তবে একটি আয়াও রাখতে হবে।

"আপনাকে বিকিয়ে না দিয়ে অত টাকা আমি পাই কোথায়! আমার তো পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছুই নেই। থাকলেও আমার বাবা আমাকে ত্যাজ্য করতেন, যখন শুনতেন যে আমি একটি বিবাহিতা নারীর সঙ্গে বাস করছি। তোমার বাবাও কি তোমাকে ত্যজ্য করতেন না, জ্যোতিদা?" রত্ন জিজ্ঞাসু হয়।

"সে আর বলতে!" জ্যোতি গুম হয়ে থাকে। "কিন্তু সেখানে আমি হার মানতুম না। আমার সম্পত্তির দরকার নেই। আমি সম্পত্তিতে বিশ্বাস করিনে। আমিও খেটে খেতুম, গৌরীও খেটে খেত। হিন্দু সমাজে এ রকমটি কখনো কোথাও ঘটে না তা নয়। নিচের দিকে গেলে এর দৃষ্টান্ত পাবে অনেক। খুব উপরের দিকে গেলেও এর নজীর পাবে। সে স্তরে অবশ্য খেটে খাওয়ার রীতি নেই।"

সমাজের দিক থেকে রত্ন চিন্তা করেনি। ও স্বয়ং যখন নৈরাজ্যবাদী তখন সমাজের আর দশজন কী করে না করে তাতে ওর কী আসে যায়? কিন্তু গৌরী তো বলেনি যে সেও নৈরাজ্যবাদী। তার হয়তো কিছু আসে যায়।

"না, গৌরীকে আমি খেটে খেতে দেব না।" রত্ন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে। আমিই দুজনের হয়ে খাটব। তবে ওকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে ও আবার মনে না করে যে ও পরাধীন।"

"তার মানে ও চায় একটি বুর্জোয়া কেরিয়ার। স্কুলমিস্ট্রেস বা লেডী ডাক্তার, এইরকম কিছু। এদেশে এখনো মেয়েদের জন্যে সব ক'টা দুয়ার খোলেনি আমেরিকা বা রাশিয়ার মতো। খুলবে একদিন। তখন যোগ্যতার প্রশ্ন উঠবে। গৌরী কিসের যোগ্য তা কি ও ভেবেছে? বলে মুক্তির পরে ভাববে। তখন বুঝবে বুর্জোয়াদের মতো ম্যাট্রিক পাশ না করলে নয়। ওই হচ্ছে পাসপোর্ট। তুমি পারবে ওকে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেওয়াতে? আমি তো সে চেষ্টাও করেছিলুম। ওর বিশ্বাস ওর সুন্দর মুখই ওর সার্টিফিকেট। আর কোনো সার্টিফিকেটের আবশ্যক নেই।" জ্যোতি পরিহাস করে।

রত্ন প্রতিশ্রুতি দেয় যে চেষ্টা করবে। তবে সফল হবে কি না সন্দেহ। ওকে মুক্ত করুক তো আগে। তার পরে ওকে স্বাবলম্বী করার প্রশ্ন উঠবে। আপাতত রত্নর নিজের উপার্জনক্ষম হওয়া চাই। উপার্জন যা করবে তা দু' জনের—চাইকি তিনজনের—পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই। তবে ঝি ঠাকুর আয়া রাখার পক্ষে যদি যথেষ্ট না হয় তবে কী করবে জানে না। আরো পড়বে, আরো যোগ্য হবে, না এখুনি ঝাঁপ দিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করবে? তা যদি করতে হয় তবে জ্যোতি যেন সাথী হয়। নয়তো ভারগ্রস্ত হয়ে ডুববে।

জ্যোতি অভয় দেয়। কিন্তু তার মেয়াদ মাত্র এক বছর। আপাতত।

সাত

কেরিয়ার কথাটা রত্নর পছন্দ নয়। ও কেরিয়ার চায়নি। চেয়েছে স্বাধীনজীবী হতে। স্বাধীনভাবে বাঁচতে। তার মধ্যে পড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও কাজের পারিশ্রমিক পাওয়া। কোনো একটা বাঁধা কেরিয়ারের চেয়ে দিন আনা দিন খাওয়া ভালো। সেইজন্যে ও হতে চেয়েছিল ফ্রী লান্স। কিন্তু তার অসুবিধে হচ্ছে প্রেমে পড়লে প্রেমিকার দায় বহন করা দুষ্কর। যদি না তিনিও উপার্জনক্ষম হন। বেবীর কথা ও ভাবেনি।

কিন্তু প্রেমে পড়েছে বলে ও আত্মবিক্রয় করবে? মনটা তাই ওর গভীর বিষাদে মগ্ন। বন্ধুদের কাউকেই বুঝিয়ে বলতে পারে না কেন ওই বিষাদ। বি-এ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আর কেউ কি ওর মতো নিরানন্দ মনে দিন কাটাচ্ছে?

একমাত্র জ্যোতির কাছেই ও মন খোলে। বলে, "আমি যে পথে চলতে চাই সে পথে চলতে দিচ্ছে কে? গোরী যদি নির্দিষ্টভাবে দু' বছর সময় দিত তা হলে হয়তো এম-এ-টাও এমনি ভালোভাবে পাস করতুম। কিন্তু যদি এক বছরের বেশী সময় না দেয় তা হলে শুধু শুধু এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে কী এমন লাভ হবে? এ রকম অনিশ্চিত অবস্থায় আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারি, জ্যোতিদা? তুমি নিজেও তো এক বছরের বেশী কবুল করছ না। বাকীটা মহাত্মার উপর ছেড়ে দিচ্ছ। তুমি চলে গেলে আমি কী উপায়ে দু'জনের জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ উপার্জন করতে পারব? বেবী যদি আসে তো তিনজনের?"

জ্যোতি চিন্তান্বিত হয়ে বলে, "তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনে, রতন। কিন্তু আরো একটা বিষয় আছে সেটাও হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। গোরী তোমাকে দু' বছর সময় দিতে রাজী হলে কী হবে, প্রকৃতি যদি প্রবল হয় তখন? দু' মাস দেরি করে যে বিপত্তি ঘটল, দু' বছর দেরি করলে সেই বিপত্তি আবার ঘটতে পারে। কাজ কী আবার ঝুঁকি নিয়ে? ধরে নাও যে এক বছরই হচ্ছে প্রাকৃতিক সীমা। ওই কথাটাই আমার মাথায় ঘুরছে বলে আমি বলছি এক বছর। কিন্তু ও যদি বাপের বাড়ীতে থেকে যায় বা অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে তবে দু' বছরেও কিছু ঘটবে না। কেন তা হলে তুমি এম-এ-তে ভালো করবে না? আমি কি চাই যে তুমি গোরীর জন্যে শহীদ হও?"

শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে গোরী কী করবে তার উপর। বাপের বাড়ীতে থেকে যাবে, না অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে? নারীই নিয়ন্ত্রণ করবে পুরুষের ভাগ্য। হঠাৎ একদিন ডাক আসবে, বম্বে চল। রইল পড়ে এম-এ-র আধখানা।

"তোমাকে আমি যত দূর পারি সাহায্য করব, রতন। তবে আমারও তো জীবনের ব্রত আছে। গান্ধীজীকে আমি কথা দিয়েছি। যখনি তিনি ডাক দেবেন তখনি সাড়া দেব। গোরীর জন্যে কি আমার কথার খেলাপ হবে? তবে নিকট ভবিষ্যতে গণসত্যাগ্রহের লক্ষণ দেখছিনে। তা ছাড়া গোরীর ভার যখন তুমিই আপনা হতে নিয়েছ তখন আমার দায়টা মুখ্য নয়, গৌণ।"

"সেইজন্যেই তো আমি আরো ভালো করে তৈরি হতে চাই। তার জন্যে আরো কিছু সময় চাই।" রত্ন নিবেদন করে।

"আরো ভালো করে তৈরি হওয়া বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও?" জ্যোতি সুধায়।

"ঝি চাকর ঠাকুর আয়া—" রত্ন বোঝাতে যায়।

"হাতি ঘোড়া পালকি।" জ্যোতি ঠেস দিয়ে বলে, "আমি নিজে এক বেলা খাই। মোটা চালের ভাত, অড়হরের ডাল, একটা সিদ্ধ। তুমিও তো মিতাহারী। ঠাকুর রাখতে হবে কেন? আমরাই পালা করে রাঁধব। ঝিরই বা দরকারটা কী? পালা করে ঘর ঝাঁট দেওয়া যাবে, বাসন মাজা যাবে। আর চাকর ছাড়া কি কেউ বাজার হাট করে না? তবে আয়ার কথা আলাদা। যদি বেবী আসে সঙ্গে।" জ্যোতি সেইটুকু ছাড় দেয়।

"গোরীর কষ্ট হবে না?" রত্ন কষ্ট পায় ভেবে।

"স্বাধীনতা জিনিসটাই কষ্টার্জিত। কষ্ট করে রক্ষিত। যে যত স্বাধীনতাপ্রিয় সে তত কষ্টসহিষ্ণু। গোরীকেও তার জন্যে তৈরি হতে হবে। তৈরি কি কেবল তুমি আমিই হব? ভালোবাসা কি একতরফা?" জ্যোতি কঠোর স্বরে বলে।

"তবু ও সে স্টাইলে অভ্যস্ত—" রত্ন গোরীর পক্ষ নিয়ে বলতে যায়।

"সে স্টাইল হারেমের বেগমদের হারেমেই বন্দী করে রাখার ফন্দি। মুক্ত নারীর স্টাইল নয় ওটা। মুক্ত নারী খেটে খায়, বাঁদীকে দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে খায় না। ও যদি আর কারো দাসী হতে না চায় তো আর কেউ ওর দাসী হবে কেন? এ কী রকম মুক্তি যার জন্যে তুমি শহীদ হতে তৈরি হবে? তোমাকে শক্ত হতে হবে, রতন। ডেকাডেন্ট ফিউডাল শ্রেণীর বেগমদের মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে। আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওর মাথাটি খাবে দেখছি।" জ্যোতি রঙ্গ করে বলে।

রত্নও হাসে। কোথায় বম্বে, কোথায় গোরী, কোথায় আদর, কোথায় কী! সমস্তটাই একটা আলনস্করের স্বপ্ন। আরব্য উপন্যাসের শামিল।

গোঁরী কবে আসবে না-আসবে তারই উপর নির্ভর করবে রত্নর পড়া না-পড়া, চাকরি করা না-করা। একটি পুরুষের জীবনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করবে একটি নারীর গতিবিধি। জ্যোতিষীদের মতে যেমন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি। এ কী জ্বালা! প্রেমেরও কি একপ্রকার জ্যোতিষ আছে? একজনের ভাগ্যসূত্র আর একজনের হাতে? প্রেমিকের স্বাধীন ইচ্ছা একটা মায়া?

বাড়ী ফিরে গিয়ে সে গোরীর চিঠি পায়। লিখেছে ও মেয়ে—

"তোমাদের দিকে আমি চাতকের মতো চেয়ে আছি। কবে বর্ষণ করবে মুক্তিজল? কবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ? তোমরা কি মনে করেছ আমার পায়ে বেড়ি পড়ল বলে আমি চুপচাপ স্থাণুর মতো বসে থাকব? তোমরা তৈরি হচ্ছ তো? আমি যে-কোনো সময় গিয়ে হাজির হতে পারি। আর সহ্য হচ্ছে না এ বিজয়োল্লাস। আমার উপর ওঁর কী অনুকম্পা! যেন চিরকালের মতো হেরে গেছি। সত্যি, আমার আর দেখাবার মতো মুখ নেই। আমি আর গর্জন করতে পারিনে। কুঁইকুঁই করি। বুঝতে পারি সবাই টিপে টিপে হাসছে। দর্পহারী মধুসূদন আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। কার বিরুদ্ধেই বা নালিশ

করি। বাপের বাড়ীর জন্যে দিন গুনছি। মা হতে নারাজ বলে আমার নিজের গর্ভধারিণীও আমার উপর বিমুখ ছিলেন। এখন তিনি আমাকে দেখতে ও আমার সৌজন্যে নাতির মুখ দেখতে উন্মুখ। কলকাতা যদিও কৃষ্ণনগরের পথে পড়ে না তবু আমার ইচ্ছা আছে আরো একবার কলকাতা আসতে ও ডাক্তার দেখাতে। সে সময় তোর সঙ্গে দেখা হবে তো?"

গৌরী যে-কোনো সময় এসে হাজির হতে পারে। ডাক্তার দেখানোর নাম করে। ওর মনের গতি এখন বাপের বাড়ীর দিকে। বম্বের দিকে নয়। তার দেরি আছে। নবনীর মতো বন্ধুরা পরামর্শ দিচ্ছিল এম-এতে নাম লেখাতে। ওরা ভিতরের কথা জানে না। ওদের পরামর্শ শুনে এম-এতে ভর্তি হলে ক্ষতি কী? যে-কোনো দিন ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। রত্নর মনের গতি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

ওদিকে জ্যোতিদারও বম্বে যাত্রার ত্বরা নেই। থাকলে রত্ন টের পেতো। জ্যোতিদাকে লিখতেই সে বলে, "অনেক কথা আছে। আমি আবার কলকাতা আসছি। তুমিও এস।"

দেখা হলে জ্যোতি বলে, "গৌরী এখন বাপের বাড়ী চলল। সেইখানেই খালাস হবে। তার আগে আর কোনো ঘটনা ঘটছে না। কাজেই অত শীগগির বম্বে গিয়ে কী করব আমরা? তার চেয়ে তুমি এম-এতেই লেগে যাও। ডিগ্রী পর্যন্ত সময় হয়তো পাবে না, কিন্তু ডিগ্রী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার একটা মর্যাদা আছে। এতদিন বাদে আমিও সেটা অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। পরে তুমি বলতে পারবে যে অমুক অমুক অধ্যাপকের কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্য পেয়েছিলে। অমুক অমুক সহপাঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতেছিলে। ঘরে বসে বই পড়েও বিদ্যা হয় তা ঠিক। কিন্তু আর দশজন বিদ্বানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক না করলে সত্যের বিভিন্ন মুখ নজরে পড়ে না। আশ্রমজীবনে আমাদের এ সুযোগটি মেলে না। সেইজন্যে আমিও ভাবছি মাস কয়েক কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাজুয়াল স্টুডেন্ট হব। কোথায় যাই বলতে পারো?"

রত্ন নানান জায়গার নাম করে। কিন্তু জ্যোতি বলে, "ওরা আমাকে আমার প্রাইভেট স্টাডির জন্যে লেশমাত্র ক্রেডিট দেবে না। সেই যে আমি থার্ড ইয়ার থেকে কলেজ ছেড়েছিলুম সেইখান থেকেই আমাকে কেঁচে-গণ্ডূষ করতে হবে। অথচ আমাব সতীর্থরা ইতিমধ্যে এম-এ পাস করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।"

সমস্যা বইকি। একদিন এ সমস্যারও সমাধান জুটে গেল। কথাটা কেমন করে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কর্তাদের কানে পৌছয়। তাঁরা বলে পাঠান, "চলে এস।" তাঁদেরও ছাত্রের প্রয়োজন ছিল।

রত্ন জ্যোতিকে অভিনন্দন জানায়। জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়াও তো দরকার। শুধু জীবিকার জন্যে নয়। বিশ্বভারতীতে জীবনচর্চা হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যার গুরু।

জ্যোতিকে একদিন ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে রত্ন। বম্বের ট্রেন নয়, বোলপুরের ট্রেন। যেটা হবার সেটা হয় না। যেটা হবার নয় সেটা হয়।

একদিন রত্নর নিজের বেলাও সেইরূপ এক ব্যাপার ঘটে। ওর বাবা ওকে নিয়ে

যান কুস্টিয়ার এস ডি ও সাহেবের কাছে। এমনি আলাপ করতে। বাঙালী সিভিলিয়ান। এই প্রথম মহকুমা পেয়েছেন। তিনিও তাঁর দিনে একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন।

রত্নর কৃতিত্বের সমাচার শুনে ঘোষাল সাহেব বলেন, "আপনিও তো আমার চেয়ে কম কৃতী নন। তা হলে আমাদের সার্ভিসে যোগ দেন না কেন?"

রত্নর চমক লাগে। ও বলে, "আমি কি পারব ? যা কঠিন পরীক্ষা।"

"একবার দিয়ে দেখতে দোষ কী? আমিও তো ভয়ে ভয়েই দিয়েছিলুম। সব নির্ভর করছে কারা দিচ্ছে তার উপর।" ঘোষাল সাহেব আশ্বাস দেন।

রত্নর মাথায় নতুন এক আইডিয়া ঢোকে। জানুয়ারি মাসে পরীক্ষা। মে মাসের মধ্যেই ফলাফল জানতে পাবে। গোরী তো ডিসেম্বরে খালাস হবে। ওর প্রয়োজনের সঙ্গে রত্নর প্রস্তুতি দিব্যি খাপ খাবে।

তবে আর বম্বে নয়। বম্বের পরপারে বিলেত। জ্যোতিদাকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। সমস্ত পরিকল্পনাটাই পালটাতে হবে। কিন্তু কৃতকার্য হলে তো ? যা কঠোর প্রতিযোগিতা।

আট

সেটা কিন্তু একটি যুবকের কেরিয়ার মনোনয়ন নয়। সেটা শুধু একটি যুবতীর বন্ধনমোচনের উপায় আবিষ্কার। গোরী যেদিন মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হবে রত্ন সেদিন ও পথ ছেড়ে দিয়ে স্বপথ অবলম্বন করবে।

তবু ওর মন থেকে অস্বস্তি দূর হয় না। পরার্থে আত্মবিক্রয় করছে না তো ? করা কি শ্রেয় ? ওটা যদি পরধর্ম হয়ে থাকে তবে ভয়াবহ নয় কি ? পথটা যদি ওর পক্ষে অপথ হয়ে থাকে তা হলে কেন জেনে-শুনে অপথে চলা ? কত শক্তি, কত সময়, কতখানি আয়ু, কতখানি যৌবন ক্ষয় হবে অপথে চলতে ও পরে আবার উজিয়ে আসতে ! যেখান থেকে রওনা হচ্ছে সেখানে ফিরে এসে নতুন করে আরম্ভ করতে !

গোরী যেমন তার পরিণয়কে অঘটিত করতে চাইছে, পারছে না, রত্নও তেমনি ওর পরীক্ষার সাফল্যকে অঘটিত করতে চাইবে, সহজে পারবে না। গোরী যেমন এক অর্থে বন্দী সেও তেমনি আরেক অর্থে বন্দী হবে। কোথায় থাকবে ওর অহিংস নৈরাজ্যবাদ ! শুধু মুখের কথা। রত্নও দিনে দিনে রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ বনে যাবে। পুলিস আর আদালত আর জেল আর যুদ্ধ—প্রত্যেকটি মন্দকে মাথা পেতে মেনে নেবে। এসব যদি সাম্রাজ্যের স্বার্থে চালিত হয়ে থাকে তবে সেও হবে সাম্রাজ্যবাদী জগন্নাথের রথের অন্যতম চালক। আর যদি স্বরাজের পর বুর্জোয়া স্বার্থে চালিত হয় তবে সেও হবে বুর্জোয়া জগন্নাথের রথের অন্যতম সারথি। তখন তার নিজের বন্ধনমোচনের কী উপায় !

রত্ন ভেবেছিল গোরী ওর অভিপ্রায় শুনে সুখী হবে। আর জ্যোতিদা হবে অসুখী। কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত।

জ্যোতিদা লিখল— "বাঃ ! কী চমৎকার আইডিয়া ! ইতস্তত না করে পত্রপাঠ

পরীক্ষার পড়া শুরু করে দাও। যদি সফল হও তা হলে গোরীর ভালো বই মন্দ হবে না! আর তোমার নিজেরও কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে। বাস্তবের কষ্টিপাথরে আদর্শের যাচাই হবে। একটার পর একটা একসপেরিমেন্ট করে তুমি হাতে-কলমে শিখবে অহিংসা কী পরিমাণে ঘাতসহ আর নৈরাজ্যবাদ কত দূর কার্যকর। গান্ধীজীও একদা ব্যারিস্টার ছিলেন। যন্ত্রটাকে ভিতর থেকে দেখেছেন। তারপর বেরিয়ে এসেছেন। তোমার জীবনের অভিজ্ঞতাও যদি তাঁর অনুরূপ হয় তবে তোমার কথার দামও সেই অনুপাতে বাড়বে। তোমাকে তো আমি চিনি। তুমিও একদিন বেরিয়ে আসতে পারবে। সুতরাং ভয় কিসের? ক্ষতি যা হবে তা পরে পুষিয়ে নিতে পারবে।"

আর গোরী।—"হায় রে আমার পোড়া কপাল! তোর সঙ্গে যেতে হবে সাহেবদের দেশে! আর ফিরতে হবে মেমসাহেব হয়ে! যাদের সঙ্গে আমার শত্রুতা তারাই হবে আমার মিত্র! আর যাদের সঙ্গে মিত্রতা তারাই হবে আমার শত্রু! একেই না বলে, তপ্ত কড়াই থেকে উনুনে ঝাঁপ! শুনছি ওটা নাকি এমন একটা কঠিন পরীক্ষা যে তুই নির্ঘাত ফেল করবি। তাই যদি হয় তবে আর ভয়ের কী আছে! ভয় পাব যদি তুই সত্যি সত্যি পাস করিস। তখন দেখব যে বাংলা দেশের কুমারীরা তোর জন্যে মালা হাতে দাঁড়িয়ে। আমার দিকে ফিরে তাকাবে কে যে আমি তোকে আমার বলে দাবি করব! তখন আমার কী হবে, মানিক! আমি কি বাঁচব! তার আগেই অপারেশন টেবিলে আমার নির্বাণ। আমার জন্যে তোকে অত কষ্ট করতে হবে কেন? তুই আমার কথা ভেবে ও পথে যাসনে। যেটা তোর স্বপথ সেই পথেই চলিস।"

বন্ধু যদি সফল হয় তা হলে আর গোরীর দিকে ফিরে তাকাবে না, বাংলা দেশের কুমারীদের একজনের মালা নেবে, গোরীর এই ঈর্ষাকাতর অবিশ্বাস ওকে নির্জীব করে রাখে। পরীক্ষার জন্যে যেসব ফর্ম পূরণ করতে হয় সেসব একেবারে শেষ দিনটি পর্যন্ত ফেলে রাখে। কী দরকার! গোরী যখন বিমুখ।

গোরী কিন্তু ঠিক বিমুখ নয়। পরে ওর চিঠির থেকে জানা গেল যে ওর মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে জ্যোতিকেও জড়িত থাকতে হবে। রত্নর সঙ্গে ও যাবে, যদি জ্যোতি সঙ্গে যায়। রেঙ্গুনের প্যাটার্ন যদি বম্বের প্যাটার্ন হয় তা হলে ও রাজী। যদি বিলেতের প্যাটার্ন না হয় তা হলে ও নারাজ। ওর অন্তরের গভীরে কোনো এক জায়গায় নিহিত আছে এ তত্ত্ব যে জ্যোতি ওকে দাদার মত আশ্রয় দেবে। তখন কেউ বলতে পারবে না যে ও রত্নর রক্ষিতা। হিন্দুর মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ তো কল্পনা করা যায় না। বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব নয়।

এখন জ্যোতিকে বিলেত যাত্রার সঙ্গী হতে বলবে কে? জ্যোতিই বা রাজী হবে কেন? সে চায় ছাড়া পেতে। ছাড়া পেয়ে গণসত্যাগ্রহে নামতে। বম্বের প্যাটার্ন যদি তিনজনের পছন্দ হয় তবেই সে তিনজনের একজন। তার বদলে বিলেতের প্যাটার্ন এলে সে সরে পড়তে চাইবে। তার পরের চিঠিতে তেমন আভাস পাওয়া গেল। বম্বের উপরে রত্নর টান নেই। টান বম্বের পরপারে। পশ্চিমের সঙ্গে ওর একটা নাড়ীর টান।

রত্ন শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে সুধায়, "দিন পেরিয়ে যাবার আগে আমি জানতে চাই,

পরীক্ষাটা দেব কি দেব না। না দিলে দায়িত্বটা জ্যোতিদার।"

গোরী উত্তর দেয়, "জ্যোতি তো বম্বে যাবার নামও করছে না। দুজনেই হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই বা চলবে কেন? তোর যদি আত্মবিশ্বাস থাকে তবে তুই পরীক্ষা দিয়ে দে, মানিক। পাস যদি করিস তো আমার পুণ্যেই করবি। এটা যেন মনে থাকে। আমি যে মাধবের কণ্ঠে প্রতিদিন মালা পরাচ্ছি সে মালা কি তোর কণ্ঠে পরানো হচ্ছে না? তোকে আমি উৎসাহই দিতে চাই। নিরুৎসাহ করতে চাইনে। বীরাঙ্গনারা যেমন অসিযুদ্ধে প্রেরণ করে ও প্রেরণা যোগায় আমিও তেমনি মসীযুদ্ধে প্রেরণ করছি ও প্রেরণা যোগাচ্ছি। জয় হবে কি না জানিনে, লোকে বলছে হবে না, তবু আমি এই ভেবে খুশী যে তুই আমার জন্যে যুদ্ধে নামছিস।"

হাঁ। যুদ্ধই বটে। সেকালের টুর্নামেন্টের যুগোপযোগী সংস্করণ। নাইটরা আসবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সকলের সঙ্গে সকলের বলপরীক্ষা। জিতবে জনাকয়েক ভাগ্যবান। হারবে যারা তাদের ব্যর্থতাও মর্যাদাসূচক।

রত্ন আর কালবিলম্ব না করে পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে। এইবার যাত্রা হলো শুরু। এতদিন বাদে মনে হচ্ছে কোথাও এক দিকে যাওয়া হচ্ছে। বন্দরের কাল হলো শেষ। পালে লেগেছে দূর দেশের হাওয়া।

সম্ভবপর প্রতিযোগীদের খুঁজে বার করতে সময় লাগে না। তাদের সংখ্যা কম। রত্নও পরীক্ষা দিচ্ছে শুনে তাদের কেউ বা ধরাছোঁয়া দিতে ডরায়, কেউ বা হাত বাড়িয়ে দেয়। এমনি একজন খেলোয়াড় মনোবৃত্তির যবক উৎপল সরকার। উৎপলই অগ্রণী হয়ে ওকে ওয়াই-এম-সি-এ হসটেলে নিয়ে যায় নিজের রুমমেট করে।

কিছু দিন একসঙ্গে থেকে দেখা গেল দু'জনেরই এক জায়গায় মিল আছে। দু'জনেই পড়ার সময় নোট লেখার ছলে চিঠি লেখে। উৎপলকে একটু চাপ দিতেই সে স্বীকার করে যে সে প্রেমে পড়েছে। প্রেমিকাটি আর কেউ নন, তার এম-এ ক্লাসের সহপাঠিনী ইরাবতী মান্না। বর্মার মেয়ে। দারুণ স্মার্ট। উৎপলের মতো ইরাবতীও খ্রীস্টান।

উৎপল যখন রত্নকে বিশ্বাস করে ওর বান্ধবীর পরিচয় দিয়েছে তখন রত্নকেও বাধ্য হয়ে আপনার বান্ধবীর পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু কিছুটা হাতে রেখে।

এর পরে ইরাবতীর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। কিন্তু গোরীর কথা ইরাকে বলা হয় না। ইরা একদিন উৎপলকে ও রত্নকে ওর জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে। সেদিন আরো কয়েকটি তরুণীর সঙ্গে রত্নর পরিচয় হয়। তাঁরাও অবিবাহিতা। একটা নিমন্ত্রণের থেকে আরেকটা নিমন্ত্রণ আসে। আলাপ জমতে থাকে। কন্টিনেন্টাল সাহিত্য নিয়ে আলাপ ধীরে ধীরে পত্রালাপে পরিণত হয় যার সঙ্গে তার নাম সেবা। সেবা দাশগুপ্ত। রত্নর থেকে সিনিয়র।

অবিবাহিত তরুণরা অবিবাহিতা তরুণীদের সঙ্গে নানা উপলক্ষে মেলামেশা করবে, এর মতো স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? এই তো উৎপল কেমন স্বাধীনভাবে মেলামেশা করছে। রত্নও এক বছর আগে যদি এ সুযোগ পেত তা হলে তেমনি স্বাধীনভাবে মিশত। কিন্তু গোরী ওর জীবনে আসার পর থেকে ওর সে স্বাধীনতা বন্ধক রাখা হয়েছে। এখন

কেবলি মনে হয় গোরী থাকতে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করলে প্রেমের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়।

আসলে গোরীকে আর তার বন্দীদশাকে ও এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। স্টীম যেমন ইঞ্জিনকে ঠেলে নিয়ে চলে, ইঞ্জিনের ইচ্ছাঅনিচ্ছার ধার ধারে না, তেমনি গোরীর বন্ধনমোচনের দায় ওকে রাত বারোটার আগে বিছানায় যেতে দেয় না, শেষরাত্রে আবার ঘুমের মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে যায় পড়ার টেবিলে। উৎপল যখন সুখনিদ্রায়, আর সকলে যখন সুপ্তিশয্যায়, রত্ন তখন আকাশের তারার মতো অতন্দ্র। শরীরকে ও বিশ্রাম দেয় না, ক্লান্ত ঘোড়ার মতো চাবকিয়ে ছোটায়।

গোরী কি জানে এসব কথা ? কেউ জানালে তো জানবে ? কন্যাটি থেকে থেকে চিঠি লিখে মনে করিয়ে দেয়, "লালকমল, নীলকমল, তোমরা তৈরি তো ?"

"আমরা তৈরি হচ্ছি। তুই নিশ্চিন্ত হ।" রত্ন জবাব দেয়। যদিও জানে না দু'জনের কোন্‌জন লালকমল আর কোন্‌জন নীলকমল।

ওদিকে গোরী ওর বাপের বাড়ী চলে গেছে ও সেখানে যাবার পর থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত আছে। ওর চিঠির সুর তেমন জ্বালাময় নয়। শ্বশুরবাড়ীর দৈনন্দিন সংঘাত বাপের বাড়ীতে নেই। সংঘাত না থাকলে জ্বালাও থাকে না। তা হলেও বাপের বাড়ী তো ওর নিজের বাড়ী নয়। ছিল একদিন যখন ও কুমারী ছিল। এখন ওঁরা কেউ ওকে কুমারী ভাবেন না, ও নিজেও কি সে রকম কোনো দাবি উত্থাপন করতে পারে ?

ওর জন্যে লালকমল নীলকমল সাধনা করছে, এই ভেবে ও নিশ্চিন্ত। রত্ন কিন্তু দুশ্চিন্তায় জর্জর। সাধনা বলতে ও বোঝে জীবনের জন্যে সাধনা। জীবিকার জন্যে নয়। জীবিকা তো ওর মতো ছেলের অনায়াসলভ্য। তার জন্যে মোমবাতি পোড়ানোই বা কেন, মোমবাতির মতো পোড়াই বা কেন ? জীবিকার জন্যে সাধনা মানুষকে সংকীর্ণচেতা করে, তার মনটা ছোট হয়ে যায়। বড়ো চাকরিও কম চাকরি নয়, বরঞ্চ বেশী চাকরি। অমন জিনিসের জন্যে জীবনের এই মূল্যবান দিনগুলি ব্যয় করা কি ক্ষতিকর নয় ? যদি পরীক্ষায় বিফলতা ঘটে তা হলে তো ডাহা অপচয়।

দু' ধারে জীবনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সবাই তাতে ডুব দিচ্ছে, স্নান করছে। উৎপলও তাদের একজন। কিন্তু রত্নর এক দণ্ডও ছুটি নেই। গোরীর বন্ধনমোচনের বোঝা ওর ঘাড়ে।

নয়

এরই মাঝখানে একদিন গোরীর কাছ থেকে বার্তাবহ আসে। ছেলেটি আর কেউ নয়, ওর ছোটভাই মোহন। অবিকল দিদির মতো দেখতে। কলকাতায় মাসীর বাড়ী থেকে ডাক্তারি পড়ে। মোহনকে দেখে রত্নর অন্তরে অহেতুক স্নেহের সঞ্চার হয়। আত্মার আত্মীয় যে !

গৌরী কলকাতা এসেছে। রত্নর কি চায়ের সময় অন্য কোনো কাজ আছে ? না থাকলে একবার যেন দেখা করে যায়।

উৎপলের সঙ্গে সেদিন সেবাদির ওখানে যাবার কথা ছিল। রত্ন মাফ চেয়ে নেয়। সেবাদি অপেক্ষা করতে পারেন, গৌরী তো অপেক্ষা করবে না। ও ফিরে যাবে।

মোহন বাইরে দাঁড়িয়েছিল। রত্নকে ভিতরে নিয়ে গেল। গৌরী ওকে বাড়ীর লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয়টা হলো এই বলে যে ও জ্যোতির বন্ধু। এবার ওর আপ্যায়ন যেমন সাদর তেমনি সর্বাঙ্গীন। চা তো নয় ছোটখাটো একটা ভোজ।

গৌরীকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়। সেই যে একটা 'মরে যাব, মরে যাব' ভাব ছিল সেটা আর নেই। লেডী ডাক্তার নাকি অভয় দিয়েছেন যে নর্মাল ডেলিভারি হবে। বাপের বাড়ীতে থেকেও সেটা সম্ভব। কলকাতা থেকে ব্যবস্থা হবে, যদি দরকার হয়।

পত্নীত্বকে গৌরী কোনোদিন মেনে নিতে পারেনি, কিন্তু মাতৃত্বকে এই ক'মাসের মধ্যেই মেনে নিয়েছে। মা হতে যাচ্ছে বলে প্রথমটা ওর যেমন বিবমিষা ছিল এখন তেমন নয়। দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার মতো বাড়ছে ওর কলেবর। ওর তুলনায় রত্ন তো কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ। দিন দিন ক্ষীণ হচ্ছে।

"তোমাকে অমন সলতের মতো দেখাচ্ছে কেন ? ওরা খেতে দেয় না ?" গৌরী সুধায়।

"খেতে দিলে কি এমন রাক্ষসের মতো খেতুম ?" রত্ন পাশ কাটায়।

"কিন্তু তোমার ঘরে যে ছেলেটি থাকে সে তো শুনছি দিব্যি নাদুসনুদুস নন্দদুলাল।"

গৌরীকে এ খবর দিয়েছে মোহন।

"কে ? উৎপল ?" রত্ন হেসে বলে, "ওর তো প্রায়ই ইরাদের ওখানে খাবারের নিমন্ত্রণ। আজ গেছে সেবাদির ওখানে। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার পড়ার চাপ না থাকলে আমিও যে নন্দদুলাল হতুম না তা নয়।" রত্ন সরলভাবে বলে।

"পড়ার চাপ কি উৎপলের নেই বলতে চাও ?" গৌরী জানতে চায়।

"উৎপলের সঙ্গে আমার তুলনা ! ও পরীক্ষা দিচ্ছে প্রেস্টিজের জন্যে। সিভিল সার্ভিস, শুধু এই কথাটা শুনলেই মেয়েরা ঘিরে দাঁড়ায়। এর মধ্যেই ইরার সঙ্গে এনগেজড হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল যাই হোক না কেন, বিবাহ ওর অবশ্যম্ভাবী। আমার বেলা কি ও কথা বলা চলে ?" রত্ন কপট খেদের সঙ্গে বলে।

"তোমারও বিয়ে হবে, বাবা।" মাসী প্রক্ষেপ করেন।

"হ্যাঁ, আমি কেরানী হলেও আমার গুরুজন ধরে বেঁধে আমার একটা বিয়ে দেবেন তা জানি, মাসিমা। কিন্তু সেই উল্লাসে আমি পড়াশুনায় ঢিলে দিয়ে নন্দদুলাল হতে পারছিনে। আমার যারা প্রতিযোগী তারা সারা দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের আমি চাক্ষুষ না করলেও তাদের সঙ্গে আমাকে পাল্লা দিয়ে পড়তে হচ্ছে। উৎপলই যদি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হতো তা হলে আমিও সুখে নিদ্রা যেতুম।" রত্ন সকৌতুকে বলে।

"আর তুমিও হয়তো এনগেজড হতে।" মেসোমশায় হেসে ওঠেন।

গৌরীর মুখখানা লাল হয়ে যায়। রত্নও বিব্রত বোধ করে। ওর যা হয়েছে তাও একপ্রকার এনগেজড ছাড়া আর কী ! কিন্তু বিয়ের কথা তার মধ্যে কোথায় !

"ইরা মেয়েটি কে ? দেখতে কেমন ?" গৌরী প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়।

"বর্মার মেয়ে। অসাধারণ স্মার্ট।" রত্ন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?" গৌরীর সলজ্জ প্রশ্ন।

"হবে না কেন ? আমরা যে একসঙ্গে পড়ি। এম-এর কথা বলছি।" রত্নর সহাস্য উত্তর।

"আর সেবাদি না কার কথা বলছিলে ?" গৌরী কৌতূহলী হয়।

"না একসঙ্গে পড়িনে। উনি আমার থেকে সিনিয়র। তবে মাঝে মাঝে আলোচনা বৈঠকে কন্টিনেন্টাল সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা হয়।" রত্ন বিবরণ দেয়।

কিছুক্ষণ পরে মেসোমশায়, মাসিমা এরা একে একে উঠে যান। দুটি একটি কনিষ্ঠ বাকী থাকে। শেষে ওরাও প্রস্থান করে। তখন গৌরী আর রত্ন নিরিবিলি পায়। বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ায় ও নিচের দিকে তাকিয়ে লোক চলাচল দেখে।

"এই জীবনই আমি চেয়েছিলুম। এই যে ছাত্রছাত্রীদের চেনাশোনা ও মেলামেশার জীবন। যাদের কথা বললি তারা তো খ্রীস্টান আর ব্রাহ্ম। হিন্দুর মেয়েরাও কি পড়ে ?" গৌরী জিজ্ঞাসা করে।

"দুটি একটি। তুই যদি ওদের একজন হতিস তা হলে কত ভালো হতো !" রত্ন বলে।

"ওরা কি কুমারী না সধবা না বিধবা ?" গৌরী জানতে চায়।

"কুমারী বা বিধবা। সধবা তো দেখিনে।" রত্ন যতদূর জানে।

"সেইখানেই তো বাধা। আমাকে কেউ পড়তেই দিত না।" গৌরী আক্ষেপ করে।

"বিবাহিতা মেয়েরা ভর্তি হতে চায় না বলেই হয় না। চাইলে কি হতো না ? তোকে আমরা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব, গৌরী। কিন্তু তার আগেকার ধাপগুলো একে একে পেরোতে হবে। বাড়ীতে পড়ে ও প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে।" রত্ন বলে।

"ততদিনে আমি বুড়ী হয়ে যাব।" গৌরী আপসোস করে। "চোদ্দ বছর বয়সে আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে না নিলে আমিও ইরার মতো তোর সহপাঠিনী হতুম, মণি। তেমনি স্মার্ট। আমিও সেবাদির মতো সেন্টিমেন্টাল সাহিত্য—"

"কন্টিনেন্টাল সাহিত্য", রত্ন শুধরে দেয়।

"তার মানে কী ?" গৌরী মিষ্টি চোখে তাকায়।

"তার মানে ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান সাহিত্য। নরওয়েজিয়ান, সুইডিশও তার মধ্যে পড়ে। স্প্যানিশ, পর্তুগীজ—" রত্ন আরো নাম করতে যায়।

"অত বিদ্যা আছে তোর সেবাদির ! আর তোর নিজের ! তা হলে তুই সত্যি একদিন সাহেবদের দেশে যাবি !" গৌরী অবাক হয়ে গালে হাত রাখে।

"সেটা নির্ভর করছে অনেকটা তোর উপরে। তুই যদি না যাস, আমার কিসের গরজ ? আমি তো রেঙ্গুনেই যাচ্ছিলুম।" রত্ন হাসে।

"আমি এই ক'মাসে আরো ভীতু হয়েছি, মানিক। রেঙ্গুন তো কাছে, তবু রেঙ্গুন যেতেও ভয় করে। বম্বের কথা শুনছি, ট্রেনে উঠলে দু'রাতের মামলা। তবু মনে হচ্ছে কোন সুদূর বিদেশ।" গৌরী উন্মনা নয়, আনমনা।

"তা হলে আমরা বম্বের জন্যে তৈরি হব না, বল?" রত্ন আশ্চর্য হয়।

"না, না, অমন কথা বলব না। তৈরি হতেই হবে। আমার অর্ধেক জীবন তো বৃথা গেল। না পারলুম ইরার মতো স্মার্ট হতে, না সেবাদির মতো শিক্ষিতা হতে। কেউ যে কেন আমাকে ভালোবাসবে এটাই আমার কাছে রহস্য। তোর ভালোবাসাও বেশীদিনের নয়। ওরা তোকে কেড়ে নেবে। আমি পারব না বেঁধে রাখতে।" গৌরী করুণ স্বরে বলে।

"দেখছি তোর ইচ্ছা নয় যে আমি আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশি। আচ্ছা, বেশ, তাই হোক। আমিও আরো মন দিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে পারি। সত্যি, ওটা একটা বিক্ষেপ। পাঁচ পাঁচটা মিনিট যদি বাঁচাতে পারি তো এক একজন প্রতিযোগীকে টপকে যেতে পারি।" রত্ন ভরসা দেয়।

"ওরা জানতে পেলে আমাকে ক্ষমা করবে না।" গৌরী কপট ভয়ে হাত জোড় করে।

"ওরা কেউ তোর মতো সুন্দরী নয়। প্রাণবন্ত নয়।" রত্ন ওর হাতে হাত রাখে।

"তবু ওরা অবিবাহিতা।" গৌরী বলে লাখ কথার এক কথা।

"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। রাধা বলে একটি বিবাহিতা মেয়েই তো তাঁকে পেয়েছিল। তখন অবিবাহিতারা ছিল কোথায়?" রত্ন দ্বাপরযুগের দৃষ্টান্ত দেয়।

"পেয়েছিল, কিন্তু হারিয়েওছিল।" গৌরী পরিণাম উল্লেখ করে।

"দৃষ্টান্তটা ঠিক জুতসই হলো না। আচ্ছা, আমরা একটা নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে যাব।" বলে রত্ন ওর চোখে চোখ মেলায়।

"এ জগতে নতুন বলে সত্যি কিছু থাকলে তো?" গৌরীর চোখ ছল ছল করে। "কালচক্রে সবই আবার ঘুরে ফিরে আসে আর যায়। যতক্ষণ বৃন্দাবন ততক্ষণ রাধা। যেই মথুরাযাত্রা অমনি রাধার কাছ থেকে বিদায়।"

"সেবার ও-রকম ঘটেছিল বটে, কিন্তু এবার আর ও-রকম ঘটবে না। মথুরায় যেতে হয় একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" রত্ন আবেগের সঙ্গে বলে। "ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের উপর উপর ছেড়ে দে, মানিক। আমাদের জীবনের বর্তমানটুকুই আমাদের হাতে। এই সন্ধ্যাগোধূলিটি। এই নিভৃতক্ষণটি।" গৌরীর কণ্ঠে আকুলতা।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু তখনো সাঁঝ বাতি জ্বলে ওঠেনি। কেউ কোথাও ছিল না। থাকলেও অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রকাণ্ড বাড়ী।

রত্ন গৌরীর একটি হাত ধরে কথা বলতে বলতে আচমকা ওটি তুলে নিয়ে মুখে ছোঁয়ায়। গৌরীর দুটি গালে দুটি রাঙা গোলাপ ফুটে ওঠে। রত্ন তা দেখে বিহ্বল হয়ে একটি গোলাপের উপর সহসা দুটি ঠোঁট ছোঁয়ায়।

এক নিমেষের ব্যাপার। গৌরী নিমেষের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। আর রত্নর যা স্বভাব। না ভেবে চিন্তে দুম করে একটা কিছু করে বসে। তার পর সমস্তক্ষণ পশতায়। গৌরী

না জানি কী মনে করেছে! কত ব্যথা পেয়েছে! একটি অবলা বালার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নেওয়া কী ভয়ানক অন্যায়!

রত্ন অন্যমনস্ক ছিল। পেছন ফিরে চেয়ে দেখে গোরী। ওর চোখে মুখে আনন্দের আভা। ও ফিক করে হেসে বলে, "একদিন আমি এর শোধ না নিই তো আমার নাম শ্রীমতী নয়। ওই যে ইংরেজীতে বলে, চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত।"

"সেই দিনটির আর কত দেরি?" রত্ন শঙ্কিত হয়ে বলে।

"আগে তো আমি স্বাধীন হই। আমি যে অনিচ্ছুক তা নয়। আমি অক্ষম।" কিছুক্ষণ এই মর্মে গৌরচন্দ্রিকা করে গোরীও অকস্মাৎ বদলা নেয়।

ʼ ৷ার প্রথম দর্শন রত্নকে অবিমিশ্র পুলক দেয়নি। প্রথম চুম্বন তা দিল।

দশ

রত্ন অন্তরে অনুভব করছিল যে গোরীর মুক্তির জন্যে ··· নিজের মুক্তি বিকিয়ে যাচ্ছে। অথচ গোরী যতদিন বন্দিনী ততদিন ওর পক্ষে স্বাধীন থাকাও লজ্জাকর। ওর শিভালরিতে বাধে। ও যে একজন নাইট।

শুধু কি শিভালরিতে? প্রেমেও নয়? ও কি কেবল একজন নাইট? প্রেমিকও নয়? প্রেম চায় মিলনের মধ্যে বিকাশ ও পরিণতি। তার সম্ভাবনা কোথায় যদি গোরীর হাতের বাঁধন পায়ের বাঁধন খসে না যায়? খাঁচার পাখী যদি বনের পাখী না হয়?

বিদ্যুৎ চমকের মতো চকিত চুম্বন রত্নকে যে মাধুর্যের স্বাদ দিয়েছিল তাকে সে দেবতার প্রসাদের মতো আঁচলে বেঁধে রেখেছিল। মাঝে মাঝে আঁচল খুলে মুখে ও মাথায় ঠেকালে খানিকটা আস্বাদন পেত। কিন্তু খাঁচার পাখী সেইভাবে কতটুকু তৃপ্তি দিতে পারে! হতো যদি বনের পাখী তা হলে দানের দ্বারা প্রাণ জুড়িয়ে দিত।

রত্নর প্রেমানুভূতি ছিল মুক্তির অনুভূতির মতোই প্রখর। ওর মনে হচ্ছিল ওর ভিতরের দুয়ার এক এক করে খুলে যাচ্ছে। জগতের রহস্য একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছে। ওর দৃষ্টির অন্তরালে যা ছিল তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ও আরো বেশী দেখছে, আরো বেশী দূর দেখছে। ওর সকল দেহ সহস্র নয়নের মতো উন্মীলিত হচ্ছে।

গোরীকে এ কথা জানাতেই সেও লেখে সেই কথা। প্রেম তাকেও দৃষ্টিমতী করেছে। জগৎ ওর রহস্য উন্মোচন করছে। সেও দেখছে বসে সেই দৃশ্য।

রত্নর হৃদয়ে সর্বদা একটা ভরপুর ভাব। গোরীরও তাই। তবে দু'জনের মধ্যে একটা তফাৎ। ইতিমধ্যেই গোরী ওর শিশুর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল। একটি অস্তিত্বের গর্ভে অপর একটি অস্তিত্ব। ওর চেয়ে বড়ো রহস্য কী আর আছে। গোরীর কাছে প্রেমই একমাত্র অনুভূতি নয়। বাৎসল্যও আর একটি অনুভূতি। সেও জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে।

রত্নর উপলব্ধি যেমন একমুখী, গোরীর তেমনি দ্বিমুখী। ও যেমন একজনের প্রিয়া

তেমনি একজনের সম্ভবপর মা। মা হতে যে ও ভালোবাসে না তা নয়। ওর কথা হলো ও নিজের ইচ্ছামতো সময়ে মা হবে।

হবে আপন মনোমতো পতির ঔরসে। তা তো নয়। তবে কেন এ দুর্ভোগ ! যেখানে এত অনিচ্ছা সেখানে কি বেঁচে থাকাই দুর্ঘট নয় ! যদি মরে তবে ওর মরার জন্যে দায়ী কে ? সন্তানটি যাঁর। রত্ন যদি ওর পতি হতো আর সন্তানটি হতো রত্নর তা হলে ও সানন্দে মরণের ঝুঁকি নিত। কিন্তু এটা হলো তর্কের কথা। আসলে যা হয়েছিল তা এই যে, গৌরী ইতিমধ্যে ওর অনাগত শিশুকে ভালোবেসে ফেলেছিল। সে ভালোবাসাও প্রেমের আর একটি মুখ।

গৌরী একদিন রত্নকে অবাক করে দেয় এই কথা লিখে—

"ছেলে হবে না মেয়ে হবে কে বলতে পারে ? আমার কিন্তু বিশ্বাস আমার কোলে যে আসবে সে হবে তোর মতো দেখতে। ওঁর মতো নয়।"

রত্ন উত্তরে লেখে, "সেটা সম্ভব হতো যদি তুই আরো কয়েক বছর পরে মা হতিস। এখন তোর অদৃষ্টকে মেনে নিতে হবে। তবে আমার নিজের মনে হয় যে আসছে সে হবে মার মতো দেখতে। বাপের মতো নয়।"

এর পরে এই নিয়ে কিছুদিন জল্পনা কল্পনা চলে। গৌরী আশা করছে ছেলে। রত্নর আশা মেয়ে। আশার সঙ্গে মিলিয়ে নামকরণও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কারো সঙ্গে কারো মেলে না। একটি জায়গায় দু'জনের মিল হয়। যিনি আসছেন তাঁকে উল্লেখ করতে হবে ইংরেজীতে 'বেব' বলে। গৌরীর ধারণা ওটা নাকি পুংলিঙ্গ। রত্ন মনে মনে হাসে।

কিছুদিন বাদে দেখা গেল 'বেব' হয়েছে 'বেবু'। রত্ন লেখে, "তা হলে আর একটু এগিয়ে গেলে কেমন হয় ? মাদ্রাজীরা যেমন বলে 'রামন', 'রাঘবন' তেমনি আমরাও কি বলতে পারিনে 'বেবুন' ?"

তা পড়ে গৌরী বিষম চটে যায়। কিন্তু পরে ও আপনা থেকেই প্রস্তাব করে 'বুবুন'। যদি মেয়ে হয়। আর যদি ছেলে হয় ? তবে সেই 'বেব'।

যাঁর ছেলে বা মেয়ে তাঁর সম্বন্ধে গৌরী একটি কথাও লেখে না। যেন তাঁর মতামত একেবারেই অবান্তর। রত্নও তাই নিয়ে খোঁচায় না। ঘুমন্ত কুকুরকে জাগায় না। গৌরী যদি ভুলে থেকেই সুখে থাকে তবে রত্নও সুখী।

গৌরীর চিঠিতে আর নিত্য অভিযোগ থাকে না। বেগমপুর থেকে দূরে সরে থাকা যেন জ্বালামুখীর থেকে শতেক যোজন ব্যবধান রক্ষা।

"ওখানে ফিরে যাবার কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না, মানিক। ওটা আমার পূর্বজন্মের কারাগার।" গৌরী একদিন আপনা হতেই লেখে। "তবে ওরা সবাই আমাকে চায়। একটু অনুশোচনার আভাসও যেন পাই। আমার সঙ্গে উচিত ব্যবহার করেনি বলে যেন একটু সচেতন। আমি কিন্তু অত সহজে ভুলছিনে। মাধব ভিন্ন ওখানে ভালো কেউ থাকলে তো ? মাধব যদি ডাকতেন তা হলে হয়তো আমি দ্বিধা করতুম না। কিন্তু মানুষের ডাক আর আমি শুনতে চাইনে। আমি বধির। আমি পাষাণ। ওরা কেউ আমার নয়।

আমিও ওদের কারো নই। কয়েদী আর প্রহরী।"

গোরী আপনাকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে বেগমপুরের অভ্যস্ত জীবন থেকে। কিন্তু ছাড়িয়ে নেওয়া যত সহজ মনে করেছিল তত সহজ নয়। মানুষের দেহ না হয় অনায়াসে স্থানান্তরিত হতে পারে, কিন্তু তার মন হচ্ছে মনোরথ। রথের একটা চাকা যদি মাটিতে বসে যায় আর সব ক'টা চাকা সেইখানেই ঘুর ঘুর করে। সেই চাকাটাকে টেনে না তোলা তক রথ অচল। তা তুমি যাই বল আর যাই কর। বেগমপুরে গোরীর মনের রথের একটা চাকা মাটিতে বসে গেছে। মাধবকে ও ভুলতে পারছে না।

রত্ন নিজে প্রতিমাপূজক নয়। তাই এ দুর্বলতার মর্ম বোঝে না। যে মেয়ে মুক্তির জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে তার কেন এ পিছুটান? আর এ পিছুটান যদি থাকে তবে তার মুক্তির দৌড় কতটুকু? ও মেয়ে যদি রেঙ্গুনে যেত তা হলে কি মাধবের কাছে ফেরবার জন্যে ব্যাকুল হত না? তার মানে তো যশোমাধবের কাছে আত্মসমর্পণ?

রত্ন তাই প্রতিমাপূজারিণীকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। লেখে, "বাংলা দেশের নারী যদি আধুনিকতার অভিমুখে এগিয়ে যেতে চায় তা হলে তার মনের রথের প্রত্যেকটি চাকা সচল হওয়া চাই। একটি চাকা যদি মধ্যযুগেই আবদ্ধ রয় তবে একটির জন্যে সব ক'টিই স্থিতিশীল হ'ব। মাধবের জন্যেই দেখছি তোর মুক্তি আটকে থাকবে।"

গোরী অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানায়। লেখে, "তোর বোধ হয় ধারণা যে আমি মাধবকেই সব চেয়ে ভালোবাসি। তোকে তার চেয়ে কম। সেটা কিন্তু ভুল। নারী যাকে সব চেয়ে ভালোবাসে তার সঙ্গেই যায়। তোর সঙ্গে আমি পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তেও যেতে পারি, ধন। মাধবের জন্যে স্থিতিশীল হব? ওটা কি একটা কথা হলো? কে জানে হয়তো মাধবকে তুই মনে মনে হিংসা করিস। ও যেন তোর প্রতিদ্বন্দ্বী। দেবতা কি কখনো মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, মণি? আমার চোখে দুই এক। যার নাম মাধব তারই নাম রত্ন। যার নাম রত্ন তার নামই মাধব। কবি বলেছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' ওর চেয়ে সত্য আর কী আছে! আমি যদি মধ্যযুগে পড়ে থাকি তুই আমাকে ঠেলা দিয়ে চালিয়ে দিবি। যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে যাবি। মাধবের সাধ্য কী যে তোর সঙ্গে গায়ের জোরে এঁটে উঠতে পারবে! তবে, হাঁ, ওকেও আমি এক-আধবার দেখতে চাইব। সে দুর্বলতা আমার আছে।"

রত্ন লেখে, "আচ্ছা, মুক্তির পর স্বাধীনভাবে তুই যদি মাধবের দর্শন পেতে চাস তো জ্যোতিদা বা আমি বাধা দেব না। কিন্তু বাধা অন্যদিক থেকে আসতে পারে, গোরী। তখন যেন আপস না করিস। আত্মসমর্পণ না করিস।"

গোরীর স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় তা রত্নর কাছে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছিল। আপনি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সে গোরীকেও প্রতিষ্ঠিত করবে। গোরী হবে সর্বতোভাবে স্বাধীনা নারী। সে যাকে ভালোবাসবে তাকে বিয়ে করবে, যদি বিয়ে করতে ইচ্ছা থাকে, বাধা না থাকে। নয়তো বিয়ে না করেও তার ঘর করবে ও তা করতে গিয়ে সমাজের সঙ্গে লড়বে। লড়তে যদি প্রস্তুত না থাকে তবে একসঙ্গে থাকা হবে না। তখন স্বাধীন জীবনের অর্থ হবে মিলনহীন জীবন। নিঃসঙ্গ জীবন। গোরী যদি তেমন স্বাধীনতা পছন্দ

করে তবে তাই হবে।

স্বাধীনতা বলতে আরো বোঝায় গোরী যদি পরে ওর পুরুষোত্তমের দর্শন পায় তা হলে তাঁকেই মনপ্রাণ অর্পণ করবে। রত্ন তখন স্বেচ্ছায় সরে যাবে। সরে যাবার পর তার স্থান হবে জ্যোতির অনুরূপ। জ্যোতির মতো সেও নীরবে বন্ধুকৃত্য করবে। একেবারে বর্জন করবে না। ভালোবাসা যতদিন না আপনা থেকে নিঃশেষ হয় ততদিন সে স্বতঃ অনুগত থাকবে, কিন্তু প্রেমিক হিসাবে তার আর কোনো দায় থাকবে না। সেও স্বাধীন। যদি অপর কোনো নারী তাকে ভালোবাসে তখন গোরী কেন কিছু মনে করবে?

"ওঃ! ওইসব কথা ভাবা হচ্ছে। ওরই নাম পরীক্ষার পড়া!" গোরী রাগ করে। "নিজের মনের কথাটিকে আমার উপর চাপিয়ে কার চোখে ধূলো দিবি, যাদু? মনে করেছিস আমি টের পাব না? তুই নিজেই যে তোর নায়িকা উত্তমার সন্ধানে আছিস। একবার তাঁর দর্শন পেলে কি আর এ অধমাকে মনে ধরবে? তখন তুই স্বেচ্ছায় সরে পড়বি। আমি তো সেই ভয়েই সারা হচ্ছি। যে পুরুষের হাত আমি ধরব সে পুরুষ কি হাত ছাড়িয়ে নেবে না? তার জীবনে কি আর কোনো নারী আসবে না? আসবে কী, এসেছে। আমার কথা যদি জানতে চাস আমি বলব আর কোনো পুরুষকে চিনিওনে, জানিওনে, চাইওনে। যতদূর দৃষ্টি যায় একমাত্র তুই আমার জীবন জুড়ে আছিস ও থাকবি। তোর প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যদি কেউ থাকে তো সে আমার অনাগত সন্তান। কিন্তু সে তো তোরও সন্তান। নয় কি?"

রত্ন আশ্বাস দেয়, "হাঁ, সে আমারও সন্তান।"

গোরী একদিন একখানা চটি বই পাঠিয়ে দেয়। অলিভ শ্রাইনারের 'ড্রিমস' গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ। নারীর সন্তানসাধ অকপটভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বোঝা যায় গোরীও সন্তানস্বপ্নে বিভোর। অথচ তেমন স্বপ্ন রত্নর জীবনের দিকচক্রবালে এখনো উদিত হয়নি। সে বয়সই তার নয়। নারী তার সন্তানের পিতা মনোনয়ন করবে, বেশ তো। কিন্তু তার জন্যে যদি রত্নকে মনোনয়ন না করে, অপরকে মনোনয়ন করে?

এগারো

গোরী ওর অনাগত সন্তানের স্বপ্নে বিভোর। ওর সেই সাত রাজার ধন মানিককে নিয়ে কী করবে, কোথায় রাখবে ভেবে পায় না। শুধু স্বপ্ন দেখে আর স্বপ্নটাকে উপভোগ করে। রত্ন যে কঠোর তপস্যায় মগ্ন তা কি ও জানে না? জানে, তবু উপভোগের ভাগ দেয়। যেন রত্নই ওর সন্তানের জনক।

রত্ন অবশ্য আনন্দ বোধ করে ও প্রকাশ করে। সেটা কিন্তু গোরীর আনন্দেই আনন্দ। পিতা হতে যাওয়ার আনন্দে আনন্দ নয়। সে উপলব্ধিই তার নেই। গোরীর আনন্দ যদি হয় সূর্যালোক তবে রত্নর আনন্দ চন্দ্রালোকের মতো তার প্রতিফলন।

আনন্দের মাঝখানে অস্পষ্ট একটা অনুভূতি জাগে। কই, রত্নকে তো কেউ

মনোনয়ন করেনি ? না পুরুষরূপে না সন্তানের জনকরূপে। ওকে ভাগ দিলে ও নেবে কোন মুখে ? ও সহানুভবী। সমানানুভবী নয়।

কিন্তু গোরীকে জানায় না অত কথা। কী দরকার বেচারিকে বিব্রত করে। যখন একসঙ্গে যাত্রা করাই দু' জনের সিদ্ধান্ত। এক যাত্রায় পৃথক ফল চায় কে ? গোরীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পা মিলিয়ে নেওয়াই রত্নর কর্তব্য। যেটা করণীয় সেটাকে আনন্দের করে নিতে হয়। আনন্দের করে নেওয়াটাই সুবুদ্ধি।

গোরীর চিঠিপত্রে বেগমপুরের কথা একেবারেই থাকে না। ওটা যেন ওর পূর্বজন্মের মতো বিস্মৃত। থাকে কৃষ্ণনগরের গল্প। এক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে ও সই পাতিয়েছে। সইটি ওর চেয়েও দুঃখিনী। ওর স্বামী ওকে নেয় না। ওকেও এখন লেখাপড়া শিখে লায়েক হতে হচ্ছে। সম্ভব হলে ডাক্তারি শিখবে। চাহিদা তো রয়েছে। বাধছে সংস্কারে। গোরী তাই ওর সইকে বলছে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে।

"মানা আমাব সই ওর স্বামীকে এক মুহূর্তের জন্যেও মনের আড়াল করতে পারছে না। কে জানে ওর স্বামী হয়তো ওকে ফিরিয়ে নিতে আসবে। ফিরে যাবার পথ বন্ধ করা কি উচিত ? ডাক্তারি করতে গেলে পথ খোলা থাকবে না। ওদের যা সংস্কার ওরা কিছুতেই ডাক্তার বউকে ঘরে নেবে না। তা হলে দেখছিস তো, মণি, সংস্কার এক তরফের কাটলেও আরেক তরফের কাটে না। তা হলে বরাবরের মতো স্থির করতে হয় যে আর স্বামীর ঘর করবে না। মানা কি প্রাণ ধরে পারে ওকথা ভাবতে ? কোনো মেয়ে পারে ? আমি সেই জন্যে ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। পথ নির্দেশ করা সহজ, কিন্তু যাকে নির্দেশ করা হলো সে যদি ও পথে চলতে দ্বিধা করে তা হলে কী করা যায় ? দুর্ভোগে ভুগছে, ভুগবে। মানার জন্যে আমার দুঃখ হয়। ওর তো তোর মতো কেউ নেই যাকে ধরে ও দাঁড়াবে।" গোরী লেখে।

সমস্যা বইকি। স্বামী পরিত্যক্তাও আশা ত্যাগ করতে পারছে না একদিন স্বামীর কৃপা হবে। তারপর ষষ্ঠীর কৃপা। সেই জন্যে ডাক্তারের কন্যা হয়েও ডাক্তারি শিক্ষার সুযোগ থাকলেও ডাক্তারির পথে যাবে না। পাছে গতানুগতিক পথভ্রষ্ট হয়। গোরীও যেমন, ওর ধারণা মানারও যদি কেউ একজন থাকত যাকে ধরে ও দাঁড়াত। না, তেমন কোনো অবলম্বন রত্নর সন্ধানে নেই। সাত ভাই চম্পা ভেঙে গেছে। নইলে বন্ধুদের বাজিয়ে দেখত।

এক নবনীর সঙ্গেই কদাচিৎ দেখা হয়। সে এখন চাকরি নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। সময় পায় না, পেলে মাসিকপত্রে লেখে। কানন চলে গেছে ট্রেনিং কলেজে। ললিত তো জাপানে। প্রভাত সরকারী চাকরির ধাঁধায় ঘুরছে, এখনো পায়নি। হৈম আইন পড়ছে। রত্নর যখন ছুটি ওর তখন কাজ। একদিন এসেছিল খোঁজ নিতে। রত্নর ব্যাঘাত হচ্ছে বুঝতে পেরে উঠল।

এখন এক-একজনের জীবনে এক-একরকম অভিজ্ঞতা। তাই কারো সঙ্গে কারো সুর মেলে না। সাত ভাই চম্পা এখন সাতজনের একটি সপ্তক নয়। রত্ন তার চম্পাভাইদের কাছে সব কথা খুলে বলতে সাহস পায় না। পাছে জানাজানি হয়ে যায়।

তখন গৌরীর উপর কড়া পাহারা বসবে। তার বন্ধনমোচনে বাধা পড়বে।

প্রাণের বন্ধুদের কাছে কোনো কথা গোপন করলে তারা আর প্রাণের বন্ধু থাকে না। রত্ন এর জন্যে দুঃখিত। কিন্তু নিরুপায়। তার তো ইচ্ছা গৌরীকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে। আইনে না বাধলে বধূরূপে। সমাজটা যদি তার ইচ্ছায় চলত তা হলে তো কোনো ঝামেলাই ছিল না। তা যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন দায়ে ঠেকে লুকোচুরি করতে হচ্ছে। এর জন্যে সে লজ্জিত।

"মানাকে আমি আমাদের কথা বলেছি।" গৌরী লেখে। "ও সমর্থন করে। কিন্তু বুঝতে পারে না কেমন করে আমাদের কাহিনীর সুখকর সমাপ্তি হবে। সমাজ কি ক্ষমা করবে ! গুরুজন কি আগুন হবেন না ? তা হলে কি সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে দিয়ে আমরাই হব আমাদের একমাত্র আত্মীয় ? সংসারটা যদি একটা নির্জন দ্বীপ হতো তা হলে আমরাই আমাদের নিয়ে থাকতুম, আর কারো মুখাপেক্ষী না হলেও চলত। যেমন রবিনসন ক্রুসো আর তার অনুচর ফ্রাইডে। কিন্তু তোমরা তো আমাকে তেমন কোনো দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছ না। বঙ্গে বা বিলেত কোনোটাই নির্জন দ্বীপ নয়। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিলেও প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে হবে। তাদের সমর্থন পাব তো ? না তাদের কাছে মিথ্যে পরিচয় দিতে হবে ? মানিক রে, আমি যে এর উত্তর খুঁজে পাইনে। আমি চাই সত্য পরিচয় দিতে, যাই থাক কপালে। কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে আমার মনের জোর কমে যায়। আমিও তখন আর একটি মানা। তেমনি দুর্বল।"

রত্নকে ভাবিয়ে তোলে এ রকম চিঠি। এ সমস্যার সমাধান করবে কে ? তারই মতো আর একজন নাইট ? তারই মতো প্রেমে পড়বে ? প্রেমাস্পদ হবে ?

যতই ভাবে ততই বোঝে যে, এ সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে সমাজ। সমাজকেই করতে হবে এর সমাধান। বিয়ের সময় সব কিছু হিসাবের মধ্যে আনা হয়, হয় না শুধু কুমার কুমারীর হৃদয়। মানারও বিয়ে নিশ্চয়ই দেখে শুনে দেওয়া হয়েছিল, সুপাত্রেই নিশ্চয়। কিন্তু ওর আর বরের হৃদয় কী বলে তা কোনো ডাক্তার স্থেথোস্কোপ দিয়ে শোনেননি। হৃদয়কে যদি তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা হয় হৃদয়ও নির্দয় হয়ে প্রতিশোধ নেয়।

যে কোনো দু'জন ছাত্রকে ছাত্রাবাসের একখানা ঘরে রাখা যায়, কিন্তু তা বলে তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায় না। এই যেমন উৎপল ও রত্ন। এরা সহাধ্যায়ী, এরা ভদ্র, এরা বনিয়ে চলে। কিন্তু কার মনে কী আছে তা জানে না, জানতে চায় না। পরিচয় দেবার সময় বলে, "আমার বন্ধু উৎপল" বা "আমার বন্ধু রত্ন"। কিন্তু সেটা হলো সাধারণ অর্থে বন্ধু। তেমন বন্ধু তো অনেকেই। গভীরতর অর্থে বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে রত্নর বেলা জ্যোতিদা ও সাত ভাই চম্পার ক'জন। আর তার বাল্যবন্ধু হীরু।

না, বন্ধুতাও ধরে বেঁধে হয় না। মানুষের হৃদয় নিজেই নিজের বন্ধু বেছে নেয়। তেমনি নিজের প্রিয়া বা প্রিয়। এটা তার জন্মস্বত্ব। কিন্তু সমাজ কি তার এই স্বরাজের দাবি স্বীকার করবে ? না, এর জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। গৌরী যেমন সংগ্রাম করছে। মানাকেও হয়তো একদিন তেমনি সংগ্রাম করতে হবে। বিনা সংগ্রামে এ দেশের নারী তার প্রেমের অধিকার অর্জন করতে পারবে না। এ দেশের পুরুষও কি পারবে ? পিতৃভক্ত

মাতৃভক্তের দল অম্লানবদনে পণযৌতুকের বিনিময়ে পাণিগ্রহণ করে। প্রেমের মূল্য বোঝে ক'জন। সেবাযত্ন পেলেই ওরা ধন্য হয়ে যায়। সেই সঙ্গে শয্যাসুখ।

হয়তো সেবাযত্ন বা শয্যাসুখ কোনো একটা বিষয়ে ফেল করেছে মানা। গৃহকর্মেও হতে পারে। হয়তো স্বামীকে সন্তানসুখে সুখী করতে পারেনি। কিন্তু কী হবে এ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ? এ রকম তো একটি-দুটি নয়। কথা হচ্ছে এরা কি এদের স্বামীদের সুমতির অপেক্ষায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, না নিজেরাই করেকর্মে খাবে ? চাকরিবাকরি বা ডাক্তারি নার্সগিরি করবে ? মানা যদি ডাক্তারি শেখে ওর স্বামী ওকে কোনো দিনই নেবেন না। তাই বলে ও দিন দিন অকর্মণ্য হবে ?

রত্ন পরামর্শ দেয় মানাকে, গড়িমসি না করে মনঃস্থির করতে। আর কিছু দিন পরে ওর ডাক্তারি পড়ার বয়স গড়িয়ে যাবে। তখন ওকে স্বামীর পায়েই দাসখৎ লিখে দিতে হবে। কে জানে হয়তো সতীনের ঘর করতে হবে। আর নয়তো বাপের বাড়ীতেই থেকে যেতে হবে।

এই সূত্রে মানা মেয়েটির সঙ্গে পত্রালাপ। রত্নকে দাদা বলে ডাকে আর নিজের করুণ কাহিনী শোনায়। বড়লোকের মেয়ে। ওর বাবা ওর জন্যে যা রেখে যাবেন তা ওর সারাজীবনের উপার্জনের চেয়েও বেশী। তা হলে চাড় কিসের ? কেন পরিশ্রম করবে ? গোরীর মতো আত্মাভিমান নেই, যেটুকু আছে সেটুকু স্বামীর কাছ থেকে লাঞ্ছনার ফল। ওর বিশ্বাস ও যদি কৃচ্ছ্রসাধনা করে তবে ওর স্বামীর মন একদিন ভিজবে। সুতরাং ডাক্তারি শিখতে যাওয়া কেন ? আইডিয়াটা ওর নিজের নয়, গোরীই ওর মাথায় ঢুকিয়েছে। দেশের মেয়েদের স্বাবলম্বনের দীক্ষা দিতে চায় গোরী। যাতে তারা স্বামীদের মুখাপেক্ষী না হয়। স্বামীরা হাজার ভালো হলেও স্বামী তো! স্বামী মানে মালিক। আমেরিকার ক্রীতদাসদের মালিকরাও কি বহুক্ষেত্রে সজ্জন ছিলেন না ?

কথা হলো নরনারী সম্পর্কটা স্বামী-দাসী সম্পর্ক নয়। যদি কোনো এক দেশে ও কোনো এক কালে স্বামী-দাসী সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তবে আমেরিকার মতো গৃহযুদ্ধ করাই শ্রেয়। কত মেয়ের সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে, জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তবু সংগ্রামের শেষে সমাজ সুস্থ হবে। নরনারী প্রকৃতিস্থ হবে। গোরী মানাকে ভজায়, কিন্তু মানার দোটানা যায় না। ওর মালিকের কাছে ফিরে যেতে ও পা বাড়িয়ে রয়েছে। ডাক আসছে না এই যা দুঃখ। বাপের বাড়ীতে কিসের অভাব! কিন্তু স্বামী থাকতে স্বামীর অভাব কি কেউ ভুলতে পারে!

গোরীর সঙ্গে চিঠিপত্রে এটাও পরিষ্কার হয় যে, প্রথার পরিবর্তন গোরীর অভীষ্ট নয়। ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইলেও তার সুযোগ কোথায় এদেশে যে, সেটাকে ও সর্বত্র প্রবর্তন করবে ? সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া যেমন চলে এসেছে তেমনি চলতে থাকবে। শুধু দেখতে হবে যে বর কনে দু'জনেই দু'জনের মনোনীত। পছন্দের অধিকার দুই পক্ষেরই থাকবে। ক্রীতদাসীর মতো যদি কোনো মেয়েকে তার মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার বিদ্রোহের অধিকার মেনে নিতে হবে। সে বিদ্রোহ করে প্রথমে হবে স্বাধীন তথা স্বাবলম্বী, পরে যদি মনোমতো বর পায় তবে আবার বিবাহ

করতে পারবে।

তা বলে ডিভোর্স গৌরীর সংস্কারসম্মত নয়। মুসলমানদের মতো তালাক! মা গো! একজনের সঙ্গে বিবাহগ্রন্থি ছিন্ন না হলে আর একজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে যুক্ত হওয়া যায় কি? কেন হবে না? পুরুষের বেলা তো অবাধে হচ্ছে। আগে ওটা বন্ধ কর দেখি। বহুবিবাহ যেদিন বন্ধ হবে বিবাহবিচ্ছেদ সেদিন চলতি হবে।

গৌরীর মন ওইভাবে কাজ করে। বিবাহবিচ্ছেদ বা পুনর্বিবাহ কোনোটার বেলা ও সীরিয়াস নয়। যাদের বেলা সীরিয়াস তারা হলো মুক্তি আর প্রেম। জ্যোতি ও রত্ন ওকে মুক্তি এনে দেবে। রত্ন এনে দেবে প্রেম।

বারো

চিঠি পেলে রত্ন প্রথমে দেখে নেয় কার চিঠি! লিখেছে কে! ওঃ মানা! মানার চিঠি পরে পড়লেও চলবে। এখন সময়াভাব।

পরে পড়তে গিয়ে চমকে ওঠে। এ কী! এ কে! এ তো মানা নয়। এ যে মালা। মালাদি। পরিষ্কার লেখা নয়, তাই ল পড়তে পড়েছে ন।

তারপর মালাদি কোনখান থেকে? এই কলকাতা থেকেই। হায়, হায় কী দুঃখের কথা! ওর বাবার স্বর্গলাভ হয়েছে। কাশীর পাট তুলে দিয়ে মাকে নিয়ে ও কলকাতা চলে এসেছে। এখানকার বাড়ীর একাংশ ভাড়াটেরা ছাড়ছে না। কোনোরকমে ঠাসাঠাসি করে চালাতে হচ্ছে। কারো জন্যে কিছুই আটকায় না। শোক পেয়ে মনে হয়েছিল আর কেন বেঁচে থাকা। কার জন্যেই বা। নিজে তো চিররুগ্ন। মায়ের সেবা করবে না মাকে বুড়ো বয়সে খাটিয়ে নেবে। পড়াশুনা একটুও এগোয়নি। প্রাইভেটে বি-এ দিতে ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ভাবছে কলকাতায় দেবে। যদি শরীরে কুলোয়। যদি কেউ দেখিয়ে দেয়। রত্নর কি চেনাশুনা কোনো মহিলা আছেন, যিনি দয়া করে দেখিয়ে দিতে রাজী হবেন? হ্যাঁ, মহিলা হলেই ভালো হয়। কেন তা রত্নকে খুলে বলতে হবে না বোধ হয়।

না, রত্নকে বলতে হবে না। ওর মনে আছে। মালাদির মা যেমন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির, কোনো ভদ্রলোক কখনো টিউটর হয়ে তিষ্ঠতে পারবে না। যদি না হয় কানা কি খোঁড়া, কালা কি বোবা, বুড়ো কি মড়া। বেচারি মালাদি! ও যে রূপে একটি বিদ্যাধরী তা নয়, ও হচ্ছে বিধবা। বিধবাকে যদি কেউ ফুসলিয়ে নিয়ে যায় তা হলে কী হবে গো! যদি বিয়ে করে তা হলে তো আরো ঘেন্নার কথা। ও মেয়েকে আবার ঘরে ঠাঁই দিতে হবে। ওর ছেলেমেয়েকে নাতিনাতনি বলে স্বীকার করতে হবে। সনাতন হিন্দুসমাজে এমন স্বেচ্ছাচার! কত বড়ো বংশের কত উঁচু মাথা যে ধুলোয় মিশিয়ে যাবে! তখন কি ছোট মেয়ের সুপাত্র জুটবে, না বিয়ে হবে!

সুপাত্র দেখেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মালাদির। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উজ্জ্বল রত্ন। উনিই ওকে পড়াশুনায় এগিয়ে দেন। নইলে ছাত্রী হিসাবে ওর তেমন যোগ্যতা ছিল

না। ওর ছিল গানের দিকে টান। কিন্তু অনুশীলনের অবসর ছিল না। না বাপের বাড়ী, না শ্বশুরবাড়ী, কোনোখানেই গানের চর্চা ছিল না। ছিল অর্থচর্চা। অর্থকরী বিদ্যাচর্চা। ওর স্বামী অবশ্য অর্থের কথা ভেবে ওকে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বলেননি। বলেছিলেন ওরই মানসিক উৎকর্ষের জন্যে। ছেলেমেয়েরা যাতে আরো ভালোভাবে মানুষ হতে পারে। ছেলেমেয়ে হয়নি। তার আগেই স্বামী হঠাৎ বসন্ত হয়ে মারা যান।

পড়াশুনায় সত্যি যে ওর মন ছিল তা নয়। পতির ইচ্ছাই সতীর ইচ্ছা। কিন্তু বৈধব্যের পর যাঁরা ওকে পড়াতে আসেন তাঁদের একজন ওর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন। ততদিনে পতির স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে। শোকের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তি নেই। বছরখানেকের বিবাহিত জীবনকে ক'বছর জড়িয়ে ধরে থাকা যায়! ওটা যেন স্বামীর শবকে কোলে নিয়ে বেহুলার মতো ভেলায় ভেসে চলা। শেষ পর্যন্ত কোলে থাকে কঙ্কাল। মালাদির বেলাও তাই হয়েছিল। ও মনে মনে প্রীত হলেও সমাজভয়ে ভীত। আরো ভয় মাকে আর বাবাকে। মা ওকে নিয়ে কাশীবাস করছিলেন। যাতে ধর্মকর্মের মধ্যে ও বেচারি শান্তি পায়। বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন, মাঝে মাঝে কাশী যেতেন। শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কাশীধামেও মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারে না। শিব যেখানে মদনও সেখানে। এবার কিন্তু শিবকে ভোলাতে নয়, শিবের কাছে আশ্রয়প্রার্থিনী অষ্টাদশী তপস্বিনীকে ভোলাতে। মালাদি ওর দু' গুণ বয়সী শিক্ষাব্রতীকে শিবের মতোই ভক্তি করত। তিনি ত্যাগী পুরুষ। বেতন নিতেন না। ওটা তাঁর সমাজসেবার অঙ্গ। তাঁর অভিলাষ মালাও তাঁর সমাজসেবার সাথী হয়। দীর্ঘজীবন সামনে পড়ে রয়েছে। কী নিয়ে দিন কাটবে ওর? চাকরি তো করবে না, করতে হবে না। বাপ মা কি চিরকাল থাকবেন?

মালা ভাবতেই পারে না যে ওর আবার বিয়ে হবে। বিদ্যাসাগর মশায়কে ও দেবতার মতো ভক্তি করলেও বিধবার পুনর্বিবাহ ওর চক্ষে পাপ। মাস্টার-দা কি ওকে পাপ করতে প্রবর্তনা দিচ্ছেন? উনিও অপ্রস্তুত হন। কথাটা কেমন করে মা [illegible] কানে যায়। বাবা নির্বোধ নন। বোঝেন যে ওই একমাত্র সমাধান। কিন্তু ওঁর নৈতিক সাহস ওঁর সুবুদ্ধির তুলনায় কম। উনি বলেন, "মালা এখনো নাবালিকা বললেও চলে। আরো কিছুদিন যাক। আগে তো ও গ্র্যাজুয়েট হোক। তারপর নিজে ভেবেচিন্তে উত্তর দেবে।" মা কিন্তু সোজা জবাব দিলেন মাস্টারকে। শুনিয়েও দিলেন দশ কথা। বিনা বেতনে পড়ানোর ছলে কী করতে আসা হয়েছিল বাবুর? 'পেম'? 'পেম' করেও যথেষ্ট হয়নি। বলে কিনা বিয়ে করতে চায়! অত বড়ো পাপ কি আর আছে!

মালাদি বিধবা হয়ে অবধি একটা না একটা অসুখে ভুগে আসছে। মাস্টার-দা লোকের চিকিৎসাও করেন। হোমিওপ্যাথি। ওঁর কাছে থাকলে মালাদিকে উনি সারিয়ে তুলতেন। ওঁর মতে সব অসুখের মূলে একটাই অসুখ। অ-সুখ। বৈধব্য থেকেই তার উৎপত্তি। বৈধব্যের প্রতিকার করলে তারও প্রতিকার হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মালাদি চায় ওর শোককে পুষে রাখতে। একবার দাগা পেয়ে ওর আশঙ্কা ছিল যে একজনের মতো আরেকজনকেও হারাবে।

কিন্তু যেটা ওর সব চেয়ে গোপন কথা, যেটা ও কাউকেই খুলে বলত না সেটা হচ্ছে এই যে মাস্টার-দাকে ও সত্যি কামনা করত। কিন্তু কামনাপূরণ যে পাপ। উনিও সেটা অনুমান করেছিলেন বলেই বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। উনিও যে নিষ্কাম পুরুষ ছিলেন তা নয়। নারীর কামনা যে কী বস্তু তাও তাঁর জানতে বাকী ছিল না। কাশীতে এত যুবতী বিধবার ভিড় কেন তার রহস্য তিনি জানতেন। তিনি মুখ দেখেই বলতে পারতেন কে তাঁর কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে, কে ধরা দিতে এসেছে।

মাস্টার-দাকে হাঁকিয়ে দেবার পর থেকে মালাদির আর পড়ে সুখ নেই। কত লোক এল গেল। ও আর কাউকেই পছন্দ করে না। তাই পরীক্ষা দেয় না। বি-এ পড়তেই চার বছর কাটল। পড়েছে যত ভুলেছে তার চেয়ে বেশী। ওর ছোট ভাই বিধু কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থেকে এম-এ পড়ছে। তা পড়ুক। পড়াশুনা পুরুষমানুষেরই কাজ। মেয়েদের কাজ তা নয়। মালাদির মা শুনেছেন ইংরেজীতে লেখা আছে, মেন মাস্ট ওয়ার্ক অ্যাণ্ড উইমেন মাস্ট উইপ। পুরুষমানুষ কাজ করবে, মেয়েমানুষ কাঁদবে, ইহাই নিয়ম।

ইতিমধ্যে ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি একটু যেন উদার হয়েছেন। আগের মতো বজ্র আঁটুনি আর নেই। মালাদিকে অত বেশী চোখে চোখে রাখেন না। তা বলে কলেজে ভর্তি হতে দেবেন তা নয়। পড়তে হলে বাড়ীতেই মাস্টার রেখে পড়তে হবে। ওটাই ওবাড়ীর রেওয়াজ। বিশেষ করে সধবা কিংবা বিধবা মেয়ের বেলা। কলকাতায় বহুকাল পরে ফিরে এসে মালাদির মা দেখেও দেখতে চান না যে হাওয়া বদলে গেছে। আগেকার মতো কড়াকড়ি আর নেই। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষাও চলছে।

মালাদির চিঠি পেয়ে রত্নর মনে পড়ে যায় একদিন এই মেয়েটিকেই সে দেবী বলে উপাসনা করত। তার জীবনের প্রথম প্রেম। দেবী থেকে ক্রমে ক্রমে ও হলো বিয়াট্রিস। যাকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। তার বিয়াট্রিসের প্রতি তার আনুগত্য এই সেদিন অবধি সত্য ছিল। গোরী এসে মালাদিকে সরিয়ে দিয়েছে এককোণে। যেখানে সে বিরাজ করছে যাদুঘরে রক্ষিত মর্মরমূর্তির মতো। নিখুঁত নিটোল অথচ অনুষ্ণ। হাজার চেষ্টা করলেও সে উত্তাপ জাগিয়ে তোলা যাবে না। মালাদিকে আর অসাধারণ মনে হয় না। অসাধারণ হচ্ছে গোরী। এ বিশ্বের একমাত্র নারী। না, দেবী নয়, নয় বলেই এত মধুর। মাধুর্য আস্বাদনের জন্যে শ্রীকৃষ্ণ কি দেবীদের কাছে যেতেন, না গোপীদের কাছে? রত্নর জীবনেও তেমনি মাধুর্যের পিপাসা এসেছে। পিপাসা মেটানোর জন্যে এসেছে পানীয় জলের গাগরী। মালাদি এখন নিতান্তই দিদি বিশেষ। বয়সেও কিছু বড়ো।

মালাদির চিঠির উত্তরে রত্ন ওকে স্বাগত জানিয়ে বলে, "মহিলাদের মধ্যে আমার যাঁদের সঙ্গে আলাপ তাঁদের একজন হয়তো রাজী হবেন। তিনি আরো একটি মেয়েকেও পড়ান। সপ্তাহে দুদিনের বেশী সময় দিতে পারবেন না কিন্তু।"

একদিন রত্ন মালাদির সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দিয়ে আসে যে সেবাদি আপাতত একটির জায়গায় দুটি ছাত্রী নেবেন না। কাজেই অন্য চেষ্টা করতে হবে। দেখা গেল মালাদিরও মহিলা টিউটরের জন্যে মাথাব্যথা নেই। তার চেয়ে টিউটর না থাকাই ভালো।

পাশ যে করতেই হবে এমন কী কথা আছে!

সেইদিনই নিভৃতে মালাদি বলে, "তোমাকে আমি আমার বন্ধুর মতো মনে করি। চাণক্য উপদেশ দিয়ে গেছেন, ষোল বছর বয়স হলে পুত্রের সঙ্গেও মিত্রের মতো ব্যবহার করতে হয়। তা হলে ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতো নয় কেন?"

"হাঁ, বয়সটা যখন ষোল নয়, একুশ।" রত্ন স্মরণ করিয়ে দেয়।

"তা হলে শোন, লক্ষ্মীটি। এই চিঠিগুলো নিয়ে যাও। এ বাড়ীতে রাখা নিরাপদ নয়। কে কখন চুরি করবে। পরে যদি আমার দরকার হয় ফেরত দিয়ো, ভাই। আশা করি হারিয়ে ফেলবে না। মনে রেখো এ আমার প্রাণ।" মালাদি প্রাণ সঁপে দেয়।

"তোমার স্বামীর চিঠি বুঝি!" রত্ন দুষ্টুমি করে।

"হায়!" মালাদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। "সে ভাগ্য কি আমি করেছি যে তাঁর মতো মহাদেবকে স্বামীরূপে পাব! তুমি কি জান না রতন, আমার সেই দুঃখের কাহিনী?"

রত্ন মুচকি হাসে। "তুমি না বললে আমি জানব কী করে? তবে সেবার কাশী গিয়ে আমি চোখ কান খোলা রেখেছি। কথাটা কানে এসেছে। কোন সূত্রে তা ফাঁস করব না।"

মালাদি করুণভাবে তাকাতেই রত্ন গলে যায়। বলে, "তোমার কাছে যিনি মাস্টারদা আমার কাছে তিনি ঝন্টুদা। তিনিও আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যেমন তুমি। মাঝে মাঝে কুস্টিয়ায় আসেন। তখন আমাদের বাড়ী দেখা করে যান। আমার যিনি হেড মাস্টার মশায় ওঁকে তিনি পড়িয়েছেন। হেড মাস্টার মশায়ের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধটা প্রকৃত গুরুশিষ্যের। তাই জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলেন। পরামর্শ নেন। হেড মাস্টার মশায়ের মতে এ বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। হয়নি বলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। অন্য মেয়েকে বিয়ে করা অনুচিত।"

তা শুনে মালাদির মুখে স্বর্গীয় আভা। "সত্যি? না, বানিয়ে বলছ?"

"সত্যি। এখন পর্যন্ত উনি কোনো মেয়েকে কথা দেননি। কিন্তু ওঁকে আর তুমি ঘুরিয়ো না, মালাদি। পরে হয়তো পশতাবে।" —রত্ন ওয়ার্নিং দেয়।

"চিঠিগুলো পড়তে দিয়েছি। পরে কথা হবে।" মালাদির চোখে কৌতুক।

তেরো

গৌরীর যখন উদয় হয়নি তখন এই মালাদিই রত্নর অন্তরাকাশ আলো করে থাকত। এখন সেসব দিনের কথা ভাবতে হাসি পায়। ওটা কি প্রেম, না দেবীপূজা? গৌরীর যেমন বীরপূজা। রত্ন ও পর্যায় ছাড়িয়ে এসেছে।

মালাদিকে বিয়াট্রিস মনে করে দান্তের মতো কামগন্ধহীন প্রেম অনুভব করা, এটা ছিল ওর পরের পর্যায়। এটাও সে অতিক্রম করেছে। গৌরীর প্রেমই এখন তার সাধ্য-শিরোমণি। আর পেছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছা নেই। পিছু হটা যায় না। মালা এখন

বাসিফুলের মালা।

রত্নব কাছে। কিন্তু ঝণ্টুদার কাছে নয়। তাঁর কাছে ও তাজা ফুলের মালা। তিনি ওকে আদর কবে গলায় পরতে চান। তার জন্যে চার বছর ধরে অপেক্ষা করছেন, আর কতকাল করবেন? তিনিও যে যৌবনের শেষ প্রান্তে।

মালাদি যদিও ঝণ্টুদাব চিঠি বত্নকে পড়তে দিয়েছে তবু পরের চিঠির প্রাইভেসী ভঙ্গ করা কি উচিত? ঝণ্টুদা শুনলে কী ভাববেন? প্রেমপত্রেব জগতে তৃতীয়জনের প্রবেশ মানা। তেমন কেউ এসে জুটলে প্রেমপত্রই বন্ধ হয়ে যায।

সেইজন্যে রত্ন ওই চিঠিব তাড়াটা শিকেয় তুলে রেখেছিল। কিন্তু মালাদিই ওকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাখতে পারবে না, ফেরত দিতে হবে। তার আগে যেন একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। যদি না পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি হয।

রত্ন চিঠি তাড়া খুলে বসে। না, প্রেমপত্র যাকে বলে তা নয়। শুরুতে "স্নেহের মালা," শেষেব দিকে "স্নেহ জেনো"। তারপর "ইতি। শুভাকাঙ্ক্ষী মাস্টারদা।" ফী চিঠিতেই এই। চিঠিব সংখ্যাও রাশি রাশি নয়। মাসে দু'মাসে একখানা। আকাবও সাধারণত বড়ো নয়। আব বড়ো হলে তাতে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ক্রমেই তাঁব প্রত্যয হচ্ছে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হলে মুসলমানদের সঙ্গে বংশবৃদ্ধিব দৌড়ে হার হবে। তখন আবার মুসলিম আধিপত্য।

ঝণ্টুদা এমনভাবে আটঘাট বেঁধেছেন যে চিঠিগুলো যদি মালার গুরুজনের হাতে পড়ে তবে তাঁরা কোথাও প্রেমগন্ধ পাবেন না। কামগন্ধ তো দূরের কথা। তবে "প্রেম" না থাকলেও তার চেয়ে আপত্তিকর জিনিস আছে। বিবাহেব জন্যে ব্যাকুলতা। চিঠিগুলো পড়ে রত্নর ধারণা দাঁড়ায় মালাদি সোজাসুজি "না" বলে দেয়নি। দিলে দুয়ার রুদ্ধ হয়ে যেত। আর চিঠি আসত না। তা হলে কি "হ্যাঁ" বলেছে বা বলবে? না, তাও নয়। ও যা ভীতু। লোকটাকে নাকে দডি দিয়ে ঘোরাবে। হাতছাড়া করবে না। ঝণ্টুদাও যেমন। ঘুরে ফিরে ওব কাছেই আসবেন।

শেষের চিঠিখানা চরমপত্রের মতো শোনায়। তাঁব মা নেই, বাবা নাকি বলাবলি করছেন যে ছেলে যদি সংসারী না হয় তবে পিতৃদেবই দ্বিতীয সংসার কবেন। নইলে বংশরক্ষা হবে কী করে? মুসলমানরা যদিও আর সব বিষয়েই পেছিয়ে রয়েছে তবু এই একটা বিষয়ে তো এগিয়ে যাচ্ছে। আরো এগিয়ে যাবে না?

আবার যখন মালাদির সঙ্গে দেখা হয় তখন বত্ন চিঠিগুলো ফেরত দিযে বলে, "চরমপত্রটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়, মালাদি। আমি চিনি ঝণ্টুদার পিতৃদেবকে। আমাকেই একদিন পাকড়াও করে বলেন, তোর তো মা নেই। তুই বিয়ে করিসনে কেন? শোন যুক্তি। মা নেই বলেই কি আমি যোগ্য হবার আগেই বিয়ে করব? তাও যদি জানতুম কে আমাকে ভালোবাসে ও আমি কাকে ভালোবাসি।"

তখনো গৌরীর আবির্ভাব ঘটেনি। মালাদিই ওর হৃদয় জুড়েছিল। কিন্তু বিয়াট্রিসের মতো নারীকে তো বিবাহ করা যায় না। কামগন্ধ আছে তায়।

"তুমি তা হলে ভালোবাসা না হলে বিয়ে করবে না, রতন?" ভালোবাসার উল্লেখে

মালাদির মুখখানি রাঙা হয়ে ওঠে।

"না, মালাদি। যার সঙ্গে ভালোবাসা হয়নি তার সঙ্গে বিয়ে আমার নীতিবিরুদ্ধ ও রুচিবিরুদ্ধ। আমার আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি ওর প্রতিরোধ করব। এর ফলে হয়তো চিরকুমার হয়ে জীবন কাটবে। সেও ভালো।" রত্ন সীরিয়াস হয়ে বলে।

"বিবাহের মতো একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অতটা সীরিয়াস হচ্ছ কেন? এদেশে সব মেয়ের ও সব ছেলের বিয়ে হয়। কেউই তো বলে না যে, ভালোবাসা না হলে বিয়ে করব না। বিয়েটা একবার হয়ে গেলে তারপরে ভালোবাসার পালা আসে। এই তো নিয়ম।" মালাদি সরল মনে বলে।

"ভালোবাসা আগে, বিয়ে তারপরে, এইটেই নিয়ম হওয়া উচিত। আমরা একালের তরুণ-তরুণীরা নতুন নিয়ম প্রবর্তন করব। তুমিও আমাদেরই একজন।" রত্ন সাহস করে বলে।

"আমি!" ভয়ে পেছিয়ে যায় মালাদি। "আমার তো ওপাট চুকে গেছে, ভাই।"

"বাইশ বছর বয়সে কত মেয়ের ও পাঠ আরম্ভই হয়নি। যেমন সেবাদির। কেন তুমি তোমার বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করছ? যে সুযোগ আপনা হতে এসেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই। করলে পশতাবে। ঝন্টুদা বোধ হয় আর সবুর করবেন না। অন্যত্র দেখবেন। চিঠিতেই তার ইঙ্গিত আছে। পিতৃদেবকে এ বয়সে অমন অপকর্ম করতে দেবেন না। তোমার যদি সত্যি বিয়ে করার বাসনা না থাকে তবে সরাসরি 'না' বললেই পারো। 'না'ও না, 'হ্যাঁ'ও না, এ দোটানায় পড়ে আর কতকাল কাটবে?"

উত্তর না দিয়ে মালাদি এমন একখানি হাসি হাসে যাকে বলে মোনালিসার হাসি। রত্ন মনে মনে ভাবে, এ মেয়ে তো বিয়াট্রিস নয়। এর জাতই আলাদা। এরই প্রেমে পড়েছিল একদিন!

আরো দু'চার কথার পর মালাদি বলে, "আচ্ছা, তোমরা পুরুষ মানুষেরা কেন অমন নাছোড়বান্দা? কেন বিয়ে না করে ছাড়বে না? ভালোবাসা যদি পাও তবে তাই নিয়ে তুষ্ট হও না কেন?"

"মেয়েরাও কি তাই নিয়ে তুষ্ট হয়, মালাদি?" রত্ন পালটা দেয়।

"তুষ্ট!" মালাদি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "ধন্য হয়। বেঁচে যায়।"

সেদিন আর ও নিয়ে কথাবার্তা হয় না। রত্নর মাসিমা এসে পড়েন। সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক তাকান। ততক্ষণে চিঠির তাড়া মালাদির ব্লাউসের ভিতরে চালান। ভিজে বেড়ালটি সেজে ও প্রশ্ন করে, "তা হলে টু প্লাস টু ইকুয়াল টু ফোর?"

ভাগ্যিস মাসিমার বিদ্যা ততদূর নয়। তিনি ধরে নেন ওটা বি-এ কোর্সের সামিল একটা কঠিন প্রশ্ন। যদিও মালাদির বি-এ তে গণিতশাস্ত্রই ছিল না।

"তুমি ফুল মার্কস পাবে।" রত্ন অম্লানবদনে বলে।

"তুই মাঝে মাঝে আসিস, রতন। একটু দেখিয়ে দিস ওকে।" মাসিমা বলেন। মাস্টার বা মাস্টারনী যদ্দিন না পাই। চেষ্টা তো করছি এত। ঠিক মনের মতো হয় কই? যার তার কাছে তো আর মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কে জানে কার মনে কী

ফন্দি আছে! এই সেদিন তো একটা ছোকরা একজনের বিধবা মেয়েকে পড়াতে এসে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে করল কী শুনবি? আমি তো ঘেন্নায় মারা যাই।"

"কী করল, মাসিমা? বলিটলি দিল না তো?" রত্ন কপট ভয়ে শিউরে ওঠে।

"তা একরকম বলিদান বইকি। বলিদানও ওর চেয়ে ভালো। স্বর্গে যেত। তা নয় চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ। বাছা রে, তোর কপালে এই ছিল!"

"কেন, মাসিমা, বিদ্যাসাগর মশায় তো বিধান দিয়ে গেছেন। আইনও করে দিয়ে গেছেন পঁচাত্তর বছর আগে।" রত্ন অনুযোগ করে।

"বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণপরিচয় আর কথামালা আমি পড়েছি, বাবা। অত বড়ো বিদ্বান আর হয় না। কী চমৎকার ওই বাঘের গলায় হাড় ফোটার গল্প। কিন্তু অত বড়ো বিদ্বান হলে কী হবে, একমাত্র ছেলের বিয়ে দিলেন কিনা এক বিধবা মেয়ের সঙ্গে। ছি ছি! বিদ্যাসাগর না বিদ্যার নাগর!" এই বলে মাসিমা ঝট করে পালিয়ে যান।

মালা আর রত্ন লজ্জায় কেউ কারো দিকে চাইতে পারে না।

মাসিমার প্রস্থানের পর রত্ন বলে, "মালাদি, তুমি যে কেবল প্রত্যুৎপন্নমতি তাই নয়, তুমি প্রকৃতভাষিণী। দুই আর দুই মিলে চার। এর মতো সত্য আর কী আছে? তুমি আর তোমারটি মিলে দুই। আমি আর আমারটি মিলে দুই। দুই আর দুই মিলে চার। সেইজন্যেই তো তোমাকে ফুল মার্কস দিয়েছি।"

মালাদি ফিসফিস করে সুধায়, "তোমারটি কে? সেবা?"

"দূর। সেবার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক।" হেসে উড়িয়ে দেয় রত্ন।

"আর কেউ আছে নাকি?" কৌতূহলী হয় মালা।

"আছে। কিন্তু তোমাকে বললে তুমি ধিক ধিক করবে।" রত্ন মিটমিট করে হাসে।

"না, না, ধিক ধিক করব কেন? ভালোবাসা কি পাপ? আমি কি তেমন কোনো আভাস দিয়েছি? আমি কি তোমার মাসিমা?" মালা অভয় দেয়।

"কী জানি! মায়ের সংস্কার হয়তো মেয়েতেও বর্তায়। নইলে ঝণ্টুদাকে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়ে রাখা হতো না।" রত্ন বলে খেলিয়ে খেলিয়ে।

"বল না, ভাই লক্ষ্মীটি, কাকে তুমি ভালোবাস?" মালার কৌতূহল তীব্র হয়।

"তুমি আগে কথা দাও যে শুনে ধিক ধিক করবে না।" রত্নর শর্ত এই।

"তা কি পারি? আমার ভাই যাকে ভালোবাসবে আমিও তাকে ভালোবাসব। এখন বল, মেয়েটি কে? কী নাম? কেমন দেখতে?" মালার প্রশ্ন এই সব।

"ডাক নাম গৌরী। অপূর্ব সুন্দরী। এর বেশী জানতে চেয়ো না। তার আগে আমাকে বল, আমার গুরুজন যদি আমার চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে দিতেন, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারতেন না, বউ যদি আমার অপছন্দ হতো তাহলে কি ও বিয়ে আমি মাথা পেতে মেনে নিতুম, না সাবালক হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীনতার দাবিতে খারিজ করতুম? তারপর প্রেমে পড়লে আরেকজনকে বিয়ে করতে চাইতুম?" রত্নর ধাঁধা।

মালা এবার বোঝে আর বেলুনের মতো চুপসে যায়।

"বিকার বোধ করলে তো!" রত্ন মুচকি হাসে।

"না, না, বিকার নয়। তবে ঠিক পুলকও নয়। আমার ভাই যাকে ভালোবাসে আমি কি তাকে ভালো না বেসে পারি ? কিন্তু কেন তুমি জেনে শুনে জড়িয়ে পড়লে ?" মালার চোখে জল আসতে চায়। সে রুমাল দিয়ে মোছে।

"সাধ করে কি কেউ জড়াতে যায় ? প্রেমে যারা পড়ে তারা পতঙ্গের মতোই পড়ে। আগুনের দুর্বার আকর্ষণে। দেবী বলে একদা একজনকে পুজো করতুম। সেও একটি দীপশিখা।" রত্ন আভাস দেয়।

মালার জিজ্ঞাসার উত্তরে রত্ন এই প্রথম জানায়, "সে আমার সম্মুখেই।"

চোদ্দ

কথা ছিল গোরী মাসে একবার করে কলকাতা এসে পরীক্ষা করাবে। সেই সূত্রে রত্নর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু মাসের পর মাস যায়। দেখা আর হয় না।

"আমার রূপ যা হয়েছে দেখলে তুই মূর্চ্ছা যাবি। অমন করে তোকে ভয় পাইয়ে দেওয়া কি ভালো ? তুই আমার যে রূপ দেখেছিস তারই ধ্যান কর। এ মূর্তি দেখলে তোর ভালোবাসা উবে যাবে।" গোরী লেখে।

জ্যোতিদা শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসে সর্বভারতীয় নেতাদের শুভাগমন হলে। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অবসরে রত্নর সঙ্গেও এক আধ ঘণ্টা কাটিয়ে যায়। দু'জনে মিলে বিলিতী বইয়ের দোকানে যায় ও বেছে বেছে কেনে।

গোরীর কথা উঠতেই জ্যোতিদা বলে, "তন্বী ও মেয়ে কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু এখন যা হয়েছে তা বর্তুলাকার। আমাকে ডেকেছিল একদিন। গিয়ে দেখে এলুম। আছে মনের সুখে। খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে। এখন ওর একমাত্র চিন্তা সেফ ডেলিভারি। বেঁচে থাকলে তো মুক্তির প্রশ্ন উঠবে ?"

রত্ন তা শুনে উদ্বিগ্ন হয়। বলে, "সেইজন্যেই তো কলকাতা এসে ডাক্তার দেখানো উচিত। জ্যোতিদা, তোমার কি মনে হয় ? বাঁচবে তো ?"

"বাঁচবে না কেন ? চাষীর মেয়েরা কি বাঁচছে না ? প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলে প্রকৃতিই বাঁচায়। কিন্তু প্রকৃতি বলে কাজকর্ম করতে, গতর খাটাতে। ফিউডাল সুন্দরীরা কি প্রকৃতির পরামর্শ শুনবেন ? ডাক্তার। ডাক্তারই যেন সর্বশক্তিমান। তুমি ওকে লিখবে সংসারের কাজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে।" জ্যোতিদা যুক্তি দেয়।

রত্ন বলে, "যার যা স্বভাব। তোমার দৃষ্টান্ত ও পাঁচ বছর ধরে দেখে আসছে। যদি দেখে না শেখে তো ঠেকে শিখবে। বম্বে গেলে ওকেই সংসারের কাজ করতে হবে।"

জ্যোতিদাও একমত হয়। সেই সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে। বলে, "জানো তো গোরী যতদিন আমার কাছাকাছি থাকত ততদিন আমার মতো করে ভাবত। আমি যদি বলতুম, রেঙ্গুন চল, তো রেঙ্গুনে চলত। এখন পড়েছে মায়ের হাতে। উনি ওকে এক বিষয়ে নির্ভয় করে দিয়েছেন। ওঁর হেফাজতে কখনো কোনো মেয়ের খালাসের সময় বিভ্রাট

ঘটেনি। সেইজন্যে উনি যাই বলেন ও তাই শোনে। উনি যদি বলেন, কারো সঙ্গে যাস্‌নে, তবে ও যাবে না কারো সঙ্গে। অতি চতুর মহিলা। এর মধ্যেই জেনে নিয়েছেন রত্নটি কে। কেন ওকে রোজ রোজ চিঠি লেখা হয়। ওই বা কেন চিঠি লেখে রোজ রোজ! জানেন, কিন্তু আপত্তি করেন না। তোমার সম্বন্ধে বলেন, ও বোধ হয় আর জন্মে আমার পেটের ছেলে ছিল। সেইজন্যে আমার পেটের মেয়েকে এত ভালোবাসে। আহা, ভাই-বোনের কী স্বর্গীয় ভালোবাসা! ওকে একদিন আসতে বল।"

রত্ন মনে মনে উৎফুল্ল হলেও সেও আশঙ্কা প্রকাশ করে। "অমনি করে উনি ওকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন। সম্পর্কটা যদি ভাইবোনেরই হয় তবে তো আর ইলোপমেন্টের প্রশ্নই ওঠে না। ও যাবে না বম্বে।"

"শুধু কি তাই? গৌরীর মনের পরতে-পরতে অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়ে যাচ্ছে পুরাতন সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তিগত যতসব মূল্য। স্বামী আর পুত্র আর সম্পত্তি আর সতীত্ব। শৃঙ্খলার সঙ্গে শৃঙ্খলের প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে তা মানো তো? গৌরী যদি শৃঙ্খল ভাঙতে চায় তো পুরাতন শৃঙ্খলার বাঁধাধরা মূল্যগুলিকেও আঘাত করতে হবে। নইলে শৃঙ্খল মোচন হবে না। আমার পাঁচ বছরের কাজ এক বছরেই মাটি করবেন ওর মা। আমার দূর সম্পর্কের দিদি। যদি এক বছর কাছে রাখতে পান।" জ্যোতিদা শঙ্কিত স্বরে বলে।

"সেইরকমই তো কথা হচ্ছে।" রত্ন গৌরীর কাছে শুনেছে।

"তার আগেই ওকে সরানো দরকার।" জ্যোতিদা সীরিয়াসভাবে বলে।

রত্ন অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়। তার আগে সরানো কি সম্ভব!

"গৌরী খালাস হবে ডিসেম্বরে। তোমার পরীক্ষা সারা হবে জানুয়ারিতে। তোমাদের ইলোপমেন্ট ফেব্রুয়ারির আগে যদি হয় তবে সেটা বড্ড সকালে। অথচ ফেব্রুয়ারির পরে যদি হয় তবে ওটা বড্ড দেরিতে। ফেব্রুয়ারিই তোমাদের ইলোপমেন্টের মাস। সোভিয়েট বিপ্লবের দিন যেমন ৬ই নয়, ৮ই নয়, ৭ই নভেম্বর।" জ্যোতিদা বলে লেনিনের অনুকরণে।

রত্নর জানা ছিল জ্যোতিদার বিচিত্র মতবাদ। প্রথমে আসবে স্বরাজ, সেটা গান্ধী নির্দিষ্ট মার্গে। তারপরে আসবে বিপ্লব, সেটা লেনিন নির্দিষ্ট পন্থায়। জ্যোতিদারা আপাতত গান্ধীজীকে তাঁর ঐতিহাসিক মিশন পূর্ণ করতে দিচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীদের মতো বাদ সাধছে না। কিন্তু আখেরে বিপ্লবের জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছে। স্বরাজ তো বলতে গেলে আসন্ন। আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই পাকা ফলটির মতো মাটিতে পড়বে। ভারতের কেরেনস্কিরা জোর পাঁচ বছর রাজত্ব করবেন। তারপরে ভারতের লেনিনদের পালা।

"তা না হয় হলো, কিন্তু বাচ্চাটির কী হবে?" রত্ন জিজ্ঞাসু হয়।

"বাচ্চার দায়িত্ব তোমরাই নেবে। খরচের জন্যে ভেবো না। আমি আছি। তবে এমনও হতে পারে যে বাচ্চাকে ওরা সহজে ছাড়বে না। অনর্থ বাধাবে। কাজ কী ওই নিয়ে লড়াই করে? গৌরীর কাছে না থেকে বাচ্চা থাকবে ওর দিদিমার কাছে। পরে ওর ঠাকুমার কাছে।" জ্যোতিদা রায় দেয়।

"বেচারি গৌরী। ওর কষ্ট হবে না?" রত্ন ব্যথিত হয়।

"কষ্ট হবে বইকি। কিন্তু বাচ্চার দিক থেকে সেইটেই ভালো। ভারী তো জানে গৌরী বাচ্চা মানুষ করতে। ওদের বাড়ীতে মায়েরা কেউ মাই দেয় না, জানো? দুধ-মা যোগাড় করে এনে রাখে।" জ্যোতিদা এক আজব খবর শোনায়।

"কেন, দুধ-মা কেন? নিজের দুধ থাকতে?" রত্ন বিস্মিত হয়।

"নিজের দুধ থাকলেও নিজের বাচ্চাকে দিতে নেই। স্তনের শেপ যদি নষ্ট হয় তবে যে সর্বনাশ! এটা বহুকালের ফিউডাল সংস্কার। আমাদের জমিদার ঘরানারা কেউ মাতৃস্তন্য পান করে মানুষ হননি। সবাই দুধু-মার সন্তানকে বঞ্চিত করে অমানুষ হয়েছেন। জানিনে কার কাছে এ শিক্ষা পেলেন। রাজপুতের কাছে না মোগলের কাছে।" বলে জ্যোতিদা রত্নকে তাক লাগিয়ে দেয়।

"গৌরী যদি বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসে আমরা কিন্তু দুধ-মা রাখব না। গৌরীকেই মাই দিতে হবে।" রত্ন আলনস্কারের মতো হুকুম জারী করে।

"দুধ-মা রাখা হবে না, এই পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি একমত। গৌরীকেই মাই দিতে হবে, ওটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। আজকাল ইউরোপীয় মায়েরাও তো ফীডিং বটলে করে দুধ খাওয়ান। মনে রেখো, ফিউডালিজমের সঙ্গেই আমাদের সংগ্রাম। মডার্নিজমের সঙ্গে নয়। একালের মেয়েরা অনেকেই মা হতে চায় না। তুমি কি তা বলে সেকেলে মেয়ে বিয়ে করবে? না একেলে মেয়েকে সেকেলে করে তুলবে?" জ্যোতিদা রত্নকে দোটানার মধ্যে ফেলে।

"বিয়ের কথা ওঠে কেন, জ্যোতিদা? গৌরী তো আমাকে কথা দেয়নি যে বিয়ে করবে। আমিও তো বিয়ের প্রস্তাব করিনি। আগে তো ও মুক্ত হোক। তারপর যাকে খুশি বিয়ে করবে। আমার সঙ্গে ইলোপ করা মানে আমাকেই বিয়ে করা নয়। আমরা দুজনেই ফ্রী থাকতে চাই। তবে সাধারণত দেখা যায় ইলোপ যারা করে তারা বিয়ের জন্যেই করে। বিয়ে করেও। আমরাও খুব সম্ভব বিয়ে করব। যদি ও ছাড়পত্র পায়। কিন্তু ও ছাড়পত্র চাইলে তো পাবে? চায় কি না তাই আমার অজানা।" রত্ন বলে।

"ছাড়পত্র চাইলেও পাবে না। হিন্দু আইনে ডিভোর্স চলে না। ওই পরকীয়াই সারা জীবন চালিয়ে যেতে হবে। আর নয়তো মুসলমান হতে হবে।" জ্যোতিদা রত্নকে তাজ্জব বানায়।

"গৌরী যেমন ঠাকুরদেবতা মানে ও কি কখনো মুসলমান হতে রাজী হবে? না, জ্যোতিদা। আমিও নারাজ। যদিও আমি ঠাকুরদেবতা মানিনে তবু আমি হিন্দু। উপনিষদে আমি যা পাই তা কি আমি ছাড়তে পারি?" রত্ন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"তাহলে বিয়ের আশা ছেড়ে দাও তোমরা। বিয়ের মন্ত্র না পড়েও কি স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা যায় না? দেশে বিদেশে অজস্র উদাহরণ। গ্যেটে কি ক্রিস্টিয়ানেকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিলেন? অবশ্য পরে বৃদ্ধ বয়সে আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়। ততদিনে সামাজিক বাধা অপগত হয়েছে। তোমরাও স্বরাজের পরে আনুষ্ঠানিক বিবাহ করতে পারো। তার আগে আমরা হিন্দু আইনে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করব। আরো ভালো হয় যদি বিপ্লব পর্যন্ত

সবুর করতে পারো। আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রয়োজনই থাকবে না। স্বামীস্ত্রীর মতো থাকলেই সেটাকে বিয়ে বলে ধরে নেওয়া হবে। আনুষ্ঠানিক বিবাহের সঙ্গে লেশমাত্র তফাৎ থাকবে না।" জ্যোতিদা আশ্বাসের বাণী শোনায়।

"কিন্তু ইতিমধ্যে ছেলেমেয়ে যদি হয়?" রত্ন লাজুকের মতো বলে।

"তোমাদের খুশি। গ্যেটে ও ক্রিস্টিয়ানেরও তো হয়েছিল। পরে ডিউকের আদেশে বৈধ বলে মেনে নেওয়া হয়। বিপ্লবের পরে প্রত্যেকটি সন্তানকেই বৈধ বলে ঘোষণা করা হবে। সম্পত্তির বালাই তো থাকবে না। বুর্জোয়াদের সমাজ সম্পত্তিভিত্তিক বলেই বৈধ অবৈধ নিয়ে ওদের এত মাথাব্যথা।" জ্যোতিদা এ বিষয়ে নিশ্চিত।

রত্ন এরপর স্বীকার করে যে দুটি জায়গায় ওর সংস্কারে বাধে। বিয়ে যতদিন না হয়েছে ততদিন এক সঙ্গে শোয়া উচিত নয়। বিয়ে না হয়ে থাকলে ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়া উচিত নয়।

"ওঃ তুমিও দেখছি একজন নীতিধ্বজ! যাঁদের মতে মন্ত্র পড়লেই মন্দটা হয়ে যায় ভালো, না পড়লেই ভালোটা হয়ে যায় মন্দ।" জ্যোতিদার মুখে বাঁকা হাসি।

" না, জ্যোতিদা, মন্ত্রের তেমন কোনো পাবনী শক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই। মন্ত্র পড়েই হোক আর না পড়েই হোক, বিয়ে আমাকে করতে হবেই, যদি কখনো কারো সঙ্গে শুই। তখন যদি না করি তো পরে যদি সন্তানসম্ভাবনা দেখি। এটা আমার অন্তরের বিধি, সমাজের বিধি যাই হোক না কেন।" রত্ন অকপটে বলে।

পনেরো

ওদের কথাবার্তা আরো একটু অন্তরঙ্গ পর্যায়ে পৌছয়। জ্যোতিদা বলে, "অন্তরের বিধি যাকে মনে করেছ ওটা হচ্ছে শিভালরির অন্য নাম। নবযুগের নারী চায় সমানাধিকার। শিভালরি নয়। আমার বৌদি ইঙ্গেবর্গকে তো চেনো। চিত্রা যাঁর ভারতীয় নাম।"

"হ্যাঁ, আলাপ হয়েছে একবার।" রত্নর বেশ মনে আছে।

"তিনিই ওদেশের নবযুগের নারীত্বের প্রতিভূ। নিউ উওম্যান দেখতে চাও তো তাঁকেই দেখ। তিনি আমাকে যা শিখিয়েছেন গোরীকে আমি তাই শিখিয়েছি। যাতে গোরীই হয় এদেশের নবযুগের নারীত্বের প্রতিভূ। এদেশের নিউ উওম্যান। এ বিষয়ে আমি দুই দেশের তফাৎ মানিনে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাও যা, চিত্রা বৌদিও তাই, সেজন্যেই তো ওঁর নাম চিত্রা ।" জ্যোতিদা বলে অন্তরঙ্গ স্বরে।

"তাই নাকি?" রত্ন কৌতূহলী হয়।

"ওদেশে ফেমিনিজমের হাওয়া যখন ওঠে তখন ওঁর বয়স আঠারো কি উনিশ। ওঁর সমবয়সিনী আরও অনেকের মতো উনিও পণ করেন যে, পুরুষের দাসত্ব কদাচ নয়, সুতরাং যে যার কেরিয়ার বেছে নেবে। সমানাধিকারের ভিত্তিতে বিবাহ তখন সম্ভব ছিল না, তাই ওঁরা ছিলেন বিবাহবিমুখ। তা বলে প্রেমবিমুখ নন, মাতৃত্ববিমুখ নন।"

জ্যোতিদা রত্নর মুখভাব দেখে থেমে যায়।

"তা হলে বিয়ে করলেন কী করে ? তোমার বৌদি হলেন কী করে !" রত্নর মনে ধাঁধা লাগে।

"বিয়ে করেন মহাযুদ্ধের পরে। ততদিনে সমানাধিকার অনেকটা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু যখনকার কথা আমি বলছিলুম তখনকার দিনে তার জন্যে ঘরে বাইরে আরেক রকম যুদ্ধ করতে হয়। সাফ্রাজেটদের কাহিনী জানো নিশ্চয়।" জ্যোতিদা বলে।

"জানি বইকি। চিত্রাঙ্গদার মতোই দুর্ধর্ষ অ্যামাজন।" রত্ন মনে মনে সেলাম করে।

"সবাই অ্যামাজন নয়। নারীত্বের সংজ্ঞা যদি উদারতর কর তা হলে দেখবে সাফ্রাজেটরাও নারী। কিন্তু সমকক্ষ নারী। পদানত নারী নয়। আমাদের দেশে এখনো আমরা সমকক্ষের কথা ভাবতে পারছিনে। তাই পদানত নারীকেই ভক্তিভরে বলি, তুমি দেবী, তুমি শুচি, তুমি অপাপবিদ্ধ।" জ্যোতিদা বলে শ্লেষভরে।

"আচ্ছা তুমি যা বলছিলে তা বল।" রত্ন শুনতে চায়।

"বলছিলুম যে, বিবাহ করবেন না বলে ওঁর অর্জুনকে উনি ফিরিয়ে দেন, কিন্তু বীরের সন্তানকে সাদরে বহন করেন। যথাকালে মা হতেন, তার জন্যে প্রস্তুতিরও অভাব ছিল না, এমন সময় জাহাজের দোলায় মিসক্যারেজ ঘটে যায়। বারো তেরো বছর পরে এখনো তার জন্যে শোক করেন। নারী নয় তো কী ?" জ্যোতিদা সুধায়।

রত্নর সংস্কারে বাধলেও সে সায় দেয়। "নয় তো কী !"

"এর সাত আট বছর পরে দাদার সঙ্গে ওদেশে বিয়ে। উনিও কিছু গোপন করেন না। দাদাও সব জেনেশুনেই ওঁর জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করেন। সাথীত্বের ভিত্তিতেই বিয়ে। সাথীত্ব যদি ভেঙে যায় তবে বিয়েও ভেঙে যাবে। এইরকম পরীক্ষামূলক অবস্থায় উনি আর মা হতে চান না। দাদাও চাপ দেন না।" জ্যোতিদা বিশ্বাস করে বলে।

"কেন, পুরুষেরও কি পিতৃত্বের অধিকার নেই।" রত্ন ভাবে এ কেমন সমানাধিকার।

"আছে বইকি। কিন্তু ওটা খাটাতে গেলে ওই কারণেই বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। দাদা ধৈর্য ধরছেন।" জ্যোতিদা একটু অপ্রস্তুত হয়।

"আমার কথা যদি বল আমি আমার শিভালরির বিধি মেনে চলব, জ্যোতিদা। কখনো কারো সঙ্গে কিছু ঘটলে তাকে বিয়ে করব। আর ওই যে সম্ভাবনা ও রকম কিছু দেখলে কালবিলম্ব করব না। বেচারি মেয়ে আমার জন্যে পথে বসবে, এ কি কখনো হতে পারে ?" রত্ন বলে আবেগের সঙ্গে।

"বেচারি মেয়ে যাকে বলছ সে যদি আর-একটি ইসাডোরা ডানকান হয়ে থাকে তো সে-ই হয়তো তোমাকে পথে বসাবে। ছেলে তোমার বলে যে তুমি পাত্তা পাবে তা নয়। ছেলে ইসাডোরার। রেবেকা ওয়েস্টের লেখা পড়েছ নিশ্চয়। কিন্তু জানো না যে ওটা যাঁর ছদ্মনাম তাঁর বিয়ে হয়নি, অথচ সন্তান হয়েছে। সন্তানের পিতা তোমার গুরুকল্প এইচ জি ওয়েলস।" জ্যোতিদা মুচকি হাসে।

"ওয়েলস !" রত্ন হতভম্ব হয়। "না, না, ওয়েলস নন।"

"ওয়েলসের তোমার মতো অমন সংস্কারের বাধা নেই। উনি অনেকটা পুরাণের

ইন্দ্র বা চন্দ্রের মতো। তোমার অপর গুরুকল্প বার্ণার্ড শ কিন্তু পয়লা নম্বর পিউরিটান। যদিও লেখা পড়ে মনে হয় ঠিক বিপরীত। জানো ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক বিশুদ্ধ নিরামিষ।" জ্যোতিদার চোখে হাসি।

রত্ন জানত না যে তার দুই চিন্তাগুরুর স্বভাব উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুর মতো। চুপ করে ভাবে। আধুনিক নারীর সঙ্গে আধুনিক পুরুষের সম্পর্কটা তা হলে কার মতো হবে ?

"আমি কিন্তু ওয়েলসকে খাটো করবার জন্যে ও কথা বলিনি, বলেছি রেবেকা ওয়েস্টের সমর্থন করতে। নারীর ইচ্ছা বলে তো একটা জিনিস আছে। সে ইচ্ছা করলে বিয়ে করতেও পারে, না করতেও পারে। মা হতেও পারে, না-হতেও পারে। বিয়ে না-করেও মা হতে পারে, বিয়ে করেও মা না-হতে পারে। তোমার সংস্কারে বাধলেও তার সংস্কারে না-বাধতে পারে। এখন এসব কথা তোলার অর্থ গৌরীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে দেওয়া। তার যেটা ইচ্ছা সেটাই সে অনুসরণ করবে। তোমার ইচ্ছাধীন হবে না। তুমি যদি ওর ইচ্ছাধীন না-হতে চাও তবে তুমিও স্বাধীন। কেই বা তোমাকে বলছে শিভালরির খাতিরে নারীর ইচ্ছাধীন হতে !" জ্যোতিদা কোমল স্বরে বলে।

রত্ন ভাবনায় পড়ে। গৌরী যদি ইসাডোরা ডানকান হতে চায় তবে ওকেও কি গর্ডন ক্রেগ হতে হবে ? না ও বলবে, "আগে তো বিয়ে হোক। তারপরে ওসব।" কিংবা গৌরী যদি চিত্রা বৌদির মতো আর মা হতে না চায় তবে ওকেও কি মোতি মুস্তফীর মতো ধৈর্য ধরতে হবে ? সাত বছর হলো বিয়ে হয়েছে ওঁদের।

কে জানে এমনও হতে পারে যে গৌরী পালন করতে চাইবে অসিধার ব্রত, বার্নার্ড শ গৃহিণীর মতো। তখন রত্নকেও কি বার্নার্ড শ মার্গ অবলম্বন করতে হবে ? জীবনের কোনো কামনা পূর্ণ হবে না ?

প্রশ্নগুলো জ্যোতিদার কানে তুলতে ও হেসে ওঠে হো হো করে। "তোমাকে এখন থেকেই ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিতে কেউ পরামর্শ দেবে না। পুরুষের ইচ্ছা বলেও তো একটা জিনিস আছে। গৌরীকে খোলাখুলি জানতে দিয়ো কী তোমার ইচ্ছা। তারপর তোমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হবে। যেখানে সমঝোতা হয় না সেখানে কিছুই হয় না। সম্পর্কটা তো একতরফা নয়।"

রত্ন তা শুনে লজ্জিত হয়। বলে, "নারীর ইচ্ছায় কর্ম। এই আমার মতবাদ। পুরুষের ইচ্ছা বলে আলাদা কিছু থাকলেও আমি কি জানাতে যাচ্ছি ভেবেছ ? তবে আমার কাম্য পরিপূর্ণ জীবন। তার অঙ্গ পরিপূর্ণ প্রেম।"

জ্যোতিদা প্রীত হয়। "আমারও কাম্য তাই। তোমার সঙ্গে আমি ষোল আনা একমত। তা হলেও তোমাকে বলে রাখি যে, তুমি তোমার জীবনে যত বড়ো হবে বলে আশা করেছ গৌরী তার জীবনে ওর চেয়েও বড়ো হতে পারে। জর্জ সাঁর মতো তার স্বামীকে, তার প্রথম প্রেমিককে ছাড়িয়ে যেতে পারে। শোপাঁর মতো সঙ্গীতকারকে, দ্য মুসের মতো কবিকে সিঁড়ির মতো মাড়িয়ে যেতে পারে। শেষে হয়তো সাহিত্যে অমর হতে পারে।"

"ও যদি সাহিত্যে অমর হয় আমিই সব চেয়ে সুখী হব, জ্যোতিদা।" রত্নর অভিমানে

লাগলেও সে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে মুখর হয়। "আমার হাতেও তো লেখনী থাকবে। তা দিয়ে আমিও তো ওকে সাহিত্যে অমর করে দিতে পারি।"

"তোমাকে লঘু করা আমার অভিপ্রায় নয়, রতন।" জ্যোতিদা অপ্রতিভ হয়ে বলে।

"জর্জ সাঁর উপমাটা জুতসই হয়নি মানছি। তোমরা বরং অ্যানি বেসান্ট ও বার্নার্ড শ'র সঙ্গে তুলনীয়। জানো তো ওঁরাও এককালে প্রেমিক প্রেমিকা ছিলেন।"

"তাই নাকি?" রত্ন কল্পনাও করতে পারে না।

"হাঁ, ওঁদেরও একটা যৌবন ছিল। আর ছিল মহত্ত্বের প্রতিশ্রুতি। মিলিত হলে ওঁরা আরো মহান হতে পারতেন।" জ্যোতিদা বলে যায়। "মিসেস বেসান্ট ইতিপূর্বেই তাঁর স্বামীর কাছ থেকে আইন অনুসারে ফারাক হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তো ডিভোর্স নয়। সেটার জোরে তো আরেকবার বিয়ে করা যায় না। শ তখনো অবিবাহিত। বিবাহ সম্ভব নয় দেখে তাঁরা স্থির করেন যে বিনা বিবাহেই একত্রবাস করবেন। এবং সেটা সবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে।"

"আমাদেরও সেই রকম অভিলাষ।" রত্ন মনে মনে মিলিয়ে নেয়।

"কিন্তু বাধল কোথায় জানো? আইনে নয়, লোকাচারে নয়, লেখাপড়া করতে গিয়ে। হাঁ, দুজনেই চাইলেন যে একটা লেখাপড়া হয়ে যাক। কার কী অধিকার, কার কী দায়িত্ব। অ্যানি যেসব শর্ত তুললেন জর্জ তাতে সম্মতি দিলেন না। খুঁটিনাটি আমার জানা নেই। চিত্রা বৌদির কাছেই গল্প শোনা। তাঁরও অজানা। শর্তে বনল না বলে লেখাপড়া হলো না। লেখাপড়া হলো না বলে একত্রবাস হলো না। সম্বন্ধটাই গেল কেঁচে। মিসেস বেসান্ট সোশিয়ালিজম ছেড়ে দিলেন। আর-কারো সঙ্গে মিলিত হলেন না। থিওসফিস্ট হলেন, ভারতে এলেন, কত উচ্চে উঠলেন। সেসব তো জানো। ওদিকে বার্নার্ড শ আবিষ্কার করলেন তিনি নাট্যকার। তাঁর হাত খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বরাতও খুলে গেল। বিবাহ হলো একজন কুমারীর সঙ্গে পরিপূর্ণ বনিবনার ভিত্তিতে। কিন্তু কায়িক সম্পর্ক বাদ দিয়ে।" জ্যোতিদা গল্পটা শেষ করে।

"তুমি কি বলতে চাও জ্যোতিদা, যে আমাদের বেলাও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে?" রত্নর মনে খটকা বাধে জ্যোতিদার মুখভাব দেখে।

"তা একটা লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে গেলে মন্দ কী? যদি শর্তে বনে।" জ্যোতিদা বলে।

"আমি সব শর্ত মেনে নেব। গৌরী যদি তাই চায়।" রত্ন চোখ বুজে রাজী হয়।

ষোল

রত্নর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় জ্যোতিদার অর্ধেক মুখ ছিল দাড়িতে ঢাকা। এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে ও রাহুমুক্ত হয়েছে, তাই ওর চেহারা খুলেছে।

দাড়ি মুড়োনোর রহস্য কী জিজ্ঞাসা করলে জ্যোতিদা বলে, "অসহযোগের আমলে

স্বদেশী ক্ষুর ব্যবহার করতে গিয়ে নিত্য রক্তপাত ঘটে। নিজের রক্ত হলেও সেটা প্রাণীরক্ত তো বটে। অহিংসাবাদী আমি বাধ্য হয়ে দাড়ি কামানো বন্ধ করি। ছেড়ে দেওয়া দাড়ি হু হু করে বেড়ে যায়। ফলে রাজনীতিক মহলে আমার সম্মানও বাড়ে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি সম্মান তো নয়, অসম্মানই আমার পাওনা। মেয়েরা এমন ভঙ্গীতে তাকায় আমি যেন একটা জংলী জানোয়ার। ছেলেরাও পাশ কাটায়। তবে কি আমি শুধু বুড়োদের দলেই মিশব ? সতীর্থরা বলবে, ছোট গুরুদেব ?”

“ওঃ সেইজন্যে দাড়ি কামিয়ে ফেললে ?” রত্ন শুধায়।

“ছিল আরো গভীর কারণ। সেটা পরে জানতে পাবে। রোমান্সটা এখনো জমেনি। আমার যেমন ভাগ্য, জমবার আগেই বাষ্প হয়ে না যায় !” জ্যোতিদা হাসে।

রোমান্সের আমেজ পেয়ে রত্ন পুলকিত হয়। শান্তিনিকেতন রোমান্সের জায়গা বটে। জ্যোতিদা কি তারই সন্ধানে ওখানে যায় ?

“আরে না, না। আমি চেয়েছিলুম বিশ্বের সঙ্গে ভারতকে মিলিয়ে নিতে। আর প্রতীচীর সঙ্গে প্রাচীকে। আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীকে। সবরমতী আশ্রমে ছিলুম কিছুকাল, তা তো তুমি জানোই। সবরমতীর পরিপূরক হলো শান্তিনিকেতন আশ্রম। সেখানের মতো এখানেও আমি বছর খানেক থাকতে পারলে জোড় মেলাতে পারতুম। কিন্তু থাকতে চাইলে থাকতে দিচ্ছে কে ?” জ্যোতিদার কণ্ঠে খেদ।

“কেন, ওঁদের দিক থেকে কি আপত্তি আছে ?” রত্ন দরদের সঙ্গে বলে।

“না, ওঁদের আপত্তি কিসের ? আমরা তো একমুঠো ছাত্র। সব ক'টিকেই ওঁরা ধরে রাখতে চান। কিন্তু আমার নিজেরি প্রোগ্রাম সাতুই পৌষ অবধি। মেলা দেখে আমি আমার জীবনের এ পর্ব চুকিয়ে দেব। তারপর বম্বে। তোমাদের একটা হিল্লে করতে হবে। একদিন ও পাটও চুকে যাবে। তখন আবার আমার নিজের আশ্রমে ফিরে এসে গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হব। তখন তোমাদের পথে তোমরা। আমার পথে আমি। আশা করি, তখন আর আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না।” জ্যোতিদা বলে।

“কী করে বলব ? যদি প্রতিযোগিতায় সফল হই তা হলে তো বম্বে থেকে বিলেত যেতে হয়। গৌরীকে কোথায় রেখে যাব ? ও কি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হবে ? ওর বাচ্চাকে ও কার কাছে দিয়ে যাবে? না সঙ্গে নিয়ে যাবে? এমনি একরাশ প্রশ্ন আমাকে নাজেহাল করবে, যদি তুমি আমার ধারে কাছে না থাক। তোমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন সেইদিনই ফুরোবে যেদিন আমার ওসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।” রত্ন বলে।

জ্যোতিদা চুপ করে থাকে। “আচ্ছা, আমি তোমার ধারেকাছেই থাকব, যদি তুমি চাও, যতদিন তুমি চাও।”

“গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ হলেও ?” রত্ন বাজিয়ে দেখে।

“না, ওইটি পারব না। আমি হলুম যুদ্ধের ঘোড়া। যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধক্ষেত্রই আমার স্থান। তোমরা যদি আমাকে আটকাও তা হলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে, রতন। তবে আমার বিশ্বাস গণসত্যাগ্রহের আগেই তোমরা স্থিতি পাবে। শান্তিনিকেতনের গুজরাতী বন্ধুরা আমাকে সবরমতীর খবর আনিয়ে দেয়। সেখানে গণসত্যাগ্রহের লেশমাত্র সাড়াশব্দ

নেই। গান্ধীজী গঠনের কাজে আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন। গঠন মানেই তো সংগঠন। সংগঠন দৃঢ় না হলে কেউ সংগ্রামে নামে না।" জ্যোতিদা বলে।

রত্ন তা শুনে আশ্বস্ত হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সে তেমন অধীর নয়, যেমন গৌরীর স্বাধীনতার জন্যে। দেশ যদি দশ বিশ বছর অপেক্ষা করে তা হলে ক্ষতি যা হবে তা অপূরণীয় নয়। কিন্তু গৌরীকে যদি দশ বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয় তবে তার অপূরণীয় ক্ষতি। তার আয়ু, তার যৌবন, তার জীবিকা, তার প্রেম কিছুই ততদিন বসে থাকবে না। গৌরীর স্বাধীনতাটাই জরুরি।

"শান্তিনিকেতনে তোমাকে অত কম সময় থাকতে হচ্ছে এর জন্যে আমি দুঃখিত। পরে আবার যেয়ো।" রত্নও আশ্বাস দেয়।

"না ভাই, জীবনে পুনরাবৃত্তি ঘটে না। ছাত্র হিসাবে থাকতে হয় তো এই আমার শেষ সুযোগ। পরে হয়তো পর্যটক হিসাবে যাব, হয়তো কর্মী হিসাবে। তখন তো কেউ আমাকে ছাত্রদের সঙ্গে থাকতে বা ছাত্রীদের সঙ্গে মিশতে দেবে না।" জ্যোতিদা আপসোস জানায়।

"খুব মিশছ নাকি ?" রত্ন চুপি চুপি বলে।

"না, খুব নয়। দাড়ি কামালেই যে মেলামেশা হামেশা হয় তা নয়। আমি লাজুক মানুষ। এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে জানিনে। তা ছাড়া সমবয়সিনী মেয়েদের কী বলে সম্বোধন করব সেটাও একটা সমস্যা।" জ্যোতিদা রহস্য করে বলে।

"সে কী ! কলকাতায় তো আমরা বলি, মিস দাশগুপ্ত, মিস দত্ত।" রত্ন আশ্চর্য হয়।

"ওটা বিজাতীয় আদব ! আমাদের পক্ষে বেয়াদবি। শান্তিনিকেতনে আমরা বিশুদ্ধ ভারতীয় শিষ্টাচার পুনঃপ্রবর্তন করতে চাই।" জ্যোতিদা গম্ভীরভাবে হাস্য গোপন করে।

"বেশ তো। কুমারী দাশগুপ্ত, কুমারী দত্ত বললেই তো সমস্যা মেটে। ও নিয়ে অত ভাববার কী আছে ?" রত্ন সহজ সমাধান বলে দেয়।

"ওটা বিলেতের নকল। গুরুদেবের ভাষায় বৈলাতিকতা। ভদ্রদের বেলা আমরা বলি রামবাবু, শ্যামবাবু। কিংবা রামজী, শ্যামজী। ভদ্রাদের বেলা এক দিদি ছাড়া আর কিছু মুখে আসে না। সেটা কি আমাদের সমবয়সিনীদের বেলা চলে ? ওঁরা রাগ করবেন যে !" জ্যোতিদা হাস্য গোপন করে আবার।

"তা হলে সমাধানটা কি ?" রত্নও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

"ব্যাপারটা চরমে ওঠে যখন গোবিন্দন বলে একটি দক্ষিণী ছাত্র গোপী বলে একটি সিন্ধী ছাত্রীকে দিদি বলে ডাকে। কন্যাটি সোজা গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ করে। তাই নিয়ে একটা বৈঠক বসে। আমিও তাতে যোগ দিই। মেয়েরা বলে, আমরাও তা হলে দাদা বলে ডাকব। আমি যতদূর জানি গোপীই গোবিন্দনের চেয়ে বয়সে বড়ো। দিদি বলে ডাকলে ওর আপত্তি করা সাজে না। কিন্তু পারিবারিক মহলের বাইরে কোন মেয়ের কত বয়স সেটা তো আর-কারো জানার অধিকার নেই। মেয়েরা ও বিষয়ে স্পর্শকাতর। গোবিন্দনের মতো তালগাছের দিদি হলে লোকে সত্যি সত্যি গোপীর বয়স

যত নয় তত ঠাওরাবে।" জ্যোতিদা রঙ্গ করে।

"তা হলে শুধু গোপী বলে ডাকলেই চুকে যায়।" রত্ন সরলভাবে বলে।

"তা কি হয় ? এটা কি ইংলণ্ড না আমেরিকা যে সমবয়সিনীর সঙ্গে দু'দিন আলাপেই তুমি ওকে মেরী বা জেন বলে ডাকবে ?" জ্যোতিদার চাপা হাসি ফুটে বেরয়।

"তা বৈঠকে কী মীমাংসা হলো ?" জানতে চায় রত্ন।

"সেখানেই তো মজা। ছেলেরা বলে মেয়েরাই বলুন ওঁদের কী বলে ডাকতে হবে। মেয়েরা বলেন, দেবী। যেমন সেবাদেবী। কিন্তু গুরুদেবই মাথা নাড়লেন। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে দাড়িতে অনেকবার হাত বুলিয়ে এই রায় দিলেন যে, প্রাচীন ভারতে নারীদের সম্বোধন করা হতো যা বলে সেই সব চেয়ে ভালো। আর্যা। এখনকার ছেলেরাও বলবে, 'আর্যা'। আর মেয়েরা বলবে, 'আর্য'।" জ্যোতিদা হেসে ওঠে।

এতে হাসির কী আছে বুঝতে পারে না রত্ন।

"পরের দিন কিন্তু রটে গেল যে ছেলেরা মেয়েদের সম্বোধন করবার সময় বলবে 'ভার্যা' আর মেয়েরা ছেলেদের সম্বোধন করতে গেলে বলবে 'আর্যপুত্র'। তা শুনে চারদিকে হাসাহাসি আর কান্নাকাটি পড়ে যায়।" জ্যোতিদাও হাস্যমুখর হয়।

"সমস্যাটা যদি আধুনিক হয় তবে সমাধানটা প্রাচীন হয় কী করে ?" রত্ন বলে সীরিয়াসভাবে। "কবে কোন দেশে তরুণ-তরুণীদের সহশিক্ষা ছিল ?"

"ওটা হলো গুরুদেবের রসিকতা।" এই বলে উড়িয়ে দিতে চায় জ্যোতিদা।

"না, না, আমি লক্ষ করেছি গান্ধীজীর মতো গুরুদেবেরও মনের আধখানা পড়ে রয়েছে প্রাচীন ভারতে। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে ওঁরা সমন্বয় করবেন কার, না প্রাচীন ভারতের। 'আর্য' আর 'আর্যা'দের যুগ চলে গেছে। ইতিহাসের মঞ্চ থেকে তারা চিরবিদায় নিয়েছে। তথাপি তাদের ফিরিয়ে আনা চাই। যে কোনো ছলে। এটাও তেমনি একটা ছল।" রত্ন বিরূপ হয়।

"রবীন্দ্রনাথকে তুমি ভুল বুঝলে, রতন। বিশ বছর আগে উনি বিভাইভালিস্ট ছিলেন সে কথা সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে উনি মডার্নিস্ট হয়েছেন। এমন কি তোমার আমার চেয়েও বেশী। অত্যাধুনিক সাহিত্যিকরাও ওঁর চেয়ে অত্যাধুনিক নন। কিন্তু এটাও তো মানতে হবে যে আর সকলের মতো তাঁরও একটা দেশ আছে। সে দেশের ঐতিহ্যকে তিনি এককথায় খারিজ করতে পারেন না। পশ্চাৎপদ দেশবাসীকেও সঙ্গে করে চলতে হয় অগ্রগামীকে। তার ফলে তাঁর অগ্রগমন কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। এটা কি একদিন তোমার আমার বেলাও সত্য হবে না, মনে করেছ ?" জ্যোতিদা বোঝায়।

রত্ন তার অগ্রগমনে ব্যাঘাত সহ্য করবে না। জ্যোতিদা করবে। সে ধৈর্যশীল। দুই বন্ধুর মধ্যে এই যে তফাৎ এটা ক্রমে স্পষ্ট হয়।

"রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তোমার শান্তিনিকেতনের মেয়েরা যদি বলে ওদের 'দেবী' বলে সম্বোধন করতে হবে তবে ওটা ক্ষমাযোগ্য নয়। গীতা চট্টোপাধ্যায় গীতা দেবী লিখতে আরম্ভ করেছেন। সে অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু তাই বলে মালা মিত্র তো মালা দেবী লিখতে পারেন না। শাস্ত্রে সে অধিকার তাঁকে দেয়নি। শাস্ত্র মতে

তিনি মালা দাসী। গীতার পক্ষে প্রাচীন ভারত যেমন সৌভাগ্যের আকর মালার পক্ষে তেমনি দুর্ভাগ্যের। মালাকে বাঁচাতে পারে প্রাচীন ভারত নয়, আধুনিক ইউরোপ। তাই তিনি লেখেন মালা মিত্র। মিস মালা মিত্র। যদিও তিনি বিধবা।" রত্ন গর্বের সঙ্গে বলে।

"মালা মিত্রটি কে? তোমার কেউ হন না তো?" জ্যোতি কৌতূহলী হয়।

সতেরো

খুলে বলতে হলো রত্নকে তার প্রথম প্রেমের কাহিনী। যে প্রেম সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণরাগের মতো। এতদিনে মিলিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। মালা এখন তার কেউ নয়। এখন আরেকজনের।

"অমন কত হয়। গৌরীর জীবনেও কি অমন ঘটেনি?" জ্যোতিদা অভয় দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেয় যে গৌরী ভুল বুঝতে পারে। মালাদের ওখানে কি না গেলেই নয়?

রত্ন বলে, "আচ্ছা। আপাতত যাওয়া কমিয়ে দেব। নিজেরও তো পড়াশুনার চাপ। আমার সময় কোথায় যে মালাদিকে সিনেমায় নিয়ে যাব? বটানিকসে নিয়ে যাব। কোথাও যেতে পারে না-বেচারি।"

মালাদির আকর্ষণ সত্যি অপনীত হয়েছিল। অবশিষ্ট যা ছিল তার নাম প্রেম নয়। বেশ ভালো করেই বাজিয়ে দেখেছিল রত্ন। আপনাকে তথা মালাদিকে। না, ওদের ওটা প্রেম নয়। মালাদিও সাবধান ছিল রত্ন যেন তেমন কিছু দাবী করে না বসে। তা হলেও দু'জনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে দেখা না হলে মন কেমন করত।

মালাদির বিয়ে দেওয়া চাই। রত্নকেই এর জন্যে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু এখন নয়। পরে এক সময়। মালাদির মুখ দেখে মনে হয় তারও অন্তরের ইচ্ছা তাই। কিন্তু হিন্দু বিধবার সংস্কার তার ইচ্ছার চেয়ে শক্তিমান। মা বাপের অমতে বিধবা মেয়ের বিয়ে কি সম্ভব? তার আগে পাশ করে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। তার ঢের দেরি।

মালাদির গল্প গৌরীকে জানিয়ে রেখেছিল রত্ন। সেইজন্যে তার মনে অপরাধবোধ ছিল না। আর গৌরীর মনেও তার উপর অবিশ্বাসের ভাব ছিল না। তবু বলা তো যায় না। মালাদির সঙ্গে মেলামেশা হাজার নির্দোষ হলেও ঘটনার চেয়ে রটনা ভারী হতে কতক্ষণ!

"ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের খালি একটিমাত্র সম্পর্ক থাকবে। এটা কখনো ঠিক হতে পারে না, রতন। প্রেম যেমন সত্য, সখ্যও তেমনি সত্য। একটির সঙ্গে আরেকটির বিরোধ কোথায়? তা সত্ত্বেও আমাদের সতর্ক হতে হবে, যাতে অকারণে বিরোধ না বাধে। তোমার চেয়ে আমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা বেশী। চিত্রাদির কাছে ওদেশের কথা অনেক শুনেছি। একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আরেকজনের সঙ্গে প্রেম এই দুই নৌকায় পা রেখে টাল সামলানো যায়নি। বিবাদ বেধে গেছে। তোমাদের প্রেম আর একটু পাকা

হলে বন্ধুতার ভর সইবে। ততদিন তুমি না হয় একটিমাত্র দেবতার উপাসনা করলে।" জ্যোতিদা রঙ্গ করে।

"সানন্দে। আমি এক ঈশ্বরী বাদী।" রত্ন আরো বলে, "ঈশ্বরকেই আমি নারী রূপে আরাধনা করি। আমি সুফী।"

"তুমি দেখছি গুরুদেবকেও ছাড়িয়ে যাবে। কোনদিন লিখে বসবে দেবতারে প্রিয়া করি, প্রিয়ারে দেবতা।" জ্যোতিদা মুচকি হাসে।

রত্ন সলজ্জভাবে বলে, "আগে ওটা জীবনে উপলব্ধি করি, তারপরে সাহিত্যে প্রকাশ করব। যা উপলব্ধি নয়, নিছক উক্তি তাতে আমার অনুরক্তি নেই, ভাই জ্যোতিদা।"

যার করুণায় জীবনে উপলব্ধি করবে সে যে গোরী বলে একটি নারী এ বিষয়ে ওর লেশমাত্র সংশয় ছিল না। ও মেয়ে ওর জীবনে উদয় হয়েছে ওই সত্যটিকে সাকার করতে, রত্ন সেইজন্যে সাকারবাদী। ব্রাহ্মদের মতো নিরাকারবাদীও নয়, জ্যোতিদার মতো নিরীশ্বরবাদীও নয়। বাবার মতো বৈষ্ণবও নয়।

"আমি কিন্তু ঠিক নিরীশ্বরবাদী নই।" জ্যোতিদা সংশোধন করে। "পার্সনাল গড মানিনে বলে প্রার্থনা উপাসনা করিনে। ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করিনে। কিন্তু তৎ সৎ মানি।"

জ্যোতিদা ওর বেশী ধরাছোঁয়া দেয় না। রত্ন চেপে ধরলে বলে "অন্ধের হস্তিদর্শন জানো তো। মানুষ কোনো দেশেই কোনো কালেই সমগ্র হস্তীটাকে মুক্তচক্ষে দর্শন করেনি। ঋষিরাও না। প্রোফেটরাও না। যিনি যেটুকু ছুঁয়েছেন সেইটুকুকেই সমগ্র ভেবেছেন। তাই ধর্ম নিয়ে এত বিবাদ বিসম্বাদ। কারো সঙ্গে কারো মত মেলে না। মেলাবার আশায় বলতে হয় যত মত তত পথ। কিন্তু সেটাও তো সমগ্রের স্বরূপদর্শন নয়।"

সমগ্র সত্য কেই বা কবে জেনেছে যে জানাবে? জ্ঞানমার্গে এর কি কোনো সমাধান আছে না হবে? রত্ন সেইজন্যে প্রেমমার্গ বরণ করেছে। ভালোবেসেই ভালোবাসা পেয়েই সে সমগ্রতার স্বাদ পাবে। একটুখানি স্বাদই এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।

জ্যোতিদা হেসে বলে, "এ যেন হস্তিদর্শন নয়, ক্ষণেকের জন্যে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ।"

এরপরে আবার গোরীর কথা ওঠে। গোরী যখন কলকাতা আসতে পারছে না তখন রত্নকেই কৃষ্ণনগরে যেতে হয়। বিশেষত গোরী যখন বার বার যেতে বলছে।

"কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে পরীক্ষার পড়া ফেলে কোথাও যাওয়া উচিত কি না। তা ছাড়া অন্য কারণও আছে।" রত্ন সঙ্কোচে বিবর্ণ হয়।

"শুনি।" জ্যোতিদা উৎকর্ণ হয়।

"সেবার আমাকে যেতে হলো বেগমপুরে। সেখানে ওর স্বামীর সম্মুখীন হতে হলো। এবার কৃষ্ণনগর গেলে হতে হবে ওর মা বাবার সম্মুখীন। এ যেন একপ্রকার পরীক্ষক-মণ্ডলীর সম্মুখীন হওয়া। কী আছে আমার? কী করে ওঁদের দৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হব?"

জ্যোতিদাকে নীরব দেখে রত্নই আবার বলে, "আমি যদি ওঁদের ভালোবাসা না পাই, ওঁদের ভালোবাসতে না পারি তা হলে গোরীর দৃষ্টিতেও তো অনুত্তীর্ণ হব। অথচ আমি

সত্যিই চাই যে গৌরীর স্বজনদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়। ওঁরাও আমাকে আপনজন মনে করেন, আমিও ওঁদের।"

জ্যোতিদা সকৌতুকে বলে, "তাই নাকি? ওর স্বামী?"

রত্ন অতটা ভাবেনি। লজ্জিত হয়ে বলে, "কেন নয়? উনি যদি ওকে গ্রেসফুলি ছেড়ে দেন তবে উনি আর আমি তো বন্ধু। উনি তো আবার বিয়ে করবেন, ওঁর এমন কী ক্ষতি!"

জ্যোতিদা গম্ভীর হয়ে যায়। "না, ভাই, অত সহজ নয়। উনি ভয় দেখাতেন তা ঠিক, তা বলে সত্যি আবার বিয়ে করবেন না। ওঁর যদি ছেলে কি মেয়ে হয় তাকে তার সৎমার হাতে সঁপে দেবেন না। ওঁকে আমি খুব খুব ভালো করেই চিনি। উনি চেয়েছিলেন সন্তান। ওঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হতে চলেছে। এখন আর উনি বিয়ে করবেন কেন, বৌ ছেড়ে গেছে বলে?"

"কেন, সন্তান ছাড়া কি স্ত্রীতে আর কোনো প্রয়োজন নেই?" রত্ন মুখ ফুটে বলে না কী প্রয়োজন? তার ইঙ্গিতটা কি স্পষ্ট নয়?

"জমিদার নন্দনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। ওসব বরং গৌরী চলে গেলে আরো নির্বিঘ্নে চলবে।" জ্যোতিদাও ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বোঝায়।

"শুনেছি সুধা—" রত্ন লজ্জায় থেমে যায়।

"নেহাৎ ভুল শোননি।" জ্যোতিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "সুধা আছে বলেই রক্ষা। সুধা ওঁকে সত্যি ভালোবাসে। উনিও ওকে। গৌরী আসলে প্রক্ষিপ্ত। ও যদি বিদায় নেয় দু'দিন একটু শূন্যতা হবে। তারপরে জীবনযাত্রা যথারীতি চলবে।"

"কিন্তু ওর বেবী তো প্রক্ষিপ্ত হবে না। যদি বাপের কাছে থাকে।" রত্নর যুক্তি।

"না, বেবী প্রক্ষিপ্ত হবে না। সুধার হৃদয়টি মাতৃহৃদয়। দু'দিনেই আপনার করে নেবে। তবে সব নির্ভর করছে গৌরীর নিজের উপর। এখন পর্যন্ত ও আভাস দেয়নি যে বেবীকে স্বামীর হাতে দিয়ে তোমার সঙ্গে যাবে। ধরে নাও যে বেবী যাচ্ছে মার সঙ্গে, যেখানেই যাক। বেগমপুরে বা বোম্বাই শহরে। ফিফটি ফিফটি।" জ্যোতির উত্তর।

মাস কয়েক আগেও জ্যোতিদার মুখে শোনা যায়নি যে বেগমপুরে গৌরীর ফিরে যাবার সম্ভাবনা আছে। কথাটা রত্নর মনে বিঁধল। কিন্তু ও নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। ফিফটি ফিফটি যখন, তখন বোম্বাই যাত্রার সম্ভাবনাও সমান।

গৌরীর চিঠি নিয়মিত আসে। কিন্তু তার সুর আর আগের মতো কড়া নয়। বেগমপুরের সেই অশান্ত বন্দিনী তার অসহ্য বন্ধনের কথা আর বলে না। তার মালিকের বিরুদ্ধে তার আর কোনো অভিযোগ নেই। কৃষ্ণনগর তাকে তার দুঃস্বপ্নের হাত থেকে ত্রাণ করেছে। এখানে তার মা বাবার কাছে শান্তিতে আছে। লোকটা ওদিকে কার সঙ্গে কীভাবে রাত কাটাচ্ছে তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। সুধার উল্লেখ একবারও করে না।

তবে মাঝে মাঝে মাধবের জন্যে ওর মন কেমন করে। কে জানে কে ওঁর নিত্য সেবা করে। ওঁর জন্যে মালা গাঁথে। ফুলের মুকুট গড়ে। ফুলের সাজ পরায়। না, কৃষ্ণনগরের গৃহদেবতার জন্যে তার তেমন মমত্ববোধ নেই। কখনো নাম করে না।

মাতৃত্ব নিয়েও তার কোনো নালিশ নেই। এখন একরকম মানিয়ে নিয়েছে। একটু বেশী বয়সে প্রথম সন্তান হলে অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণ থাকে। কী জানি কেমন করে সে উদ্বেগ ও কাটিয়ে উঠেছে। আগে ওর সন্তান কামনা ছিল না। ইদানীং ওর চিঠি পড়ে মনে হয়, আছে। স্বাভাবিকরূপেই আছে। ওর সন্তান কামনা পূর্ণ হতে চলেছে বলে ও মনে মনে সুখী। যদিও বাইরে ও কথা স্বীকার করবে না। তা যদি করে তবে ওর স্বামীই জিতে যাবেন। ও হেরে যাবে। না, কিছুতেই নয়।

কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে ও একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছে। যত রাজ্যের বাংলা ইংরেজী মাসিকপত্রের পুরাতন বাঁধানো সেট। ওর ছেলেবেলায় ও এর মূল্য বুঝত না। নতুন পত্রিকা পেলে পড়ত। পুরোনোর ধার দিয়ে যেত না। এখন নতুন পুরোনো বিচার করে না। হাতের কাছে যা-ই পায় তাই পড়ে। তেমনি ইংরেজী বাংলা বাছবিচার নেই। ইংরেজী চর্চা তো করতেই হবে। নইলে রত্নর উপযুক্ত সঙ্গিনী হবে কী করে? ইংরেজী চর্চার এই যে সুযোগ এমনটি আর কবে পাচ্ছে? গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িক কাল অবধি "স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন" এর সম্পূর্ণ সেট আর কোথায়ই বা মিলবে?

খবরটা রত্নকে প্রলুব্ধ করে। ত্রিশ বত্রিশ বছরের "স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন" এক সঙ্গে পড়তে পাওয়া একটি দুর্লভ সৌভাগ্য। তার জন্যে সে বিলেত যেতে পারত। কে জানে বিলেতযাত্রা এ জীবনে ঘটে উঠবে কিনা! পরীক্ষা মানেই তো সিদ্ধি নয়। আপাতত কৃষ্ণনগর গেলেই যদি মিষ্টান্ন ভোগ হয় তবে সেই ভালো নয় কি? হাঁ, বিলিতী মাসিকপত্রও একপ্রকার মিষ্টান্ন।

পরীক্ষার পড়া যেন কুইনিন গেলা। কী করবে, নিরুপায়। কিন্তু বেছে নিতে বললে বিলিতী মাসিকপত্রই একশোবার বেছে নেবে। ফলাফল যাই থাক কপালে।

আঠারো

গৌরীর মা সুমতি দেবীও এককালে লেখিকা ছিলেন। লিখতেন ছোট গল্প আর মাসিকপত্রে পাঠাতেন। ছাপাও হয়েছিল গোটা কয়েক। রত্নর অত কথা জানা ছিল না। কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাঁধানো মাসিকপত্রের সেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ে।

"মাসিমা, আপনিই সেই সুমতি দেবী?" রত্ন জিজ্ঞাসা করে।

"হাঁ, বাবা, আমিই সেই। ওসব বাজে লেখা পড়ে সময় নষ্ট করে কী হবে? একালের লেখিকারা আমার চেয়ে শতগুণ ভালো লেখেন।" সুমতি দেবী উত্তর দেন।

"না, না, আমার তা মনে হয় না।" রত্ন প্রতিবাদ করে। "কিন্তু আপনি অমন করে হঠাৎ থেমে গেলেন কেন? আরো লিখতে পারতেন।"

"ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কার না লেখা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় না কেবল তাঁদের যাঁদের কাছে ওটা একটা সাধনা কিংবা ওটা একটা পেশা। কিংবা যাঁদের একটা

ঘরোয়া পত্রিকা আছে। আমার বেলা কোনোটাই খাটে না। তাই একদিন দেখলুম লেখা কোথায় ফেরার হয়েছে। সম্পাদকের হুকুমেও সে আর ধরা দেয় না। কী করি, বল? ঘরসংসার করব, না বুনো হাঁস তাড়াব?" সুমতি দেবী দুঃখ করেন।

"তা হলেও লেখা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত হয়নি, মাসিমা। মাঝে মাঝে একটা আধটা লিখতে পারতেন।" রত্ন তার অভিমত জানায়।

"চেষ্টা করেছি। মনের মতো ওতরায়নি। অভ্যাস একবার ছেড়ে দিলে যেমন গান বাজনা হয় না, তেমনি লেখালেখিও হয় না। সম্পাদকরা এখনো শারদীয় সংখ্যার জন্যে গল্প চেয়ে পাঠান। বিলিতী পত্রিকা থেকে চুরি করে কত লোক লেখা জোগাচ্ছে, আমিও কি পারতুম না? আমার মজা লাগে ওঁদের রচনা পড়তে। ওঁরা জানেন না যে আমার বাড়ীতেই রয়েছে সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার যার থেকে ওঁরা চুরি করে নিজের বলে চালান। তোমার যদি সময় থাকে মিলিয়ে দেখতে পারো ওইসব বিলিতী পত্রিকা আর এইসব বাংলা। কিন্তু ফাঁস করে দিয়ো না, বাবা।" মাসিমা হাসেন।

সখের ডিটেকটিভ হয়ে রত্ন আবিষ্কার করে যে "স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন" হচ্ছে বাংলা ছোট গল্পের স্বীকৃতিহীন আকর। যে পারে সেই একমুঠো সোনা সরায়। কিন্তু ওস্তাদ স্বর্ণকারের মতো তা দিয়ে যে অলঙ্কার গড়ে তা স্বকীয়তামণ্ডিত। এইসব অলঙ্কারশিল্পীকে চৌর্যাপরাধ দেওয়া যায় না। তবে কে কোনখান থেকে নিয়েছেন তা ধরে ফেলা শক্ত নয়। রত্নর মুখে ডিটেকটিভের মতো হাসি।

গৌরীর মাকে যেমন বয়সের তুলনায় ছোট দেখায় বাবাকে তেমনি বয়সের অনুপাতে বড়ো। মাথার চুল কাঁচাপাকা, গোঁফ জোড়াটা পাকা। বিষম ব্যস্ত মানুষ। দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে আদালতে বা মিউনিসিপাল অফিসে। হ্যাঁ, চেয়ারম্যান। বাড়ীতেও মক্কেলের বা উমেদারের ভিড়। অবসর পেলে মদের গেলাস নিয়ে বসেন, সঙ্গে এক গেলাসের ইয়ার। উকিল মোক্তার মিউনিসিপাল কমিশনার। জলি গুড ফেলো অশেষপ্রতাপ সিংহরায়।

সরকার ওঁকে পাবলিক প্রোসিকিউটর করতে চেয়েছিল। উনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, পলিটিকাল কেস তার হাত দিয়ে হবার নয়, কারণ তাঁর সহানুভূতি আসামীদের দিকে। তবে তিনি রাজনীতিতে যোগ দিতেও রাজী নন। দেশবন্ধুর প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন আর একটা মিউটিনির জন্যে অপেক্ষা করবেন, তার আগে ঝাঁপিয়ে পড়া নিরর্থক। কে একজন হিমালয়বাসী যোগী নাকি তাঁর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্ণ হলে আবার মিউটিনি বাধবে ও এ যাত্রা সফল হবে। ততদিন যদি বেঁচে থাকতে পারেন তবে স্বচক্ষে দেখে যাবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন।

রত্নর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয় রাতের বেলা খেতে বসে। জানতে চান ওর পড়াশুনা কেমন চলছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, কবে পরীক্ষার দিন পড়েছে। দু'একটা প্র্যাকটিকাল পরামর্শও দেন।

"আমার ছেলেকে আমি বিজনেসে দিয়েছি। চাকরিতে দিলুম না ইচ্ছে করেই।"

তিনি খেতে খেতে বলে যান, "সেখানে প্রতিদিন বিবেকের প্রশ্ন উঠত। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত কি উচিত নয়। এই জায়গায় আমি মহাত্মার সঙ্গে একমত।"

"আর অহিংসার ক্ষেত্রে?" রত্ন জেরা করে।

"অহিংসা পরমো ধর্ম। তা কি আমি অস্বীকার করতে পারি? শাস্ত্রে আছে যে! কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কতটুকু সম্বন্ধ? রাজনীতিতে ছল বল কৌশল সব কিছুর প্রয়োজন আছে। ইংরেজদের দিকেই চেয়ে দেখ। যেমন ওদের বল তেমনি ওদের ছল আর তেমনি ওদের কৌশল। আমরাও তো একদিন রাজার জাত ছিলুম। তখন আমরাও কি ছল বল কৌশলের আশ্রয় নিইনি? আবারও তো একদিন রাজত্ব করব। ওটা ঘটবে ১৯৫৭-৫৮ সালে। তখন কি ছল বল কৌশল অনাবশ্যক হবে?" তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসেন।

রত্ন কী বলতে যাচ্ছিল, গোরী ওকে ইশারায় নিরস্ত করে।

আঁচাবার সময় গঙ্গাজল আসে কর্তার জন্যে। গঙ্গাজল না হলে মুখ ধোওয়া হয় না। রত্ন অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকায়।

"ওঃ তুমি বুঝতে পারছ না কেন গঙ্গাজলে মুখ ধুচ্ছি?" তিনি অনুমান করে বলেন, "উকিলকে আদালতে কত মিথ্যা কথা বলতে হয়। মক্কেলকে বাঁচিয়ে দিতে বা জিতিয়ে দিতে। সে পাপের ক্ষালন হবে কী করে? রোজ তাই শুতে যাবার আগে গঙ্গাজলে মুখ ধুতে হয়। তাতেও কি ঘুম আসে? শুয়ে শুয়ে গীতার শ্লোক মুখস্থ বলি। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ।"

রত্ন আবার কী বলতে চাইছিল, গোরী ওকে থামিয়ে দেয়।

পরে এই নিয়ে গোরীর সঙ্গে কথা হয়। গোরী বলে, "বাবার যেদিন মন মেজাজ ভালো থাকবে সেদিন উনি তোর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবেন। শুধু তাই নয়, তোর পক্ষেই ওকালতী করবেন। আজ ওঁর দিনটা খারাপ গেছে। মামলায় হেরে এসেছেন।"

"মদটাও কি সেইজন্যে?" রত্ন আন্দাজ করে।

"না। মদটা আভিজাত্যের লক্ষণ। ওটা আমাদের ঘরানা।" গোরী সগর্বে বলে। "আমরা মেয়েরা অবশ্য খাইনে।"

"আমাদের বংশেও আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল, গোরী। আমার বাবা বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়ে অনভিজাত হন। আমি যদি আবার অভিজাত হই তো কেমন হয়? আমার মা শুনলে মূর্ছা যেতেন। এখন তো মা নেই যে বাধা দেবেন।" রত্ন বলে।

"মা নেই কেন বলছিস? আমার মা কি তোরও মা নন? ব্যবহারে কোনো রকম তারতম্য দেখছিস?" গোরী অনুযোগ করে।

"সে কথা ঠিক। এমন মাতৃহৃদয় আমার জীবনে এই দ্বিতীয়বার পাচ্ছি।" রত্ন অভিভূত হয়ে বলে।

গোরীর মা ওকে দিনে দশবার করে এটা ওটা খেতে দেন। সেইসূত্রে লাইব্রেরী ঘরে আসেন। দুটি একটি কথা বলে আবার চলে যান। রত্ন জানত না যে ওটা ছিল

ডিটেকটিভের উপর ডিটেকটিভগিরি। গোরীও সেই ঘরেই রত্নর সঙ্গে বসে ডিটেকটিভের কাজে নিযুক্ত ছিল কিনা। একজন পড়ত ইংরেজী মূল রচনা। আরেকজন বাংলা ভাবানুসরণ। তারই ফাঁকে ফাঁকে গল্প করত নিজেদের ব্যাপার নিয়ে।

"মাঝে মাঝে আমি তোকে স্বপ্ন দেখি।" গোরী বলে। "আর ওকে।"

"কাকে?" রত্ন শুনতে উন্মুখ হয়।

"যেটি আসছে। অবিকল তোরই মতো দেখতে।" গোরী ফিস ফিস করে বলে।

"দূর! তা কি কখনো হয়!" রত্ন লজ্জায় শিউরে ওঠে।

"হয়, যদি কেউ এক মনে ধ্যান করে। আমার কাছে একখানা বই আছে, ওতে লিখেছে। সত্য মিথ্যা আর মাস দুয়েকের মধ্যেই বোঝা যাবে।" গোরী বলে।

"ওঃ! আমার খেয়াল ছিল না যে এত শীগগির। হাঁ, এখন মনে পড়ছে জ্যোতিদা বলছিল বটে ডিসেম্বর মাসে প্রত্যাশা করা যায়।" রত্ন অন্যমনস্ক হয়।

"জ্যোতি আর কী বলছিল?" গোরী আগ্রহ প্রকাশ করে।

"বলছিল ফেব্রুয়ারি মাসেই—" রত্নর বাকীটুকু উচ্চারণ করতে সাহস হয় না। ওদিকে মাতৃচরণের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"সরস্বতী পূজা এবার ফেব্রুয়ারি মাসে বুঝি?" গোরী কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

"সরস্বতী পূজার সময় রতনকে আসতে বলছিস তো? রতন, তোর আসা চাই। যশোও সে সময় আসবে।" সুমতি দেবী দু'গ্লাস কমলালেবুর রস দিয়ে যান।

ইতিমধ্যে রত্নর নোটবই ভরে উঠেছে। ও বলে, "বসে বসে এই করছি, মাসিমা। এর জন্যে কেউ আমাকে ধন্যবাদ দেবে না।"

"ওটা বরঞ্চ সরস্বতী পূজার ছুটিতে করিস। ততদিনে তোর পরীক্ষার চাপ থাকবে না। এখন তো শুধু শুধু সময় নষ্ট।" উনি মন্তব্য করেন।

"সময় নষ্ট কেন বলছ, মা? সাহিত্যের নামে কে কী চালিয়ে দিচ্ছে, আর আমরা ভাবছি এরই নাম প্রগতি! আমরা একদিন ফাঁস করে দেব। আমরা একটা প্রবন্ধের খসড়া করছি। তবে তিন চার মাস সবুর করলেও চলবে।" গোরী বানিয়ে বলে।

"কেন মিছিমিছি ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়তে যাবি? ওদের হাতেই কাগজ। ওরা এমন গালাগাল দেবে যে তারপরে আর তোদের কারো লেখা ছাপা হবে না। তাছাড়া সব সাহিত্যের গোড়ার দিকটা অনুবাদের বা অনুকরণের। কিংবা স্রেফ চুরির। আমার দাদা ইংরেজীর অধ্যাপক। তাঁর কাছে শুনেছি। ইংরেজরাও ইটালিয়ানদের ভাঁড়ার ঘরে সিঁদ কেটেছে।" সুমতি দেবী সকৌতুকে হাসেন।

তিনিই জের টেনে বলেন, "তাতে কিন্তু কোনো পক্ষের ক্ষতি হয়নি। বরং বৃদ্ধি হয়েছে ইংরেজী সাহিত্যের। তোরা ও মতলব ছেড়ে দে। পারিস তো নতুন কিছু সৃষ্টি কর। তবে মেয়েদের সে পথেও বিস্তর প্রতিবন্ধক।"

উনিশ

ললিতের কাছে সুমতি দেবী সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের আধুনিক উপাখ্যান শুনেছিলেন। শুনে সুখীই হয়েছিলেন। এসব বিষয়ে তিনি আশ্চর্যভাবে সংস্কারমুক্ত বাঙালী মহিলা। বোধ হয় তাঁর পিতৃকুলের গুণে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছিলেন সেকালের পক্ষে উদারভাবে।

সাত ভাই চম্পার মধ্যে রত্নই ছিল পারুল বোনের মতে সব চেয়ে অগ্রসর। গোরীর সঙ্গে রত্নর চিঠি লেখালেখি সেই জন্যে সুমতি দেবীর চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। তিনি নিজেও তো এককালে সাহিত্যিকদের চিঠিপত্র পেয়েছেন ও তাঁদের লিখেছেন। কেউ কেউ তাঁর বাড়ীতে শুভাগমনও করেছেন। দু'একবার অতিথিও হয়েছেন। তাঁর স্বামী এতে অন্যায় কিছু দেখেননি। বরং আফসোস করেছেন যে আজকাল আর কেউ আসেন না। কোন্ সুবাদেই বা আসবেন! সুমতি দেবী তো আর লেখেন না।

তাই রত্নকে পেয়ে তিনি পুলকিত হন। আদর আপ্যায়নের চূড়ান্ত করেন। তাঁর ধারণা ছিল গোরীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ললিতের সঙ্গে সম্পর্কের মতো অনবদ্য। গোরী যে একটু আধটু লিখছে ও তার লেখা যে ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এর পেছনে রত্নর হাত আছে বলে তিনি ওর উপর আরো প্রসন্ন।

তা বলে তো তিনি চোখ বুজে থাকতে পারেন না। সারাদিন একজোড়া তরুণতরুণী নিভৃত কক্ষে বসে বইপত্র পড়ে এইটেই কি সব কথা না শেষ কথা? ওদের চাউনি, ওদের ফিস ফিস করে আলাপ, ওদের একজনের মুখের কাছে আরেকজনের কান পাতা—ম্যাজিস্ট্রেট কন্যা এসব ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে পারেন কি? উকিলপত্নীও কি পারেন? তাই নানা ছলে পদক্ষেপ করেন।

একবার তাঁর মনে হল তিনি স্বচক্ষে দেখতে পেলেন যে ওরা মাসিকপত্র তুলে ধরে তার আড়ালে হাসাহাসি করছে। কিছু একটা পড়ে হাসি পাচ্ছে বলেই কি হাসাহাসি? না অন্য কোনো কারণে? তিনি অন্তরাল থেকে তীব্রতর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে আবিষ্কার করলেন যে একজন আরেকজনের গালে ঠোনা মারতে মারতে—ঐ যাঃ—দিল ঠোঁট ছুঁইয়ে। অপরজনও তার শোধ না দিয়ে ছাড়বে না।

হরি! হরি! এ কী দৃশ্য! এও চোখে দেখতে হলো! সুমতি দেবী তখনকার মতো চেপে যান। শুধু জানান দিয়ে যান যে তিনি ঘোরাফেরা করছেন। রাতের বেলা গোরীর পাশে শুয়ে সমস্ত বার করে নেন তার কাছে থেকে। আদি অন্ত। সহানুভূতিভরে।

ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, "বাছা রে, তোর বিয়ে সুখের হয়নি সে কি আমি জানিনে! তুই যাতে শান্তি পাস তাতে জীবন উৎসর্গ কর। সাহিত্য রয়েছে। রাজনীতি রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে। ইচ্ছে করলে প্রাইভেট ম্যাট্রিক, প্রাইভেট আই-এ, প্রাইভেট বি-এ দেওয়া যায়। একদিন তুই এম-এ দিতেও পারবি। বাধা দিচ্ছে কে? যশো কি তোর সাহিত্যচর্চায় বাধা দিচ্ছে, না রাজনীতিচর্চায়? শিক্ষায় যদি বাধা দেয় আমরা তো আছি। আমরা ওকে বলে কয়ে ওর মা বাপকে বলে কয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা

করব। তোর একটি গভর্নেস চাই। দরকার হলে আমরাই ওর মাইনের টাকা যোগাব।"

গৌরী শুনে যায়, কথাটি বলে না। মা বলতে থাকেন, "কিন্তু ও পথে না গিয়ে এ কোন্ পথে তুই যাচ্ছিস? মেয়েমানুষের পক্ষে এর মতো বিপথ আর কী আছে? স্বামীর ঘর ছেড়ে গেলে স্বামী তো পরমহংস হবে না। ও আবার বিয়ে থা করে সংসারী হবে। ফিরে যেতে চাইলে ফিরে যাবার দুয়ার বন্ধ। মাঝখান থেকে বাচ্চাটি হাতছাড়া হবে। হ্যাঁ, দেশের আইন তাই বলে। শুধাস গে তোর বাপকে। বাপ অত বড়ো উকিল, ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করলে খাঁটি পরামর্শই পাবি। তুই যদি মনে করে থাকিস যে, তুই যে মুলুকে যাবি তোর বাচ্চাও যাবে তোর সঙ্গে তবে ওটা তোর ভুল ধারণা। যশো বরং ওর ঘরণীকে ছাড়বে, তবু ওর বংশধরকে ছাড়বে না। ওর মহত্ত্বের উপর অত বেশী ভরসা রাখিসনে।"

গৌরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মা বলে যান, "বাছা রে, তোর বেদনা আমি বুঝি। এমন হবে জানলে কি তোর ও বাড়ীতে বিয়ে দিতে যাই? কিন্তু যে বাড়ীতেই দিই না কেন, কোনো মতে নিশ্চিত হবার জো নেই যে বিয়ে সুখের হবেই। এই যে তুই রত্নকে মনে মনে বরণ করেছিস এ বিয়ে যদি সম্ভব হয়—হবে না বলেই আমার বিশ্বাস—তা হলেও সুখের হবে কেমন করে জানলি? এখন মনে হচ্ছে সুখের হবে, কিন্তু দু'বছর পরে হয়তো সব উত্তাপ জুড়িয়ে হিম হয়ে যাবে। বন্ধুতা অনেকদিন স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু প্রেম কখনো বেশী দিন থাকে না। ওটা কবিদের কল্পনা। কবিরাও কি সকলে একমত? প্রেমে পড়েছিস তার জন্যে তোকে দুষব না। যার প্রেমে পড়েছিস সেও কিছু মন্দ লোক নয়। তারও দোষ দেব না। মানুষের হৃদয়ের উপর কি মানুষের জোর জুলুম খাটে? কিন্তু ওইখানেই দাঁড়ি টানতে হয়। তোরা যদি ভালোবেসেই ক্ষান্ত হতিস আমি হস্তক্ষেপ করতুম না। কিন্তু পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়া কি সহ্য হয়? ওর চেয়ে আগুনে হাত দেওয়া কম বিপজ্জনক। ভাগ্যিস আর কেউ দেখতে পায়নি। তোর বাপের কানে উঠলে রক্ষা থাকত না। তোদের দুজনকেই উনি ঘোড়ার কোড়া দিয়ে চাবকাতেন। ছি ছি! তুই কি পরিবারের মুখ হাসাবি? যদি আর কারো চোখে পড়ত! শেষকালে আমাকেই বিষ খেয়ে মরতে হতো! আর ওই কি তোর উপযুক্ত সাথী?"

গৌরী থরথর করে কাঁপে। ওর মা ওকে কোলে জড়িয়ে ধরে বলেন, "না, না, আগুন নিয়ে খেলা চলবে না। চলতে দেওয়া যায় না। আমি আর সব সইতে পারি। ওইটি পারব না। তোরা যখন এতদূর গেছিস তখন আরো কতদূর যাবি কে জানে! না, না, সে ঝুঁকি আমি নেব না। রত্নকে কালকেই এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে। আমরা অপমান করে তাড়াব না। মানে মানেই সরে যেতে বলব। ইচ্ছে করলে তুই ওকে আভাস দিতে পারিস। প্রস্থানের প্রস্তাবটা ওর দিক থেকেও আসতে পারে। সত্যি ওর এখানে এমন কী কাজ আছে যে ও কলকাতার পড়াশুনায় অমনোযোগী হবে? পরের চুরি ধরতে গিয়ে তোরা নিজেরাই ধরা পড়ে গেছিস। এর পরে তোরা কী আশা করিস? ক্ষমা করতে রাজী আছি, কিন্তু প্রশ্রয় দিতে নারাজ। রত্নকে আমার আর একটি ছেলে বলেই দুধকলা খাইয়েছি, জানতুম না যে কালসাপ পুষেছি। ভুল সবাই একবার

করে, কিন্তু দ্বিতীয়বার কেউ জেনেশুনে করে না। যা হবার তা হয়ে গেছে, গৌরী। তোকে আমি বকব না। রত্নকেও না। তোর বাপকেও সব কথা বলব না। যেমন রাগী মানুষ। তা বলে একেবারে গোপন করতেও পারব না। গৃহস্থের কাছে গৃহিণীর কিছু গোপন করা উচিত নয়।"

গৌরী এতক্ষণ মুখ বুজে সহ্য করছিল। এবার ওর আত্মসম্মানে বাধে। ও ফণা তোলে। বলে, "কী দেখেছ তুমি যে বাবাকে বলবে? যা দেখেছ সেটা তোমার চোখের মায়া। একটা অলীক ধারণার উপর রং চড়িয়ে তুমি যা করেছ তা তোমারি মনের রচনা। রত্ন কালকেই যাচ্ছে। আমিই ওর হয়ে তোমাকে নোটিস দিচ্ছি। আমিও যে থাকছি তা নয়। আমিও কলকাতা চললুম। গয়না বেচে চালাব। কোনোমতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা, তারপরে আর একটা দিনও না। যাদের বাচ্চা তারা চায় তো নিয়ে যেতে পারে। আমি এতদূর এগিয়েছি যে আর পিছু হটতে পারিনে, মা। হটলে রত্নর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হব। ও যে আমার জন্যেই প্রতিযোগিতায় নামছে। নইলে নিজের জন্যে এমন কী দরকার ছিল! ওর জীবনের লক্ষ্য থেকে যে ও সরে যাচ্ছে। কেন? কার জন্যে? আমাকে ওর মতো ভালোবাসে কে? তুমি? তুমি যদি ভালোবাসতে তা হলে চোখ বুজে বেগমপুরের নবাবনন্দনের হাতে সঁপে দিতে না। কী দেখলুম ওদের ওখানে গিয়ে? মনে আছে না আবার শুনতে চাও? পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিয়েছে কে প্রথমে? সুধা কি পরস্ত্রী নয়? বিধবা হয়েছে বলে কি আপনার স্ত্রী হয়েছে? দেশের আইন কি পুরুষকে অমন কোনো অধিকার দেয়? আইন তো বিধবাকে বিয়ে করার সুযোগই দিয়েছে। সুধাকে বিয়ে না করে আমাকে বিয়ে করার কারণটা কী ছিল? ফলে এখন দু'জনকেই অসুখী করা হলো। সুধাও কি সুখী হয়েছে নাকি?"

সুমতি দেবী মেয়েকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। বলেন, "যা হবার তা তো হয়ে গেছে, মা। একই লেবু হাজারবার কচলিয়ে কী হবে? শ্বশুরবাড়ী ফিরে গিয়ে তোর প্রথম কাজ হবে সুধাকে ওর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া। সেখানে বসে ও মাসে মাসে মাসোহারা পাবে। ওকে সুখী করা কারো সাধ্য নয়। বিধবার বিয়ে! দূর! ওসব নাটক নভেলেই শোভা পায়। তাই বা কেমন করে বলি? শরৎবাবু অতি সাবধানী লেখক। ওঁর বিধবা নায়িকারা ভালোবাসে, ভালোবাসা পায়, কিন্তু বিয়ে একজনেরও হয় না।"

সুধার হয়ে গৌরী ঝগড়া করে। বলে, "কেন ওকে বেগমপুর থেকে তাড়াব? আমার যে অধিকার ওরও সেই অধিকার। ওর অধিকার বলতে গেলে আমার চেয়েও বেশী। শাশুড়ীর ও আত্মীয়া। ওর বোন ছিল ও-বাড়ীর বড় বউ। তা ছাড়া আমার স্বামীর দেহমনের উপরও তো ওরই অগ্রাধিকার।"

"চুপ, চুপ! ওসব কথা মুখে আনতে নেই। এমন কোন্ পরিবার আছে যেখানে একটা না একটা কেচ্ছা নেই। ওর চেয়েও কুৎসিত কেচ্ছা আমার জানা। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দে যে বেগমপুরের কেচ্ছাটা লালপুরের মতো জঘন্য নয়। ওখানে তো ভাসুর ভাদ্রবউতে।" সুমতি দেবী হেসে গড়িয়ে পড়েন।

"ভয়ানক অন্যায়! ভয়ানক অন্যায়!" গৌরী গর্জে ওঠে। "আবার বিয়ে দেয়

না কেন বিধবা ভাদ্রবউয়ের ? কেন অমন করে ওর চরিত্র নষ্ট করে ? কুমার বাহাদুরকে আমি হলে শুট করতুম। শয়তান, ভিলেন, ডেভিল, স্কাউণ্ডরেল কোথাকার ! তোমরা আমাকে লালপুরে দাওনি তাই রক্ষা। এতদিনে আমারও ফাঁসি হয়ে যেত। অত বড় উকিল বাপও আমাকে বাঁচাতে পারতেন না।"

"চুপ, চুপ। তোর বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। ওঘর থেকে ওঁর নাকের গর্জন আর এঘর থেকে তোর মুখের গর্জন। বল, মা গোরী, দাঁড়াই কোথা !" সুমতি দেবী নিজেই চুপ করেন।

বিশ

রত্ন ও বাড়ীতে এমন আদরযত্নে ছিল যে তিনদিনের জায়গায় সাতদিন থাকার স্বপ্ন দেখছিল। গোরীর সঙ্গ পাচ্ছে এটা ওর পরম ভাগ্য, তার চেয়ে কম ভাগ্য নয় ওর পিতামাতার স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ লাভ। ভালোবাসা তখনি সর্বাঙ্গীণ হয় যখন প্রিয়জনের প্রিয়জনকেও ভালোবাসা যায় ও তাঁদের ভালোবাসা পাওয়া যায়। গোরীর মা বাবাকে রত্ন অকপটে ভালোবাসত। ওঁরা শুধু গোরীর মা বাবা বলে নয়, এমনিতেই ভক্তিযোগ্য।

"তোর তো মা নেই, আমিই তোর মা।" প্রথমদিনেই বলেছিলেন সুমতি দেবী। আর অশেষবাবু কথায় না জানালেও ব্যবহার করেছিলেন পিতৃব্যের মতো।

চারদিনের দিন রত্ন লক্ষ করে সকলের মুখভাব সুগম্ভীর। সকলেই যেন মৌনব্রত পালন করছেন। হয়তো অনশনব্রত। কারণ জলখাবারের সময় কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। রত্নকে একা একা সারতে হলো।

লাইব্রেরী ঘরে যথারীতি মাসিকপত্রের সেট নিয়ে বসেছে এমন সময় গোরী এসে কথা নেই বার্তা নেই ঝরঝর করে কাঁদে। রত্ন তো অবাক।

গোরীই প্রথম কথা বলে। "তখন আমি তোর স্তোকবাক্যে ভুলে বিষ খেয়ে মরিনি। এখন মরতে চাইলেও মরতে পারছিনে, সেই দুঃখে জ্বলে পুড়ে মরছি, মানিক। কেন তুই আমাকে বাঁচালি ! শত্রু না হলে কেউ অমন কাজ করে ?"

গৌরচন্দ্রিকার পর ও যা বলে তার মর্ম ওর মা ওকে অপমানের একশেষ করেছেন। অন্য সময় হলে ও গলায় দড়ি দিত। কিন্তু বড়োই দুঃসময়। ওর মা-ই এখন ওর সঙ্কটতারিণী ধাত্রী। মার সঙ্গে ঝগড়া মানে নিশ্চিত মরণ।

"কিন্তু কেন অপমান ? কোন্ অপরাধে ?" রত্ন ব্যাকুল কণ্ঠে শুধায়।

"মান্ধাতার আমলের ওই ভদ্রমহিলার ধারণা আমি বিবাহিতা মেয়ে, আমার কাছে তুই হলি পরপুরুষ আর তোর কাছে আমি হলুম পরস্ত্রী। তাই যখন হলো তখন বইয়ের আড়ালে অমন ফষ্টিনষ্টি কেন ?" গোরী রত্নকে হকচকিয়ে দেয়।

"ওঃ ! দেখতে পেয়েছেন বুঝি !" রত্ন রেগে ওঠে।

"হাঁ, গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল আমার মা ওসবের ঊর্ধ্বে। সত্যি

আমাকে উনি অসাধারণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বালিকাবয়সে। অমন উদারতা আমি আর কোনো বাড়ীতে দেখিনি। কিন্তু সেই মা আমার আজ এমন বিরূপ হয়েছেন যে লেশমাত্র স্বাধীনতা সহ্য করতে পারেন না।" গৌরী বলে।

রত্ন মর্মাহত হয়ে তটস্থ রয়েছিল। কী বলবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

"কাল সারারাত আমার চোখের দুটি পাতা এক করতে পারিনি। কেঁদেছি আর ভেবেছি। শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে লোকচক্ষে আমি বিবাহিতা মেয়ে, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে আমি কুমারী। তাই যদি হয় তবে আমি পরস্ত্রী হই কী করে? আর তুই কেন হবি পরপুরুষ? আমাদের দিক থেকে আমরাই ঠিক। কেন তবে দুঃখপ্রকাশ করব বা মার্জনাভিক্ষা করব? মাকে স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়েছি তোমার বাড়ীতে যতদিন আমি আছি, তোমার উপর নির্ভর করছি ততদিন তুমি আমার সঙ্গে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু পরে এমন দিনও আসবে যখন আমি সবাইকে দেখিয়ে শুনিয়ে রত্নর সঙ্গে থাকব। এটুকু ফষ্টিনষ্টি তো কিছুই নয়। এর পরে দেখবে কী না করি।" গৌরী বলতে বলতে জ্বলে ওঠে।

রত্ন তো ভয়ে কাঠ। "বললি তুই মাকে ওকথা?"

"হাঁ। এতদিনে সব সাফ হয়ে গেছে। আপাতত মার হাতেই ঝাঁটা। উনি আমাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন। আমাকে না করলে তোকে। কিন্তু আসুক তো ফেব্রুয়ারি মাস। তখন দেখব কার কতদূর দৌড়।" গৌরী হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাত পা ছোঁড়ে আর অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়।

রত্ন চিন্তিত হয়। বলে, "মাকে খবরদার আমাদের পরিকল্পনার কথা বলিসনে। পরীক্ষায় ভালো করব না মন্দ করব জানিনে। মন্দ করলে ফেব্রুয়ারি নয়, আরো দেরি হবে। তারপর জ্যোতিদা যদি চাকরি জোটাতে না পারে বম্বে গিয়ে আমরা তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেব। মাকে তুই আমার সঙ্গে থাকার কথা না বললেই ভালো করতিস। এখন তো আমি ওঁকে মুখ দেখাতেও পারব না। আজকেই সরে পড়ব। আজ কেন, এখনি। নয়তো অপমানের একশেষ হতে হবে আমাকেও।"

সুমতি দেবী বোধ হয় আড়ি পেতে শুনছিলেন। হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলেন, "ছি, বাবা! তোকে কি আমি অপমান করতে পারি! তুই আমার পেটের ছেলের চেয়ে কম কিসে! আমি জানি গৌরীর উপর তোর অসীম প্রভাব। তুই যা বলবি ও তাই করবে। দোহাই, বাবা, ওকে কুপরামর্শ দিসনে। ওতে ওর সর্বনাশ হবে। হিন্দুর মেয়ের কি সাত পাকের বাঁধন থেকে মুক্তি আছে? ডিভোর্স কখনো এ সমাজে চলবে না। একশো বছর পরেও না। তুই কত বড়ো হবি! তোর কি বউয়ের অভাব হবে! গৌরীকে তুই রেহাই দে।"

গৌরী রত্নর দিকে একদৃষ্টে তাকায়। শোনা যাক ও কী বলে।

রত্ন তাঁকে অভয় দেয় যে গৌরী সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে রত্ন সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। নিজের সিদ্ধান্ত খাটাবে না। পরামর্শ যখন যা দিয়েছে ভালোর জন্যেই দিয়েছে। পরে যদি কখনো দেয় ভালোর জন্যেই দেবে। অনাহূতভাবে দেয়নি ও দেবে

না। প্রভাব যদি কিছু থাকে সেটা একতরফা নয়। গোরীর যেমন প্রখর ব্যক্তিত্ব, ওকে প্রভাবিত করতে পারে কে?

"তোরা দুটি ভাইবোন হয়ে চিরকাল থাক, এই আমার মনস্কামনা।" বলে সুমতি দেবী দু'জনের দিকে সস্নেহে তাকান।

"সেইভাবেই তো শুরু হয়েছিল মাসিমা। কে জানত তার এই পরিণতি হবে! কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, গোরী না চাইলে আমি কিছু চাইব না।" বলে রত্ন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

"ঘরের ঢেঁকি কুমীর।" সুমতি দেবী মন্তব্য করেন। কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে তা ঠিক মালুম হয় না। গোরীকে না রত্নকে।

"কাকে লক্ষ্য করে বলছ, মা?" গোরী কৈফিয়ত চায়।

"তোকে লো, তোকে।" তিনি ফেটে পড়েন। "পরের ছেলের কাছে বলা হচ্ছে কি না, আমি কুমারী! তুই কুমারী যদি তো অমন গোলগাল চেহারা হয়েছে কেন?"

"তুমি ভিক্টোরিয়ার আমলের মহিলা, তুমি এ তত্ত্ব বুঝবে কী করে? বিলেতে আজকাল বিবাহিতা মেয়েরাও নামের আগে কুমারী লেখে। লোকেও তাদের কুমারী বলে ডাকে। ছেলেমেয়ে হয়েছে যার সেও কুমারী বলে পরিচিত। এইটেই আধুনিক ধারা। এ ধারা ভারতবর্ষেও আসছে। জ্যোতিই তার ভগীরথ।" গোরী জ্যোতির নামটাও ফাঁস করে দেয়।

"জ্যোতি!" তিনি আকাশ থেকে পড়েন। "জ্যোতি আছে এর পেছনে! ও যে দেশের একটি রত্ন!"

"কেন, রত্নও কি তাই নয়?" গোরী দ্বন্দ্বে নামে।

"হতে পারে। দীপনারায়ণ সিংহও তো ছিলেন একটি রত্ন। লিলিয়ান পালিতের প্রেমে পড়ে কী হাল হয়েছে তাঁর!" সুমতি দেবী পরিতাপ করেন।

ওই মধুর কেলেঙ্কারির কাহিনী গোরীর অজানা ছিল না। বলে, "প্রেমের জন্যে দুঃখ পেতে হয়, মূল্য দিতে হয়, তুমিই তো কতবার বলেছ, মা।"

"হাঁ, কিন্তু সে প্রেম বিবাহান্ত হওয়া চাই। বিবাহ যেখানে সম্ভব নয় সেখানে প্রেমে পড়ে কাজ নেই, বাছা। আর বিবাহবিচ্ছেদপূর্বক বিবাহ, যেটা ওদেশে আজকাল চলছে, সেটা আমার দু' চক্ষের বিষ।" তিনি ভিক্টোরিয়ার মতো ফারমান জারী করেন।

গোরী ওর মাকে বোঝায়। "আমি কি এক বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি চাই আরেক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে। না, মা। আমি চাই বন্ধনহীন স্বাধীনতা। রত্নও বিয়ের কথা ভাবছে না। বিয়ের কথা উঠলে তো বিবাহবিচ্ছেদের কথা উঠবে। না, বিবাহবিচ্ছেদে আমার রুচি নেই। ওটা আমার কাছে নীতিবিরুদ্ধ নয়, রুচিবিরুদ্ধ।"

তিনি আরো ভয় পান। বিবাহবিচ্ছেদও নয়, বিবাহও নয়, তা হলে কী? নিষ্কাম প্রেম? তার নমুনা কি ওই কাল বিকেলের ঘটনা?

"তোর মনের তল পাওয়া ভার। বন্ধন এড়াবি, অথচ সঙ্গ চাইবি। জানিসনে কী ওর পরিণাম! আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পোড়ে, মুখ পোড়ে, ঘর তো পোড়েই,

সংসার পুড়ে ছাই হয়। তুই এখন মা হতে চললি। তোর আরো সাবধান হওয়া উচিত। সন্তানের মুখ চেয়ে।" তিনি হিতোপদেশ দেন।

"ওকে তো আমি কাছে রাখতেই চাই। ওকে কি আমি ছেড়ে দিচ্ছি নাকি ? আমি যেখানে যাব ও সেখানে যাবে। বাপের কাছে যাবে না।" গোরী অবদার ধরে।

"শোন কথা !" সুমতি দেবী রুষ্ট হয়ে বলেন, "দুনিয়া তোর ওই আবদার শুনবে ! সবাই রায় দেবে বাপের পক্ষে। ওরই তো ফসল।"

"কী ! ওরই ফসল ! আমার নয় ! আমি যে দশ মাস গর্ভে ধরছি। তার বেলা ? আমি যদি না ধরতুম তা হলে কী হতো ? দুনিয়া আমাকে বাধ্য করত ? করতে পারত ?" গোরী আগুন হয়ে ওঠে। "এই জন্যেই পাশ্চাত্ত্যের মেয়েরা বিদ্রোহ করছে। যেখানেই অন্যায় সেখানেই বিদ্রোহ। পিতার অংশ অতি তুচ্ছ। মাতার অংশই সাড়ে পনেরো আনা। দুনিয়া একদিন মানবে এ তত্ত্ব। আমরাই মানাব।"

"সব সত্যি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছিস যে সম্পত্তির বেলা বাপের অংশই সাড়ে পনেরো আনা। সেই জন্যেই তো বিয়ে লো।" মা মেয়েকে মনে করিয়ে দেন। "আমি এ বাড়ীতে কতটুকু এনেছি ? সারাজীবন খাচ্ছি। তোদেরও খাওয়াচ্ছি।"

রত্ন ওদিকে ওর যৎসামান্য তল্পিতল্পা গুটিয়ে গাড়ি ডাকতে যাবে ভাবছে। সময় থাকতে সরে না পড়লে তার কপালেও হয়তো প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

গোরী তা দেখে অসহায় বোধ করে। বাড়ীটা তো ওর নয়, ওর মা বাপের। মাকে বলে, "রত্ন চলে যাচ্ছে, মা। ও কি আর কোনো দিন আসবে ?"

মা মনে মনে কঠিন হন। কিন্তু মুখে মিষ্টি হাসি। "ও কী ! তুই ভাত না খেয়েই চলে যাবি ? গৃহস্থের অকল্যাণ হবে না ? এবেলাটা থাক। ওবেলা উনি ফিরলে পরে বাড়ীর গাড়িতে করে আমরা সবাই তোর সঙ্গে স্টেশন যাব। কেমন ?"

একুশ

গোরীর যেমন জীবনমরণ সমস্যা রত্নরও তেমনি। প্রতিযোগিতায় বিফল হলে সে কি আর গোরীর দায়িত্ব বহন করতে পারবে ? যদি না জ্যোতিদা সহায় হয়। শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় জ্যোতিদার নিজের পায়ের জোর কত।

গোরীর পরীক্ষা ডিসেম্বরে, রত্নর পরীক্ষা জানুয়ারিতে। যে যার পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে থাকে। চিঠিপত্র আপনি কমে আসে। তা ছাড়া রত্ন চায় না যে ওর চিঠির জন্যে গোরীর মা আবার বিরূপ হন।

"মা আমার একটুও বেদরদী নন।" গোরী আশ্বাস দেয়। "তোর উপর ওঁর সত্যি মায়া পড়ে গেছে। আমার উপরে তো অগাধ স্নেহ। ব্যাপারটা উনি বাবার কানে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তোলেননি। সেটা আমাদের মুখ চেয়ে। ওঁর হৃদয়টি মোমের মতো নরম। ওঁর বিবেক কিন্তু ইস্পাতের মতো নির্মম। উনি বলেন, ভালোবাসায় পাপ নেই,

আমরা যদি ভালোবাসি উনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমরা যদি নিরাকার প্রেমকে সাকার করতে যাই তা হলে উনি প্রাণপণে বাধা দেবেন, সে বাধা আমাদেরই মঙ্গলের জন্যে।”

তার মানে প্লেটনিক প্রেম। রত্ন যে প্রেম মালাদিকে অর্পণ করেছিল। তখন তার ওতে বিশ্বাস ছিল। এখন নেই। এখন ওর আদর্শ বৈষ্ণব প্রেম। “প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।” গোরী যতদিন অপরের বিবাহিতা স্ত্রী ততদিন রত্ন প্লেটনিক প্রেমে রাজী। কিন্তু যেদিন সে বন্ধন ছিন্ন হবে সেদিন আর প্লেটনিক প্রেম নয়। সেদিন বৈষ্ণব প্রেম। তার আগেই একটুখানি ব্যত্যয় ঘটেছে বলে সে লজ্জিত।

“কই, আর কেউ তো লজ্জিত নয়। আমার প্রোপ্রাইটরের কথা বলছি।” গোরী এর উত্তরে লেখে। “সুধার সঙ্গে সে ভদ্রলোক—ভদ্রলোক? —যা করে আসছেন তা কি নিরাকার না সাকার সাধনা? মাকে আমি কিছু না হোক একশোবার বলেছি। তার বেলা ওঁর বিবেক অসাড়। জ্যোতি ব্যাখ্যা দেয় বুর্জোয়াদের বিবেক সম্পত্তির তারে বাঁধা। যশোমাধব যাই করুন সেটা ধর্তব্য নয়। কারণ তাঁর সম্পত্তি আছে ও সে সম্পত্তি স্ত্রীই তো ভোগ করছে ও করবে। সম্পত্তিটা তাঁর না হয়ে তাঁর স্ত্রীর যদি হতো তাহলে তাঁকে জবাবদিহি করতে হতো বইকি। ঘরজামাইকে সুধাপান করতে দেখলে কি ক্ষমা করত কেউ? সুরার নেশার মতো সুধার নেশাও ছাড়িয়ে দিত ভাত বন্ধ করে।”

রত্নর অনেক সময় মনে হয় যে গোরী ওর স্বামীর সঙ্গে সমান সমান হতে চায় বলেই রত্নকে ওর দরকার। যশোবাবুর যেমন সুধা গোরীর তেমনি রত্ন। তাই যদি হয়ে থাকে তবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা আসলে স্বামীর মতো স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, স্বামীর হাত থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নয়। একটার সঙ্গে আরেকটার আসমান জমিন ফারাক। গোরী যদি ওর স্বামীর মতো স্বাধীন হয় তবে রত্নর কাছে ও হবে চিরদিন পরকীয়া। আর যদি স্বামীর হাত থেকে স্বাধীন হয় তবে একদিন রত্নর স্বকীয়া।

রত্ন বৈষ্ণব প্রেমে বিশ্বাস করলেও পরকীয়া তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। বৈষ্ণবরা শিউরে ওঠেন যদি কেউ বলে, রাধা হচ্ছেন কৃষ্ণের স্ত্রী। বা কৃষ্ণ হচ্ছেন রাধার স্বামী। রত্ন খুশি হয় যদি কেউ ভাবে, গোরী আর রত্ন লোকচক্ষে না হলেও ভগবানের চোখে পতি আর পত্নী। পরোক্ষে গোরীও তো সেটা স্বীকার করছে। যেটি আসছে সেটি নাকি রত্নর মতো দেখতে। এর তাৎপর্য কি এই নয় যে, কল্পলোকে ওরা পতিপত্নী হয়ে গেছে। বাস্তবেও একদিন হবে। ওদের প্রেম তা হলে স্বকীয়ার সঙ্গে স্বকীয়ের প্রেম। সাকার প্রেম। সর্বাঙ্গীণ প্রেম। এর নাম পরকীয়া তত্ত্ব নয়, স্বকীয়া তত্ত্ব।

গোরীর সঙ্গে এই নিয়ে একসময় বোঝাপড়া হবে। এখন নয়। এখন ও বেচারি জঠরযন্ত্রণায় জর্জর। রত্ন যে ঘরে শুত তার পাশের ঘরেই শুত গোরী। ওর মা শুতেন ওর সঙ্গে। মাঝে মাঝে কান্নার স্বর শোনা যেত। গোরী কাঁদছে জঠরযন্ত্রণায় বা তার ভয়ে। মেয়েদের জীবনে ওর মতো সঙ্কট আর নেই। গোরীকে ও সঙ্কট পার করিয়ে দিতে হবে। তার আগে একটিও কথা না। আর রত্ন নিজেও তো সঙ্কটারূঢ়। কোথায় একমনে পড়াশুনা করবে! তা নয় গোরীর সঙ্গে বোঝাপড়া। বোঝাপড়া কি তর্কবিতর্ক

বিনা হয়? চিঠিপত্রে তর্কবিতর্ক করবে, না পরীক্ষার সম্ভবপর প্রশ্নপত্রের উত্তর তৈরি করবে? আর পাঁচজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করবে?

কলকাতায় ফিরে গিয়ে রত্ন পরীক্ষাটাকে আর একটু সীরিয়াসভাবে নেয়। পরীক্ষা মানেই বলপরীক্ষা। বলটা শারীরিক নয়, মানসিক। পালোয়ান যেমন কুস্তির দিন বাহুবলের পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার্থী তেমনি লেখনীবলের। তার জন্যে প্রস্তুত হতে হয় অতি যত্নে। রত্নর তো রাত্রে ঘুম ভালো হয় না। শুয়ে শুয়েও সে পরীক্ষা দেয়, মনে মনে। তার ফলে দিনের বেলা ঘুম পায়। কিন্তু তা বলে তো সে বিশ্ববিদ্যালয় কামাই করতে পারে না। সেখানে গিয়েও তাকে নিয়মিত ক্লাস করতে হয়। বোঝার উপর শাকের আঁটি। শরীর কতদিন সহ্য করতে পারে!

"ভেবেছিলুম মার মতো শত্রু আর নেই। কেন তিনি আমার হাত পা বেঁধে আমাকে রাক্ষসের কবলে সঁপে দিয়েছিলেন। এখন দেখছি মার মতো মিত্র আর নেই। রাক্ষস তো আমাকে যমের হাতেই তুলে দিচ্ছিল। মা এসে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। এমন মাকে কি ভালো না বেসে পারা যায়? আমার মনে রাগ ছিল, অভিমান ছিল। সেসব কবে জল হয়ে গেছে। দেখছি মার সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব। কত কথা বিশ্বাস করে উনি আমাকে বলেন। তেমনি কত কথা আমিও বলি বিশ্বাস করে। সেদিন তোর উপর অবিচার করতে যাচ্ছিলুম, মানিক। কলকাতা থেকে কেউ একজন আমাকে লিখেছে তুই নাকি মালাদির সঙ্গে ঘন ঘন সিনেমায় যাচ্ছিস। মাকে বলতেই উনি কী বললেন, শুনবি? বললেন, রত্ন কখনো অবিশ্বাসী হবে না। তেমন চেহারাই ওর নয়। আমার মেয়েকে যে ভালোবেসেছে সে কি কখনো আর কারো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে? মালার সঙ্গে ওর সিনেমায় যাওয়া তো ভালোবাসার থেকে নয়। এত পরিশ্রম করছে যে ছেলে তার তো একটু চিত্তবিনোদন চাই। তেমনি মালাও চায় বাড়ীর পাঁচিলের বাইরে একটুখানি বেরোনো। ওর মাকে তো আমি চিনি। বিষম সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। তবে রত্ন হলো ওদের আপনার লোক। ওর সঙ্গে যাওয়া সমাজের চোখে পড়বার মতো নয়। বয়সেও ছোট, সম্পর্কেও বাধে।" গোরী লেখে রত্নকে।

মালাদিদের সঙ্গে সুমতি দেবীর চেনাশোনা অনেকদিনের। এটা জানা ছিল না রত্নর। নইলে গোরী কি ও ব্যাপারটাকে সহজ মনে নিত নাকি? নিজেই সন্দিগ্ধ হতো। রত্ন লেখে, "খবরটা যখন শুনেছিস তখন পুরো খবরটাই বা শুনিসনি কেন? মালাদিকে নিয়ে যখন সিনেমায় যাই তখন প্রত্যেকবারই আরো একজনা বা দুজনা থাকে। কখনো ওদের বাড়ীর। কখনো আমার বান্ধবীগোষ্ঠীর। তা নইলে অনুমতি মেলে না। মালাদি নিজেও কম খুঁতখুঁতে নয়। ও যে আরেকজনের প্রেমে ডুবুডুবু এটা আমাকে জানিয়েছে। কাজেই ওর দিক থেকে আমার বা আমার দিক থেকে ওর লেশমাত্র ভয় নেই। থাকলে ও কখনো আমার সঙ্গে বেরোত না। ওই পচা ডোবাটাতেই পচত।"

রত্নর "বান্ধবীগোষ্ঠী" কথাটা গোরীর গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। আসলে ও বলতে চেয়েছিল সহপাঠিনীগোষ্ঠী। কিংবা আলাপিনীগোষ্ঠী। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? কারা ওরা? কী কী ওদের নাম? কী পড়ে? কেমন ছাত্রী?

"বিনোদন চাই বলে কি বিনোদিনীও চাই ?" খোঁচা দেয় গৌরী। "তোর বিনোদিনীরা আমার ননদিনী হবে না, আশা করি।"

কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর অসোয়স্তি বেড়ে যাচ্ছিল। আর রাগটা গিয়ে পড়ছিল যেমন স্বামীর উপরে একবার তেমনি রত্নর উপরে একবার। তার ওই দুর্ভোগের জন্যে যত দোষ যদিও নন্দ ঘোষের অর্থাৎ যশোমাধবের তবু রত্নও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। গৌরী যখন ঘরের কোণে একলাটি কষ্ট পাচ্ছে তখন ও ছেলে কোন মুখে বিনোদিনীদের নিয়ে বিনোদনে বার হয় ? এই কি ওর প্রেমের পরিচয় ?

মালাদিকে রত্ন বুঝিয়ে বলে যে পরীক্ষার জন্যে ওকে আরো বেশী খাটতে হবে, পড়াশুনায় আরো বেশী মনোনিবেশ করতে হবে। সাত দিনে একবারও সিনেমায় যাওয়া হয়ে উঠবে না। ওর এখন চাই কিছু আদা আর কিছু নুন; তাই খেয়ে লেগে পড়বে। নয়তো নির্ঘাত ব্যর্থ হবে। মালাদি যেন কিছু না মনে করে।

তা না হয় হলো। গৌরী কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয়। ও চায় সঙ্গ। নারীমাত্রই চায় যে তার আসন্ন মাতৃত্বের সময় তার স্বামী তার কাছে থেকে সঙ্গ দেয়, সাহস দেয়, সহানুভূতি যোগায়। যশোবাবুকে তো ও কাছে ঘেঁষতে দেবে না। তা হলে তাঁর স্থান নেবে কে ? কে আবার ? ওই যে পরীক্ষা দিচ্ছে, ওই রত্ন। কী করে সেটা সম্ভব ! মানুষ কি একই কালে দুই স্থলে উপস্থিত হতে পারে ?

গৌরী যে বোঝে না তা নয়। কিন্তু ওই সময়টাতে মেয়েরা যুক্তিতর্কের ধার ধারে বলে মনে হয় না। যেটা সম্ভব নয় সেটা কেন সম্ভব হয় না বলে নালিশ করে। ওর মা-বাবার সঙ্গে সদ্‌ভাব থাকলে রত্ন রবিবারে রবিবারে তাঁদের ওখানে গিয়ে গৌরীর সঙ্গে দেখা করে আসত। সেই হতো তার পক্ষে যথেষ্ট বিনোদন। কিন্তু আর ওমুখো হবে না বলে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওঁদেরও তেমনি কঠিন প্রতিজ্ঞা যে গৌরীকে আর ওর সঙ্গে মিশতে দেওয়া হবে না, যদি না ওদের সম্পর্কটা কথায় ও কাজে ভাইবোনের সম্পর্ক হয়।

গৌরীও হাল ছেড়ে দিয়েছে। কোনো পক্ষের মন বদলাবার এতটুকুও আশা নেই। সেও মন বদলাতে বলবে না। সে যখন চিঠি লেখে তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো লেখে। রত্ন যতই আশ্বাস দেয় যে ফেব্রুয়ারিতে আবার দেখা হবে গৌরী ততই কাতরভাবে জানায় যে তার মরণকাল ঘনিয়ে আসছে। সে শুধু এইটুকুই চায় যে তার শেষ চিহ্নটুকু যেন মুছে না যায়। তার "বুবুন" যেন বাঁচে। যশোবাবু তো আর একটি বিয়ে করবেন, তিনি কি ওকে বাঁচাবেন ? সৎমার মুখের বিষনিঃশ্বাসে ও বেচারি শুকিয়ে মারা যাবে। গৌরীর যদি উপায় থাকত "বুবুন"কে ও রত্নর হাতেই তুলে দিয়ে যেত কিংবা উইল করে দিয়ে যেত যে রত্নই ওকে পাবে। কিন্তু রত্নও তো আরেকজনকে বিয়ে করবে। ওর বিনোদিনীদের একজনকে। তখন ?

বাইশ

গৌরীর শেষ চিঠিতে একটা কী হয় কী হয় ভাব ছিল। তার সেই উদ্বেগ রত্নর মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বেচারি গৌরী। না জানি কত কষ্ট পাবে। যদি সীজারিয়ান করাতে হয়! বাঁচবে তো!

গৌরীর চিঠি অনেকদিন আসেনি বলে রত্নর উদ্বেগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। অথচ ও যে ওর গুরুজনকে চিঠি লিখে খবর নেবে এমন মনোবৃত্তি ওর ছিল না। ও যে অনধিকারী। সাধ করে অপমান ডেকে আনতে যাওয়া কেন?

খবরটা আসে অবশেষে সোজা পথে নয়, ঘুর পথ দিয়ে। হঠাৎ একদিন কাননের চিঠি। "বেগমপুর যাচ্ছ নাকি? যশোবাবুর নিমন্ত্রণ রাখতে? ভদ্রলোক আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। না গেলে নয়। একুশ দিনের দিন ওঁরা উৎসব করবেন। মহাধূমধাম হবে। এই যখন প্রথম সন্তান। বংশের বড়ো ছেলে।"

চিঠিতে আরো কত কথা ছিল, কিন্তু এই পর্যন্ত পড়ে রত্নও উল্লাসে আত্মহারা। যেন ওটি যশোবাবুর নয়, রত্নরই পুত্রসন্তান। গৌরী বেঁচে আছে তা হলে। "ছেলেটিও বেঁচে আছে। বেঁচে থাক ওরা। দীর্ঘজীবী হোক।"

রত্ন আর ধৈর্য ধরতে পারে না। টেলিগ্রামে অভিনন্দন জানায়। গৌরীকে। কাননকে লেখে, "আমার মাথার উপরে খাঁড়া ঝুলছে পরীক্ষার। আর দিন পনেরো বাকী। আমি তো যেতে পারিনে, ভাই। তুমিই যেয়ো।" খুলে বলতে পারে না যে ওটা হচ্ছে যশোবাবুর বিজয়োৎসব। ভিকটরি সেলিব্রেশন। যার জন্যে তিনি পাঁচ বছরকাল অপেক্ষা করছেন। রত্ন শুধু এইজন্যে খুশি যে গৌরী ভালোয় ভালোয় খালাস হয়েছে, ওর বেবীও ভালো আছে। নইলে যা হতো তা রত্নর পক্ষেও মর্মান্তিক। তেমন কিছু হলে সে পরীক্ষাও দিত না, পড়াশুনাও করত না, যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যেত।

যশোবাবু জিতলেন, গৌরী হেরে গেল। সেইজন্যেই কি গৌরী মুখ দেখাতে পারছে না, চিঠি লিখছে না। নইলে ও তো কখনো চিঠি না লিখে চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। বেচারি গৌরী। বেঁচে আছে বলে যেমন আনন্দ হেরে গেছে বলে তেমনি নিরানন্দ। মা হয়েছে বলে যেমন সার্থকতা আরো জড়িয়ে পড়েছে বলে তেমনি ব্যর্থতা।

অবশেষে গৌরীর চিঠি। "তুই চেয়েছিলি মেয়ে। যে মেয়ে আমার মতো দেখতে। আমি চেয়েছিলুম ছেলে। যে ছেলে তোর মতো দেখতে। তোর বা আমার কারো মতো হয়নি। ছেলে হয়েছে বাপের মতো। আমি তোর কাছে অপরাধী হয়ে মরমে মরে আছি।"

আরো লিখেছে যে এমন সর্বাত্মক পরাজয় ও কল্পনা করতে পারেনি। কী করবে। ভগবানের অবিচার। তবে ও আত্মসমর্পণ করবে না। সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ওর সংগ্রামী মনোবল অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওর সংগ্রামের সাথীরা যেন হাল ছেড়ে না দেয়, হাল ধরে থাকে। রত্ন যেন সমান উদ্যমের সঙ্গে পরীক্ষা দেয়। একটুও দমে না যায়। রত্নও যদি হেরে যায় তবে তো আর আশাভরসা থাকে না। তখন অগতির গতি মা গঙ্গা।

"ওটা তোর অপরাধ নয়, গোরী। ওটা প্রকৃতির নিয়ম। ওটাই ঠিক।" রত্ন উত্তর দেয়। "অন্যরকম হলে কথা উঠত। লোকে আমাকেও সংশয়ের চোখে দেখত। কিছু না করেও আমি কলঙ্কভাগী হতুম। তা বলে তোর ছেলে আমার কম আপনার নয়। তুই যেমন আপনার তোর ছেলেও তেমনি আপনার। আমি ওকে মনে মনে আমার করে নিলুম।"

ওরা দুই ছিল। এখন হলো তিন। প্রায় চিঠিতেই তৃতীয়জনের খোঁজ বা খবর থাকে। রত্ন খোঁজ নেয়, গোরী খবর দেয়। রত্ন ভালোবাসা জানায়। সে ভালোবাসা গোরীর ভালোবাসার পরিপূরক হয়, তাকে পরিপূর্ণতা দেয়।

রত্নর খেয়াল ছিল না যে ওদিকে যশোবাবুও তাঁর ছেলেকে ভালোবাসছিলেন, সে ভালোবাসাও গোরীর কাছে পৌঁছচ্ছিল। গোরীর দিকে প্রসারিত হচ্ছিল। ওঁরাও একটি ত্রয়ী। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান।

রত্নর হুঁশ ছিল না যে শিশুর স্বার্থে পরিকল্পনার ইতরবিশেষ হতে পারে। ফেব্রুয়ারির সেই নির্দিষ্ট তারিখটির জন্যে সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। তার আগে জ্যোতিদার বম্বে যাত্রা। একটির সঙ্গে আরেকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

জ্যোতিদা কিন্তু নীরব। না লেখে চিঠিপত্র, না করে দেখাসাক্ষাৎ। মাঝে মাঝে কলকাতা বেড়িয়ে যায়। কিন্তু রত্নকে বিরক্ত করতে চায় না। ওর যে সামনেই পরীক্ষা।

পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসতে লাগল রত্নর উত্তেজনাও ততই বাড়তে থাকল। পরীক্ষা তো নয়, টুর্নামেন্ট। নানা প্রদেশ থেকে আগত শ' দুয়েক নাইট। তাদের হাতে তলোয়ার নেই, তার বদলে আছে কলম। সেও কম ধারালো নয়। মসীযুদ্ধে কে যে কাকে হারায় তা আগে থেকে বোঝা যায় না। কাউকে দেখে চেনা যায় না যে এঁর সঙ্গে বলপরীক্ষা। যুদ্ধেরও একটা উম্মাদনা আছে। তা সত্ত্বেও কারো কারো সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। ভালো লেগে যায় সম্ভবপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কারো উপর বিদ্বেষ নেই রত্নর।

ওঁদের সঙ্গে তফাত এইখানে যে রত্ন হচ্ছে শ্রীমতী বলে একটি লেডীর নাইট। যেমন রানী গুইনেভারের নাইট ছিলেন স্যার ল্যান্সলট। নাইটকে সংগ্রামের প্রেরণা যোগাতেন তাঁর লেডী। রত্নকে প্রেরণা জোগায় তার গোরী।

একই তত্ত্ব বৈষ্ণবরাও মানে। "শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল। শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। নইলে পারবে কেন ?"

গোরীও তেমনি শক্তি সঞ্চার করবে। রত্ন তা নইলে পারবে কেন ? সমবেত যুযুৎসুদের দিকে চেয়ে রত্নর মুখ শুকিয়ে যায়, বুক দুরু দুরু করে। সে কি এদের সঙ্গে পারবে ? না, যদি নিজের শক্তিই সম্বল হয়। হাঁ, যদি গোরীর শক্তি যোগ দেয়। গোরীর শক্তি হচ্ছে রাধাশক্তি। সে না হলে কৃষ্ণশক্তি যথেষ্ট নয়।

পরীক্ষাটাকে দূর থেকে যত ভীষণ মনে হয়েছিল আসলে তত ভীষণ নয়। উপরের দিকে যারা স্থান পাবে তারাই একটা সীমা পর্যন্ত নির্বাচিত হবে। তাদের একজন হওয়ার যোগ্যতা কার আছে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। কারণ দু'নম্বর এক নম্বর এদিক ওদিক হলেই পোজিশন ওঠা নামা করে। ক'জন নেওয়া হবে তাও আগে থেকে

ঘোষণা করা হয়নি। সংখ্যায় কম হলে আশাও কম, সংখ্যায় বেশী হলে আশাও বেশী। সেইজন্যে এর মধ্যে কতকটা জুয়া খেলার ভাব আছে। তুমি হাজার যোগ্য হলেও তোমার আশা কম যদি মাত্র কয়েকটি চাকরি খালি থাকে।

"কতদূর আশা তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু সবাই আশা রাখে। এটা ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো নয় যে কার কতদূর দৌড় তা আগে থেকেই আন্দাজ করা যায়। বিদ্বানরাই সবচেয়ে বেশী নম্বর পায় তাও নয়। লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটা মৌখিক পরীক্ষাও আছে যাতে পাঁচজন পরীক্ষক যাঁর যা খুশি প্রশ্ন করেন। বিদ্যার পরিমাপ নেবার জন্যে নয়, উপস্থিতবুদ্ধির, বিচারশক্তির, বাস্তববোধের, লোকের সঙ্গে ব্যবহার কৌশলের, আদব কায়দার, চেহারার, চৌকস ব্যক্তিত্বের পরিচয় নেবার জন্যে। ইচ্ছা করলে একজন পরম বিদ্বানকেও ওঁরা নামিয়ে দিতে পারেন, একজন চালাক চতুর ও স্মার্ট ছেলেকে উপরে তুলে দিতে পারেন। আমি এমন বেপরোয়াভাবে নিজের মতামত জাহির করেছি যে একজন কি দু'জন পরীক্ষক আমার উপর চটে গিয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের তেমন খাতির করিনি, গোরী। যা মুখে আসে তাই বলে এসেছি। একটুও ইতস্তত করিনি। আমি যেন একটি সবজান্তা। আমার এক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ওঁরা শুদ্ধ উত্তর চান না, ওঁরা চান তোমার নিজস্ব উত্তর। তোমার নিজস্ব চিন্তা। এখন ফলাফল আমার হাতে নয়। আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। আরো ভালো করতে পারতুম তা ঠিক। তেমনি আরো খারাপও তো করতে পারতুম। হায় হায় করছি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গেছি বলে। জানা উত্তর। দিলে আরো উপরে স্থান পেতে পারতুম। এমনি করেই মানুষের বরাত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। একটু ভুলচুকের জন্যেও তাকে বিফল হতে হয়। তা বলে পশ্চাত্তাপ করা চলে না।" রত্ন লেখে গোরীকে।

পশ্চাত্তাপ করা বৃথা। রত্নর জীবনদর্শনে পশ্চাত্তাপের ঠাঁই নেই। কিন্তু যেখানে আরেকটি মানুষের বন্ধন মুক্তি সমস্যা সেখানে পশ্চাত্তাপ না করে পারে কি ? গোরী যদি মুক্তি না পায় তবে রত্নর ব্যর্থতা কেবল তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, যেমন আর সব পরীক্ষার্থীর বেলা। এর উপর নির্ভর করছে একটি নারীর ভবিষ্যৎ। যে নারী অসহায়ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

তার আর জ্যোতিদার। মাস দু'য়েক হলো ওর কোনো চিঠিপত্র নেই। কথা ছিল সাতুই পৌষের পর শান্তিনিকেতন ছেড়ে বম্বে রওনা হবে। সে সময় কলকাতায় দেখা হবে। এলাহাবাদ থেকে কলকাতা ফিরে রত্ন জ্যোতিদার অপেক্ষা করে। তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে কুষ্টিয়ায় চলে যায়। বিশ্রামের জন্যে।

হঠাৎ একদিন জ্যোতিদার টেলিগ্রাম। কলকাতায় দেখা করতে বলেছে। চিঠি লিখলেই পারত। টেলিগ্রাম কেন ? রত্ন সাতপাঁচ ভাবে। তৎক্ষণাৎ কলকাতা যাত্রা করে।

"কি হে, মাণ্ডারিন। পরীক্ষা কেমন দিলে ?" জ্যোতিদার জিজ্ঞাসা।

"ভালোই। তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।" রত্নর উত্তর।

"যাক, তোমার কাজ তুমি করেছ। এখন আমার কাজ।" জ্যোতিদা গম্ভীর মুখে বলে। "আমি কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেছি।"

"কী রকম ?" রত্ন অবাক হয়।

"কখনো ভাবতেই পারিনি যে কেউ আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। আমার মতো লোককে। যার কোনো ডিগ্রী নেই, চাকরি নেই, সম্পত্তি যদি থাকে তবে তা পারিবারিক সম্পত্তি। যে জেলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আছে। দেশের স্বাধীনতাই যার কাছে বড়ো। যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। যে চাষা বললেও চলে। যাকে মজুর বললেও ভুল হয় না।" জ্যোতিদা গদ্‌গদভাবে বলে যায়।

রত্ন সুখী হয়ে বলে, "এর মতো আনন্দের কথা আর কী হতে পারে ! তুমি নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। সবাই মিলে বম্বেতে বাস করা যাবে।"

"সেই কথাই তো তোমাকে বলতে এসেছি।" জ্যোতিদা আরো গম্ভীর হয়।

তেইশ

জ্যোতিদাকে এমন উৎফুল্ল কখনো দেখা যায়নি। অথচ এমন গম্ভীরও কখনো নয়। বুঝতে পারা যায় যে ওর জীবনে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে।

"গৌরীকে আর তোমাকে কথা দিয়েছি বলে তোমাদের সঙ্গে যদি যাই তা হলে রেবা আমার সঙ্গে যাবে না। কারণ ও তো তেমন কোনো কথা দেয়নি। তা ছাড়া ও চায় ওর নিজের মনের মতো একটি নীড়। তার জন্যে ও গ্রামে যেতেও রাজী, চাষানী হতেও রাজী, কিন্তু বম্বে গিয়ে গৌরীর সঙ্গে থাকতে রাজী নয়। গৌরীর উপর ওর টান নেই। গৌরীর সমস্যাই ও স্বীকার করে না।" জ্যোতিদা কুণ্ঠিত হয়ে বলে।

"কেন ? রেবাদি কি একালের মেয়ে নন? একালের মেয়েদের সমস্যা মানেন না ? গোঁড়া হিন্দু বুঝি ?" রত্ন আহত হয়।

"গোঁড়া হিন্দু হতে যাবে কেন ? ওর বাবা বিলেত ফেরতা। কিন্তু বৈলাতিকতায় ওর অরুচি ধরে গেছে। তেমনি নাগরিকতায়।" জ্যোতি জবাবদিহি করে। "ওর সঙ্গে আলাপ হলে দেখবে ওর মধ্যে গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় হয়েছে। ও যেমন গাইতে বাজাতে ভালোবাসে তেমনি সেবা করতে, চরকা কাটতে।"

"তা হলে বাধছে কোথায় ?" রত্ন জিজ্ঞাসু হয়।

"বাধছে এইখানে যে ইবসেনের ডলস হাউস ও পছন্দ করে না। নোরা কেন স্বামী-পুত্র ফেলে চলে গেল তা ও অনুধাবন করতে অক্ষম। যে নারী সন্তানের মা হয়েছে তার স্বাধীনতা আপনি খর্ব হয়েছে। নিঃসন্তান হলে যেটা সঙ্গত হতো সন্তান হলে সেটা সঙ্গত নয়। গৌরীর কর্তব্য শিশুকে নিয়ে আর কোথাও যাওয়া নয়, আর কোথাও না গিয়ে শিশুর সঙ্গে থাকা।" জ্যোতিদা রেবার উক্তি শোনায়।

"তা হলে নারীর মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না।" রত্ন অসহিষ্ণু হয়ে বলে। "যে স্বামীকে ও স্বেচ্ছায় বরণ করেনি, যার সন্তান ও স্বেচ্ছায় ধারণ করেনি, ওকে সেই স্বামীর ঘর করতে হবে। এটাই কি সুনীতি ? অমন করে একটি মানুষকে ভেঙে ফেলাটাই কি

ন্যায়ধর্ম ? আমি তো মনে করি ইবসেনই এ যুগের প্রোফেট। পত্নীত্বের চেয়ে, মাতৃত্বের চেয়ে নারীত্বই বড়ো। সেই জন্যে নারীর মুক্তি এ যুগের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। যেমন শূদ্রের মুক্তি। যেমন ক্রীতদাসের মুক্তি।"

"সব মানি, রতন। সব মানি। কিন্তু মানুষের জীবন তার চেয়েও জটিল। তুমি কি জানো যে গোরী নিজেই এখন মাতৃত্বের আনন্দে ভরপুর হয়ে রয়েছে ? বম্বের কথা ভাবছে না। ওর সঙ্গে আমি দেখা করে এসেছি। ও বলে, এখন থাক। এইটুকু বাচ্চাকে নিয়েও যেতে পারিনে, রেখেও যেতে পারিনে। অত্যাচার তো আপাতত হচ্ছে না। এ বাড়ীতে যতদিন আছি ততদিন হবেও না। আরো ছ' মাস আমি অনায়াসেই মার কাছে থাকতে পারি।"

রত্ন তা শুনে খুশি হয়। ফেব্রুয়ারিতে বম্বে যেতে ওর উৎসাহ ছিল না। একটি নারী তো শুধু নয়, একটি শিশুও তার সঙ্গে। দু'জনের ভার নেওয়া কি কম ভাবনার কথা ? কত লোক বিয়ে করেও বাপ হতে চায় না আরো প্রস্তুত না হয়ে। এক যদি গোরী ওর শিশুকে আর-কারো কাছে রেখে যায়। সে দায়িত্ব আর-কেউ নিলে তো ? স্বামী যদি নেন, সুধাকেই দেবেন। গোরীর তাতে আন্তরিক আপত্তি।

হাঁ, মানুষের জীবন আরো জটিল। আপাতত গোরী যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, তাকে নড়ানো উচিত নয়। তবে সে যদি আপনা হতে নড়তে চায় ও কথা স্বতন্ত্র। প্রস্তাবটা গোরীর দিক থেকেই আসুক। গোরীই বলুক যে ওকে বম্বে নিয়ে যেতে হবে। বা আর কোথাও। কৃষ্ণনগর তো বেগমপুর নয়। পরিস্থিতিও সেখানকার মতো নয়।

"পরিস্থিতি অনুসারেই কর্ম।" রত্ন মন্তব্য করে। "আমরা সময় নেব, জ্যোতিদা। ততদিনে তুমি যদি রেবাদিকে তোমার আমার সঙ্গে একমত করাতে পারো তো সবাই মিলে একসঙ্গে থাকা যায়। সাদে, কোলরিজ ও তাঁদের ওঁরা যেমন একসঙ্গে থাকতেন। আমি খুব রাজী আছি গ্রামে গিয়ে তোমাদের সাথী হতে। গোরীকেও রাজী করাতে হবে। সাদে, কোলরিজ যা পারলেন না আমরাই তা পারব। প্যান্টিসোক্রাসী। কী চমৎকার আইডিয়া ! সর্বোদয় আর কাকে বলে !"

"দূর পাগলা !" জ্যোতিদা হাসে। "কোলরিজের স্বপ্ন আর গান্ধীর স্বপ্ন কি এক ? ওসব নিপট কবিত্ব। বেচারি সাদেকেই কোলরিজপত্নী ও পুত্রের ভার বহন করতে হলো। কোলরিজ তো কবিতা লেখায় তন্ময়। তোমারও সেই মতলব।"

জ্যোতিদা ওর নতুন পরিকল্পনায় রত্ন গোরীর জন্যে স্থান রাখেনি, গোরীর শিশুর জন্যেও না। রত্ন যদি প্রতিযোগিতায় সফল হয় তা হলে বিলেত যাবে, গোরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর যদি বিফল হয় আরো একবার চেষ্টা করবে। গোরীর নিয়তি রত্নর নিয়তির সঙ্গে গাঁথা। জ্যোতির নিয়তির সঙ্গে নয়। তেমনি রেবার নিয়তি জ্যোতির নিয়তির সঙ্গে গাঁথা। একজোড়া নিয়তি জোটবন্দী হবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই।

"তবে আমি তোমাকে গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেব না, রতন। আমি তোমার পেছনে থাকব। অন্যভাবে সাহায্য করব।" আশ্বাস দেয় জ্যোতিদা।

রত্নর জানা ছিল যে জ্যোতিদা এককালে গোরীকে ভালোবাসত। গোরীই ওকে

প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের উপর নারীর আর কিসের দাবী ? সে যদি নিঃস্বার্থভাবে ওর মুক্তির ভার বহন করতে সম্মত হয় তবে সেটা একটা বাধ্যবাধকতা নয়। সেটা একপ্রকার সৌজন্য। সেটা বরাবরের জন্যেও নয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। গোরীকে ওর নিজের ভার নিজেকেই নিতে হতো। জ্যোতি চিরদিন বাঁধা থাকত না। একদিন না একদিন দেশের ডাকে তাকে সত্যাগ্রহ করতে হতো, দীনহীনদের ডাকে বিপ্লবে ঝাঁপ দিতে হতো। যে নারী এদিক দিয়ে তার সহকর্মিণী হতো সেই তো তার সহধর্মিণী।

রত্ন এসে গোরীর ভার নিতে ইচ্ছুক না হলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু এমন একজন যখন উপস্থিত হয়েছে আর গোরীও তার উপর অনুকূল তখন জ্যোতির দায়িত্বটা তলে তলে পাত্রান্তরিত হয়ে গেছে। জ্যোতি আর ঠিক আগের মতো দায়ী নয়। তবে সে অসময়ে হাত ধুয়ে ফেলবেও না। রত্নকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে।

"আমার সে প্রতিশ্রুতি আমি ফিরিয়ে নিচ্ছিনে, রতন। যতদিন তোমরা আমার সাহায্য চাইবে ততদিন পাবে।" জ্যোতিদা অভয় দেয়। "কেবল তোমরা যেখানে থাকবে সেখানে থাকব না। আমাকে থাকতে হবে রেবার সঙ্গে। বিয়ের পর স্বামী আর স্ত্রী একসঙ্গেই থাকে। রেবা ওর অধিকার দাবী করবে। না, ও অতটা নিঃস্বার্থ নয় যে আমার মতো তোমাদের সঙ্গে থাকতে যাবে।"

"ওর কাছে অতখানি নিঃস্বার্থতা কেই বা প্রত্যাশা করছে, জ্যোতিদা ? বিয়ের পর নারীমাত্রেই চায় নিজের জন্যে একটি হোম। গোরীও একদিন চাইবে, যদি আমার সঙ্গে বিয়ে হয়। তৃতীয়জনের অবস্থান তো নিয়ম নয়, সাময়িক ব্যতিক্রম। কথা ছিল না যে তুমি অত শীগগির বিয়ে করবে। এটা আমাদের অপ্রত্যাশিত এক আকস্মিক ঘটনা। আকস্মিকের জন্যে জীবনে জায়গা রাখতে হয়। আমি তো জায়গা দিতে একটুও দ্বিধা করছিনে। আমি বরঞ্চ খুব খুশি হয়েছি যে তোমার নিঃসঙ্গতার এতদিনে অবসান হবে। তোমাকে ভালোবাসার জন্যে রেবাদি থাকবেন।" রত্ন এর সঙ্গে জুড়ে দেয় "একসঙ্গে না থেকেও ভাই ভাইকে সাহায্য করে, বন্ধু বন্ধুকে। তেমন সাহায্যের দরকার হলে নিশ্চয়ই তোমার কাছে চাইব। বউদি যদি কিছু না মনে করেন।"

"না, না, বউদি কেন কিছু মনে করবেন ? আমি ওকে বোঝাব।" জ্যোতি বলে।

"আমি যদি পরীক্ষায় বিফল হই ও গোরী যদি আর অপেক্ষা করতে নারাজ হয় তা হলে তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে, জ্যোতিদা। কিছু দিনের জন্যে।" রত্ন জানায়।

এর পরে গোরীর চিঠি। সে ঠেস দিয়ে লিখেছে, "জ্যোতিবাবু এখানে এক আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে গেছেন। রেবা বলে একটি ইঙ্গবঙ্গ দুহিতা নাকি তাঁকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁর সঙ্গে গ্রামে গিয়ে বসতি করবেন। ঢেঁকিতে ধান ভানবেন। চিঁড়ে কুটবেন। খই ভাজবেন। এমনি কত কী ! জ্যোতিবাবুর মতো রূপবান পুরুষের এহেন গুণবতী বধূ জুটবে আমি তো কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি রে, রতন। দেখছি এ জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে বিশ্বাস করা শক্ত। জ্যোতিবাবুর কথাবার্তা শুনে ভুলেছে এমন মেয়ে কি ওই একটি ? যত সব বড়ো বড়ো কথা। কাজের বেলা রম্ভা।

কই, বম্বে যাত্রার কী হলো ? কোথায় আমার জন্যে অগ্রিম বন্দোবস্ত ? কেমন করে আমি এমন গুরুতর একটি পদক্ষেপ নিই ? আমি তো প্রস্তুতই ছিলুম, কিন্তু জ্যোতিবাবুর কাণ্ড শুনে আমার আর ওঁর উপর ভরসা নেই। এখন একমাত্র তোর উপর ভরসা। কিন্তু তোর অগ্রজ যে দৃষ্টান্ত দেখালেন তার পর তুই যে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবিনে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? মরদকা বাত হাতীকা দাঁত বলেই তো জানতুম। কিন্তু জ্যোতিবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে তিনি বোধ হয় মরদ নন।"

আরো লিখেছে, "উনি যেমন রেবার প্রেমে মজেছেন তুইও তেমনি সেবার প্রেমে মজবি কি না কে জানে ? কথা দিয়ে কথার খেলাপ করাই যদি পুরুষধর্ম হয় তবে তুইও তো পুরুষ। তুইও একদিন পেছিয়ে যাবি। বম্বে যাওয়া তো হলো না, এখন তুই যতবার খুশি সিনেমায় যা, ফুর্তি কর। আর আমি এদিকে বাচ্চার কোপ্‌নি পালটিয়ে মরি। মা বলে দিয়েছেন আমাকেই এসব করতে হবে, আয়া রাখা হবে না। মেথরানীর কাজ করতে করতে আমি একদিন না মেথরানী বনে যাই। সেই ভয়ে তিন বেলা সাবান মেখে স্নান করি। যদিও এটা শীতকাল। এখানে দিব্যি শীত।"

চিঠিতে মাতৃত্বের আনন্দের দিকটাও ঠিক। গোরী ওর ছেলের রূপগুণের বর্ণনা দিয়েছে। মুগ্ধের মতো। ও নাকি দেবশিশু। শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে। এসেছে ওর মায়ের টানে। বাপের আকর্ষণে নয়।

এমনি কত কথা। আজকাল ওর চিঠিতে ওর নিজের কথা থাকে দশভাগের একভাগ তো ওর ছেলের কথা বাকী ন' ভাগ। কিন্তু ও বিন্দুমাত্র আভাস দেয় না ছেলেকে ও সঙ্গে নিয়ে যাবে না পেছনে রেখে যাবে। তবে ও স্বয়ং যাবে। যাবেই যাবে। কোথায় ও কবে তা ও জানে না। কিন্তু বেগমপুরে নয়। ছ'মাসের মধ্যেও নয়। রত্ন যেন ওর জন্যে প্রস্তুত থাকে। যেন জ্যোতির মতো দৌড় না দেয়।

চব্বিশ

জ্যোতিদা থাকতে রত্ন যেন পর্বতের আড়ালে ছিল। পর্বত সরে যাওয়ায় সে হতবল বোধ করল। সমস্যাটা তো নিছক আর্থিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক। একটি বিবাহিতা স্ত্রীকে তার স্বামী ও শ্বশুরকুলের হাত থেকে উদ্ধার করে সর্বতোভাবে স্বাধীন করে দেওয়া, যে-স্বাধীনতার মধ্যে পুনরায় বিবাহের স্বাধীনতাও পড়ে, এ কি রত্নর একার সাধ্য ! আর সে নারী যদি তার সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আসে তা হলে এ কি রত্নর একার সাধ্যাতীত নয় !

যেটা এককভাবে অসাধ্য সেটা একত্রভাবে সাধ্য, সেইজন্যেই জ্যোতিদাকে একসঙ্গে চাওয়া। জ্যোতিদা সঙ্গে থাকলে কেউ বলবে না যে ওরা ইম্‌মরাল কিছু করেছে বা করতে চায়। তা হলে জ্যোতিদার প্রকৃত ভূমিকা হলো জামিনের। সে সঙ্গে থাকলে দুর্মুখের মুখ বন্ধ হতো। মামলা মোকদ্দমাও বাধত না। বাধলেও টিকত না।

পর্বত সরে যাওয়ায় রত্ন মনে মনে দমে যায়। তা বলে হাল ছেড়ে দেয় না। ওটা একটা চ্যালেঞ্জ। সে ওই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। তার আগে তার আপনার বল বাড়াতে হবে। দুজনের শক্তি একজনকেই অর্জন করতে হবে। ইলোপমেন্ট যে দ্বিতীয়বার বন্ধ হলো এটা একদিক থেকে বাঁচোয়া। বার বার তিনবার। এখন থেকে তৃতীয়বারের জন্যে দিন ফেলতে হবে না। দুই বারেই দিন ফেলেছিল জ্যোতিদা। দেখা গেল ওর গণনা নির্ভুল নয়। পরের বার দিন ফেলবে রত্ন। কিংবা ছেড়ে দেবে গৌরীর উপর। কিন্তু তার আগে তার শিশুর সমস্যার উত্তর দেওয়া চাই। সন্তানের উপরে পিতারও তো অধিকার আছে। সে অধিকার কি নারীর মুক্তির জন্যে উড়িয়ে দেওয়া যায় ?

গৌরীও এ প্রশ্নের উত্তর ভাবে না। আপাতত সে তার কোলের ধনকে নিয়ে বিভোর। বলে, "আমার সাত রাজার ধন মানিক।" মানিক বলে ডাকত আগে রত্নকে। এখন ডাকে তার খোকনকে। "বুবুন" নামটা কোথায় তালিয়ে গেছে। "বেব" নামটাও তাই।

"মানিক বলে ওকে কেন ডাকি, বলব ? তোকে ডাকতুম বলে। আমার চোখে তোরা অভিন্ন। এই এক মানিক আর ওই এক মানিক। জোড়ামানিক।" গৌরী লেখে।

রত্ন একপ্রকার পিতৃস্নেহ অনুভব করে। পিতা না হয়েও পিতৃস্নেহ। খোকনের জন্যে গৌরী যদি উদ্বেগ বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে রত্নও তাই করে। যেন ওর নিজের ছেলে। তেমনি গৌরী যখন ছেলের কথা লিখতে গিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয় তখন রত্নও তাই হয়। ওর রক্তমাংস না হোক, ওর প্রিয়ার রক্তমাংস তো। ভালোবাসার মূল্য কী, যদি একাত্মতা না ঘটে ? ওরা তিনজনে মিলে একই আত্মা। ওরা একাত্মা।

"ছেলে মানুষ করা কি মুখের কথা ? মা যদি না থাকতেন আমি পারতুম ? সত্যি, বম্বে গেলে আমি বিপাকে পড়তুম একে নিয়ে। যাইনি বলে এ বেঁচে আছে। দেখছি ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে।" গৌরী লেখে।

"হাঁ, আমিও সেটা বুঝতে পারছি। জ্যোতিদা যদি বম্বে গিয়ে প্রেমে পড়ত তা হলেই হয়েছিল আর কী ! প্রেমের মধ্যে একটা আকস্মিকতা আছে, তার জন্যে ও প্রস্তুত ছিল না। তাই ওকে দোষ দেওয়া যায় না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আকস্মিকতা বম্বে গিয়ে ঘটেনি। ঘটেছে আরো আগে।" রত্ন লেখে।

ফেব্রুয়ারি রেভোলিউশন ইতিহাসে সফল হয়েছিল, রত্ন ও শ্রীমতী ও জ্যোতির জীবনে হলো না। দেখা যাক এর পরে অক্টোবর রেভোলিউশন কেমন হয়, আদৌ যদি হয়। ভবিষ্যৎ গণনার সামর্থ্য রত্নর নেই। গৌরীও তাড়া দিচ্ছে না। সে তার শিশুকে উপভোগ করছে ক্ষীর ননী সন্দেশের মতো।

"মাধবকে এখানে পাচ্ছিনে। এই তো আমার মাধব। একেই ভোগ দিচ্ছি আর ভোগ করছি।" গৌরী লেখে।

ওদের বংশে ছেলের নামের সঙ্গে মাধব জুড়ে দিতে হয়। যশোমাধবের পুত্রের নামের সঙ্গেও একদিন মাধব যুক্ত হবে। ওরাই নাম রাখবে। গৌরী বা রত্ন নয়। তা হলেও গৌরী জল্পনা কল্পনা করে।

"রত্নমাধব কেমন শোনায় ?" গৌরী জিজ্ঞাসা করে।

"ভালো শোনায় না। তার চেয়ে গৌরমাধব ভালো।" রত্ন জবাব দেয়।

নামকরণের দেরি আছে। গোরী এখন থেকেই তালিকা তৈরি করে নামের। যদিও জানে যে ওর শ্বশুরকুলের পছন্দই চূড়ান্ত।

জ্যোতিদার সঙ্গে আবার দেখা হয়। গোরী ওর ছেলের জন্যে নামের তালিকা তৈরি করছে শুনে ও হাসে। বলে, "ওর নাম হবে পৃথুল।"

"পৃথুল ? সে আবার কী রকম নাম ? কী ওর মানে ?" রত্ন চমকে ওঠে।

"মোটাসোটা। যেমন ওর মা। জানো না তো গোরী কেমন মোটা হয়েছে। ওর নাম আর গোরী নয়। পৃথুলা।" জ্যোতিদা রঙ্গ করে।

গোরীকে ও কথা জানাতে ও দারুণ খাপ্পা হয়ে লেখে, অমন করে নজর দিলে আমার খোকা শুকিয়ে সলতে হয়ে যাবে। ও মোটেই মোটা নয়। বরং রোগা।"

নিজের সম্বন্ধে লেখে, "তবে আমি একটু মোটাপানা হয়েছি সেটা মিথ্যা নয়। ভুঁড়ির ভয়ে মরছি।"

গোরীর প্রসঙ্গ থেকে রেবার প্রসঙ্গ ওঠে। প্রাণপূর্ণা চঞ্চলা কর্মতৎপরা বীর্যবতী নারী। জ্যোতি যেমনটি চায়। কিন্তু মতবাদে পিউরিটান। জ্যোতি যা নয়।

"আমার ধারণা ছিল রেবা যখন রাজী তখন ওর গুরুজনও রাজী। তেমনি আমি যখন প্রস্তুত তখন আমার গুরুজনও প্রস্তুত। দেখছি তা নয়।" জ্যোতির মনে দুঃখ।

"সে কী ! সেবার তো মনে হলো বিয়ের সব ঠিকঠাক।" রত্ন আশ্চর্য হয়।

"আমাদের দিক থেকে ঠিকঠাক। যে কোনো দিন আমরা রেজিস্ট্রারের আপিসে বিয়ের নোটিস দিয়ে আসতে পারি। কিন্তু রেবার আন্তরিক ইচ্ছা যে ওর গুরুজনের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আমার গুরুজনের আশীর্বাদ নিয়েও। আমি অবশ্য ওতে বিশ্বাস করিনে। বিয়েতেই বিশ্বাস করিনে। নেহাৎ দেশকালপাত্র বিবেচনা করে বিবাহ প্রথাটা মেনে নিতে হচ্ছে। তা বলে গুরুজনের আশীর্বাদ ! সামাজিক অনুষ্ঠান ! দেখ দেখি কী মুশকিলেই না পড়েছি ! গুরুজনের আশীর্বাদ পেতে হলে ওঁদের পছন্দসই হতে হবে। পছন্দেরও অনেকগুলি শর্ত। জাত কুল আর্থিক অবস্থা ও জীবিকার প্রশ্ন উঠবে। উঠবে কী। উঠেছে। সেই জন্যেই তো দেরি হচ্ছে।" জ্যোতিদা দুঃখের সঙ্গে বলে।

"তোমরা একটা নতুন কিছু দেখাবে আশা করেছিলুম।" রত্নও দুঃখিত হয়।

"আশা ছেড়ে দেবার মতো এমন কী ঘটেছে। রেবার মা বাবার আমাকে দেখে পছন্দ হয়েছে। ওঁরা জাত নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু চাকরি বাকরি না করে আমি যে চাষবাস করব ও মাঝে মাঝে জেলে যাব এইখানে ওঁদের আপত্তি। ওঁরা শহুরে মানুষ, গ্রাম কখনো দেখেননি। ধানগাছ যে কেমন তাও ওঁদের অজানা। চাষ যদি করতেই হয় তবে ট্র্যাকটর দিয়ে কেন নয় ? শোন কথা। ট্র্যাকটর চলবে এ মাটিতে।" জ্যোতি হাসে।

"কেন, চলবে না কেন ? চালালেই চলবে।" রত্নও একজন থিয়োরিওয়ালা।

"ঠাকুরবাবুদের জমিদারি পতিসরে একটা ট্র্যাকটর দেখে এলুম। মাটিতে জল এত বেশী যে চাকা বসে যায়। বিগড়ে গেলে হাতের কাছে মেকানিক জোটে না। স্পেয়ার পার্টের জন্যে কলকাতায় লোক পাঠাতে হয়। তেমনি ডীজেল ফুরিয়ে গেলে ডীজেলের

জন্যে। তা ছাড়া আরো কতরকম খরচ আছে। হাতী পোষার মতো ব্যাপার। শুনলুম ওটা অ্যাণ্ডরুজ সাহেবের বুদ্ধি। বন্যায় গোরু মারা গেছে বলে গোরুর বদলে ট্র্যাকটর আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। রীড সাহেব কলেক্টর তো হেসে খুন। সেই টাকায় বিশ জোড়া গোরু কিনতে পাওয়া যেত। বিশজন মুনিষের কাজ জুটত। আমিও ভেবে দেখেছি যে এটাই যথার্থ।" জ্যোতিদা বলে।

রত্ন আবার রেবার প্রসঙ্গে ফিরে যায়। "তারপর রেবাদিকে তোমার মা বাবার পছন্দ হয়েছে তো ?"

"মেয়ে দেখা বলে সেই একটা প্রথা আছে, সেটা রেবার মতে মেয়েদের পক্ষে অপমানকর। ও কিছুতেই সে পদ্ধতি মেনে নেবে না। তবে আর কোনো পদ্ধতিতে ওর আপত্তি নেই। যেমন আমার বেলা চায়ের নিমন্ত্রণ হলো, সবাই মিলে চা খাওয়া গেল, গান বাজনা করা গেল, খেলা করা গেল। কে বলবে যে ওটা ছেলে দেখা ? চিত্রা বউদি ভার নিয়েছেন একদিন একটা পার্টি দেবেন, তাতে আমার মা বাবা থাকবেন, রেবা তো থাকবেই। ওর মনে ক্ষোভ থাকবে না যে ওটা মেয়ে দেখা।" জ্যোতিদা সহাস্যে বলে।

"তার মানে সেই জিনিসই হলো, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে !" রত্ন মন্তব্য করে।

"কী করা যায়, বল !" জ্যোতিদা আক্ষেপ করে। "দেশ প্রস্তুত নয়। এর চেয়ে বেশীদূর এগোতে চাইলে বিয়েই হবে না। আর বিয়ে যদি না হয় রেবা ও আমি সহকর্মী হতে পারব না। অন্তত গ্রামে তো নয়ই। শহরেও সম্ভব কি না সন্দেহ।"

রত্ন তা শুনে ভাবনায় পড়ে। গোরীর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু হতে পারে তো একদিন। গোরী যখন স্বাধীন হবে তখন। কিন্তু গুরুজনের আশীর্বাদ যদি একান্ত আবশ্যক হয় তবে স্বাধীন হলেই বা হবে কী ? বিয়ে কেমন করে হবে ?

"আমাদের বেলা কী হবে তাই ভাবছি।" রত্ন এর পরে খোলসা করে।

"তোমরা যদি গুরুজনের আশীর্বাদ না পাও", জ্যোতিদা বলে, "তা হলেও কিছু আসে যায় না। তোমরা তো গ্রামে গিয়ে চাষবাস করবে না। তোমরা বিয়ে করতেও পারো, না করতেও পারো। বিয়ে করলে যে গুরুজনের সম্মতির দরকার হবে তাও নয়। আমাদের বেলাও কি দরকার হতো নাকি ? হচ্ছে রেবার মনোভাবের জন্যেই। গোরীর মনোভাব সে রকম নয়।"

"কিন্তু দেশকাল তো এই একই। রেবার বেলাও যা গোরীর বেলাও তাই। গোরী কি সেটা অনুভব করে পেছিয়ে যাবে না ?" রত্নর প্রশ্ন।

তোমরা যদি আর-কোনো দেশে চলে যাও তা হলে কাল তোমাদের প্রতিকূল হবে না। নয়তো তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে, দেশ যতদিন না অনুকূল হয়। অপেক্ষা করবে বিয়ের জন্যে। একত্রবাসের জন্যে নয়।" জ্যোতিদা বিধান দেয়।

"কী জানি আমার কেমন-কেমন লাগছে। তুমি তো সঙ্গে থাকছ না। গোরী যদিও পিউরিটান নয় তবু তুমি না থাকলে ও স্বচ্ছন্দ বোধ করবে বলে মনে হয় না।" রত্ন বলে।

পঁচিশ

সাত ভাই চম্পার সেই যে প্রভাত সেও প্রেমে পড়েছে। তারও সেই একই সমস্যা। গুরুজনের আশীর্বাদ। সেখানেও অসবর্ণ। তবে সেখানে জীবিকা নিয়ে বিবাহ সংশয় নয়। প্রভাত এখন রেলওয়ে অফিসার। ওর বাগ্‌দত্তা সুলেখাও অধ্যাপনা করে। একটি স্কুলে।

প্রভাতের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে যায়। রেলের পাশ নিয়ে ও মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। তদ্বির করতে। যাতে কলকাতায় বদলি হয়।

"শুনছিলাম তোমরা নাকি ইলোপ করবে। কই, করলে না তো ?" প্রভাত বলে ফূর্তি করে।

"কোথায় শুনলে ? আমি তো বলিনি।" রত্ন অপ্রতিভ হয়।

"ভায়া হে, দেয়ালেরও কান আছে। তুমি গোপন করলে কী হবে, তোমার সীক্রেট আমাদের কারো অজানা নয়।" প্রভাত হাসে।

"বম্বে যাবার প্ল্যানও তোমার মালুম ছিল ?" রত্ন হতভম্ব হয়ে বলে।

"বম্বে যাচ্ছিলে নাকি ? না, ওটা তো আমার জানা ছিল না।" প্রভাত কবুল করে।

"সেটা ভেস্তে গেছে। এখন আমাদের আর কোনো প্ল্যান নেই। কী যে করি বুঝতে পারছিনে। যদি জানতুম যে নির্ঘাত সফল হব তা হলে বিলেত যাবার প্ল্যান করতুম। কিন্তু তুমি তো জানো পেয়ালা আর ঠোঁটের মাঝখানে অনেকগুলি ফসকানি। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে জ্যোতিদার মতো একজন না থাকলে আমাদের সাহসে কুলয় না। ওদিকে জ্যোতিদাও প্রেমে পড়ে বসে আছে।" রত্ন সে বৃত্তান্ত শোনায়।

সমস্ত শুনে প্রভাত বলে, "ওসব কোনো কাজের কথা নয়। তোমরা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। এ সমাজে এতরকম ফাঁদ আছে আমিও কি জানতুম ? একবার ভেবে দেখ দেখি আমার দশা। সুলেখা কুমারী মেয়ে, স্বাবলম্বী। আর আমি তো পদস্থ অফিসার। আমাদের তো এখনি বিয়ে হওয়া উচিত, কিন্তু যেমন দেখছি বছর ঘুরে গেলেও হবে না। ওকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না। এখন তোমার মতো আমিও ভাবছি আমরাও ইলোপ করব।"

"ইলোপ করবে ?" রত্ন উত্তেজিত হয়ে বলে।

"তবে লুকিয়ে নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মোলাকাত করে। যাতে নারীহরণের অভিযাগ না ওঠে।" প্রভাত হুঁশিয়ার মানুষ।

"আমার বেলাও কি ওরকম অভিযোগ উঠত ?" রত্ন শিউরে ওঠে।

"তোমার বেলা", প্রভাত আশ্বাস দিয়ে বলে, "খুব সম্ভব উঠত না। কেলেঙ্কারির ভয়ে বেগমপুরের বাবুরা ওটা চেপে যেতেন। চুপি চুপি ছেলের আরেকটি বিয়ে দিতেন। কিন্তু এ যা বলছি রেঙ্গুনের কথা স্মরণ করে বলছি। ইতিমধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। একটি শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। এখন যশোবাবু কী করবেন না করবেন তা জোর করে বলা শক্ত। কানন তো মনে করে ওঁর জয়লাভ এখন সম্পূর্ণ। পারুলবোন কোনো মতেই জয়কে পরাজয়ে পরিণত করতে পারবে না। এখন সমগ্র প্রশ্নটা নতুন

করে ভাবতে হবে।"

রত্নও ক্রমে ক্রমে সেই ধারণার অভিমুখীন হচ্ছিল। নতুন করে ভাবার একটি কারণ গৌরীর মাতৃত্ব। আর-একটি জ্যোতিদার প্রস্থান। দায় গেল বেড়ে, দায় বইবার লোক গেল কমে। রত্নর একার ঘাড়ে ডবল বোঝা।

"নতুন করে ভাবতে আমারও মন চায়।" রত্ন ওর বন্ধুর সঙ্গে একমত হয়। "কিন্তু নতুন করে ভাবলেও সেই পুরোনো সত্য তো তেমনি থেকে যায়। আমরা মধ্যযুগের নাইট আর লেডী। আমিও পাশ কাটাতে পারিনে, সেও কি পারে ? বিবাহ নয়, কিন্তু বিবাহের চেয়ে বড়ো। সেই জন্যেই একে এত মহত্ত্ব দেয়া হয়েছে। কাব্যে আর গানে। উপায় একটা না হোক আর-একটা খুঁজে বার করতে হবে। ইলোপমেণ্ট না হোক আর কিছু। আজ না হোক এক বছর বাদে।"

প্রভাত ভেবে চিন্তে বলে, "পারুলবোন যতদিন বাপের বাড়ীতে রয়েছে ততদিন ওর জন্যে ভাবনা নেই। যেদিন বেগমপুর ফিরে যাবে সেইদিন ভাবনার প্রত্যাবর্তন হবে। এবার ছেলে হয়েছে। পরের বার মেয়ে হবে। অন্তত তার উদ্যোগপর্ব শুরু হবে। আবার সেই জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্ব।"

রত্ন এর থেকে এই বোঝে যে আর বেশী দিন সবুর করা উচিত নয়। "আজ না হোক এক বছর বাদে" বললে সময়সীমা পার হয়ে যায়। যেমন করে হোক বেগমপুরে ফিরে যাবার আগেই গৌরীকে উদ্ধার করতে হবে। নইলে বড্ড বেশী দেরি হয়ে যাবে।

"তাহলে তুমিই বল আমাদের কী করা উচিত।" রত্ন বন্ধুর পরামর্শ চায়।

"বিপদে ফেললে। কখনো তো ভেবে দেখিনি ভাই।" প্রভাত পাশ কাটায়।

"সফল হলে বিলেতযাত্রা ? সামনের জুলাই কি অগাস্টে ?" রত্ন প্রশ্ন করে।

"বিফল হলে ?" প্রভাত পাল্টা সুধায়।

"সেইখানেই তো সঙ্কট। তা হলে আমি কি দু'দিক থেকে হেরে যাব ?" রত্ন আক্ষেপের স্বরে বলে। গৌরীও কি হেরে যাবে ? এতকাল লড়াই করার পরেও ? হেরে গেলে ও কি বাঁচবে !"

"কেন, হেরে যাওয়া মানে কি মরে যাওয়া ?" প্রভাত বলে। তারপর গাঢ়কণ্ঠে বলে, "রানু দিব্যি বেঁচে আছে। আমিও।"

"কিন্তু গৌরী যে অন্য ধাতুতে গড়া।" রত্ন তর্ক করে।

"হতে পারে। কিন্তু এতকাল বেঁচে আছে যখন তখন আরো কিছুকাল বাঁচবে। মা হয়েছে। মাতৃত্বের সাধ মিটিয়ে নেবে। প্রেমের সাধই কি একমাত্র সাধ, রতন ? সব নারীর জীবনে কি প্রেমের সাধ মেটে ? তবে অধিকাংশের জীবনে মাতৃত্বের সাধ মেটে। সেই জন্যে ওরা হেরে গিয়েও বেঁচে থাকে।" প্রভাত কারুণ্যের সঙ্গে বলে।

"কিন্তু হেরে যাওয়াটা যে ভালো নয়। যে সমাজে যত বেশী পরাজিতা নারী, সে সমাজ যে তত বেশী পরাজিত। সে দেশ যে কিছুতেই জয়ী হতে পারে না। প্রশ্নটা কি নিছক ব্যক্তিগত ? সমষ্টির এর জন্যে মাথাব্যথা নেই ?" রত্ন সীরিয়াস হয়ে বলে।

"আমার সঙ্গে কুস্তি করে কী হবে, ভাই ? সাধ্য থাকে তো এদেশের গুরুজনদের

সঙ্গে কর। আমি প্রতিবারই ক্ষতবিক্ষত। তবে এবার আমি অত সহজে হাল ছাড়ছিনে। পুলিস নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করব সুলেখাকে। দেখি কেমন করে বন্দী করে রাখতে পারে!" প্রভাত তার প্ল্যান ফাঁস করে দেয়।

"তুমি আমাকে অবাক করলে প্রভাত। যে মেয়ে স্কুলে পড়ায় তাকে বন্দী করে রাখবেই বা কে? স্কুলে যাবার নাম করে সে কি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসতে পারে না? অমন একখানা সীন করার কী দরকার?" রত্নর মুখে হাসি দেখা দেয়।

"না, না, চোরের মতো লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আমি আমার শক্তি প্রমাণ করতে চাই। ওরা বেঁধে রাখবে, আমি ছাড়িয়ে নেব। এর নাম নাটক নয়, এর নাম বীরত্ব।" প্রভাত গোঁফে তা দেয়।

"তা হলে যে বলছিলে তোমরাও ইলোপ করবে?" রত্ন চেপে ধরে।

"এটাও কি ইলোপমেন্ট নয়? তোমাদেরটা চোরের মতো। আমাদেরটা ডাকাতের মতো। পুলিস নিয়ে আইন অনুসারে ডাকাতি।" প্রভাত এর পর একটু নরম হয়ে বলে, "সবুর করলে এত কাণ্ডের দরকার হবে না, ভাই। সমাজ দিন দিন বদলে যাচ্ছে। অসবর্ণ বিবাহ শুনে লোকে শক পায় না। তবে সামাজিক অনুষ্ঠান এখনো দুরূহ। আমরা সিভিল ম্যারেজই করব। তোমাকেও যোগ দিতে হবে। তুমিও সাক্ষী হবে। কেমন?"

"নিশ্চয় সাক্ষী হব, যদি দেশে ততদিন থাকি।" রত্ন সানন্দে কথা দেয়। "আব যদি তাব আগে বিদেশে চলে যাই তবে সাদর অভিনন্দন জানাব।"

"তা হলে সেই কথা রইল।" প্রভাত বন্ধুর হাতে হাত রেখে বলে, "সাত ভাই চম্পার সবাইকে প্রত্যাশা করব। পারুলবোনকেও। কিন্তু সেটা হয়তো সম্ভব হবে না।"

বত্ন তা শুনে ব্যথা পায়। "সেটা যদি সম্ভব না হয তবে আমার সাধনা ব্যর্থ। আগে ভাগে কেন আমি মেনে নিতে যাব যে আমার সামনে আছে ব্যর্থতা?"

প্রভাতের কাহিনী গৌরীকে জানায়। ও মেয়ে জ্যোতিব বেলা যেমন তিক্ত হয়েছিল প্রভাতের বেলা তেমনি মধুর হয়।

"চমৎকার খবর!" গোরী লেখে। "প্রভাতই পুরুষের মতো পুরুষ। সেই জন্যেই বরাবর ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। সুলেখাকে ও হরণ করে নিয়ে যাবে বীরের মতো। সঙ্গে অবশ্য একজন সেপাই থাকবে। বীরদের সঙ্গেও কি সৈনিক থাকে না? চমৎকার, চমৎকার দৃশ্য! মহাভারতে অমন অনেক উপাখ্যান আছে। উষাহরণ, রুক্মিণীহরণ, সুভদ্রাহরণ। একালের মহাভারত যখন লেখা হবে তাতেও থাকবে সুলেখাহরণ। তোমরা সাত ভাই চম্পা সাতজনেই যদি প্রভাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তা হলে মহাভারতের উপাদান সৃষ্টি কবতে। প্রত্যেকেই এক-একটি বীর। প্রত্যেকেরই এক-একটি বীরাঙ্গনা।"

"এক ভাই চম্পা যদি পারুলহরণ করে তা হলে কি সেটা রূপকথাসম্মত হবে?" বত্ন জিজ্ঞাসা করে চিঠিতে। "বিশেষত ওই কোটালের সাহায্যে পারুলহরণ?"

"না। ওটা ভালো নয়। তুই একদিন পুলিস ডেকে এনে আমাকে ধরে নিয়ে যাবি

আমার বাপের বাড়ী থেকে? এত নিষ্ঠুর কি তুই হবি? প্রভাতকে বলিস সুলেখার গুরুজনের মনে দাগা না দিতে। ওঁরা যে একদিন প্রভাতেরও গুরুজন হবেন। কত ভালোবাসবেন ওকে। আইন আদালতকে আমি যমের মতো ডরাই। বেচারি সুলেখার জন্যে আমি ভীত। প্রভাত ছেলেটা এমন গোঁয়ার! বলে কী না পুলিস ডেকে নিয়ে যাবে ভদ্রলোকের বাড়ী হানা দিতে। না, না, হরণ-টরণ ওসব কলিযুগে চলতে পারে না। চলত দ্বাপর যুগে। ত্রেতাযুগে। সত্যযুগে। সেকালে সবাই সত্য কথা বলত। একালে সত্য কথা বলে ক'জন!" গৌরী যুক্তি দেখায়।

তা হলে আর একখানা মহাভারত হয় না! তা হলে হয় কী? আর একটি চম্পা পারুল রূপকথা? সেটাও রত্ন গৌরীর বেলা হলো কোথায়! ওরা কেমন করে একদিন নাইট ও লেডী হয়ে গেল। যা নিয়ে মধ্যযুগেও রোমান্স। এটা মধ্যযুগ নয়। সেইখানেই তো বাধছে।

ছাব্বিশ

না, শুধু সেইখানেই নয়। যুগটা আধুনিক। এ যুগের তরুণ তরুণীরা নতুন একটি সম্পর্কের আস্বাদন পেয়েছে। তার নাম বন্ধু বন্ধুনী সম্পর্ক। তরুণের সঙ্গে যেমন তরুণের বন্ধুতা তরুণীরও তেমনি। ওরা চম্পা ও পারুলের মতো ভাইবোনও নয়। নাইট আর লেডীর মতো প্রেমিক প্রেমিকাও নয়। সম্ভবপর স্বামী স্ত্রীও নয়। ওরা নিতান্তই বন্ধু বন্ধুনী।

এ রকম একটা সম্পর্ক রত্ন কোনোদিন প্রত্যাশা করেনি। এটা আপনা আপনি পাতানো হয়ে গেছে তার এক বছরের সিনিয়র সহপাঠিনী সেবা দাশগুপ্তর সঙ্গে। গোড়ার দিকে সেবাকে সে গতানুগতিক ধারায় "সেবাদি" বলে ডাকতে শুরু করেছিল, কিন্তু সেবার তাতে আপত্তি। তা হলে কি "মিস দাশগুপ্ত?" না, সেটাও নয়। সেটা তো নেহাত ফর্মাল। তা হলে কী? শুধুমাত্র "সেবা"? হাঁ, তাই। তা হলে আর "আপনি" কেন? অগত্যা "তুমি।"

পরস্পরের কাছে বই ধার করা, নোট ধার করা থেকেই আলাপের সূত্রপাত। সেই সূত্রেই সেবাদের ওখানে যাওয়া আসা। খেতে বললে খাওয়া। বুভুক্ষু হস্‌টেলবাসীর পক্ষে সেটাও একটা আকর্ষণ। নয়তো রূপের আকর্ষণ এক্ষেত্রে ছিল না। সেবার মুখে চোখে যা ছিল তা একপ্রকার অন্তর্দীপ্তি। সে যেন শ্যামবর্ণ একটি ইলেকট্রিক বালব। যেমন স্নিগ্ধ তেমনি ভাস্বর।

অধ্যাপক বুধকুমার দাশগুপ্তকে দেখলে ভক্তি হয়। অধ্যয়নকক্ষে তন্ময় হয়ে কী সব লিখে যাচ্ছেন, যতবার দেখা হয় ততবার ওই একই চিত্র। মিনিট দশের পরে আবিষ্কার করেন যে রত্ন বলে একটি ছাত্র তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় আছে।

"ওঃ হাঁ, তুমি!" অধ্যাপক শশব্যস্ত হয়ে বলেন, "পরীক্ষা দিতে এলাহাবাদ গেছলে।

কেমন দিলে ? কী কী প্রশ্ন এসেছিল ? কী লিখলে তার উত্তরে ? হিসেব করে দেখেছ কত মার্ক আন্দাজ কোনটাতে পাবে ?"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলার পর তিনি আবার তাঁর লেখার খাতায় ডুব দেন। এক কান দিয়ে যা ঢোকে আরেক কান দিয়ে তা বেরিয়ে যায়।

"শুনলুম। শুনলুম। সমস্ত শুনলুম। তা তুমি ভালোই করেছ। ভালোই করবে। এবার আর কী ? এবার খাও দাও ফূর্তি কর। কিছু দিনের জন্যে লেখাপড়ার কাজ তুলে রেখে টেনিস ব্যাডমিন্টন টেবল টেনিস খেলবে। যাতে তোমার শরীরের ক্ষতি পুষিয়ে যায়। দেখছ তো এত খাটুনি সত্ত্বেও আমার শরীর কেমন মজবুত। এখনো রোজ ডাম্বেল ভাঁজি কিনা। স্বামীজী বলতেন ফুটবল খেললে ভগবানকে আরো আগে পাওয়া যায়। তোমার বয়সে আমি রোজ ঘড়ি ধরে ফুটবল খেলেছি। এখন কি আর সে বয়স আছে ?" তিনি তড়িৎগতিতে বলে যান। আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকান্।

সেবার মার সঙ্গে ইতিমধ্যে মাসিমা পাতানো হয়েছিল। তিনি পড়াশুনায় বেশীদূর এগোবার সুযোগ পাননি। তার আগেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। সেকালে একবার বিয়ে হয়ে গেলে তারপরে আর সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকত না। তাঁর দৌড় ওই মাসিকপত্র আর নাটক উপন্যাস পর্যন্ত। মাসিকপত্রে রত্নর লেখা থাকে এটা জানেন বলেই ওকে অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় অতিরিক্ত আদর করে খাওয়ান।

"তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মা। রতন একদিন তোমাকে নিয়েও লিখবে। সব লেখকই চেনা জানা মানুষের চেহারা আঁকে। আমি তো সব সময় সতর্ক, যাতে রতন আমার উল্টো পিঠটা দেখতে না পায়।" সেবা রসিকতা করে।

"তোর আবার উল্টো পিঠ কী ? একটাই তো পিঠ !" ওর মা হাসেন।

"কেন, আমি কি চাঁদপানা নই ? ছেলেদের চোখে আমরা মেয়েরা ও ছাড়া আর কী ? তবে রতন খুব ভালো ছেলে। কারো দিকে কোনোদিন অমন চোখে তাকাযনি।" সেবা সার্টিফিকেট দেয়।

"তা হলে ওকে আরো একখানা প্যানকেক দিতে হয়।" মাসিমা বলেন। দেবার বেলা একখানার জায়গায় দু' খানা বাড়িয়ে দেন।

"থাক, থাক। সর্বনাশ। আমি ভালো ছেলে হতে পারি, কিন্তু খাইয়ে বলে আমার নামডাক নেই, মাসিমা।" রত্ন কিন্তু খায় লোভে পড়ে।

সে অনেক সময় প্রলোভন বোধ করে সেবাকে ওর জীবনের আখ্যান খুলে বলতে। যাতে ওকে অকারণে ভালো ছেলে বলে আপ্যায়ন না করা হয়। ও যা ও তাই। সব শুনে যদি ওকে ভাগিয়ে দেওয়া হয় তাও সই কিন্তু এই ভ্রম ভালো নয়।

একদিন ও সাহসে বুক বেঁধে সেবাকে বলেই ফেলে ওর ইতিহাস। সেবা তো কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না।

"আমার সহানুভূতি আছে, এইটুকু জানালে যদি সুখী হও তা হলে এইটুকুই বলব। বাকীটা পরে একদিন।" সেবা মৌন হয়।

"কেন, আজ বললে ক্ষতি কী ? আমার কাছে তোমার মতামতের যথেষ্ট ওজন

আছে। তুমি আমার বন্ধু।" বন্ধু কথাটার উপর জোর দেয় রত্ন।

"এর হ্যাপি এণ্ডিং আশা করা যায় না রতন। কারো পক্ষে হ্যাপি হবে না। গৌরীর স্বামীর পক্ষে তো নয়ই, ছেলের পক্ষে তো নয়ই, গৌরীর পক্ষেও না, তোমার পক্ষেও না। তুমি মনে করছ চারজনের মধ্যে দু'জন তো সুখী হবে। না, একজনও না।" সেবা সবজান্তার মতো বলে।

এবার মৌন হবার পালা রত্নর। সেবার ওটা কি ভবিষ্যদ্বাণী ! ও কি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে পথের শেষে চারজনের মধ্যে চারজনেই অসুখী হবে ?

"কিন্তু, সেবা, জীবনে সুখটাই কি পরম পুরুষার্থ ? স্বাধীনতা নয় ? প্রেম নয় ?" রত্ন অবশেষে কথা খুঁজে পায়। "স্বাধীনতার জন্যে সুখ বিসর্জন দেওয়া, প্রেমের জন্যে দুঃখ বরণ করা এসব কি পুঁথিতেই লেখা থাকবে ? জীবনে সত্য হবে না ? আমার কথা যদি বল আমি এই ত্রিকোণের মধ্যে স্বেচ্ছায় আসিনি। এখন তো দেখছি চতুষ্কোণ। কিন্তু এসে পড়েছি যখন, তখন স্বেচ্ছায় সরে যেতে অক্ষম। যেদিন বুঝব যে আমার থাকা না থাকা দুই সমান, আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ, সেদিন ছুটি চাইব। তার আগে নয়।"

সেবা কী ভেবে বলে "মনে রেখো, স্বাধীনতাতেই স্বাধীনতার শেষ।"

"আর ভালোবাসার ?" আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে রত্ন।

"ভালোবাসাতেই ভালোবাসার শেষ।" সেবা গম্ভীরভাবে বলে।

রত্ন ধরতে পারে না। অনুধাবনের চেষ্টা করে।

"কেন, এ তো সহজবোধ্য। ব্যাখ্যার দরকার করে না।" সেবা বিশদ করে বলে, "ইচ্ছা করলে তোমরা সারাজীবন ভালোবেসে যেতে পারো, কিন্তু বিয়ের কথা ভেবো না। বিয়ের চিন্তা ছেড়ে দিলে স্বাধীন হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া যেমন তোমার পক্ষে তেমনি ওঁর পক্ষেও সম্ভব। একালের মেয়েদের জন্যে সব জানালা দরজা খুলে যাচ্ছে। কিন্তু বিবাহিতা হয়ে থাকলে বিবাহবিচ্ছেদটা বাদ। ওটা খুলে গেলেও ওই পর্যন্ত গিয়ে থামতে হয়। ছেলের মুখ চেয়ে।"

রত্ন এবার বুঝতে পেরে স্তব্ধ হয়ে থাকে। গৌরীকে ভালোবেসে যাবে, কিন্তু সে ভালোবাসা হবে পরকীয়া বা অশরীরী দুটোর একটা। এ জীবনে গৌরীর সঙ্গে ঘর করতে পারবে না। গৌরী ওর সন্তানের মা হবে না। কিন্তু গৌরীর স্বাধীনতার বাসনা পূর্ণ হবে।

"ভালোবাসাতেই ভালোবাসার শেষ ? স্বাধীনতাতেই স্বাধীনতার শেষ ?" রত্ন পুনরুক্তি করে। "গৌরীর দিক থেকে এই হয়তো শ্রেয়, কিন্তু আমার দিক থেকে নয়। সেবা, তুমি নারী বলে নারীর দিকটাই দেখছ, পুরুষেরও একটা দিক আছে সেটা দেখতে পাচ্ছ না। না, নারীর দিকটাও নয়। শিশুর দিকটাই দেখছ। যেন সবার উপরে শিশু সত্য তাহার উপরে নাই।"

"কী করা যায় ! শিশু যখন ছিল না তখন একরকম ছিল। এখন যে অন্যরকম। ওর দিকটাও তো দেখতে হবে।" সেবা এইখানে দাঁড়ি টানে।

অত পড়াশুনা করলে কী হবে, সেবাও সংস্কারবদ্ধ ব্রাহ্মমহিলা। বিবাহবিচ্ছেদ ওর চক্ষুশূল। রত্ন ওর পরামর্শ গ্রহণ করে না, কিন্তু ওর পিতার উপদেশ অনুসারে খেলাধুলায়

মেতে যায়। উৎপল হয় ওর খেলার সাথী।

অনেক দিন মালাদির সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়নি। এবার দু'জনে মিলে কারনিভালে যায়, সঙ্গে অবশ্য মালাদির এক ভাই। ইতিমধ্যে রত্ন একটা সুট করিয়েছিল ইণ্টারভিউর জন্যে। সেটা শীতকালে পরতে বেশ আরামের। কারনিভালে সুট পরা রত্নকে মালার সঙ্গে দেখে বন্ধুজনের চোখে দুষ্টু হাসি। রত্নও শেষকালে প্রেমে পড়ল। উৎপল তো সরাসরি অভিনন্দন জানায়। সেও ছিল কারনিভালের দর্শক।

"ভুল্ করেছ, বন্ধু।" রত্ন বলে। "উনি আমার দিদি হন।"

"ওঃ তাই নাকি? আপন দিদি?" উৎপল সন্দিগ্ধ হয়।

"না, দূর সম্পর্কের। আলাপ করতে চাও?" রত্ন ডেকে নিয়ে আলাপ করিয়ে দেয় মালাদির সঙ্গে।

ইরাবতী মান্নাও ছিলেন। মালাদির সঙ্গে তাঁরও আলাপ হলো। সবাই মিলে টো টো করা গেল। অংশ নেওয়া গেল অনেকরকম খেলায়। দেখা গেল মিস মিত্রও মিস মান্নার চেয়ে হইহুল্লোড়ে কম যান না। এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ।

বেচারি মিস সিংহরায়! তার জন্যে দুঃখ হয় রত্নর। এমনিতেই পরাধীন। তার উপর মা হয়ে অবধি যেটুকু বা স্বাধীনতা ছিল সেটুকুও গেছে। তার সমবয়সিনী মেয়েরা যখন প্রাণ খুলে ফূর্তি করছে সে তখন বাচ্চা নিয়ে পড়ে আছে।

বাড়ী ফিরে মালাদি আবার সেই অবদমিত হিন্দু বিধবা। মার ভয়ে ভিজেবেড়াল। আমেরিকান কারনিভালে যোগদানটা যেন প্রক্ষিপ্ত।

পড়াশুনার চাপ ছিল না। যত রাজ্যের হইচই করে দিন কেটে যায়। দেখতে দেখতে গরমের বন্ধ এসে পড়ে। রত্ন কুষ্টিয়ায় বাবার কাছে চলে যায়। সেখানে সিনেমা বা থিয়েটার নেই, কারনিভাল বা পিকনিক নেই। কিন্তু গোরাই নদী তো আছে। তার জলে রোজ সাঁতার কেটে তৃপ্তি পায়।

হঠাৎ একদিন বজ্রপাত। কাগজে মাত্র তিনজনের নাম বেরিয়েছে। তাদেরই নেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। আরো দু' জনকেও নেওয়া হবে, তারা মনোনীত। রত্নর নাম নেই। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। আরো বড়ো শক পায় যখন প্রতিযোগীদের তালিকা আসে। সে তিনজনের একজন হয়নি বটে, কিন্তু পাঁচজনের একজন হয়েছে। তার প্রাপ্য দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুকে।

সাতাশ

সত্যি কথা বলতে কী, রত্নর মন তখন ইলোপমেণ্টের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। গোরী তো আর একা নয়, ওর সঙ্গে ওর শিশু। দু'জনের জন্যে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। জ্যোতিদা থাকলে ওরাও দু'জন হতো। তা হলে হয়তো আরো দু'জনের ভার বইতে পারত। সমস্যা তো কেবল অর্থনীতির নয় যে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হলেই মিটে যাবে।

ওদিকে গোরীর মনও কি প্রস্তুত ছিল ? না, সে তার নন্দনের বন্ধন কাটাতে পারত না। সনন্দন অকূলে ঝাঁপ দিতেও তার প্রাণে আতঙ্ক। রত্ন কৃতকার্য হলেই যে তখনি তার সমস্যা জল হয়ে যেত তা নয়। বরং তখনি শুরু হতো তার অগ্নিপরীক্ষা। সে কি শ্যামের জন্যে কুল ছাড়বে, না কুলের জন্যে শ্যাম ছাড়বে ?

রত্নর আশঙ্কা ছিল যে, প্রতিযোগিতার ফল শুনে গোরী হয়তো বলবে রত্নটা একটা অপদার্থ। ওর উপর নির্ভর করলে কোনো কালেই মুক্তিলাভ ঘটবে না। খবরটা গোরীকে সে ভয়ে ভয়েই দিয়েছিল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সৌরভ ছিল তার চিঠিতে। সিদ্ধি তো তার হাতের মুঠোয় এসেও ফস্কে গেল। লুফে নিল একজন সংখ্যালঘু প্রার্থী। "পরের বার যদি একজনমাত্রও নেওয়া হয় তা হলে সেই একজন হবে রত্নকান্ত।" এই হলো তার ধনুর্ভঙ্গ পণ।

"আমার তো উল্টো আশঙ্কা ছিল যে, তুই এইযাত্রাই সফল হবি ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করবি। আমি না পারতুম তোর সঙ্গে যেতে, না তোর বিরহ সইতে। আমার পরিস্থিতি তো জানিস। এটা আমি সাধ করে ডেকে আনিনি। যে কর্তব্যভার আমার ঘাড়ে চেপেছে তার থেকে মুক্তি কি জাহাজে উঠলেই মেলে ? এর একটা ফয়সালা না করে আমার মুক্তি কোথায় ? তুই তোর যথাসাধ্য করেছিস। এবার যখন এত উচ্চে উঠতে পেরেছিস তখন পরের বার আরো উচ্চে উঠতে পারবি। তোর উপর আমার অসীম বিশ্বাস। তুই ছাড়া আমার আর আছেই বা কে ? মানিককে যদি গণনায় না আনি। তোরা দুটিই আমার দুটি চোখ। আমার জোড়মানিক। হাঁ, তুই আবার পরীক্ষা দে। এ সংগ্রাম চলবে। তোর পরাজয়ে আমারও পরাজয়। তোর জয়লাভে আমারও জয়লাভ। একবার পরাজয় হলো বলে হাল ছেড়ে দিসনে। পরাজয়ই বা কেন বলব ? এটা অর্ধ জয়। আমার বাবারও তাই মত। তিনি এতদিন বাদে তোর উপর প্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু মার মনোভাব তেমনি অকরুণ। জিতলে তো তুই আমাকে হরণ করে নিয়ে যাবি। মা এবার আরো ভয় পেয়েছেন। ভিতরে ভিতরে মা তোকে ভালোবাসেন। কিন্তু তোর হাতে আমার ভাগ্য সঁপে দিতে পারেন না।"

মুক্তির পরে গোরীর ভাগ্য গোরীর নিজের হাতেই থাকবে। রত্নকে যদি সে স্বেচ্ছায় বরণ করে তা হলেও তার নাম ভাগ্য সঁপে দেওয়া নয়। দু'জনেই স্বাধীন নায়ক-নায়িকা, কেউ কারো বন্দী নয়। কিন্তু প্রেমের যা স্বভাব, প্রেম প্রিয়জনকে সম্পূর্ণ আপনার না করে ছাড়ে না। সেইজন্যে একজনের নিয়তির সঙ্গে আরেকজনের নিয়তি জড়িয়ে যায়। তখন তারা যদি সামাজিক অনুমোদন চায় তো বিবাহের ভিতর দিয়ে যায়। তার মানে কি এই যে পত্নীর ভাগ্য পতির হাতে ?

ওসব সেকেলে ধারণা। আধুনিক নরনারী কেউ কারো হাতের পুতুল নয়। দু'জনেই সমান স্বাধীন। বিয়ে করলেও স্বাধীন, না করলেও স্বাধীন। কিন্তু কী জানি কেমন করে রত্ন আর গোরী উভয়েই ধরে নিয়েছিল যে পুরুষই নারীকে উদ্ধার করবে, রক্ষা করবে। ওটা ঠিক সমান সম্পর্ক নয়। তবু ওটা প্রায় বদ্ধমূল ধারণা। অথচ এটাও রত্নর মনের কথা যে, গোরী সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী হয়, স্বনির্ভর হয়। লতার মতো তরুকে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ না করে।

এ জীবনে রত্ন আর কোনো নারী চায় না। গোরীকেই হতে হবে তার গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা। এটা যেমন তার অন্তরের একদিকের কথা, তেমনি আরেক দিকের কথা গোরী যদি তাকে আর ভালো না বাসে বা তার ভালোবাসা না পায় তা হলে কেউ কারুকে বেঁধে রাখবে না। সব নির্ভর করবে প্রেমের সত্যের উপরে। যেখানে প্রেম চলে গেছে সেখানে নীড় শূন্য পড়ে থাকবে, এইটেই তো স্বাভাবিক। তা বলে প্রেমকে তো জোর করে ধরে রাখা যায় না। সেটা অসত্য হবে।

রত্ন যখন এসব কথা খোলাখুলি বলে তখন বুঝতে পারে না যে, গোরী তাতে ভয় পায়। প্রেমের বেলা প্রেমিক, প্রেম ফুরোলে কেউ নয়, এর মধ্যে সত্য থাকতে পারে কিন্তু নিরাপত্তা নেই। নারী যদি নিরাপদ বোধ না করে তবে ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মেলাতে চায় না। এক যদি সে প্রেমের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে সেকথা ভিন্ন। কিন্তু সাধারণত সে ততদূর যায় না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সংযত হয়।

রত্ন মনে মনে গোরীর আত্মসমর্পণই আশা করে। অথচ ও জানে যে ও পুরুষোত্তম নয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই যদি পুরুষোত্তম হওয়া যেত তা হলে আর ভাবনা কী ছিল ! কিন্তু গোরীর মতো প্রাণময়ী নারী কি তেমন একটি বিদ্বানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে ? কী করে সমান প্রাণময় হবে রত্ন, যখন তার উপরে পড়াশুনা ও ভাবনাচিন্তার প্রচণ্ড দায়। সুতরাং আশা পোষণ করলেও সে নিশ্চিত ছিল না যে একদিন গোরীর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ পেয়ে ধন্য হবে।

প্রথম দর্শনের পূর্বে গোরীর চিঠিপত্রে আত্মসমর্পণের আভাস ইঙ্গিত অভিলাষ পরিস্ফুট থাকত। কিন্তু চোখের দেখার পর থেকে ওসব একরকম অদৃশ্য। এর থেকে অনুমান হয় রত্ন ওর পুরুষোত্তম নয় বলেই তার প্রতি এই নিরুত্তাপভাব। বার দুয়েক যে চুম্বন বিনিময় হয়েছে তার মধ্যেও তেমন উত্তাপ ছিল না। ছিল নিবিড় প্রীতি। তার জন্যেও ধন্যতা বোধ করে রত্ন। কিন্তু তার গভীর প্রত্যয় প্রথম দর্শনের পর গোরী কিছু ফিরিয়ে নিয়েছে। তুলে রেখেছে আর কোনো পুরুষের জন্যে। যে হবে ওর পুরুষোত্তম।

, বেশ তো, তাই হোক। রত্ন শুধু ওকে মুক্ত করে দিয়েই ক্ষান্ত হবে। মুক্তির পর ও যাকে খুশি বরণ করবে, স্বয়ংবরা হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। মুক্তিদাতাকেই বরণ করতে হবে এমন কী বাধ্যবাধকতা আছে ? অপর পক্ষে রত্নর দিক থেকেও তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আর কোনো নারী যদি তার প্রতি অনুরক্ত হয়, তাকে বরণ করে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তা হলে সেও স্বাধীন।

প্রথম দর্শনের পর থেকেযেটা রত্ন লক্ষ করে নি বললেও চলে মাতৃত্বের পর থেকে সেটা সম্পূর্ণ বিলীন। গোরী আগের মতো রাশি রাশি চিঠি লেখে, কিন্তু কোনোখানেই ব্যক্ত করে না যে তার অন্তরে রত্নর জন্যে বাসনা কামনা আছে। যে বাসনা প্রণয়ী প্রণয়িনীর মধ্যে স্বাভাবিক। মাতৃত্ব এসে আর-সব কিছুকে খর্ব করেছে, ক্ষয় করেছে। গোরী যেন মূর্তিমতী মাডোনা। খ্রীস্টজননী। যাকে ভক্তি করতে পূজা করতে সাধ যায়। কিন্তু কোলে নিতে সাহস হয় না।

নারীর সঙ্গে স্থূল সম্পর্ক রত্নর কাম্য নয়। তা বলে একমাত্র সূক্ষ্ম সম্পর্কই কি

তার কাম্য ? তা যদি হয় তবে আর গোরীতে সেবাতে মালাতে তফাত কী ? নারীতে পুরুষে পার্থক্য কী ? প্রাকৃত কাম তার কাম্য নয়, তা বলে অপ্রাকৃত প্রেমও কি কাম্য ? রত্নর মনে একটা খটকা বেধেছে। সে পুরুষোত্তম বলে কি পুরুষ নয় ? সে তবে কী ?

আসলে যা হয়েছিল তা এই যে, গোরীর প্যাশন কখন একসময় নিবে গেছল। আর রত্নর প্যাশন কখন একসময় জ্বলে উঠেছিল। গোরীর প্যাশন নিবে যাবার সময় রত্নর প্যাশনকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। প্রেমের সবটাই কিছু আলোক নয়। আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাপও থাকে। যেখানে তাপ নেই সেখানে আলোক থাকলে সে আলোক চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ অথচ নিস্তেজ। নিশ্চয়ই মূল্যবান, কিন্তু সূর্যের আলোর বিকল্প নয়।

রত্ন চায় সূর্যের আলো। তবে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর নয়। যে আলোতে তাপও থাকবে, অথচ আয়ত্তের অতীত হবে না। গোরীকে তার সত্তার ভয়। ও মেয়ে চাইলে তাকে ধ্বংস করতেও পারে।

নারীর প্রতি আকর্ষণটা যদি কেবল হৃদয়ের হতো তা হলে তো কোনো গোলই বাধত না। জীবন হতো অতি মধুর একটি প্রেমের কবিতা। সমাজের সঙ্গেও ঠোকাঠুকি ঘটত না। ধর্মের সঙ্গেও না। পদে পদে শুনতে হতো না, এটা অসামাজিক ওটা অধর্ম। কিন্তু আকর্ষণ যে অনুভব করে সে পুরুষ। পুরুষের কেবল হৃদয় আছে তাই নয়। আছে দেহ, তাপ। সেইজন্যে সে চায় নারীসঙ্গ। দিনরাত চিঠি লিখে যা পায় তা তো তাপ নয়, তা আলো। নিশ্চয়ই মূল্যবান কিন্তু ফুল-ব্লাডেড ম্যান চায় ফুল-ব্লাডেড উওম্যান।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে চাইতে। গোরী এখন নিবন্ত আগুন। যেদিন আবার জ্বলন্ত আগুন হবে সেদিন সে আগুনে ঝাঁপ দিলে রত্নই পুড়ে খাক হবে। কারণ যে আগুন তার ভিতরে জ্বলছে সে আগুন দুর্বল দেহের আগুন। নিরবচ্ছিন্ন মস্তিষ্কচর্চা তার বলবীর্য টেনে নিচ্ছে। নারীর জন্যে সামান্যই অবশিষ্ট রাখছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, এ দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা পুরুষকে যমের অরুচি না করুক, নারীর অরুচি করে। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।'

রত্নর চিন্তায় ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয় এই তত্ত্ব যে, ইনটেলেকচুয়াল পুরুষের জন্যে চাই ভাইটাল নারী। যে তাকে নিজের ভাইটালিটি দিয়ে ভাইটালাইজ করবে। ইনটেলেকচুয়াল পুরুষের জন্যে ইনটেলেকচুয়াল নারী নয়। তা হলে যে ইনটেলেকটের ডবল ডোজ হবে। সন্তান যদি হয় তবে সে হবে অতিমাত্রায় ইনটেলেকচুয়াল। তার ভাইটালিটি বলে বিশেষ কিছু থাকবে না। তেমন সন্তান কে চায় ? চাই ইনটেলেকট তথা ভাইটালিটির সমন্বয়। গোরীর ও রত্নর সন্তান যদি হয় তবে তার মধ্যে এই বাঞ্ছনীয় সমন্বয় ঘটবে। সেই হবে আদর্শ সন্তান।

সন্তানবাসনা রত্নর মনে কোনোদিনই ছিল না। যুগলের ধ্যানেই সে এতকাল বিভোর। বৈষ্ণবরা যাকে বলে যুগলকিশোর। যুগলতত্ত্বের মধ্যে তৃতীয় কেউ নেই। সন্তানও তো তৃতীয়। সন্তান হলে আর যুগল থাকে না। হয়ে যায় ত্রয়ী। ত্রয়ীর জন্যে রত্নর মন প্রস্তুত ছিল না। তবে আরো বয়স হলে সেও একদিন সন্তানের জনক হতে রাজী হবে। এখন অসময়ে গোরী ওর মধ্যে সন্তানবাসনা সঞ্চারিত করছে। লিখছে মানিক নাকি মানিকেরই

ছেলে। আত্মিক অর্থে। তাই যদি হলো তবে এর পরেরটি কেন কায়িক অর্থে হবে না? অবশ্য মুক্তির পরে। সেই হবে আদর্শ সন্তান। যদি হয়।

গোরীকে রত্ন ওর ফরমাশ জানিয়ে রাখে। গোরী তো হেসে খুন। লেখে, "পুরুষদের তো গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসববেদনা পোহাতে হয় না। ওরা শুধু ফাঁদে ফেলতেই জানে।"

আটাশ

রেবাদিকে দেখে জ্যোতিদার গুরুজনের পছন্দ হয়। জাতের বাধা শেষ পর্যন্ত টেকে না। পরলোকের পিণ্ডির জন্যে ইহলোকের বিবাহ পণ্ড হলে ছেলে আর ঘরমুখো হবে না। হবে জেলমুখো। সেটা তো ভালো নয়।

"তা হলে আর দেরি কেন? শুভস্য শীঘ্রম্।" রত্ন উৎসাহের সঙ্গে বলে।

"তা কি হয়! এ যে হিন্দুমতে বিবাহ। এখন শুভদিন ও শুভক্ষণ নিয়ে গবেষণা চলছে। ইতিমধ্যে ঠিকুজি মেলানো হয়েছে। জ্যোতিষীদের হাত থেকে রেহাই পেলে তারপরে বামুনদের পালা। নাপিতদেরও এতে একটা ভূমিকা আছে, জানো? নাপিত সঙ্গে না গেলে বিয়ে হবে না।" জ্যোতিদা হাসে।

"তা হলে শ্রাবণে নয়। হবে ভাদ্রমাসে।" রত্নর উৎসাহ কিছু কমে।

"দূর, ভাদ্রমাসে কি বিবাহ হয়? ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক বাদ। ওঁরা দেখছি অগ্রহায়ণের পূর্বে আমাদের মিলতে দেবেন না।" জ্যোতিদা সংশয় প্রকাশ করে।

"মিলনের জন্যে তোমরা বিবাহ অবধি অপেক্ষা করবে কেন? তুমি তো বিবাহেই বিশ্বাস কর না। আমাদের বেলা তো অন্যরকম পাঁতি দিয়েছিলে।" রত্ন চেপে ধরে।

"কী করি, বল? রেবার মতো পিউরিটানের প্রেমে পড়তে হবে, তা কি জানতুম? শুধু বিয়ে নয়। মন্ত্র পড়ে বিয়ে। যে দেবতার অস্তিত্ব মানিনে তাঁর নাম নেওয়া। তাঁকে নমো করা। সত্যি, আমার এক এক সময় ইচ্ছে করে পালাতে। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে। কিন্তু রেবা আবার ইলোপমেণ্টে বিশ্বাস করে না।" জ্যোতিদা করুণভাবে বলে।

"তা হলে তোমরা রেজিস্ট্রি করছ না কেন? সেটাও তো বিয়ে।" রত্ন পরামর্শ দেয়।

"রেজিস্ট্রিকে সেকেলে আত্মীয়স্বজনের আরো ভয়। ওটা নাকি বিবাহই নয়। বিবাহ বলতে ওঁরা বোঝেন সম্প্রদান, সপ্তপদী, সাত পাক, কুশণ্ডিকা ইত্যাদি। এসব বাদ গেলে কেউ যোগ দেবেন না। পরে ছেলেমেয়ে হলে তাদের বিয়ে আটকাতে পারে। তবে রেজিস্ট্রিও আমরা করব। অসবর্ণ বিবাহ কিনা। হিন্দু আইন এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য-নয়। পরে আবার উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ বাধতে পারে।" জ্যোতিদা বোঝায়।

"আচ্ছা, তুমিই না আমাকে বলেছিলে যে গোরী আর আমি যদি বিয়ের সুযোগ না পাই, অথচ আমাদের যদি ছেলেমেয়ে হয়, তাহলে খালি উইল করে সম্পত্তি দিয়ে গেলেই চলবে? আর বিবাহ তো কেবল উত্তরাধিকারের জন্যেই।" রত্ন জবাবদিহি চায়।

"তোমাদের বেলা বিবাহ্ অসম্ভব বলেই ওকথা বলেছিলুম।" জ্যোতিদা উত্তর দেয়। "তা বলে কি তোমাদের মিলন হবে না?"

দুই বন্ধুর প্রিয় বিষয় গোরী। যেমন কানু বিনে গীত নেই তেমনি গোরী বিনে গল্প নেই। দেখা হলেই গৌরচন্দ্রিকার পর গোরীর প্রসঙ্গ ওঠে।

"গোরী আমার উপর টং হয়ে রয়েছে, রতন। রেবাকে বিয়ে করছি বলে নয়। এত শীগগির বিয়ে করছি বলে। ওর একটা ব্যবস্থা না করে, ওকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে আপনি বিয়ে করছি আমি কোন্ মুখে? আমার কি লজ্জাশরম নেই? আমি না ওর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?" জ্যোতিদা আক্ষেপের স্বরে বলে।

"কথাটা ভুল নয়, জ্যোতিদা। তুমিই তো আমাদের পরিকল্পনার মধ্যমণি। তোমাকে বাদ দিলে পরিকল্পনা যে ধ্বসে যায়। এই মুহূর্তে আমরা ইলোপ করছিনে বলেই রক্ষে। নইলে তোমাকে বাদ দিয়ে ইলোপমেন্ট যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট।" রত্ন বলে খানিকটে সীরিয়াসভাবে, খানিকটে পরিহাসভরে।

"গোরীরও সেই নালিশ। ও বলছে ও তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিল। আমার জন্যেই ওর যাওয়া হলো না। কেন, আমার জন্যে কেন? রত্নর জন্যে কেন নয়? রত্নর পরীক্ষার ফল আর-একটু ভালো হলেই তো ওর অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল। কই, রত্নর বিরুদ্ধে তো ওর কোনো নালিশ নেই?" জ্যোতিদা হাসে।

"না, আমাকে আরেকবার চেষ্টা করতে বলেছে। এখন ওর মন প্রস্তুত নয়। আমি সফল হলেও আমার সঙ্গে ও যেত না।" রত্ন গোরীর বক্তব্য বোঝায়।

"অথচ আমাকে দোষ দেয়, যেন আমার জন্যেই ওর যাওয়া হলো না। এর সোজা অর্থ ও এখন প্রস্তুত নয়। সুতরাং ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে ও আমাকে। তুমি আরেকবার চেষ্টা করবে। আমি আরেক বছর হাঁ করে বসে থাকব। আর রেবা? আসলে রেবার জন্যে গোরী তৈরি ছিল না। রেবা ওর কাছে অপ্রত্যাশিত। ওই ছিল আকাশের একটিমাত্র তারা। এখন ওর দোসর হয়েছে রেবা। দোসরকে সইতে পারছে না। তা যদি বল রেবাও।" জ্যোতির চোখে দুষ্টু হাসি।

"রেবা সইতে পারছে না কেন?" রত্নর ধাঁধা লাগে।

"রেবাকে আমি বলেছি যে গোরীর জন্যে আমার কিছু করণীয় আছে। আগে রেবা ছিল না বলে রেবার সম্মতির প্রয়োজন হয়নি। এখন প্রয়োজন। রেবা কি সম্মতি দেবে? সব শুনে রেবা বলে গোরী মোটেই আন্তরিক নয়। কোনোদিন যাবে না। খামখা দুটি ছেলেকে চোখ ঢাকা বলদের মতো নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। আমরা নাকি জোড়া বলদ! তুমি আর আমি!" হো হো করে হাসে জ্যোতিদা।

রত্ন ওর মধ্যে হাসির খোরাক না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর বলে, "রেবাদি ভাবছে গোরীর জন্যেই ওর বিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে। আর গোরী ভাবছে রেবাদির জন্যে ওর মুক্তি পেছিয়ে যাচ্ছে। পেছিয়ে যাওয়া হয়তো ভেস্তে যাওয়া। রেবাদি বা গোরী কারুর সেটা পছন্দ নয়। তোমারও নয়। আমারও নয়। তাহলে পেছিয়ে না দিয়ে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হয়। বিয়েরও, মুক্তিরও। চেষ্টা করলে বিয়ে এগিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মুক্তি

এগিয়ে দিতে পারে কে ? তুমিও না, আমিও না। তা হলে দেখা যাচ্ছে গোরী আর রেবাদির মধ্যে রেবাদিই জিতছে, গোরীই হারছে। একটি ঘোড়া পেছন থেকে ছুটে এসে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আরেকটি ঘোড়া তার জন্যে তোমাকেই দোষ দিচ্ছে, কারণ তুমিই ও ঘোড়ার সওয়ার বা সইস।" রত্ন এই বলে হাসির দৌড়ে ছাড়িয়ে যায়।

"আমরা দুটি বলদ আর ওরা দুটি ঘোড়া। কী চমৎকার উপমা।" জ্যোতিদা মৌজ করে বলে, "আর ওরা যদি ঘোড়া হয় আমরা ওদের সওয়ার তো নই, সইস।"

এর পরে জ্যোতিদা রত্নকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে, "বিলম্বে কার্যসিদ্ধি। সবুরে মেওয়া ফলে। এ বছর আমাদের বিয়ে। আসছে বছর তোমাদের ইলোপমেণ্ট। প্রতিযোগিতায় তোমাকে কেউ রুখতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমার সমুদ্রযাত্রা ধ্রুব। এই অবসরে গোরীর মনটা যাতে তৈরী হয় তার জন্যে সবাই মিলে যত্ন করা যাক। যতনে রতন মেলে। তখন রতনের সঙ্গে মিলে সাগর পাড়ি দেওয়া যায়।"

আপনার উপর রত্নর বিশ্বাস আরো বেড়েছিল। তবু না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সেইজন্যে আরো একজনকে সঙ্গে রাখা দরকার। সেই একজন হলো জ্যোতিদা। কিন্তু রেবাদি ওকে ওর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দিলে তো! রেবাদি যে এর মধ্যেই ধারণা করে বসে আছে যে গোরী আন্তরিক নয়, ও কোনোদিন ঘর ছেড়ে যাবে না। মেয়েমানুষের সহজাত একটা প্রতিভা আছে, যা দিয়ে ওরা মেয়েমানুষ চেনে। তার জন্যে চোখের দেখারও আবশ্যক হয় না।

"রেবাদির মনটাও যাতে তৈরি হয় সে ভার তোমাকেই নিতে হবে, জ্যোতিদা।" রত্ন বিশদ করে, "ধরো, পরের বারেও আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলুম। বলা তো যায় না। পরীক্ষার পড়া একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার। ফী বছর পরীক্ষা দিতে গেলে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে। সেটাও একজাতের গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসববেদনা। শেষে হয়তো দেখা গেল মৃতবৎসা। পরীক্ষায় ব্যর্থ। তা বলে তো গোরীর মুক্তি আবার পেছিয়ে যেতে পারে না। আমাদের আবার উদ্যোগী হতে হবে। তোমাকে আর আমাকে।"

"তা হলে যে রেবার আর আমার মিলিত জীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবে।" জ্যোতিদা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে। "কে জানে রেবা হয়তো সে সময় সন্তানসম্ভবা! এক নারীর দায়িত্ব নিলে আরেক নারীর দায়িত্ব বহন করা যায় না। তবে মহাত্মাজীর আহ্বান পেলে একমুহূর্ত দ্বিধা করব না। ওটা হলো একটা ঐতিহাসিক লগ্ন। ওতে আমিও একজন বরযাত্র।"

"রেবাদি হয়তো সে সময় সন্তানসম্ভবা।" রত্ন প্রতিধ্বনি করে। ঠেস দিয়ে।

"তা হলে ওকে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দেব।" জ্যোতিদা গম্ভীরভাবে বলে।

শ্রাবণমাসেই বিয়ের দিন পড়ে। রত্নও একজন বরযাত্র। সেইসূত্রে রেবাদির সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কথাবার্তার সুযোগ মেলে না। পরে মোতি মুস্তফীর যাদবপুরের আবাসে বধূবরণের ভোজসভায় নববধূর সঙ্গে প্রিয়বন্ধুর প্রথম আলাপ। তেমনি আরো একজনের সঙ্গে। তিনি মোতিদার স্ত্রী ইঙ্গেবর্গ। নরওয়ের মেয়ে। তাঁর এদেশী নাম চিত্রা।

দুটি বউ দুটিই দীর্ঘাঙ্গী। একটি বিদেশিনীদের পক্ষে, আর-একটি স্বদেশিনীদের পক্ষে। কিন্তু গাত্রবর্ণে দুই বিপরীত মেরু। দুই জায়েতে গলাগলি ভাব। যেন পিঠোপিঠি

দুই বোন। যদিও বয়সের ব্যবধান অনেক।

"সাহেবনগর আসছ তো?" রেবাদি সুধায় রত্নকে।

"না, বউদি। আমাকে যে বলদের মতো খাটতে হবে।" রত্ন রসিয়ে রসিয়ে বলে।

"তা বটে। বেগমপুর হলে অন্য কথা!" রেবাদিও সুরসিকা।

পরস্পরকে খোঁচানোর খেলায় রেবাদিরই জিৎ। বিজয়িনী বলে, "এই ছেলেটা! চেহারার এ কী ছিরি! রবি ঠাকুর হতে চাও, সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু শুধু কি বাবরী চুল রাখলেই তাঁর মতো সুপুরুষ হবে? তাঁর মতো খেতে ও খেয়ে হজম করতে হবে তোমাকে। দেখে তো মনে হয় না যে খেতে পাও।"

রত্ন মুখ ফুটে বলতে পারে না যে হসটেলে আধপেটা খেয়েই দিন কাটে। অন্যান্য ছাত্ররা বাইরে গিয়ে পেট ভরায়। ওর যে সে সঙ্গতি নেই।

বিদায়ের ক্ষণে রেবাদি ওর হাত ধরে মিষ্টি হেসে বলে, "কেবল খুনসুটি করেই সময় কাটানো গেল। তোমার দাদার সঙ্গে তো চলছে পিটাপিটি। চাষা ও চাষানী হবার মহড়া দিচ্ছি আমরা। এসো আমাদের চাষগাঁয়। পেটভরে পিঠে খাবে।"

"পিঠে খেলে কেমন লাগে তা তো দাদাকে দেখেই বুঝতে পারছি।" রত্ন তামাশা করে। যখন দেখে জ্যোতিদার পিঠে পড়েছে এক চাপড়।

জ্যোতিদাও তেমনি। দুই গালে দুটি চড় বসিয়ে দিয়ে বলে, "আহা, লেগেছে? দাও, একটু হাত বুলিয়ে দিই।"

ঊনত্রিশ

জ্যোতিদার বিয়ের পর শোনা গেল গোরীর দাদা শ্রীশেষেরও বিয়ের আয়োজন চলেছে। কলকাতায় পাত্রী দেখার জন্যে স্বয়ং সুমতি দেবী আসছেন। সঙ্গে গোরী ও তার বাচ্চা। এটা নাকি দাদার ইচ্ছায়। ওঁর বউ কে হবে না হবে সে বিষয়ে গোরীর পরামর্শ নাকি অপরিহার্য। "গোরীর মতো রুচি আর কার?"

শ্রীশেষপ্রতাপের সঙ্গে রত্নর পরিচয় ছিল না। হলো জ্যোতির বিয়ের বরযাত্রীদের মেলায়। এসেছিলেন তিনি সাহেবী পোশাক প'রে। আলাপ করলেন ইংরেজীতে। রত্ন তো দুটি একটি কথার বেশী বলতেই পারে না। সঙ্কোচে বোবা বনে যায়। কে জানে তিনিও হয়তো মনে মনে ওকে পরখ করে দেখছেন যে, গোরীর মতো নারীর উপযুক্ত সাথী নয়।

মোতি মুস্তফীর ওখানেও আবার দেখা ও আলাপ। এবার রত্নকে সমীহ করলেন শ্রীশেষ। ইতিমধ্যে ওঁর কর্ণগোচর হয়েছিল যে ছেলেটি আর দু'দিন বাদে বিলেত যাচ্ছে। যেটা তিনি হাজার সাহেব সেজেও এতদিন পারেননি, বাণিজ্যে সফল না হলে কোনোদিন পারবেনও না। এবার তাঁর মুখ দিয়ে বাংলা বেরিয়ে এল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে গোরীর সঙ্গে রত্নর বন্ধুতা কতদূর গড়িয়েছে এটা তিনি জানতেন না। শুধু জানতেন যে ওদের

সাত ভাই চম্পা বলে একটা সাহিত্যিকমণ্ডলী আছে।

এবার রত্নর সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়ে যায়। বলেন, "আসবেন একদিন আমার ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। মোহনকে তো আপনি চেনেন। ওই আপনাকে নিয়ে যাবে।"

একদিন মোহন সত্যি সত্যি এল। তার হাতে একখানা চিঠি। গোরী লিখেছে খবর দিতে যে সে এখন কলকাতায় দাদার ফ্ল্যাটে। এতদিন এটা ছিল নারীবর্জিত। শ্রীশেষ ওখানে বাস করতেন, বাবুর্চি বেয়ারা সমেত। থাকতেন পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে। গোরীর যেটা দু'চক্ষের বিষ। সেইজন্যে সে যতবার কলকাতা এসেছে দাদার সাদর আহ্বান উপেক্ষা করেছে। এবার মা স্বয়ং এসেছেন বলে বাবুর্চিকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, তার জায়গায় রাখা হয়েছে ঠাকুর। তা সত্ত্বেও ফ্ল্যাটের গা থেকে বিলিতী গন্ধ যাচ্ছে না। কারণ অন্যান্য ফ্ল্যাটে বিস্তর সাহেব মেম। বেশীরভাগ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান।

"তোকে জানাবার সময় পাইনি, মানিক। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল যে সামনের অগ্রহায়ণেই দাদার বিয়ে দিতে হবে। তা নইলে দাদাও হয়তো ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু জ্যোতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রেমে পড়বে ও অসবর্ণ বউ আনবে। প্রেম বা অসবর্ণ কোনোটাই ওর গুরুজনের পছন্দ নয়।" গোরী লিখেছে।

ওটা সাহেবপাড়া বলে রত্ন সেদিন সাহেবী পোশাক পরেই যায়। পাছে ওকে দারোয়ান ঢুকতে না দেয়। মোহনকেও দেখা গেল সাহেবী পোশাক পরে থাকতে।

গোরীর মা তখন কুটুমবাড়ী গেছেন, দাদা ওর আপিসে। গোরী ওর ছেলের খাতিরে একলা রয়েছে। অবশ্য ঝি চাকর নিয়ে।

"আয়, আয়। অনেকদিন তোকে চোখে দেখিনি। শুকিয়ে গেছিস দেখছি।" গোরী উঠে এসে রত্নকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের একটি সোফায় বসায়। একটুখানি দূরত্ব বজায় রাখে লোকচক্ষু এড়াতে। মোহনকে বিদায় দেয়।

সেদিন রত্নর চেহারা দেখে গোরী যত না দুঃখিত হয় গোরীর দশা দেখে রত্ন তার চেয়ে বেশী। ও মেয়ে শুকিয়ে যায়নি, মোটা হয়েছে। কিন্তু ওকে দেখলে মনে হয় ও ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছে। ওর মনে ভাঙন ধরেছে।

"মরে যাচ্ছি, মানিক। কে আমাকে বাঁচাবে?" গোরী হা-হুতাশ করে।

"কেন, কী হলো আবার?" রত্ন ঘাবড়ে যায়।

"শুনিসনি? আমাকে নিতে আসছে।" গোরী খবরটা শোনায়। লিখেছে বেগমপুর থেকে। লিখেছে পুরো এক বছর তো বাপের বাড়ীতে কাটল। আর কতদিন কাটবে? ওদিকে মাধবের সেবাপূজা করবে কে? দেবতার অবহেলা হচ্ছে।"

রত্ন চুপটি করে শোনে। কী বলবে বুঝতে পারে না। ক্ষমতা তো নেই গোরীকে আর কোনোখানে নিয়ে যাবার। থাকলে প্রস্তাব করত।

"অঘ্রানেই তো দাদার বিয়ে। আর ক'টা দিন সবুর করে বিয়েটা দেখে গেলে তো আরেক দফা খরচপত্তর করে বাপের বাড়ী আসতে হয় না। এত শীগগির ওঁরা পাঠাতে চাইবেনও না। এখন যাওয়া মানে কে জানে ক'বছরের মতো যাওয়া!" বলতে বলতে গোরী ভুলে যায় যে আসছে বছর রত্নর সঙ্গে ইলোপ করার কথা আছে।

রত্নও মনে করিয়ে দেয় না। কে জানে আসছে বছর কী আছে ওর বরাতে ? সিদ্ধি না ব্যর্থতা ? ব্যর্থ হলে কি ইলোপ করা চলে ?

ওর মুখ দেখে গোরী অনুমান করে ওর মন। বলে, "তুই তোর যথাসাধ্য করেছিস ও করবি। কিন্তু জ্যোতি আমাকে হতাশ করেছে। কী শক ! কী শক ! ও শক আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বোধ হয় পারবও না। একেই বলে গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া। এখন আমি কোন্ মুখে বেগমপুরে ফিরে যাই ! মালিক আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসবেন। আর সে হাসি বিষের ছুরির মতো আমার মর্মে বিঁধবে। ওঃ কেন যে তখন তোর কথায় ভুলে আত্মহত্যা করিনি ! কেন তুই অমন শত্রুতা করলি !"

রত্ন নীরবে শুনে যায়, প্রতিবাদ করে না। গোরী বলতে থাকে, "জ্যোতির কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিলুম। ও কী বলল শুনবি ? বলল, মানুষমাত্রেরই কর্তব্য তার নিজের কাছে সত্য হওয়া। আমি তা ছাড়া আর কী করেছি ? অকস্মাৎ প্রেম এল জীবনে, এসে সব ওলটপালট করে দিল। আমি কি তাকে ডেকে আনতে গেছি ? তোর বেলা যেমন মাতৃত্ব এসে সব ওলটপালট করে দিল। তোর জীবনে মাতৃত্বটাই সত্য। সেই সত্যকে মেনে নিয়েই তুই নিজের কাছে সত্য হলি, নিজের সঙ্গে সত্য রক্ষা করলি। তুই যদি আমার কাছে কৈফিয়ত চাস তো আমিও তোর কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারি। কেন তুই কথা দিয়ে কথা রাখলিনে, কেন অকস্মাৎ অন্তঃসত্ত্বা হতে গেলি, রেঙ্গুনযাত্রা বন্ধ হলো কার জন্যে ? মুক্তি তো তখনি হাতের মুঠোয় এসেছিল। কেন তাকে হাতছাড়া হতে দিলি ? যেদিন শুনি তুই মা হতে যাচ্ছিস সেদিন কী শক ! কী শক ! সে শক কি আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি না পারব ? এই বলে জ্যোতি আমারি কথা আমার মুখে ছুঁড়ে মারে।"

আর ও নিয়ে তর্কবিতর্ক করে কী ফল ! পরস্পরের উপর দোষারোপ করেই বা কী লাভ ! রেঙ্গুনযাত্রা যে ঘটল না সেটা ভালোর জন্যেই। নয়তো রেঙ্গুনে গিয়ে আবিষ্কার করা যেত যে গোরী সন্তানসম্ভবা। তখন শ্বশুরবাড়ীর পথ বাপেরবাড়ীর পথ দুই পথই রুদ্ধ। বেচারিকে নিয়ে কি বিপদেই না পড়ত দুটি বেকার যুবক ! সময়মতো কাজ না জুটলে ট্র্যাজেডী ভিন্ন আর কী ছিল ওদের বরাতে !

"থাক, ও নিয়ে আর আলোচনা করে কী হবে ? যা হবার তা হয়েছে, যা হবার নয় তা হয়নি।" রত্ন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "জ্যোতিকে তুই হতাশ করেছিলি বলেই জ্যোতি তোকে হতাশ করেছে। কিন্তু আমি তো রয়েছি, আমি তো এমন কিছু করিনি যা তোকে হতাশ করবার মতো। আমার উপর ভরসা রাখতে পারিস।"

"সেকথা ঠিক। কিন্তু," গোরী বলতে ইতস্তত করে, তারপর বলেই বসে, "জ্যোতি তোর মতো বিদ্বান না হলেও তোর চেয়ে অনেক বেশী সলিড। ও সবরকম অবস্থায় ধকল সইতে পারে। ওর উপর দিয়ে ঝড় বৃষ্টি শীত আতপ সব কিছুই গেছে, কিন্তু ওকে টলাতে পারেনি। ও যেন একখণ্ড শিলা। তা বলে ওকে ভালোবাসা যায় না। আমি তো পারলুম না। আর কেউ যদি পেরে থাকে তো আমি নালিশ করবার কে ? আমার শুধু এইটুকুই বলবার যে বিয়েটা কি এখনি না করলে নয় ! যাক, ওটা যখন হয়েই

গেছে আর ও নিয়ে কথা বাড়িয়ে কী হবে? ওরা সুখী হোক, তা হলেই আমরা সুখী হব।"

জ্যোতি যে শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছে রত্নকে দিয়ে তা ভরবে না, এইটেই সার কথা। প্রেমের অভাব ঘটেনি, ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের মহারথীর অভাব। রত্ন কি তেমনি একজন মহারথী? সত্যি, এর কোনো উত্তর নেই। রত্ন হয়তো একজন মহাপ্রেমিক, কিন্তু মহারথী কি না সন্দেহ। জ্যোতিদা এই বয়সেই গান্ধীর আশ্রমে বাস করে এসেছে, উত্তরভারত পদপরিক্রমা করেছে, শোভাযাত্রা পরিচালনা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে, জেলে গেছে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার দিনেও সে বেপরোয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু' এক ঘা লাঠিও খেয়েছে। ও জাতবিপ্লবী। ওর সঙ্গে কার তুলনা! রত্নর!

"জ্যোতিদা তো লড়াই থেকে সরে যায়নি।" রত্ন আশ্বাস দিয়ে বলে, "ওর স্ট্রাটেজি ঠিক আছে, ট্যাকটিকস বদলেছে। ও আমাদের সঙ্গে বিলেত বা বম্বে যাবে না, কিন্তু বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়াবে। ও আমাদেরই একজন। তবে রেবাদি সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। রেবাদি কেন বলছি, বউদি। বউদির মতে প্রেমের দাবির চেয়ে মাতৃত্বের দাবিই বড়ো, মুক্তির প্রশ্নের চেয়ে ঘরসংসারের প্রশ্নই বড়ো। পাকা ঘুঁটি আর কাঁচিয়ে দেওয়া যায় না। তার সময় পার হয়ে গেছে।"

গৌরীর খোঁপা ভেঙে পড়েছিল। একরাশ এলোচুলকে সায়েস্তা করতে তার দুই হাত ব্যাপৃত। কেশের শোভা যেমন রসিকজনকে মুগ্ধ করে তেমনি স্তনের ডৌল।

গৌরীর অশ্রু আর বাগ মানে না। ও ধরা গলায় বলে, "তা হলে তো আজকেই এ পাট চুকিয়ে দিতে হয়। এই অবাস্তব স্বপ্ন। এই অসার্থক প্রেম।"

"তা যদি হয় তবে আমারই বা অনিশ্চিত প্রতিযোগিতার জন্যে শরীরপাত করা কেন? আমাকে ছেড়ে দিলে আমি নিজের প্রতিভার প্রতি সত্য হতে পারি। এটা তো আমার স্বধর্ম নয়, এটা পরধর্ম।" বলে রত্ন গৌরীর চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

"না, না, তোকে আমি ছেড়ে দেব না। আমার একমাত্র সম্বল এখন তুই। মুক্তির জন্যে যেমন প্রেমের জন্যেও তেমনি। আমি যে তখন বিষ খেয়ে মরিনি তার জন্যে তুইই দায়ী। তোকে ছেড়ে দেব? কক্ষনো না।" বলে গৌরী ওর গালে চুম্বন বসিয়ে দেয়। ভক্ত খ্রীস্টানের মতো রত্ন তার আরেকটা গাল বাড়িয়ে দেয়। তারপর অ-খ্রীস্টানের মতো প্রতিশোধ নেয়।

গৌরীও প্রতিশোধ নিল রত্নকে একজোড়া কার্পেটের ফুলতোলা জুতো উপহার দিয়ে। আগে একবার রত্ন ওকে একজোড়া জরীর নাগরা উপহার দিয়েছিল কিনা। কার্পেটের জুতো উপহারও এই প্রথম নয়।

"এ তো পায়ে দেবার জন্যে নয়, মাথায় করে রাখার জন্যে।" বলে রত্ন গৌরীর দান মাথায় ছোঁয়ায়।

ত্রিশ

বেগমপুরের বেগম বেগমপুরেই ফিরে যান। সেখানে তাঁকে আর তাঁর শিশু নবাবকে আতসবাজি পুড়িয়ে ও দীপাবলী জ্বালিয়ে সম্বর্ধনা করা হয়। গ্রামের লোক কয়েক রাত ধরে যাত্রা থিয়েটার কবির গান ও লীলাকীর্তন শোনে। মাধবকে রাজবেশ পরানো হয়, রাধাকে রানীবেশ। পাড়া ভেঙে পড়ে দেখতে ও হরির লুট করতে।

রত্ন নিয়মিত চিঠি পায়। তাতে কিন্তু ওসব কথা থাকে না। কারণ ওসব তো গৌরীর বিজয়ের নিশানা নয়, বরং পরাজয়ের চিহ্ন। দুনিয়ার দৃষ্টিতে ও হেরে গেছে, কিন্তু রত্নর দৃষ্টিতে তো নয়। কেন তবে ওর দৃষ্টিকে পতনের দিকে আকৃষ্ট করবে?

গৌরী পারতপক্ষে ওর ছেলের কথা লেখে না। সেদিন ওর দাদার ফ্ল্যাটে দেখাসাক্ষাতের সময়ও ওর ছেলেকে দেখায়নি। কী জানি কেন ওর ধারণা রত্ন ওটাকে পরাজয়ের লক্ষণ মনে করবে। কৃষ্ণনগরে থাকতে মাঝে মাঝে ছেলের উল্লেখ করত। কারণ তখনো বেগমপুরে ফিরে যাবার চিন্তা উদয় হয়নি।

রত্নর এবার শেষ চান্স। এবার যদি ব্যর্থ হয় তবে আর প্রতিযোগিতার বয়স থাকবে না। উৎপল একবার ব্যর্থ হবার পর আর প্রতিযোগিতায় নামছে না। ওর বয়স নেই। ও এম-এ'র জন্যে তৈরি হচ্ছে। রত্ন যদিও এম-এ ক্লাসে যায় তবু লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য বই পড়ে। যাতে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারে।

জ্যোতিদা কদাচ কখনো কলকাতা এলে রত্নর সঙ্গে দেখা করে, গৌরীর প্রসঙ্গ ওঠে। ওর কাছেই খবর মেলে বেগমপুরের বেগমের। যে খবর চিঠিতে থাকে না।

"সুধাদির জন্যে দুঃখ হয়, রতন।" জ্যোতিদা বিষণ্ণভাবে বলে।

"কেন, কী হয়েছে ওর?" রত্ন চমকে ওঠে।

"বেচারিকে নির্বাসনে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তুমি তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে ওখানেই বসবাস কর। মোটা মাসোহারা পাবে। সুধাদি চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু মাসোহারা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। ওর বাপের দেওয়া সম্পত্তি খায় কে? ললিতকে জাপানে এ সংবাদ জানানো হয়নি। পাছে তার মনে কষ্ট হয়। সুধাদির নির্বাসন যে কল্পনা করা যায় না। তাতাদা-ই ওর সর্বস্ব। সমবয়সী সমবয়সিনী ওরা। বারো বছর বয়স থেকেই দু'জনে দু'জনার বন্ধু।" জ্যোতিদার কণ্ঠস্বরে বিষাদ।

রত্ন বুঝতে পারে না কেন সুধাদির এই নির্বাসনদণ্ড। অপরাধটা কী।

"অপরাধটা কী আবার। সবই তো জানো। তাতাদার সঙ্গে সুধাদির আর একটা সম্পর্ক ছিল। সেটা ওর বৈধব্যের পর থেকে। গৌরীর বিবাহের পূর্বের থেকে। গৌরী যদি প্রশ্রয় না দিত তা হলে ওটা কবে বন্ধ হয়ে যেত। গৌরী প্রশ্রয় দিয়েছিল আপনাকে বাঁচাতে। এতদিন যে ও বেঁচেছিল সুধাদির জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। নইলে তাতাদা হয়তো রাগ করে আরেকটি বিয়ে করে বসতেন। সুধাদির প্রতি কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না এতদিন। এখন কিন্তু নির্বাসন।" জ্যোতিদা বিষাদাচ্ছন্ন।

আস্তে আস্তে বোঝা গেল যে জ্যোতিদার বিষাদ আসলে সুধাদির জন্যে নয়, গৌরীর

জন্যেই। সুধাদি ওকে পর্বতের আড়ালে রেখেছিল। পর্বত সরে গেলে যা হবার তাই হবে। স্বামী স্ত্রী স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করবে। তাতাদা যে অত নিষ্ঠুর হতে পারেন তা কে ভেবেছিল? গোরীর সম্বর্ধনার সঙ্গে সঙ্গেই সুধাদির বিসর্জন?

যশোবাবু এখন বাচ্চাকে নিয়ে মেতে আছেন। তাঁর বুড়ো বাপ-মা তো ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো কবে থেকে প্রতীক্ষা করছিলেন। নাতির মুখ দেখবেন। নাতিকে পেয়ে কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিয়েছেন। ওর পা মাটিতে পড়তে পায় না। জ্যোতিদা ওর নাম রাখতে চেয়েছিল "কোলবিহারী"। তা তো ওরা শুনবে না। যশোমাধবের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে জয়মাধব।

"জয়মাধব? কার জয়?" রত্ন আবার চমকায়।

"কার আবার? ওর জনকের।" জ্যোতিদা হাসে।

"ওর জননী মেনে নিয়েছে?" রত্ন অবাক হয়।

"না মেনে উপায় আছে? সুধাদির উপরে ওরও তো জয়। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে সার্থকনামা হয়েছে।" জ্যোতিদা পরিহাস করে।

বোঝা গেল গোরী এখন বাস্তববাদী। যশোবাবুও ওকে জয়ের ভাগ দিতে প্রস্তুত। উনি গোরীর উপর জয়ী হয়েছেন, গোরী সুধার উপর জয়ী।

তা হলে গোরীর জন্যে বিষাদের কারণ কী থাকতে পারে? বিষাদ এই জন্যে যে ওকেই এখন সুধার শূন্যতা পূরণ করতে হবে। যশোবাবু তো অপূর্ণ থাকবেন না। এমনি করে গোরীর মুক্তি আরো দুরূহ হলো। এর পরে কী করে ও প্রতিরোধ করবে?

"ভাববার কথা বইকি।" বলে রত্ন প্রসঙ্গটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ হোক তো আগে। শেষ জয়টা তারই হাতে।

জ্যোতিদা তার সমর্থন করে। "হাঁ, শেষ জয়টা তোমারই হাতে। এখন একমনে নিজের জোর বাড়াও। গোরী অবলা বলে তুমিও যেন অবল না হও। অবলাকে বলবানই জয় করবে। বলহীন নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" উপনিষদ আওড়ায় জ্যোতিদা।

যার যা স্বভাব। গোরী আবার রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠায় বেগমপুরে। আশ্রমে বাস না করলেও আশ্রমের কাজ জ্যোতিদা এখনো ছাড়েনি। এবার চাষের মরসুম পার হয়ে গেছে বলে চাষগাঁয় থেকে চাষবাস করা হয়ে উঠছে না। রেবা আছে সাহেবনগরের বাড়ীতে। আর জোতি কাপালিপাড়ার আশ্রমে। কাছাকাছি গ্রাম। তাই সপ্তাহের মধ্যে সাতদিন দেখাসাক্ষাত ও একদিন একত্রবাস।

"হ্যাভলক এলিস পড়েছ?" জ্যোতিদা প্রশ্ন করে।

"না, পড়িনি তো।" রত্ন তার অজ্ঞতা স্বীকার করে।

"এলিস আর তাঁর স্ত্রী আলাদা আলাদা বাড়ীতে থাকতেন। মাঝে মাঝে মিলিত হতেন। এলিস একে বলেন সেমি-ডিটাচড লাভ। সংযুক্ত নয়, বিযুক্তও নয়। সব সময় একসঙ্গে থাকলে প্রেমের নিবিড়তা থাকে না। অপর পক্ষে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে প্রেম হয়ে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ প্লেটোনিক।" জ্যোতিদা বলে।

"তা হলে আর বিয়ে করা কেন?" রত্ন মন্তব্য করে।

"সেইখানেই তো বার্নার্ড শ'র সঙ্গে বিরোধ। শ'রা অবশ্য একসঙ্গেই থাকেন। কিন্তু দুই বন্ধুর মতো।" জ্যোতিদা জানায়।

এর পরে কথাবার্তা আবার গৌরীর দিকে গড়ায়।

"গৌরী এসেছিল একদিন বউ দেখতে।" জ্যোতি বলে, "বউভাতের সময় তো ছিল না, নইলে আরো আগে বউ দেখত।"

"তারপর ? বউ পছন্দ হয়েছে ?" রত্ন কৌতূহলী হয়।

"বোধ হয় হয়নি। তা নয়তো রেবা কেন ওর উপর অত চটে যেত ? মেয়েরা তলে তলে বোঝে কে কাকে পছন্দ করে, কে কাকে করে না।" জ্যোতিদা তাই ভাবে।

"বউদি চটেছিলেন বুঝি ? আশা করি মিটে গেছে।" রত্ন বলে।

"রেবাও যাকে পছন্দ করে তাকে খুব পছন্দ করে। যাকে পছন্দ করে না তাকে আদপেই পছন্দ করে না। কোনো যুক্তিতর্কের ধার ধারে না।" জ্যোতিদা বাকীটুকু রত্নর অনুমানের উপর ছেড়ে দিয়ে বলে "আমি নাচার।"

দুই নারী যেন দুই নৌকা। দুই নৌকায় পা রাখলে যা হয় তাই হয়েছে জ্যোতির। সেইজন্যে ও গৌরীর সঙ্গে সন্তর্পণে মেশে। তাতে গৌরীর মন খারাপ। জ্যোতি যেন দূরে সরে সরে যাচ্ছে। রেবাও চোখা চোখা কথা শোনায় গৌরীর সম্বন্ধে। তাতে জ্যোতির মন খারাপ।

"তোমার সম্বন্ধে ও কী বলে শুনবে ?" জ্যোতির চোখে মিটমিটে হাসি।

"শুনি।" রত্ন উৎকর্ণ হয়।

"হাতের কাছে পেলে ওর দুই গালে দুই চড় কষিয়ে দিতুম।" জ্যোতি শোনায়।

"কেন, আমি কি তোমার মতো চাষা যে চড়টা চাপড়টা খাব ?" রত্ন হাসে। মনে মনে বলে, বেশ মজা তো ! একজন দেবে দুই গালে দুই চুমু, আরেকজন দুই গালে দুই চড়। চুমুর প্রতিদান আছে। চড়ের প্রতিদান আছে কি ?

"তা নয়। ওর কথা হলো, গৌরী এমন কী একজন গরীয়সী নারী যে ওর জন্যে তোমার মতো একটি উদীয়মান তরুণ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে ? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে সমগ্র হিন্দুসমাজ তোমার বিপক্ষে দাঁড়াবে ?" জ্যোতিদা উত্তর দেয়।

রত্ন তো শুনে থ ! সমগ্র হিন্দুসমাজ !

জ্যোতিদা যা বলে তার মর্ম হিন্দুর বিবাহ একটা স্যাক্রামেন্ট। একবার যদি তা ঘটে তবে আর তাকে অঘটিত করা সম্ভব নয়। জন্ম যেমন ফাইনাল, মৃত্যু যেমন ফাইনাল, বিবাহও যদি হিন্দুমতে হয় তবে তেমনি ফাইনাল। জন্মকে অঘটিত করতে পারে কেউ ? মৃত্যুকে অঘটিত করবে কে ? তা হলে বিবাহকে অঘটিত করতে চাওয়া কি মূঢ়তা নয় ? অমন করে পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকতে গেলে কি মানুষ বাঁচে ? রত্নও কি বাঁচবে ? যে নারী বিধবা হয়েছে তার বিবাহ আপনা হতেই অঘটিত হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর পরিণাম কী হলো ? শেষবারের মতো তিনি স্বগ্রামে গিয়ে বিস্তর দান খয়রাত করেন, বহুজনের উপকার করেন। যখন পালকিতে চড়ে ফিরে আসছেন তখন তাঁর পালকির উপর ক্রুদ্ধ জনতার ঢিল বর্ষণ

হয়। অকথ্য গালাগাল দেয় যারা তাদের মধ্যে অনেকেই বিধবা। বিদ্যাসাগর নাকি তাদের ধর্মনাশ করতে যাচ্ছেন !

"রেবা আমাকে শাসিয়েছে যে আমার বন্ধুর কপালেও আছে ঢিল বর্ষণ। আর অকথ্য গালিগালাজ। সধবারাই বলবে ও সধবার ধর্মনাশ করতে যাচ্ছে ! ও হবে সধবা বিবাহের প্রবর্তক ! এমন পাগল !" জ্যোতিদা গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারে না। হাস্যমুখর হয়।

"গোরী তা হলে মুক্ত হবে না ?" রত্ন কাতরভাবে বলে।

"রেবাকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। ও কী বলল শুনবে ?" জ্যোতি বিবরণ দেয়।

"দুটি পুরুষকে দুই বগলদাবা করে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটার নাম কি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা ? ক্রাচ দুটির থেকে একটি তো বেহাত। বাকী একটিতে ভর দিয়ে কতদূর যাবে !"

একত্রিশ

বেগমপুরে ফিরে যেতে গোরীর বিন্দুমাত্র অভিরুচি ছিল না। আবার তো সেইসব আরম্ভ হবে। কারই বা ওসব ভালো লাগে। বেগমপুরে ফিরে যাওয়া মানে তো অতীতে ফিরে যাওয়া। গোরী চায় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে, অতীতের দিকে পেছিয়ে যেতে নয়।

ও ভেবেছিল বেগমপুরে ফিরে না গিয়ে কৃষ্ণনগরেই আরো একটা বছর কোনোরকমে পায়চারি করে কাটিয়ে দেবে। তারপরে রত্নর হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে। কেবল একটি বিষয়ে ও মনঃস্থির করতে পারছিল না। মানিককে কি সঙ্গে নিয়ে যাবে ? না মার কাছে রেখে যাবে ? মার কাছে রেখে গেলে মা যে ওকে রক্ষা করতে পারবেন তা নয়। বেগমপুর থেকে ওরা এসে ওকে ধরে নিয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে ও যে কার হাতে পড়বে কে জানে ! ঠাকুমার হাতে পড়লে তবু ভালো। যদি সৎমার হাতে পড়ে তা হলে ?

অপর পক্ষে, সঙ্গে নিয়ে গেলে জ্যোতির মতো একজন শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন। যার উপর চোখ বুজে নির্ভর করতে পারা যায়। রত্নটা তো নিজেই একটা বাচ্চা। নিজেকেই সামলাতে পারে কিনা সন্দেহ। নারীকে অভয় দিতে যদি বা পারে মাতাকে অভয় দেওয়া ওর সাধ্য নয়। শেষ পর্যন্ত গোরীকেই দু'হাতে বাচ্চা আগলাতে হবে। তা হলে মুক্তির স্বাদ পাবে কী করে ও কবে ?

অপ্রত্যাশিতভাবে জ্যোতির বিবাহ গোরীর মনের ভিতরে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে যায়। ও হাড়ে হাড়ে অনুভব করে যে ওর একটা বাহু ভেঙে গেল। বাকী রইল আর একটা বাহু। সেটা কমজোরী। গোরী দুর্বল বোধ করে। কিন্তু হাল ছাড়ে না।

এমন সময় শোনা গেল দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। সামনের অঘ্রানেই দাদা বউ আনবে। তারপরে এ বাড়ীতে গোরীর স্থান কি তেমনি সম্মানের থাকবে ? না পদে পদে

অসম্মান সইতে হবে? কেমন বউ হবে কে জানে! ও যদি বড়লোকের মেয়ে হয়! কিংবা রূপে বিদ্যাধরী! না, তখন আর বাপের বাড়ীর ভাত মিষ্টি লাগবে না। কোনোমতে হয়তো বাকী কয়েকটা মাস পায়চারি করে কাটিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু বাচ্চাকে রেখে যাবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ওর মামী ওকে দেখতে পারবে না।

ভাঙনটা ধরিয়ে দিয়েছিল জ্যোতির বিয়ে। তাকে বাড়িয়ে দিল দাদার বিয়ের সম্বন্ধ। মনে মনে ও নোটিশ পেল যে অঘ্রানের মধ্যেই ওকে মানে মানে সরে পড়তে হবে। ততদিন সবুর করতে হলো না। শ্বশুরবাড়ী থেকে তলব এল। স্বয়ং যশোবাবু এলেন নিয়ে যেতে।

স্বপ্ন ছিল রতুর হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া। বাস্তব হলো স্বামীর হাত ধরে পেছিয়ে যাওয়া। কেউ ওকে পায়চারি করতে দিল না আরো একটা বছর। মনঃস্থির করবার অবকাশ দিল না। স্বপ্নে আর বাস্তবে অনেক ফারাক। বেচারি গোরী।

আবার সেই বেগমপুর। সেই মাধব। সেই যশোমাধব। কিন্তু—এইখানেই বিস্ময় —সেই সুধা নয়। গোরী আবিষ্কার করে যে পাখীর খাঁচা শূন্য। পাখী উড়ে গেছে। সুধার থাকাতে ও সন্তুষ্ট ছিল না। কিন্তু না থাকাতে ব্যথিত হলো। আহা, কতকালের মানুষটা! এ বাড়ী তো তারও বাড়ী। সে তো আপন অধিকারেই বাস করত।

যশোবাবু সুধাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে গোরীর সঙ্গে মিটমাটের সুরাহা হয়। সুধা থাকতে ওটা সম্ভবপর নয়। সুধার বাপের বাড়ীর অবস্থা ভালো। ওর ভাইরাও চায় যে দিদি ওদের সংসারের হাল ধরে ওদের পৃথক হবার ভয় থেকে বাঁচায়। তা ছাড়া এদিক থেকেও মোটা মাসোহারা পাবে। কিসের অভাব! কিসের দুঃখ! দুঃখ যেটা সেটা বিচ্ছেদের। প্রায় বারো বছর বাদে যশোবাবুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কী করা যায়। যশো ও গোরীকে যে একটা সুযোগ দিতে হবে বোঝাপড়ার। সুধা ওর গদী ছেড়ে দেয়।

যশোবাবু গোরীকে বলেন যে, পুত্রসন্তানের পিতা হয়ে তিনি পরম ধন্য হয়েছেন, পুত্রের জননীর কাছে তিনি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি নাকি শপথ নিয়েছেন যে এ জীবনে তিনি আর কোনো নারীকে স্পর্শ করবেন না, আর কোনো নারীকে বিবাহ করবেন না। গোরীর কাছে তাঁর যে ঋণ তা এইভাবেই শোধ করবেন।

পুরোনো পাপীকে বিশ্বাস নেই। তা হলেও গোরীর অন্তর থেকে একটা ভার নেমে যায়। ওর সন্তানকে সৎমার জ্বালা পোহাতে হবে না। স্বামীর আন্তরিকতায় সন্দিহান না হবার আরো একটা কারণ ছিল। যশোবাবু স্বয়ং সৎমার জ্বালায় জ্বলেছেন। সৎমাকে নিয়ে ওঁর বাবা একটু তফাতেই থাকেন, পৃথক মহলে।

গোরী এই প্রথমবার নিষ্কণ্টক বোধ করে। কেবল বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতেও। ওর মনের উপরে এর ক্রিয়া চলতে থাকে চেতন ও অচেতনভাবে। মুখ ফুটে স্বীকার না করলেও গোরীও একপ্রকার কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। যে পুরুষ অপর নারীতে আসক্ত সে অপর নারী ত্যাগ করছে। যে পতি অপর পত্নী গ্রহণ করতে পারত সে পতি অপর পত্নী গ্রহণ করবে না। এ কি বড়ো সামান্য কথা! এ যে একটা অলৌকিক ঘটনা! ঘটল

কী করে ? ঘটাল কে ? ঘটাল গৌরী। ঘটল তাঁর বংশরক্ষায়।

মুক্তির দীপশিখা কিন্তু সমান অনির্বাণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে আপস করলেও ওই একটি ক্ষেত্রে গৌরী আপসহীন। স্বাধীনতা ওর চাই-ই চাই। না পেলে ও জীবন রাখবে না। স্বাধীনতা বলতে প্রেমের স্বাধীনতাও বোঝায়, নইলে তেমন স্বাধীনতার মূল্য কী ? শুধুমাত্র পর্দার বাইরে যাবার স্বাধীনতা নিয়ে ও তৃপ্ত নয়। ইতিমধ্যেই সেটা ওর করতলগত হয়েছে। চিকের আড়াল থেকে ও বেরোবার অনুমতি পেয়েছে।

"তোমার মুক্তিতে আমি কি কোনোদিন বাধা দিয়েছি ?" যশোবাবু বলেন। "বাধা দিয়েছে সমাজ। লড়তে চাও সমাজের সঙ্গে লড়বে। আমার সঙ্গে কেন ?"

গৌরী বলতে পারত, কিন্তু বলে না যে মুক্তি বলতে বিবাহের থেকে মুক্তিও বোঝায়। বিবাহের বাইরে যাবার স্বাধীনতাও তার মধ্যে পড়ে। তার মন এখনো বিবাহের থেকে মুক্তির জন্যে প্রস্তুত নয়। বিবাহ যে একটা স্যাক্রামেন্ট। তবে বিবাহের বাইরে যাবার নজীর অনেক আছে। সমাজের চোখে ধূলো দিতে জানলে সমাজ কিছু বলে না। প্রকাশ্যে না করলে বুক ফুলিয়ে না করলে সমাজের কাছে সাত খুন মাফ। গৌরী কিন্তু যা করবে জানিয়ে শুনিয়ে করবে।

স্বামীকে একদিন বলে, "আমি আরেকজনকে ভালোবাসি।"

"সেটা আমার অজানা নয়। আমি চোখ বুজে থাকি বলে অন্ধ নই। আর একজনকে ভালোবাসা পুরুষের বেলা যদি অপরাধ না হয় তো নারীর বেলাই বা অপরাধ হবে কেন ? তুমি যাকে খুশি ভালোবাসতে পারো। তবে হৃদয়ের ধন হৃদয়ে গোপন থাকলেই আর কারো চোখে পড়ে না। চোখে পড়লেই কথা ওঠে। সমাজই দুষবে, আমি নয়। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আমি সহনশীল।" যশোবাবু নির্বিকার।

"তা যদি বল আমিও কি কম সহনশীল ? আমি ওর চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করেছি। তুমি তো হৃদয়ের ধন হৃদয়ে গোপন রাখনি। পরকীয়ার সঙ্গে স্বকীয়ার মতো আচরণই করেছ। আমি যদি ততদূর যেতুম তুমি ক্ষমা করতে ?" গৌরী বাজিয়ে দেখে।

"না, ততদূর আমার সহ্য হত না।" যশোবাবু কবুল করেন। "পুরুষেরা যতদূর গেলে ক্ষমা পায় মেয়েরা ততদূর গেলে ক্ষমা পায় না। মেয়েরাই মেয়েদের ক্ষমা করে না। তোমার সখীরাও তোমাকে ক্ষমা করবেন না। সমাজের একটি মেয়েও যদি তোমাকে ক্ষমা করে আমাকে তার নাম বললে আমিও তোমাকে ক্ষমা করব।"

"ধন্য তুমি ! কিন্তু আমিও কারো চেয়ে কম কঠোর নই। কোনো মেয়ে যদি ততদূর যায় আমিও কি তাকে ক্ষমা করি নাকি ?" গৌরী স্বীকার করে।

প্রেমের বহ্নিও সমান অনির্বাণ। স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে বলে যে রত্নর উপর টান শিথিল হয়েছে তা নয়। মাতৃত্বও সে আবেগের সমকক্ষ নয়। তবে মাতৃত্ব এসে এমন একটা স্থিতি দিয়েছে যে গতি তাকে টলাতে পারে না। গৌরী ওর ছেলেকে বুকে চেপে ধরে বলে, "তোকে ফেলে কোথাও যেতে পা সরে না, সোনা। তুই যেখানে আমিও সেখানে।"

আবার অবিকল সেই কথারই পুনরুক্তি করে চিঠিতে। রত্নকে আশ্বাস দিয়ে বলে,

"তোকে কি আমি ছেড়ে থাকতে পারি, ধন ? যেখানে তুই সেখানেই আমি।"

একজনকে না ছাড়লে যে আরেকজনকে পাওয়া যায় না, এটা কি ও বোঝে না ? ওর বুদ্ধি বোঝে, কিন্তু ওর মন বোঝে না। তবে কি ওর ধারণা ছেলেকে নিয়ে ও রত্নর সঙ্গে থাকবে ? না, সে ধারণা ওর নেই, কোনোদিন ছিল কিনা সন্দেহ। ছিল জ্যোতির, ছিল রত্নর। ওরাই অবাস্তববাদী। গোরী নয়। গোরী পারলে ওর ছেলেকে কৃষ্ণনগরে রেখে যেত। বম্বে নিয়ে যেত না। বিলেতেও না।

ছেলেকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় গোরীতে আর যশোবাবুতে। দিনের মধ্যে দশবার উনি ছেলেকে দেখতে আসেন আর কোলে নেন। ও যে যক্ষের ধন। তেমনি রাতের বেলা ওকে মাঝখানে রেখে শোওয়া হয়। গোরী ঘুমিয়ে পড়লেও উনি জেগে থাকেন। ছেলে কেঁদে উঠলে ওকে বুকে করে পায়চারি করেন, যতক্ষণ না ওর কান্না থামে আর ঘুম আসে। ওর ময়লা কৌপীন বদলে দেন। ভিজে কাঁথা সরিয়ে শুকনো কাঁথা পাতেন। এর জন্যে কোনো অভিযোগ করেন না। বরঞ্চ এতেই তাঁর পরিতোষ।

"বাপ তো নয়, মা-বাপ !" গোরী তারিফ করে বলে। "অমন করে মানুষ করলে ও পরম পিতৃভক্ত হবে। মার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

"মা যদি ওর দিকে ফিরে না তাকায় তা হলেও ওর কোনো অসুবিধে হবে না।" যশোবাবু হেঁয়ালির মতো করে বলেন।

"তুমি কি অনাগতবিধাতার মতো এখন থেকে সেই ঘটনার জন্যে তৈরি হচ্ছ নাকি ?" গোরী চমকিত হয়।

"হব না ? আরো একজন তৈরি হচ্ছেন যে !" যশোবাবু ইঙ্গিত করে হাসেন।

"কোথায় শুনলে ? কে বলল ওকথা ?" গোরী বিব্রত হয়ে বলে।

"সবাই জানে। তুমিই একে তাকে ওকে বলে বেড়াও। আমার নামে বেনামী চিঠি আসে। আমাকে সাবধান করে দেয়। তা তুমি যদি উড়তে চাও তো উড়তে পারো, কিন্তু তোমার অভাবে কারুর কোনো কষ্ট হবে না, পরী।"

বত্রিশ

গোরী এতদিন যশোবাবুর দিক থেকে ভাবেনি। এখন ভাবে। সত্যি, লোকটা খুব খারাপ নয়। বরং বেশ দুঃখী। ওঁর স্ত্রী ওঁর দুঃখ বোঝে না, বোঝে সুধা। সুধাও তো দুঃখিনী। অকাল-বিধবা। দুঃখীর সঙ্গে দুঃখিনীর একটা সমব্যথার ডোর ছিল। ওটা ঠিক প্রণয়ের ডোর নয়।

আগেকার দিনে একটা প্রবাদ ছিল যে, বিলেতে যেই যায় সেই ব্যারিস্টার হয়। যশোবাবু স্বপ্ন দেখতেন যে তিনিও একদিন বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবেন ও কলকাতা হাইকোর্টে পসার জমিয়ে ইঙ্গবঙ্গ সমাজে বিবাহ করবেন। উনি তো বংশের বড় ছেলে নন যে ওঁর উপর জমিদারি দেখাশুনার ভার বর্তাবে। বেগমপুরে থাকবেন

ওঁর দাদা জীবনমাধব। বাবা জগমাধবও যশোবাবুকে নিরুৎসাহিত করেননি, তবে একটি জায়গায় তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল। বিলেত যাবার আগে বিয়ে করে যেতে হবে। তিনি যাকে মনোনয়ন করবেন তাকে।

মুর্শিদাবাদের এক মুর্শিদজাদা বিলেত যাচ্ছিলেন। প্রস্তাবটা তাঁর তরফ থেকেই আসে যে যশোবাবু যদি তাঁর সহযাত্রী হন পাথেয় তিনিই বহন করবেন। তা ছাড়া লণ্ডনে ভর্তির ব্যাপারেও তিনি সহায়তা করবেন। এমন মওকা দু'বার মেলে না। যশোবাবু যাবার জন্যে তল্পিতল্পা বাঁধতে বসলেন। বিয়ে ! বিয়ের জন্যে সময় কোথায় ! আর করতে চাইলেই বা পাত্রী কোথায় ! জগমাধববাবু মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে অশেষবাবুর কন্যা শ্রীমতীর সঙ্গে যথাকালে যশোবাবুর বিবাহ দেবেন। কিন্তু সে মেয়ের বয়স তো আট কি নয়। এই মুহূর্তে ওর বিয়ে দিতে ওর মা বাপের আপত্তি। বিশেষত ওব মা একজন আধুনিকা। তিনি চোদ্দ বছর বয়সের আগে ওর বিয়ে দেবেন না। ততদিনে যশোবাবুর চব্বিশ পঁচিশ বছর বযস হয়ে থাকবে। তিনি যে কোনো একটি পেশায় সেটলড হয়ে থাকবেন। বিলেত যাওযার তাগিদে যশোবাবুকে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে বিযে দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ মহাযুদ্ধ বেধে যাওযায় তাঁব বিলেত যাত্রা তখনকাব মতো স্থগিত থাকে। কী জানি কী কারণে তাঁর সেই বৌ আত্মহত্যা করে। বিপত্নীক যশোবাবু ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় যুদ্ধকালটা দেশে কাটিয়ে দেন। যুদ্ধশেষে গোরীব সঙ্গে তাঁর বিয়ে। তারপর মুর্শিদাবাদের সেই মুর্শিদজাদার সঙ্গে তিনি বিলেত যাত্রা করেন। নাচগান পানভোজন খেলাধূলা ঘোড়ায় চড়া ও শিকার হয়তো নবাব জমিদারেব শিক্ষার অঙ্গ কিন্তু ব্যারিস্টার হতে চাইলে আরো কিছু করতে হয়, তার নাম বছরে চারবার বার ডিনার খাবার পব পরীক্ষায় বসা। সে কার্যে অনবধান হলে নবাব ঘরানার কিছু আসে যায় না, ওঁকে তো সত্যি হাইকোর্টে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে না। কিন্তু যশোবাবুর কথা আলাদা। ওইটুকু জমিদারি দুই ভাইয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

যশোবাবুর দাদা জীবনমাধব যুদ্ধকালে বাঙালী রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেন। তখন থেকেই তাঁর মার মন ভেঙে যায়। যশোবাবু বিলেতে থাকতেই তাঁর মার মরণাপন্ন অবস্থার বার্তা পান। যশোবাবু ফিরে এলেন, কিন্তু মাকে দেখতে পেলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা শেষ করবেন, পরীক্ষা দেবেন, বার-এ কল্ড হবেন। এ জীবনে বি-এ তো হলেন না। বার-অ্যাট-লও কি হবেন না ? তা হলে তিনি হবেন কী ? পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদে জমিদার ?

পুত্রশোকাতুর পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়া ও দাদার স্থলবর্তী হয়ে সেরেস্তা দেখা এই গুরুভার কাঁধে নিয়ে তিনি আর বিলেত যাবার জন্যে ফাঁক পান না। যাক, পুরো খরচপত্র করে আবার একদিন যাবেন। পরে যে কোনো এক সময় গিয়ে পরীক্ষা দিলেই চলবে।

রয়ে গেলেন যশোবাবু সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু ঘটে গেল আরো একটি দুঃখকর ঘটনা। জগবাবু পত্নী বিরহ সহ্য করতে না পেরে আর একটি বিয়ে করে বসলেন।

কিন্তু বিলেত যাত্রার নাম মুখে আনতেই বাবা বলেন, "তা কি হয় ! ওইটুকু কচি বউকে ফেলে তুই সাত সমুদ্দুর পারে যাবি ? আরো কিছুদিন যাক। ওর ছেলেমেয়ে

হোক। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো ওকে।"

কাজেই যশোবাবুর সাগর পারে যাওয়া পেছিয়ে গেল অনির্দিষ্টকাল। কবে ছেলেমেয়ে হবে, তারপরে তিনি ছুটি পাবেন। ছেলেমেয়ের জন্যে তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই বেধে গেল আড়াআড়ি। স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্যে সবুর করতে হয়। গৌরীকে সময় দিলে সে হয়তো মনে মনে প্রস্তুত হতো। যশোবাবু তাঁর ব্যারিস্টারির দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে কেবলি হম্বিতম্বি বা হাহুতাশ করেন। আর গৌরী দিন দিন বিমুখ হয়।

ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলেছিল সুধার সঙ্গে যশোবাবুর রসের সম্পর্ক। কাছাকাছি বয়স বলে ওদের ভিতর একটা স্বাভাবিক সখ্য ছিল। গৌরীর আবির্ভাবের পূর্বে দু'জনে দু'জনাকে একান্ত অন্তরালে পায়। বয়সের ধর্ম প্রবল হয়। যা ঘটবার তা ঘটে যায়। একদিন গৌরী এসে জবাবদিহি চাইবে এতটা তো তখন কেউ ভাবেনি। গৌরী এসে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে না। যখন বোঝে তখন অনমনীয় হয়। কাউকেই ক্ষমা করে না। না যশোবাবুকে, না সুধাকে। অথচ আত্মরক্ষার খাতিরে উভয়কে প্রশ্রয় দেয়। সে যেন দেখেও দেখতে পায় না, থেকেও নেই।

বিবাহে ওর একেবারেই রুচি ছিল না। বিশেষ করে অচেনা অজানা একজন পাত্রের সঙ্গে তো নয়ই। এমন কী গুণবান পাত্র! রূপবানই বা কিসের!

তবে হাঁ, ব্যারিস্টার হলে বরণীয় হতো। কিংবা পুলিস বা মিলিটারি অফিসার হলে। অন্ততপক্ষে ডাক্তার হলে। তা তো নয়। পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদে জমিদার। কাটাতে হবে সারাজীবন এরই সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের ভাঙা অট্টালিকায়। যেখানে দিনে দুপুরে শেয়াল ডাকে। বরও যেমন পছন্দ নয়, ঘরও তেমনি পছন্দ নয় ও মেয়ের। কোনো দিন পছন্দ হবেও না। এ বিবাহ বাতিল করতেই হবে। এ জীবন নতুন করে আরম্ভ করতেই হবে। মিথ্যার জন্যে আত্মত্যাগ করাও মিথ্যা। গৌরী তা করতে রাজী নয়।

কোথায় কলকাতা হাইকোর্টের উচ্চ ব্যারিস্টার আর কোথায় বেগমপুর এস্টেটের তুচ্ছ শরিক! যশোবাবুর আত্মকরুণার অবধি ছিল না। বন্ধুবান্ধবের কাছে আফসোস করেন, "আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়, তাই ভাবি মনে। দেশে থাকলে বহরমপুর থেকে বি-এ পাশ করে, কলকাতা থেকে এম-এ আর বি-এল পাশ করে বহরমপুর বার-এই জাঁকিয়ে বসতুম। পরে এক সময় লণ্ডনে গিয়ে বছরখানেক থেকে বার-অ্যাট-ল হয়ে ফেরা যেত। তখন বসা যেত কলকাতায়।"

তবে স্বভাবতই তিনি রিয়ালিস্ট। বাবা যতদিন না অনুমতি দিচ্ছেন ততদিন আবার বিলেত যাবার কথা ওঠে না। এবার গেলে সস্ত্রীক ও সপুত্রক যাবেন। তা হলে হয়তো গৌরীরও পালাই-পালাই ভাবটা কেটে যাবে। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় যশোবাবুই ঘটিয়ে দেবেন। রত্নর দরকার হবে না। এখন বুড়োর মর্জি হলে তো? হতে পারে, যদি যশোবাবু জমিদারির একটা সুব্যবস্থা করতে পারেন। দেখাশুনার অভাবে যেন সম্পত্তি নষ্ট না হয়ে যায়। যেমন মাইকেলের বেলা হয়েছিল।

আপাতত গৌরীকে শহরের স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্যে তিনি বহরমপুরের বাসা-বাড়ীটাকে বসতবাড়ীতে পরিণত করতে চান। বেশীর ভাগ সময় সেইখানেই থাকবেন

ও অনরারি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য করবেন। ইতিমধ্যেই তাঁকে ও পদের জন্যে মনোনীত করে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যাঁর দাদা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাঁর কাছে সরকার ঋণী হয়ে রয়েছিলেন। কিন্তু বহরমপুরে প্রত্যেক সপ্তাহে দু'তিনবার যাতায়াত করতে তাঁর অভিরুচি ছিল না। না গেলেও আবার কর্তব্যহানি। স্ত্রীপুত্র নিয়ে বহরমপুরে বসবাস করতে হলে একটা উপলক্ষ চাই তো। যশোবাবু ভেবে দেখেছেন যে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট পদটাই তাঁর উপযুক্ত উপলক্ষ। যদি না দেশের ছেলেদের জেলে পুরতে হয়। এই নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। ওঁরা তাঁর এজলাসে পলিটিকাল কেস পাঠাবেন না। তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

হোক না অনারারি, তবু তো ম্যাজিস্ট্রেট। পাঁচজনের একজন। ক্লাবের মেম্বর। নানান কমিটির সভ্য। গোরী যদি শহরে গিয়ে বাস করতে রাজী হয় তবে দেখবে তার স্বামী একজন নামী লোক।

তেত্রিশ

চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া যেন নিঃশ্বাস নেওয়া ও প্রশ্বাস ফেলা। গোরী ও না হলে বাঁচতে পারে না। রত্নও কি পারে ? এক এক সময় মনে হয় ওদের ভালোবাসা চিরদিন ওই স্তরেই নিবদ্ধ থাকবে। ওই চিঠি দেওয়া নেওয়ার স্তরে। মাঝে মাঝে এক আধবার চোখাচোখি হবে। ভাগ্যে থাকলে চুম্বন বিনিময়। ওর বেশী কোনোদিন নয়।

অথচ রত্ন মনে মনে একশরণ ব্রত নিয়েছে। গোরীই তবে তার জীবনের একমাত্র নারী, যে নারীর কাছে পুরুষ সব কিছু প্রত্যাশা করতে পারে। তবে একটি ক্ষেত্রে সে অপরজনের জন্যে স্থান রাখতে চায়। সেটি হলো বিশুদ্ধ বন্ধুতার ক্ষেত্র। সেখানে থাকবে মালাদি, সেখানে থাকবে সেবা। তেমনি আরো অনেকে। বন্ধুতার কি সীমা আছে না শেষ আছে ! কাল আছে না দেশ আছে ! যেমন পুরুষ বন্ধুর বেলা তেমনি নারী বন্ধুর বেলা রত্ন চায় অবাধ পরিসর। কিন্তু প্রেমের বেলা সে একজনের কাছে বাঁধা থাকতে রাজী। সেই একজন হচ্ছে গোরী। সেই হবে তার গৃহিণী সচিব অন্তরঙ্গ সখী। তার সন্তান-জননী।

একদা সে গোরীর প্যাশনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। এখন তার নিজের ভিতরেও প্যাশন সঞ্চারিত হয়েছে। গোরী তার আঁচ পেয়ে শঙ্কিত। রত্ন তা শুনে লজ্জিত। গোরী যদি তার বান্ধবী হয়েই ক্ষান্ত হতো তবে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু তার সঙ্গিনী হলে ? একদিন না একদিন সেই আগুনের সম্মুখীন হতে হবে যে-আগুন জ্বলছে তারায় তারায় নক্ষত্রে নীহারিকায়। রত্নও কি একটি জ্যোতিষ্ক নয় ? গোরীও কি তাই নয় ? মা হয়েছে বলে কি তার জ্বালা নিভে গেছে ? সে কি এখন পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ বা চাঁদের মতো উপগ্রহ ?

তবে এটাও ধীরে ধীরে অনুভব করে রত্ন যে, রাধা কেমন করে মাডোনা হয়ে

গেছে। গোরীর মাতৃমূর্তির আলোকচিত্র রাফেলের আঁকা সিস্টিন ম্যাডোনার ভাব মনে আনে। এই মাতৃরূপিণী নারীর দিকে তাকিয়ে রাধাভাব যদি কারো মনে জাগে তবে তার লজ্জিত হওয়াই উচিত। লজ্জায় নীরব থাকাই শ্রেয়। রত্ন আর ও প্রসঙ্গে একটি কথাও লেখে না। কিন্তু একবার যে লিখেছে তাইতেই গোরীর দেহে মনে ত্রাস লাগিয়ে দিয়েছে। গোরী এখন ওকে ডরায়। কথাটা ফিরিয়ে নেবারও উপায় নেই। ঢিল ছুঁড়লে হাতে ফিরে আসে কি ?

পরস্পরকে ভালোবাসলে পরস্পরের দেহ মনেরও খোঁজ খবর জানতে হয়। রত্ন বিদেহী প্রেমিক নয়। সেও একটুকরো আগুন। যদিও ছাইঢাকা। জানুক গোরী এই সত্য। সত্যের সঙ্গে সত্যের বোঝাপড়া হোক। সম্বন্ধটা যদি হয়ে থাকে সম্ভবপর পতিপত্নীর তবে আগুনকে কেন সত্তার ভয় ! সত্তাই যে আগুন দিয়ে গড়া। তবে কি ওরা চিরন্তন বান্ধববান্ধবী ? তা যদি হয় রত্নকেও তার মুক্তির কথা ভাবতে হবে। মুক্ত হয়ে অন্য নারীর সঙ্গ পেতে হবে। অপরার সঙ্গে মধুর রসের আস্বাদন নিতে হবে।

ইতিমধ্যেই সে গোরীকে তার স্ত্রী বলে কল্পনা করতে আরম্ভ করেছিল। কল্পনাটা একতরফা। গোরী আর রত্নই যেন স্বামী-স্ত্রী। যশোবাবু কেউ নন। তা বলে তাঁর ছেলেটিকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে ছেলে গোরীরও ছেলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রত্নই কেউ নয়। সে কেবল কল্পনাই করতে পারে। বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

গোরী যদি ওর বউ হয় তবে গোরীর সন্তান ওরও সন্তান। এর মধ্যেই তার প্রতি ও একপ্রকার বাৎসল্যভাব অনুভব করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কোন প্রাণে গোরী ওকে পেছনে ফেলে আসবে। সঙ্গে করে আনতে চাইলেই বা আনতে দিচ্ছে কে ? যশোবাবু কি অমনি ছেড়ে দেবেন ? তিনি যেমন পুত্র-অন্ত প্রাণ।

গোরীকে ভালোবাসতে বাসতে রত্ন ওর ছেলেকেও ভালোবেসেছে। তা বলে গোরীর উপর যেমন দাবী ওর ছেলের উপরও কি তেমনি দাবী ? না, রত্ন ওকে যতই ভালোবাসুক না কেন ওর বাপের মতো ভালোবাসতে পারে না, ওর বাপের স্থান পূরণ করতে পারে না। তেমন দাবী করা সাজে না। ভালোবাসতে চায় ভালোবাসুক, কিন্তু কোনোদিন যেন কল্পনাও না করে যে গোরীর ছেলে ওকে নিজের বাপের জায়গায় বসাবে। বাপের টান যেমন ছেলের প্রতি, ছেলের টানও তেমনি বাপের প্রতি। প্রকৃতি এ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে, তাই এ সম্পর্ক প্রেমের চেয়ে নিত্য। নরনারীর প্রেমে জোয়ার আছে ভাঁটা আছে। কিন্তু পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপরিবর্তনীয়।

এমনি করে রত্নর অলক্ষিতে ওর অন্তরে সন্তানক্ষুধা জন্মায়। ওরও একটি সন্তান চাই, যে একান্তভাবে ওর আপনার, যার সঙ্গে ওর সম্পর্ক প্রকৃতির সৃষ্টি, সুতরাং নিত্যকালীন। ওর সন্তানের মা হবে কে ? কে আবার ? ওর গোরী। ওর একমাত্র নারী। সন্তানের জন্যে ও অন্য নারীর কাছে যাবে না। অন্য নারীকে বিবাহ করবে না। বিবাহ যদি করে তবে ওই গোরীকেই। সন্তানের পিতা যদি হয় তবে ওই গোরীর প্রসাদেই। এখন গোরী সম্মত হলেই হয়। কে জানে ! ও মেয়ে কি সত্যি রাজী হবে ! কিন্তু এখন

থেকে ওসব কথা কেন ? আগে তো ওর বন্ধনমোচন হোক।

লিখবে কি লিখবে না করতে করতে একদিন লিখেই ফেলে রত্ন। ওর মনের সাধ কি কোনোদিন মিটবে না ? কী সাধ ? ও চায় একটি ছেলে কি মেয়ে। এমন কোনো নারী কি এ জগতে নেই যে স্বেচ্ছায় ওর সন্তানের মা হবে, ওকে তার সন্তানের পিতারূপে. মনোনয়ন করবে ? ওদের দুজনের সন্তান হবে প্রেমের সন্তান, নিছক আনুষ্ঠানিক বিবাহের উৎপাদন নয়।

রত্ন সোজাসুজি জানতে চায়নি গোরী সেই নারী কি না। তা হলেও তীরটা লক্ষ্যভেদ করে। গোরী আরো আতঙ্কিত হয়। প্যাশন যত না ভয়ঙ্কর মাতৃত্ব তার চেয়ে বেশী। রত্ন কেন বুঝতে পারে না যে প্রেমের সম্বন্ধ মাঝখানে থাকলেও সম্মতি দেওয়া সহজ নয়। গোরীই বোঝে ওতে যন্ত্রণার ভাগ কত আর সুখের ভাগ কত। আবার সেই যন্ত্রণা ! না, না, এত শীগগির নয়। পরে হয়তো দেহ মন অনুকূল হবে। তার আগে চাই বন্ধনমোচন। নতুন করে বন্ধনস্বীকার যখন হবার তখন হবে। আপাতত চিন্তাও করা যায় না। এখনকার একমাত্র ধ্যান কবে মুক্তি, কেমন করে মুক্তি।

"আমার সমস্যা আরো জটিল হয়েছে, সোনা।" গোরী লেখে, "ইংরেজ সরকার যখন জোর জুলুম করে পারে না তখন শাসন সংস্কারের প্রলোভন দেখায়। আমাদের বাবুরা নির্লজ্জের মতো টোপ গেলেন। তেমনি আমার মালিকের পলিসি একবার গরম তো একবার নরম। এবার উনি ক্ষেপেছেন আমাকে খুশি করতে। আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ওঁর দিবারাত্র ব্যস্ততা। ওঁর আন্তরিকতা সত্যি আমাকে স্পর্শ করে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা তো আমাকে সোনার খাঁচায় আটক করে রাখা। লোহার না হয়ে সোনার বলে কি ওটা খাঁচাই নয় ? আমি যে খাঁচার পাখিই ছিলুম সেই খাঁচার পাখিই আছি। ওঁর অভিলাষ যদি পূর্ণ হয় তবে সেই খাঁচার পাখিই থাকব। হায়, মুক্তির আনন্দ একবার যদি প্রাণভরে আমি পেতুম ! তা হলে কি এই সোনার খাঁচার দিকে একদিনও ফিরে তাকাতুম। ওঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী আমি নই। হতেও পারব না আর এ জীবনে। কিন্তু ও কথা যদি মুখ ফুটে বলি উনি নিদারুণ আঘাত পাবেন। এখন দেখছি সুধাই ছিল ওঁর প্রকৃত সঙ্গিনী। সুধার অভাব কি আমি পূরণ করতে পারি ! ওঁর সাধ্যসাধনা বৃথা। কিছুতেই ওঁর সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারব না। খাঁচাটা সুধাকেই দিয়ে যাব ভাবছি। কে একজন অচেনা মানুষ এ বাড়ীর নতুন বউরানী হয়ে আসবে, তার চেয়ে চেনা মানুষই ভালো। সুধার জন্যে আমার দুঃখ হয়, মানিক। ওর না আছে স্বামী, না পুত। তবু লিখতে পারিনে যে, দিদি, ফিরে আয়। লিখতে বাধে।"

কেন বাধে রত্ন জানতে চায় না, ওদের ব্যাপার ওরাই বুঝুক। রত্ন কোথাকার কে। অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে ওভাবে জড়িয়ে পড়তে ওর অন্তরের আপত্তি। গোরী ভিন্ন আর কেউ ওর আপনার নয়। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল কি শিষ্ট ? রত্ন কখনো যশোবাবুর প্রসঙ্গে একটি কথাও লেখে না। সব সময় এড়িয়ে যায়। তবে ছেলের প্রসঙ্গে লেখে। ছেলে যে গোরীরই অঙ্গ। গোরী যদি তার আপনার হয়ে থাকে তো ওর ছেলেও আধখানা আপনার। তা হলেও বাপের মতো দরদ দেখাতে যায় না। পাছে কেউ বলে, মায়ের

চেয়ে মাসীর বেশী দরদ।

আসলে হয়েছিল এই যে মা হবার পর থেকে গোরী একধাপ এগিয়ে রয়েছিল। রত্ন তো বাপ হয়নি, সে কেমন করে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে ? মিলিয়ে নিতে হলে তাকেও বাপ হতে হবে। পরের ছেলের নয়, নিজের ছেলের বাপ। কিন্তু কেউ তার ছেলের মা হতে রাজী থাকলে তো ?

তা ছাড়া সে নিজেও প্রস্তুত নয়। হবেও না বহুদিন। তার মন প্রস্তুত নয়, প্রস্তুত হতে সময় নেবে। তার আর্থিক প্রস্তুতিও নেই। সেটাও সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া সে স্বাধীন থাকতে চায়। অমন করে জড়িয়ে পড়লে স্বাধীনতা হারাবে। গোরীর যেমন মুক্ত হবার জন্যে ব্যাকুলতা রত্নরও তেমনি মুক্ত থাকার জন্যে আকুলতা। বিবাহই যথেষ্ট বন্ধন, সন্তান হলে তো আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধন।

স্বাধীন থাকতে হলে গোরীর মতো সসন্তান হওয়া নয়, ওর অনুসরণ করা নয়। বরং ঠিক উল্টো। তবু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে গোরী মা হয়েছে, রত্ন বাপ হয়নি, অভিজ্ঞতা দু'জনের সমান্তরাল নয়। গোরী ওর পুত্রমুখ দেখে যা আস্বাদন করছে রত্ন তার ভাগ পাচ্ছে না। ভাগ পাচ্ছেন যশোবাবু। ধন্য তিনি।

যশোবাবুকে সে ঈর্ষা করে না। সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তিনি যদি গোরীকে ওর মুক্তির স্বপ্ন ভুলিয়ে দিতে পারেন তবে সে নির্বিবাদে দূরে সরে যাবে। দূর থেকে ভালোবাসবে। ভালোবাসতে তো কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। তেমনি গোরী যদি মনে মনে ভালোবাসতে চায় ভালোবাসতে পারবে। তখন সেই ভালোবাসার সঙ্গে মুক্তির প্রশ্ন জড়িয়ে থাকবে না। একজনকে উদ্ধার করার জন্যে আরেকজনকে আদা নুন খেয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না, প্রতিযোগিতায় নামতে হবে না, পরধর্ম বরণ করতে হবে না।

পরকীয়াকে স্বকীয়া করা হয়তো তত কঠিন নয়, কিন্তু পরধর্মকে স্বধর্ম করা একান্ত কঠিন। রত্নর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে জীবিকার পেষণে। যে জীবিকা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এ জীবিকা ত্যাগ না করলে সে বাঁচবে না। তাই যদি হয় তবে আদৌ গ্রহণ করাই বা কেন ? একজনের মুক্তির জন্যেই তো।

চৌত্রিশ

অনেকদিন বাদে কাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এসেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় মেয়ে দেখতে। জানে প্রথাটা ভালো নয়, মেয়েদের পক্ষে অমর্যাদাকর। তবু ও ছাড়া উপায় কী ? রত্নর মতো সবাই তো নয় যে প্রেমে পড়ে বিয়ে করবে।

কানন হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে সকলের বিশ্বাসভাজন। গোরী তো ওকে বিশ্বাস করেই, যশোবাবুও করেন। স্বহস্তে ওর চুরুট ধরিয়ে দেন। নিজের দেওয়া চুরুট।

"যশো-দার এখন সুদিন যাচ্ছে, রতন।" কানন বলে। "ছেলেটি পয়মন্ত।"

"হাঁ, শুনেছি উনি নাকি প্রথম শ্রেণীর অনাহারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।" রত্ন পরিহাস করে।

"না না, তামাশার কথা নয়। চার বছর আগেই যাঁর ব্যারিস্টার হবার কথা আজ তিনি হচ্ছেন কিনা অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট উইথ ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার্স। তুমি বলবে কমিক, আমি বলব ট্র্যাজিক। অথচ এ না হলে ওঁর পুনর্বাসন হয় না। এমনি করে মাটি ধরে ধরেই ওঁকে উঠতে হবে। চলি চলি পা পা।" কানন উৎসাহের সঙ্গে বলে।

"আমি কিন্তু তামাশা করিনি, ভাই। আমারও সহানুভূতি আছে।" রত্ন আশ্বাস দেয়।

"এই ক'টা দিনেই ভদ্রলোকের চেহারা ফিরে গেছে, রতন। দেখলে মনে হয় একজন ভেরি ইম্পর্টান্ট পার্সন। বলেন, আমরা ক'জনাই এ জেলার আইন ও শৃঙ্খলার মা-বাপ। আমরা যাঁদের ম্যাজিস্টেরিয়াল পাওয়ার্স আছে।"

ছেলের বাপ হতে না হতে জেলার মা-বাপ। কী অসামান্য প্রগতি! রত্ন কি হাসতে পারে! গম্ভীর মুখে বলে, "কথাটা ভুল নয়।"

"আসলে ব্যাপারটা কী, জানো?" কানন কানে কানে বলে, "তুমি পাশ করলে যা হবে তা উনি আগে ভাগেই হয়ে রইলেন। একই পদে নয় অবশ্য। তবু তো বলতে পারবেন যে উনিও একজন হর্তা কর্তা বিধাতা। পারুলদির চোখে যাতে খাটো না হন। তা ছাড়া আরো কথা আছে। ওটা ওঁর জীবনেরও একটা কামনাপূরণ। সেদিন বলছিলেন, দ্যাখ হে, কোর্ট ভিন্ন আমার গতি নেই। একভাবে না একভাবে সেখানে আমাকে পৌঁছতে হতোই। ব্যারিস্টার হয়ে পরে হাইকোর্ট বেঞ্চে না হোক ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বেরহামপুর বেঞ্চে। অনরারিই ভালো। লোকে বুঝুক যে টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যায় না। আমি কারো মাইনে করা চাকর নই। যে কোনোদিন আমি ইস্তফা দিয়ে বেবিয়ে আসতে পারি। আমি কারো সাবর্ডিনেট নই যে সাহেবদের মন রাখা রায় দেব।"

রত্ন বুঝতে পারে ওটা ওরই উপর কটাক্ষ। কী করবে! হজম করে।

"তা পদটার সত্যি দাম আছে। তা না হলে এক লোন কোম্পানী ওঁকে চেয়ারম্যান করে কেন? অবশ্য ওঁকেও কিছু ইনভেস্ট করতে হলো। কোর্ট আর কোম্পানী করতে ঘন ঘন সদরে আসতে হয় বলে বহরমপুর শহরে ওঁর নতুন ইমারত উঠছে। সেইখানেই বেশীর ভাগ সময় কাটাবেন। পারুলদিও পাড়াগাঁয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। ওর মুক্তির আধখানাই তো পাড়াগাঁয়ের হাত থেকে মুক্তি। বাচ্চাকে ও পাড়াগাঁয়ে মানুষ করতে চায় না। যশো-দাও এ বিষয়ে একমত।" কানন বলে যায়।

"ভালোই তো।" রত্ন আর কী বলতে পারে! "অমনি করে যদি ওর মুক্তির বাকী আধখানাও মিটে যায় তা হলে আমারও ছুটি। আমি এই দুঃসাধ্য সাধনের দায় ঘাড়ে নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছি, ভাই।"

রত্নের আত্মবিশ্বাস যদিও টনটনে তবু ব্যর্থতার আশঙ্কাও ছিল পদে পদে। তখন গৌরীর জন্যে আর কী করতে পারে সে? কেই বা আছে তার সহায়? জ্যোতিদা তো পাশ কাটাল। গৌরী যদি আপনি আপনার ভার নিতে পারত তা হলে সে-ই সব চেয়ে ভালো হতো না কি?

"তুমিও কি জ্যোতিদার মতো পাশ কাটাতে চাও রতন?" কানন শুনে বলে। "ও বেচারির দিকটা কি ভেবে দেখবে না?"

"কেন, ওর ভালোর জন্যেই তো ওকথা বলেছি।" রত্ন জবাবদিহি করে।

"ওকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ খুশি। বেগমপুর থেকে বহরমপুর ওর পক্ষে একটি প্রতিশ্রুতিময় পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়। যশোদা তো ওকে বিলেত নিয়ে যাবার অঙ্গীকারও দিয়েছেন। যাবেন উনি পরীক্ষা দিয়ে কল্‌ড টু দি বার হতে। এটুকু কবে সারা হবার কথা! কেন হয়নি সেইটেই আশ্চর্যি। স্ত্রীকে একা ফেলে যাবেন না এটাই বোধ হয় কারণ। অথচ সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও বারণ। পথি নারী বিবর্জিতা। ও অনুশাসন লঙ্ঘন করবার মতো সাহস এতদিন ব্রাহ্মিকাদেরই ছিল। ইদানীং হিন্দুর ঘরের মেয়েরাও কালাপানি পার হতে এগিয়ে আসছেন।" কানন দুটি একটি দৃষ্টান্ত দেয়।

"হোক, হোক, তাই হোক। গোরী ওর স্বামীর সঙ্গেই বিলেত যাক। সেইভাবেই ষোল আনা মুক্ত হোক।" রত্ন অকপটে বলে। যদিও ব্যথিত সুরে।

"তাই যদি সম্ভব হতো তা হলে ও অন্তরে অন্তরে অসুখী হতো কেন?" কানন বলে। "ও চায় শিক্ষিতা হতে, স্বাবলম্বী হতে। তারপর নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে। ও চায় ঘরসংসার নয়, সন্তানবৃদ্ধি নয়, কমরেডশিপ বা কম্পানিয়নশিপ। যশোদার সাধ্য কী যে উনি ওকে সব রকমে সুখী করেন। সেই জন্যেই তো ও তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে। তুমিই পারবে। উনি পারবেন না। তবে তোমার সঙ্গে টক্কর দেবার চিন্তা যে ওঁকে বিলেতের দিকে টানছে এটা সুলক্ষণ। উনি যদি ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেন তবে উনিও নতুন করে জীবন আরম্ভ করবেন। বেগমপুর তো একটা পচা ডোবা। ডোবার ব্যাঙ যতই ফুলে উঠুক না কেন ব্যাঙ ছাড়া আর কিছু নয়। যে অমন সুন্দর বেহালা বাজাতে পারে সে কেন ঘ্যাগর ঘোঁ করে জীবনটা কাটাবে শুনি?" কানন উত্তেজিত হয়ে বলে।

"কিন্তু আমার সঙ্গে টক্কর বললে যে, আমি কি তার যোগ্য?" রত্ন অবাক হয়।

"এতদিন তোমাকে উনি সীরিয়াসলি নেননি। এখন বুঝতে পেরেছেন যে তুমি সফল হলেও হতে পারো। তখন পারুলদিকে ঠেকানো দায়। তাই উনি আপাতত বহরমপুরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এর পরে বাড়াবেন বিলেতের দিকে। এতে ওঁরও তো অগ্রগতি। তুমিই সক্রিয় হয়ে ওঁকে সক্রিয় করে দিয়েছ। এটাও অলিখিত একটা প্রতিযোগিতা। এতেও শেষ পর্যন্ত জয় হবে তোমারই। তবে উনিও পেছনে পড়ে থাকবেন না। দশ রকম সাংসারিক অভিজ্ঞতা যাঁর তিনিই তো আইনের ব্যবসায় কুশলী হন।" কানন নিঃসন্দেহ।

"আমি কিন্তু কোনো অর্থেই ওঁর প্রতিপক্ষ নই, কানন। তুমি কি এটা ওঁকে বুঝিয়ে বলবে? পারেন তো উনিই গোরীকে মুক্ত করে দিন, সেই সঙ্গে ওর কমরেড বা কম্পানিয়ন হোন। ওর মনোনয়ন পেয়ে ওকে নতুন করে বিয়ে করুন। গোরীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার যা থাকবে তা এক জাতের বন্ধুতা। আমারও স্বাধীনতা থাকবে অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসবার, ভালোবেসে বিয়ে করবার। তার সন্তানের পিতা হবার।" বলতে বলতে রত্নর চোখ ছল ছল করে।

"ও কী বলছ তুমি!" কানন চমকে ওঠে। "তোমাদের প্রেম এতদূর গড়িয়েছে যে এর পর আর অন্য কোনো মেয়ে বা অন্য কোনো পুরুষের কথা ওঠে না। পারুলদিকে

তুমি একটা চান্স দাও। ওর স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটাকে ও ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেবে। উনি ওর ছেলের বাপ হয়েছেন বলে যে ওর সত্যিকার স্বামী হয়েছেন, তা তো নয়। ওর নিজের চোখে ও অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে। ও চায় স্বয়ংবরা হতে। ঘটনাকে মেনে নিলে তো ও হেরে গেল। কেন হেরে যাবে শুনি ? ওকে জিতিয়ে দেবার ভার তোমার উপরে। আমাদের নৈতিক সমর্থনও তোমার উপর। তবে যশো-দাকে এ কথা বলা যায় না। উনি বুঝবেন না। ওঁর ধারণা ছেলের বাপ হয়ে উনি তুরুপের তাস হাতে পেয়ে গেছেন। এখন ওঁর সুবিধামত তুরুপ করবেন। পারুলদির হাতের রঙের তাস তো তুমি। তুমি সাহেব হতে পারো, কিন্তু উনি হচ্ছেন টেক্কা।"

রত্ন তা শুনে দুঃখিত হয়। "তোমার কাছে স্বীকার করছি, কানন, যে গৌরীর বেগমপুর ফেরা আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি যদি সফল হতুম তা হলে হয়তো ওটা ঘটত না। কিন্তু ঘটেছে যখন তখন আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছে।"

"তা যদি বল, পারুলদিরও মাথা হেঁট। ছেলের মুখ চেয়েই ছেলের সঙ্গে যেতে হয়েছে ওকে। যেমন যায় ছেলের আয়া।" কানন রত্নকে প্রবোধ দেয়। "আয়ার যেটুকু প্রাপ্য তার বেশী প্রত্যাশা নেই ওর। ও স্ত্রীর অধিকার দাবি করে না। করলে তো স্বামীকেও স্বামী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ওর ধারণা ও একটি কুমারী জননী। ওটা একটা আকস্মিক ঘটনা। ওর জন্যে ও কাউকে স্বামী বলে স্বীকার করতে বাধ্য নয়। অথচ সন্তানের স্বার্থও রক্ষা করতে হবে। ছেলেকেও তার উত্তরাধিকার বুঝে নিতে হবে। ওরা নবাবী আমলের রাজপুত রইস। সূর্যের না চন্দ্রের কার যেন বংশধর। পারুলদিও এর জন্যে গর্বিত।"

রত্নর মন প্রবোধ মানে না। ওর প্রেম ওকে দেওয়ানা করেছে। আর দেওয়ানার মতো ও যত রাজ্যের অলীক অবস্তব কল্পনায় ভোর হয়ে রয়েছে। গৌরী নাকি ওরই নারী। ওর স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘর করছে। অন্যের সন্তানের জননী হয়েছে। ও কেবল প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক নয়, বিড়ম্বিত স্বামী। ওরই অক্ষমতার জন্যেই তো এটা হলো। স্বামী হয়ে ও ওর স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারল না।

কানন হতভম্ব হয়ে শোনে। "এ সব কী যা তা বকতে শুরু করেছ, রতন ! পারুলদি কবে থেকে তোমার স্ত্রী হলো ! তুমিই বা কবে থেকে ওর স্বামী হলে ! বিয়েই যাদের হয়নি, এক সঙ্গেই যারা থাকেনি তারা কিসের স্বামী স্ত্রী ! আর অক্ষমতাই বা কিসের ! কেউ কি বলছে যে তোমার ব্যর্থতার দরুনই পারুলদি শ্বশুরবাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে ? তা তো নয়। তুমি সফল হলেও পারুলদি ওইটুকু বাচ্চাকে নিয়ে বা রেখে তোমার সঙ্গে যেত না। ওর বাপের বাড়ীতে আর বেশী দিন থাকা চলত না। ওঁদের ছেলেকে ওঁরা নিয়ে যেতেনই। ওকেও যেতে হতো ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। মাকে ছেড়ে ছেলে কি বাঁচত ?"

সব সত্য। তা সত্ত্বেও রত্নর অন্তর মানে না। ও প্রতিবাদ না করলেও ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর প্রাণে ঘা লেগেছে। আস্ত একটা পাগল !

"ওসব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল, রতন। পারুলদি ওর স্বামীর স্ত্রী নয়। তা বলে

তোমারও স্ত্রী নয়। আগে তো তুমি ওকে মুক্ত কর। মুক্তির পরে ও যদি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে বরণ করে তবেই তুমি হবে ওর স্বামী। নয়তো শুধুমাত্র প্রেমিক। অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধর। অধীর হয়ে কী যেন ওকে লিখেছ, ওর মত নির্ভীক মেয়ের মনেও ভয় ঢুকেছে। ও বলছে, আমি কি তপ্ত কটাহ থেকে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি ?" কানন জানতে চায় আগুন বলতে কী বোঝায়। অজানা দেশে পাড়ি ?

রত্ন জানে আগুন মানে কী। ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। উত্তর দেয় না।

পঁয়ত্রিশ

কানন নিজেও প্রেমে পড়েছে, কিন্তু রত্নর মতো সর্বস্ব পণ করে নয়। ও বাপ মা ভাইবোন ঘরদোর সমাজ ছাড়বে না। ওদের বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে খাপ খায় এমন একজনকেই বিয়ে করবে। তবে ওর হৃদয়টা তো পারিবারিক শাসনের অধীন নয়। তাই ও যাকে খুশি ভালোবাসতে পারে। বিয়ে না করলেও ভালোবাসবে। ভালোবেসে যাবে।

"এইখানেই আমার আপত্তি।" রত্ন বলে। "একজনকে ভালোবাসবে, আরেকজনকে বিয়ে করবে। বিয়ের পরও ভালোবাসার জের টেনে যাবে। আবার স্ত্রীর সঙ্গেও রাত কাটাবে। এতে ভালোবাসাও পূর্ণাঙ্গ হয় না, বিবাহও অপূর্ণ থাকে।"

"মানছি। কিন্তু উপায় কী !" কানন বিষণ্ণ মুখে বলে। "যদি জানতুম যে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিয়ে কোনোদিন হবে তা হলে না হয় ততদিন অপেক্ষা করতুম। বাড়ীর চাপ উপেক্ষা করা সহজ নয়, তবু ঠেকিয়ে রাখতুম।"

"কেন, বিয়ে কোনোদিন হবে না কেন। ইন্দ্রাণীও তো ভালোবাসেন তোমাকে। যতদূর জানি।" রত্ন জিজ্ঞাসু হয়।

"এটাও তো জানো যে ওঁরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখাতে আমি ভয় করি। আর সেটাও যদি অন্তরায় না হয় তা হলেও বাধছে বয়সে। দিদির বয়সীকে আমি দেবীর মতন পূজো করতে পারি, কিন্তু মানবীর মতো স্পর্শ করতে পারিনে। প্রভাত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে, জ্যোতিদাও রসিকতা করেন, আমি নীরবে পরিপাক করি। রবীন্দ্রনাথ যাই লিখুন না কেন, এ বৈষ্ণবের সাহস হয় না দেবতারে প্রিয়া করতে।" কাননও ভয় করে আগুনকে।

"তা যদি হয় তবে তোমার প্রেম ওই একটি জায়গাতেই চিরটাকাল পায়চারি করতে থাকবে। আর একটি পাও এগোবে না।" রত্ন মন্তব্য করে।

"নিরুপায়। তা বলে তো দেবতার গায়ে হাত দিয়ে তাঁকে অপবিত্র করতে পারিনে। আমি অস্পৃশ্য"। কানন সন্ত্রস্তভাবে বলে।

"একটিবারও হাতে হাত রাখনি ?" রত্ন সকৌতুকে শুধায়।

"সর্বনাশ ! পাপ হবে যে !" কানন আঁতকে ওঠে।

"তা হলে তো চুম্বনও করনি বা পাওনি।" রত্ন ওকে ক্ষ্যাপায়।

"কী সর্বনাশ! মহাপাতক আর কাকে বলে!" কানন পেছিয়ে যায়।

"তা হলে আর কী! কোনো আনন্দই আস্বাদন করলে না। এত ভয়!" রত্ন হাসে। "বৈষ্ণবরা কী বলে ? ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। এ জন্মে তোমার কিছু হবে না। কারণ তোমার সাহসই নেই।"

"তোমার আছে ?" কানন প্রশ্ন করে। চোখা প্রশ্ন।

"ছিল না। এখন একটু আধটু হয়েছে। নইলে প্রেমের রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাঁরা সবচেয়ে সার্থক প্রেমিক তাঁরা সবচেয়ে সাহসী প্রেমিক। দুঃসাহসীও বলতে পারো। দেবতার সঙ্গে লীলাখেলাও তাঁদের কাজ।" রত্ন হেসে ওঠে।

"তোমার পতন হয়েছে, রতন। আগে তো তুমি এরকম ছিলে না। অ্যাঁ! কী যা-তা প্রলাপ বকছ!" কানন শিউরে ওঠে।

"নারীর সঙ্গে পুরুষ হতে হয়। এটাই তো নিয়ম। এ যদি না পারি তবে গোরী আমাকে পুরুষের মর্যাদা দেবে না কোনোদিন। পুরুষোত্তম তো দূরের কথা। আমি যেদিন থেকে প্রেমে পড়েছি সেদিন থেকেই শিখছি প্রেম কাকে বলে। এ আমার হাতে কলমে শেখা, পুঁথি পড়ে শেখা নয়।" রত্ন বলতে বলতে জমে ওঠে।

"এই যদি হয় প্রেম তো কাম কাকে বলে ?" কানন তর্ক করে।

"যেখানে আপনার সুখই একমাত্র কাম্য সেখানে ওর নাম কাম। যেখানে আরেকজনকে সুখী করেই সুখ সেখানে ওর নাম প্রেম।" রত্ন তার উপলব্ধি থেকে বলে।

"কিন্তু কাম যে অতি ভয়ঙ্কর জিনিস, এটা তো তুমি মানবে ?" কানন জেরা করে।

"নিশ্চয় মানব। যুদ্ধ তেমনি ভয়ঙ্কর। তবু মানুষ যুদ্ধে যায়, বীরত্ব দেখায়, মালা পায়। নারীই মালা পরায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে থাকলে তো মেয়েদের হাতের মালা পাওয়া যাবে না, কানন।" রত্ন ইঙ্গিতে উত্তর দেয়।

"তোমার কথাবার্তার ধারা বদলে গেছে, ভাই। তুমি কি সেই তুমি!" কানন অবাক হয়।

"দুটো বছর মানুষের জীবনে বড়ো কম সময় নয়, ভাই। বিশেষত তরুণের জীবনে। যে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছি ও যাচ্ছি সে তো সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়। আমার মনে হচ্ছে আমার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। যেন অকালপক্ক হয়েছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কী, শুনবে ? আমার মধ্যে সন্তানক্ষুধা জন্মেছে। যেটা এ বয়সে জন্মানোর কথা নয়। গোরী যদি মা না হতো আমিও বাপ হতে চাইতুম না।" রত্ন কবুল করে।

"আশ্চর্যের ব্যাপার বইকি।" কাননও স্বীকার করে।

"তা বলে আমি আর কারো সন্তানের জনক হবার কথা ভাবছিনে। সামঞ্জস্যটা গোরীর সঙ্গেই। ওর যদি আপত্তি না থাকে। বলা যায় না, ও এমনিতেই যা শঙ্কিত। আগুন ও নিজেই, তবু আগুনকে ওর এত ভয়!" রত্ন অবশেষে প্রকাশ করে।

"ওঃ! এখন বুঝতে পারছি গোরী কেন বলেছিল, আমি কি আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি ?" কানন মাথা নাড়তে নাড়তে বলে। "রতন, তুমি যদি এখন থেকে ওকে আগুনের ভয় দেখাও তা হলে ও কেমন করে তোমার সঙ্গে যায়, বল দেখি ? আমি

যতদূর জানি তোমাদের সম্পর্কটা হবে চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনীর সম্পর্ক। রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।"

"তাই নাকি ? বলেছে গোরী ওকথা ?" রত্নর মনে খটকা বাধে।

"না, অত স্পষ্ট করে বলেনি। যা বলেছে তার মর্ম ও ছাড়া আর কিছু নয়। বলেছে, সব পুরুষই সমান। একজনও ভালো নয়। হাজার ভালোমানুষ সাজুক, একদিন না একদিন মুখোস খুলে যায়। বেরিয়ে পড়ে ভিতরকার পশু। একটু আড়ালে পেয়েছে কি, অমনি ছুঁতে এসেছে। ভান করবে স্বর্গীয় প্রেমের, কিন্তু মনের কথাটি তা নয়, সরলা অবলার সর্বস্ব হরণ। সময় ও সুযোগ বুঝে ওটা প্রকাশও করে। মুখে না হোক চোখে। শত শত প্রেমের গল্প পড়েছি, আদিতে যাই থাক অন্তে আদিরস। ঘেন্না ধরে গেছে, কানু।" কানন বিবরণ দেয়।

"তা হলে ও কী চায় আমার কাছে ?" রত্নর ধাঁধা লাগে।

"যেটাতে ওর অরুচি ধরে গেছে সেটা নয়। শোননি, বাউলরা গায়, চণ্ডীদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দু'জন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে ? তোমাদের সম্বন্ধেও একদিন দেশের কবিরা গান বাঁধবে, রত্ন আর শ্রীমতিনী, ওরাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দু'জন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।" কানন সুর করে বলে।

"না, না, ওটা আমাদের আদর্শ নয়। আমাদের বেলা একটু পাল্টে দিয়ে বলতে হবে, এক বাঁচনে দু'জন বাঁচল প্রেমপূর্ণ প্রাণে।" রত্ন সুর করে বলে। কিন্তু শঙ্কান্বিতভাবে। কে জানে হয়তো সমাজের নির্যাতনে বাউলরা যা শোনায় তাই হবে।

"না, রতন, তোমাদের বেলা অমন ট্র্যাজেডী ঘটবে না।" কানন আশ্বাস দেয়। "সমাজ বদলে গেছে। আরো বদলাবে। ডিভোর্সও অসম্ভব নয়। বিয়েও অসম্ভব নয়। সমস্তই একে একে হবে। কিন্তু ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়, জানো তো। সত্যিকার আগুন দেখলে দড়ি ছিঁড়ে পালাতেও পারে।"

রত্ন বোঝে। কিন্তু বিশ্বাস করে যে সত্যিকার আগুন মানুষকে বাঁচাতেও পারে। বন্ধুকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে বলে, "তোমরাই বা কম কিসে? কানন আর ইন্দ্রাণী লোর আর চন্দ্রাণী। প্রভাত আর সুলেখা য়ুসুফ আর জুলেখা।"

কাননও ছড়া কাটে। "শ্রীমতী আর রতনু লায়লা আর মজনু। লায়লা মজনুর সঙ্গে তোমাদের তুলনা করছি কেন জানো ? পারস্যের ছবিতে দেখেছি মজনু বেচারি তপস্যায় শুকিয়ে হাড্ডিসার। আর লায়লা কেমন হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবতী ! স্বচক্ষেও তাই দেখছি। না খেয়ে না শুয়ে তুমি দিন দিন যা হয়ে দাঁড়াচ্ছ তা ওই ছবির মজনুর সঙ্গে মিলে যায়। ওদিকে বেগমপুরের গয়লারা দুধ ঘি ক্ষীর সর সরবরাহ করে রাধামাধবজীউকে এমন যত্নে রেখেছে যে তাঁর সেবিকারও তনুশ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোমাদের পরিণতি কি শেষ পর্যন্ত লায়লা মজনুর মতোই হবে ?"

"কে জানে !" রত্নর কণ্ঠস্বরে বিষাদ। "যেদিন শুনলুম ও বেগমপুর ফিরে গেছে সেদিন মনে হলো ও পেছিয়ে গেছে। তবে এমনও হতে পারে যে ওটা এগিয়ে যাওয়ার জন্যেই পেছিয়ে যাওয়া। সৈনিকরা যা করে।"

"ঠিক। ওকে তো আমি চিনি। ও বেগমপুরে কখনো স্থির থাকবে না। বহরমপুরেও কি বেশীদিন পায়চারি করবে ? না, তাও নয়। ও যা চায় ওকে তা দিতে হবেই। মুক্তি। এই পর্যন্ত আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। বাকীটা আমার দৃষ্টির বাইরে। অর্থাৎ তোমার সঙ্গে মিলন। তোমাদের মিলিত জীবন। সন্তানের মধ্যে পরিপূর্ণতা। কম্পানিয়নশিপ। পরস্পরের সাহচর্যে সৃষ্টি।" কানন রত্নকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "আমার দৃষ্টির বাইরে হলেও সম্ভাব্যতার বাইরে নয়। তুমি যে তপস্যা করছ তা কি ব্যর্থ যেতে পারে ? প্রেমেরও তো একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। প্রেম যদি সত্য হয় তবে তা অঘটনকে ঘটায়।"

রত্ন সুখী হয়ে বলে, "গৌরীর মতো মেয়ে যে আমার মতো ছেলেকে প্রেমিক-রূপে পছন্দ করেছে এটাই একটা অঘটন। এরপরে যদি স্বয়ংবরা হয়ে আমাকে বরণ করে তবে সেটা হবে আরো এক অঘটন। যদি আমাকে সন্তানের পিতারূপে মনোনয়ন করে তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো অঘটন। প্রত্যেকবারেই ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। তেমনি আমিও । আমরা দু'জনেই সমান স্বাধীন। একপক্ষের ইচ্ছাই উভয়পক্ষের ইচ্ছা নয়। যেমন সচরাচর দেখা যায়। আমরা হব সাধারণের থেকে ভিন্ন। গৌরীর যদি ইচ্ছা না হয় ও আমার স্ত্রী হবে না, আমার সন্তানের মা হবে না। কিন্তু তা হলে সমস্যার উদয় হবে। আমি তবে কী করব ? চিরকুমার হব ? নিঃসন্তান হব ? প্রেমের জন্যে এসব হওয়া বিচিত্র নয়। অনেকেই হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণতা কোথায় ? আমি যে পরিপূর্ণতার ধ্যান করি সে ধ্যান কি বিসর্জন দেব ?"

কানন তো হেসেই আকুল। "একেই বলে ইঁচড়ে পাকা। এখন থেকে কেউ অত কথা ভাবে !"

ছত্রিশ

সংসারের সার কী। রূপকথায় আছে, বাড়ীর ছোট বউ বলেছিল, লবণ।

লবণ ? শ্বশুর তা শুনে উপহাস করেছিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বড়ো বউ বলেছিল, ধনদৌলৎ। মেজ বউ বলেছিল, মানসম্মান। সেজ বউ বলেছিল, ছেলেমেয়ে। সবাই ওরা বুদ্ধিমতী। কেবল ছোট বউটি বোকা।

একদিন রাঁধবার পালা ছোট বৌমার। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের বাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু শ্বশুর মশায় যেটাই মুখে দেন সেটাই আলোনা। থু থু করে ফেলে দেন। রাগে তাঁর পিত্ত জ্বলে যায়। খিদেয় জ্বলে যায় পেট। ছোট বউমাকে ধমক দিয়ে বলেন, "নুন দিতে ভুলে গেলে কেন ?"

"না, বাবা, ভুলে যাব কেন ? ইচ্ছে করেই দিইনি।" ছোট বউমা জবাব দেয়। "নুন এমন একটা কী জিনিস যার অভাবে সব থেকেও কিছুই মুখে দেওয়া যায় না ? সব অসার ?"

গৃহস্থ বুঝতে পারেন যে ছোট বউ যা বলেছে তাই ঠিক। লবণই সংসারের সার। নুন না থাকলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে প্রাণ বাঁচে না।

বাল্যবন্ধু কাননকে এই রূপকথাটি শুনিয়ে রত্ন বলে, "সংসারের সার কী ? আমি হলে বলতুম, প্রেম। প্রেম না থাকলে জীবন শুকিয়ে যায়। ফুল ফোটে না। ফল ফলে না। জগৎ হয়ে ওঠে মরুভূমি। তখন তাকে মায়া বলে সন্ন্যাসী মন আপনাকে ভোলায়। আর গৃহস্থ মন জড়িয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য ধনদৌলৎ মানসম্মান ইত্যাদির বন্ধনে। নিয়ে এস এক ফোঁটা প্রেম। প্রেমের রসে সব সরস হবে।"

এত যে হানাহানি কাটাকাটি, এত যে যুদ্ধ আর বিপ্লব, এত যে শোষণ আর পীড়ন, এর মূলে প্রেমের অভাব। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে ভুলে গেছে। শুধু তাই নয়, ভালোবাসাটাকেই মনে করে দুর্বলতা। কিংবা পাপ। যার অন্তরে যত অপ্রেম বা যত অসাড়তা সেই তত বড়ো বাহাদুর। মানুষ যদি ভালোবাসতে না পারে তবে ভালোবাসা পেতে চায় কেন ? পাবে কোন উৎস থেকে, কেউ যদি ভালো না বাসে ?

"জ্ঞানচর্চা ও শক্তিচর্চার মতো প্রেমচর্চাও করতে হবে মানুষকে। প্রেমচর্চাই শ্রেষ্ঠ চর্চা হবে। আমাদের এযুগটা হবে প্রেমের যুগ। এই আদর্শ নিয়েই আমরা বাঁচব। আমরা যারা আর দশজনকে বাঁচাতে চাই। শুধু আত্মগত জীবন কে চায় ? আমরা যেন হতে পারি ধরিত্রীর লবণ।" রত্ন বলে আবেগভরে।

রত্নর জীবনদর্শন ধীরে ধীরে প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তার ভালোবাসার আলোয় সে দেখতে পাচ্ছিল আগের চেয়ে বেশী, আর-সকলের চেয়ে বেশী। আর প্রেমই যেন তার দূরবীন, তার অনুবীক্ষণ। দূরতম ও সূক্ষ্মতমও তার চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের আকাশও যেন সুদূরপ্রসারী হয়। আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায় তার মন। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ক্ষমতার ধারণা। যেন ইচ্ছে করলে সব কিছু পারে। শুধু গায়ের জোরটাই যা কম।

দুই বন্ধুর কথাবার্তার ধ্রুবপদ যেমন প্রেম তেমনি ধ্রুবপদের প্রধান কথা হলো গৌরী। ইন্দ্রাণীর কথাটাও মাঝে মাঝে ওঠে। তবে কানন সে বিষয়ে স্বল্পবাক।

"প্রেমই আমার জীবনের কেন্দ্র। আর গৌরীই আমার প্রেমের কেন্দ্র।" রত্ন এমনভাবে বলে যেন ওটা একটা ঘোষণা। "প্রেম বিনা জীবন নয়। গৌরী বিনা প্রেম নয়।"

"এই তো চাই। এইজন্যেই তো তোমাদের দিকে চেয়ে আছি। তোমরা একটা কীর্তি রাখবে। এ বিশ্বের প্রেমের ইতিহাসে আর এক জোড়া নাম বন্ধনীভুক্ত হবে। রত্ন ও শ্রীমতী। তবে বাস্তবের উপরেও একটা চোখ রেখো। কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয়, এটুকু জানা থাকলে তোমাদের প্রেম বিয়োগান্ত হবে না।" কানন বলে বিজ্ঞের মতো।

"বিবাহিতার সঙ্গে প্রেমের প্রায় সব কটিই তো বিয়োগান্ত প্রেমের নিদর্শন।" রত্ন এক এক করে নামের মালা গড়িয়ে যায়।

"তা হোক। তোমাদের বেলা হবে মিলনান্ত।" কানন নিঃসংশয়।

"এ শুধু বিবাহিতার সঙ্গে নয়। সন্তানবতীর সঙ্গে। আরো দুরূহ প্রেমের

নিদর্শন।" স্মরণ করিয়ে দেয় রত্ন।

"তা হলেও তোমরা মিলবে। যখন এতদূর এগিয়েছ।" কানন উৎসাহ দেয়।

"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।" রত্ন প্রীত হয়ে বলে। "কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না। প্রেমের সাধনাও একপক্ষের সাধনা নয়। গোরীকেও আমার সঙ্গে তাল রাখতে হবে। আপাতত ওকে বল দেখি একটু পড়াশুনা করতে। আমি যখনি যা পড়ি ওকে আমার পড়ার অংশ দিই। সেই সূত্রে সমশিক্ষিতা করে তুলি। কিন্তু ওর চিঠিপত্রে পড়াশুনার পরিচয় যা পাই তা যত সব মামুলী উপন্যাসের। জ্যোতিদা তো নেই যে ওকে ইউরোপের চিন্তার পসরা বয়ে এনে দেবে।"

সমস্যাটা কঠিন, কেননা গোরী ইংরেজী যৎসামান্য শিখেছে। ওকে ইংরেজী বই উপহার দিলেও পড়ে বুঝতে পারে না। ওকে পড়াতে হয়। সে দায়িত্ব নিচ্ছে কে? যশোবাবুর কিসের গরজ? তাঁর দিক থেকে ও যথেষ্ট শিক্ষিতা।

কানন সম্প্রতি জ্যোতিদাব সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। জ্যোতিদা অসুখী, গোরীর কাছে কথার খেলাপ হয়েছে। ওর মুক্তিযাত্রায় যোগ দিতে পারবে না। তবে নৈতিক সমর্থন দূর থেকে জোগাবে। জ্যোতিদা থাকতে অর্থের অভাব হবে না।

তা শুনে গোরীর কী রাগ! জগতে অর্থই কি সব! কে চায় ওর অর্থ! ওর অর্থ ওর বউকে দিক। আর রেবাদিও তেমনি। সেও জ্যোতির উপর রুষ্ট। অমন একটা কথা কেনই বা দিয়েছিল? যখন অমন একটা কাজ বিজ্ঞজনের করণীয় নয়। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া কোন পরিবারে নেই? ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে। দেখবে একদিন মিটেও যাবে। মাঝখান থেকে জ্যোতি কেন জড়িয়ে পড়ে?

রেবাদি বিশ্বাস করে না যে গোরী তার বিবাহে সম্মতি দেয়নি বলে বিবাহের থেকে নিষ্কৃতি চায়। ওর মুক্তি একটা নেবুলাস স্বপ্ন। যতই বাস্তবের নিকটবর্তী হবে ততই স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে। জ্যোতি তখন ওর কোনো কাজেই লাগবে না। রত্নও কি লাগবে? লাগতে পারে রোমান্সের জন্যে। যে রোমান্স পরিণয়ে পরিণতি পাবে না। শূন্যে ঝুলে থাকবে।

রেবাদি নাকি বলেছে, "আমার খালি দুঃখ হয় যে ও রত্নর মতো একটি অবোধ ছেলের মাথা খাচ্ছে।"

"অবোধ!" শুনে রত্ন হকচকিয়ে যায়।

"অবোধ না সুবোধ কী বলেছে ঠিক মনে পড়ছে না।" কানন এড়িয়ে যায়। "তবে মাথা খাওয়ার কথাটা বিলকুল মনে আছে।"

রত্নর বিরক্তি দেখে কানন রেবাদির পক্ষ নেয়। বলে, "রেবাদির মুখের উক্তি রূঢ়, কিন্তু মনের কথাটা মন্দ নয়। ও চায় গোরীর পাগলামির জন্যে ওদের পরিবারটা ভেঙে না যায়। ওর স্বামী হাজার অপরাধ করলেও ওঁকে শোধরানোর চেষ্টা করা উচিত। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তখন সেপারেশন। ডিভোর্স নয়। তবে উনি যদি আর একটি বিয়ে করেন তখন গোরীও আবার বিয়ে করার দাবীতে ডিভোর্স চাইতে পারে। ডিভোর্সের পক্ষপাতী নয় রেবাদি। কিন্তু ওই একটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করে। তেমন পরিস্থিতি তো দেখা

দেয়নি। যখন দেখা দেবে তখন দেখা যাবে।"

যাক, বাঁচা গেল যে রেবাদি একেবারে প্রাচীনপন্থী নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, অমন একটা পরিস্থিতির কবে উদয় হবে, তার জন্যে রত্ন কতকাল ধৈর্য ধরবে।

"যশো-দা কিন্তু সাফ বলে দিয়েছেন তিনি ছেলেকে সৎমা দেবেন না। ছেলের মা যদি ইচ্ছা করে সৎবাপ দিতে পারে।" কানন ঠেস দিয়ে বলে।

রত্ন তো শুনে হাঁ। 'সৎবাপ'। রত্ন হবে কিনা 'সৎবাপ'। শব্দটা অশ্লীল নয়, তবু ওর মনে লাগে। যেন ওকেই ইচ্ছা করে অপমান করা হয়েছে।

"বুঝতেই পারছ যে এখন সমস্যাটা ঠিক আগের মতো নয়। এমন নয় যে পারুলদিকে কেউ প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিচ্ছে। সংগ্রাম কথাটা এখন অর্থহীন। কার সঙ্গে সংগ্রাম ? কিসের জন্যে সংগ্রাম ? জয়পরাজয় একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তার পরে আর সংগ্রাম চলতে পারে না। তখন বিজেতা যিনি তিনি কৃপা করে উদার শর্ত দেন। সেই শর্তে সন্ধি হয়। যশো-দার শর্ত হলো, পারুলদি যেখানে খুশি যেতে পারে, চাইলে ছাড়পত্রও পাবে, কিন্তু নেপোর সঙ্গে ঘটে যাবে শেষ দেখা।" কানন এবার করুণ রসে গলে যায়।

"নেপো ! নেপো আবার কে ?" রত্নর ধাঁধা লাগে।

"নেপোলিয়ন। নেপোলিয়নাদিত্য।" কানন ব্যাখ্যা করে। "বাপ এই নামে ডাকেন। যদিও ওর আসল নাম হলো জয়মাধব।"

"জানতুম না তো।" রত্ন অন্যমনস্ক হয়।

"যা বলছিলুম। পারুলদি যদি স্বাধীনা হতে চায় হতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে মাতৃত্ব করা চলবে না। কী হয়েছে, জানো ! পারুলদি এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ হচ্ছে নারী। নারী চায় তার মনোমতো পুরুষ। তার মনোমতো পুরুষের সঙ্গ। আরেকভাগ হচ্ছে মাতা। মাতা চায় তার সন্তানকে চোখে চোখে রাখতে, চোখের আড়াল না করতে। এই যে দুটি ভাগ এর একটা সামঞ্জস্য না হলে পারুলদি কখনো সুখী হবে না। ও যদি সুখী না হয় তোমাকেই বা সুখী করবে কী করে ! শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বলা যায় না। নারী না মাতা। তবে আমার বিশ্বাস নারীই জিতবে। তোমার নারী তোমারই হবে। ওদিকে মাতৃহারা হবে একটি নিরপরাধ শিশু। কী যে ট্র্যাজিক !" বলতে বলতে কাননের গলা ধরে আসে।

রত্ন কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে ভাবে। তারপর বলে, "আমিই তা হলে এ নাটকের ভিলেন ! কেই বা আমার জন্যে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে ?"

"না, না, নিজেকে দোষী ভাবছ কেন ? তোমার কী দোষ ? দোষ যদি কারো থাকে তার নাম নিয়তি। ওর তো মা হবার কথা ছিল না। দস্তুরমতো প্রতিরোধ করেছে। তা সত্ত্বেও যা হবার তাই হলো। আর সব তার পরিণাম। কে জানে হয়তো ও ছেলের খাতিরে স্বামীর সঙ্গেই থেকে যাবে। তা হলে আর ট্র্যাজিক বলব কেন ?" কাননেন মুখে হাসি ফোটে আবার।

"তা হলে আমার পক্ষে ট্র্যাজিক।" রত্ন বলে করুণ স্বরে।

সাঁইত্রিশ

কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয় যে, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুতা হয় না, হলে বন্ধুতা দাঁড়ায় প্রেমে। রত্নুর ধারণা ছিল অন্যরূপ। সে মনে করেছিল প্রেম সকলের বেলা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। প্রেমে একনিষ্ঠতার দায় আছে। কিন্তু বন্ধুতা অনেকের বেলা সম্ভব। যেমন একরাশ ছেলের সঙ্গে তেমনি একরাশ মেয়ের সঙ্গে। এঞ্জেল বা বোধিসত্ত্বরা যেমন স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, তেমনি বন্ধুরা নয় স্ত্রী-বন্ধু বা পুরুষ-বন্ধু। বন্ধু হচ্ছে বন্ধু। কিবা ছেলে কিবা মেয়ে! বন্ধুদের বেলা একনিষ্ঠতার দায়ও নেই। একাধিক বন্ধুকে ভালোবাসা যায়। কামগন্ধ নাহি তায়।

সেবা আর রত্নু বন্ধুতা ভিন্ন আর কিছু চায়ওনি, পায়ওনি। বন্ধুতা নিয়েই ওরা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু অনাত্মীয় তরুণীর সঙ্গে অনাত্মীয় তরুণকে বার বার দেখলেই লোকে গবেষণা শুরু করে দেয়। এরা কি প্রেমে পড়েছে? যদি পড়ে থাকে তবে বিয়ের ফুল ফুটতে আর কত দেরি? আর যদি বিয়ের অভিপ্রায় নাই থাকে তবে অমন প্রেমও ভালো নয়, অমন মেলামেশাও ভালো নয়।

অন্যে পরে কা কথা, সেবার মা বাবাও ধরে নিয়েছিলেন যে ওদের মেলামেশার একটা পর্যায়ে ওরা পরস্পরের কাছে বাগ্‌দত্ত হবে। তার আগে গুরুজনের অনুমতি চাইবে। তাঁরা সবুর করতে রাজী ছিলেন। যথাকালে হবে মধুরেণ সমাপয়েৎ। সেবা দাশগুপ্ত রূপান্তরিত হবে সেবা মল্লিকে।

সামনে ফাঁদ। সেটা উপলব্ধি করবামাত্র রত্নু স্থির করে ফেলে সে ওটা যেমন করে হোক এড়াবে। সেবাকে বলবে সে আরেকজনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, কিন্তু তা হলে গোরীর সঙ্গে পলায়নের পরিকল্পনাটা জানাজানি হয়ে যায়। কাজ কী অসময়ে ফাঁস করে?

"সেবা, তোমাকে একটা কথা বলব?" রত্নু একদিন বলে।

"কী কথা, রতন?" সেবা জানতে চায়।

"এস, আমরা নতুন একটা সম্পর্ক পাতাই", রত্নু একটু রহস্যময় করে তোলে।

"নতুন সম্পর্ক? সেটা আবার কী?" সেবা রেগে ওঠে। সেই প্রস্তাব নয় তো।

"তুমি আমার শত্রু। আমি তোমার শত্রু।" রত্নু ওকে চমকে দেয়।

"না না, শত্রু কিসের? আমরা তো বন্ধু।" প্রতিবাদ করে সেবা।

"বন্ধু হবার অনেক জ্বালা। কেউ সহজে বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে বন্ধুতাতেই বন্ধুতার শেষ। ওদের ধারণা ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুতা হতে পারে না। ওদের সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে এই ভালো নয় কি?" রত্নু যুক্তি দেখায়।

সেবা প্রথমটা আহত হয়েছিল। পরে বুঝতে পারে ওটা আসলে একই জিনিস, নাম আলাদা। সেইসঙ্গে আরো অনুমান করে যে রত্নু কোনো এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে চায়। তার বেশী এগোতে চায় না। তা একটু ক্ষুণ্ণ হয় বইকি।

"আচ্ছা, এখন থেকে পরস্পরকে আমরা শত্রু বলে সম্বোধন করব। সেটা বেশ একটা নতুন সম্পর্ক হবে। তা বলে পুরোনো সম্পর্কটা পালটে যাবে না। কী বল,

শত্রু ?" সেবা ফূর্তি করে বলে।

"শত্রু, আমারও সেই মত।" রত্নও ফূর্তিসে বলে।

পুরোনো সম্পর্কটা পালটে যায় না ঠিক। কিন্তু তার থেকে উত্তাপ চলে যায়। তা হলে কি লোকের ধারণা ভুল নয় যে, ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুতা হয় না, হয় যেটা সেটা প্রেম ? আর প্রেম যদি হয় তো তার অনিবার্য গতি বিবাহের অভিমুখে ?

তবে দু'জনে দু'জনাকে মিষ্টি স্বরে ডাকে, "শত্রু।" আর চিঠি লিখলে লেখে, "প্রিয় শত্রু।" এক বিচিত্র সম্পর্ক।

লোকে যা নয় তাই মনে করে রত্ন ও মালাদির বেলাও। সেই যে ওরা একসঙ্গে কার্নিভালে যায় তারপর থেকে শুনতে হয়, "তোমরা তো এনগেজড।"

সেদিন রত্নর পরনে ছিল সাহেবী পোশাক। সেটাও বোধ হয় গবেষণার সূত্র। মালাদিকেও একটু উন্মনা মনে হয়েছিল। সেটা রত্নর জন্যে নয়। আর একজনের জন্যে। হ্যাঁ, রত্নই দু'জনের মাঝখানে দূতগিরি করেছিল। এর চিঠি নিয়ে ওকে পাঠায়। ওর চিঠি পেয়ে একে দেখায়। ও যেন একটি ডাকঘর।

রত্নকে শিখণ্ডী করে ঝণ্টুদাকে তার পত্রবাণের লক্ষ্য করেছিল মালাদি। তিনিও বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন মালাদির উদ্দেশে। সরাসরি পত্রালাপ নয়, হলে মালাদির মা টের পেতেন। টের পেলে ঝাঁটাহস্ত হতেন। ঝণ্টুর উপর ঝাঁটাহস্ত। তাই ঝণ্টুদা মালাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হননি। যদিও কলকাতা দিয়েই ওঁর যাওয়া আসা।

শেষে একটা ফন্দী আঁটা হয়। মালাদি যাবে রত্নর সঙ্গে কার্নিভালে। বেচারির কি সামান্য একটা শখও মিটবে না ? মেটাবে কে ? ওর ভাইরা তো হাতের কাছে নেই। রত্নই অনুগ্রহ করে রাজী হয়। ওর পরীক্ষার পড়ার কামাই করতে।

সেখানে ঝণ্টুদার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকার। রত্ন কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ওদের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রেখে। তারপর অনেকক্ষণ ওর পাত্তা নেই।

ঝণ্টুদা গোঁফ দাড়ি গজিয়ে এক সাধুবাবার মতো দেখতে। তাঁর সঙ্গে মালাদিকে লক্ষ করে কেউ কিছু মনে করে না। মনে করে কেবল রত্নর মতো বিবাহযোগ্য যুবককে দেখলে। মজা মন্দ নয়। সাধুবাবাও মাঝে দুটো একটা তত্ত্বকথা শোনাচ্ছিলেন। অপরকে শুনিয়ে শুনিয়ে। "নির্বাণ হচ্ছে বাসনা কামনার নির্বাণ। যে বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়েছে সেই তো নির্বাণ লাভ করেছে। মরণের এপারেই সেটা সম্ভব। মরণের সঙ্গে নির্বাণের কী সম্পর্ক ! পরকাল যদি সত্য হয় তবে বাসনা কামনাও পরকালে দগ্ধায়।"

মালাদি অবশ্য তত্ত্বকথা শুনতে আসেনি। যা শুনতে এসেছে তা বাসনা কামনার নির্বাণের অন্য কোনো উপায় আছে কি না। বেশ কিছুকাল স্বামীসঙ্গ করলেও তো বাসনা কামনার নির্বাণ হতে দেখা যায়। বিশেষত সন্তানাদি হবার পরে।

গৌরীর মতো মালাদির ভিতরেও এক দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে হয়ে যায়। ঝণ্টুদাকে রত্ন নরম করে এনেছিল। অভয় পেলে তিনি প্রস্তাবও করতেন, পাণিগ্রহণও করতেন। বিধবা বলে তাঁর কোনো বিকার ছিল না। মালাদি যে তাঁর জন্যে পার্বতীর মতো তপস্যা কর.. এর জন্যে তিনি শিবের মতো সন্তুষ্ট।

কিন্তু বাধা ছিল মালাদির ভিতরেই। লোকলজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। মা বাবা সমর্থন করবেন না। ভাইদের মধ্যেও মতভেদ। একজন যদি বলে, "সমাজে চালিয়ে দিলেই চলবে" আরেকজন বলে, "সমাজ এখনো প্রস্তুত নয়।" কী করা যায়! আপাতত একমনে পড়াশুনা করাই শ্রেয়। তাতে তো সমাজের আপত্তি নেই।

"মালা আমাকে যতদিন সবুর করতে বলবে আমি ততদিন সবুর করব, রতন।"

ঝণ্টুদা বলেন। "যদিও পারিবারিক চাপ ক্রমেই প্রবল হচ্ছে আমার উপর।"

"মালাদি কি সবুর করতে সত্যি চায়? করছে বাধ্য হয়ে।" রত্ন বলে ঝণ্টুদাকে আশ্বাস দিতে।

গৌরীর মতো মালারও ভাবনা কেমন করে সে স্বাবলম্বী হবে। তেমন কোনো অর্থাভাব ছিল বলে নয়, এমনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে। বিধবার বিবাহ যে দেওয়া হয় না তার কারণ কি এই নয় যে বিধবারা পরনির্ভর?

ঝণ্টুদার সঙ্গে পরে একদিন রত্নর কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস হয় না যে মালা কোনোদিন মনঃস্থির করতে পারবে। নিজের পায়ে দাঁড়ালেও পরের কথায় চলাই ওর অভ্যাস। ওর ওই মা-টি ওকে মাটি করবে। আমার উপর ওঁর জাতক্রোধ। তুমি দেখবে তোমার উপরেও তাই হবে, যদি উনি জানতে পারেন যে তুমি আমাদের বিয়ে দিচ্ছ।"

বিয়ে দিচ্ছে কে? না রত্ন। একথা শুনলে কার না মাথা ঘুরে যায়? রত্ন তার উদ্যোগ বাড়িয়ে দেয়। যখন তখন মালাদির সঙ্গে দেখা করতে যায়। ওরা দু'জনে কী যে অত ফিসফাস গুজগুজ করে মালাদির মা বুঝতে পারেন না। রান্নাঘরে কে? না মালা আর রত্ন। কী হচ্ছে ওখানে? না চা খাওয়া। মালাদির আছে একটা স্পিরিট স্টোভ। সেটাতে ও যখন খুশি চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। ঘড়ি ঘড়ি চা খায়।

হঠাৎ মা যদি ওপথ দিয়ে যান ওদের কথাবার্তার বিষয়টা মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। মালাদি বলে, "ও প্রশ্ন দু' বছর আগে একবার এসেছিল। এবারেও আসতে পারে। কী লিখব, বল না, লক্ষ্মীটি।"

"কেন, তোমার কাছে মোহিত ঘোষের নোটস নেই? আচ্ছা, আমিই না হয় তোমার জন্যে একটা উত্তর খসড়া করে দিচ্ছি।" রত্ন অভয় দেয়।

অথবা ওদের কথাবার্তা এমন ধারাও ধরে। মালা বলে, "তুমি যে উপন্যাস লিখতে চাও তার নায়ক নায়িকার বিয়ে হবে তো শেষ পর্যন্ত? না বেচারিদের কপালে চিরবিরহ?"

"লেখক কি তা আগে থেকে কাউকে জানতে দেয়?" রত্ন গম্ভীরভাবে বলে, "ওটা লেখকের সীক্রেট।"

"কিন্তু বিয়ের অনেক বাধা আছে যে। একেই তো মেয়েটি বিধবা। তার উপর ওর যৌবন দিন দিন চলে যাচ্ছে। নায়ক ওকে সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আর সাধছে একটু বেলা থাকতে মনঃস্থির করতে। নায়কের নিজেরও তো যৌবন যায় যায়।"

"কী করব, বল! আমি কি ওদের বিয়ে দিতে নারাজ! বরঞ্চ আমারই উৎসাহ ওদের চেয়েও বেশী। মেয়েটির বদ্ধমূল ধারণা বিধবার বিয়ে পাপ। অথচ বিপত্নীকের বিয়ে পাপ নয়। এই দোরোখা নীতির বিরুদ্ধেই তো কলম ধরতে হচ্ছে আমাকে। নইলে ও বই লিখতুম কেন? অবশ্য এখনো হাত দিইনি লেখায়।" রত্ন বানিয়ে বলে যায়।

মালাদির মা প্রখর বুদ্ধিমতী না হলেও প্রবল স্বার্থসচেতন। ওরা দুটিতে মিলে কী এক মহাভারত অশুদ্ধ করার মতলব আঁটছে এ সন্দেহ অনেকদিন থেকেই তাঁর মনে উঁকি মারছে। কিছু বলতেও পারছেন না, কারণ মেয়ের জন্যে বিনা পয়সায় টিউটর তিনি পাচ্ছেন কোথায়! অথচ যেই টিউটর হয়ে ঢুকবে সেই নাগর হয়ে বেরোবে এটা কি বরদাস্ত করতে পারেন? ঝন্টুকে তিনি গলাধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবার রত্নর পালা।

"বুঝেছি! বিধবা বিবাহের ষড়যন্ত্র। আমার সঙ্গে চালাকি! আমার চোখে ধূলো দিবি তোরা!" একদিন গর্জে ওঠেন তিনি। আর রত্নকে দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, "এখন যা। আমার ইচ্ছা নয় যে আর আসিস।"

আটত্রিশ

মালাদির সঙ্গে বন্ধুতা হঠাৎ এমনি করে এক ফুঁয়ে নিবে যায়। ভালো করে বিদায় পর্যন্ত নেওয়া হয় না। রত্ন আর পেছন ফিরে তাকায় না। তাকালে দেখতে পেত মালা যেন বিষাদের প্রতিমা।

মালার সঙ্গে বন্ধুতার মালা ছিঁড়ে গেলেও সেবার সঙ্গে শত্রুতার ডোর অটুট। তবে দেখা বড় একটা হয় না। ওরা ইচ্ছা করেই দূরত্ব রক্ষা করে। কেউ কারো চেয়ে কম ব্যস্ত নয়। দেখা হলে একজন সুধায় আরেকজনকে, "কেমন আছ, শত্রু?" উত্তর পায়, "মন্দ কী!"

জ্যোতিদার বিয়ের সময় রত্ন আবিষ্কার করে যে রেবা আর সেবা দুই মাসতুত বোন। শুধু নামের মিল নয় চেহারারও মিল। কিন্তু রেবা যেমন প্রাণবতী সেবা তেমন নয়। আবার সেবা যেমন মনস্বিনী রেবা তেমন নয়।

আশ্চর্য এই যে জ্যোতিদার বরাতে জুটেছে রেবা আর রত্নর বরাতে জুটত সেবা, যদি মাঝখানে গোবী না থাকত। এর জন্যে দুঃখিত নয় রত্ন। কারণ মনস্বিনী নারীকে ও স্পর্শ করতে ভয় পায়। কানন যেমন দেবীকে।

বিলেতে যাদের অবজ্ঞাভরে বলা হতো ব্লু স্টকিং সেবা হচ্ছে তাদেরই একজন। ও জানে ও একদিন অধ্যাপিকা হবে, বেথুনে পড়াবে। রত্নর খাতিরে ও। কেরিয়ার ও ছাড়বে না। ওর উচ্চাভিলাষ ওর বাবার কাজের জের টেনে চলা। ধারা বজায় রাখা। রত্নর সাধ বা সাধনার সঙ্গে ওর একাত্মতা নয়।

"সেবা," রত্ন একদিন কথা প্রসঙ্গে বলে, "আমার সত্যিকারের কাজ কী তা নিয়ে আমি ভাবনায় পড়েছি।"

"কেন, রতন," সেবা বলে, "তুমি যাতে হাত দিয়েছ তা কি অকাজ?"

"অকাজও নয়। স্বকাজও নয়।" রত্ন খোলসা করে। "একটা না একটা কেরিয়ার বিনা পুরুষের চলে না। এখন তো দেখছি নারীরও। কিন্তু সেইটেই কি জীবনের কাজ? না, জীবনের কাজ বলতে আমি বুঝি সেই কাজ যার জন্যে আমাকে ডাকা হয়েছে। যার জন্যে আমি একটা ডাক অনুভব করছি।"

"তুমি কি তেমন কোনো ডাক শুনেছ?" সেবা আগ্রহের সঙ্গে সুধায়।

"রকমারি ডাক শুনতে পাই। কোনটা যে আমার পক্ষে সত্যিকার ডাক তা তো জানিনে। এই যেমন একটা হলো এ যুগের উপযোগী রামায়ণ মহাভারত লেখা। সেই জিনিস নয়, কিন্তু তেমনি মহান এপিক। বিংশ শতাব্দীর জীবনদর্পণ। জীবনদর্শনও বলতে পারি।" রত্ন বোঝাতে চেষ্টা করে।

রত্নর আসমানে কেল্লা বানানোর পরিকল্পনা এই প্রথমও নয়, এই একমাত্রও নয়। মৃদু হেসে সেবা মন্তব্য করে, "তুমি হয়তো আর একজন রাম সৃষ্টি করতে পারবে, কিন্তু আর একজন রাবণ? আর একটি হনুমান? এদের বাদ দিয়ে কি রামায়ণ হয়? তারপর যুধিষ্ঠির হয়তো একালেও সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু দ্রৌপদী বা কুন্তী? এঁদের বাদ দিয়ে কি মহাভারত হয়? রামায়ণ মহাভারতের মহত্ত্ব কোনখানে? যেখানে মানুষ আইডিয়াল সেখানে, না যেখানে মানুষ রিয়াল সেখানে?"

রত্ন এর উত্তর দিতে না পেরে গালে হাত দিয়ে বসে।

সেবা খিল খিল করে হেসে ওঠে। রত্নর দশা দেখে নয়, তার বাবার কাছে শোনা একটি কাহিনী স্মরণ করে। "জানো, এক নবার একবার এক পণ্ডিতকে ফরমায়েশ দিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে একখানা নতুন মহাভারত রচনা করতে। শুধু ফরমায়েশ নয়, জায়গা জমি সোনাদানা শালদোশালা। নবাব চেয়েছিলেন চিরস্মরণীয় হতে।"

"না, এ গল্প আমি শুনিনি তো!" রত্ন উৎকর্ণ হয়।

"তা হলে শোন। তোমার কাজে লাগবে।" সেবা গম্ভীরভাবে হাসি চাপে। "তা নবাব যতবার তাগিদ করেন পণ্ডিত বলেন, হচ্ছে, হবে। জায়গা জমি সোনাদানা সব হজম হয়ে যায়, তবু মহাভারতের পাত্তা নেই। শেষকালে নবাব রাগ করে হুকুম দেন, মুণ্ডু লে আও। পণ্ডিত তো বগলে এক তাড়া হিজিবিজি লেখা ভূর্জপত্র নিয়ে হাজির। নবাব তা দেখে বলেন, এর মধ্যে কী আছে? সব আছে, জাঁহাপনা, পণ্ডিত জবাব দেন, শুধু একটি কথা নেই, সেইজন্যেই তো এটি শেষ করতে পারা যাচ্ছে না। নবাব জানতে চান, কী কথা? পণ্ডিত কাঁপতে কাঁপতে বলেন, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি? নির্ভয়ে বলুন, নবাব অভয় দেন। তখন পণ্ডিত এক উদ্ভট প্রশ্ন তোলেন। যুধিষ্ঠিরের বেগমের তো পঞ্চ পতি। জাঁহাপনার বেগমের ক'জন—? পণ্ডিতকে আর উচ্চারণ করতে হলো না। তোবা তোবা করে নবাব সভা ছেড়ে পালান। নবাবী মহাভারত অসমাপ্ত রয়ে যায়।" এই বলে হেসে ওঠে সেবা।

রত্নও সে হাসিতে যোগ দেয়। মহাভারতের বোঝা তার ঘাড় থেকে নেমে যায়। বলে, "মহাভারতের চরিত্রগুলি পরস্পরনির্ভর। দ্রৌপদীকে বাদ দিলে যুধিষ্ঠির বা অর্জুনও

হয় না। তাদের পাঁচ ভাইয়ের সংহতিও থাকে না। দ্রৌপদীকে একনিষ্ঠ করলে নীতিশাস্ত্র হতো, কিন্তু মহাকাব্য হতো না। আমি নীতিশাস্ত্র লিখতে চাইনে, মহাকাব্যই লিখতে চাই। তেমনি আমার হাত দিয়ে রামায়ণ লেখা হলে সেটিও একটি ধর্মগ্রন্থ হবে না, হবে মহাকাব্য। রাবণ যার প্রতিনায়ক আর হনুমান যার অত্যাবশ্যক চরিত্র।"

সেবা রত্নকে সুপরামর্শ দেয়। "ওসব ভূতের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলাই উচিত। যা একবার সৃষ্টি হয়ে উঠেছে তা বরাবরের জন্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার পুনঃসৃষ্টি আর সম্ভব নয়। যেটা সম্ভব সেটা নবীন সৃষ্টি। হয়তো তেমনি মহান নয়, তবু নবজাত। এ যা বলছি তা কেবল রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে নয়, বেদ বেদান্ত ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধেও। সব মহান, সব অক্ষয়, কিন্তু তা বলে অনুকরণীয় নয়। অনুসরণীয় নয়। যেখানে যা আছে তাকে সেখানে রেখে নতুন কিছু চিন্তা কর, নতুন কিছু তৈরি কর। হয়তো ততদিন থাকবে না, তবু স্বনামা হবে। পিতৃনামা হবে না।"

রত্নর ভিতরেও একজন রিভাইভালিস্ট ছিল। যে প্রাচীন ভারতের পুনরুদয়ে বিশ্বাস করত। সেইসব মহান পুরুষ ও মহীয়সী নারী আবার আমাদের মধ্যে দেখা দেবেন। আমরা তাঁদের দেখে ধন্য হব আর তাঁদের নিয়ে মহাকাব্য লিখব। এই ভারত হবে মহাভারত। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের আবির্ভাব তার সূচনা।

রিভাইভালিস্টের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করত এক মডার্নিস্ট। একজন যেমন অতীতের দিকে মুখ করে বসে আছে, আরেকজন তেমনি পশ্চিমের দিকে চোখ মেলে। রত্নর মধ্যে দুটোই সমান প্রবল। অতীতমনস্কতা ও পশ্চিমমনস্কতা। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয় কেমন করে হবে এটাও তার গভীরতর ভাবনা।

জ্যোতিদা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সেবাও এতে বিশ্বাস করে না। সেবা বলে, "অতীত আমাদের মহান। কিন্তু বর্তমানকে মহান করতে হলে অতীতের অভিমুখে ফিরে যেতে হবে বা অতীতকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। এ ধারণা আমাদের মহামানবদের সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। তোমার গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের মধ্যেও। অথচ এঁরা পশ্চিমকেও অস্বীকার করতে পারছেন না। এঁরা কেউ বিশুদ্ধ ভারতীয় কবি যোগী বা সন্ত নন। এঁরা এমন এক দোটানায় পড়েছেন যার থেকে উদ্ধারের সহজ পন্থা সমন্বয়। কিন্তু সমন্বয় কি সত্যি অত সহজ ? রুশদের অমন কোনো অলীক ধারণা নেই। তাই ওরা দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে ডবল মার্চ করে। এপিক যদি লিখতে হয় তো রাশিয়ানরাই পারবে। কারণ ওদের জীবনটাই এপিকের উপাদান।"

টলস্টয়কে রত্ন তার অন্যতম গুরু বলে মানত। টলস্টয়োত্তর রাশিয়া তার মতে পথভ্রষ্ট। লেনিন সম্বন্ধে সে অতি সামান্য জানত। বিপ্লবকেও তার প্রাণে ভয়। সেইজন্যেই সেবার উক্তি তার কানে অমৃত বর্ষণ করে না। বলে, "রক্ত আর অশ্রু আর স্বেদ। এই হলো তোমার এপিকের উপাদান !"

"তোমার রামায়ণ মহাভারতেও কি রক্ত আর অশ্রু আর স্বেদ কিছু কম ?" সেবা সুধায়।

"তা হলে আমার অমন রামায়ণ মহাভারতে কাজ নেই। আমি প্রেমের কাহিনী লিখব। রক্ত আর স্বেদ আর অশ্রু আমার ধাতে সইবে না।" রত্ন হাত জোড় করে।

"তা আমাদের সমাজে প্রেমই বা কোথায়। থাকলে সেখানেও তো অশ্রু।" সেবা বলে খেদের সঙ্গে। "আর প্রেমের কাহিনী তো ব্যর্থতারই কাহিনী।"

"সব সত্যি। তবু ভালোবাসতে তো কেউ কাউকে মানা করে না। মানা করলেও মানুষের হৃদয় মানে না। আর হৃদয় যখন আছে তখন সুখদুঃখবোধও আছে। তাই দিয়ে শিল্প রচিত হয়। হোক না ব্যর্থতার কাহিনী। সবচেয়ে মধুর কাহিনীগুলিই তো করুণ রসাত্মক।" একথা বলার পর রত্নর মনে হয়, সে শুধরে দিয়ে বলে, "আদিরসাত্মকও কম মধুর নয়।"

সেবা তা শুনে লাল হয়ে যায়। "ধ্যেৎ! যতসব বিশ্রী কথা! তুমি কী করে জানলে? তোমার তো বিয়ে হয়নি এখনো।"

"বিয়ে হয়তো এজন্মে হবে না। তা বলে কি আমি ও রসে বঞ্চিত হব? যার রসের ভাণ্ডার অপূর্ণ সে সৃষ্টি করবে কী দিয়ে?" রত্ন সরসভাবে বলে।

সেবা তা শুনে বিরস হয়ে বলে, "শত্রু, তোমাকে তো আমি ভালো ছেলে বলেই জানতুম। কিন্তু তুমি যে কথা বলছ সে কথা ভালো কথা নয়। তার চেয়ে তুমি চটপট বিয়ে করে ফেল। এজন্মে হবে না কেন, নিকট ভবিষ্যতেই হবে।"

"বিয়ে তো আর যাকে তাকে করা যায় না। যাকে চাই সে যদি হয়ে থাকে আকাশের তারা আর আমি যদি হয়ে থাকি মাটির পতঙ্গ তা হলে তো এ জীবন চিরবিরহেই নিঃশেষ হবে।" এই বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রত্ন।

"মানছি সমস্যাটা শক্ত।" স্বীকার করে সেবা। "সারাজীবন অপেক্ষা করাই মহত্ত্ব, কিন্তু ক'জন পুরুষ তা পারে! পারলে মেয়েরাই পারে।"

"তা হলে তুমি আমাকে কী করতে পরামর্শ দাও, শত্রু?" রত্ন কাতরভাবে তাকায়। "আমি কি অনন্তকাল অপেক্ষা করব? যদি না পারি, তা হলে কি আর কারো সঙ্গে রসের সম্পর্ক পাতাব? না শুধুমাত্র সংসার ধর্মের তাড়নায় আরেকজনাকে বিয়ে করব? যার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই?"

"শক্ত। শক্ত। জবাব দেওয়া শক্ত।" কবুল করে সেবা।

"আমি তো দেখছি তিনটি নারী না হলে আমার চলবে না। যে নারী আমার হৃদয়ের প্রেম পাবে, যে নারী আমাকে রসের আস্বাদন দেবে, যে নারী আমার সঙ্গে সংসার করবে।" রত্ন লক্ষ করে সেবা কাঁদছে।

উনচল্লিশ

ভালোবাসার সঙ্গে ভালো লাগার যে তফাৎ গৌরীর সঙ্গে সেবার সেই তফাৎ। রত্ন একজনকে ভালোবাসে বলে আরেকজনকে ভালো লাগার থেকে বিরত হয় না। সেবাকেও তার চাই। বান্ধবীরূপে।

কিন্তু ওর মুখে ওইসব কথা শুনে সেবা মনে মনে আঘাত পায়। সেদিন আর কিছু বলে না। তবে দিনকয়েক বাদে চিঠি লিখে জানতে চায়, "তোমার আকাশের তারাটি কে? যদি আমি হয়ে থাকি তা হলে একদিন মাটিতে নেমে আসতে পারি। আর যদি আমি না হয়ে থাকি তা হলেও তোমার জন্যে চেষ্টা করতে পারি। যদি নামধাম জানতে পাই।"

এর উত্তরে রত্ন লেখে, "তুমি হলে আমার ভাবনা কী ছিল! কিন্তু কী করব! আমার আকাশে ও তোমার আগে ফুটেছে। নামধাম শুনতে চাও তো রেবাদির কাছে শুনবে।"

গৌরী যদি সেবার আগে না ফুটে পরে ফুটত তা হলেও কি ওই রত্নকে জয় করে নিত না? এখানে অগ্রপশ্চাৎ গণনা করা বৃথা। ভালো লাগা ও ভালোবাসার মধ্যে ভালোবাসাই প্রবলতব।

রেবার কাছে রত্নর আকাশের তারার পরিচয় শুনে সেবা তো হাঁ।

তেমনি সেবার চিঠিতে ওর এনগেজমেন্টের বার্তা পেয়ে রত্নও তো হাঁ।

আপাতত এনগেজমেন্ট, পরে এক সময় বিবাহ। পাত্রটি ডক্টর দাশগুপ্তর এক প্রাক্তন ছাত্র। অধ্যাপকের পদ না পেয়ে আবগারি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়েছেন। এতদিন সাহস করে প্রস্তাব করেননি। এবার নাকি কন্যাপক্ষের দিক থেকেই প্রস্তাব যায়।

ভালোই তো, মন্দ কী। রত্ন অভিনন্দন জানায়। সেবা যে খুব খুশি হয় তা নয়। তা বলে অখুশিও হয় না। মুকুল ও ছেলের তুলনায় মানুষ হিসাবে অনেক বড়ো। জীবনে প্রেমই কি সব? আর প্রেমই বা কোথায়? রত্ন তো ওকে ভালোবাসে না।

ওদের শত্রুতা সঙ্গে সঙ্গে চুকে যায় না। আরো কিছুদিন গড়ায়। সেবা একদিন বলে, "ভাবতে ইচ্ছা করে না যে বাজে ছেলেরা যা করে থাকে তুমিও তাই করবে। একজনের সঙ্গে প্রেম, আরেকজনের সঙ্গে প্রমোদ, শেষে আরো একজনের সঙ্গে সংসারধর্ম। আমার পরামর্শ শোন। ওসব বদখেয়াল ছেড়ে দাও।"

"ওঃ!" রত্ন রঙীন হয়ে বলে, "সেদিন ওটা আমি ভেবেচিন্তে বলিনি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, শত্রু। অমন করে কি আমি আমার আপনাকে ভেঙে তিনখানা করতে পারি? শেষ পর্যন্ত ওটা আমাকেই আঘাত করবে, সে কি আমি বুঝিনে? কিন্তু সমাধান কী তা বলতে পারো?"

"সমাধান আর কী হতে পারে?" সেবা বলে, "উনি ওঁর স্বামীকে ভালোবাসবেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসবে। স্ত্রীর কাছেই সব কিছু পাবে।"

"স্ত্রী! আমার স্ত্রী!" রত্ন অবাক হয়। "কার কাছে শুনলে?"

"আহা, দু'দিন বাদে তো বিয়ে হবে। পরীক্ষায় পাশ করলে দেখবে বিয়েরও আর দেরী নেই। বিয়ে না দিয়ে তোমার মা বাবা তোমাকে বিলেত যেতে দেবেন না। তুমিও লক্ষ্মী ছেলের মতো টোপর মাথায় দিয়ে বউ আনতে যাবে। ওসব আমি ঢের দেখেছি। তোমার বেলা ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না। তুমি তো সত্যি বাজে ছেলে নও। তুমি ভালো ছেলে।" সেবা সার্টিফিকেট দিয়ে আপ্যায়িত করে।

"শক্র, তোমার সার্টিফিকেটের যোগ্য হওয়া বোধ হয় আমার কপালে নেই। অমন বিয়ে আমি কোনোকালেই করব না।" রত্নর কণ্ঠে দৃঢ়তা।

"তা হলে যে এদেশে বিয়ে হবে না তোমার। ওঁর সঙ্গে বিয়ে একটা অসম্ভব স্বপ্ন। এক যদি আবার তুমি প্রেমে পড়, সাড়া পাও, সমাজের বাধা না থাকে। কিংবা আর কেউ যদি তোমার প্রেমে পড়ে, সাড়া পায়, সমাজের বাধা না থাকে।" সেবা বলে সহানুভূতিভরে।

"না, না, ওকথা ভাবা যায় না। বিয়ে অসম্ভব বলে প্রেমে আমি ভঙ্গ দেব না। যাকে ভালোবাসি তাকে ফেলে যাব না। ওকে মুক্ত করতে হবে, এর জন্যে আমাকেও মুক্ত থাকতে হবে। অপরাকে বিবাহের কথাই ওঠে না। তবে আমার যৌবনকে আমি ভয় করি।" রত্ন সলজ্জভাবে বলে।

প্রসঙ্গটা ভদ্র নয়। সেবা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

রত্নর মনে পড়ে যায় যে সেবার একটি কথার উত্তর দেওয়া হয়নি। বলে, "না, ও ওর স্বামীকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না। মাঝখানে আরেকজন আছে। ওর স্বামী যাকে বিয়ের আগে ভালোবাসতেন, পরেও বাসেন। জটিল ব্যাপারকে সরল করবে কে? করতে পারলে তো আমারও ছুটি। আমি যে দিন দিন জড়িয়ে পড়ছি। একটি শিশু এসেছে, আমার নয়, তবু তাকেও আপনার করে নিতে হবে। নয়তো সামঞ্জস্য হবে না।"

"কার সঙ্গে সামঞ্জস্য?" সেবা জিজ্ঞাসা করে।

"ওর সঙ্গে সামঞ্জস্য। ওর সন্তানের সঙ্গে সামঞ্জস্য। প্রেমের চেয়ে সামঞ্জস্যের প্রশ্নই আজকাল আমাকে বেশী ভাবায়। সামঞ্জস্য না হলে প্রেম কি স্থিতি পাবে? তা ছাড়া আমারও তো সন্তানক্ষুধা আছে।" বলতে বলতে রত্ন রক্তিম হয়।

সেবা তো শুনে থ! এই বয়সেই সন্তানক্ষুধা!

"তা তুমি এক কাজ কর। সৃষ্টির কাজ। ওই দিয়ে তোমার সাবলিমেশন হবে। এক একখানি সৃষ্টিও তো এক একটি সন্তান।" সেবা পরামর্শ দেয়।

কথাটা রত্নর মনে ধরে। এক একটি সৃষ্টিও তো এক একটি সন্তান। কিন্তু সেইসব শিশুর মা হবে কে? গৌরী। আবার কে!

গৌরীকে একথা লিখতে হবে। রত্ন মনে মনে সঞ্চয় করে রাখে এ চিন্তা। সেবাকে বলে, "তোমার পরামর্শ শুনব। তোমাকে শত্রু না বলে সচিব বলাই উচিত। তুমি কি আমার সচিব হবে?"

"এই প্রস্তাবটা," সেবা হেসে বলে, "আরো আগে করলেই পারতে। এখন আমি যে আরো একজনের সচিব হতে চললুম।"

এমনি করে সেবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু আড়াআড়ি নয়।

মেয়েতে ছেলেতে বন্ধুতার এইখানেই ইতি। নির্জলা বন্ধুতা যদি চাও তো মেয়েদের সঙ্গে নয়। অন্তত প্রেমের সম্ভাবনা থাকতে নয়।

মালা আর সেবা দু'জনের সঙ্গেই ছেদ পড়ে যাওয়ায় মেয়ে বন্ধু বলে আর কেউ

রইল না ওর। দুঃখের বিষয় বইকি। কিন্তু দুঃখ করবার মতো অবকাশ ছিল না। পড়াশুনার চাপে রত্নর দৈনন্দিন জীবন ভারাক্রান্ত। তারই ফাঁকে গৌরীকে চিঠি লিখতে হয়। গৌরীর চিঠি পড়তে হয়। ও মেয়েটি স্বল্পভাষিণী নয়। রাইটিং প্যাডে কুলয় না বলে ফুলস্ক্যাপ কাগজ ভরায়। কিংবা একসারসাইজ বুকের পাতা।

ওর স্বামীর কথা ও আর লেখে না। সুধার কথাও না। লেখে শিশুর কথা। কিন্তু শিশুর নাম যে নেপো এটা উল্লেখ করে না। রত্নর কাছে ওর নাম মানিক। যশে বাবুর কাছে ওর নাম নেপোলিয়ন। গৌরীর নিজের কাছে ওর অষ্টোত্তর শত নাম। আর একটি শ্রীকৃষ্ণ আর কী।

ও ছেলে বড়ো হয়ে ধনুর্ধর হবে এটা তো জানা কথা। যেটার কথা লোকে জানে না সেটা ওর অসাধারণ কবিপ্রতিভা। ও নাকি এক বছর বয়সেই অবোধ্য ভাষায় কথা বলছে কবিতার মতো করে। এ বিদ্যা ও পেল কার কাছে? রত্নর কাছে নয়তো?

কী জানি কী এক মিস্টিক প্রণালীতে রত্নর বিদ্যাবুদ্ধি বর্তেছে ওর মানস পুত্রের মনঃশরীরে। দেখতে অবিকল ওর বাপের মতো হলে কী হয়, স্বভাবটি তো ওর মানস পিতার মতো। সামঞ্জস্য আর কাকে বলে? এই তো কেমন সামঞ্জস্য! রত্নর আইডিয়া আর আইডিয়াল দিয়েই ওর মনঃশরীর গড়ে উঠছে। ও রত্নসঙ্কাশ।

জ্যোতির কথা গৌরী আগেকার দিনে বেশ ঘন ঘন লিখত। বিয়ের পরের দিন থেকে কদাচ কখনো। জ্যোতি নাকি এক নম্বর স্ত্রৈণ। ওর বউ নাকি কামরূপের কন্যার মতো ওকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে।

"তোমাদের জ্যোতিবাবুর কাণ্ড শুনবে? উনি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন যে উনিও একজন চাষা আর ওঁর গিন্নীও একজন চাষানী। কিন্তু হাল ধরতে বা ঢেঁকি কুটতে ওঁদের বড়ো একটা দেখা যায় না। ওঁদের সম্বন্ধে গুপ্ত খবর হলো ওঁরা তলে তলে একটা কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। মহাত্মার আশীর্বাদ পেলেই ওটা শুরু হয়ে যাবে। চাষীদের কানে মন্ত্র দেওয়া হচ্ছে, আওয়াব দিয়ো না, খাজনা বৃদ্ধি করলে খাজনা বন্ধ কোরো। কর্তার চেয়ে গিন্নী শুনছি আর এক কাটি সরেস। বলছেন, গাছ জমিদারের নয়, গাছ প্রজার। এর পরে একদিন বলবেন, জমি জমিদারের নয়, জমি প্রজার। কী ভয়ঙ্কর কথা! ইংরেজরা বিদেশী লোক, ওদের বেলা যা নিয়ম, জমিদাররা স্বদেশী লোক, তাদের বেলাও কি সেই নিয়ম? স্বদেশী বিদেশীর বাছবিচার নেই? জমিদার কি দেশের অর্থ বিদেশে চালান করে দিয়েছে? না প্রজার অর্থ প্রজার জন্যে অকাতরে ব্যয় করেছে? এই যে বারো মাসে তেরো পার্বণ, মেলা আর যাত্রা আর থিয়েটার, এসব কি শুধু জমিদার ঘরানাদের জন্যে? জমিদারের পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে কারা? জঙ্গলে কাঠ কুড়োয় কারা? রাস্তায় গোরুর গাড়ি হাঁকায় কারা? জ্যোতিবাবুদের ধারণা জমিদাররাও শোষকশ্রেণীর লোক। তা হলে আন্দোলনের জন্যে জমিদারদের কাছে চাঁদা চান কেন?"

এমনি অনেক কথা। জ্যোতির চেয়ে রেবার উপরেই আরো উষ্মা। চাষানীদেরও তলে তলে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। ওদের স্বামীদের যেন ওরা সাহস যোগায়। জমিদার বড়জোর

জমি কেড়ে নেবে। জমিতে লাঙল দিতে তো পারবে না। তখন ডাক পড়বে চাষীকেই। চাষী যেন সাফ জবাব দেয় যে লাঙল যার জমি তার। কী ভয়ানক কথা!

জ্যোতি বা রেবার সঙ্গে দেখা হয় না। ওরা আসে না, বলে ওদের কাজ আছে। এরাই বা যায় কী করে! গেলে পুলিসে রিপোর্ট যাবে। গোরীর মনের ইচ্ছা জ্যোতিকে নিবৃত্ত করা। সিপাহী বিদ্রোহ এক জিনিস। কৃষক বিদ্রোহ আরেক। জ্যোতি যদি সিপাহী বিদ্রোহকে ঘটিয়ে তুলতে পারত তা হলে গোরীও ঝাঁপিয়ে পড়ত। যাই মনে করে করুক ইংরেজ। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ কার কোন্ কাজে লাগবে? ওতে কি দেশ স্বাধীন হবে? কেবল হতভাগ্য জমিদার শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা! জমিদার উৎখাত হলে প্রজাও কি বাঁচবে? প্রজার উপর সরকারের অত্যাচার বেড়ে যাবে। জমিদার ভক্ষক নয়, রক্ষক। চাষীর মা বাপ। জমিদারই দেশের রাজা। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে রাজদ্রোহ।

চল্লিশ

জ্যোতিদা মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসে। রত্নর সঙ্গে দেখা হয়। গোরীর কথা ওঠে। গোরীর চিঠির কথা। কৃষক বিদ্রোহের প্রস্তাবনার কথা।

"ওঃ! লিখেছে নাকি গোরী ও কথা!" শুনে আমোদ পায় জ্যোতিদা। আর বলে, "ও এখন রুশদেশের জারিনা। ওর ছেলে একদিন রাজ্যপাট পেয়ে জার হবে। মানে, জমিদারি পেয়ে জমিদার। কে ওকে বোঝাবে যে ে ট চিরন্তন নয়? না জার, না জমিদার। আমি শুধু চেষ্টা করছি যাতে ওদের মাথা কাটা না যায়, যাতে ওরা ভালোয় ভালোয় বিদায় হয়। বলতে গেলে আমিই তো ওদের সেভিয়ার।"

জ্যোতিদা আরো একটু খোলসা করে। "দ্যাখ, আমিও ওই শ্রেণীভুক্ত। স্বশ্রেণীর প্রতি আমার কি মায়ামমতা নেই? কিন্তু জমিদারকে ভালোবাসা এক জিনিস আর জমিদারিকে ভালো বলা আরেক জিনিস। জমির উপর কার অগ্রাধিকার? জমিদারের না চাষীর? এই প্রশ্নের উত্তর গোরী দিতে চায় একভাবে, আমি দিতে চাই আরেকভাবে। মতবিরোধ অপরিহার্য। জমিদাররা যদি চাষীদের অগ্রাধিকার আপসে মেনে নেয় তা হলে জমিদারও থাকে, চাষীও থাকে। বাঁচো আর বাঁচাও. এই নীতিই আমার নীতি। আমি তো সত্যি লেনিন নই যে বলব, জমিদাররা পা দিয়ে ভোট দিক।"

রত্ন তা শুনে অবাক হয়। লেনিনটা তো বড়ো বদলোক! একটুও দয়ামায়া নেই। মৌমাছিকে তাড়িয়ে দিয়ে মৌচাক দখল করা!

"ওল্ড অর্ডার টিকবে না, রতন। তার উপর পা রেখে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের পতন অনিবার্য। তা বলে তাদের আমি তাড়িয়ে দিতে চাইনে। তারা চাষীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গা গতর খাটিয়ে বাঁচুক। এমন কি ইংরেজদেরও আমরা বেরিয়ে যেতে বলছিনে। থাকুক না ওরা। শুধু আমাদের ইচ্ছায় চলুক।" জ্যোতিদা এমনভাবে বলে যেন ওর অথরিটি আছে।

"গোরী কিন্তু চায় ইংরেজদের তাড়াতে, জমিদারদের না তাড়াতে। একদলকে তাড়ালে পরে আরেক দলকেও তাড়াতে হবে, এর লজিক ও মানবে না। ওকে বোঝানো দায়। শেষকালে আমার সঙ্গে না আড়ি হয়ে যায়।" রত্ন মুচকি হাসে।

"ওর সঙ্গে কিছুদিন থাকলে তুমি নিজেই টের পাবে যে ও যেমন নারীর জন্যে মুক্তি চায় তেমনি চাষীর জন্যে মুক্তি চায় না। চাষী যেমন গোরুর সঙ্গে গোরুর মতো খাটছে তেমনি জোয়াল কাঁধে চিরটাকাল খাটবে। কোথায় এর মধ্যে লজিক ?" জ্যোতিদা দুঃখ করে।

"ওর সঙ্গে কিছুদিন থাকার সুযোগ পেলে তো ?" রত্নও আক্ষেপ করে।

জ্যোতিদা বলে, "লিবারেশন জিনিসটা বিচ্ছিন্ন নয়, রতন। নারীর মুক্তি যেমন চাই তেমনি চাই চাষীর মুক্তি, চাষীর মুক্তি যেমন চাই তেমনি চাই মজুরের মুক্তি। এসব যদি না পাই তো দেশের মুক্তি আমার কাছে যথেষ্ট নয়। দেশ স্বাধীন হোক, এখানে গোরী আর আমি একমত ও এক পথের পথিক। নারীর মুক্তি হোক, এখানেও আমরা এক। কিন্তু এর পরে ও আর একটি পাও এগোতে চায় না। ও যে ফিউডাল যুগের লেডী।"

"তা বলে আমিও কি, ফিউডাল যুগের নাইট ?" রত্ন চমকে ওঠে।

"না, না, তুমি ফিউডাল যুগের কেউ নও। তুমি এ যুগেরই ফেমিনিস্ট। আমিও তাই। সেই জন্যেই তো তোমার সঙ্গে এত বনে।" জ্যোতিদার কণ্ঠস্বরে স্নেহ।

"আমি তোমার উপরে গোরীর ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত রয়েছি, রতন। তুমি যেমন একব্রত তুমিই পারবে। নারীর মুক্তির চেয়ে চাষীর মুক্তি আমার কাছে আরো জরুরী। শুনেছি গান্ধীজী নাকি বারডোলিতে সত্যাগ্রহ করবেন। এখন নয়, পরে এক সময়। বারডোলিতে সত্যাগ্রহ শুরু হলে সে আগুন কি সেইখানেই থামবে ? কাপালিপাড়ায়ও লাগবে। লাগাবে কে ? সে আমি। তখন যদি আমি তোমাদের সঙ্গে বম্বেতে বসে থাকি তো আমার জীবনের পরম লগ্ন এসে ফিরে যাবে। আমাকে তুমি মুক্ত করে দাও, ভাই।"

"আমি মুক্ত করে দিলে কী হবে ? গোরী কি তোমাকে মুক্ত করে দেবে ? আমি যতদূর জানি ও মন থেকে তোমাকে ছাড়েনি। মনে মনে আশা করছে রেবাকে ছেড়ে তুমি ওর সঙ্গে যাবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। ওর পরিকল্পনায় তোমার স্থান পূরণ করতে হবে তোমাকেই। আমি করব আমার স্থান পূরণ। কেবলমাত্র একজনের সঙ্গে মিলে ঝাঁপ দিতে ওর অন্তরের অনিচ্ছা। তার চেয়ে ও অনন্তকাল অপেক্ষা করবে। আগে তো ওই সব চেয়ে অধীর ছিল, আমরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম। এখন দেখছি টেবিল উল্টেছে। ওর মধ্যে তেমন অধীরতা নেই, যেমন আমার মধ্যে। আমি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে নারাজ।" রত্ন কী যেন চাপতে চায়।

"খুলে বল, যদি বলার মতো হয়ে থাকে।" অভয় দেয় জ্যোতিদা।

"আমার মধ্যে দুটো শক্তি কাজ করছে। প্যাশন আর কম্প্যাশন। গোরীর দুর্দশা দেখে আমি কম্প্যাশন অনুভব করি। আর তার মোহন রূপ দেখে প্যাশন। কম্প্যাশন

ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসছে, কারণ ওর উপর জোরজুলুম বন্ধ হয়ে আসছে। এদিকে প্যাশন কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে। এখন আমিও ওর মুক্তির জন্যে অধীর। ও আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ।" রত্ন অকপটে বলে। বলতে গিয়ে রেঙে ওঠে।

আশ্চর্য হবার মতো কিছু নয়। তা হলেও এই প্রথম শুনছে বলে জ্যোতি হকচকিয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, "যেখানে প্রেম আছে সেখানে প্যাশনও আছে। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। আর কম্প্যাশন তো যেখানে প্রেম নেই সেখানেও দেখতে পাই। দুঃখিত হব যেদিন শুনব যে তোমার মধ্যে শুধু কম্প্যাশনই কাজ করছে। প্রেমের আগুন নিবে গেছে।"

"আর সেদিন", জ্যোতিই আবার বলে, "গোরীও কি তোমার সঙ্গে যেতে চাইবে? তোমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল বলেই তো আমাকেও টেনেছিল যাতে আমি নৈতিক সমর্থন যোগাই। নীতির জন্যে আমি। প্রীতির জন্যে তুমি। হাঁ, আমিই ওকে শিখিয়েছিলুম যে ওটা পাপ নয়, ইউরোপে অমন কত হয়।"

"কেন, ভারতেও কি হয় না?" রত্ন বিস্মিত হয়।

"ভারতে যেটা হয় সেটার কোনো বৈপ্লবিক তাৎপর্য নেই। যারা যায় তারা সমাজের বাইরে চলে যায়, আর ফিরে আসে না। তোমরা তো সমাজ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছ না। সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে সামাজিক মানুষের মতো বাস করতে যাচ্ছ। তোমরা পলাতক নও, তোমরা বিদ্রোহী।" জ্যোতিদা জোর দিয়ে বলে।

রত্ন তাতে যথেষ্ট বল পায়। "ঠিকই তো।"

জ্যোতি বলে যায়, "এই নিয়ে রেবার সঙ্গে মতের অমিল। ও আমাকে হুঁশিয়ারি দেয়। 'শেষে আর একটি আনা কারেনিনা যেন না হয়। নারীর রক্ত তোমার হাতেও লাগবে। সে দাগ তুমি মুছে ফেলতে পারবে না। রত্নকেও নিবৃত্ত কর। গোরীকেও আর প্রশ্রয় দিয়ো না।' দেখছ তো, টলস্টয় কেমন একখানা বই লিখে গেছেন? যেন নারীর পক্ষে বিদ্রোহের যথেষ্ট হেতু ছিল না। সমাজের পক্ষে পরিবর্তনের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল না। যেন ওটা নিতান্তই একটা অসামাজিক ব্যাপার।"

গোরীর দশা একদিন আনার মতো হতে পারে একথা ভাবতেই রত্নর চোখে জল আসে। কিন্তু কেন? কেন অমন হতে বাধ্য? এমন কী অবশ্যম্ভাবিতা আছে ওতে?

"অবশ্যম্ভাবিতা আছে জানলে আমি কেন ওকে প্ররোচনা দিতুম? অবশ্যম্ভাবিতা নেই, কিন্তু ঝুঁকি আছে। যশোবাবু ওকে ওর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না। কারেনিন যেমন আনাকে দেননি। কারেনিন ডিভোর্সও তো প্রথমে দিতে চেয়ে পরে দিলেন না। দিলে কি আনা অত নিঃসহায় বোধ করত! ইউরোপের মেয়েরা ডিভোর্সের স্বাধীনতা অনেকটা আদায় করে নিয়েছে। তাই ওরকম ট্র্যাজেডী আজকাল আর ঘটে না। ভারতেও তাই হবে। তার জন্যে গোরীকেই অগ্রণী হতে হবে।" জ্যোতিদা বিধান দেয়।

জীবন কখনো কখনো আর্টের অনুবর্তন করে। রত্ন ও শ্রীমতীর জীবন যদি আনা কারেনিনার অনুবর্তন করে তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ যুগের ভারত তো ও

যুগের রুশ দেশের মতোই ঘোরতর রক্ষণশীল। টলস্টয় বলতে গেলে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছেন। তা বলে গৌরী তো আনা নয়, রত্নও ভ্রনস্কি নয়, দু'জনের কামনাপূরণও হয়নি, সন্তানও হয়নি।

মাঝখানে জ্যোতিদা থাকলে কত ভালো হতো! ওর উপস্থিতি যেন একটা নিশ্চিতি যে গৌরী রত্নকে ভুল বুঝে ওর উপর রাগ করে দুম করে হঠাৎ কিছু করে বসবে না।

"আমার নৈতিক সমর্থন সব সময় তোমাদের পক্ষে। কিন্তু কায়িক উপস্থিতি আর সম্ভব নয়। রেবা ভুল বুঝবে। সেও ভুল বোঝার ঊর্ধ্বে নয়। এখনো তাকে আমি কনভিন্স করতে পারলুম না যে গৌরীর বিবাহ ওর অমতে হয়েছে বলে সে বিবাহ রদ করার অধিকার ওর আছে ও তারপরে তোমাকে বিয়ে করার বা তোমার সঙ্গে বাস করার অধিকারও অযথা নয়। ও যে বিশ্বাসই করতে চায় না যে গৌরী নিশ্চিতকে ছেড়ে অনিশ্চিতের আশায় ঝাঁপ দেবে। আসলে ওরও একটা ব্রাহ্ম সংস্কার আছে। সেটা হিন্দু সংস্কারেরই নামান্তর। ডিভোর্স ও দু' চক্ষে দেখতে পারে না। বিশেষত যে মেয়ের কোলে সন্তান এসেছে তার। সন্তানের স্বার্থেই ওকে নিজের স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। জানিনে গৌরী মা-হবার আগে রেবা এলে কী হতো!" জ্যোতিদা দুঃখের সঙ্গে বলে।

"তা তুমিই বা সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেলে কেন? যখন জানতে যে গৌরী মা হয়েছে ও রেবার মনোভাব বিরূপ।" রত্ন অনুযোগ করে।

"তুমি কি জানো না যে চাষ করতে গেলে যেমন হাল লাঙল লাগে তেমনি লাগে একটি চাষানী বা চাষীবউ? নইলে চাষ কখনো ইকনমিক হয় না। এতদিন আমি যার সন্ধানে ছিলুম এই সেই মেয়ে। যে আমাকে ভালোবেসে চাষীবউ হতে রাজী। চাষীরা যদি কোনো দিন বিদ্রোহী হয় সেদিন ওই আবার বিদ্রোহিণী হবে। জেলে যাবে। লাঠির বাড়ি খাবে। গুলীও খেতে পারে, এত তেজ।' জ্যোতি পঞ্চমুখে বলে।

"সবই তো ভালো, কেবল আমাদের উপর বিরূপ।" রত্ন আক্ষেপ জানায়।

"তোমাদের তাতে কী আসে যায়? তোমাদের সংকল্প স্থির থাকলেই হলো।" এই বলে জ্যোতিদা হাত বাড়িয়ে দেয়। "আমরা ধান কেটে নবান্ন করছি। তোমাকেও নিমন্ত্রণ। এলে সুখী হব, কিন্তু পরীক্ষার ক্ষতি করে নয়। দেখবে চাষী ও চাষানীর সংসার কাকে বলে। রেবা আজকাল রূপোর খাড়ু পরে, জানো। কোমরে আঁচল বেঁধে রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে ঝাঁট দেয় গোবর তোলে ঘর নিকোয় ছাই ফেলে কাপড় কাচে গাই দোয়। কারো কারো মতো পটের বিবি নয়।"

একচল্লিশ

নবান্নের সময় ইচ্ছা থাকলেও যাবার উপায় নেই। পরীক্ষার তাড়া। এই তার জীবনের শেষ পরীক্ষা। চরম পরীক্ষাও বটে। হেরে গেলে গৌরীকেও হারাবে। জিতলে পাবার আশা আছে। গৌরীর দিক থেকে ভেবে দেখতে গেলে এইটেই ওর মুক্তির অন্তিম সুযোগ।

"অর্জুনের মতো তুমিও লক্ষ্যভেদ করবে।" লিখে পাঠায় গোরী। সেও বোঝে এখন সব কিছু নির্ভর করছে একটি শরক্ষেপের উপর।

পরীক্ষার হলে শত শত পরীক্ষার্থীর সমাবেশ। সকলে না হোক অনেকেই সীরিয়াস। কিন্তু রত্নর মতো আর কারো জীবনে তেমন কোনো সঙ্কট ঘনিয়ে আসেনি। আর কেউ তেমন জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন নয়। কৃতকার্য হওয়া আর কারো পক্ষে তেমন জরুরি নয়।

রত্ন উপনিষদের উপদেশ স্মরণ করে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি। শরের মতো তন্ময় হও। হে সোম্য, সেই বেদ্ধব্যকে বিদ্ধ কর।

পরীক্ষার ভীতি আর পাঁচজনের মতো রত্নরও ছিল। কিন্তু একবার পরীক্ষায় বসার পর সে ভয় কোথায় উবে গেল। পরীক্ষা যখন সারা হলো তখন সে অন্তরে প্রতীতি পেল যে, একজনমাত্রকেও যদি নেওয়া হয় তবে সেজন রত্ন।

"এবার আমার শরকে কেউ রুখতে পারবে না। সে লক্ষ্যভেদ করবেই। কেউ কি তখন পাঞ্চালীর মতো আমার কণ্ঠে মালা দেবে? না, তখনো বলবে অপেক্ষা করতে? আর চারমাস পরে আমি জানতে পাব কী আছে আমার বরাতে। জয়লাভসত্ত্বেও জয়মাল্য থেকে বঞ্চিত হব না তো?" রত্ন লেখে গোরীকে।

"আগে তো জয়লাভ কর, তারপর জয়মাল্যের প্রশ্ন উঠবে।" গোরী উত্তর দেয়।

পরীক্ষা তো হয়ে গেল, এখন আর কিছু করণীয় নেই। এম-এ ক্লাসে হাজিরা দিতে পারা যায়। কিন্তু দিয়ে কী হবে। আরো একটা পরীক্ষা দিতে তার না ছিল কায়িক শক্তি, না মানসিক সামর্থ্য। সে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমন নিঃশেষিতভাব জীবনে অনুভব করেনি। আরো একটা পরীক্ষার দরকারটাই বা কী, যদি তার আগেই প্রতিযোগিতায় জিতে বিলেত চলে যায়? গোরীর মুক্তির সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই তেমন এক পরীক্ষা না দিলেই বা ক্ষতি কী? মুক্তি যদি হবার থাকে তো চার মাস পরেই জানতে পারা যাবে, আরো ছ'মাস পরে নয়। অনাবশ্যক কালক্ষয় করতে রত্নর একটুও ইচ্ছা ছিল না। সে তার ধৈর্যের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে সে গোরীকে আর মুখ দেখাবে না। এম-এ পরীক্ষাও দেবে না। ভারমুক্ত হয়ে অকূলে ভেসে যাবে।

বন্ধুবান্ধবদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে রত্ন একদিন কলকাতা ছেড়ে জামালপুর যাত্রা করে। সেখানে প্রভাত রেলওয়ে অফিসার। ওর বিয়েতে সাতভাই চম্পার সবাইকে নিমন্ত্রণ। তা বলে সকলেই যে আসবে এমন কোনো কথা নেই।

রত্ন ছাড়া ওদের দলের আরো একজন যোগ দিতে এসেছে। ললিত। অনেকদিন বাদে দুই বন্ধুতে দেখা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

"জাপান থেকে কবে ফিরলে? কই, খবর পাইনি কেন?" রত্ন জবাবদিহি চায়।

"এই তো সবে ফিরছি। তোমার পরীক্ষার ব্যাঘাত হবে বলে চিঠি লিখিনি। ভেবেছিলুম তোমার পত্রপ্রেরিকাই তোমাকে জানাবে।" ললিত কটাক্ষ করে।

কথাবার্তায় বোঝা গেল ললিত গৌরীর উপর তেমন প্রসন্ন নয়। কথায় কথায় খোঁচা দেয়। ব্যাপার কী? এই ক'দিনের মধ্যে এমন কী ঘটল?

"তুমি কি শোননি যে দিদিকে ওরা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে? যেমন তোমার যশোবাবু তেমনি তোমার গৌরী। দিদি যেন ওদের পথের কাঁটা। তা ওরা কর্তাগিন্নীতে বোঝাপড়া করে শান্তিতে থাকুক। কেই বা চায় অশান্তি? দিদি তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ওদের মাঝখানে শান্তি স্থাপন করতে। তা বলে দিদিকে ওর স্নেহনীড় ছাড়তে হবে কেন? এটা কোনদেশী বিচার?" ললিত গজগজ করে।

"কই, আমি তো অত কথা শুনিনি? আমার ধারণা তোমার দিদি স্বেচ্ছায় ওদের বাড়ী থেকে তোমাদের বাড়ী চলে গেছেন।" রত্ন নিরীহভাবে বলে।

"ওদের বাড়ী! আর কারো বাড়ী নয়?" ললিত রাগতভাবে বলে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদিরও আত্মীয়বাড়ী। আমারি ভুল।" রত্ন স্বীকার করে।

"তোমার ভুলের মূলে আর কারো প্রেরণা কাজ করছে নিশ্চয়। নইলে তুমিই বা অমন ভুল করবে কেন? যাক, দিদি যে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে এটা যারা তোমাকে বলেছে তারা জেনেশুনে মিথ্যা বলেছে। অবশ্য এমন একটা সময় এল যখন দিদিকেই মুখ ফুটে বলতে হলো, আমি থাকতে শান্তি নেই। আমার চলে যাওয়াই শ্রেয়।" ললিতও স্বীকার করে।

এর পরে জাপান নিয়ে দুই বন্ধুতে জমে যায়। দিদির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে। কিন্তু পরে আবার ওঠে। রত্ন জানতে চায়, দিদি ফিরে যাচ্ছেন না কেন? বাধা দিচ্ছে কে? দেবার অধিকারই বা আছে কার? বাধা দিলে মেনে নিচ্ছেই বা কে?

"বাধা দিচ্ছি আমরাই। ওদের অন্তঃপরিবর্তন না হলে দিদি ও বাড়ীতে একটুও শান্তি পাবে না। হবে অন্তঃপরিবর্তন। তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গৌরীই সাধাসাধি করে চিঠি লিখছে। ওর বাচ্চাটা আবার দিদিকে খুব ভালোবাসে কিনা।" ললিত সরল মনে বলে।

প্রভাত ও সুলেখার অসবর্ণ বিবাহে গুরুজনরা কেউ আসেননি। রেলওয়ে কলোনিও দ্বিমত ছিল। অনেকেই বিপক্ষে। তাই বিয়েটা হলো বেশ একটু ঘরোয়াভাবে। ঘটা করে নয়। তা হলেও প্রভাত যা করেছিল তা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে আর কেউ কখনো করেনি। রেজিস্ট্রেশন তো হলোই, তারপরে হলো আর্যসমাজী মতে হোম আর ব্রাহ্মসমাজী মতে আচার্যের ভাষণ। আচার্য হলেন ওর পুরাতন হেডমাস্টার মশায়। অতি সজ্জন ব্যক্তি।

বিয়ের পর ললিত বলে, "তুমি তো পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দিয়েছ। এখন তোমার কলকাতা বা কুষ্টিয়া গিয়ে কাজ কী? তার চেয়ে চল না আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী।"

রত্নর হাতে কাজ ছিল না। শরীরও চায় দম নিতে। মনের ভিতরেও এমন জট পাকিয়ে গেছে যে জট খোলার জন্যেও চাই অখণ্ড অবসর। তা ছাড়া দেশ দেখার শখ তো চিরদিনের। ললিতের প্রস্তাবে সে খুশি হয়ে সম্মতি দেয়।

সমস্ত বাধাবিঘ্ন একে একে অতিক্রম করে প্রভাত ও সুলেখা বিধিমতো মিলিত হয়েছে। এখন আর কী। 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' সারা জীবনটাই যেন

একটানা একটা মধুমাস। প্রভাত গদগদভাবে বলে, "তোমাদের বেলাও যেন তাই হয়, রতন।"

ললিত কিন্তু বিয়ের পর থেকে দস্তুরমতো রিয়ালিস্ট হয়েছে। রত্নকে নির্জনে পেয়ে বলে, "বিয়ের আগে হাজারটা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারো, কিন্তু সব চেয়ে বড়ো পরীক্ষাটাই যে বিয়ের পরে। তোমাদের বেলাও তার ব্যত্যয় হবে না, রতন।"

রত্ন বুঝতে পারে না ললিত কিসের ইঙ্গিত করছে। বিয়ের পরে তো সব মধুময়, যদি দু'পক্ষে ভালোবাসা থাকে। অবশ্য ভালোবাসা না থাকলে বা একপক্ষে না থাকলে অন্য কথা।

"তুমি একটার পর একটা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারো, কিন্তু উলউইচে গিয়ে যেদিন ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দেবে সেদিন তোমার অগ্নিপরীক্ষা। অরবিন্দ যে অরবিন্দ তিনিও সে পরীক্ষায় ফেল।" ললিত ভয় দেখায়।

রত্ন ধরতে পারে না ললিত কী বোঝাতে চাইছে। কিসের জন্যে এ গৌরচন্দ্রিকা। "ভেবেছিলুম আমার সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এবার পাস করলে সেই হবে চূড়ান্ত। তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করলে ললিত, যে পরীক্ষার শেষ নেই। ও যেন রক্তবীজের বংশ।"

গলা খাটো করে ললিত বলে, "তেমনি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তোমার সামনে আরো একটা পরীক্ষা আসবে। সেটা তোমাদের বিয়ের পর।"

"আমাদের বিয়ে!" রত্ন করুণ হেসে বলে, "আমাদের বিয়ে কি কোনোদিন হবে! কবে স্বরাজ হবে, হিন্দু আইন বদলাবে, ততদিন বেঁচে থাকলে হয়।"

ললিত সমব্যথা জানায়। "তখন যদি আমার সঙ্গে জাপান যেতে তা হলে ওদেশে অত বাধা পেতে না। বৌদ্ধ হতেও তোমাদের সংস্কারে বাধত না। কিন্তু যে কথাটা আজ আমি তোমাকে বোঝাতে চাই সেটা তা নয়। ধরো, কাল সকালেই স্বরাজ হলো, পরশু আইন পালটাল, তরশু তোমাদের বিয়ে। তারপরে কী? সারাজীবনটাই হানিমুন? না, বন্ধু। আরো একটা পরীক্ষা আছে। তার নাম পুরুষপরীক্ষা।"

রত্ন এবার খানিকটে আঁচ করতে পারে। সভয়ে নীরব থাকে।

ললিত একবগ্‌গা লোক। যা ধরে তা ছাড়ে না। বলে, "মেয়েদের হাতে একবার ক্ষমতা এলে আর ডিভোর্স একবার চালু হলে ক'টা বিয়ে তিনদিন টিকবে মনে কর? ওরা বাজিয়ে নেবে কে পুরুষ, কে পুরুষ নয়। এতদিন আমরাই বাজিয়ে নিয়েছি আর ডিভোর্স না করেই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছি। বা অন্য স্ত্রীলোক।"

রত্নর এসব শুনে কাঁপুনি ধরে। এত যে ভালোবাসা, এত যে ত্যাগস্বীকার, এ কি কোনো কাজেই লাগবে না, যদি পুরুষপরীক্ষার সময় নারীর বিচারে সে নামঞ্জুর হয়!

"নারীই কি এর একমাত্র বিচারক ও তার বিচারই কি চূড়ান্ত বিচার? আর কোনো আদালত বা আপীল নেই?" রত্ন বিমূঢ় হয়ে শুধায়।

"না। সেইজন্যেই তো আমি হিন্দু আইন পরিবর্তনের বিপক্ষে। তোমরা বলবে প্রতিক্রিয়াশীল। গোরী তো আমার মুখদর্শন করবে না। কিন্তু একবার যদি মেয়েদের হাতে

ক্ষমতা আসে ওদের পরীক্ষায় কে যে পাস করবে আর কে যে ফেল, তা দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। রত্নকান্ত, তোমাকে আমি একজন বিবাহিত পুরুষ হিসাবে সাবধান করে দিচ্ছি। নারীর মুক্তি বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে পুরুষপরীক্ষাও পড়ে। আর সে পরীক্ষার ওরাই পেপার-সেটার, ওরাই পরীক্ষক, ওরাই সর্বেসর্বা।" ললিত ভয় জাগায়।

"বেশ তো আমার ভয় কিসের?" রত্ন সাহসে বুক বাঁধে। সে কি পুরুষ নয়?

"মনে রেখো ফাইনাল টেস্ট হচ্ছে রাইডিং টেস্ট।" ললিত ওইখানেই দাঁড়ি টানে।

রত্নও ওই নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। দুনিয়ায় আর কি কোনো কথা নেই?

জ্যোতিদা ও রেবাদির প্রসঙ্গ উঠলে ললিত শ্লেষের সঙ্গে বলে, "ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হতে গিয়ে ওরা ভুলে যাচ্ছে যে ওর নীট ফল হবে ছোটলোকিস্থান।"

রত্ন দেখে যে জাপান থেকে ললিত একটি ফাসিস্ট বনে এসেছে। ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তবে আশা ছেড়ে দেয় না যে বন্ধুর সাহচর্যে ওর মতবাদ ধীরে ধীরে লিবারল হবে। সেই কথা ভেবে ওর সঙ্গে নুরপুর রওনা হয়। ভাগীরথী তীরে।

বিয়াল্লিশ

নুরপুরে টেনে নিয়ে গেল ললিত নয়, ললিতের দিদি সুধা। কিংবা বলতে পারা যায়, নিয়তি। যে শক্তি সকলের অগোচরে কাজ করে যাচ্ছে, কাউকে জানতে দিচ্ছে না।

সুধাদিকে চিনতে একমুহূর্ত দেরি হয় না। বেগমপুরে ক্ষণেকের জন্যে দেখা হয়েছে যদিও। অত্যন্ত মধুর স্বভাবের মহিলা। কিন্তু এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেছেন। হয়তো এককালে চোখ ঝলসে দেবার মতো রূপ ছিল। এখন নিষ্প্রভ।

"হাঁ রে, তোর চেহারা অমন প্যাঁকাটির মতো হয়েছে কেন! যেখানে থাকিস সেখানে খেতে দেয় না?" সুধাদি রত্নকে যত্ন করে খাওয়ান।

রত্নও জিজ্ঞাসা করতে পারত, আপনারই বা এ দশা কেন? রাতে ঘুম হয় না?

এটা সেটার পর গৌরীর প্রসঙ্গ ওঠে। সুধাদিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেন, "গৌরী দিন দিন শতদলের মতো ফুটে উঠছে, রতন। মাতৃত্বের মতো এ সংসারে আর কী আছে! আর কী চমৎকার ছেলে ওই নেপো! আমি ওকে নেপো না বলে ডেঁপো বলি। যা দুষ্টু! ও ছেলে বড়ো হলে একটা কিছু করবে।"

ললিত ফোড়ন দেয়, "হাঁ, আর একটি সিপাহীবিদ্রোহ। বাইশ বছর বয়সে, ১৯৫৭ সালে।"

"ও কি তা হলে নানাসাহেবের অবতার?" রত্ন পরিহাস করে।

"আমি তো সেইজন্যে নানাসাহেব বলে ডাকি।" ললিতও হাসে।

কথায় কথায় সুধাদি বলে, "গৌরীর এখন পরিপূর্ণ সংসার। অমন সংসার ফেলে ও যাবে কোথায়! কার হাতে দিয়ে যাবে? তা কি কখনো হয়?"

রত্ন বুঝতে পারে যে সুধাদি সব জানেন। দিদি হিসাবে ওকে নিবৃত্ত করতে চান। ও কিছু বলে না, শুধু শুনে যায়।

"আমিও বলি যে, কাজ কী কোথাও গিয়ে? যে মানুষ ষোল আনার জন্যে বারো আনা ছেড়ে যায় সে কি ঠিক জানে যে ষোল আনা তার কপালে জুটবে? যদি না জোটে তখন কী হবে? আবার সেই বারো আনার কাছে ফিরতে হবে তো? ততদিনে বারো আনাও হয়তো বেহাত। তখন একূলও গেল ওকূলও গেল। পুরুষ ছেলে ও-ঝুঁকি নিতে পারে। নেয়ও। কিন্তু মেয়েছেলে কি নেয়, না নিতে পারে কখনো?" তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন।

"হাঁসের জন্যে যে আচার হাঁসীর জন্যে তা নয়।" ফোড়ন দেয় ললিত।

রত্ন তা শুনে হেসে অস্থির। সস্ হলো কিনা আচার!

ললিত হাসিয়ে হাসিয়ে বলে, "হাঁসীর কথা হাসির কথা নয়।"

সুধাদি নিজের কথা ভেঙে বলতে চান না। তিনি স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন না বিতাড়িত হয়েছেন রহস্যভেদ করতে পারে না রত্ন। কবে ফিরে যাচ্ছেন জানতে চাইলে বলে, "আমার স্থান যেখানে স্থিতি সেখানে। আমার ভাইদের প্রয়োজন্ বেশী। ওদের প্রয়োজন কম। ওরা আমাকে গভর্নেসের চাকরি নিতে ডাকছে। ডেঁপোর গভর্নেস! তা আমার ভাইপো ভাইঝিরা আমাকে ছাড়লে তো! আমার চোখে ডেঁপোও যেমন হেবোও তেমনি, আর টুনীও কিছু কম নয়। এরাই দলে ভারী। আজকাল তো সব কথায় ভোট।"

সুধাদি যে বিষম আঘাত পেয়ে চলে এসেছেন এটা তো পরিষ্কার। আঘাতটা পেলেন কার কাছে, গৌরীর কাছে না যশোবাবুর কাছে তা জেনে কী হবে? রত্ন কেঁচো খুঁড়তে যায় না। শেষকালে কি কেউটের ছোবল খাবে?

"যে বউ কতকাল বাদে মা হয়েছে, ছেলের মা, তারই তো সব চেয়ে বেশী মান, সব চেয়ে বেশী মহত্ব। তাকেই তো সবাই মাথায় করে রাখে। নিঃসন্তান একটি বিধবাকে পোঁছে কে? আমার দিন ফুরিয়েছে, রতন, আমার দিন আর ফিরবে না, ভাই। তোর সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা হলো। এই আমার আনন্দ।" তিনি আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ মোছেন।

আসলে রত্ন যা জানতে চেয়েছিল তা সুধাদির সংবাদ নয়, গৌরীর সমাচার। যেটুকু পাওয়া গেল সেটুকু চিঠিপত্রে পাওয়া যায়নি। সুধাদি এখন দুয়োরানী হতে পারেন, কিন্তু গৌরী তো সুয়োরানীর মতো মানমর্যাদা পাচ্ছে। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত না হলে দুয়োরানী আর ফিরছেন না। ফিরলে ফিরবেন ওরা বহরমপুরে প্রয়াণ করলে।

"বহরমপুরে বাড়ী হচ্ছে, কে যেন বলছিল।" রত্ন সে প্রসঙ্গ তোলে।

"আমিও শুনছি, ভাই। আমার ভালো লাগছে না। একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকলে মান-অভিমান কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি হয়, কিন্তু সব সময় দেখা তো পাই। আর কি কখনো দেখা হবে? হতে পারেও বা। গঙ্গাযাত্রার সময়। বাড়ীটা তো শুনছি গঙ্গার ধারেই উঠছে।" সুধাদি চোখের জল ঝরান।

"ছেড়ে দাও ওদের কথা।" ললিত বিরক্ত হয়ে বলে। "আমি তো শুনছি যশোবাবুর আবার বিলেত যাবার সাধ হয়েছে। আরো হাজার কয়েক টাকা খসিয়ে আসবেন। ও টাকা আমাকে দিলে আমিও কোন না ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতুম? তা তো হবার নয়. জাপান গিয়ে হয়েছি সেরিকালচারিস্ট। কেই বা বোঝে, কেই বা পোঁছে!"

ললিতের প্রাণের জ্বালা তো ওইখানে। কিন্তু গোরীর উপরে ওর অপ্রসন্নতা কেন? যখন দিদির কথাবার্তায় মনে হয় না যে গোরীর দিক থেকে কোনো অপরাধ ঘটেছে।

পরে দুই বন্ধুতে নিভৃত আলাপ হয়। ললিত বলে, "গোরীকে আমি দোষ দিইনে। ওর জীবন ও নতুন করে আরম্ভ করতে চায়। যা হবার তা হয়ে গেছে। অতীতের জন্যে কি কেউ ভবিষ্যৎ খোয়ায়? তবে দিদির উপর সুবিচার হয়নি। ওরাও বুঝতে পারছে, তাই বার বার লোক পাঠাচ্ছে। দিদিও যেমন, একটুতেই গলে যায়। আমরাই ওকে আটকে রেখেছি। দিদির মতো কেউ একজন না থাকলে আমাদেরও তো পরিবারটা ভাগ হয়ে যেতে পারে।"

রত্নর মনটা গোরীর কাছে পড়ে আছে। বলে, "গোরী তা হলে নতুন করে আরম্ভ করেছে। মুক্তির জন্যে আর ভাবছে না।"

"তা কখন বললুম?" প্রতিবাদ করে ললিত। "মুক্তি হচ্ছে ওর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস। তবে একটা কথা ও বোঝে না। ছেলের মা হতে হলে স্বামীর স্ত্রী হতে হয়। এমন কোনো পদ্ধতি কেউ জানে কি যাতে স্বামীর স্ত্রী না হয়ে ছেলের মা হওয়া যায়?"

"আমি তো জানিনে।" রত্ন ঘাড় নাড়ে।

"গোরী ভাবছে ও মা হয়েছে বলে স্ত্রী হয়েছে তা নয়। এই যে স্ববিরোধ এই নিয়ে ও কষ্ট পাচ্ছে। কষ্ট দিচ্ছেও। ছেলেকে ভালোবাসব, ছেলের বাপকে ভালোবাসব না, এটা কি কখনো সম্ভব? এক বাড়ীতে থাকলে, একঘরে রাত কাটালে যা হবার তা হবেই। থিওরিতে আর প্র্যাকটিসে ঢের তফাৎ। আমিও তো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। রাখতে পারলুম কি? মানুষের চেয়ে প্রকৃতি অনেক বেশী শক্তিশালী। আমরা যাকে প্রবৃত্তি বলি সেটা প্রকৃতিরই নামান্তর। কী করবে, গোরী? কতটুকু ওর শক্তি?" ললিত উপহাস করে।

"হুঁ!" বলে রত্ন চুপ করে যায়। যা বোঝবার তা বোঝে।

"তবে শেষ না দেখে বলা যায় না। এ নাটক ট্র্যাজেডীও হতে পারে। কমেডীও হতে পারে। নায়িকা নায়কের সঙ্গেও যেতে পারে, প্রতিনায়কের সঙ্গেও ঘর করতে পারে। হা হা হা হা! হি হি হি হি!" ললিত হাসি চাপতে পারে না।

"হাসছ কেন, হাসির কী পেলে?" রত্ন দাবড়ি দেয়।

"আর একটা সম্ভাবনা রাধিকার মতো ঘরও করা, বাহিরও করা। ও কী! ক্ষেপে উঠলে কেন? মারবে নাকি?" ললিত ও ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে।

"ভাই ললিত, গোরী আমাকে পতিরূপে বরণ করবে কিনা জানিনে, আমি কিন্তু মনে মনে ওকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি। আমার স্ত্রী পরের ঘর করবে এটা আমার অসহ্য। এ বেদনা আমি অহরহ অনুভব করছি। তুমি আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছ। এ জ্বালা আমাকে দগ্ধ করছে।" রত্ন কাতরস্বরে বলে।

ললিত জানত না যে রত্ন-গোরীর ভালোবাসা তার অবর্তমানে এতদূর গড়িয়েছে। বেচারা রত্ন ! ওর জন্যে সমবেদনায় বিগলিত হয় ললিত। বলে, "কেন অতদূর গেলে ? এখন পিছু হটবে কী করে ? তুমি কি মনে করেছ পিছু হটতে হবে না জীবনে ?"

"আমি যে ওর চেয়েও আরো এককদম এগিয়ে গেছি। গোরী যে একদিন আমার সন্তানেরও মা হবে। গোরীর মুখে আমি যে আমার মেয়ের মুখ দেখতে পাই। সেটা সম্ভব হবে কী করে ও যদি বার বার পরের সন্তানের মা হয় ? হবেই, যদি তুমি যা বলেছ তা সত্য হয়ে থাকে।" রত্ন অব্যক্ত ব্যথায় আর্তনাদ করে।

"পাগল না ক্ষ্যাপা ! চল তোমাকে বহরমপুরের পাগলা গারদে রেখে আসি। কেন, দুনিয়াতে কি আর কোনো মেয়ে নেই ? সুন্দরী যদি বল, জাপানীদের মতো কেউ নয়। আর বউ যদি বল ওরাই সকলের সেরা। আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে সাবু। তা নইলে আমি ওদেশ থেকে একা ফিরতুম না। জোড়ে ফিরতুম।" ললিত কবুল করে।

"আমি যে প্রেমের ডোরে বাঁধা। এ ডোরও যে বিয়ের ডোরের মতো অটুট। গোরীর কাছে যা আশা করেছি তা যদি না পাই তবে যে আমাকে আরেক নারীর কাছে হাত পাততে হয়। সেই বা কেন দেবে যদি ভালোবাসা না পায়, যদি স্ত্রী না হয় ? তবে কি আমার প্রেমিক সত্তা দুই ভাগে বিভক্ত হবে ? দেহ মন হৃদয় আত্মা দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দিলে আমি নিজে বাঁচব তো ?" রত্ন ভেবে আকুল হয়।

"শেক্সপীয়ার না কে যেন বলেছেন, প্রেমিকেরা পাগলেরা আর কবিরা সবটা কল্পনা দিয়ে গড়া। তুমি তো একাধারে প্রেমিক আর পাগল আর কবি। উপরন্তু একটি ফুল। তোমার গোরী তোমাকে এপ্রিল ফুল বানাবে।" ললিত ভবিষ্যদ্বাণী করে।

রত্ন তাতে আরো আঘাত পায়। বলে, "তুমি একটা ফলস প্রোফেট। তোমার কথা ফলবে না। আমাদের ইলোপমেন্ট অনেকদূর এগিয়ে রয়েছে। একদিন বাজবাহাদুরের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসবে রূপমতী। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে।"

ললিত তার কল্পনার বহর দেখে হেসে বাঁচে না। আরো দু'য়েকদিন দুই বন্ধু একসঙ্গে কাটায়। বেশির ভাগ নদীর ধারে। বিদায়ের পর রত্নর খেয়াল হল যে ললিত ওর বউকে কড়া পর্দায় রেখেছে, রত্নর সামনে বেরোতে দেয়নি। এমন প্রতিক্রিয়াশীল !

তেতাল্লিশ

একটি নারীর হৃদয় জয় করা যেন একটা রাজ্য জয় করা। জয় করেছে যে সে তো একজন রাজা। সে যদি তার সেই রাজত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত তা হলে কি তার কোনো দুঃখ থাকত ? কিন্তু সে যে শুধুমাত্র রাজা হয়েই ক্ষান্ত নয়। সে চায় সর্বস্ব জয় করতে। একটি নারীর সর্বস্ব জয় করা যেন একটা সাম্রাজ্য জয় করা। জয় করবে যে সে হবে একজন সম্রাট। সম্রাট না হয়ে তার সুখ নেই যে ! তাই রাজা হয়েও সে অসুখী।

রত্ন তার মনের কথাটা গোরীকে সোজাসুজি জানায় না। আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত

করে। গোরী সেকথা বোঝে ঠিকই, কিন্তু উত্তর দেবার সময় সযত্নে এড়িয়ে যায়। সাড়া দেয় না। বার বার ও-প্রসঙ্গ উঠলে লেখে, "ও আমার বনের পাখী, মনের পাখী ! তুই যেমন স্বাধীন আমি খাঁচার পাখী, কোণের পাখী, আমিও কি তেমনি স্বাধীন ? ওসব কথা যখন হবে তখন স্বাধীনে স্বাধীনে হবে। আগে তো আমাকে স্বাধীন হতে দে। যতদিন আমি পরাধীন ততদিন আমার আপনার বলতে আছে এক হৃদয়। বলতে গেলে সেই আমার স্ত্রীধন। সে কি আমি তোর হাতে নিঃশেষে সঁপে দিইনি ?"

রত্ন কি বোঝে না যে সে যেমন স্বাধীন গোরী তেমনি স্বাধীন নয় ? মনটা তবু তার অবুঝ। গোরী কি পরাধীন বলে এতই পরাধীন যে এখন থেকেই আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করতে পারে না, মুক্ত হলে সে কার সঙ্গে স্বয়ংবরা হবে, কার সন্তানের জননী হবে ? রত্নর ধারণা গোরী এখনো মনঃস্থির করেনি, করতে চায়ও না। মুক্ত হলে পরে মনঃস্থির করবে। অথবা একেবারেই করবে না। বিবাহ মানেই তো বন্ধন। একবার বন্ধনমুক্ত হলে দ্বিতীয়বার বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে যায় ক'জন ! প্রেমে পড়া আর বিয়ে করা তো সমান অবন্ধন নয়। প্রেম নিবে গেলে তার থেকে সহজে ছাড়ান আছে, বিয়ে ভেঙে দেওয়া কি তেমনি সহজ ? মা হয়ে থাকলে তো আরো বেশী কঠিন।

হৃদয় দেওয়া নেওয়া হচ্ছে প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতা। সমাজ সে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেও না, করতে গেলে পারেও না। কিন্তু সর্বস্ব দেওয়া নেওয়া হলো অন্য কথা। সেখানে প্রকৃতিদত্ত অধিকার দাবী করতে চাইলে আগে অবিবাহিত হতে হবে কিংবা অবিবাহিত অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। রত্ন অবিবাহিত বলেই সর্বস্ব দিতে পারে বা দেবার কথা ভাবতে পারে। গোরী তো এখনো অবিবাহিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। যেতে চাইলেই বা পারছে কোথায় ? বিয়ের সময় থেকেই ওর পায়ে শিকল বাঁধা। মা হয়ে আবার দুই হাতে বেড়ী পরেছে। দোর খুলে দিলেও কি ও ঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে ? বেরোলে আবার ফিরে যেতে চাইবে। ফিরে যাবার জন্যে দোর খোলা রাখতে চাইবে। ছেলে নয় তো, হস্টেজ। ছেলের বাপ কৌশলী পুরুষ। বেশ কৌশল করেই এই চালটি চেলেছেন।

পরিত্রাণের পূর্বে গোরী তাই রত্নর মতো সুখস্বপ্ন দেখতে চায় না। বৃথা, বৃথা, এখন থেকে ভাবা বৃথা। তার চিঠিপত্রে তেমনি মুক্তির আকুলতাই থাকে। আর থাকে তেমনি ভালোবাসার বিচিত্র আবেগ। তার বেশী না। গোরী যেন মাসের পর মাস পায়চারিই করছে, সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে না। প্রেমের তা হলে প্রগতি সম্ভব কী করে ? প্রেম কি তা হলে একটা স্থিতাবস্থা—গতি নয়, স্থিতি ?

তারপর প্রেম কি কেবল হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের টান ? নারীত্বের প্রতি পৌরুষের টান নয় ? পৌরুষের প্রতি নারীত্বের টান নয় ? রত্ন যে পুরুষ আর গোরী যে নারী এটা কি ওদের দু'জনের শুধুমাত্র হৃদয় আছে বলেই ? প্রশ্নটা রত্নকে আরো অবুঝ করে তোলে। তার মনে হয় গোরীর পুরুষোত্তম সে নয়, আর কোনো জন। কোনো অনাগত জন। সেই সুজনের বা স্বজনের জন্যেই গোরী তার নারীত্বকে হাতে রেখেছে। রত্নর জন্যে হাত খালি করবে না। ওইখানেই গোরীর দুর্গমতা। রত্নর পক্ষে দুর্গমতা।

সমস্তটাই অনুমান। তবু অনুমানই যুক্তির স্থান নেয়। গৌরী তো কাগজে কলমেই ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। বাহুপাশে ধরা দেবে ? রত্নর ধীরে ধীরে প্রতীতি হয় যে গৌরীর প্রেম তাকে রাজারূপে অভিষেক করলেও সম্রাটরূপে অভিষেক করবে না। দুজনার মাঝখানে থেকে যাবে দুস্তর ব্যবধান। মুক্তির পরেও গৌরী সে ব্যবধান রক্ষা করবে। আত্মসমর্পণ করবে না। রত্ন যদি না পুরুষোত্তম হয়ে ওঠে। পৌরুষের প্রতিযোগিতায় আর সবাইকে পরাস্ত করে। সৈনিক হয়, বীর হয়। ব্রাহ্মণের মতো বিদ্বান না হয়ে ক্ষত্রিয়ের মতো বলীয়ান হয়। কিন্তু জীবনকে ঢেলে না সাজলে তো ধনুর্ধর হওয়া যায় না। হতে পারে লেখনীধর। গৌরী কি ধনুর্ধর ছাড়া আর কারো বাহুপাশে বাঁধা পড়বে ? না, ও যতকাল সম্ভব মুক্ত থাকবে ? মুক্তিই ওর অভিপ্রেত। সেই সঙ্গে প্রেম। যে প্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। যার সম্পূর্ণতার জন্যে কামনাপূরণের অপেক্ষা নেই।

পরীক্ষার পড়ার চাপ না থাকায় রত্নর মস্তিষ্ক অলস ছিল। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে একবার আকাশে ওঠে তো একবার পাতালে নামে। উচ্চতম চিন্তার শিখরে আরোহণ করে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নীচতম চিন্তার অতলে। মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা করে। দাহ যখন জুড়য় না তখন নদীর জলে ডুব দেয়, সাঁতার কাটে। যতক্ষণ না শ্রান্ত হয়, ক্লান্ত হয় ততক্ষণ উঠে আসে না। ভিজে কাপড়ে থেকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একদিন তার সত্যি সত্যি জ্বর হয়। কুষ্টিয়ায় বাড়ীতে ওপর তলার একমাত্র ঘরে সে রোগশয্যায় শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তার খোঁজ খবর নেওয়া হয়। কিছু দিন পরে জ্বর ছেড়ে যায়, কিন্তু তাকে নিচে নামবার অনুমতি দেওয়া হয় না। সে নজরবন্দী থাকে। চিঠি লেখে, মাসিকপত্র পড়ে, কেউ দেখা করতে এলে গল্পগুজব করে। হীরু, ওর বাল্যবন্ধু, রোজ একবার দেখা করে যায়। সন্ধ্যার দিকে।

রত্নদের বাড়ীতে বাউল বৈষ্ণব দরবেশ ফকিরদের জন্যে খোলা দরজা ছিল। তার বাবা ওদের সঙ্গে তত্ত্বকথা বলতে বলতে ওদের গান শুনতে শুনতে এক একদিন রাত করে ফেলতেন। তখন ওরা যায় কোথায় ? ওইখানেই খায় দায়, মাদুর পাতে, যত না ঘুময় তার বেশী জেগে কাটায়। ভোর হবার আগেই ওরা নদীতে স্নান করে আসে, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

চতুরী বলে একটি বিগতযৌবনা মধ্যবয়সিনী ছিল ওদের একজন। রত্ন বাড়ী এলে ও কেমন করে যে টের পেত যেখানেই থাকুক রত্নকে দেখতে ছুটে আসত। গান শোনাত, ভিক্ষা নিত কিংবা খেতে বললে খেয়ে যেত। এক আধদিন রাত করে ফেলত। তখন তাকে বারান্দায় জায়গা করে দেওয়া হতো, সেইখানে শুয়ে বা জেগে রাত কাটাত। গান যেন ওর গলায় আপনি আসত। একটার পর একটা। বেশ মিষ্টি গলা। সবাই ওকে পছন্দ করত। কিন্তু ওর কোনো প্রার্থনা ছিল না। এমন কি ভিক্ষাও না। যে দিত সে না চাইতেই দিত। ও যেন একজন দাতা। ও গ্রহীতা নয়। নিয়ে ধন্য করে দিত। ওর চাউনি থেকে মনে হতো ও তো নিতে আসেনি, নিচ্ছে যে সেটা ওর দাক্ষিণ্য।

রত্নর জ্বর হয়েছে শুনে চতুরীও আসে দেখতে। দু'দণ্ড বসে। একদৃষ্টে তাকায়। দুটো কথা বলে আশ্বাস দেয়। আপন মনে গুন গুন করে, আনন্দলহরী বাজায়। গানগুলির

কোনোটি বাউল, কোনোটি বৈষ্ণব ধারার। কোনোটিতে দরবেশের মিশেল। রত্নর ইচ্ছা করে লিখে নিতে, কিন্তু পারে না। বলে আরেকদিন আসতে। চতুরী যেন তাই চায়। আরেকদিন আসে। আরও একদিন। জ্বর ছেড়ে যাবার পর একদিন রত্ন ওর গানের কথা লিখে নেয়, কিন্তু সুর ধরে রাখবে কী করে ? স্বরলিপি তো জানে না। সময়ে অসময়ে আসতে আসতে চতুরী একদিন রাতের বেলা রয়ে যায়।

রত্ন অনেকক্ষণ গৌরীর ধ্যান করে সবে ঘুমিয়ে পড়েছে, জানতে পায়নি কখন কে এসে আর পায়ের দিকে বসে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করে তার বিছানায় সে একা নয়। জেগে উঠে বুঝতে পারে ও পরশ নারীর পরশ। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু তার অনুমান করতে বিলম্ব হয় না কে সেই নারী।

রত্ন স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। চতুরীর চতুর হস্ত তার দেহযন্ত্রকে আনন্দলহরীর মতো বাজায়। সেখানে স্পন্দন জাগে। শিহরণ লাগে। পুরুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয় নারীর কেশ। সে ওকে বুকে টেনে নেয়। ওর কোলে আপনাকে সঁপে দেয়। যা ঘটবার তা চকিতেই ঘটে যায়। সম্পূর্ণ অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা। একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত।

চতুরী যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে যায়। বাড়ি যেমন নিঝুম ছিল তেমনি নিঝুম। শুধু রত্নর চোখে আর ঘুম নেই। চেষ্টা করলেও সে আর ঘুমোতে পারবে না। এমন রাত তো জীবনে আর কোনোদিন আসেনি। এমন অন্তরঙ্গতাও হয়নি। এ কি কেবল কায়িক অর্থে ? কায়ার সঙ্গে আত্মাও কি ছিল না ? উপলব্ধি করল যে সে আত্মা নয় তো কে ? যার সঙ্গে উপলব্ধি সেও কি আত্মা নয় ?

কিন্তু হৃদয় যে অনুপস্থিত ছিল। সে আরেকজনের কাছে বাঁধা। দেহ একজনের সঙ্গে, হৃদয় আরেকজনের সঙ্গে, এর নাম দ্বিচারিতা। এটা নীতিবিরুদ্ধ। রত্ন যে ঘটনার অংশ নিয়েছে তা শত চেষ্টাতেও অঘটিত হবে না। এই চিন্তা তাকে বিমর্ষ করে রাখে। সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়।

সে গৌরীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, একথা যদি ও মেয়ে জানতে পায় তবে তো সব শেষ। হায়, হায়, এতদিনের প্রেম ! তার এই পরিণতি ! রত্নর প্রাণ ভরে কাঁদতে ইচ্ছা করে ! তা বলে গৌরীকে না জানিয়েও থাকা যায় না। সেটা আরো বড়ো অপরাধ।

চতুরীর উপরে ওর রাগ হয়। কিন্তু সেও তো একটি নারী। তার প্রাণেও তো অনুরাগ আছে। বিনা অনুরাগে তো সে এতদূর আসেনি। কখনো কি সে রত্নর কাছে কিছু চেয়েছে ? না, ওটা অর্থের বিনিময়ে নয়। স্বার্থের বিনিময়ে নয়। নিরর্থ ও নিঃস্বার্থ।

রত্ন অস্বীকার করতে পারে না যে চতুরী ওকে সুখী করতে চেয়েছিল, সুখী করে গেছে। অথচ যে সুখ গৌরীর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা যায় না সে সুখ সুখই নয়। সুখের সুখত্বই হলো প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা। তা হলে একে সুখ বলবে কেন ? এটা ওর চেয়ে নিচু দরের জিনিস।

তা হলে কি পাপ ? রত্ন তা নিয়ে সারা রাত চিন্তাজ্বরে জর্জর হয়।

চুয়াল্লিশ

চতুরীর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক যদি থাকত তা হলে রত্নর নীতিবোধ ওই নিয়ে পীড়িত হতো না। ওটা হতো প্রেমেরই প্রাকৃতিক পরিণতি। সমাজ যাই বলে বলুক। কিন্তু তা তো নয়। চতুরী হয়তো রত্নকে ভালোবাসে, রত্ন তো ওকে ভালোবাসে না। কখনো ওকথা ওর মনে উদয় হয়নি। ওটা কল্পনার অতীত।

চতুরীর উপর রাগ হচ্ছিল কেন ও অমন চোরের মতো ঘরে আসতে গেল, কেন গায়ে হাত দিতে গেল! রক্তমাংসের শরীর গরম হতে কতক্ষণ লাগে! তাও যদি পরিপূর্ণ সজাগ থাকত। ঘুমের ঘোর তখনো ভালো করে কাটেনি। শীতকাতর একটি নারী যদি কম্বলের বাইরে শুয়ে কাঁপতে থাকে তা হলে তাকে কম্বলের ভিতরে একটু জায়গা করে দেওয়া কি পুরুষের পক্ষে শিভালরি নয়?

শিভালরির কথা মনে আসতেই রত্নর রাগটা এক নিমেষে জুড়িয়ে যায়। তাই বলে অনুরাগে রূপান্তরিত হয় না। না, চতুরীকে সে ভালোবাসে না। কোনোদিন ওকে ভালোবাসেনি। ভালোবাসতে পারবে না। ও যদি ভালোবেসে থাকে ওর ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারবে না। গোরী বলে আরেকজন যদি না থাকত তা হলেও চতুরীর সঙ্গে সম্পর্কটা ভালোবাসার সম্পর্ক হতো না। এখন তো গোরী বলে আরেকজন রয়েছে। একই সম্পর্ক কি দু'জনের সঙ্গে পাতানো যায়?

ইচ্ছা করছিল চতুরীকে ডেকে বুঝিয়ে বলতে যে দুই নারীকে ভালোবাসা একজন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। উচিতও নয়। রত্ন যখন গোরীর তখন চতুরীর হতে পারে না। শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই শোভা পায়, রত্নর পক্ষে নয়।

কিন্তু কোথায় চতুরী! পরের দিন ওর দেখা নেই। উড়ো পাখীর মতো ও উড়ে গেছে। রেখে গেছে কয়েকটি গানের রেশ। আর দিয়ে গেছে এমন একটি রসের আস্বাদন যা মধুরও নয়, তিক্তও নয়, সুধাও নয়, বিষও নয়, ভালোও নয় মন্দও নয়, সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। পাপ? না পাপও নয়, পুণ্যও নয়। তাপ? হাঁ, তাপ। উত্তাপ। পরিতাপ। সন্তাপ।

এখন প্রশ্ন হলো গোরীকে আদৌ লিখবে কি না ওকথা। লিখলে কী লিখবে। ইচ্ছে করলে চতুরীর উপরেই সবটা দোষ চাপিয়ে দিয়ে ভালোমানুষ সাজা যায়। নারী যদি অমন করে হঠাৎ চড়াও হয় পুরুষ বেচারা আত্মরক্ষা করে কী উপায়ে? কিন্তু রত্নর শিভালরিতে বাধে। দোষটা সে আপনার উপরেই টেনে নেয়। ওর উচিত ছিল অনুত্তেজিত থাকা। নয়তো উঠে বেরিয়ে যাওয়া। তা না করে ও চূড়ান্ত দুর্বলতা দেখিয়েছে।

যে কথাটি সে তার বুকের মাঝখানে সযত্নে বন্ধ করে রাখে সেটি হলো এই যে, নারীর চোখে সে পুরুষ। নারী তাকে পুরুষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সে নারী গোরী নয় বলে কি সে নারী নয়? তার স্বীকৃতিরও দাম আছে।

কিন্তু এ বিষয়ে রত্নর সন্দেহ ছিল না যে চতুরীর সঙ্গে যা হলো তা যদি হতো গোরীর সঙ্গে তা হলে তা হতো দ্বিধাহীনভাবে মধুর, উত্তম, সুন্দর, অমৃত, পুণ্য। অবশ্য

তার আগে গৌরীকে মুক্ত হতে হতো। স্বকীয়া হতে হতো।

গৌরীকে রেখে ঢেকে চিঠি লেখা এই প্রথম। ও যে বিষম রাগ করবে, ভীষণ অভিমান করবে এরকম একটা আশঙ্কা রত্নকে কাঠ করে দিয়েছিল। কে জানে হয়তো সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বসবে। গৌরীকে হারিয়ে রত্নর জীবনে আর কী অবশিষ্ট থাকবে! শূন্য হয়ে যাবে না জীবন ? তা বলে গৌরীর কাছে ঘটনাটা গোপন করা কি ঠিক হতো ? না, কিছুতেই ঠিক হতো না। প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের কাছে গোপন বলে কিছু থাকবে না। এইটেই আদর্শ। রত্ন এ আদর্শ যথাসাধ্য মেনে চলবে।

গৌরী সাধারণত পত্রপাঠ উত্তর দেয়। এবার দেখা গেল তার দেরি হচ্ছে। অবশেষে এল তার চিঠি। আজে বাজে একশো রকম কথার পর চিঠি শেষ করে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, "যশোবাবুর যেমন সুধা তোমার তেমনি চতুরী। কী বলব, আমার যেমন কপাল! পুরুষ মানুষের যা স্বভাব!"

চিঠিখানা রত্নকে ব্যথা দেয় তা ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে তার নিজের উপর আস্থাও যোগায় যে সে পুরুষ। গৌরীও প্রকারান্তরে তা স্বীকার করেছে।

রত্ন এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে গৌরী রাগ করেনি, করেছে একটুখানি অভিমান। সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়নি। দেবার নামগন্ধ নেই। যথারীতি আদর জানিয়েছে। "মণি" বলেছে, "মানিক" বলেছে। তফাতের মধ্যে এই যে "তুই" না বলে "তুমি" বলেছে, "তোর" না বলে "তোমার" বলেছে। তফাৎটা লক্ষ করবার মতো। রত্নর বুকে লাগে। তবে কি গৌরী ওকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ? ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ?

সত্য বলতে গিয়ে ফল এই হয় যে চিঠিপত্রের সুর কেটে যায়. তবু তো পূর্ণ সত্য নয়। রত্ন অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না। যা ঘটে গেছে তার উপর তার হাত থাকলে কি তা ঘটত ? মানুষের স্বাধীনতা বাস্তবিক কতটুকু ? উন্মুখ নারীকে বিমুখ করতে সেকালের মুনি ঋষিরাও কি পেরেছেন ?

গৌরী যে কত বড়ো শক পেয়েছে সেটা চিঠিতে প্রকাশ না করলেও রত্ন সেটা নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বোঝে। তাই ওকে বার বার অভয় দেয় যে আর অমন কিছু ঘটবে না। গৌরী কিন্তু তার আশ্বাসবাক্যে ভোলে না। সেও একটি ভবী।

লেখে "তুই অনেক পড়াশুনা করে পণ্ডিত হয়েছিস বলে কি চতুরী'র মতো চতুর ? ও হলো বহুদর্শী। তোর মতো ছেলেদের এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে জানে। হায়, আমি যদি তোর কাছে থাকতুম! যতই ভাবছি ততই বুঝতে পারছি যে তোকে ওর মতো মেয়েমানুষের কবল থেকে রক্ষা করা আমারই কর্তব্য। আমার এ কর্তব্য আমি পালন করতে পারিনি বলেই তোর যা হবার তা হয়েছে। এখন তুই একটু ধৈর্য ধর। সবুর কর। আমি তো একদিন আসছিই। তুই বোধ হয় আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিস। তা না হলে কি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে যেতিস!"

রত্নর অন্তর পুলকে ভরে যায়। গৌরী তা হলে আশা দিয়েছে যে দুধের স্বাদ দুধে মেটাবে। অবশ্য মুক্ত হবার পরে। ততদিন ধৈর্য ধরতে, সবুর করতে বলেছে। রত্নও তাতে রাজী। ভ্রমর যে কমল ভিন্ন আর কোনো ফুলের মধু খায় না লালন ফকিরের

না কার যেন এইরকম একটা পদ চতুরীর মুখে শুনেছিল। সেটাই শুনিয়ে দেয় গৌরীকে।

আবার মিটমাট হয়ে যায়। যেমনকে তেমন। অন্তত রত্নর তো তাই ধারণা। ও যেমন নিজের অন্তর্দর্শী তেমনি অন্যের অন্তর্দর্শী হলে ওর ধারণা হয়তো অন্যরূপ হতো। মেয়েরা ক্ষমা করে কিন্তু ভোলে না। প্রত্যেকেই এক একটি ভবী।

"কুষ্টিয়ায় তুই আছিস কী করতে ? কী তোর দরকার ?" গৌরী একদিন শাসনের সুরে লেখে। "তার চেয়ে কলকাতায় গিয়ে একটা কাজকর্মের উদ্যোগ দেখ। যেটার প্রত্যাশায় বসে আছিস সেটা যদি আবার ফসকে যায় ?"

কথাটা সত্যি। কাজকর্মের অভাবে রত্নও অলস হয়ে পড়ছিল। তা বলে একেবারে নিষ্কর্মা নয়। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে ওর খাতির ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রায়ই বইপত্র ধার করে নিয়ে আসত। ফিরিয়ে দিতে গেলে তিনি তাকে আটক করতেন। আলাপ-আলোচনায় সন্ধ্যা কাবার হতো। মফঃস্বল শহরে অমন একটি দুর্লভ ব্যক্তির সঙ্গে ভাব বিনিময় রত্নকে সতেজ রেখেছিল।

বাংলার বিখ্যাত হেডমাস্টার শ্রেণীর তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কখনো কাউকে মারতেন না, বকতেন না, ধমকাতেন না, বিদ্রূপ করতেন না। সবাই তাঁর চোখে বালগোপাল। কিন্তু শাসন করতেন ঠিক। সেটা হাসিমুখে শাসন। কদাচ কখনো হাসতে হাসতে কর্ণাকর্ষণ বা কেশাকর্ষণ। তারপর ডেকে নিয়ে পড়া বুঝিয়ে দিতেন ! আরও আশ্চর্য, ছেলেদের সবাইকে "তুমি" বলতেন।

কুষ্টিয়াতে রত্নর সত্যি একটা দরকারী কাজ ছিল। সেটা গৌরীকে সে লিখেওছিল। মালাদির যিনি মাস্টারদা রত্নর তিনি ঝণ্টুদা। রত্নর যিনি হেডমাস্টার মশায় ঝণ্টুদারও তিনি হেডমাস্টার মশায়। তা ছাড়া রত্নর সঙ্গে ঝণ্টুদার একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। যদিও কোথাও এক জায়গায় তিনি স্থির হয়ে বসবার পাত্র নন তবু কিছুদিন থেকে তাঁর মধ্যেও একটা স্থিতির বাসনা জেগেছিল। সেই স্কুলেরই একটা মাস্টার পদ কেমন করে তাঁর বরাতে জুটে যায়। রত্ন জানত না যে ওটা তাঁর গুরুজনের কারসাজি। অমনি করে ওঁরা তাঁকে সংসারী করতে চেয়েছিলেন। ঝণ্টুদা একই শহরে থাকায় রত্নর দিক থেকে বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটালে ভারতদর্শনের ফল হয়। হেন তীর্থ নেই যেখানে তিনি যাননি, হেন আশ্রম নেই যেখানে তিনি থাকেননি। অন্তত এক রাত।

এমন যে ঝণ্টুদা তাঁকে সংসারী হবার মন্ত্রণা কি কেবল তাঁর গুরুজনরাই দিয়েছিলেন ? রত্নও কি দেয়নি ? মালাদির চিঠিপত্র তাঁকে পৌঁছে দেবার ও তাঁর চিঠিপত্র মালাদিকে পৌঁছে দেবার ভার রত্নই নিয়েছিল। তার সেই শখের হরকরাগিরি একদিন হঠাৎ থামিয়ে দেন মালাদির মা। তারপর চিঠিপত্র বহন করার ভার কার উপর পড়ল রত্ন সে খবর জানে না। ঝণ্টুদার সঙ্গে দেখা হলে প্রসঙ্গক্রমে মালাদির কথাও ওঠে। তিনি গম্ভীর হয়ে যান। যেটুকু না বললে নয় সেইটুকুই বলেন।

"রতন, তুমি যা ভেবেছ তা নয়।" ঝণ্টুদা বলেন। "আমি তো ওঁকে বিয়ে করতেই চাই, ওই আমাকে বিয়ে করতে নারাজ।"

"সে কী কথা, ঝণ্টুদা! মালাদি যে কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছে!" রত্ন বলে।

"আমারও সেইরকম ধারণা ছিল। কিন্তু ক্রমেই অনুভব করছি যে ওর কাছে প্রিয়তর ওর পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি। তুমি কি লক্ষ করেছ যে ও লুকি- লুকিয়ে ওর স্বামীর ফোটো পূজা করে? সংস্কার। সংস্কারই হিন্দুর মেয়েদের মনে বলবান। তুমি আমি ইংরেজীপড়া পুরুষ বলে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারি। কিন্তু ইংরেজী পড়িয়ে দেখা গেল মালার মনে একটুও রেখাপাত করল না। ওর মায়ের সঙ্গে ওর ভেদ নেই, রতন।" ঝণ্টুদা বলেন।

মালাদির পক্ষ নিয়ে ঝণ্টুদাকে বোঝানোও রত্নর নিত্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একদিন স্তম্ভিত হয়ে গেল হেডমাস্টার মশায়ের মুখে শুনে যে, ঝণ্টুদার গুরুজন ওঁর বিয়ে দিচ্ছেন, উনিও এতকাল বাদে রাজী হয়েছেন। না, মালা বলে একটি বিধবা মেয়ের সঙ্গে নয়।

পঁয়তাল্লিশ

যেমন করে হোক এ বিবাহ বন্ধ করা চাই। নইলে মালাদির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রত্ন তাড়াতাড়ি কলকাতা ছুটে যায় ও মালাদির সঙ্গে গোপনে দেখা করে।

"এখনো সময় আছে। শুধু তুমি একবার বল যে ঝণ্টুদাকে বিয়ে করবে। তা হলে বাকীটা আমরাই ম্যানেজ করতে পারব।" রত্ন অনুনয় করে।

"আমার কি অসাধ? আমি কি কোনো দিন বলেছি বিয়ে করব না?" মালাদি মোনালিসার মতো রহস্যময় হাসি হাসে। "দুইপক্ষ রাজী না হলে কি বিয়ে হয়?"

"কিন্তু ঝণ্টুদার মুখে শুনে এলুম তুমিই নারাজ।" রত্ন এ রহস্য ভেদ করতে পারে না।

"রতন, তোমাকে কি সব কথা খুলে বলা যায়? ওসব কহতব্য নয়। আমার মনের দুঃখ আমি মনে চেপে রাখি। কবে এর প্রতিকার হবে তা যদি জানতুম তা হলে শান্তি পেতুম। তবে এইটুকু বুঝি যে বিবাহ এর প্রতিকার নয়, ভাই।" মালাদি করুণ কণ্ঠে বলে।

"দয়া করে খুলে বল, দিদি। আমার উপর কেন এত অবিশ্বাস?" রত্ন অনুযোগ করে।

"না, অবিশ্বাস নয়। কিন্তু ওসব কথা মুখে আনা যায় না। আমি কারো কাছে বলিনে। মাকে ছাড়া। মা তো সেইজন্যেই খাপ্পা। বিধবাবিবাহের উপর ওঁর যে বিরাগ সেটা আর একটি বিধবার কথা মনে করেই। বিধবাবিবাহ যদি চলে তবে ওরও তো আবার বিয়ে হতে পারে।" মালাদি আরো ঘোরালো করে।

"আর আমাকে ঝুলিয়ে রেখো না, দিদি। শুনিই না ব্যাপারটা কী। হেন সমস্যা নেই যার সমাধান নেই।" রত্ন আশ্বাস দেয়।

"তুমি দেখছি নাছোড়বান্দা ছেলে। না শুনে ছাড়বে না। কিন্তু পরে আবার আমাকেই দোষ দেবে যে আমি তোমাকে একটা কল্পিত কেচ্ছা শুনিয়েছি। না, না। থাক ওসব কথা। ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে যখন হবার নয় তখন তোমারই বা কী করবার আছে ? আমারই বা করবার আছে কী ?" মালাদি চোখে আঁচল দেয়।

অনেক পীড়াপীড়ির পর মালাদি যা বলে তা শুনে রত্ন তাজ্জব বনে যায়। ঝণ্টুদা যাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন সে ওর মামাতো বোন বকুল। গুরুজনের প্রচণ্ড আপত্তি। তখন তিনি বৈরাগ্য নিয়ে বিবাগী হয়ে যান। বকুলের বিয়ে দেওয়া হয় এক বুড়ো বরের সঙ্গে। বুড়ো কিছু দিন পরে চোখ বোজে। রেখে যায় দুই পক্ষের ছেলেমেয়ে। প্রচুর সম্পত্তি। বকুল ততদিন পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংসারে ষোল আনা মন নেই। থেকে থেকে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। যেখানেই ঝণ্টুদা সেখানেই ওর তীর্থ। দু'জনাতে মিলে একসঙ্গে ঘোরাফেরা হয়। কেউ দেখবারও নেই, কেউ বলবারও নেই। কোথায় বদরিকাশ্রম, কোথায় মাদুরা, কোথায় কাশী, কোথায় কামাখ্যা ! তীর্থেরও লেখাজোখা নেই, ভ্রমণেরও ঠিকঠিকানা নেই। এই তো সেদিন প্রভাসপত্তন ঘুরে এল।

"আচ্ছা, এতে অন্যায়টা কোথায় ?" রত্ন ঝণ্টু-বকুলের হয়ে তর্ক করে।

"অন্যায় বলে অন্যায়। যে তোমার মামাতো বোন তার সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি কেন ? আর ওই বা কেমন ভাই-সোহাগী ? দেবাটি যেখানে দেবীটিও সেখানে। লোকে কিছু মনে করবে না ?" মালাদি দুষ্টু হাসি হাসে।

"লোকে তো তোমার আমার সম্বন্ধেও কত কিছু মনে করে। তা বলে কি তুমি আমি অন্যায় করেছি ?" রত্ন ওকে মনে করিয়ে দেয় যে ওরাও সম্পর্কিত ভাইবোন।

"আহা, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোনোদিন তেমন ছিল না। তুমি তো আমাকে তেমন চোখে দেখনি।" মালা কাটান দেয়।

রত্ন মালাদিকে কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও জানায়নি যে মনে মনে ওকে ভালোবেসেছিল। ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিল। গোরী যদি তার জীবনে হঠাৎ উদয় না হতো তা হলে তার ভালোবাসা হয়তো পাত্রান্তরিত হতো না।

"মালাদি, একটা কথা তোমার কাছে এতদিন গোপন করেছি। আর দেখছি গোপন রাখা চলে না। কিন্তু ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি ?" রত্ন ইতস্তত করে।

"সেবাদির ব্যাপার তো ? সে আমি আগেই লক্ষ করেছি। ওতে অত ভয়ের কী আছে ? তোমার বাবা আপত্তি করলে আমার তো আছি তাঁকে বোঝাতে। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও, রতন।" মালাদি অভয় দেয়।

"দূর ! সেবাদির কথা কে বলতে চায় ! বলতে চাই আরেকটি দিদির কথা। তাঁর নাম হুবহু তোমার নামের মতো। চেহারাও তেমনি তোমারি চেহারা। তিনিও তেমনি বিধবা। কুমারী বিধবা।" রত্ন দুষ্টুমি করে বলে।

"এ জগতে আরো একজন মালা মিত্র আছে নাকি? সেও কি তোমার দিদি সম্পর্কীয়া ? অ্যাঁ ! তুমি তো খাসা ছেলে ! এতদিন এ রহস্য ফাঁস করনি ! আগে শুনলে একটা মালা টালা যোগাড় করে রাখতুম। এর মতো কমপ্লিমেণ্ট জীবনে আমি পাইনি।

আমি ধন্য। তবে ওটা এ জন্মে হবার নয়, রতন। তুমি যদি এখনো ও রকম কল্পনা পুষে রেখে থাক তোমাকে নিবৃত্ত হতে বলব। আমার দিক থেকে যা আছে তা বিশুদ্ধ স্নেহ।" মালা বলে।

"না, দিদি, ও কল্পনা আর আমার নেই। ভালোবাসারও রং বদলে গেছে। আর তুমি তো একথাও জানো যে আমি আরেকজনকে ভালোবাসি। না, সেবাদি নন। বলেছি বোধ হয় যে গোরী ওর ডাকনাম।" রত্ন বলে।

কথাবার্তা আবার সিধে রাস্তা ধরে এগোয়। রত্ন জানতে চায় ঝণ্টুদার বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ আছে কি না। ওঁর মতো আদর্শবাদী জিতেন্দ্রিয় ঋষিকল্প পুরুষ তো রত্নর নজরে পড়ে না।

"ঋষিকল্প ! হা হা ! বিশ্বামিত্র ঋষিকল্প।" খিল খিল করে হেসে ওঠে মালা।

"কেন অমন কথা বল ?" রত্ন কটমট করে তাকায়।

"বলব না ? তপোভঙ্গ ঘটাবার জন্যে মেনকাকল্প অপ্সরা রয়েছে যে ! শুনে রাগ করছ। কিন্তু সত্য কথা চিরদিন অপ্রিয়।" মালা তার জ্বালা ব্যক্ত করে।

রত্ন তো হাঁ। এ কি কখনো হতে পারে যে ঝণ্টুদাও ওরই মতো দুর্বল ! দুর্বলের পক্ষ নিয়ে ও একহাত লড়তে যায়। বলে, "তুমি তো স্বচক্ষে দেখনি। পরের মুখে শুনে বোকার মতো বিশ্বাস করেছ। ইউ আর এ ফুল।"

মালা তা শুনে ক্ষেপে যায়। "কী ! আমি ফুল ! তুমি বলতে চাও আমি অনুসন্ধান করিনি ? তুমি আমাকে ফুল বলে আঘাত করতে পারো, আমি তোমাকে ব্লাইণ্ড বলে প্রত্যাঘাত করব না ?" মালা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে।

"কেন, আমি ব্লাইণ্ড হতে যাব কেন ?" রত্ন প্রতিবাদ করে ওঠে।

"কারণ তুমি ওদের ভাইবোনকে একসঙ্গে দেখনি। দেখলেই বুঝতে যে ওরা স্বামী-স্ত্রী। কাশীর বাঙালীরা কে না জানে ! কে না বলাবলি করে !" মালা সজল চক্ষে বলে।

"তা হলে ওদের বিয়ে দিলেই চুকে যায়। মুসলমান সমাজে তো অমন কত হয়। ব্রাহ্মসমাজেও দুটি একটি কেস দেখা যায় !" রত্ন ভালোমানুষের মতো বলে।

"তা হলেই পাপের ভরা পূর্ণ হয়।" মালা উত্তেজিত হয়ে বলে। "একে বিধবাবিবাহ, তার উপর ভাইবোনের বিবাহ। তুমি কি সমাজসংস্কারক, না সমাজসংহারক ?" মালা রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়।

"আমি তো মনে করি ওরকম ক্ষেত্রে বিয়ে না করাটাই পাপ। বিয়ের বাধা নেই যখন। সিভিল ম্যারেজ করলেই চলবে।" রত্ন বিধান দেয়।

"ব্লাইণ্ড ! ব্লাইণ্ড ! ইউ আর ব্লাইণ্ড ! যার ছেলেপুলে হয়েছে, স্বামীর বিপুল সম্পত্তি সে কেন ফকিরকে বিয়ে করবে ? একটা মাস্টার বই তো নয় !" মালা উপহাস করে।

প্রেম আর কাম দুই ভিন্ন খাতে বইবে আর বিবাহ বইবে তৃতীয় এক খাতে, রত্নর মতে এরই নাম অন্যায়। একই কালে তিনটি নারীর প্রতি কর্তব্য কেউ পালন করতে পারে না। তা যদি করতে যায় তবে একটিকে না একটিকে বঞ্চিত করে, আর নয়তো নিজের জীবনটাকেই দুই-তিন ভাগ করে। রত্ন চায় অবিভক্ত জীবন। তাই তার আদর্শ

হলো প্রেম আর কাম আর বিবাহের ত্রিবেণীসঙ্গম। একটিই নারী, তার তিনটি বেণী।

সে আশা করেছিল ঝণ্টুদার বেলাও তাই হবে। মালাদির কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে ঝণ্টুদা তিনটি নারীর মধ্যে আপনাকে ভাগ করে দিয়ে তিনজনের প্রতিই অবিচার করবেন। মালার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, বকুলের সঙ্গে কামনার সম্পর্ক, বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রার্থক সম্পর্ক, এর মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য কোথায় যে ঝণ্টুদার জীবন সার্থক হবে ?

রত্ন কলকাতা এসেছিল মালাদির সম্মতি নিয়ে ঝণ্টুদাকে জানাতে ও দু'জনের বিয়ের চেষ্টা করতে। হেডমাস্টার মশায় বাকীটুকু করতেন। ঝণ্টুদার গুরুজনকে বোঝাতেন। কিন্তু মালাদির অনিচ্ছা দেখে আর অগ্রসব হয় না। মালাদির সঙ্গেও সেই শেষ দেখা। ওর বিচারে মালাদি সত্যি একটা ভুল করল। ঝণ্টুদাকে বিয়ে করে আয়ত্তের মধ্যে রাখলে ওকেও বাঁচাত, আপনিও বাঁচত। আর বকুল ? সে তো এমনিও যাচ্ছে, অমনিও যেত। বিয়ের পরে ঝণ্টুদা কি আর ওমুখো হতে পারবেন নাকি ?

কিন্তু ওটা যদি নিছক কামনার সম্পর্ক না হয়ে থাকে ? যদি হয়ে থাকে সর্বাঙ্গীন প্রেমের সম্পর্ক ? তা হলে কি ঝণ্টুদা অত সহজে বকুলের মায়া কাটাতে পারবেন ? জীবনভোর দ্বিচারিতায় দোদুল্যমান হতে হবে তাঁকে। মালাদির মঙ্গে সম্পর্কটাই একদিন স্বপ্ন হয়ে যাবে। নিরাকার প্রেম স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যায়। বকুলের প্রেম সাকার বলেই ওর চেয়ে স্থায়ী। বিবাহ আর যার সঙ্গেই হোক না কেন, প্রেম যদি সত্য হয়ে থাকে তার হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি নেই। ঝণ্টুদার জীবনে বকুলই চিরন্তনী।

একটি নিরীহ বালিকার পাণিপীড়ন করতে যাচ্ছেন ঝণ্টুদা। বরযাত্রী হতে বলা হয়েছে রত্নকে। চল্লিশের সঙ্গে চোদ্দর সপ্তপদী। আহা মরি, কী দৃশ্য ! রত্ন তার জন্যে কুষ্টিয়া ফিরে যায় না। কলকাতায় সিনেমা ও থিয়েটার দেখে কাটায়। এসব দৃশ্য ঝণ্টুদার পরিণয়দৃশ্যের চেয়ে কম হাস্যকর আর কম ট্র্যাজিক। দু'দুটি নারীর অভিশাপ কুড়োবেন দাদা। আরো একটি যে পরে অভিশাপ দেবে না তা নয়।

ছেচল্লিশ

জীবনদেবতার কাছে রত্নর প্রার্থনা ছিল অন্নের জন্যে নয়, অমৃতের জন্যে। অমৃত যদি পায় অন্ন আপনি জুটবে। তার প্রশ্ন ছিল মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। যা আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব ?

কিন্তু গোরী বলে একটি নারীর মুক্তির দায় কাঁধে তুলে নেবার পর থেকে তাকে অন্নের ভাবনাও ভাবতে হচ্ছিল। অন্নচিন্তা চমৎকারা। সে কি অন্য চিন্তার জন্যে অবকাশ দেয় ? প্রতিযোগিতার চিন্তাটাও অন্নচিন্তারই অঙ্গ। সেটা যে শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। পরীক্ষার ফল না বেরনো অবধি নিশ্চিত হওয়া যায় না। রত্নর অবশ্য স্থির বিশ্বাস যে এবার কেউ তাকে রুখতে পারবে না, কিন্তু জোর করে বলতে পারে না কার কপালে

কোন পোজিশন আছে, কোন পোজিশন অবধি নেওয়া হবে। সেইজন্যে রত্নর মনে অস্বস্তি ছিল।

ছিল ওর নতুন বন্ধু কেশবের মনেও। ওরা দু'জনে প্রতিযোগী হয়ে পরীক্ষায় বসলেও সহযোগীর মতো মেলামেশা করে। কলকাতায় কেশবদের ওখানে প্রায়ই ডাক পড়ে রত্নর। নইলে কলকাতার একটা মেসে দূর সম্পর্কের এক কাকার সঙ্গে বাস করা ওর পক্ষে দুঃসহ হতো। ওখানে দিনরাত চাকরির কথা, আর নয়তো পরচর্চা বা পলিটিকস, আর নয়তো গড়ের মাঠের খেলার খবর, আর নয়তো রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ।

ওরা দুই বন্ধুতে তত্ত্বকথা বা খেলার খবর বা চাকরি জীবনের হালচাল নিয়ে মাথা ঘামায় না। একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে গুণীজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। সেইভাবে একজন বিশিষ্ট কবি, একজন বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও একজন উদীয়মান ভাবুকের সঙ্গে চেনাশুনা হয় রত্নর। দেশের ইনটেলেকচুয়াল জীবনে এঁদের দুজনে স্থায়ী আসন পেয়ে গেছেন, তৃতীয়জন এখনো অখ্যাত, কিন্তু কবে একদিন খ্যাত হবেন তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। কেশব বলে, যুবকটি একটি চলন্ত বিশ্বকোষ।

জীবনে কত রকম কাজ রয়েছে করবার, করছেনও কত জন। রত্নর জীবনের কাজটা কী ? কিসের জন্যে তার জীবন ? ছোট বা বড়ো একটা চাকরি জোটাতে পারলে অন্নবস্ত্রের ভাবনা থাকে না, লেগে থাকলে উন্নতিও করা যায়। কিন্তু জীবিকা আর জীবন এক জিনিস নয়। জীবিকায় সফল হতে গিয়ে জীবনে বিফল হওয়া তো হামেশা দেখতে পাওয়া যায়। রত্নর চোখে তেমন সাফল্য মূল্যবান নয়। ব্যর্থতাও তার চেয়ে মূল্যবান, যদি মহৎ কর্মে হাত দিয়ে ব্যর্থ হওয়া যায়।

দেশবিদেশের প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বহু লেখকের জীবন ছিল তার সামনে। এক এক সময় তার মনে হতো কীটসের মতো বছর পঁচিশ বা শেলীর মতো বছর ত্রিশ বাঁচাও শ্রেয়। তবু অমুক অমুকের মতো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে অবসর নিয়ে সত্তর বছর বাঁচা শ্রেয় নয়। কেশব হয়তো সেই পন্থায় চলবে। কিন্তু রত্নর জীবনের কাজ ওপথে এগোবে না। যদি সে অমৃত হতে চায়। অমৃত পেতে চায়।

গৌরী আশা করেছিল যে কলকাতায় থেকে রত্ন অন্য চাকরির চেষ্টা দেখবে। পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে তার জন্যে হাঁ করে বসে থাকা মূর্খতা। কিন্তু রত্নর সেদিকে মনোযোগও ছিল না, শরীরও পরীক্ষার শ্রমভারে বিকল। তা ছাড়া চাকুরির উমেদারদের যা যা করতে হয় তাতেও ওর গভীর অরুচি। সে তো ধরে রেখেছিল যে জ্যোতিদাই বম্বে গিয়ে নিজের জন্যে একটা কিছু জোটাবে, তারপরে রত্নর জন্যে। কংগ্রেসী মহলে ওর যা প্রতিপত্তি ওর উদ্যোগে কার্যসিদ্ধি হবে। এখন জ্যোতিদাকে বা তার মতো একজনকে পাচ্ছে কোথায় ? রত্ন তার অভাবে অসহায় বোধ করছে।

রত্ন তাই বৃথা চেষ্টা করে না জীবিকার জন্যে। ও যা হবার তা হবে। মানুষের পক্ষে যা করবার তা তো সে ইতিমধ্যেই করেছে। বাকীটা ভগবানের করুণা। তাঁর যদি এটাতে সায় না থাকে তবে অন্য ব্যবস্থা করবেন। না হয় গৌরীর মুক্তি আরো কিছুদিন পেছিয়ে

যাবে। বিফল হলেও রত্ন তার নিজের জন্যে আফসোস করবে না। তার কলম আছে, তার ডান হাত আছে। ওরাই তাকে দু'বেলা দু'মুঠো জোটাবে। গৌরীরও কি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, কর্মশক্তি নেই? বছর খানেক বাদে সেও স্বাবলম্বী হতে পারবে। দু'জনে মিলে উপার্জন করলে, কেউ কারো চেয়ে কম স্বাধীন হবে না। বিবাহকে মনে হবে না একটা অপ্রীতিকর বন্ধন।

না, বিফল হলেও রত্ন হাহুতাশ করবে না। যে পন্থা কেশবের পক্ষে স্বধর্ম সেই পন্থাই রত্নর পক্ষে পরধর্ম। গৌরীর মুক্তির প্রয়োজন না থাকলে সে পন্থার দিকে সে আকৃষ্ট হতো কি না সন্দেহ। এই নিয়ে তার মনে বরাবরই একটা দ্বিধা। ইউরোপ দেখার দুর্বার আকর্ষণ ভিন্ন তেমন কোনো মোহনীয়তা ছিল না সে পন্থার। হাঁ, ইউরোপ তাকে চিরদিন টেনেছে। নারী যেমন টানে পুরুষকে। একের মধ্যেই অপরের পরিপূরকতা। হাঁ, ইউরোপও তার জীবনে আর একটি নারী, আর একটি গৌরী। ইউরোপের কাছে যাবার এটিও একটি পন্থা। এটিই সরলতম। কারণ তার পিতার তো তেমন ধনবল নেই যে তিনি ওকে বিলেত পাঠাবেন। ছাত্রবৃত্তি জোটানো আরো শক্ত।

এ ছাড়া তার জীবনে আর একটি টান ছিল। একদা সে কল্পনা করত চাষানী বিয়ে করে জনগণের একজন হয়ে যাবে। সেইভাবে একপ্রকার পরিপূরকতাও হবে। মনোময় পুরুষ চায় প্রাণময়ী নারী। নইলে অতিমাত্র মনোময়তা তো বন্ধ্যা। তার কল্পনার চাষানীই কি শেষে চতুরীর রূপ ধরে এল? যেমন প্রাণবতী তেমনি রসবতী। কিন্তু রূপবতী নয়, যুবতীও নয়। চতুরী যদি সমবয়সিনী হতো, দেখতে সুশ্রী হতো, রত্নকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বাউল কি ফকির হয়ে ছেলেটা পথে পথে ফিরত। কোনো এক আখড়ায় মাথা গুঁজত। কোথায় গৌরী, কোথায় জীবিকা, কোথায় জীবনের পরিপূর্ণতার পরিকল্পনা! সব পড়ে রইত পেছনে। ভাগ্যিস চতুরী তা নয়!

ওদিকে গৌরী মনে মনে জ্বলছিল। কুষ্টিয়ায় থাকলে ফের হয়তো ওরকম ঘটনা ঘটত, সেইজন্যে কলকাতায় গিয়ে চাকরির খোঁজখবর নিতে বলা। অন্য চাকরির। প্রতিযোগিতায় এবারে যদি ব্যর্থ হয় তা হলে হাতের পাঁচ হিসাবে আর একটা চাকরি তো থাকবে। কিন্তু রত্নর চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় না যে তার লেশমাত্র চাড় আছে। থিয়েটার সিনেমা দেখে আড্ডা দিয়ে তার দিন কাটছে। বলে কিনা জীবনের পেয়ালা ভরিয়ে নিচ্ছে। স্বাদ নিয়ে দেখছে অমৃতের মতো লাগছে কি না।

রত্ন লেখে, "অমৃত কোথায় নেই? সবটাতেই আছে। তারপর মনে হয় অমৃত কোথাও নেই। সবটাই ছলনা।"

গৌরী ওটা গায়ে পেতে নেয়। এমন রাগ করে যে লিখতে হাত কাঁপে। লেখে, "ওসব তত্ত্বকথা পরে শোনা যাবে। এখন যা করতে বলা হয়েছে তাই কর তো দেখি। একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নে। নইলে আপনিই বা খাবি কী, আর আমাকেই বা খাওয়াবি কী? আসমান থেকে কবে দৌলৎ নেমে আসবে তারই আশায় দিনপাত করবি? মনে রাখিস সময় ঘনিয়ে আসছে। আমার মুক্তির একটা এসপার কি ওসপার হওয়া চাই। আমার ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। সবাই মিলে যেন ষড়যন্ত্র করেছে যে আমাকে এই

খাঁচায় বন্দী করে রাখবে। খাঁচাটাও আর লোহার নয়, সোনার। জানিস, বহরমপুরে বাড়ি উঠছে ? নতুন একটা জেল। ওটা আমার জন্যেই। তোর যদি বিন্দুমাত্র পৌরুষ থাকে তবে তুই আমাকে সময় থাকতে হরণ করে নিয়ে যা। গৃহপ্রবেশের পূর্বেই। কিন্তু বলছি কাকে ? কে কান দিচ্ছে আমার কথায় ? মন হয়তো পড়ে আছে কুষ্টিয়ায়। ওখানে যে অমৃত মেলে আমার কাছে তো তা মিলছে না।"

গৌরী অবশ্য ভালোর জন্যেই ভালো মনে করে লিখেছিল। ভাবতেই পারেনি যে রত্ন তা পড়ে তেতে উঠবে । লিখবে, "গুরুমশায়, প্রণাম। যথেষ্ট গুরুগিরি হয়েছে। আমার জীবন আমি কেমন করে ভরিয়ে নেব সেটার জন্যে পাঠ নিতে হবে কি না গুরুর কাছে ! চাকরি বলতে যদি বোঝায় যেমন তেমন একটা চাকরি তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই, গৌরী। খাটতে তো হবে আমাকেই। তোকে তো নয়। খাটবার মতো বল কি এই দেহে আছে ? দু দু'বার বিষম পরীক্ষাজ্বরে ভুগে এখন আমি কাহিল। আমি নিঃশেষিত। আমার পেয়ালা শুকিয়ে গেছে বলেই আমি তাকে এইভাবে ভরিয়ে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত হেলাফেলায়। প্রতিদিনই নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হচ্ছে। জানিনে আমি কী হতে গিয়ে কী হয়ে উঠছি। জীবনে একটা কিছু করে দেখানো যেমন শক্ত তার চেয়ে আরো শক্ত একটা কিছু হয়ে ওঠা। তার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করা কর্তব্য।"

রত্ন যদি ওইখানেই থামত তা হলে গৌরীর কথা মেনে নিয়ে শান্ত হতো। কিন্তু ওর রোখ চেপে যায়। লেখে, "কুষ্টিয়ার কথা ভুলে যেতেই চেয়েছি। আমার ধারণা ছিল তুইও গেছিস। মনে হচ্ছে তোর রাগের গোড়ায় সেই ঘটনা। কিন্তু আমার উপর রাগ করার আগে একবার নিজের উপরে রাগ করা উচিত নয় কি ? আমি তোর প্রেমের মর্যাদা রাখিনি বলে লজ্জিত। কিন্তু তুইও কি আমার প্রেমের মর্যাদা রেখেছিস না রাখছিস ? কই, আমি তো তা নিয়ে খোচা দিইনে। বুঝি তোকে পদে পদে আপস করতে হচ্ছে। তাই চোখ বুজে থাকি। মুখ বুজে থাকি। গুরুমশায়গিরি আমার মানায় না। কত ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়ে জীবনটাকে ঠিক রাখতে চেষ্টা করি। কম্পাসের কাঁটার মতো। আমি তোকে বলবার কে ? তুই স্বাধীনা নায়িকা আমিও স্বাধীন নায়ক।"

গৌরীর বুক ফেটে কান্না ওঠে। কিন্তু সেটাকে ও মনে করে দুর্বলতা। রত্ন বকে যাচ্ছে। কড়া হাতে শাসন করা চাই। যে ভালোবাসে সে কি কেবল আদরই করবে, শাসনও করবে না ? শাসন করতে গেলেই কথা উঠবে গুরুমশায়গিরি করা হচ্ছে ? কান্তাসম্মিত বলে একটা কথাও তো আছে। গৌরী যদি কান্তা হয়ে থাকে তবে কান্তাসম্মিত বাক্যও শোনাবে।

গৌরী লেখে, আমার দিক থেকে প্রেমের অমর্যাদা হয়েছে ও হচ্ছে বলতে তুই যা মীন করেছিস সেটা মীন মাইণ্ডের পরিচায়ক। কে জানত যে তুই এতটা মীন হবি ! আমি ভেবে মরছি তোরই ভালোর জন্যে। তোর ভালো হলেই আমার ভালো। আমি তলিয়ে গেলে তুই আমাকে টেনে তুলবি, কিন্তু তুই যদি নিজেই তলিয়ে যাস তবে আমাকে টেনে তুলবে কে ? সেইজন্যেই তোকে একটু শাসিয়ে দেওয়া । সে অধিকার কি আমার নেই ?"

সাতচল্লিশ

রত্ন জানত 'আপস' বলতে কী বোঝায়। ললিতই ওর কানে মন্ত্র দিয়েছিল। গৌরী আর আগের মতো প্রতিরোধ করে না। যা করে তার নাম নিরোধ। ওর অসিধার ব্রত অচল। চললে সেটা অতিমানুষিক হতো।

রত্ন এর জন্যে ওকে দায়ী করে না। বর আপনার ঘাড়েই টেনে নেয় সব দায়িত্ব। সময়ে সফল হলে গৌরীকে ও মুক্ত করে নিয়ে যেত, তা হলে তো এ প্রশ্ন উঠতই না। কিন্তু খুঁচিয়ে ঘা করলে কার না মেজাজ বিগড়ে যায় ? চতুরীকে রত্ন সাধতে যায়নি। কোনোদিন ওর সঙ্গ কামনাই করেনি। যে নারী অনাহূতভাবে শয্যায় এসেছে তার সঙ্গে অসিধার ব্রত উদ্‌যাপন করলে সেও একটি মুনি কি ঋষি হতো, তা ঠিক । কিন্তু মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। সেকালের মুনি ঋষিদের দৌড় তো দেখা গেছে। গৌরী তা হলে কেন ওকে খোঁচা দেয় ? ও নিজে কী করছে ?

এই হলো যুক্তি। কিন্তু যুক্তিটার কাটান হলো এইখানে যে, কোনো প্রেমিকাই কোনো প্রেমিকের অন্যতর সংসর্গ সহ্য করতে পারে না। তেমনি কোনো প্রেমিকই কোনো প্রেমিকার। বিশ্বাসভঙ্গ একবার যদি ঘটে তবে তার ধাক্কা সামলে ওঠা দায়। গৌরী ক্ষমা করলেও ভোলেনি। সে তো রত্নকে চোখে রাখতে পারছে না। ও ছেলে কখন কার পাল্লায় পড়ে কে জানে। তাই চোখে একটু সমঝিয়ে দিতে হয়। সমঝিয়ে দেওয়া কি খোঁচা দেওয়া?

রত্নও কি খোঁচা দিতে চেয়েছে নাকি? আঘাতের উত্তরে আঘাত দিয়েছে। কিন্তু সে আঘাত এমন আঘাত যে গৌরীর কাছে যেন আঁতে ঘা। প্রেমের অমর্যাদা করল কে, না গৌরী? প্রেমে যার মনপ্রাণ আত্মা ছেয়ে আছে। দেহটাই শুধু বাকী। কী করবে, সে তো স্বাধীনা নয়। স্বাধীনা হলে মন প্রাণ আত্মার সঙ্গে দেহও ভরে যেত প্রেমে। এখন রত্নকে ওকথা বোঝাবে কে ? স্বাধীনা ও পরাধীনার প্রভেদ ও বুঝবে না। স্বাধীনা হলে ওকে কারো সঙ্গে আপস করতে হতো না। পরাধীনা বলেই তো করতে হচ্ছে। ওটা তার দুর্বলতার দরুন নয়। রত্ন কিন্তু যেটা করেছে সেটা দুর্বলতার দরুনই। সে তো পরাধীন নয়। এই যে বৈষম্য এটা কি উড়িয়ে দেওয়া যায় ?

রত্ন আর গৌরী দু'জনেই বৈষম্যসচেতন হয়। তার থেকে আসে সাম্যের প্রশ্ন। রত্নর মতে গৌরী যদি প্রেমের অমর্যাদা না করে থাকে তবে রত্নও করেনি, ভবিষ্যতে আবার অমন কিছু ঘটলে সেটাও প্রেমের অমর্যাদা হবে না। রত্নর বেলা যদি ওটা হয় দুর্বলতা তবে গৌরীর বেলাও কেন দুর্বলতা নয় ? দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কী চেষ্টা সে করছে ?

ওদিকে গৌরীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে ও যা করছে তার সঙ্গে সাম্য রক্ষার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। রত্ন যদি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহিত হতো তা হলেই স্ত্রীর সঙ্গে আপস করে সাম্য রক্ষা করত। রত্ন তো কুমার। চতুরী তো ওর কেউ নয়। যা ঘটেছে তা তো অনিচ্ছাসত্ত্বে নয়। দুর্বলতা। নিপট দুর্বলতা। পুরুষ জাতটাই কি দুর্বল ?

রত্ন মনে করিয়ে দেয় যে গৌরীও তো কুমারী বলে দাবী করে। তার বিবাহ তো

সে স্বীকারই করেনি। আপস করছে কোন যুক্তিতে ? মেয়েদের যদি যুক্তির বালাই থাকত ! যারা যুক্তির ধার ধারে না তাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

এমনি করে কথায় কথা বেড়ে যায়। নিষ্পত্তি হয় না। শেষে গৌরী কান্নাকাটি করে। মেয়েদের মোক্ষম অস্ত্র। রত্নও কথা দেয় সে আর অমন কিছু করবে না। গৌরীর জন্যে সবুর করবে। যাতে বেশীদিন সবুর করতে না হয় তার জন্যে একটু চেষ্টা চরিত্র করবে। একটা সুযোগ যদি হাতছাড়া হয় আরেকটা যেন মুঠোর মধ্যে থাকে। তা যদি না হয় তবে আরো দেরি হবে। তার মানে আরো আপস করতে হবে। গৌরীর পক্ষে সেটা অস্বস্তিকর। সেও মানে যে একজনের সঙ্গে প্রেম ও আরেকজনের সঙ্গে সহবাস কোনোজনের উপরই সুবিচার নয়।

তার স্বামী কিন্তু এই নিয়ে কিছু বলেন না। তাঁর পলিসি হলো গৌরীকে ঘরে ধরে রাখা। অন্তত যতকাল না তার সন্তানটি বড়ো হচ্ছে। এর জন্যে যা যা করা দরকার তা একে একে তিনি করছেন। সুধাকে বিদায় দিয়েছেন, বহরমপুরে বাড়ি বানাচ্ছেন। অনাহারী হলেও হাকিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন। লোন কোম্পানীতে টাকা ঢালছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গৌরীর এখন আর কী নালিশ থাকতে পারে ? অতীতে তিনি অপাপবিদ্ধ ছিলেন না, সত্য। কিন্তু এখন তো আর সে কথা বলা চলে না। বরং একটু স্ত্রৈণই বলছেন ইয়ারবক্সীরা। ওঁরা এখনো ফুলে ফুলে মধু পান করছেন। একদিন ওঁদের সঙ্গ এড়াবার জন্যে তিনি আবার বিলেত যাবেন, ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবেন, কলকাতায় বসবেন। তখন তো তিনি আদর্শ স্বামী।

গৌরীর পক্ষে ক্রমেই দুষ্কর হচ্ছিল এমন মানুষের উপর বিরাগ পুষে রাখা। লোকটা তো খারাপ নয়। না হয় এক সময় খারাপ কাজ করেছে। তা ওদের সমাজে কে না করে ! করে না যারা তারাই ব্যতিক্রম। যেমন জ্যোতি। কিন্তু জ্যোতিও তো শ্রেণীগতভাবে নেমে গেল। ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক যে হয়, তার চাষানী হওয়ার চেয়ে যশোবাবুর বধূরানী হওয়া শ্রেয়।

দু'জনের মাঝখানে দু'জনের দুই হাত ধরে দাঁড়িয়েছে শিশুপুত্র জয়মাধব। সে যেন ব্রত নিয়ে এসেছে যে বাপ মাকে মেলাবে। দুই দেশের মাঝখানে যে সাগর সে যেন তার উপর দিয়ে সেতু রচনা করবে। সে যেন সেতুবন্ধনকারী।

অথচ রত্ন ও গৌরীর মাঝখানে সেই শিশুই হয়েছে সেতুভঙ্গকারী জলপ্লাবন। ব্যবধান বাড়তে বাড়তে এমন হবে যে একপার থেকে অপর পার দৃষ্টিগোচর হবে না। এর মধ্যেই দূরত্ব বেড়ে গেছে। গৌরী আর রত্নকে তেমন আদর জানায় না। আদরে ভাগ বসাবার জন্যে আছে তার ঘর আলো করা মানিক, তার কোল জোড়া ধন সোনা। রত্নর পাওনায় টান পড়ে, কিন্তু গৌরীর পাওনায় টান পড়ে না। ওকে সমানে সোহাগ জানিয়ে যায় ওর প্রিয়।

প্রিয়। কিন্তু প্রিয়তম নয়। রত্নর মনে হয় ওর চেয়ে প্রিয়তর জয়। গৌরী বরং রত্নকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে, কিন্তু জয়কে ছেড়ে বাঁচবে না। জয় যেন ওর বাপের হয়ে ওর মাকে জয় করে নিয়েছে। পরাজয় ঘটিয়েছে ওর মার। সঙ্গে সঙ্গে পরাজয় ঘটেছে আরো একজনের। সে রত্ন। সে প্রথম স্থান থেকে নেমে এসে দ্বিতীয় স্থান নিয়েছে। কোনোদিন

কি প্রথম স্থান ফিরে পাবে?

রত্নর ভিতরে যে বস্তু ছিল না সে বস্তুর সঞ্চার হলো। ঈর্ষা। অতটুকু বাচ্চাকে ঈর্ষা। অথচ একেই সে আপনার বলে ভালোবেসেছিল একদিন। এখনো ভালোবাসে, কিন্তু আপনার বলে নয়, গৌরীর বলে। সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষাও করে। ও যে আরেকজন পুরুষের। যশোবাবুর উপরেও ঈর্ষা জন্মেছে এটা স্বীকার করতেও রত্নর মাথা কাটা যায়। সে কি সত্যি এতটা মীন? এমন মীন তো সে আগে কোনোদিন ছিল না।

গৌরী যে তার কোলের ছেলেকে ভালোবাসে সে ভালোবাসাও প্রকারান্তরে তার ছেলের বাপকে ভালোবাসা। ভালোবাসার রাজ্যে তিনিও রত্নর শরিক। তাই যদি হয় তবে ওটা আর একজনের রাজ্য নয়। দুইজনের রাজ্য। রত্ন আর একেশ্বর নয়। অর্ধেশ্বর। এদিক দিয়েও সে হটেছে।

শরিক হতে তার একটুও অভিরুচি ছিল না। গৌরীকেও তো সে অপর কোনো নারীর শরিক হতে বলছে না। গৌরী তা হবেও না। রত্নই বা হবে কেন? যদি হয় তবে সাম্য রক্ষার জন্যে আরেকটি নারীকেও ভালোবাসতে চাইবে। তেমনি সাম্য রক্ষার জন্যে তার সন্তানের জনক হতেও ইচ্ছা করবে। নইলে সামঞ্জস্য হবে কোন সূত্রে? সামঞ্জস্য না হলে প্রেম কি সার্থক হবে?

অনেক রাত বিনিদ্র থেকে সে একটু একটু করে উপলব্ধি করে যে ও ধরনের সামঞ্জস্য কারো পক্ষে সুখকর হবে না। একদিন ওই জটিলতার ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে হবেই। কিন্তু বেশী দেরি হয়ে গিয়ে থাকলে অভিমন্যুর দশা হবে। বাঁচতে হলে আরো আগে বেরিয়ে আসাই শ্রেয়। গৌরীকে বাঁচাতে গিয়ে রত্ন কি মরবে? না, সেও বাঁচবে। বাঁচলেই বাঁচাতে পারবে। মরলে তো বাঁচাতে পারবে না।

সামঞ্জস্য যদি হবার থাকে তো জয়কে মাঝখানে রেখে যশোবাবুর সঙ্গেই হবে গৌরীর। অবশ্য আজকেই হবে না। হবে একদিন না একদিন। হবে আখেরে। অপর পক্ষে রত্নর সঙ্গে যেটা হবে সেটা অসামঞ্জস্য। সেটাও আজকেই হবে না। হবে একদিন না একদিন। হবে আখেরে। রত্ন ধীরে ধীরে অনুভব করে।

এসব কথা গৌরীকে লেখে না। কেন বেচারিকে বেদনা দেওয়া! মনে মনে তুলে রাখে। যেদিন না বললে নয় সেইদিন বলবে।

জ্যোতি কলকাতা থেকে এসে রত্নকে খুঁজে বার করে। এই ক'মাসে ওর চেহারা হয়েছে সীজন করা সেগুন কাঠের মতো। বয়সও বেশ বেড়ে গেছে। চাষের দায়িত্ব ও দেশের দায়িত্ব দুই কাঁধে জোয়ালের মতো চেপেছে। তা ছাড়া গৃহস্থ হয়েছে, ঘর গেরস্থালির দায়িত্বটাও তো কম নয়। এ কি আশ্রমজীবন যে অল্পে চলবে?

রত্নর মনে জমে থাকা কথা জ্যোতি ভিন্ন আর কার কাছে নামিয়ে সে হালকা হবে? ওদের দু'জনের মধ্যে এমন একটা সাযুজ্য ছিল যেটা বন্ধুতার চেয়েও বড়ো। ওরা যেন হরিহর আত্মা। অথচ দুই মেরুর মতো বিপরীত।

"আমিও লক্ষ করেছি", জ্যোতিদা বলে, "গৌরী আর তেমন জোরের সঙ্গে প্রতিরোধের আশা দেয় না। ও যদি প্রতিরোধ করতে চাইত আমরা প্রেরণা জোগাতুম। যদি না চায় আমরাই বা হাত দিতে যাই কেন? ওকে ওর ভিতর থেকে প্রতিরোধশক্তি

সংগ্রহ করতে দাও।"

"কিন্তু ও যে পরাধীন। ও যে বেকায়দায় পড়েছে।" রত্নর ভিতরে যে নাইট ছিল তার শিভালরি হাত বাড়িয়ে দিতে চায়।

"তা বলে ওর প্রতিরোধশক্তি তো নিঃশেষ হয়নি। ভারতবর্ষও তো পরাধীন। সেও তো বেকায়দায় পড়েছে। রতন, তুমি ওদের পারিবারিক জীবনে জড়িয়ে পড়তে যেয়ো না। রেবা বলে ওদের মধ্যে একটা হোম লাইফ গড়ে উঠছে। ওরা একটি ত্রয়ী। ওদের হোম ভেঙে দেওয়া কি উচিত?" কথাটা জ্যোতিদাকেও ভাবিয়ে তুলেছে।

আটচল্লিশ

একদিন ওরা ছিল মানিকজোড়। গোরী আর রত্ন। গোরীরত্ন। রত্নগোরী। সেই অপূর্ব দিন কি আর আছে? এখন ওদের বন্ধনীর মাঝখানে আর একটি মুখ উঁকি মারছে। গোরীর শিশুসন্তানের। তাকে নিয়ে গড়ে উঠছে একটি ত্রয়ী। সে ত্রয়ীতে রত্নর স্থান নেই। যশোবাবুর স্থান আছে। ওঃ কী নির্মম সত্য!

যে ত্রয়ীটি গড়ে উঠছে সেটিকে ভেঙে দিয়ে কার কী লাভ? তার জায়গায় আর একটি ত্রয়ী তো গড়ে দেওয়া সহজ নয়। আবার তাকে স্বীকার করে নিলেও অনধিকারী প্রবেশকারীর মতো হীন হয়ে থাকতে হয়। ছেলে যদি জানতে চায়, "মা, এ লোকটা কে" তা হলে কী উত্তর দেবে গোরী? "আমার বন্ধু" বা "আমার ভাই" না বলে আর কী বলতে পারে? "আমার প্রেমিক" বললে কি সেটা খুব সম্মানের শোনাবে? "আমার স্বামী" বলার মতো সাহস কি তার কোনোদিন হবে?

ওদের জীবনে সত্যের মুহূর্ত ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছিল। ওরা আসলে কী! ওদের কোন পরিচয়টা দুনিয়ার সামনে মাথা উঁচু করে শোনাবার মতো? আর কতদিন কাটবে গোপনে প্রেমপত্র লিখে? দেখা-সাক্ষাৎও আর হয় না। হলে সেটা বন্ধু বা ভাই সুবাদে। তা হলে সেই সুবাদটাকে বরাবরের মতো মেনে নেয় না কেন? কেন স্বপ্ন দেখে আরো অন্তরঙ্গ সুবাদের? কবে সফল হবে সে স্বপ্ন?

ত্রয়ী কথাটা একবার যদি মাথায় ঢুকল তো আর বেরোতে চায় না। না, আর দুই নয়। দুইয়ের যুগ গেছে। ত্রয়ীর যুগ এসেছে। গোরী এখন একটি ত্রয়ীর অঙ্গ। ত্রয়ী না ভেঙে সে রত্নর হতে পারে না। রত্নও তার হতে পারে না। ওদের তিনজনের চালচিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে রত্ন তার মধ্যে ঠাঁই পেতে পারত, কিন্তু সেটা যেন সিংহবাহিনীর পায়ের তলায় সিংহের মতো। ওর পক্ষে ওটা অমর্যাদাকর। ওর প্রেমের পক্ষেও।

ভিতরে ভিতরে ওর পৌরুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল। পৌরুষ বলতে পুরুষের ইজ্জৎও বোঝায়। রত্ন দিন দিন ইজ্জৎ সচেতন হয়ে উঠছিল। প্রেমের জন্যে পুরুষ কি তার পৌরুষ বিসর্জন দিতে পারে? কিংবা পৌরুষকে খাটো করতে পারে? তা হলে যে তার উচ্চতা হবে বামনের মতো। গোরীর প্রেম পেয়ে তার মাথা একদিন আকাশে ঠেকেছিল। আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে গেছল। কিন্তু নন্দনের আবির্ভাবের পর থেকে

তার মাথা একটু একটু করে নত হয়ে আসছিল। এর পরে হয়তো মাটিতে মিশিয়ে যাবে।

এটা হলো এমন একটা সমস্যা যে গৌরীকে বোঝাবার নয়। সে বুঝবে না। সে তো পুরুষ নয়। এ সমাজে নারী অনেক কিছু স্বীকার করে নিতে পারে, সেইটেই তার কাছে নারীত্ব। তার সপত্নী থাকতে পারে, সপত্নীর সন্তান থাকতে পারে। তাতে তার মাথা হেঁট হয় না। প্রাণে একটা জ্বালা বোধ করে, কিন্তু সে জ্বালা অসম্মানের জ্বালা নয়। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় পড়লে পুরুষ অসম্মানের ভারে নুয়ে পড়ে। অসম্মানের ভয়ে মুখ তুলে তাকাতে পাবে না। চোরের মতো প্রকৃত পরিচয় গোপন করে।

"হাঁ রে, তুই নাকি একটি গয়লানীকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস? গৌরী তার নাম?" তার বাবা একদিন কলকাতা ছুটে এসে তাকে পাকড়াও করেন।

"কে বলল? না তো।" এই বলে রত্ন পাশ কাটায়। অসত্য নয়। ও তো তেমন কোনো গয়লানীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে না গৌরী যার নাম। বিয়েও নয়, গয়লানীও নয়, গৌরীও নয়। সুতরাং মিথ্যা বলেনি।

ভাগ্য ভালো যে বাবা জেরা করেন না। রত্নর সত্যবাদিতার উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তা হলে লোকে অমন কথা রটায় কেন? আশ্চর্যের ব্যাপার নয়?

রত্ন বুঝতে পারে যে কথাটা যেমন করে হোক কুষ্টিয়ায় ছড়িয়েছে। কোন সূত্রে ছড়িয়েছে সেটা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। কিন্তু মিথ্যা হলে তো অনুসন্ধান করবে। কথাটা অবশ্য আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। তাতে কি বিবেক শান্তি পায়?

শেষকালে বাপের কাছে মিথ্যা বলা হলো। তাঁর বিশ্বাসপরায়ণতার সুযোগ নিতে হলো। সৎসাহস থাকলে বলত, "হাঁ, গৌরী বলে একটি মেয়ে আছে। গয়লানী নয়, ক্ষত্রিয়ানী। না, বিয়ে করতে যাচ্ছিনে। তবে ওর মুক্তির জন্যে যথাসাধ্য করতে যাচ্ছি। আমিও তো একজন ক্ষত্রিয়। তা নইলে কায়স্থরা পৈতে নিচ্ছে কেন?"

মুক্তি বলতে কী বোঝায়? কোন কারাগার থেকে মুক্তি? স্বামীর কারাগার থেকে না স্বামিত্বের কারাগার থেকে? এ সব প্রশ্ন একে একে উঠলে একে একে জবাব দেওয়া যেত। তার ফলে পিতা হয়তো অগ্নিশর্মা হয়ে ত্যজ্যপুত্র করতেন। তার জন্যে সে প্রস্তুত। বাপের সম্পত্তির উপর তার বিন্দুমাত্র মায়া ছিল না। সম্পত্তিমাত্রের সম্বন্ধে সে বীতরাগ। সম্পত্তি মানুষকে বেঁধে রাখে। ছেড়ে দেয় না। রত্ন চায় ছাড়া পেতে।

বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ভয়ে নয়, তাঁর মনে যাতে আঘাত না লাগে সেই জন্যেই তাকে মিথ্যা বলতে হলো। মনের দুঃখে তিনি হয়তো মারা যেতেন। লোকসমাজে তিনি মুখ দেখাতে পারতেন না। ছি ছি! পরনারীকে ঘর থেকে বার করে নেওয়া। যাকে বিয়ে করার জো নেই। আখেরে উভয়েরই সর্বনাশ।

রত্নর বাবা নিজে যেমন স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন রত্নকে তেমনি স্বাধীনচেতা হতে শিখিয়েছিলেন। যত বড়োই হোক না কেন চাকরি হচ্ছে চাকরি। দাসখৎ হচ্ছে দাসখৎ। রত্ন যেন সেটা এড়াতে চেষ্টা করে। তিনি চেষ্টা করেও পারেননি। তাঁর উপরে অতি অল্পবয়স থেকেই চেপেছিল একান্নবর্তী পরিবারের সমস্তটা দায়। রত্নর উপরে তো তেমন কোনো দায় চাপানো হয়নি। তাকে কেউ চাকরি করতে বা বিয়ে করতেও বলছে না।

যখন বিয়ে করবে তখন নিজের পছন্দমতো করতে পারে। তবে বংশের মর্যাদা যেন হানি না হয়। পণ দেওয়া নেওয়া তাঁর মতে অধর্ম। তাতেও বংশের মর্যাদাহানি।

এমন বাপকেও কেউ ধোঁকা দেয় ? রত্ন ঘোরতর অশান্তি বোধ করে। বাবা যদি অমন একটা প্রশ্ন না করতেন তা হলে তাকে অমন একটা উত্তর দিতে হতো না। কিন্তু প্রশ্নটা কি একদিন না একদিন হানা দিত না ? গোরীর মুক্তির পরে তো সব জানাজানি হয়ে যেত। তখন কি আর অস্বীকার করবার কোনো উপায় থাকত ?

"সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ আসে তার ঠাঁই।" রত্ন অবশ্য সুখের জন্যে প্রেম করেনি, কিন্তু প্রেমের মধ্যে সুখ পেয়েছে। ভেবেছে ওর মতো সুখী আর কে ! এখন কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে। ওর মতো দুঃখী আর কে ! বেচারা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। বালিশ ভিজে যায় চোখের জলে। গোরীকেও জানতে দেয় না।

এমনি করে শুরু হয় সত্যের সঙ্কট। গোরীর কাছে সত্যরক্ষা করতে হবে, নইলে বিশ্বাস কতদিন থাকবে ? তেমনি বাপ-খুড়োর সঙ্গে সত্যরক্ষা করতে হবে, নইলে তাঁরাই বা বিশ্বাস করবেন কতদিন! সকল সম্পর্কই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস চলে গেলে সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়। রত্ন কি সেটা সইতে পারবে?

অপর পক্ষে সত্যরক্ষা করাও সহজ কথা নয়। তারও ঝুঁকি আছে। বাবা বলবেন, গোরীর সঙ্গে এখন থেকে আর কোনো সম্বন্ধ রাখিসনে। রত্ন বলবে, আমি যে অঙ্গীকারবদ্ধ। একটি বিপন্ন নারীকে বিপদ থেকে মুক্ত না করে আমারও অঙ্গীকারমুক্তি নেই। বাবা কি সেটা স্বীকার করবেন ? সহ্য করবেন? মনোমালিন্য অপরিহার্য।

সত্যের সঙ্কট ক্রমে ঘনিয়ে আসে। রত্ন বুঝতে পারে যে গোরী তার সখীদের বিশ্বাস করে যা জানিয়েছে আর রত্ন জানিয়েছে তার সখাদের আর মালাদিকে, তার কিছুটা বিকৃত হয়ে কুষ্টিয়ায় পৌঁছেছে। বিকৃতকে সংশোধন করতে হলে প্রকৃতকে অনাবৃত করতে হয়। তাতে আবার অপর একটি পরিবারের সম্মানহানি ঘটে। যশোবাবু সমাজে অপদস্থ হন। আর গোরীরও বিপদ বেড়ে যায়।

কী ফ্যাসাদ ! নিজের বল না বুঝে আরেকজনকে বাঁচাতে গেলে দু'জনেই ডুবে মরে, এমন তো অনেক সময় ঘটে। এটাও কি তারই মতো নয় ! অথচ আরেকজনকে ডুবতে দেখেও জলে নামতে কুণ্ঠিত হয় যে জন সে কি মানুষ নামের যোগ্য! মানুষের ধর্ম মানুষকে বাঁচানো। যায় যাক প্রাণ।

গোরীর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে রত্ন যা করেছে ঠিকই করেছে। মানুষ হিসাবে সে নেমে যায়নি। নেমে যেত যদি বিপন্ন নারীর ডাকে সাড়া না দিত। অপর পক্ষে এটাও তো ঠিক যে পিতার কাছে অপরাধী হয়েছে। মিথ্যা বলেছে। পরে একদিন ধরাও পড়বে। তখন কি আর মুখ দেখাতে পারবে। তাঁর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ !

মনের যখন এইরূপ বিহ্বল অবস্থা তখন গোরীর কাছ থেকে চিঠি আসে, ওরা বহরমপুর যাচ্ছে, সেখানেই বসবাস করবে। রত্ন কি কোনোদিন ওদিকে যাবে না ?

সামান্য একটা প্রশ্ন। কিন্তু সামান্য থেকে অসামান্য জন্মায়। দেখতে দেখতে বচসা বেধে যায়। সেটা যে পূর্ব পরিকল্পিত তাও নয়।

"বহরমপুরে একটা পাগলা গারদ আছে শুনেছি। সেইখানেই যেতে হবে একদিন।

সেটা আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি, গোরী।" রত্ন উত্তর দেয়।

"কেন, তুই কি পাগল? কার প্রেমে পাগল? প্রেমে না কামে?" গোরী কটাক্ষ করে। ওর মনেও তো একটা জ্বালা আছে।

"সে জন্যে নয়। আমাকে জ্বালাতন করছে অন্য এক সমস্যা। আমি কি সব কথা খুলে বলব আমার বাবাকে? তোরও খুলে বলা উচিত তোর স্বামীকে। সত্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে আমরা বাঁচি তো বাঁচব, মরি তো মরব। ভাসি তো ভাসব, ডুবি তো ডুবব। ডুবে ডুবে জল খেয়ে আর কতদিন বাঁচা যায়!" রত্ন লেখে।

"খবরদার! কোনো কথা অসময়ে প্রকাশ করিসনে। করলে ঝগড়া করব। বলব তোরই দোষ। তুই-ই আমাকে ভজিয়েছিস। তুই-ই আমাকে মজিয়েছিস।" গোরী বাণ হানে।

"আমি তোকে ভজাবই বা কেন, আর মজালুমই বা কবে? তোর কি মাথা খারাপ? না মুখ খারাপ? অমন ইতর ভাষায় কী তুই বোঝাতে চাস?" রত্নও পালটা বাণ হানে।

"কী! আমি ইতর, না তুই ইতর? ইতর স্ত্রীলোকের সংসর্গে ইতর!" বলে গোরী আহত ফণিনীর মতো ছোবল মারে।

প্রেমের ওটাও একটা স্তর। ওই পারস্পরিক দোষারোপ। রত্নও পালটা বলতে পারত যে গরিব হলেই ইতর হয় না, বড়লোকরাও ইতর হতে পারে, কিন্তু বলে না।

ঊনপঞ্চাশ

এক সুন্দর প্রভাতে রত্ন সহসা মনঃস্থির করে। গোরীর সঙ্গে ওর যে আদি সম্পর্ক সেই সম্পর্কে ফিরে যাবে। আবার ভাইবোন সম্পর্ক পাতাবে। ভাই সুবাদেও তো বোনকে বাঁচানো যায়। তার জন্যে প্রেমের সম্পর্ক পাতানোর কী দরকার? প্রেমের সম্পর্ক পাতালে প্রেমের শেষ সীমাটি পর্যন্ত যেতে হয়। ততদূর কি গোরী সত্যি কোনো দিন যেতে পারবে? ওর ছেলেই ওকে যেতে দেবে না। ছেলের মুখ চেয়ে ছেলের বাপকেই স্বামী বলে মেনে নিতে হবে। স্বামীকে তাঁর স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করলে সতীন এসে জুটবে।

অমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু আগে যেটা অকল্পনীয় ছিল, একটু বাদে মনে হলো সেইটেই স্বাভাবিক। এতদিন যেন সে একটি মধুর স্বপ্ন দেখছিল। এবার জাগরণ। এখনো স্বপ্নের রেশ লেগে রয়েছে, তবু স্বপ্নটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাকে আর জোড়া দেবার, প্রলম্বিত করবার উপায় নেই।

গোরীকে জানাতে হাত ওঠে না, অথচ না লিখেও পারে না। যা লেখে তার মর্ম, "তুইও থাকছিস, আমিও থাকছি, আমাদের দু'জনের মাঝখানে রেশমের সুতোর মতো একটা সম্পর্কও থাকছে, কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক নয়। তার পরিবর্তে আমাদের সেই ভাইবোন সম্পর্ক। রাখীবন্ধ ভাই বহিন। হুমায়ুন বাদশা ও রাজপুত রানী। তোর বিপদের ডাকে আমি সাড়া দেব। কিন্তু প্রেমের ডাকে নয়। প্রেমের জগতে তুইও স্বাধীন থাকবি, আমিও স্বাধীন থাকব। তোর মতো ভালোবাসা আর কেউ আমাকে ভালোবাসেনি,

কিন্তু ভালোবাসবে না কেমন করে বলি? হয়তো সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসবে। কিছুই হাতে রাখবে না। তোর পক্ষে সেটা কোনোদিন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না, তুই মা হয়ে অবধি রূপান্তরিত হয়েছিস। তোর মধ্যে আমি আর রাধাকে খুঁজে পাচ্ছিনে। যার রূপ দেখছি সে মাডোনা। তোর সঙ্গে আমার সামঞ্জস্য হবে কী করে? যেটা হবার নয় সেটার স্বপ্ন না দেখে যেটা সম্ভব সেটার উপরেই নির্ভর করা শ্রেয় নয় কি? সেটার নাম ভাইবোন সম্পর্ক। রাখীবন্ধ ভাইবহিন। আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি ও রয়েছি, তোর যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন তোকে মুক্ত করব। আয়, তা হলে প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে গ্রহণ করি। আবার নতুন করে শুরু হোক আমাদের যাত্রা।"

গৌরীর কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাত। ও মেয়ে ক্ষণকালের জন্যে মূর্ছা যায়, তারপর কেঁদে কেটে অনর্থ বাধায়। কেউ বুঝতে পারে না কেন।

বছর দুই আগে গৌরী তো আত্মহত্যা করতেই উদ্যত হয়েছিল। রত্ন কেন এসে ওকে নিরস্ত করতে গেল? সে যে পরে এমন বেইমানী করবে তা কি ও জানত? জানলে কি ওর কথায় কান দিত? একটি অবলা নারীর সঙ্গে অমন বেইমানী যে করে সে কি এর জন্যে নরকে যাবে না? আছে, আছে তার কপালে অনন্ত নরক।

এখন আর আত্মহত্যা করা চলে না। বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে। তবু কিছু একটা করতেই হবে ওকে। না করলে নয়। একজন ওকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল, এটা কি ও বরদাস্ত করবে? যার সঙ্গে যার প্রেমের সম্পর্ক একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে তার ভাইবোন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে কখনো? শেলী তাঁর বধূ হ্যারিয়েটকে ফেলে পালিয়ে যাবার পর আদর করে চিঠি লেখেন, "আমার আত্মার বোন হ্যারিয়েট।" হ্যারিয়েট সার্পেন্টাইনে ঝাঁপ দিয়ে মুখের মতো জবাব দিয়ে যান। শেলীও কি সুখী হলেন? পরে একদিন জাহাজডুবি হয়ে তাঁরও তো ঘটল সেইরূপ সলিল সমাধি।

এসব কথা মনে করিয়ে দিয়ে গৌরী যে উত্তর দেয় তার মর্ম, "নদী কি তার উৎসমুখে ফিরে যেতে পারে? জীবনের যেমন পশ্চাদগতি নেই, প্রেমেরও তেমনি উজান গতি নেই। প্রেমিক প্রেমিকা যদি আর প্রেমের সম্পর্ক রাখতে না চায় তবে সব সম্পর্কই কেটে যায়। তুই তার জন্যে প্রস্তুত? আমি তো ভাবতেই পারিনে, মণি। তোকে আমি কটু কথা বলেছি বলে আমার মন পুড়ে যাচ্ছে। তোর পায়ে ধরে মাফ চাইছি। ক্ষমা কর। ভুলে যা। কিন্তু অমন করে শাস্তি দিসনে। তোর কোথায় বাধছে আমায় খুলে বল। আমি প্রতিকার করব।"

এর পরে বোঝাপড়ার দীর্ঘ পালা। তারই মাঝখানে হঠাৎ একদিন কাগজে বেরিয়ে যায় প্রতিযোগিতায় যারা সফল হয়েছে রত্নই তাদের সকলের শীর্ষে। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম এসে হাজির। উল্লাসভরা অভিনন্দন।

"মানিক রে, ধন্য তোর তপস্যা! এবার তুই ইন্দ্রত্ব লাভ করবি। ইন্দ্র হলে শচীও আসবেন। আমি কে যে আমাকে কেউ ইন্দ্রলোকে বসে স্মরণ করবে?" গৌরী লেখে।

সফল হয়েছে বলে রত্নর মনে সুখ নেই। গৌরীকে তো সুখের ভাগ দিতে পারবে না। কোথায় পড়ে থাকবে গৌরী আর কোথায় চলে যাবে রত্ন! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। দূরত্ব কি শুধু ভূগোলের হিসাবে বাড়বে? দেখা সাক্ষাতের লেশমাত্র সম্ভাবনা যদি

না থাকে তবে জীবনেও এক প্রকার শূন্যতা সৃষ্টি হয়। পূরণ করার জন্যে নতুন নতুন নারীর পদপাত ঘটে। বিলেতের মতো দেশে কত নারীর সঙ্গে আলাপ হবে। তাদের মধ্যে কেউ যে আকর্ষণ করবে না, আকৃষ্ট হবে না, কেমন করে তা বলা যায়? রত্ন যদি অচঞ্চল থাকতে না পারে সেটা কি তারই দোষ? যৌবনের ধর্ম নয়?

কী মনে করে লেখে, "তুই থাকতে আর কেউ কেন শচী হবে? কিন্তু তুই থাকলে তো? আমি বলি কী, তুই বিলেত চল। এক সঙ্গে নয়, মাস কয়েক বাদে। ততদিনে আমিও গুছিয়ে বসে থাকব। ওইভাবেই তোর মুক্তি আর আমাদের পরিণয়।"

গোরী তো কেঁদে আকুল। ওর খোকনকে ফেলে ও স্বর্গে যেতেও চায় না। বিলেত দেশটা তো মাটির। অমন কাজ যদি করে তবে খোকনকে তো চিরকালের মতো হারাবেই, আত্মীয়স্বজন সবাইকেই হারাবে।

"তোর প্রস্তাবটা তো চমৎকার। কিন্তু মা হয়ে কোলের ছেলেকে কার হাতে সঁপে দিয়ে যাব? ডাইনীর হাতে? ওর বাবা নির্ঘাত আবার বিয়ে করবেন। আর ডাইনীর নিঃশ্বাস লেগে নটে গাছটি শুকিয়ে যাবে। এত বড়ো অধর্মের ভাগী হয়ে তোরই বা কোন সুখ? তার চেয়ে আরো কিছুকাল সবুর কর। খোকন একটু বড়ো হোক। মাকে ছেড়ে থাকতে শিখুক। আমি তোর পথ চেয়ে বসে থাকব। তুই ফিরে এলে তারপরে যা তোর ইচ্ছা তাই হবে।" গোরী জবাব দেয়।

রত্ন দেখে নিজের মুক্তির জন্যে গোরী আর অধীর নয়। একজন যে দুটি বছর প্রবাসে কাটাবে আরেকজন সে দু' বছর দেশে থেকে কোলের শিশুটিকে মানুষ করবে। বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু রত্ন আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। সে যদি আর কারো প্রেমে পড়ে তবে সে স্বাধীনতা তার থাকবে। গোরীর মুক্তি সুদূর বলে রত্নর মুক্তি বন্ধক থাকবে কতকাল!

"আমি তোকে কথা দিয়েছি কথা রাখব। তোর মুক্তির জন্যে দায়ী থাকব। কিন্তু আমার নিজের মুক্তি তো চিরদিনের জন্যে সমর্পণ করতে পরিনে। আমাকেও মুক্ত থাকতে হবে, গোরী। আর কেউ যদি আমাকে ভালোবাসে ও আমার ভালোবাসা পায় তবে তার সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্ক পাতাব। তোর সঙ্গে ভাইবোন সম্পর্ক। যদি আপত্তি না থাকে তোর।" রত্ন পরিষ্কার করে জানায়।

"এর পরেও আমার মুক্তি তোর হাত থেকে নেব? কেন, তোর হাত থেকে কেন? আর কারো হাত থেকে কেন নয়?" গোরীও স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেয়। "বৃন্দাবনে কানু বিনা কি পুরুষ নেই? যে আমাকে ভালোবাসবে সে-ই আমাকে মুক্ত করবে। তোকে আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দিলুম।"

এতদিন মুক্তির জন্যে গোরীই তাড়া দিচ্ছিল। এখন গোরীকেই তাড়া দিতে হচ্ছে। মুক্তির লগ্ন যতই নিকট হয়ে আসে ততই প্রকট হয় যার মুক্তি তার অনিচ্ছা। বছর দু' তিন অপেক্ষা করলে কি অনিচ্ছা পরিণত হবে ইচ্ছায়? মনে তো হয় না।

রত্নর ধারণা ছিল মুক্তির সমস্যাটাই গোরীর জীবনের মূল সমস্যা। তার ওই ধারণার পরিবর্তন হয়। যে নারী সমাজের যূপকাষ্ঠে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তার বাঁধন খুলে দিতে বা কেটে দিতে হলে আরো বড়ো শক্তিমান পুরুষের আরো বড়ো প্রেমশক্তির প্রয়োজন।

প্রেমই তার জীবনের মূল সমস্যা।

প্রয়োজনের সঙ্গে শক্তিকে পরিমাপ করে দেখা গেল রত্নর শক্তি গোরীকে মুক্ত করবার পক্ষে এখন তো নয়ই, কোনো দিনই যথেষ্ট হবে কি না সন্দেহ। সে যেমন পুরুষ হিসাবে দুর্বল তেমনি প্রেমিক হিসাবেও ক্ষীণপ্রাণ। কেমন করে সে গোরীর মতো একটি শক্তিমতী নারীর প্রেমশক্তির সমকক্ষতা করবে। ওদের মিলন যদি বা ঘটে তবে তা বিচ্ছেদের জন্যেই। ঘটলে ওই মুক্তিটুকুনই ঘটবে, তার বেশী নয়। শুধুমাত্র মুক্তিটুকুনের জন্যে গোরী এত বড়ো ঝুঁকি নেবে? স্বামীত্যাগ, পুত্রত্যাগ, সামাজিক আশ্রয়ত্যাগ? এখন তো নয়ই, পরে নেবে বললেও তা নির্ভরযোগ্য নয়।

স্বামীও রাখব, পুত্রও রাখব, কুলও রাখব, শীলও রাখব, এসব হাতে রেখে শ্যামও রাখব, এই যার মনোগত অভিপ্রায় তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কতদিন থাকতে পারে? একটি বিবাহিতা নারীর পরকীয়া প্রেমের শরীক হয়ে রত্নই বা কোন সার্থকতা পাবে?

"ভাবনা কিসের, গোরী, তোর যদি ত্বরা না থাকে তোর পুরুষোত্তম একদিন না একদিন তোর জীবনে উদয় হবেন, তোকে একহাতে মুক্তি দেবেন, আরেক হাতে প্রেম। তাঁর জন্যেই প্রতীক্ষা শোভা পায়, আমার জন্যে নয়।" রত্ন সান্ত্বনা দিয়ে লেখে।

"মেয়েদের তুই অত ছোট ভাবিস কেন? ওরা স্বভাবত একনিষ্ঠ। তোদের মতো ভ্রমরস্বভাব নয়। আমি যাকে ভালোবেসেছি তারই জন্যে প্রতীক্ষা করব।" গোরী আশ্বাস দেয়।

জ্যোতি কেমন করে জানতে পায় যে ওদের দু'জনের প্রণয়ভঙ্গ ঘটে গেছে। রত্নকে বলে, "তুমি যখন প্রেমে পড়েছিলে তখনো ভুল করনি। প্রেমের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এখনো ভুল করছ না। অনিচ্ছুককে তুমি ইচ্ছুক করবে কোন জাদুবলে? যখন ওর নিজের ইচ্ছা হবে ততদিন যদি তুমি আর-কোনোখানে বাঁধা পড়ে না থাক তবে তুমিই ওকে মুক্ত করবে। এখন তুমি তোমার আপনাকে মুক্ত কর।"

পঞ্চাশ

প্রেম কি কারো প্রজা যে, "আয়" বললেই আসবে, "যা" বললেই যাবে? রত্ন যাই বলুক না কেন তার প্রেম তা শোনে না। প্রেমের সম্পর্কটা চুকে গেলেও প্রেম যেমন ছিল তেমনি থাকে। রত্নও তার উপর জোরজুলুম করে না। তার স্বভাব নয় জোর খাটানো। অন্যের উপরেও না। আপনার উপরেও না।

তবে সে সর্বতোভাবে স্বাধীন থাকতে চায়। যদি আর কারো প্রেমে পড়ে প্রেমের স্বাধীনতা তার থাকবে। গোরীর প্রেম তার অন্তরায় হবে না। বৃন্দাবনে যদি কানু-বিনা আরো পুরুষ থাকে তবে রাধা বিনা আরো নারীও কি নেই? তাদের জন্যে দুয়ার খোলা রাখার নামই পুরুষের মুক্তি। মুক্তি মানে মুক্তদ্বার।

একদিন কানন এসে খোঁটা দেয়। "কি হে, কৃষ্ণ! তুমি তো বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাবার মুখে। ওদিকে রাধা বেচারির কী দশা হবে? তোমার নামে কলঙ্ক রটবে যে তুমি

একটি অভাগিনী নারীকে পাগলিনী করে পথে বর্জন করলে। ছি ছি! কী কাঠ হৃদয়! পারুলদির কান্না যদি দেখতে।"

ইতিমধ্যেই সে গোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে। ওর মতো অসুখী আর কে? তা বলে নিজের সুখের জন্যে কোলের ছেলেকে তো বিসর্জন দিতে পারে না।

রত্ন চুপ করে থাকে। গোরীর কাছে ওরকম প্রত্যাশা করা ওর উচিত হয়নি। ওটা ওর ভুল। গোরী যে অমন প্রস্তাবে রাজী হয়নি সেটা সকলের ভালোর জন্যেই। রত্নর দিক থেকেও ভালো। একটি পুত্রবিরহিতা জননীকে নিয়ে বিদেশে ও নিজেই নাজেহাল হতো।

"শোন, তোমার সঙ্গে আরো কথা আছে।" কানন বলে, "পারুলদির সঙ্গে তোমার একবার শেষ দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওকে তো কেউ আসতে দেবে না। তোমাকেই যেতে হয়। তুমি কবে যাবে বল। আমিই তোমাকে আবার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। ওদের বহরমপুরের বাড়ি তো তুমি চেনো না।"

রত্ন বলে, "বেশ তো। তুমিই একদিন নিয়ে যেয়ো।"

দুই বন্ধুতে মিলে একটা দিন ফেলা গেল। কথা রইল যে দেখা করেই পরবর্তী ট্রেনে ফিরে আসবে। রাত্রে থাকবে না। কলকাতায় মেলা কাজ ছিল।

গোরীর সঙ্গে প্রথম দর্শনের মতো শেষ দর্শনও সেই গোধূলিবেলায়। মাঝখানে দু' বছরের চেয়ে কিছু বেশী ব্যবধান। বৈশাখ নয়, আষাঢ়।

যশোবাবু রত্নকে পরম ভদ্রতার সঙ্গে স্বাগত করেন ও তার কৃতিত্বের জন্যে অভিনন্দন জানান। তারপর দোতালার বারান্দায় নিয়ে গিয়ে খসখসের পর্দার আড়ালে বসিয়ে দেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে নদীর দৃশ্য দেখা যায়। রত্ন উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কখন এক সময় গোরীর আবির্ভাব। ট্রে হাতে। যশোবাবু দু' চার কথার পর নিচের তলায় নেমে যান কাননকে নিয়ে। বাগান দেখাবেন।

ও মেয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ দুটিকে জবাফুল করেছে। কেশও অবিন্যস্ত। রত্ন আসছে বলে সাজসজ্জারও বিশেষত্ব নেই। বিষাদের প্রতিমা। তবে খুশিরও আমেজ লেগেছে রত্নকে এতদিন পরে আবার কাছে পেয়ে।

গোরীই প্রথম কথা বলে। "ভেবে দেখছি আমার মুক্তি এককালীন হবার নয়, কিস্তিতে কিস্তিতে হবে। উনি আমাকে এর মধ্যে বেশ খানিকটে মুক্তি দিয়েছেন। পরে আরো দিতে রাজী হয়েছেন। ইংরেজের পলিসি আর কী! দেখাই যাক না সত্যরক্ষা করেন কি না। যদি বুঝতে পারি ওটা একটা ভাঁওতা আমিও একদিন যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাব। তোকে আর বিব্রত করব না। ততদিনে তুই হয়তো আর কোনো রূপবতীর রূপে বিভোর বা গুণবতীর গুণে মুগ্ধ। জগতে কত নারী আছে, ওদের সঙ্গে প্রেমের প্রতিযোগিতায় আমিই যে শীর্ষস্থান অধিকার করব সে আত্মবিশ্বাস কি আমার আছে? আমি তোর অতীত হতে পারি, আমি তোর ভবিষ্যৎ নই। তোকে আমি আটকে রাখব না, ধন। রাখতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ত্রিভুবন ঘুরে একদিন যদি অনুভব করিস যে আর কেউ তোকে আমার মতো ভালোবাসে না, যদি তোর প্রত্যেকটি ভালোবাসাই ব্যর্থ হয় তা হলে আবার আমার দিকে ফিরে তাকাস, নইলে আর ফিরে

তাকাসনে।"

রত্নর কণ্ঠস্বরেও তেমনি আবেগ। "তোর মতো ভালোবাসা কেউ আমাকে কখনো বাসেওনি, বাসবেও না, গোরী। তুই এক ও অদ্বিতীয়। তোর কথা ভেবে আমার হৃদয়ে আজ বিষাদ ভিন্ন আর কোনো ভাব নেই। এ বিষাদ এত প্রগাঢ় আর এত গভীর যে দুটো বছর এর কাছে কিছু নয়। একটি প্রেমবতী অবলা নারীকে আমি পরিত্যাগ করে যাচ্ছি এর মতো অপরাধ আর কী হতে পারে! যে প্রেম ধ্রুব তাকে ফেলে আমি অধ্রুবের আশায় ছুটেছি। এর মতো মূঢ়তাই বা কী আছে! তবু এটা সত্য যে আমি তার জন্যে মুক্ত থাকতে চাই যে আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করবে। সানন্দে আমার সন্তানের জননী হবে। আমার জীবনের সঙ্গে জীবন জুড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবে।"

গোরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "ওরে ক্ষ্যাপা, তোকে দোষ দিচ্ছে কে? আমি তো নয়। আমার জীবনের সাধ আমি হব বিপ্লবী নায়িকা। তোর সঙ্গে গেলে কি আমার সে সাধ পূর্ণ হবে? বলতে গেলে আমিই তোকে পরিত্যাগ করছি। আমিই অপরাধী। তারপর দুই যাকে চাস সে একটি সীতা কি সাবিত্রী। যে নারী স্বয়ংবরা হবে। কিন্তু পুরাণে কি লিখেছে ওরাই প্রেমিকার শিরোমণি? না রে, ওঁদের উপরেও ঠাঁই রাধা নামে একটি গোপীর। রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি।"

একাধারে রাধা আর বিপ্লবী নায়িকা! এ নারীর সঙ্গে ছন্দ রেখে জীবনের পথ চলবে কে? এ পুরুষ তো নয়। সে পুরুষোত্তম আজ এখনি দৃশ্যমান না হলেও পরে একদিন হবেন। তখন গোরীর জীবনে ছন্দ আসবে।

রত্নও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "কোনো দুটি প্রেম একই রকমের হয় না। আমাদের এ প্রেম অদ্বিতীয়। আমরা সত্যরক্ষা করব প্রেমিকের কাছে বা প্রেমিকার কাছে না হোক, প্রেমের কাছে। ভালোবাসা চিরদিন থাকে না। যে ক'দিন থাকে সেই ক'দিন যেন আপনার কাছে সত্য হয়। তুই আমাকে, আমি তোকে সত্যই ভালোবেসেছি, গোরী। কিন্তু এর পরে যদি ভালোবাসাকে টেনে লম্বা করতে যাই ওটা আর সত্য থাকবে না। অসত্য নিয়ে আমরা কী করব, গোরী?"

"আমি যে এ জীবনে আর কাউকে ভালোবাসতে পারব, এ আমার বিশ্বাস হয় না, মানিক। তোর কথা আলাদা। নারীর কাছে পুরুষের যত কিছু পাবার আছে তা যখন মেটাতে পারছিনে, পারব কি না অনিশ্চিত, তখন তোর পাওনা তুই আর কারো কাছে পাবি। আমি কিন্তু আমার এই মানিকটিকেই আঁচলে বেঁধে রাখব। আর আমার কপালে সইবে না।" গোরী চোখে আঁচল দেয়।

রত্ন তার দুটি হাত ধরে বলে, "রাধে, তোর প্রেমের ঋণ কি এ জন্মে ভুলতে পারি? প্রেমের পরীক্ষায় তোরই জয় হয়েছে, আমার হয়নি। যে পরীক্ষায় আমি জিতেছি সেটা প্রেমের পরীক্ষার মতো অত কঠোর নয়। গোরী, তুইই আমার চেয়ে বড়ো। আমার সুপিরিয়র। তুই বিজয়িনী। আমি তোকে বন্দনা করি।"

গোরীর দুটি গাল বেয়ে ধারা বয়ে যায়। রত্ন একটু ঝুঁকে পড়ে দুই হাত দিয়ে মুছিয়ে দেয়। দিতে দিতে কী যে খেয়াল হয়, আচমকা ওর একটি গালে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে

দেয়। গোরী চমকে উঠে সরে যায়। তারপর সরে এসে এদিক ওদিক চেয়ে ত্বরিত প্রতিদান দেয়। তারপর ছুটে পালিয়ে যায়।

এদিকে প্রেমের দেবতা হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেও ওদিকে বিবাহের দেবতা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। প্রজাপতির নির্বন্ধে রত্নকে তার কাকার এক বন্ধুকন্যার পাণিগ্রহণ করতে হবে। এ বাড়িতে পণগ্রহণ হয় না বলে ওঁরা প্রস্তাব করেছেন যে রত্ন যদি ওর বধূকে বিলেত নিয়ে যেতে চায় তবে যাবতীয় খরচ ওঁরাই বহন করবেন। ওটা কিন্তু এমন নির্বোধ যে সরাসরি "না" বলে দেয়। পাছে কেউ তর্জমা করে "না" মানে "হাঁ" তাই বাবাকে চিঠি লিখে জানায় যে, এ জীবনে সংসারী হতে ওর ইচ্ছা নেই।

বাবা তার তর্জমা করেন এই বলে যে, ছেলে তাঁর সন্ন্যাসী হবে। তিনি দারুণ শোক পান। সে বাড়ি ফিরে গেলে তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করেন। শেষে খোলসা করে বলতে হয় যে সংসারী না হওয়ার অর্থ সন্ন্যাসী হওয়া নয়, বিবাহ না করা। ব্যাপারটা আরো খোলসা হত যদি সে সাহস করে বলত যে সে অন্য একটি মেয়ের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিণয়ের জন্যে নয়। মুক্তির জন্যে। ওটা এমন একটা প্রহেলিকা যে তাঁর কাছে সহজবোধ্য হত না। হয়তো আরো শোক পেতেন। তাই সত্য গোপন করতে হয়।

ফলে রত্নর মনে অস্বস্তি। অস্বস্তি ক্রমে ক্রমে অসুখে দাঁড়ায়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিতে দিতে শরীর মন নিঃশেষিত। প্রেমের পাট চুকিয়ে দিতে গিয়ে হৃদয় নিঃশেষিত। এখন নির্দিষ্ট দিনে রেলপথে বম্বে অবধি গিয়ে জাহাজ ধরতে পারলে হয়।

ওদিকে ইউরোপ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অন্তরালবর্তিনী মোহিনীর মতো। একটা দিনও তার ত্বর সইছে না। এদিকে তো ত্রিশঙ্কুর মতো ন যযৌ ন তস্থৌ। অবশেষে আর থাকতে না পেরে সে রোগীর পথ্য সম্বল করে পথে বেরিয়ে পড়ে। তার বাবা আশীর্বাদ করেন, যাত্রা শুভ হোক।

গোরীর সঙ্গে চিঠি লেখালেখির বিরাম ছিল না। কিন্তু সুরটা আর প্রণয়ের নয়। ওরা এখন আবার ভাইবোন। রত্নর ধারণা গোরী ওটা গ্রেসফুলভাবে মেনে নিয়েছে। দু'জনে দু'জনের কাছে বিদায় নেয়। পুনর্দর্শনায় চ। পুনর্দর্শনায় চ।

বম্বেতে পা দিয়ে রত্ন দেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে একটি বিস্ময়। একটি পার্সেল। আবিষ্কার করে ওতে আছে একখানি নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়। খদ্দরের তৈরি। তার উপর রূপালি কাজ। সেই সঙ্গে একটি রেশমী রুমালে বাঁধা কী এক অপূর্ব বস্তু। খুলে দেখে, গুচ্ছ গুচ্ছ ঘন কৃষ্ণ অলক। কাঁচি দিয়ে কাটা। কী নির্মম! কী করুণ!

নারীর কেশের গুরুভার কি ও বইতে পারে? জাহাজের ডেক থেকে নির্জন দেখে সে কেশ বাতাসে ভাসিয়ে দেয়। এক ঝাঁক পাখীর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ অলক উড়ে চলে অলকার অভিমুখে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

রত্ন ও শ্রীমতী/প্রথম ভাগ
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক —শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

চার টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৫।

উৎসর্গ — মাতৃস্মৃতি
পিতৃস্মৃতি

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৩

রচনাবলীতে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে।
বইয়েব প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করণেই লেখকেব ভূমিকা ছিল। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ছাপা হযেছে মূল-গ্রন্থের সঙ্গে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা নিচে দেওয়া হলো —
'রত্ন ও শ্রীমতী'-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকাব তৃতীয় অনুচ্ছেদে আমি ঘোষণা করেছিলুম এ বই পাঁচ খণ্ডে সারা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ লিখতে গিয়ে দেখি দুস্তর বাধা। বাধার ইতিহাস যদি লিখতে বসি তা হলে সেও একখানি উপন্যাস হবে। অবশেষে আমাকে হার মানতেই হলো। বাইরের কাছে, ভিতরের কাছে, মানুষের কাছে, অদৃষ্টের কাছে। মহাপ্রস্থানের পথে শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও তো পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন কি ? পর্বতে উঠতে গেলে মাঝ পথে পতনও আছে। আমি এটা জানতুম না। প্রথম এক হাজার ফুট অনায়াসে অতিক্রম করে ওই ভূমিকা লিখি। দ্বিতীয় এক হাজার ফুট কায়ক্লেশে অতিক্রম করি। তার পরে আর পারিনে।

একবার এক হিমালয়-অভিযাত্রী ইংরেজের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কথা

প্রসঙ্গে তিনি বলেন —

'The most important thing for a mountaineer to know is when he is defeated. He must accept that defeat, for not to do so is certain death'.

অন্নদাশঙ্কর রায়

রত্ন ও শ্রীমতী/দ্বিতীয় ভাগ

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক — শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৬-৫৭।

উৎসর্গ — মাতৃস্মৃতি
পিতৃস্মৃতি

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৪

রচনাবলীতে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে।
দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত লেখকের ভূমিকা নিচে দেওয়া হলো —

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কথা ছিল যে 'রত্ন ও শ্রীমতী' পাঁচভাগে সারা হবে। বছরে একভাগ করে নিয়মিত লেখা হবে। কিন্তু আমার সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কোথাও একজায়গায়

একটা অদৃশ্য বাধা ছিল। তাই দ্বিতীয়ভাগ শেষ করে আমাকে থামতে হলো। তখন মনে হয়েছিল বেশীদিনের জন্যে নয়। পাঠককে আমি বসিয়ে রাখব না। কিন্তু দেখলুম আমি আমার মালিক নই। আমাকে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতেই হবে। পরে এমন হলো যে আমাকে সমাপনের আশা ছেড়ে দিতে হলো, ধরে নিতে হলো যে দ্বিতীয়ভাগই শেষভাগ।

বারো বছর বাদে তৃতীয়ভাগ লিখতে পেরেছি। তৃতীয়ভাগই শেষভাগ। যত কথা বলবার ছিল তত কথা বলা হলো না। কিন্তু কাহিনী যথাস্থানে সমাপ্ত হয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

রত্ন ও শ্রীমতী/তৃতীয় ভাগ
অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক — শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

আট টাকা

উৎসর্গ — মাতৃস্মৃতি
পিতৃস্মৃতি

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখকের ভূমিকা ছাপা হয়েছে মূলগ্রন্থের সঙ্গে।

রচনাবলীর এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থের কপিরাইট শ্রীপুণ্যশ্লোক রায়ের।